প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদাসমগ্র ২

ঘনাদাসমগ্র ২

banglabooks.in

ঘনাদা সমগ্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

২

সম্পাদনা : সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আনন্দ

banglabooks.in

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১
ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১১

প্রচ্ছদ সমীর সরকার
অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-101-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

GHANADA SAMAGRA: Volume II
[Stories]
by
Premendra Mitra

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

ভূমিকা

ঘনাদার প্রথম গল্প 'মশা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে আর প্রথম গল্প সংকলন "ঘনাদার গল্প" প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। তারপর ১৯৭০ পর্যন্ত একে একে প্রকাশিত হয় আরও পাঁচখানি গ্রন্থ। সেই মোট ছ-খানি গ্রন্থ কালানুক্রমিক ভাবে "ঘনাদার সমগ্র ১"-এ গ্রন্থিত হয়ে ২০০০-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মধ্যে ঘনাদার আরও ন-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—সেগুলির মধ্যে আছে ছ-খানি গল্প-সংকলন আর তিনটে উপন্যাস। "ঘনাদা সমগ্র ২"-এর প্রথম বিভাগে ছ-খানি গল্পগ্রন্থ ও দ্বিতীয় বিভাগে উপন্যাসে তিনটে প্রকাশের কাল অনুসারে পরপর সাজানো হয়েছে। এই ন-খানি গ্রন্থের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত "ঘনাদা ও দুই দোসর" গ্রন্থটির অন্তর্গত 'ঘনাদার বাঘ', "পক্ষিরাজ" পত্রিকার ১৯৮৫-র পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'কালো ফুটো সাদা ফুটো', "কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান"-এর ১৯৮৭-র পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা' এবং শেযোক্ত পত্রিকার ১৯৯১-এর পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত ঘনাদার একটি আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ গল্প। "ঘনাদা সমগ্র"-র প্রথম দু-খণ্ডে ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রর সশরীর উপস্থিতি কালে প্রকাশিত ঘনাদার যে-পনেরোটি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে সেগুলি ছাড়াও ঘনাদার আরও কতকগুলি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, যেমন "ঘনাদা চতুর্মুখ", "অফুরন্ত ঘনাদা", "ঘনাদার সঙ্গীসাথী", "ঘনাদা বিচিত্রা" ইত্যাদি। কিন্তু এইসব সংকলন আগেই প্রকাশিত কোন-না-কোন গ্রন্থের সংযোগে সংকলিত, তাই এগুলিকে ঘনাদার গল্পের মূল গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায় না, উল্লিখিত পনেরোখানা গ্রন্থই শুধু মূল গ্রন্থ। তবে "ঘনাদা বিচিত্রা" বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে 'পৃথিবী যদি বাড়ত' নামে একটি নাটিকা যা আসলে "দুনিয়ার ঘনাদা"-র অন্তর্গত 'পৃথিবী বাড়ল না কেন' গল্পটারই নাট্যরূপ। চলচ্চিত্রের পর্দায় ও নাটকের মঞ্চে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ছিল; নাটিকাটির রচনায় তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে পুরো মাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। এ ছাড়া এই খণ্ডের শেষে রয়েছে কতকগুলি ছড়া যেগুলিকে প্রেমেন্দ্র স্বয়ং 'ঘনার বচন' বলে অভিহিত করেছেন বোধকরি বাংলার ঘরে ঘরে বহুকাল ধরে প্রচলিত 'খনার বচন'-এর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে। আমাদের বিশ্বাস, "ঘনাদা সমগ্র"'র প্রথম দু-খণ্ডে আত্মনেপদীতে কথিত বিশ্বের বিভিন্ন দুর্জ্ঞাত ও দুর্গম স্থানে এক-একটি মোক্ষম মুহূর্তে হাজির ঘনাদার কীর্তি ও কেরামতির সমস্ত কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে আর ঘনাদা কথিত তাঁর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস-মূলক

কাণ্ডকারখানার কাহিনী সংকলন করা হবে "ঘনাদা সমগ্র"র তৃতীয় খণ্ডে।

উপরে লিখেছি বটে প্রথম দু-খণ্ডে ঘনাদার নিজের সব বাহাদুরির গল্প গ্রন্থিত হয়েছে, কিন্তু কথাটা ষোলো আনা ঠিক নয়, একটু সংশোধন প্রয়োজন, কারণ এই খণ্ডের অন্তর্গত মহাভারত, মৌ-কা-সা-বি-স ও পরাশর নিয়ে গল্পগুলি ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন রসের।

প্রথমে পরাশর প্রসঙ্গে বলি। ঘনাদার মতো পরাশর বর্মাও প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক অনন্য সৃষ্টি। পরাশর বর্মা এমন এক চরিত্র যিনি একই সঙ্গে গোয়েন্দা ও কবি, যেমন তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তেমনই ছন্দে ও ভাষায় তাঁর কর্তৃত্ব। কবিতার দাঁড় বাইতে বাইতে তিনি রহস্যের দরিয়া পার হন। এই অসাধারণ গোয়েন্দাকে নিয়ে প্রেমেন্দ্র অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। সেগুলিতে রয়েছে সূক্ষ্ম সংস্কৃতির পরিচয়। পরাশর নিয়ে দুটি গল্পে ঘনাদাও নিজস্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই গল্প দুটি প্রথমে সংকলিত হয় "ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স" গ্রন্থে আর তাতে সবশেষের গল্প ছিল 'পরাশরে ঘনাদায়', তার আগের গল্প 'আঠারো নয়, উনিশ' আর তারও আগের গল্প ছিল 'ঘনাদা ফিরলেন'। এই খণ্ডে এই তিনটে গল্পের অনুক্রম কেন 'পরাশরে ঘনাদায়' 'ঘনাদা ফিরলেন' ও 'আঠারো নয়, উনিশ' করেছি তা গল্প তিনটে পরপর পড়লেই বোঝা যাবে। উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থে প্রদত্ত গল্পগুলির অনুক্রম অনুসরণ করেছি।

এবার মৌ-কা-সা-বি-স নিয়ে গল্পগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই গল্পগুলিও লেখকের স্বকীয় উদ্ভাবনী প্রতিভায় বিশিষ্ট। এগুলি ঘনাদার অধিকাংশ গল্পের মতো যথাক্ষণে অকুস্থলে উপস্থিত ঘনাদার কোনও কেরামতির বা দুঃসাহসের গল্প নয়, ঘনাদার সামনে ধাঁধার মতো সমস্যার বাজি ফেলে দিলে তিনি কেমন করে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দিয়ে তার মোকাবিলা করেন সেই ওস্তাদির দলিল হল মৌ-কা-সা-বি-স-এর গল্পগুলি। কিন্তু মৌ-কা-সা-বি-স নামের আড়াল থেকে কে বা কারা বাহাত্তর নম্বরের বাসিন্দাদের উদ্দেশে সমস্যাগুলি বিদ্রূপের মতো নিক্ষেপ করত এ এক অনিবার্য তথা স্বাভাবিক প্রশ্ন। কীভাবেই বা সবার চোখ এড়িয়ে সেসব কূটপ্রশ্নের চিরকুট অব্যর্থ প্রবিষ্ট হত মেস-এর ডাকবাকসে? এসবের জবাব ইতিপূর্বে প্রকাশিত ঘনাদার কোনও গ্রন্থে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে এই খণ্ডেই প্রথম গ্রন্থিত 'মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা' নামক গল্পে।

মহাভারত অবলম্বনে ঘনাদার গল্পগুলিতে রয়েছে পৌরাণিক ঘটনাজালের ঘনাদার ঢঙে বিন্যাসের আস্বাদ। "ঘনাদার হিজ বিজ বিজ" গ্রন্থের নামগল্পে আছে 'ঘনাদাকে তখন পুরাণের প্রেতে পেয়েছে। দিন-রাত শুধু মহাভারতই দেখছেন সর্বত্র।' তার পর ওই গ্রন্থের অন্তর্গত 'শান্তিপর্বে ঘনাদা' গল্পটিতে রয়েছে যুদ্ধের পর অনাচারে ভ্রষ্টাচারে ভরে যাওয়া দেশের চিত্র। সে-দেশে ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ হয় না। এমনকী মহাভারতের লিপিকার ও বিঘ্নহন্তা বলে পরিচিত শ্রীশ্রীগণেশ মহোদয়কে দিয়ে কোনও কার্যোদ্ধার করতে হলে তাঁর বাহন ইঁদুর বাবাজিকে মোটা ঘুষ খাওয়াবার দস্তুর দাঁড়িয়ে গেছে, ফলে ঘুষ খেয়ে খেয়ে মূষিকপ্রবর বন্য বরাহের

মতো বপু ধারণ করেছে। মহাভারতের কালেও যে মামা-ভাগ্নের মধ্যে আঁতের সম্পর্ক এ-কালের মতোই ছিল তার প্রমাণ পাই 'ঘনাদার শল্য সমাচার' গল্পটিতে। তখনকার সমাজের সঙ্গে যে এখনকার সমাজের গুণগত সদৃশতা রয়েছে তা গল্পগুলি পড়লে বুঝতে পারি।

'কীচকবধে ঘনাদা', 'ভারতযুদ্ধে পিঁপড়ে', 'কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা', 'খাণ্ডবদাহে ঘনাদা', 'আঠারো নয়, উনিশ' প্রভৃতি গল্পে দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে ও ধর্মসংস্থাপনে আত্মোৎসর্গকারী ঘনাদার কাহিনী পাই না, তার বদলে পাই মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার ঘনাদার দেওয়া বিশ্লেষণ এবং সেসব যেমন অভিনব তেমনই মৌলিক। প্রবাদ আছে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। কিন্তু এই মূল্যবান প্রবাদবাক্যকে ঘনাদা অনেকটাই অসার প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর কথা থেকে আমরা জানতে পারি যে বহু হাত ঘুরে যে-মহাভারত আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে আসল ঘটনাগুলোর অনেক কথাই বাদ পড়ে গেছে। অথবা কারসাজি করে বাদ দেওয়া হয়েছে। ঘনাদার ব্যাখ্যাগুলি, যেমন 'জয়দ্রথবধে ঘনাদা' গল্পে সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যকে আবৃত করার ঘটনাটির ব্যাখ্যা, তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে সেগুলির পেছনে এক বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মন অবিরাম কাজ করে চলেছে। এবং সে-মন প্রকৃতপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই মন। সেই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মন থেকে উদ্ভিন্ন এইসব গল্পও কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারতের মতোই অমৃতসমান।

তবে মহাভারত নিয়ে ঘনাদার কোন গল্পটি যে প্রেমেন্দ্র প্রথম লিখেছিলেন তার কোনও নিশ্চিত সূত্র পাইনি। 'ভারতযুদ্ধে পিঁপড়ে'র এক জায়গায় আছে, বনোয়ারির দেওয়া খাবারের প্লেট সরিয়ে নেওয়ার ফলে 'ঘনাদার মুখের চেহারা মহাভারতের হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশো পঁচাত্তরের বাহাত্তরে এসে পড়ার জন্য ভ্যাবাচাকা।' তার মানে এই গল্পটি উনিশশো পঁচাত্তরে লেখা। কিন্তু গল্পটির শেষের দিকে শ্রোতৃমণ্ডলী জানতে চেয়েছে যে পিঁপড়ের জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণের উলটে শোবার কথা 'মহাভারত থেকে সরাল কে? সেই আপনার ভীমসেন, দারুক আর বন-বরা মার্কা মূষিক কোম্পানি?' বোধহয় আরও আগে লেখা হয়েছিল 'খাণ্ডবদাহে ঘনাদা' আর তাতেও আছে, 'দারুক মূষিক কোম্পানি কি বল্মী বিশারদের কাজ এটা নয়।' আবার 'শান্তিপর্বে ঘনাদা' গল্প থেকেও আমরা জানতে পাই যে ভীমসেন যখন আগে একবার মুশকিলে পড়েছিলেন তখন দারুক আর মূষিক মোটা ঘুষের বদলে ভীমসেনকে বাঁচিয়েছিলেন। এর থেকে কি মনে হয় না যে ভীমসেন, কৃষ্ণের সারথি দারুক আর গণেশের বাহন মূষিকের যোগসাজশের কোনও একটি কাহিনী ঘনাদা আগেই কোথাও ফেঁদেছিলেন? এবং একাধিকবার দারুক-মূষিক কোম্পানির উল্লেখে সংশয় থাকে না যে তাঁরা কীভাবে ভীমসেনকে বাঁচিয়েছিলেন তা নিয়ে ঘনাদার একটা কোনও গল্প প্রেমেন্দ্র আগে কোথাও লিখেছিলেন। কিন্তু সে-গল্প ঘনাদার কোনও গল্পগ্রন্থে অথবা প্রেমেন্দ্রের অন্য কোনও গ্রন্থে বা পত্রিকায় এখনও খুঁজে পাইনি। তবে এমন হতে পারে যে ঘনাদার কোনও গল্পে নয়, কিন্তু মহাভারত নিয়ে লেখা কোনও গল্পে দারুক-মূষিক কোম্পানির প্রথম সূচনা। এখানে বলে রাখি, 'মহাভারতে নেই'

শিরোনামে প্রেমেন্দ্র এমন কতকগুলি গল্প লিখেছিলেন, যেমন ১৯৭১ সালে দেব সাহিত্য কুটির-এর পূজাবার্ষিকী "উদ্বোধন"-এ, যেসব গল্প ঘনাদার গল্প নয়, খোদ লেখকের জবানিতে পেশ করা গল্প।

॥ দুই ॥

ঘনাদার গল্প লেখা প্রেমেন্দ্র শুরু করেছিলেন বিজ্ঞান ও ভূগোলের অল্পজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান পরিবেশনের ছলে। আকস্মিকভাবে ঘনাদার গল্প লেখা শুরু হলেও বছরে বছরে নতুন গল্প লেখা চলতে থাকে অনিবার্যভাবে। এ-বিষয়ে প্রেমেন্দ্র "আনন্দমেলা" পত্রিকার ১৯৮৩-র ২৮ মে সংখ্যায় প্রকাশিত কার্তিক মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, আবার আর্টসেরও ছাত্র ছিলাম। বিজ্ঞান বলো, ইতিহাস-ভূগোল-রূপকথা বলো, সবকিছুতেই আমার দারুণ আকর্ষণ। ঘনাদাকে নিয়ে মশা নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁকে নিয়ে আর লিখব না। কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে এত চিঠি আসতে লাগল যে বনমালি নস্কর লেনের মেসবাড়ির ঘনাদা আর আমি কেউ পালাতে পারলাম না।' ঘনাদা চরিত্র বাস্তবে দেখা কোনও চরিত্রর আদলে গড়েছেন কি না প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখার সময় একজন হিরোর দরকার পড়ল। বিদেশী সায়েন্স-ফিকশনের হিরোকে দেখা যায়, যেমন সে বিদ্যাদিগগজ তেমনই তার গায়ের জোর। আমি হিরো করলাম একজন সাধারণ অন্নভুক বাঙালিকে। সে কলকাতার মেসের ভাত খেয়ে এমন শক্তিমান যে তার মুখের জোরের ধারেকাছে কেউ দাঁড়াতে পারা না। পাঠকের কাছে ঘনাদা তাই এত ভালোবাসা পেয়েছে।'

কোন কোন মহলে একটা ধারণা চালু আছে যে বাঙালি কাজের চেয়ে কথায় দড়, বাতের জোরে সে দুনিয়া মাত করে। এই ধারণাটা ঠিক কি বেঠিক সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই একই ধারণাকে সাধারণ বাঙালির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন ঘনাদার গল্পগুলোতে। একদিক থেকে ঘনাদা অবশ্যই বাকসর্বস্ব বাঙালি জাতির একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, আবার অন্যদিক থেকে দেখলে অভিভূত হতে হয় তাঁর বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারে, তাঁর প্রখর উপস্থিতবুদ্ধিতে, তাঁর অফুরন্ত উদ্ভাবনী প্রতিভাতে। বাগাড়ম্বরের সঙ্গে প্রভূত পাণ্ডিত্যে ঘনাদা অনন্য। এবং চূড়ান্ত বিচারে ঘনাদার সমস্ত বাকচাতুর্য, সমস্ত ঘটনাবিস্তার, সমস্ত তথ্যসম্ভার, সমস্ত বিন্যাসশৈলীর অদ্বিতীয় ও নিত্যবহ উৎস হল স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব।

এই ব্যক্তিত্ব এক জাতের গল্পে মানব-চরিত্রের স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গভীর বিশ্লেষণে, আবার অন্য জাতের গল্পে একই ব্যক্তিত্ব অধীত ও অর্জিত জ্ঞানের সংশ্লেষণে নির্মাণ করেছেন কাহিনীর চমকপ্রদ অবয়ব, প্রথম জাতের গল্পে চরিত্রে চরিত্রে যে-সংস্থান তৈরি হয় তার ভেতরে ঢুকে ফুটিয়ে তোলেন জীবনের আলো-আঁধারি রহস্যের ব্যঞ্জনা, এবং দ্বিতীয় জাতের গল্পে বাইরে থেকে

সংগৃহীত বিবিধ উপাদানের সমবায়ে গড়ে তোলেন অসম্ভব প্রস্তাবকে সম্ভব করে তোলার প্রীতিময় উত্তেজনা। দুই জাতের গল্পেই প্রেমেন্দ্র মিত্র সিদ্ধহস্ত।

বয়সের গাছপাথর নেই, গত দুশো বছরে হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই এইভাবেই ঘনাদার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল সেই ১৯৪৫ সালে লেখা ঘনাদার প্রথম গল্পে। তারপর ১৯৮৭-তে লেখা 'মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা' গল্পটি পর্যন্ত তিনি মহানায়কের মতো সমান দাপটে বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘরে অটল হয়ে টিঁকে থেকেছেন। অবশ্য কখনও কখনও এই মেস ছেড়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন, একবার ছেড়েই গেছেন এক অদ্ভুত কারণে, কিন্তু ঘটনা এই যে এই দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরে বাহাত্তর নম্বরে কোনও রকম মেরামতির জন্য রাজমিস্ত্রি অথবা চুনকামের জন্য রংমিস্ত্রি লাগানো যায়নি ঠাঁই নাড়ানাড়িতে ঘনাদার অসুবিধে হবে বলে। তাঁর অবস্থান পর্বে বাহাত্তর নম্বরে কখনও কখনও নতুন অতিথি এসেছে। যেমন বাপি দত্ত, সুশীল চাকি, ধনু চৌধুরি প্রমুখ। কিন্তু যখনই তেমন কেউ মাতব্বরি শুরু করেছে বা নিজের সীমানা ছাড়িয়ে পুরনো বোর্ডারদের অসুবিধে কি বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে তখনই তাকে মেস-ছাড়া করার দায়িত্ব নিয়েছেন ঘনাদাই। এমনকী তাঁকে নিয়ে খাতিরের বাড়াবাড়ি বা স্থূল আদিখ্যেতা ঘনাদা বরদাস্ত করার পাত্র নন। আবার অন্যদিকে তিনি মেস-এর পুরনো সবার সঙ্গে একটা শোভন, সরস ও সুসম সম্পর্ক বজায় রেখেছেন আগাগোড়া।

শুধুমাত্র ভোজ্যবস্তুর বিষয়ে ঘনাদা বেসামাল হন এবং তাঁর ভোজনপ্রিয়তা বিলাসিতার পর্যায় ছেড়ে লোলুপতার পর্যায়ভুক্ত। তার এই প্রচণ্ড দুর্বলতাটাকে মেনে নিয়েই মেস-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যরা তাঁকেই গুরুজনের স্থান ও জ্ঞানীগুণীর মান দিয়েছে। মেস-এর পরিচারকদ্বয়ও তাঁকেই 'বড়া বাবু' বলে জানে, এমনকী "তেল দেবেন ঘনাদা" উপন্যাসের নামকরা কোম্পানির উর্দিপরা ড্রাইভারের কাছেও তিনিই 'বড়া বাবু'। বাহাত্তর নম্বরের শিরোদেশ স্বরূপ এহেন ঘনাদা তথা ঘনশ্যাম দাস মহোদয় এই মেস-এ কবে কেমন করে এসে হাজির হলেন এ-প্রশ্ন পাঠকপাঠিকার মনে বারেবারে জাগা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে 'ঘনাদা এলেন' গল্পটিতে। যেমন হঠাৎ-করে ঘনাদার গল্প লেখা শুরু হয়েছিল তেমনই হঠাৎ-করেই ঘনাদা একদিন এসে পড়েছিলেন এই মেস-এ। ঘনাদার গল্পগুলি যদি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে লেখা হত তবে হয়তো এইটেই হত ঘনাদা গল্পমালার প্রথম গল্প। কিন্তু এই গল্পটি লেখা হয়েছে ঘনাদার প্রথম গল্প লেখার চল্লিশ বছর পরে ঘনাদা ক্লাব-এর সদস্যদের ফরমাশে। ফরমাশী গল্পেও যে কত নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, তাও যে কত সম্পূর্ণতা লাভ করে এই গল্পটি তার একটি চমৎকার উদাহরণ। ফরমাশকারীদের ঘনাদা ক্লাব-এর কথা পরে বলব।

ইতিমধ্যে ঘনাদার গল্পগুলির লেখক রূপে উত্তমপুরুষের চরিত্রটি মেস-এর অন্যান্য চরিত্রর মতোই কথায় ও কাজে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে এই লেখক-চরিত্র নিজেকে অন্যান্য চরিত্রর আড়ালে অনেকখানি গোপন করে রেখেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে যে সেই আড়াল সরিয়ে সামনে বেরিয়ে

আসতে থাকে তা আমরা "ঘনাদা সমগ্র"র প্রথম খণ্ডেই দেখেছি। সে-খণ্ডে তার নাম জানা যায়নি, তা জানা গেল বর্তমান খণ্ডের প্রথম গল্প 'ধুলো'তে। ঘনাদাই প্রথম তাঁর কাহিনীকার চরিত্রটিকে সুধীর নামে অভিহিত করেছেন, আবার তাকে ওই নামে সম্বোধন করেছেন 'কাদা' গল্পটিতে। 'ঘনাদার হিজ বিজ বিজ' গল্পটিতেও কাহিনীকারকে সুধীর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুধীর স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত 'ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স'-এর মতো আরও কোন কোন গল্পে। তবে কাহিনীগুলোতে উত্তমপুরুষ সাধারণত যেমন স্পষ্টভাবে উপস্থিত তাতে তার নাম উল্লেখ করা হল কি হল না তা অবান্তর। তবু কোন কোন স্থলে তাকে সুধীর নামে স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার কারণ বোধকরি এই যে প্রেমেন্দ্ররই ডাকনাম সুধীর। আর মেস-এর অন্যান্য চরিত্রের বাস্তব পরিচয় পূর্ববর্তী খণ্ডের ভূমিকাতেই জানিয়েছি।

ঘনাদার সমস্ত গল্পই গঠিত হয় দুটি অংশের সংযোগে, প্রথম অংশে থাকে মেস-এর সভ্যদের মধ্যে ঘনাদাকে তাতাবার জন্য আলাপ-সলাহ্‌র উত্তমপুরুষে দেওয়া বিবরণ আর দ্বিতীয় অংশে থাকে ঘনাদার নিজের জবানিতে বলা কাহিনী। ঘনাদার বয়ানই আসল গল্প, পরিস্থিতির আবিষ্করণে ও পরিকল্পনার রূপায়ণে যেমন চমকপ্রদ তেমনই স্মরণীয়, কিন্তু তার প্রস্তুতিপর্বের উপস্থাপনেও সুধীরের বর্ণনা অনবদ্য, কারণ ঘনাদার বয়ানে স্থান-কাল-পাত্র প্রতিবারেই নতুন, অথচ সুধীরের বর্ণনায় প্রদত্ত সমস্ত গল্পে নিত্য সত্য-র মতো সতত একই স্থান-কাল-পাত্র, শুধু পরিবেশনের কৌশলে ও বৈচিত্র্যে প্রতিবারই অভিনব ও আকর্ষী। ঠিক কথা যে ঘনাদা-সাহিত্যের অর্থাৎ ঘনাদাকে দিয়ে গল্প বলাবার জন্য মেস-এর বাসিন্দাদের তোড়জোড়ে ভরা প্রাথমিক কাণ্ড আর ঘনাদার মুখে মূল কাণ্ডের সবটাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা এবং স্বতন্ত্রভাবে গল্পের একটি চরিত্রকে নিজের ডাকনামে চিহ্নিত করার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না। তা ছাড়া যাঁরা জানেন না যে লেখকেরই ডাকনাম ছিল সুধীর, তাঁরা মেস-এর কাহিনীকারের নাম সুধীর জেনেও কোনও অতিরিক্ত রস পাবেন না, কিন্তু প্রেমেন্দ্রর দিক থেকে নিজের ডাকনামে কাহিনীর উত্তমপুরুষকে চিহ্নিত করার মধ্যে ঘনাদা-সাহিত্যে একটা অতিরিক্ত মাত্রাদানের ব্যাপার আছে এবং পাঠকের দিক থেকেও সেই মাত্রা তখনই ধরা সম্ভব হবে যখন তিনি জানবেন যে লেখক নিজেকে এমনভাবে প্রক্ষেপ করেছেন যাতে তিনি পরিণত হয়েছেন বিরচিত কুশীলবদেরই একজন। আবার 'ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স' গল্পটিতেও ধাঁধার মতো ছড়ার কৌশলে কালীঘাটের গঙ্গার যে-ধারে আলিপুর কারাগার তার অপর ধারে নিজের বসতবাড়িটারই বর্ণনা দিয়েছেন,

'নদী না খাল?
তার ওপারে শুরু
লম্বা লাল দেওয়াল।
দেওয়ালের ওখানে কারা?
ওখানে রইল ইশারা।

এখন খুঁজলে বাড়ি
পাবে তাড়াতাড়ি।'

॥ তিন ॥

এই বাড়িতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে গেছেন, তবে কখনও হয়তো কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য তিনি থাকতে পারেননি, কিংবা কখনও হয়তো তিনি নিজেই কাজের কারণে মুম্বাইয়ে বাস করেছেন, কিন্তু এই বাড়ির সঙ্গেই তাঁর সমগ্র শারীরিক অভ্যাসের স্মৃতি জড়িত এবং তাঁর জীবনযাপনার প্রায় সমগ্র অংশই এখানে অতিবাহিত। এই বাড়িতেই তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য লিখিত। উপকরণে ও স্থাপত্যে এই প্রাচীন বাড়ি এই কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এক কৃতীজন একই বাড়িতে প্রায় গোটা জীবন কাটিয়ে দিলেন এমন নজির আজকের বাঙালি সমাজে দুর্লভ।

এই বাড়িতেই ১৯৮৪ সালে গল্পের ঘনাদার অনুরাগী কয়েকজন বাস্তব চরিত্র মিলে ঘনাদা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের শার্লক হোমস ক্লাব-এর আদর্শে ঘনাদা ক্লাব গড়ার প্রস্তাব তুলেছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ "কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান" পত্রিকায় একটি পত্রের আকারে ১৯৮৩ সালে। এই ক্লাবের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন রবীন বল, কিন্নর রায় প্রভৃতি। দু-বছর পরে রবীন বল-এর ব্যবস্থাপনায় "কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান"-এর ১৯৮৬ জুন সংখ্যাটি বিশেষ ঘনাদা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। তাতে রন্ধন-পটিয়সী বিখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদার লেখেন ঘনাদার ভোজনপ্রিয়তা সম্বন্ধে। তিনি লেখেন, 'ভোজন বিলাসী যিনি তিনি নিজের হাতে পাক না করলেও, যারা করবে তাদের হাড়-জ্বালানি ডিটেল সহকারে, রিগা বা মিকিউ বা কংগো বা বোদরুমের এবং বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের পাক-প্রণালীর বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবেন না? ভোজন-বিলাসীদের ওই করে কত সুখের সংসার ছারখার করে দিতে কি আমি দেখিনি? অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে প্রথম জীবনে ওইসব করতে গিয়েই বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে এমন নির্বান্ধব পরিচয়বিহীন জীবন তাঁকে (ঘনাদাকে) কাটাতে হচ্ছে।' একটু পরে লেখিকার মনে পড়েছে, 'কিন্তু প্লেট বোঝাই শিক-কাবাব, ফিশ ক্রোকেট, হরি ময়রার বাদশাহি শিঙাড়া, কালীঘাটের তোতাপুলি-ল্যাংচা প্লেটের পর প্লেট নিঃশেষ করে দিচ্ছেন ঘনাদা, এ-দৃশ্য বারবার দেখতে পাচ্ছি। খেতে ভালো হলেই খেয়ে ফেলেন।' এটা তো ঠিক ভোজনবিলাসীর চরিত্রানুগ হতে পারে না। লেখিকার মতে, আসলে 'শিবু, শিশির, গৌর এবং বিশেষ করে ভিজে বেড়াল সুধীর—ঐ চারটে ছেলে দারুণ পেটুক এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা তারা জানে যে দুনিয়ার পেটুকপনার সুবিধা নিয়ে সবাইকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যায়।' প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে শিবু, শিশির ও গৌরের প্রকৃত পরিচয় জানিয়েছি আর একটু আগে জানিয়েছি স্বয়ং সুধীরের—আসল চরিত্রগুলি যে কে কোনজন তা জানতে পারলে ঘনাদাকে ভোজনবীর হিসেবে দেখানোর মধ্যে একটা অতিরিক্ত মজা পাওয়া

যায় না কি? কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ভোজনকর্মে প্রেমেন্দ্র নিজে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন জীবনের শেষ বিশ বছর। সেই অক্ষমতা থেকেই কি তাঁর হিরো-কে ভোজনবীর হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন? এখানে আরও একটু জানিয়ে রাখি যে শিবু নামের আড়ালধারী বিখ্যাত রস-সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী "ঈশ্বর পৃথিবী, ভালোবাসা" নামে আত্মকথা মূলক গ্রন্থের একস্থানে নিজস্ব রসিকতায় লিখেছেন, তাঁর কাছে কেউ যদি জানতে চান যে তাঁর বিবেচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কে বড় তাহলে তিনি নিঃসংশয়ে জানাবেন ওই দুজনের মধ্যে প্রেমেন্দ্রই বড়।

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 'বিজ্ঞানী ঘনাদা' নামক প্রবন্ধে লেখেন, 'নিজের হাতে বিজ্ঞানের গবেষণা না করলেও নানা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসে তিনি যেসব তথ্য পরিবেশন করেন তা কিন্তু সত্যি অস্বাভাবিক মনে হলেও মোটামুটি বিজ্ঞাননির্ভর—বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র বা নিয়মকে মেনে নিয়েই তা রচিত। আর খুঁটিনাটি সেই তথ্যগুলো এত নিখুঁত যে মনেই হয় না, এ কোনও বিজ্ঞানীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ ফল নয়। ...প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও নিজে বিজ্ঞানী নন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর কৌতূহল অদম্য আর তারই ছায়া এসে পড়েছে এইসব গল্পে।' আর ঘনাদা ক্লাব গড়ার প্রথম প্রস্তাবক সিদ্ধার্থ ঘোষ 'ঘনাদার বিশ্বপরিক্রমা' সম্বন্ধে লেখেন, 'ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যায় না এমন বহু দ্বীপই ধন্য হয়েছে ঘনাদার আগমনে। ...তা বলে কেউ যদি মনে করে ঘনাদা শুধু বেপট জায়গাতেই ঘুরেছেন—সে কিস্‌সু জানে না। দুনিয়াময় টহলদারি করছেন তিনি দু-শো বছর ধরে। নামী-দামী জায়গাই বা বাদ পড়বে কেন।... তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপ সর্বত্রই গেছেন তিনি, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি তাঁকে টেনেছে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার রহস্যময় জঙ্গল, আর দুই মহাসাগর প্যাসিফিক ও আতলান্তিকের ছিটেফোঁটা বহু দ্বীপ।' বিজ্ঞান-শিক্ষক সাহিত্যিক সমরজিৎ কর লেখেন, 'গল্পের ভেতর দিয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় যে এত সহজ করে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে বাংলা ভাষায় আর কখনও ঘটেনি। ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চার শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের কত অজানা কথাই না আমরা মনের অজান্তে শিখে ফেলেছিলাম!'

যখন ঘনাদা ক্লাব গঠিত হয় তখন ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রর বয়স আশি, দৃষ্টি ক্ষীণ, ইন্দ্রিয়গুলো পতনোন্মুখ, স্বাস্থ্য জীর্ণ, শরীর অশক্ত, কিন্তু মন তখনও তাজা, কল্পনা তখনও উড়ন্ত, তখনও তিনি শুধু ঘনাদাকে নিয়ে নয়, মামাবাবু-ঘনাদা-পরাশরের থেকে নতুনতর চরিত্র "ভূত শিকারি মেজোকর্তা"কে নিয়ে অদ্ভুত রসের আরও গল্প রচনার আগ্রহে চঞ্চল, আর ঘনাদাকে নিয়ে তো লিখছেনই। ঘনাদা ক্লাব প্রতিষ্ঠার ফলে ঘনাদার আরও নতুন গল্প লেখায় প্রেমেন্দ্র যে-উৎসাহ পেলেন তাতে লিখে ফেললেন "মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা" নামে এমন এক অভিনব উপন্যাস যার রহস্যের সূত্র উদ্ধার করেছেন নতুন কোনও গ্রন্থ বা তথ্য থেকে নয়, নিজেরই স্মৃতিতে নিমজ্জিত জয়দেব-এর বিখ্যাত রচনা

"গীতগোবিন্দম"-এর একটি বহুল প্রচারিত শ্লোক থেকে। কিন্তু কাহিনীটি উপস্থাপন করেছেন স্কটল্যান্ডের এমন এক হ্রদের উপকূলে যার সঙ্গে সমুদ্রের এক গোপন সংযোগ রয়েছে আর উপন্যাসটিতে তিনি ওই হ্রদ সংলগ্ন শহরের তথা স্কটল্যান্ডের জীবন ও প্রকৃতির এমন বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন যাতে মনে হয় লেখক স্বয়ং স্কটল্যান্ড-এ গিয়ে সরেজমিনে সব তদন্ত ও চাক্ষুষ করে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন। ঘনাদার অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায়, যেসব অখ্যাত বা দুর্গম স্থানে ঘনাদা গিয়ে হাজির হন সেসব স্থানে লেখক নিজে কখনও যাননি বা যেতে পারেন না তবু সেসব স্থানের যে বর্ণনা তিনি দেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। ওই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রেমেন্দ্রের নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভার সৃষ্টি।

সেই শক্তি ও প্রতিভা, প্রেমেন্দ্রর শেষ পর্যন্ত অটুট ও জীবন্ত ছিল, কিন্তু বাদ সাধছিল তাঁর বয়স ও ব্যাধি। উল্লিখিত বিশেষ ঘনাদা সংখ্যাটির জন্য তাঁর যে-সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন কিন্নর রায় তার শিরোনাম ছিল 'ঘনাদা এলো কোথা থেকে'। তাতে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আসলে কী জানো? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা আছে যে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়। আবার বিজ্ঞানমনস্ক, ইতিহাসমনস্ক, সবার ওপর অভিযান প্রিয়।' কিন্নর রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঘনাদা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার পরিকল্পনা কী?' উত্তরে প্রেমেন্দ্র বলেন, 'অনেক কিছুই তো পরিকল্পনা আছে। কিন্তু পেরে উঠছি কই? একে তো শরীর খুব খারাপ। তার ওপর চোখে দেখতে পাই না, ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ড লিখি। নিজের লেখা লাইন নিজেই বুঝতে পারি না। পড়ে দেওয়ার লোক নেই। না পড়লে ঘনাদা লেখা অসম্ভব এ তো জানোই।' দৃষ্টিশক্তির ক্রমাবনতি তাঁর শেষ বছরগুলির দুর্গতি ছিল। কখনও আগের লাইনের ঘাড়ে পরের লাইন চড়ে বসত, আবার কখনও লিখতে লিখতে লাইন বাইরে বেরিয়ে যেত পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি যে তিনি যখন "আনন্দমেলা" পত্রিকার সম্পাদক তখন প্রেমেন্দ্রর লেখার প্রুফ নিজে দেখতেন, লেখার পাঠে যেসব গোলমাল ও ঘাটতি থাকত সেসব নিজে শুধরে ও পূরণ করে দিতেন এবং চূড়ান্ত পাঠটি প্রেমেন্দ্রর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পড়ে শোনাবার পর তাঁর অনুমোদন নিতেন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই জানিয়েছিলাম, একবার কাগজেকলমে লিখে ফেলা রচনার আর-একবার মুদ্রণের সময় প্রুফ সংশোধনের মেজাজ প্রেমেন্দ্রর ছিল না। কোনও যান্ত্রিক কাজের জন্য ধৈর্যও ছিল না তাঁর। ফলে কোন কোন ছাপার ভুল চলে এসেছে প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই। এবং পরের মুদ্রণে ভুলের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই গেছে। এই মেজাজের সঙ্গে যখন তাঁর বয়স ও তার সঙ্গে শারীরিক অপটুতা যোগ হল তখন অবস্থা দাঁড়াল বেশ শোচনীয়। তাঁর হাতে লেখা কপির পাঠ উদ্ধার করাই হল প্রেস-এর কর্মীদের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার।

প্রেমেন্দ্রর শেষ জীবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ও দৃষ্টিদুর্বলতার ফলে কী ধরনের বিভ্রাট হয়েছে তার দু-একটি নমুনা এখানে দিতে পারি। 'কাঁটা' গল্পের এক স্থানে মধ্যপ্রদেশের

সাতনা স্টেশনটির নাম ছাপা হয়েছিল 'যাতনা', তবে এই ধরনের ভুল অনেকেই চট করে ধরে ফেলতে পারবেন। কিন্তু আলাসকার রাজধানী Juneau যদি ছাপা হয় 'ব্যুনো' তাহলে অনেকের পক্ষে সেটা ধরা কঠিন হবে বলে সন্দেহ করি; তেমনই 'মাত্তো প্রসসো' যে আসলে Mato Grasso এটাও বোধহয় কেউ কেউ বুঝতে পারবেন। তবে banderillero-র জায়গায় যদি বাংলা হরফে 'ব্যাণ্ডেলিয়োরো' ছাপা হয় তাহলে ঠিক শব্দটা ধরা অনেকের পক্ষেই বেশ কঠিন হবে বলে মনে হয়। কেউ কেউ ঘনাদার গল্পকে বানানো গুল গল্প মনে করলেও ঘনাদার জোগানো সব তথ্যই মোটের উপর সত্য, সেখানে গুলের কোনও ব্যাপারই নেই, তাই ছাপার ভুলের দোহাই দিয়ে ভুল তথ্য জোগালেই লেখকের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতাচারণ করাই হবে। তা ছাড়া কোন লেখকই বা নিজের লেখায় ছাপার ভুল বরদাস্ত করতে রাজি? তাই যেখানে ছাপার ভুলের ঠিক রূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ করেছি সেখানে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু কোন কোন স্থলে মুদ্রণপ্রমাদের সমুদ্রে নাকানিচোবানি খেয়েছি, যেমন 'ঘনাদা ফিরলেন' গল্পটি যে-গ্রন্থে এর আগে সংগৃহীত হয়েছিল তাতে এক জায়গায় ছিল যে ঘনাদার খোঁজ করার জন্য পরাশর বর্মার কাছে যাওয়ার ঠিক আগেই বনোয়ারি খবর দিল যে কে একজন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার পরে ওই গ্রন্থে যা ছিল তা হুবহু নীচে তুলে দিচ্ছি :

'বনোয়ারীর এই বিবরণটুকু দেওয়ার মধ্যেই সিঁড়ির নিচে আগন্তুকদের দেখা গেল। হ্যাঁ, আর একজন নয় দুজন।

এমন বেয়াড়া সময়ে কে আবার ঘনাদার সঙ্গে দেখা করতে এল?

খোঁজ করতে নিচে যাবার পথে সিঁড়িতেই তাদের সঙ্গে দেখা। হ্যাঁ, এসেছেন একজন নয় তাঁরা দুজন। প্রথম জন কাশ্মীরী শালওয়ালা আর দ্বিতীয় জন তাঁর বেচতে-আনা শাল-দোকানের বোঝার বাহন।'

এই পাঠ প্রেমেন্দ্র জীবদ্দশাতেই বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হয়, সুতরাং ধরে নিতে হয় যে উদ্ধৃত পাঠটি তিনি নিজেই কবুল করেছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে নীরেন্দ্রনাথের মতো সম্পাদক জোটেনি বলে তিনি নিরুপায় হয়ে এ-বিষয়ে চোখ বুজে থেকেছিলেন।

এই রকম আরও একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি 'মৌ-কা-সা-বি-স ও ঘনাদা' গল্পটির শেষ দিক থেকে। তার আগে প্রসঙ্গটি জানিয়ে দিই যে ঘনাদার বিবরণে রয়েছে, বিদেশিরা যখন বাণ্টুদের দেশে এসে মোটা ঘুষ দিয়ে তাদের ওঝাদের হাত করে গোটা দেশটাই হাত করার তালে ছিল তখন তাদের সব গমের খেত ঝলসে যেতে লাগল কী যেন এক অভিশাপে। তখন ঘনাদা-ভক্তরা জানতে চায় যে ওই বিদেশিদের চাষবাসের বিদ্যেও ছিল আর হাতে স্থানীয় ওঝারাও ছিল, তবু খেতগুলোর অমন হাল হল কেন? এবার আদি-পাঠ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

'—তা ছিল! ঘনাদা স্বীকার করলেন। কিন্তু ওঝাদেরও ভির্মি খাওয়ানো ক্ষ্যাপা হাতির পিঠে চড়া অমন কাঁধে ঝোলা জড়ানো ক্ষ্যাপা অসুরের মতো ওঝাদেরও

আতঙ্ক এসে সব ফসলের ক্ষেতে দেখা দেবে, আর তারপর কিছুদিন বাদে কি এক ফসলদানার মতো পোকার ঝাঁকে আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবার পর সমস্ত ক্ষেত ঝলসে যাবে এত আর কেউ ভাবেনি।'

এই দুটি অংশের পাঠ সংশোধন করে যে-পাঠ নির্ধারণ করেছি তা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এসব ক্ষেত্রে খোদার উপর খোদকারি করে স্বয়ং প্রেমেন্দ্রর মোহরাঙ্কিত রচনার উপর নিজের বিবেচনা অনুসারে রদবদল করতে বাধ্য হয়েছি বলে প্রেমেন্দ্রানুরাগীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। জানি যে এটা প্রেমেন্দ্রর লেখার উপর কলম চালাবার ঔদ্ধত্য, তবু সে-অন্যায় কাজ করেছি তার কারণ যা আদিপাঠে ছিল তা অবিকল রাখলে লেখকের মর্যাদা রক্ষিত হত না বলেই আমার বিশ্বাস।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন পাঠকপাঠিকার পক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে ভেবেও সংশোধনের চেষ্টা করিনি। যেমন 'পৃথিবী বাড়ল না কেন' গল্পে জাইর নামে একটি রাজ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু জাইর বলে কোনও রাজ্য আর নেই, যা আছে তা জাইর নামে একটি নদী আর যে-রাজ্যের নাম বেলজিয়মের শাসন থেকে স্বাধীনতা পাবার পরে জাইর হয়েছিল তার নাম আবার আগের নাম কঙ্গোই হয়েছে। 'ঘনাদার ফুঁ' গল্পে মঙ্গোলিয়ার রাজধানীর নাম আগে Ulan Bator ছিল, বর্তমানে এর নাম Ulaanbaatar. এই রকম আরও কিছু কিছু পরিবর্তন সম্পাদনের অবকাশ ছিল বা আছে যেগুলি লেখক সশরীরে থাকলে হয়তো করতেন, কিন্তু আমি সেগুলো স্পর্শ না করাই উচিত মনে করেছি।

ঘনাদার মতো বিশ্ব-ভ্রমণ না করলেও ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্রও কিছু কিছু বিদেশ-ভ্রমণ করেছিলেন। প্রথমবার তিনি বিদেশ যান ১৯৫৭ সালে, উপলক্ষ ছিল, বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কবিতা-উৎসব, তাতে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সেই সূত্রে তিনি ইটালি ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিডারস গ্রান্ট লাভ করে। আর সোভিয়েত দেশ থেকে নেহরু পুরস্কার পেয়ে রাশিয়া ও উজবেকিস্তান পরিক্রমা করেন ১৯৭৬ সালে। নেহরু পুরস্কার ছাড়াও আরও অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পুরস্কৃত। এসব পুরস্কারের মধ্যে আছে ঘনাদার গল্পগুলির জন্য রাজ্য সরকার প্রদত্ত ১৯৫৮ সালের শিশু সাহিত্য পুরস্কার; কিন্তু ক্রমশই স্পষ্ট হতে লাগল যে ঘনাদার গল্পগুলি শুধু শিশুদের জন্য নয়, সব-বয়সিদের জন্য। তিনি অন্যান্য যেসব পুরস্কার পেয়েছেন সেগুলির মধ্যে আছে ১৯৫৪ সালের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৫৭-র সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৫৮-র রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭৩-এর আনন্দ পুরস্কার, ১৯৮৪-র বিদ্যাসাগর পুরস্কার ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি যেসব সম্মান পান সেগুলির মধ্যে ১৯৮১-তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট, ওই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পদক, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৮-র ১৬ জানুয়ারি তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিশ্বের বহু বিখ্যাত

ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশিকোত্তম উপাধির সম্মান গ্রহণ করেন। অল্পকাল পরে তাঁর স্বাস্থ্যর দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ৪ মার্চ তাঁকে সাদার্ন অ্যাভেনিউ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের সংযোগে অবস্থিত এক নার্সিং হোম-এ নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাঁর বিশেষ ইচ্ছাক্রমে ক-দিন বাদেই ফিরিয়ে আনতে হয় বাড়িতে। ৩ মে তাঁর মহাপ্রয়াণ। এবং সেই সঙ্গে ঘনাদারও নতুন নতুন বিশ্বব্যাপী কীর্তিকাহিনীর অবসান।

এই খণ্ড সম্পাদনে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি শ্রীমান শুভেন্দু দাশমুন্সীর কাছ থেকে—বিশেষত ঘনাদার অগ্রন্থিত গল্পগুলি তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছেন—তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আরও অগ্রন্থিত রচনার সন্ধান যদি কারও কাছ থেকে পাই তাহলে আমাদের তা অনুগ্রহ-পূর্বক দিলে আমরা সেটি পরবর্তী মুদ্রণে স্বীকৃতি-সহ সংযোজন করতে পারব।

এই খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট বিভাগে আছে প্রথম দু-খণ্ডে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির প্রথম প্রকাশের কাল পাওয়া গেছে সেগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্য। এই পরিশিষ্টও শুভেন্দুর রচনা। প্রেমেন্দ্র-র অনুরাগিবৃন্দের কাছে অনুরোধ—যেসব গল্পের প্রথম প্রকাশের কাল জানানো গেল না সেসবের সংবাদ যদি কেউ জানান তাহলে তা যথোচিত স্বীকৃতি সহ আমরা প্রকাশ করব।

১ ডিসেম্বর ২০০০ **সুরজিৎ দাশগুপ্ত**
কলকাতা

banglabooks.in

সূ চি প ত্র

গল্প

যাঁ র না ম ঘ না দা

ধুলো • ২৩

মুলো • ৩৪

টল • ৫০

নাচ • ৬৩

কাদা • ৭৮

দু নি য়া র ঘ না দা

কাঁটা • ৯৫

গান • ১১৪

কীচকবধে ঘনাদা • ১৩০

পৃথিবী বাড়ল না কেন • ১৩৮

ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ • ১৫৬

ঘ না দা র ফুঁ

ঘনাদার ফুঁ • ১৬৭

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে • ১৮৬

বেড়াজালে ঘনাদা • ১৯৪

কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা • ২০৯

খাণ্ডবদাহে ঘনাদা • ২১৯

ঘ না দা র হি জ্‌ বি জ্‌ বি জ্‌

ঘনাদার হিজ্‌ বিজ্‌ বিজ্‌ • ২৩১

গুল-ই ঘনাদা • ২৬১

শান্তিপর্বে ঘনাদা • ২৭৫

ঘ না দা ও মৌ - কা - সা - বি - স

ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স ২৮৭

মৌ-কা-সা-বি-স ও ঘনাদা ২৯১
মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই ৩০০
ঘনাদার শল্য সমাচার ৩১২
মৌ-কা-সা-বি-স—একবচন না বহুবচন ৩২২
পরাশরে ঘনাদায় ৩৩৫
ঘনাদা ফিরলেন ৩৫২
আঠারো নয় উনিশ ৩৬৪

ঘ না দা র চিং ড়ি বৃ ত্তা ন্ত
ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত ৩৭৫
ভেলা ৩৯২
ঘনাদা এলেন ৪০১
হ্যালি-র বেচাল ৪১৩
জয়দ্রথ বধে ঘনাদা ৪২০

উপন্যাস
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৪৩৫
তেল দেবেন ঘনাদা ৪৯৩
মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা ৫৩৫

অগ্রন্থিত
ঘনাদার বাঘ ৫৯৫
মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা ৬০৭
কালোফুটো সাদাফুটো ৬১৬
অসম্পূর্ণ ঘনাদা ৬২৩

নাটক
পৃথিবী যদি বাড়ত ৬২৭

ছড়া
ঘনার বচন • ৬৩৭

পরিশিষ্ট • ৬৪৩

গ্রন্থপরিচিতি • ৬৪৫

গল্প

banglabooks.in

যাঁর নাম ঘনাদা

ধুলো

"বার্মুডা, না বাহামা?"

"বেনেপুকুর বোধহয়!"

সেই সেকালের বটতলা উপন্যাসের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারত যে কোনও এক বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় একটি জীর্ণপ্রায় বাড়ির দ্বিতলের একটি নাতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে কয়েকটি অপরিণত যুবক ও জনৈক অনির্দিষ্ট বয়সের কিঞ্চিৎ শীর্ণ ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

কিন্তু যত প্যাঁচ করেই বলি, একথা কি কেউ সহজে বিশ্বাস করবে যে প্রথম উক্তিটি স্বয়ং ঘনাদার আর দ্বিতীয়টি আমাদের?

ঘনাদা তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারায় বসে নিজে থেকে বার্মুডা কি বাহামা, কোথায় শিশিরের জোগানো সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁর গল্পের গুল ছাড়বেন ভাবছেন, আর আমরা বেতালা বিদ্রূপের খোঁচায় তাঁর মুখ বোজাতে চাইছি!

এ-ও কি সম্ভব?

অন্য দিন হলে ওই বেনেপুকুর নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্প শোনার আশা ভরসা তাইতেই ডুবত নিশ্চয়, কিন্তু আজ ঘনাদা যেন কানে তালা আর পিঠে কুলো বেঁধে বসেছেন।

"ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনও পাইনি," বলে তুচ্ছ বেনেপুকুর-মার্কা বিদ্রূপ গ্রাহ্যই না করে ঘনাদা স্মৃতির ভাঁড়ার ঘটা করে ঘাঁটাতে বসে গেছেন আমাদের সামনে।

আর তা সত্ত্বেও পোশাকের ওপর ওয়াটারপ্রুফ চড়িয়ে মাথায় তার হুড-এর বোতাম লাগাতে লাগাতে "পেলে কী কেলেঙ্কারি-ই হত" বলে আমরা মুখ টিপে হাসছি!

এমন কখনও হতে পারে বলে ভাবা যায়?

অমৃতে কি অরুচি হয়?

হয়।

হয়, অসময়ে যদি অমৃতও কেউ মুখে ঢেলে দেয় জোর করে!

ধরো, দারুণ তেষ্টা পেয়েছে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়, সে সময়ে এক ভাঁড় রাবড়ি কেউ মুখে ধরলে কেমন লাগে?

কিংবা খেলার মাঠে সকাল থেকে লাইন দিয়ে কোনও মতে ঢুকে পাক্কা দুটি ঘণ্টা খোলা গ্যালারিতে ছাতা বিহনে রামভেজা ভিজে হঠাৎ বিপক্ষ দল মাঠে নামবে না

বলে ঘোষণায় প্রাণটা পর্যন্ত জল হয়ে যাবার পর গেটের পয়সা ফেরত নিতে আর এক দফা ভিজে ন্যাতা হয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ছুটে এসে এক কাপ গরম চায়ের জন্য দোকানে যখন হামলে গিয়ে পড়তে যাচ্ছি, তখন যদি কেউ দরদ দেখিয়ে বাজে জায়গায় চা খাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচাতে এয়ারকন্ডিশনড কোনও রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে আইসক্রিম সোডার অর্ডার দেয়, কী রকম মনে হয় তখন?

ঠিক এতটাই না হোক, সেদিন যা হয়েছে তা প্রায় তা-ই।

খেলার মাঠের ওই রাগ আর হতাশায় ব্লেন্ড করা মেজাজ নিয়ে ভিজে সপসপে হয়ে চৌরঙ্গির ধারের এক দোকানে সবে চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময় দুই মূর্তিমানের সঙ্গে দেখা।

দুই মূর্তিমান আর কে? শিশির আর গৌর।

আমরা সারা দুপুর মাঠের মাঝখানে ভিজে আমসত্ত্ব হয়েছি আর ওঁরা দুজনে দিব্যি মেসে বসে জানলা থেকে বর্ষার শোভা দেখে, আর সেই সঙ্গে রামভুজকে দিয়ে কোন না দুটো অন্তত পাঁপড় ভাজিয়ে তাই দাঁতে কাটতে কাটতে অর্ধেক বিকেলটা পার করে বৃষ্টি ধরে যাবার পর সেজেগুজে এসপ্ল্যানেডে একটু টহল দিতে এসেছেন!

যে খেলা দেখার জন্য আমাদের হয়রানি তার ওপর তো ওঁদের দুজনের কারওই কোনও টান নেই। খেলা বলতে ওঁরা বোঝেন শুধু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। আর সব ওঁদের কাছে ছেলেখেলা।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের জন্য জান দিতে যাঁরা প্রস্তুত, অন্য খেলার দিন তাঁরা মাঠের ধার মাড়ান না।

দুই মূর্তিমানের ওই সাজাগোজা ফিটফাট হাওয়া-খেতে-বার-হওয়া চেহারা দেখেই তো মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ওদের বদান্যতায় আরও।

"আরে! এখানে চা খাচ্ছিস কী! পেটের ভেতরটা ট্যান হয়ে যাবে। চল চল," বলে যে সব জায়গার নাম ওরা করেছে সেগুলি কলকাতার সব সেরা রেস্তোরাঁ হলেও পেটের ট্যানিং বাঁচাতে সেখানে এই অবস্থায় গিয়ে ঢুকলে বুকে নির্ঘাত নিউমোনিয়া।

শিশির গৌরের উদার নিমন্ত্রণ শুধু সেইজন্যই অবশ্য প্রত্যাখ্যান করিনি। একসঙ্গে এই দুজনের ঘাড় ভাঙবার এমন একটা মৌকার জন্য শিবু আর আমি, নিউমোনিয়ার ঝক্কিও অন্য সময় হলে হয়তো নিয়ে ফেলতাম। কিন্তু আমাদের আরেক গরজ তখন অনেক বেশি জবর।

কোনও রকমে মেসে ফিরে জামা-কাপড়টা শুধু বদলেই আমাদের না ছুটলে নয়। শিবু সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে গৌর-শিশিরকে।

"এখন রেস্তোরাঁয় যাব কী! পাইকপাড়া যেতে হবে না?"

"পাইকপাড়া? সেখানে আবার কেন?" গৌর-শিশির যেন আকাশ থেকে পড়েছে।

একেই বলে জেনেশুনে ন্যাকা সাজা। পাইকপাড়া কোথায়, কী, কেন, সব যেন ভুলে গেছেন দুজনে!

ওদিকে বুকের ভেতরটা তো চড় চড় করছে। নিজেরা যেখানে দেউড়ি দিয়ে পা বাড়াতে না বাড়াতে পত্রপাঠ বিদায়, সেখানে আমরা সাতমহলের ছ-টা মহল পেরিয়ে

এবার খাসমহলে ঢুকতে যাচ্ছি! মনের ভেতর সেই দুঃখই পাক খাচ্ছে, আবার বলে কিনা, পাইকপাড়া! সেখানে আবার কেন?

তা ওরা যদি ডালে ডালে চলে তো আমরা যাই পাতায় পাতায়।

যেন বলবার মতো কিছু নয় এমনই ব্যাপারটা তুচ্ছ করে আমি বলেছি, "এমন কিছু না। ওই একটু খেলতে যাব দুজনে।"

"খেলতে যাবে!" শিশির-গৌরের যেন কথাটা হতভম্ব হয়ে দু-বার আওড়াবার পর খেয়াল হয়েছে, "ও, আজ তো সেই ব্রিজ কমপিটিশনের খেলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরা যেন কোন রাউন্ডে উঠেছিস?"

"রাউন্ডে আর নেই!" পয়লা রাউন্ডেই যারা খসে পড়েছে তাদের গায়ে চিড়বিড়িনি ধরাবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি! "উঠেছি সেমিফাইন্যালে।"

"ওঃ, সেমিফাইন্যালে!" তাচ্ছিল্য করবার চেষ্টা করলে কী হবে, গৌরের গলাটা আফশোসে মিয়োনো।

শিশির হঠাৎ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যই ভাবিত হয়ে উঠেছে! "কিন্তু এত ভিজেছিস, আবার এই বৃষ্টির মধ্যে অতদূর যাবি! বাসে ওঠাই তো এখন দায়।"

"বাসে যদি না হয় তাহলে ট্যাক্সিতে যাব।" শিবু যেন একটানা মুখস্থ-পড়া পড়ে গিয়েছে, "ট্যাক্সি না জোটে, রিকশ নেব। আর তাও যদি না পাই, হেঁটে যাব পাইকপাড়া। জোকার ক্লাবের অল বেঙ্গল ব্রিজ কম্‌পিটিশনের শিল্‌ডটা আমাদের বাহাত্তর নম্বরের বসবার ঘরে মানাবে বলেই তো মনে হয়।"

শেষ কথাগুলো হয়েছে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে। মতি শীলের গলির ভাঁড়ের চা পেটে-ছ্যাঁকা-লাগানো দুটো করে চুমুকে শেষ করে মেট্রোর সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরে তখন আমরা এসপ্ল্যানেড থেকে বনমালি নস্কর লেনে চলেছি।

"ও! দেয়ালে শিল্‌ড টাঙাবার পেরেক পুঁতেই ফেলেছিস বুঝি!" গৌর একটু বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু খোঁচাটাই ভোঁতা।

শিশির অন্য রাস্তা নিয়েছে। বাহাত্তর নম্বরের সামনে নেমে ট্যাক্সির ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলেছে, "কিন্তু আজ হয়তো মিছিমিছি যাবি! খেলাই হয়তো আজ বন্ধ!"

"কেন? রেনি-ডে বলে!" ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি উপযুক্ত জবাব দিয়েছি, "এ কি স্কুল পেয়েছিস? রেনি-ডে বলে ছুটি হবে কী? রেনি-ডে হলেই তো খেলা বেশি জমে! গিয়ে পৌঁছতে যে পারবে না সে দল বাতিল।"

শিশির-গৌর আর একটা ছুতো পেয়ে গেছে এবার। গৌর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চোখ বন্ধ করে নাকটা একটু তুলে গদ্‌গদ স্বরে বলেছে, "আঃ! গন্ধটা পাচ্ছিস?"

শিশির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে, "রামভুজ ডালপুরি বানাচ্ছে যে! এ যা পাচ্ছিস, এ তো শুধু ওর স্পেশ্যাল সব্‌জির গন্ধ। এরপর যখন ডালপুরি ভাজবে তখন তো তর হয়ে যাবি। আর বড় জোর আধঘণ্টা লাগবে। তারপরেই গরমাগরম!"

ততক্ষণে দোতলায় পৌঁছে নিজেদের ঘরের দিকে চলেছি। শিবু একেবারে

বৈরাগী বিবাগীদের মডেল হয়ে বলেছে, "গরমাগরম তোমরাই সেঁটো ভাই। আমাদের লোভ নেই।"

নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে বসবার ঘরটার দিকে একবার চোখ না ঘুরিয়ে পারিনি অবশ্য।

বেশ একটু তাজ্জবই হতে হয়েছে, অস্বীকার করব না।

স্বয়ং ঘনাদা সেখানে তাঁর মৌরসি কেদারা দখল করে বসে আছেন।

তা থাকুন! মুনির মন টলতে পারে, কিন্তু আমাদের আজ টলায় দুনিয়ায় এমন কোনও কিছু নেই।

শুধু জোকার ক্লাবের কম্পিটিশনে যাওয়ার জেদ তো নয়—শিশির-গৌরের সঙ্গে এ এক মোক্ষম মনের জোরের পাঞ্জা লড়া।

অল বেঙ্গল ব্রিজ কম্পিটিশনের শিল্ডটা আমরা জিতে নিয়ে আসব, আবার এই আসর-ঘরের দেওয়ালেই আমাদের কীর্তি দিনের পর দিন মনে করিয়ে দেবার জন্য তা চোখের ওপর ঝুলবে এতটা কি সহ্য হয়!

তাই যা করে হোক আমাদের ব্রিজ খেলতে যাওয়াটা বন্ধ করতেই হবে!

বাহাত্তর নম্বরে ডালপুরির জোগাড় জেনেও শিশির-গৌরের আগবাড়িয়ে এ সময়ে এসপ্ল্যানেড টহল দিতে যাওয়ার মানেটা কি আর এতক্ষণে বুঝিনি!

ওখান থেকেই বাগড়া দেওয়া যাতে শুরু করা যায় সেই আশাতেই ওই টহলদারি। ওখানে না পেলে মেসে এসে পর পর চালবার সাজানো ঘুঁটি তো আছেই। এখন যা চালছে।

যে প্যাঁচই খাটাক, আমরা কেটে বার হবার জন্য তৈরি।

বসবার ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময় একটু বেকায়দায় অবশ্য পড়তে হয়েছে।

"আরে! শিবু-সুধীর যে!" তপস্যা করে যাঁকে পাওয়া যায় না সেই ঘনাদা নিজে থেকে সেধে ডেকেছেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ! আসর ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে! শিগগির এসে তাতাও।"

হ্যাঁ, তাতাচ্ছি এই যে! মনে মনে বলেছি। শিবুর সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখে বলেছি, "হ্যাঁ, আসছি কাপড় ছেড়ে।"

ছেড়ে আসতে মিনিট কয়েক মাত্র লেগেছে। শুধু পোশাক বদলেই নয়, গায়ে ওয়াটারপ্রুফগুলো গলাতে গলাতে হুড দুটো হাতে করে নিয়ে আসরঘরে ঢুকেছি।

তা, একটু চমকে দিতে পেরেছি বইকী!

"আমাদের ডাকছিলেন তখন?" বেশ, একটু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে নেহাত যেন অনিচ্ছাভরে ঘরে এসে দাঁড়াবার পর আর সকলের তো বটেই, ঘনাদারও ভুরু দুটো একটু যে উঠেছে তা লক্ষ করেছি।

নাসারন্ধ্র দুবার একটু নীরবে বিস্ফুরিত করে তিনি বলেছেন, "তোমরা বেরুচ্ছ এখন।"

উক্তিটা বিস্ময়ধ্বনিও নয়, প্রশ্নও না।

শিবু আর আমি ততক্ষণে ওয়াটারপ্রুফ দুটো গায়ে গলিয়ে ফেলে বোতাম পর্যন্ত

এঁটে ফেলেছি।

"না, বেরিয়ে আর করি কী!" এদিক ওদিক কিছু একটা খোঁজার জন্য তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবেই ঘনাদাকে জবাব দিয়ে আবার বলেছি, "একটা ছাতা শুধু খুঁজছিলাম!"

"ছাতা!" একটু আশার আলো পেয়ে গৌরের গলায় সহানুভূতি উথলে উঠেছে যেন, "সত্যিই তো, ছাতা একটা না হলে আজকের এই বৃষ্টি শুধু ওয়াটারপ্রুফে কি আটকায়! কিন্তু বাহাত্তর নম্বরে ছাতা কোথায়? সেই উল্টো নামের শ্রীমান সুশীলের ছাতা ঘনাদা রাস্তায় দান করে আসার পর থেকে বাহাত্তর নম্বরে ছাতা আর কেউ কি দেখেছে?"

"কিন্তু ছাতা একটা না হলে তোরা বেরুবি কী করে?" শিশির গৌরের চেয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

"এই—এমনই করে!" বলে হুডগুলো এবার মাথায় চাপিয়েছি।

ঘনাদা যেন হঠাৎ আমাদের কথা ভুলেই গেছেন। তাঁকে ঘিরে যারা বসেছে তাদের দিকে চেয়ে স্মরণশক্তিটা উস্‌কে নেবার চেষ্টায় বলেছেন, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম? তখন আমি ঠিক কোথায়, তাই না? বার্মুডা, না বাহামা?"

বাইরে না হোক, মনে মনে আমরা ঘনাদার মতোই নাসিকাধ্বনি করেছি। এসব পুরনো প্যাঁচ আমাদের খুব জানা আছে। এতেই কাবু হবার মতো কাঁচা ছেলে ভেবেছে নাকি আমাদের?

ঘনাদার কথার পিঠে চটপট চিমটিটুকু কেটেছি তাই।

ঘনাদার যেন কানে তুলো গোঁজা এমনইভাবে তিনি নতুন কী প্যাঁচ ছেড়েছেন তা তো আগেই বলেছি।

ঘনাদা যেন নিজের স্মৃতির ডুবুরি হয়ে হেঁয়ালির জট তুলেছেন, "ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনও পাইনি!"

শিবু আর আমি এ ওর মাথায় বর্ষাতি ঘোমটার বোতাম এঁটে দিতে দিতে হেসে বলেছি, "পেলে কী কেলেঙ্কারিই হত!"

ঘনাদার কানটা হঠাৎ কী করে শুধরে গেছে কে জানে! আমাদের কথাটা এবার নির্ভুল শুনে তাতেই জোরের সঙ্গে সায় দিয়েছেন, "কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি! ওদের কারও সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা!"

ঘনাদার কথায় আর কান দেবারই দরকার কী? শিবুকে তাই ধাক্কা দিয়ে বলেছি, "চল! চল!"

দুজনে দরজার দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে শিশিরের ভয়ে কাঁপা গলা শুনতে পেয়েছি, "ওই ডোরা আর ফ্লোরা যা নাম করলেন, সব খুব সাংঘাতিক মেয়ে বুঝি!"

"তা সাংঘাতিক মেয়ে ছাড়া আর কী বলবে!" দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসেও ঘনাদার কথাটা কানে এল, "ডোরারটা ঠিক হিসেব নেই, কিন্তু ফ্লোরার হাতে গেছে অন্তত সাত হাজার একশো তিরেনব্বুই জন।"

"সাত হাজার একশো তিরেনব্বুই জন খুন!" গৌরের শিউরে-ওঠা

আধা-চিৎকারটা বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছে, "রাক্ষুসি নাকি?"

"রাক্ষুসি ছাড়া আর কী?" ঘনাদার গলাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, "দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের দ্বীপে ট্রিনিডাডের মাথার ওপর দিয়ে এসে গলা বাড়ানো হাইতির ছোট মুণ্ডুটা মাড়িয়ে কিউবার পুব কোণটা একটু ছুঁয়ে উত্তরমুখো হয়ে নিরুদ্দেশ হবার মধ্যেই ওই সাত হাজার একশো তিরেনব্বুই জনকে সাবাড় করেছে ফ্লোরা।"

শিবুকে এবার ধমক দিতে হয়েছে, "হাঁ করে আবার থমকে দাঁড়ালি কেন সিঁড়ির মাথায়?"

"না, দাঁড়ালাম কোথায়?"

শিবু সিঁড়িতে এক ধাপ নামতেই আমায় বলতে হয়েছে—"দাঁড়া, দাঁড়া, কী যেন একটা ফেলে এলাম মনে হচ্ছে।"

গৌর গলা ছেড়ে তখন জিজ্ঞাসা করছে শুনতে পাচ্ছি—"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলছেন, তার মানে ওই রাক্ষসি খুনে মেয়ে দুটোকে কেউ ধরতেও পারেনি!"

"সাধ্য কি তাদের কেউ ধরে! আর শুধু কি দুটো"—ঘনাদা যেন সেই সর্বনাশী মেয়েদের কথা ভাবতেই খানিক গুম হয়ে গেছেন।

"কই, কী ভুলে গেছিস মনে পড়ল?" শিবু আমায় খোঁচা দিয়েছে সেই ফাঁকে।

"ওঘরে না গেলে মনে তো পড়বে না ঠিক!" বেশ ব্যাজার মুখেই বলেছি, "কিন্তু গেলেই তো ভাববে লোভে লোভে ফিরে এসেছি!"

"ভাবুক না যা খুশি।" শিবু বেপরোয়া হয়ে আমায় সাহস দিয়েছে, "আমরা কারও ভাবনার পরোয়া করি নাকি? দরকার থাকলেও টিটকিরির ভয়ে ও-ঘরে যাব না?"

"আলবত যাব!" আমি বীরবিক্রমে এগিয়ে গেছি।

পেছনে শিবু।

খোঁচার বদলে পাল্টা খোঁচার সঙ্গিন উঁচিয়ে তৈরি হয়েই আসরঘরে ঢুকেছি। কিন্তু কই, টিটকিরি তো দূরের কথা, কেউ যেন খেয়ালই করেনি।

ঘনাদা তখনও বুঝি তাঁর সর্বনাশীদের ধ্যানে ভোম মেরে আছেন। গৌর তা ভাঙবার জন্যই তখন বলছে, স্তম্ভিত গলায়, "দুটো নয় কী বলছেন! আরও আছে?"

"আছে না?" ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসে আবার একটু চুপ।

শিবু তখন খালি একটা চেয়ারে বসেই পড়েছে।

বললাম, "বসলি যে!"

চাপা গলাতেই বলেছি অবশ্য।

"তা বসলামই বা!" শিবুও গলা নামিয়ে বলেছে, "তুই তো এখন কী ভুলে গেছিস মনে করবি!"

শিবুর যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কী ভুলে যাচ্ছি ভাববার জন্য আমাকেও একটু বসতে হয়েছে।

চেয়ার আর নেই, কিন্তু ছোট চৌকিটায় গৌর নিজে থেকেই নীরবে একটু সরে

বসেছে জায়গা করে দেবার জন্য।

যা হোক একটু জায়গা হলেই হল। কতটুকুই বা আর বসব! শুধু ভুলটা মনে পড়ার ওয়াস্তা।

কিন্তু ঘনাদা বসে বসেই ঘুমোলেন নাকি!

"আর যারা সব তারাও ওই ফ্লোরার মতোই খুনে?" শিশির ঘনাদার চটকা ভাঙতে নাড়া দিয়েছে।

"কম যায় না বড়ো!" ঘনাদা বাহামা না বার্মুডা থেকে বনমালি নস্কর লেনে ফিরে এসে বলেছেন, "ফ্লোরা খতম করেছে সাত হাজারের ওপর তেষট্টি সালে আর তার আগে উনিশশো আটাশ-এ আর একজনের হাতে সাবাড় হয়েছে চার হাজার। তার আবার নামও কেউ জানে না। নামই হয়নি হয়তো। নাম-করাদের মধ্যে হ্যাটি, ডোনা, হিল্ডা, হেজেল—শতমারির নীচে কেউ নয়। হেজেল দফা নিকেশ করেছেন এক হাজার একশো পঁচাত্তর জনের, হিল্ডা পঞ্চান্নতে ছশো, ডোনা ষাটে একশো পঁয়ষট্টি আর হ্যাটি একষট্টিতে দুশো পঁচাত্তর। এ ছাড়া ক্লিও, অড্রে আর ছোটখাটো আরও তো আছে। মানুষকে প্রাণে যারা কম মেরেছে তারা সুদ সুদ্ধ পুষিয়ে নিয়েছে ধনে। ডোনা এমনিতে ওদের দলে যাকে বলে লক্ষ্মী মেয়ে বলা যায়। জান নিয়েছে মাত্র একশো পঁয়ষট্টি জনের, কিন্তু যেখান দিয়ে গেছে সেখানে কমসে কম সাতশো কোটি টাকার ধন দৌলত লোপাট!"

এত খুনোখুনি লুটপাটের কথার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবা যায়! কী ভুলে গেছি মনেই করতে পারিনি এতক্ষণে। ডোরা ফ্লোরার জন্য আমার কীসের মাথাব্যথা! নেহাত বিদঘুটে আলোচনাটা থামাবার জন্যই বলতে হয়েছে, "ওই খুনে মেয়েগুলো সব বুঝি আপনি যেখানে ছিলেন সেই বার্মুডা, না বাহামার?"

"বার্মুডা নয়, ছিলাম তখন বাহামায়। এখন মনে পড়েছে।" ঘনাদা আমায় খুশি মুখেই জবাব দিয়েছেন, "আর ওরা সবাই ঠিক বাহামার না হলেও, ওই অঞ্চলের বলা যায়। ছোট অ্যান্টিলিজ দ্বীপপুঞ্জের পুবদিকে উত্তর অ্যাটলান্টিক সমুদ্র। সেখান থেকে এসেছে অনেকে। কারও কারও আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরেই জন্ম। উনিশশো সাতান্নতে তিনশো নব্বুই জনকে যমালয়ে পাঠিয়ে অন্তত একশো কোটি টাকার সম্পত্তি যে লোপাট করে দেয়, সেই অড্রে তো দূর-দূরান্তর কোথাও থেকে আসেনি। মেক্সিকো উপসাগর থেকে মাত্র আমেরিকার লুইসিয়ানা স্টেট-এর সীমানা ছাড়িয়ে মিসিসিপির চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছেই অড্রে নিপাত্তা। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে যেখানে সে চোখ দিয়েছে সেখানেই শ্মশান।"

একটু থেমে, পুরনো স্মৃতির একটু চমকেই যেন শিউরে উঠে ঘনাদা বলেছেন, "কিন্তু ফ্লোরা, হিল্ডা, হেজেল, অড্রে এরা সব তো পাহাড়ি বিচ্ছুর কাছে ডেয়ো পিঁপড়ে! একেবারে ঠিক সময়ে না সামলালে লরা যে কী করত তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। আমেরিকার নিউ অরলিনস্ থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বংশে বাতি দিতে কাউকে বোধহয় রাখত না।"

"অ্যাঁ! এমন ভয়ংকর মেয়ে! এ লরাকে সময়-মতো সামলেছিল কে?" শিবুটা

প্রথমে খানিক হাঁ করে থেকে, পরে আহাম্মকের মতো জিজ্ঞেস করে বসেছে, "আপনি?"

ঘনাদার বাঁকানো ঠোঁটে অসীম ধৈর্য আর ক্ষমার একটু হাসি। টেনজিং নোরকে-কে যেন কে প্রথম এভারেস্ট-এর চূড়ায় উঠেছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, প্রথমে কে একটানা প্লেনে আটলান্টিক পার হয়েছে জানতে চাওয়া হয়েছে লিন্ডবার্গ-এর কাছে!

শিবুর আহাম্মকিতে ঘনাদা চটুন না চটুন, আমার কী আসে যায়? আমরা তো যাচ্ছি জোকার ক্লাবে! নেহাত কী ভুল হয়েছে ভাববার জন্য একটু বসেছি, তাই শিবুকে একটু ধমক দিতে হয়েছে, "জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল না তোর? ঘনাদা নয় তো লরাকে আর কে সামলাবে, শুনি!"

শিবু অধোবদন হবার পর ঘনাদাকেই জিজ্ঞেস করেছি, "ও মুণ্ডমালিনীকে কেমন করে সামলালেন, ঘনাদা?"

"কেমন করে?" ঘনাদা তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন, "একটু ধুলো দিয়ে!"

"ধুলো দিয়ে!"

আমার শুধু একার নয়, আসরে যে যেখানে ছিল সবার চোখই ছানাবড়া।

"হ্যাঁ, " ঘনাদা ব্যাখ্যা করেছেন, "লরা-র চোখে একটু ধুলো দিতেই কাম ফতে হয়ে গেল।"

"চোখে ধুলো দিয়ে কাম ফতে?" আমাদের হাঁ মুখ আর বুজতে চায়নি!

"হ্যাঁ, লরার অর্ধেক শয়তানি জারিজুরি তাতেই চোখের জলে গলে গেল বলতে পারো"—ঘনাদা আর একটু বিশদ হয়েছেন—"তারপর যাকে বলে কানা হয়ে দ্বিগ্বিদিক ভুলে আতলান্তিকের ওপরই উধাও হয়ে কোথায় মুখ থুবড়ে মরেছে কে জানে! কারি তাই বলত—'দাস, কোথায় ছিলে তুমি উনিশশো চুয়ান্নতে? এক হাজার একশো পঁচাত্তর জনকে নিকেশ করার বদলে এই বাহামার মায়াগুমা দ্বীপে পৌঁছোবার আগেই হেজেল নিজে কাবার হয়ে যেত!' "

"হেজেল বুঝি মায়াগুমা দ্বীপে হানা দিয়েছিল?" জিজ্ঞাসা করেছে শিশির।

"শুধু কি মায়াগুমা দ্বীপ!" ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসেছেন—"ওইখানে তো তার উৎপাত সবে শুরু। সেখান থেকে সাগর পেরিয়ে আমেরিকার উইলমিংটন শহরের পাশ দিয়ে ফিলাডেলফিয়াকে ডাইনে রেখে সোজা সেই অনটারিও হ্রদ পর্যন্ত।"

"সত্যি, আপনি থাকলে তো আর এ সব হয় না!" গৌর আফশোস করেছে—"ঠিকই বলত তো ওই, কী নাম বললেন যেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ কারি। ওই কারি কে?"

"কারি আমার বন্ধু একজন কংক।" ব্যাখ্যা করেছেন ঘনাদা—"তার সঙ্গে স্ট্রমবস গাইগাস, মানে, পঞ্চমুখী শাঁখের খোঁজে তখন বেল দ্বীপে একটা সুলুপে থাকি, আর সেই সুলুপেরই একটা ডিঙি নিয়ে তাতে কারি আর আমি পঞ্চমুখী শাঁখ খুঁজে ফিরি সমুদ্রের তলায়। ডিঙিতে আমার হাতে থাকে তলায় কাচ আঁটা একটা বালতি আর কারির হাতে হাল। কাচ আঁটা বালতির মতো চোঙটা সমুদ্রের জলের ভেতর ডুবিয়ে ধরে আমি তার ভেতর দিয়ে কোথায় অ্যালজির ওপর পঞ্চমুখী চরে বেড়াচ্ছে দেখি,

আর দেখতে পেলে আঁকশি লগি দিয়ে তা বোটে তুলে নিই। আমার লোভ পঞ্চমুখী শাঁখের ওপর, কারির লোভ শাঁখের শাঁসালো মাংসে। শাঁখের শাঁসই তাদের প্রধান খাদ্য বলে এই শাঁখ শিকারিদের একটা নাম কংক। বেশির ভাগ শাঁখ শিকারিই নিগ্রো বলে তাদের এ নামটা অবজ্ঞাভরেই দেওয়া হয়েছে।

যারা তা দিয়েছে একজন কংক-এর দৌলতেই কত বড় ভয়ংকর পরিণাম থেকে যে তারা রক্ষা পেয়েছে তা কোনওদিন বোধহয় জানবে না।

চোখে ধুলো দিয়ে কানা করে লরার জারিজুরি আমি ভেঙে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু কারি আমার সঙ্গে না থাকলে লরা কখন কোথায় যে রাক্ষুসি মূর্তি ধরছে তা আমি জানতেও পারতাম না।

কারিরা প্রায় চৌদ্দপুরুষ ধরে বাহামাতেই আছে। বাহামার মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ। কারির আবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা এই যে, সাইজমোগ্রাফে যেমন ভূমিকম্প, ব্যারোমিটারে যেমন হাওয়ার চাপ, কারি তেমনই তার হাড়ের ভেতরে ঝড়-তুফানের সব হদিস আগে থাকতে টের পায়।

সারাদিন শাঁখ শিকারের পর রাত্রে সুলুপের ডেক-এ তারার আলোয় ঝলমল আকাশের তলায় শুয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ কারি ধড়মড় করে তার বিছানায় উঠে বসেছে সেদিন।

'কী হল, কারি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে!'

'ভূত নয়, ডাকিনী!' ধরা গলায় বললে কারি, 'আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি, সে জাগছে।'

হাজার বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হলেও বাহামায় শাঁখ শিকার করে জীবন কাটিয়েছে। আমি তাই ব্যাপারটা কারির অন্ধ কুসংস্কার ভেবেছি। বিশ্বাস করিনি। তাকে শুধু ক্ষুণ্ণ না করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'জাগছে কোথায়?'

'এই কাছেই!' কারি সভয়ে বলল, 'প্রভিডেন্স প্রণালীতে।'

এবার একটু হেসে ঠাট্টা করে বললাম, 'কী বলছ কী, কারি? প্রভিডেন্স প্রণালীতে ডাকিনী জাগছে আর তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে তা টের পেলে! ও তোমার গেঁটে বাত-টাত হবে। কাল অমাবস্যা—তাই একটু চাগাড় দিয়েছে।'

'না, না, বাত নয়, দাস!' কারি ব্যাকুল হয়ে উঠল আমায় বোঝাতে, 'আমি সত্যি আমার হাড়ের ভেতর এসব টের পাই। হেজেল-এর বেলা ঠিক এই রকম টের পেয়েছিলাম। তখন জানাবার কেউ ছিল না। তুমি আছ বলে তাই জানাচ্ছি। এ ডাকিনী হেজেল-এর চেয়ে শতগুণ সর্বনাশী। প্রভিডেন্স প্রণালীতে কাল ভোরের আগেই জেগে উঠে সৃষ্টি ছারখার করে দেবে।'

এবার আর হাসতে পারলাম না। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভোরের আগেই প্রভিডেন্স প্রণালীতে পৌঁছোতে পারবে?'

কারি বললে, 'পারব।'

'সুলুপে একটা হারপুন ছোড়ার বন্দুক আছে না?' জিজ্ঞাসা করলাম তারপর।

'হ্যাঁ, আছে।' কারি অবাক হয়ে বললে, 'কিন্তু হারপুন ছুড়ে এ ডাকিনীকে তুমি

ঘায়েল করবে?'

'করব।' জোর দিয়ে বললাম, 'তবে শুধু হারপুন ছুড়ে নয়, হারপুনের কামানে এ ডাকিনীর চোখ নিশানা করে ধুলো ছুড়ে তাকে কানা করে।'

'কী বলছ কী, দাস!' কারি মাথা নেড়ে বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! নিশ্বাসে যে প্রলয় ঘটায় সেই তুফানকে তুমি ধুলো ছুড়ে জব্দ করবে!'

'তোমার হাড়ের খবর যদি ভুল না হয়, আর ভোরের আগে প্রভিডেন্স প্রণালীতে যদি পৌঁছে দিতে পারো এ সুলুপে, তা হলে চেষ্টা করে তো একবার দেখতে পারি।' এবার ইচ্ছে করেই সুরটা একটু নামিয়ে বললাম, 'এ সব তুফানের একটা এবং একটিমাত্র চোখ থাকে, জানো তো?'

'জানি।' কারি আমার কৌশলটা বোঝবার চেষ্টা করে বলল, 'সে চোখ তোমায় দেখাতেও পারব।'

'তা হলেই হবে।' তাকে আশা দিলাম।

হলও তাই। প্রভিডেন্স প্রণালীতে পৌঁছোলাম ভোর হবার আগেই।

তুফান ডাকিনী তখন থমথমে সমুদ্রে ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে জাগতে শুরু করেছে।

কারি সভয়ে বলল, 'এখন হালকা কথার সময় নয়। তবু ওই ঘূর্ণি দেখে আমার লরা বলে এক নাচিয়ে মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সে-ও সর্বনাশী মেয়ে হাজার বুক ভেঙেছে।'

'বেশ, তা হলে এ ডাকিনীর নামও থাক লরা।' আমি হেসে বললাম, 'এবার তৈরি থাকো হারপুন কামান নিয়ে। আমি ধুলোয় ঠাসা গোলা তাতে ভরে রেখেছি।'

দেখতে দেখতে লরা ভয়ংকরী হয়ে উঠল। আর তার চোখ তাগ করে ছুড়লাম সেই ধুলো-ভরা গোলা!

ব্যস! খানিকক্ষণের মধ্যেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়া লরা নেতিয়ে পড়ে কাত।"

ঘনাদা থামলেন।

এক-একজনের মুখে তখন এক-এক রকম বিস্মিত প্রশ্ন।

"ও! লরা ফ্লোরা মানে সব তুফান-ঝড়?"

ঘনাদা একটু মুচকে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"কিন্তু ধুলোর গোলা যে ছুড়লেন, সে ধুলোটা কী?"

"হলদে রঙের একরকম ধুলোর মতো গুঁড়ো।"—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন—"তার চিহ্ন হল English, আর নাম সিলভার আইওডাইড!"

"সিলভার আইওডাইড!"—এবার আমি মৌকা পেয়ে চেপে ধরলাম—"কিন্তু সে তো বৃষ্টি নামাবার জন্য সাধারণ মেঘের ওপর ছড়ানো হয়। তাতেও তেমন কাজ হয় না । সিলভার আইওডাইডে ফ্লোরা-ডোরার মতো প্রলয়ঙ্করী হ্যারিকেন থামানো যায়?"

কাকে বলছি?

ঘনাদা তখন ঘরের দরজা দিয়ে তাঁর টঙের ঘরের দিকেই চলেছেন। হাতে তাঁর গোটা একটা সিগারেটের টিন। এখনও খোলাই হয়নি।

এটা যেন ঘুষ মনে হল!

শিশির গৌরের দিকে চাইলাম। তাদের মুখে যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বলল, "বোসো, ডালপুরি আসছে।"

"ডালপুরি তোমরাই খেয়ো।" যথাসাধ্য গলায় অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করে শিবুর দিকে ফিরে বললাম, "কই, ওঠ!"

তাড়া দিয়ে শিবুকে ওঠালাম। গেলামও সেই পাইকপাড়ায় কাদা-জল ভেঙে। লাভ হল না।

সময়ে না পৌঁছোবার দরুন কম্‌পিটিশন থেকে আমাদের দলের নাম কাটা গেছে।

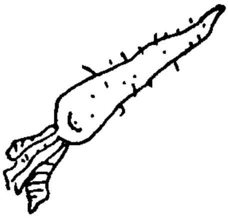

মুলো

হ্যাঁ, মুলো। আর কিছু নয়, মুলো।

তাই নিয়েই তুমুল কাণ্ড!

আমাদের শিবু নেহাত মরমে মরে আছে তাই, তা না হলে তার অনুপ্রাসের বাতিকে নিশ্চয় বলত, মুলো—বানানটা হ্রস্ব উ দিয়েই করলাম—তা থেকেই আমাদের বাহাত্তর নম্বরের আমূল পরিবর্তন। কিংবা এখান থেকে আমাদেরই নির্মূল হবার অবস্থা।

সামান্য মুলো! বাজারে নতুন উঠেছে। শিবু তাই খুব খুশি মনে গণ্ডা দুয়েক কিনে এনে আড্ডা ঘরে তাই নিয়ে আবার একটু জাঁক করেছিল।

"আজ একটা জিনিস যা খাওয়াব! মরশুমের একেবারে প্রথম ফলন!"

আমরা সকলেই একটু অবাক হয়ে শিবুর দিকে চেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটুও সন্দিগ্ধও।

শিবুর মুখে বাজার সম্বন্ধে এরকম বাহাদুরির দাবি বেশ অস্বাভাবিক! বাজার করার নাম শুনলেই আগে সে তো ব্যাজার হয়ে থাকত। বাজারের পালা পড়লে প্রথমে সে নানা অজুহাতে এ দায় এড়িয়ে আর কারও ঘাড়েই চাপাবার চেষ্টা করত। তাতে সফল না হলে এমন বাজার করে আনত যে আমাদের পাচক চূড়ামণি রামভুজের রান্নার

জাদুর হাতেও সে সব জিনিস মুখে তোলবার যোগ্য হত না।

একটা দিন ঘনাদার মুখ আষাঢ়ের মেঘ হয়ে থাকত। সে মেঘ কাটাতে পরের দিন আমাদের বাজার খরচটা বাধ্য হয়েই যে ডবল করতে হত তা বলাই বাহুল্য।

নিজেদের খাওয়া নষ্ট হওয়া আর এই উপরি খরচার সমস্ত গায়ের ঝাল শিবুর ওপর গিয়ে পড়ত।

কিন্তু সব গাল-মন্দ দাঁত-খিঁচুনি শিবু ঠেকাত করুণ মুখের একটি ছোট্ট জবাবে "আমি কি বাজার করতে জানি! কিছু যে চিনি না!"

ওই এক বাজারের ধাক্কাতেই তার পর পারতপক্ষে শিবুর ওপর বহুদিন ও-ভার দেওয়া হত না।

কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ শিবুর এক অদ্ভুত পরিবর্তনে আমরা বেশ একটু অবাক অবশ্য হয়েছি। ক-দিন হল শিবু নিজে থেকেই বাজারের ভারটা নিতে এগিয়ে আসছে!

এ-সুমতির রহস্যটা শিশিরের কাছেই জানা গেছে। শিবু নাকি কোথায় শুনেছে বা পড়েছে যে, ভীমসেনের স্বাস্থ্য নিয়ে মার্কণ্ডেয়-র পরমায়ু পেতে হলে নিজে হাতে বাজার করতে হয়। সব দীর্ঘজীবী বড় বড় লোকেরা নাকি তাই করেছেন ও করেন। এই কিছুকাল আগেই স্যার যদুনাথ সরকার পর্যন্ত।

তা শিবুর বাজারে আমরা খুব কষ্টে আছি এমন কথা বলতে পারব না। এই সেদিন পর্যন্ত পোকা ধরা বেগুন, পাকা ঢেঁড়স, পচা আলু আর বাসি মাছ ছাড়া বাজারে আর কিছু যে খুঁজে পেত না, এখন তার পছন্দর তারিফই করতে হচ্ছে মনে মনে। বাজারের টাটকা সওদা আর তার সঙ্গে এটা-ওটা নতুন কিছু প্রায় রোজই আমাদের ভাগ্যে জুটছে।

বাজার নিয়ে তার হামবড়াইটা কিন্তু এই প্রথম!

বিস্ময়ের সঙ্গে সন্দেহটা সেই জন্যই।

"কী অবাক চিজ খাওয়াবি!" গৌর মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তেরো হাত বীচির বারো হাত কাঁকুড়!"

"না, না!" শিশির সে ঠাট্টায় যোগ দিয়েছিল, "নতুন ফসল বলছে যে! নির্ঘাত তা হলে কচু শাক! বর্ষার শেষে মাঠ বন এখন ছেয়ে গেছে না!"

"এখন কচু বলো ঘেঁচু বলো" শিবু নিজের সাফল্যে নিশ্চিত থেকে বলেছিল, "খাওয়ার সময় দুবার চেয়ে খাবে!"

"বটে!" আমাকে এবার ফোড়ন কাটতে হয়েছিল, "এমন আজব মাল কী নতুন উঠেছে বাজারে! পুঁই মেটুলি নাকি?"

"না, ব্রকোলি!"

আমরা চমকে যথাস্থানে চোখ তুলেছিলাম।

হ্যাঁ, এ সরল সমাধান আর কারও নয়, স্বয়ং ঘনাদার। শিশিরের দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেট হাতে আসর ঘরের বিশেষ আরাম-কেদারায় অর্ধ নিমীলিত চোখে শায়িত তাঁর উপস্থিতির কথাটা ভুলে যাওয়া আমাদের উচিত হয়নি।

"কিন্তু ব্রকোলি? সে আবার কী!"

আমাদের প্রায় সকলেরই মনের প্রশ্নটা মনের মধ্যেই চাপা থেকেছে।

গৌর ওর মধ্যে একটু ওয়াকিবহাল হবার চাল দেখিয়ে মুরুব্বির মতো বলেছে, "ব্রকোলি কী জানিস তো? এক রকম কী বলে—কী বলে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো যাকে বলে—" আমি বিজ্ঞের মতো গৌরের পন্থাই ধরেছি।

শিশির আর এক ধাপ এগিয়ে ঘনাদাকেই যেন সমর্থন করে জানিয়েছে, "ঠিক ধরেছেন, ঘনাদা! শিবু হাঁ করতেই বুঝেছি যে ব্রকোলি ছাড়া আর কিছু নয়। বাজারে এখন তো ব্রকোলিরই ওঠবার সময়।"

ঘনাদার ভুরু জোড়া একটু কি কুঁচকেছে!

শিবুকে হার মানাবার উৎসাহে অতটা লক্ষ করিনি তখন। তার বদলে শিবুর চেহারাটাই যেন কেমন কেমন লেগেছে। নতুন সওদায় তার চমকে দেওয়ার প্যাঁচটা ধরা পড়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু তাইতেই মুখখানা কি অমন ভ্যাবাচাকা দেখায়!

দুপুরবেলা খেতে বসে ব্রকোলি হঠাৎ মুলো হয়ে যাওয়ায় হতাশ কিন্তু খুব হইনি। পালংশাক দিয়ে নতুন মুলোর ঘণ্ট বেশ তৃপ্তি করেই খেতে খেতে শিবুকে তারিফ করেছি।

"তা, তোর ব্রকোলি তো সত্যি খাসা দেখছি, শিবু!"

শিবু ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে নিজের থালাটার ওপরেই অখণ্ড মনোযোগ দেওয়ায় আরও তাতিয়ে বলেছি, "এরকম ব্রকোলি রোজ রোজ এখন আনিস।"

"**ব্রকোলি**!" ভাতের তালের ওপর মুলো-পালং-ঘণ্টর একটি ছোট পাহাড় সাফ করতে **করতে** ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূকুটিভরে চেয়ে বলেছেন, "কই, ব্রকোলি কোথায়?"

"কোথায় আর! আপনার পাতে!" শিশির বাঁকা হাসির সঙ্গে জানিয়েছে, "শিবুর ব্রকোলির ঘণ্টই তো খাচ্ছেন!"

"ব্রকোলির ঘণ্ট খাচ্ছি!" ঘনাদার গলা ভারী হয়ে উঠেছে, "এ-ঘণ্টে ব্রকোলি আছে!"

"আছে বই কী!" গৌরের হঠাৎ বেয়াড়া রসিকতার ঝোঁক চেপেছে। "এখন শুধু অন্য নামে আছে মর্ত্যলোকে! আপনার যা ব্রকোলি তাই এখানে মুলো!"

"মুলো!" ঘনাদা মুলো-পালঙের শেষ গ্রাসটা যথাস্থানে পাঠিয়ে যেন শিউরে উঠে বললেন, "ব্রকোলি আর মুলো এক! জানো ব্রকোলি কাকে বলে? জানো বাঁধাকপির গাঞ্জী আর ফুলকপির মেল মিলিয়ে ব্রকোলির বিবর্তন ঘটাতে কত যুগের সাধনা লেগেছে? জানো—"

"অত জানাজানির দরকার কী, ঘনাদা!" ঘনাদাকে তাঁর ভাষণের মধ্যে থামিয়ে দিয়ে শিশির সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটি এবার করে ফেলেছে, "যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি। ও মুখে যখন ভাল লাগছে তখন ব্রকোলিও যা মুলোও তাই ধরে নিন না।"

"ধরে নেব? ব্রকোলি আর মুলো এক বলে ধরে নেব!" ঘনাদার ধাপে ধাপে ওঠা

গলায় মেঘ-গর্জন শোনা গেছে, "তার মানে ব্রকোলির নামে আমায় মুলো খাওয়ানো হয়েছে! মুলো!"

শেষ কথাটা যেন চাপা আর্তনাদের মতো বেরিয়েছে ঘনাদার গলা থেকে।

আমরা এইবার প্রমাদ গনেছি। শিবু কাতর হয়ে বলেছে, "কেন ঘনাদা, মুলোগুলো তো খারাপ ছিল না।"

"বলছিলাম কী, ঘনাদা!" গৌরও অনুতপ্ত হয়ে শান্তির সাদা পতাকা উড়িয়েছে, "খাওয়া যখন হয়েই গেছে তখন আজকের মতো ক্ষমা-ঘেন্না করে নিন।"

ঘনাদার কানে যেন এসব কথা পৌঁছোয়ইনি। আমাদের উপস্থিতিই ভুলে গিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে তিনি ডাক দিয়েছেন, "রামভুজ!"

রামভুজ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে সভয়ে বলেছে, "হ্যাঁ, বোলিয়ে বড়া বাবু!"

কী বলবেন আর কী করবেন এবার ঘনাদা? আমরা দুরু দুরু বুকে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ইষ্টনাম জপ করেছি। ঘনাদা কি খাওয়া ছেড়ে উঠে যাবেন? সেই কথাই বলতে ডেকেছেন রামভুজকে?

না, তা নয়। মুলোর ঘন্টের চাঁছাপোঁছা থালাটা শুধু বদলে দিতে বলেছেন ঘনাদা।

তারপর নিঃশব্দে সব খাওয়া শেষ করে সেই যে টঙের ঘরে উঠে গেছেন, আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপই নেই বললেই হয়।

চেষ্টার ত্রুটি আমরা কি কিছু করেছি? মোটেই না। সকালে বিকেলে গিয়ে ধন্না দিয়েছি তাঁর দরজায়।

তাতে ঘনাদার আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই। আমাদের যেন দেখেও দেখেননি। নেহাত আমরা নাছোড়বান্দা বলে 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে সেরেছেন।

"বালাখানা থেকে এই সবচেয়ে সরেস অম্বুরি তামাক আনলাম, ঘনাদা!" আমরা স্বস্ত্যয়নের নৈবেদ্যটা তাঁর সামনে ধরে দিয়েছি কখনও।

"হুঁ", তিনি সেটার দিকে একবার দৃক্‌পাত করে আবার নোটবুকের মতো ছোট কী একটা বই-এর পাতা উল্টোতে তন্ময় হয়ে গেছেন।

কী এমন বই-এ ঘনাদার হঠাৎ মনোযোগ? সকালে বিকেলে বার কয়েক তাঁকে সেই বই-এ ডুবে থাকতে দেখে অনেক চেষ্টা করেও সেটার মর্ম উদ্ধার করতে পারিনি।

"সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিশ্চয়!" ঘনাদার ঘর থেকে ফেরার পর শিবুর অনুমানটা আমাদের মনে লেগেছে। কিন্তু ঘনাদার হঠাৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এত আঠা কেন?

রহস্যটা কিন্তু বোঝা গেছে পরের দিনই। আমরা যথারীতি সকালে নিষ্ফল হাজিরা দিয়ে ফিরে এসেছি।

খানিকবাদেই ওপর থেকে সেই পেটেন্ট গলা শুনে উৎসুক হয়ে কান খাড়া করতে হয়েছে।

ঘনাদা বনোয়ারিকে ডেকে ডেকে কী বলছেন। কথাটা জনান্তিকেই বলা হচ্ছে নিশ্চয়, তবে বাহাত্তর নম্বরের বাইরের গলি ছাড়িয়ে সদর রাস্তা পর্যন্ত কারও কাছে

তা অশ্রুত থাকা উচিত নয়।

"হ্যাঁ, বলবি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি, বুঝলি!" ঘনাদা তারস্বরে তাঁর গোপন সংবাদটা জানিয়েছেন, "যারা সব আসবে তারা যতই কাকুতি-মিনতি করুক, বড়বাজারে যে গেছি তা বলবি না। তাতেও যদি না শোনে তো আর দেখা হবে না বলে বিদেয় করবি, বুঝেছিস?"

আমাদের হাত-পা প্রায় ভেতরে সেঁধিয়ে যাবার অবস্থা।

না, ঘনাদার দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়ের ভয়ে নয়, 'বড়বাজার' 'ডাক্তারখানা' এইসব গোলমেলে কথা শুনে।

হঠাৎ তাঁর ডাক্তারখানায় যাবার কী দরকার পড়ল?

টঙের ঘর থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁকে ঘিরে ধরি।

"ডাক্তারখানায় কেন, ঘনাদা? কী হয়েছে!"

"মানুষের শরীরের কথা কিছু বলা যায়!" নীরব না থেকে আমাদের ওপর কৃপা করে ঘনাদা উদাসীন দার্শনিক হয়ে ওঠেন, "শরীর থাকলেই ব্যাধি আছে!"

ও বাবা! আমরা সেখানেই প্রায় বসে পড়ি আর কী! এর চেয়ে কথা বন্ধ যে ভাল ছিল, কিংবা জ্বলন্ত গলার বকুনি! এ মূর্তিমান বৈরাগ্যশতককে সামলাব কী করে?

তবু যা হোক একটা চেষ্টা করতেই হয়।

"অসুখ করেছে আপনার?" আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠি, "তা আপনি ডাক্তারখানায় যাবেন কী! আর সেই বড়বাজারে! আমরা এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি!"

"ডাক্তার!" ঘনাদা এমন একটা গলার স্বর আর মুখভঙ্গি করেন যেন নতুন হাওড়া ব্রিজ বানাতে আমরা নাপিত ডাকবার কথা বলেছি।

"কেন?" আমরা অপ্রস্তুত হয়ে নিজেদের মূঢ়তার কৈফিয়ত হিসেবে বলি, "ডাক্তার কিছু করতে পারবে না? ডবল এম আর সি পি, এফ আর সি এস ডেকে আনব।"

"না, তাতে লাভ নেই।" ঘনাদা পরম তিতিক্ষার সঙ্গে জানান, "ওদের গাল ভরা ডিগ্রিই আছে, আসল যা জিনিস তা পাবে কোথায়! দেখি জোগাড় হয় কি না! পারি যদি তো ফিরব।"

"অ্যাঁ!" আমরা একেবারে আঁতকে উঠি ভয়ে। ঘনাদা বলেন কী?

"আপনার সঙ্গে তা হলে যাই?" আমরা আকুল আগ্রহ জানাই।

কিন্তু ঘনাদা যেন শিউরে ওঠেন। "সঙ্গে যাবে! তার মানে মুলো খেয়ে যে সর্বনাশটা হয়েছে তা একেবারে মোক্ষম করতে চাও? সঙ্গে কেউ থাকলে ও জিন-সেঙের সন্ধান আর পাব! এমনিতেই এক কণা যদি পাই তা হলে বুঝব নেহাত পরমায়ুর জোর।"

এরপর বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী!

"আচ্ছা, চলি!" বলে ঘনাদা যেন ফাঁসিকাঠে উঠতে যাওয়ার মতো করে উদাস মুখে বিদায় নিয়ে যান।

বারান্দায় সিঁড়ির মাথাতেই একবার শুধু ফিরে দাঁড়ান।

"দেখো, নেহাতই যদি ফিরি," ঘনাদা নিরাশ শুকনো গলাতেই বলেন, "তা হলে জোরালো একটু পথ্যির দরকার হতে পারে। জিন-সেঙের ধাক্কা সামলানো তো সোজা কথা নয়।"

আর আমাদের কিছু বলতে হয়?

জিন-সেঙ কী চিজ জানি না। তাতে কী হয়েছে! জোরালো পথ্যি বলতে যা কিছু মাথায় আসে সব কিছুরই জোগাড় রাখতে ত্রুটি করি না।

জোরালো পথ্যি মানে কী? নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরটাও নিজেরাই দেবার চেষ্টা করি: গরম দুধ, শিঙি, মাগুর, কই-এর ঝোল?

মনটা খুঁতখুঁত করে। ওসব তো দুবলা পাতলা পেট-রোগাদের পথ্যি। তেমন জবরদস্ত কিছুর ধাক্কা কি ওই পানসে পথ্যিতে সামলানো যাবে? তার জন্য তন্দুরি নান, মটনের রগন জোস গোছের কিছু না হলে চলে? অন্তত মটন দোপেঁয়াজা, চিকেন কাটলেট তো বটেই।

বড় ফাঁপড়েই পড়তে হয়। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখব? শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় হার মেনে জল-সাবু থেকে শুরু করে শিককাবাব, শোহন হালুয়া পর্যন্ত সব কিছুর জোগাড়েই লেগে যাই।

জোগাড়ের সঙ্গে সঙ্গে হা-হুতাশ আর পরস্পরের দোষ ধরা চলে।

"আর ঘনাদা ফিরবেন? কোনও আশাই নেই!"

"যাবার সময় মুখটা কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে দেখলি না!"

"কিন্তু হঠাৎ হলটা কী? দিব্যি তো বহাল তবিয়তে ছিলেন!"

হবে আর কী? হয়েছে ওই মুলো! ওই মুলোই সর্বনাশ বাধিয়েছে।"

"হ্যাঁ, মুলোতে নিশ্চয় অ্যালার্জি!"

"তা অ্যালার্জির ওষুধ খেলেই তো হয়।" শিবু নিজের অপরাধটা একটু হালকা করবার চেষ্টা করে।

"তুই আর তোর ওই মুলোই তো সব নষ্টের মূল!" আমরা তার ওপর খেঁকিয়ে উঠি, "মুলো আনবার কী দরকার ছিল? আবার 'কী চিজ খাওয়াব' বলে বাহাদুরি!"

"তা মুলো উনি খেলেন কেন?" শিবু দুর্বলভাবে একটা তর্ক তোলে।

"খেলেন, মানে ব্রকোলি ভাবতে ভাবতে ভুলে খেয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়—"

আমরা শিবুর বেয়াড়া প্রশ্নটাকে আমলই দিই না—"আর ওই ভুল করে খেয়েই আরও সাংঘাতিক হয়েছে বোধহয় অ্যালার্জি!"

"আমার তো ভয় হচ্ছে রাস্তাতেই মুখ থুবড়ে না পড়েন।"

"আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।"

"কিন্তু যেতে দিলেন কই? কেউ সঙ্গে থাকলেই নাকি, সেই জংশন না কী, আর পাওয়া যাবে না।"

"জংশন নয়, জিন-সেঙ!" শিশির সংশোধন করে।

"জংশন বা জিন-সেঙ যাই হোক"—হতাশ হই আমরা—"ও জিনিস কি আর

পাওয়া যাবে! শুনলি না, এক কণার জন্য সারা বড়বাজার চষে ফেলতে হবে!"

"তা হলে?"—আমাদের গলা ধরে আসে—"তা হলে ওই এক কণা জিন-সেঙ না পাওয়া মানে তো ঘনাদার আর না ফেরা! মানে এ বাহাত্তর নম্বর অন্ধকার!"

"অন্ধকার আবার কীসের? বাহাত্তর নম্বরে আর থাকছি নাকি!"

"হ্যাঁ, বাহাত্তর নম্বর তো ছার, এ বনমালি নস্কর লেনেই আর ঢুকতে পারব না।"

"মেসের জন্য নতুন বাড়ি কোথাও—" শিবু কথাটা শুরু করতেই আমরা তাকে এই মারি তো সেই মারি!

"আবার বাড়ি, আবার মেস! লজ্জা করে না?"

"আমি তো দেশ ছেড়েই চলে যাব ঠিক করলাম!" শিশির তার অটুট সংকল্প জানায়।

"কোথায় যাবি?" আমি শিশিরের সঙ্গী হবার জন্য তৈরি হই—"কটক, না কাটামুণ্ডু?"

"কটক, না কাটামুণ্ডু?"—শিশির যেন অপমানে জ্বলে ওঠে—"তার বদলে বেহালা বঁড়শে বললেই পারতিস! ওর নাম দেশ ছেড়ে যাওয়া? যাব কঙ্গো কি কটোপাক্সি!"

"এই?" আমিই বা কম যাই কেন? "তোকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। দেশ যদি ছাড়তেই হয় তা হলে কঙ্গো আর কটোপাক্সি কেন? যাব আঙ্গারা বেসিন কি কুইন মড রেঞ্জ!"

"ও আর এমন কী!"—শিশির হালে পানি না পেলেও, ভাঙে তবু মচকাতে চায় না—"আরও দূর গেলেই হয়!"

"আরও দূর এ পৃথিবীতে যাবার কোথাও নেই যে!" ঘনাদাকে তাতাবার আশায় সেদিন সকালেই ভূগোল হাটকানো বিদ্যের জোরে আমি শিশিরকে পেড়ে ফেলি—"আঙ্গারা বেসিনটা হল উত্তর মেরুতে, আর কুইন মড রেঞ্জ দক্ষিণ মেরুতে।"

বেশ একটু থমথমে অবস্থা। ঘনাদার অভাবের শোকটা এমন একটা মোক্ষম টেক্কা দেওয়ার বাহাদুরিতে একটু যে হালকা করব তার কি জো আছে তবু?

"ও মেরু-টেরু কিছু নয়!"—গৌর বিদ্যে জাহির করবার আর যেন সময় পেল না—"যেতে হলে যাও আল আজিজিয়া, নয়তো নর্থ ভোস্টক!"

আমরা সবাই কি একটু ভ্যাবাচাকা?

ভেতরে যা-ই হই, বাইরে ধরা দেবে কে?

আমি ঘনাদার নাসিকাধ্বনির অক্ষম অনুসরণ করে অবজ্ঞাভরে বলি, "তা ওর চেয়ে ভাল জায়গা ভেবে না পাও তো ওই দুটোর একটাতেই যাও।"

"ভাল নয়, সবচেয়ে খারাপ জায়গা বলেই যেতে চাইছি!" গৌর আমার খোঁচাটাকে ভোঁতা করে দিয়ে বলে, "একেবারে জ্বলন্ত চুলোয় ঝলসাতে চাও তো যাও লিবিয়ার আল আজিজিয়া। থার্মোমিটারের পারা ১৩৬.৪ ফারেনহাইটে গিয়ে পৌঁছয়, আর মাইনাস ১২৬.৯-এ যদি জমে বরফের চাঁই হতে চাও তো যাও দক্ষিণ মেরুর নর্থ ভোস্টক-এ। দুনিয়ার সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা।"

"ওইমিয়াকন!"

হৃদ্‌যন্ত্রগুলো লাফ দিয়ে প্রায় মুখের হাঁ দিয়েই বেরিয়ে যায় আর কী! ক্ষীণ হলেও গলাটা শুনেই চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি বৈঠকঘরের দরজায় সশরীরে স্বয়ং ঘনাদা। কিন্তু যেভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এখুনি পড়ে যাবেন যে! কী যেন কোনও মিঞার সম্বন্ধে ভুলও বকছেন তো।

ধরাধরি করে এনে তাঁর মৌরসি কেদারায় বসিয়ে পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দেবার পর আসল কথাটা খেয়াল হয়। আরাম-কেদারা আর হাওয়ায় কী হবে? দরকার তো এখন অন্য কিছুর!

"আপনার পথ্যিগুলো এখানেই আনতে বলি, ঘনাদা?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

পথ্যি শুনে ঘনাদার মুখে ক্ষণেকের জন্য একটু যদি ছায়া নেমে থাকে তো গৌরের ব্যাখ্যাতেই তা কেটে যায়!

"অত পথ্যি আবার এখানে ধরানো মুশকিল!" গৌর বেশ চিন্তিত হয়ে বলে, "মটন আর চিকেনের ক-টা প্লেটেই তো এ ছোট টেবিল ভরে যাবে!"

"সব প্লেট আনবার দরকার কী?" শিশির সুযুক্তি দেয়, "বাছাই করে গোটা কয়েক আনলেই তো হয়! ঘনাদা তো আর সব খাবেন না!"

শিশিরের প্রস্তাবটা শেষ হতে না হতেই ঘনাদার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায়, "না, না, খাবার ঘরেই চলো। এতটা যখন এসেছি তখন এটুকুও পারব!"

গলাটা সাত দিনের সাবু খাওয়া রুগির মতো চিঁচিঁ করলেও ঘনাদা আমাদের সমর্থনের অপেক্ষায় না থেকে নিজে নিজেই ইজিচেয়ার থেকে উঠে বেশ চটপটে পা বাড়িয়ে দেন।

পিছু পিছু গিয়ে খাবারঘরে তাঁর সঙ্গে এবার বসতে হয়।

তা টেবিলটা যে ভালই সাজানো হয়েছে ঘনাদার চোখ দেখেই তা বোঝা যায়। ঘনাদা কোন দিকে যে প্রথম হাত বাড়াবেন যেন ঠিক করতে পারেন না। গলাটা অবশ্য তাঁকে এখনও চামচিকের মতোই রাখতে হয়।

"এত সব খাবার করতে গেলে কেন আবার?" ঘনাদার করুণ গলার মৃদু অনুযোগ।

"তা হলে দু-একটা তুলে রাখি!" গৌর যেন সে অনুযোগে লজ্জা পেয়ে ভুল শোধরাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"আহা! আবার তোলাতুলির কী দরকার!" চিঁচিঁ গলা প্রায় চিঁহি হয়ে ওঠে ঘনাদার। খাবার আগলাতে টেবিলের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েন বুঝি!

তা, সাজানো টেবিলের মান ঘনাদা রাখলেন। খাওয়া শেষ করে শিশিরের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে যখন তিনি আবার আসরঘরের আরাম-কেদারার শোভা বাড়ালেন তখন টেবিলের প্লেটগুলোয় পিঁপড়ে কেঁদে যাচ্ছে বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। তাঁর চিঁচিঁ গলাও তখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে অবশ্য।

বনোয়ারিকে খাবার জল দিয়ে যাবার হাঁকে গলার এই উন্নতি দেখেই ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, "শেষ পর্যন্ত জংশন তা হলে পেলেন?"

"জংশন নয়, জিন-সেঙ," শিশির সংশোধন করলে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই জংশন-ই হোক," আমি সংশোধনটায় এমন কিছু দাম না দিয়েই বললাম, "আর জিন-সেঙ-ই বলি, ঘনাদা যে পেয়েছেন এই আমাদের ভাগ্য।"

"কিন্তু কই আর পেলাম!" ঘনাদা আমাদের মুখের হাঁ-গুলো খানিক বুজতে না দিয়ে বললেন, "জিন-সেঙ কলকাতা শহরে তো ছার, ইন্ডিয়াতেই কোথাও আছে কি না বলতে পারি না।"

"কিন্তু জিন-সেঙ না পেলে তো আপনার—"

শিবু ঘনাদার দিকে চেয়ে উদ্বেগে আশঙ্কায় কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

জিন-সেঙ না পেয়ে থাকলে ঘনাদা এক টেবিল খানা সাফ করে কীসের ধাক্কা সামলালেন সে প্রশ্নটাও তখন আমাদের মনে উঁকি দিচ্ছে।

ঘনাদা সব উদ্বেগ আশঙ্কা কৌতূহলই ঠাণ্ডা করলেন।

বনোয়ারির নিয়ে আসা জলের গেলাসটা প্রায় এক চুমুকেই খালি করে কোঁচার খুঁটে জলের সঙ্গে মুচকি হাসিটাও যেন মুছে বললেন, "হ্যাঁ উপায় নেই, তাই জিন-সেঙের সস্তা বদলি দিয়েই কাজ সারতে হল।

"জিন-সেঙের সস্তা বদলি!" ঘনাদা যেন একটু মাত্রা ছাড়াচ্ছেন! গৌরের উচ্চারণের ধরনে সেই সন্দেহটা একেবারে লুকোনো রইল না।

"হ্যাঁ, জিন-সেঙের বিকল্প রিন-সেন!" ঘনাদা কিন্তু নির্বিকারভাবে জানালেন, "তাও দাঁও বুঝে চার আঙুলের দাম চাইল চার হাজার!"

"চার হাজার টাকা! চার আঙুল মাপের জিনিসের দাম!"

"তার মানে এক আঙুল পরিমাণ হাজার টাকা?"

আমাদের চোখগুলো তখন যেমন কপালে, গলাগুলো তেমনই আর খুব মোলায়েম নয়। সন্দেহের বদলে তাতে শঙ্কাটাই প্রধান হয়ে উঠছে।

জিন-সেঙ না রিন-সেন ওই ছাইপাঁশ কিছু সত্যি খেয়ে থাকুন বা না খেয়ে থাকুন, ঘনাদার মাথাটাতে হঠাৎ একটু গোলই বাধল নাকি!

ফিরে এসে আসরঘরে ঢোকার মুখেই তাঁর প্রথম আবোল-তাবোল কথাটাও মনে পড়ে গেল। প্রলাপ বকা তখনই তো শুরু হয়ে গেছে মনে হয়!

তবু অবস্থাটা ঠিক মতো বোঝবার জন্য একবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তা, ওই হাজার টাকা আঙুল মানে ইঞ্চির রিন-সেন-ই কিনলেন? ওই কোন মিঞ্রার কথা বলছিলেন তার কাছেই বুঝি!"

"মিঞ্রার কথা বলছিলাম!" ঘনাদা ক্ষণেক একটু হকচকিয়ে গিয়ে তারপর অনুকম্পার হাসি হাসলেন, "না, কোনও মিঞ্রার কথা বলিনি, শুধু ওইমিয়াকন-এর নাম করেছিলাম।"

আমাদের হতভম্ব মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে করুণ স্বরে তারপর ব্যাখ্যা যা করলেন, তাতে অবস্থা আরও কাহিল—"সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গার কথা কী হচ্ছিল না তোমাদের? তাই শুনে ওইমিয়াকন-এর কথা মনে পড়ল। পাঁচ-পাঁচটি আঁটি সেখানে যদি অমন দাতাকর্ণ হয়ে না দিয়ে আসি তা হলে আজ বিক্রম থাপাকে তার বাবার কথাটা মনে করিয়ে দিতে হয়!"

জিন-সেঙ, রিন-সেন, পাঁচ আঁটি, দাতাকর্ণ, ওইমিয়াকন, বিক্রম থাপা, আবার তার বাবা—সব মিলিয়ে মাথাগুলো যে আমাদের তখন চক্কর খাচ্ছে তা নিশ্চয় বলবার দরকার নেই।

তারই মধ্যে একটু সামলে উঠে গৌরই প্রথম জিজ্ঞাসা করলে, "কীসের আঁটি দান করে এসেছিলেন? ওই জিন-সেঙের? ওখানে কারখানা আছে বুঝি?"

"কারখানা? ওখানে জিন-সেঙের কারখানা!" অ্যাপোলো ইলেভন-এর আর্মস্ট্রংকে চাঁদে চিনেবাদামের দর যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ঘনাদা গৌর আর সেই সঙ্গে আমাদের মূঢ়তায় সেই রকম যেন ব্যথা পেয়ে বললেন, "ওইমিয়াকন বলতে কী বোঝায় তা জানো? ওইমিয়াকন হল একটা শহরের নাম। পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা শহর। তখন দুনিয়ার সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গার কথা বলছিলে না? সে জায়গা অবশ্য অ্যান্টার্টিক মানে দক্ষিণ মেরুর নর্থ ভোস্টক। সেখানে এক দশমিক কম মাইনাস একশো সাতাশেও থার্মোমিটারের পারা নামে, কিন্তু সে জায়গা তো ধু-ধু তুষারের তেপান্তর। মানুষের পাকা বসতি আছে এমন শহর তো নয়। সে রকম শহর হল সাইবিরিয়ায় এই ওইমিয়াকন। আর্কটিক সার্কল যাকে বলে সেই সুমেরু বৃত্তের বাইরে ও দক্ষিণে হলেও এ শহরে শীতকালে থার্মোমিটারের পারা মাইনাস ছিয়ানব্বুইও ছোঁয়। আর সে শীত তো আমাদের মতো পৌষ মাসেই কাবার নয়। বছরের আট মাসই যা কিছু তরল সব জমে পাথর হয়ে থাকে।

ওইমিয়াকন-এই সমশের-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন তার নাম অবশ্য সমশের নয়, সেমেন রুজ্‌নিকভ। তাকে ও অঞ্চলের আদিবাসী ইয়াকুট বলেই ধরে নিয়ে সাইবেরিয়ায় অজানা অসীম টাইগা অঞ্চলের গাইড ও সঙ্গী হিসেবেই সবে বহাল করেছি।

খটকা লেগেছে অবশ্য গোড়াতেই। ওইমিয়াকন শহর হিসেবে এমনও কিছু নয়। কম-বেশি হাজার তিনেক লোকের সেখানে বসতি। যাকে রুপোলি শেয়াল বলা হয়, মহামূল্য পশমি ছাল ফার-এর জন্য উত্তর মেরু অঞ্চলের সেই প্রাণীটি পোষবার একটা ফার্ম-ই ও শহরের প্রাণ বলা যায়।

যখনকার কথা বলছি তখন শেয়াল পোষা ফার্ম-এর সবে পত্তন হয়েছে। মেরু অঞ্চলের ফার শিকারি আর বল্গা হরিণের পাল অসীম টাইগায় যারা চরিয়ে বেড়ায় সেই ইয়াকুট রাখালদের ওটা একটা সময়-অসময়ের মেলবার আস্তানা মাত্র।

আধ-পোষা বল্গা হরিণের থেকে শুরু করে টাইগা অঞ্চলের পশু-পাখির বিস্তারিত খোঁজ নেবার জন্য ওইমিয়াকন-ই ক-দিনের জন্য প্রধান ঘাঁটি করেছিলাম। অভিযানে বার হলে নাগাড়ে অন্তত দু-তিন হপ্তা টহল দেবার মতো রসদ সঙ্গে রাখা দরকার। সেই ব্যবস্থা করতে গিয়েই সেমেন মানে সমশের-এর ওপর প্রথম সন্দেহ জাগল একটু। আমার নির্দেশ মতো কয়েকটা জিনিস সেমেন সেদিন ওইমিয়াকন ঘুরে সওদা করে এনেছে। সেগুলো দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি তো আসল জিনিসই ভুলে গেছ দেখছি! কই, স্ট্রোগানিনা কই?' "

"কী বললেন?"

না, প্রশ্নটা সেমেন ওরফে সমশের-এর নয়। আমাদেরই।

একটু অনুকম্পার হাসির সঙ্গে ঘনাদা আমাদের অবজ্ঞার প্রতি করুণা কটাক্ষ করে বললেন, "সমশের-এর চোখেও সেই প্রশ্নই দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম।

'স্ট্রোগানিনার কথা কি ভুলে গিয়েছিলে নাকি?' মনের ক্ষীণ সন্দেহটাকে তবু প্রশ্রয় না দিয়ে সমশেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'শুধু তো দুটো জিনিসই আনতে দিয়েছি— চোখন আর স্ট্রোগানিনা। তারই আসলটা ভুলে গেলে?' "

"আজ্ঞে?" এবারও কাতর বিহ্বল প্রশ্নটা আমাদেরই, "ওগুলো কী খাবার-দাবারের নাম?"

"হ্যাঁ," আমাদের এইটুকু বুদ্ধির পরিচয়েও যেন কৃতার্থ হয়ে ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন, "চোখনকে মালাই চিজ-এর একরকম কুলপি বলতে পারো। তবে নোনতা। আর স্ট্রোগানিনা হল বরফে জমানো কাঁচা মাছ।

ইয়াকুট হয়ে তাদের সবচেয়ে পেয়ারের খাবার স্ট্রোগানিনা জানবে না! এমনটা হতেই পারে না। ভুলে যাবার কারণ তাই অন্য কিছু বলে ধরে নিয়েছিলাম।

কিন্তু টাইগায় টহলদারিতে বার হবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই সমশের সম্বন্ধে সন্দেহটা আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। ওইমিয়াকন থেকে রওনা হয়ে তখন দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় খান্দিগার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ ফার গাছের জঙ্গলের মাঝে একটা জায়গা চোখ দুটোকে যেন চুম্বকের মতো আটকে দিলে। বরফের মতো ঠাণ্ডা মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটে এক রাশ কমলা রঙের খুদে খুদে পেরেকের মাথা যেন জটলা পাকিয়ে আছে।

নিজের চোখকে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না তখন। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সমশেরের কথায় চমকে ভেঙেছে।

'কী দেখছেন এত?'

অবাক হয়ে সমশের-এর দিকে খানিক চেয়ে থেকে তার কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে বলেছি, 'কী দেখছি, সত্যি জিজ্ঞাসা করছ?'

'হ্যাঁ, করছি তো!' আমার গলার স্বরে একটু অস্বস্তি বোধ করে সমশের বলেছে, 'ওদিকে একটা মিঙ্ক ভাম চলে গেল কিনা, তাই ভাবছি কী এত দেখছেন।'

'আমিও একটা কথা ভাবছি, সেমেন!' তার চোখে চোখ রেখে বেশ একটু কড়া গলায় বলেছি, 'তুমি কি সত্যি ইয়াকুট?'

'কেন? কেন?' সমশের বেশ একটু অস্থির হয়ে বলেছে, 'আমি ইয়াকুট নয়তো কী?'

'কী, তাই তো ভাবছি! ইয়াকুট হয়ে তুমি স্ট্রোগানিনা কাকে বলে জানতে না, এই ক-দিন টাইগায় ঘুরে দেখলাম তুমি এ-অঞ্চলের নদী-পাহাড়-বন কিছুই ঠিকমতো চেনো না। এখন আবার আমি কী দেখছি জিজ্ঞাসা করলে অম্লান বদনে। তোমার পক্ষে ইয়াকুট হওয়া অসম্ভব। সত্যি করে বলো তো, সেমেন রুজ্‌নিকভ তোমার আসল নাম কি না?'

আরও কিছুক্ষণ পরিচয় লুকোবার বৃথা চেষ্টা করে সমশের শেষ পর্যন্ত সব কথাই

স্বীকার করেছিল। সেমেন রুজ্‌নিকভ নয়, নাম তার সমশের থাপা। এমনিতে বেশ ভাল ঘরের ছেলে। শিক্ষাদীক্ষাও অবহেলা করবার মতো নয়, শুধু পেশাটা যা বেছে নিয়েছে তা অত্যন্ত নোংরা। সমশের গুপ্তচর হিসেবে এ অঞ্চলে এসেছে। এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারায় মিল দেখে ভাষা ইত্যাদিতে যথাসম্ভব তালিম দিয়ে— কোনও শত্রুপক্ষের শক্তি—তাকে ইয়াকুট সেজে ওখান থেকে সব রকম দরকারি খবর সংগ্রহ করে আনতে পাঠিয়েছে।

কাজ সে ইতিমধ্যে খুব কম করেনি। তার ওপর আমার কাছে চাকরি বাগিয়ে তার সুবিধে হয়েছে খুব বেশি। আমি যখন তাকে সহায়-সঙ্গী হিসেবে বহাল করেছি বলে ভেবেছি, তখন আসলে সে-ই আমায় বাহন করেছে তার কার্যোদ্ধারের জন্য। এ অজানা অঞ্চলে নিরাপদে নির্ভয়ে ঘোরাফেরার জন্য আমার মতো কাউকেই তার দরকার ছিল।

সব শুনে আমি তাকে দুটি রাস্তার একটি বেছে নিতে বলেছি। হয় তাকে গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়তে হবে, নয় এ পর্যন্ত যা কিছু সে সংগ্রহ করেছে সমস্ত আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সমশের থাপা শেষ পথটাই বেছে নিলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিয়তিই তার সংকল্পে চরম বাদ সাধবে বলে ভয় হল।

টাইগা থেকে ফিরে ওইমিয়াকন-এর ভেতরে তখন ঢুকেই পড়েছি। আর পোয়া খানেক পথ গেলেই আমাদের আস্তানায় পৌঁছে যাই।

হঠাৎ আপনা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে, 'নাক! তোমার নাক সামলাও, সমশের!'

'নাক!' সমশের চমকে উঠে নাকে হাত লাগাল।"

চমকে উঠলাম আমরাও। "নাকে হাত হঠাৎ? কী সামলাতে?"

"নাক চুরি যাচ্ছিল নাকি?" গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন।

"গোঁফ চুরির মতো নাক চুরিও যায় বোধ হয়!" শিশিরের তার ওপর ফোড়ন।

অন্য দিন হলে এই বেয়াদবিটুকুতেই বৈঠক বানচাল হয়ে যেতে পারত। আজ পথ্যিগুলোর পয়ে ঘনাদার খোশ-মেজাজে চিড় ধরল না।

"নাক চুরিই বলতে পারো," আমাদেরই একরকম সমর্থন জানিয়ে ঘনাদা গলায় যেন ভয়ের কাঁপুনি তুললেন, "তার চেয়েও বুঝি সাংঘাতিক।"

দু সেকেন্ড আমাদের মনে কথাটা বসবার সময় দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন, "চুরি গেলে তবু ফেরত পাবার আশা থাকে। এ একেবারে জন্মের মতো লোপাট হবার ভয়। অস্থির হয়ে তাই সমশেরকে প্রাণপণে নাক ঘষতে বললাম। প্রাণপণে ঘষে ঠাণ্ডায় জমে সাদা হয়ে যাওয়া নাকটায় যদি রক্ত চলাচল করাতে পারে। তা না হলে ও নাক আর বাঁচানো যাবে না, পচে খসে যাবে। সাইবেরিয়ার টাইগার ঠাণ্ডার এই এক বিভীষিকা।

সমশেরকে আর দুবার বলতে হল না। রাস্তার ধারে পিঠের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে সে তখন খ্যাপার মতো নাক ঘষতে শুরু করেছে।

নাকটা তাতে বাঁচল, কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ নাক ঘষেছে তাতে একটা পা-ই গেছে ঠাণ্ডায় জমে। সে পা-টা শেষ পর্যন্ত কেটে বাদই দিতে হল। তাতেও সমশেরকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি।

সে টানাটানির মধ্যে তার গুপ্তচরগিরির কীর্তিগুলো সম্বন্ধেই দারুণ ভাবনায় পড়লাম। কথা ছিল ওইমিয়াকন-এ পৌঁছেই তার সে গোপন কাগজপত্রের পুঁজি সে আমার হাতে তুলে দিয়ে আমার সামনেই জ্বালিয়ে দেবে। রাস্তায় নাক জমে যাওয়ার পর থেকে সে পুঁজি কোথায় যে লুকোনো তার বলবার ফুরসতই কিন্তু সে পায়নি। বলবার মতো অবস্থাও তার ছিল না।

তার মরণ-বাঁচন-দোলার অসুখের মধ্যে নিজেই একদিন তার ডেরায় গিয়ে জিনিসপত্র থেকে শুরু করে তার কামরায় খুঁজতে কিছু বাকি রাখিনি। তখন ওখানকার সব বাড়িই ছিল কাঠের বড় বড় গাছের রোলা কেটে তৈরি। সে কাঠের কামরায় চোরা ফোকর কোথাও থাকতে পারে ভেবে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠুকে ঠুকে হয়রান হয়ে গেছি। কোনও হদিসই মেলেনি।

সমশেরকে যদি না বাঁচানো যায়, শেষ পর্যন্ত তার গোপন পুঁজির খবর সে যদি না দিয়ে যেতে পারে, তা হলে কী হওয়া সম্ভব তাই ভেবেই বুকটা কেঁপে উঠেছে বার বার। আমি এখন সন্ধান না পেলেও, পরে কোনওদিন কোনও লুকোনো জায়গা থেকে সমশেরের গুপ্তচরগিরির কীর্তি বার হয়ে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। সমশেরের সঙ্গে আমার নামটাও তখন এই কুৎসিত জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে যে জড়িয়ে ভাবা হবে! সমশের আমার কাছেই কাজ করেছে, তাকে নিয়েই আমি টাইগা অঞ্চলের দুর্গম সব জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। আমিই যে খোদ চক্রী নই কে বিশ্বাস করবে তখন সে কথা! বিশেষ করে সমশের তো তখন সব ধরাছোঁয়ার ওপরে চলে গেছে!

যেমন করে হোক সমশেরের বেঁচে ওঠা তাই একান্ত দরকার। কিন্তু সেইটেই অসম্ভব মনে হয়েছে। ওইমিয়াকন-এর আধা হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর ভরসা না রেখে দুশো পঁচিশ মাইল দূরের আরও বড় ঘাঁটি খানডিগা থেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সত্যিকার বড় সার্জন এনেছি। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে তিনিও একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, 'না, আর আশা নেই। নাড়িই ছেড়ে যাচ্ছে!'

সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখেছি!

কিন্তু সেই অন্ধকারেই একটা ছবি যেন ভেসে উঠেছে। মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটানো খুদে খুদে কমলা রঙের থোক থোক একরাশ যেন পেরেকের মাথা।

সমশেরের তারপর নাড়ি ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত সেরেও উঠেছে পুরোপুরি, একটা পা বাদে অবশ্য।"

"সারল বুঝি ওই আপনার জংশন-এ!" আমি সবিস্ময়ে বললাম।

"জংশন নয়, জিন-সেঙ"—সংশোধন করলে শিশির।

ঘনাদা সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই হল জিন-সেঙ। নেহাত দৈবের দয়া না হলে ও বস্তুর দেখা পাওয়া যায় না। পেলেও চেনা শক্ত। ভাগ্যক্রমে যা পেয়েছিলাম সবটাই মাটি কেটে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তা পরিমাণে খুব অল্প কী? প্রায় পাঁচশো গ্রাম।

সাইবিরিয়ার টাইগায়, এমনকী জিন-সেঙের খাস মুল্লুক খাবারভস্ক অঞ্চলেও যেসব পেশাদার সন্ধানী এ জিনিস খুঁজে ফেরে, তাদের এক মরশুমের সংগ্রহও চারশো গ্রামের ওপর কখনও ওঠে না। চারশো গ্রাম তো চারটিখানি কথা নয় । সরেস মাল হলে চারশো গ্রামের দামেই দালান তোলা যায়। সত্যিই জিনিসটা সাতরাজার ধন কিনা! সব কিছুই তার শাহানশাহি চালের। বীজ থেকে কল বার হতেই দু বছর লাগে। বাড় এমন আস্তে যে বোঝাই যায় না। বছরে দেড় গ্রাম ওজন যদি বাড়ে তা হলেই যথেষ্ট। কিন্তু গুণ? তিল পরিমাণ বেটে খাওয়ালে একটা তাগড়া জোয়ান হার্টফেল করে মরে যায়। তিলের কণার কণা খাওয়ালে মরতে বসা রোগী জ্যান্ত হয়ে ওঠে। সমশেরও তাই হল।"

"কিন্তু," শিবু আমাদের সকলের মনের ধোঁকাটাই ব্যক্ত করলে, "এক তিলের কণার কণাতেই যখন অমন কাজ হল তখন, আপনার কী বলে, পাঁচ-পাঁচটা আঁটি দাতব্য করতে গেলেন কেন? করলেনই বা কাকে?"

"কাকে আর? ওই সেমেন রুজ্‌নিকভ মানে সমশের থাপাকেই!" ঘনাদা যেন রাজা হরিশচন্দ্রের প্রক্সি দিয়ে বললেন, "আমার বাসাতেই সমশেরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেরে-সুরে ওঠবার পর তার প্রতিজ্ঞাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'এবার তা হলে লুকোনো মালগুলো কোথায় রেখেছ বার করে দেবে চলো। ওগুলো না পোড়ানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই!' মুখে স্বীকার করলে সমশের। কিন্তু তবু তার নড়বার নাম নেই!

একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললাম, 'তা তো বটেই যদি হয় তো চুপ করে বসে আছ কেন? বেশি দূর কোথাও যদি হয় তো খোঁড়া পায়ে তোমার যাবার দরকার নেই। শুধু জায়গাটার হদিস দাও, আমি খুঁজে বার করে আনছি।'

'আজ্ঞে না, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না!'

সমশেরের এই ভুয়ো তোয়াজের কথায় জ্বলে উঠলাম এবার, 'আমায় যদি কষ্ট না করতে হয় তো তুমি-ই করো! যেখানে যেতে হয় যাও তাড়াতাড়ি!'

'আজ্ঞে যাব আর কোথায়!' বলে সমশের যেখান থেকে তার লুকোনো মাল বার করে আনল তা দেখে আমি তাজ্জব!

সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে সমশের কোন সুযোগে আমার কামরায় আমারই বিছানার পুরু গদির নীচে তার সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন!

বেশ সুশীল সুবোধ হয়ে বার করে দিলেও তার লুকোনো পুঁজি পোড়াতে যাবার সময় সমশের প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

'সত্যিই এগুলো পোড়াবেন?'

'পোড়াব না তো কি এখানকার পুলিশকে উপহার দেব?' আমি কামরা গরম করার চুল্লিতে এক এক করে সেগুলো ফেলতে শুরু করলাম।

'কিন্তু আমার কথা একবার ভেবেছেন!' সমশের আকুল আবেদন জানালে।

'তোমার কথা ভেবেছি বলেই তো গুপ্তচর বলে ধরিয়ে না দিয়ে তোমায় ভালয়

ভালয় দেশে ফেরার সুযোগ দিচ্ছি!'

'কিন্তু ফিরে আমি করব কী!' সমশের এবার প্রায় ডুকরে উঠল। 'এই খোঁড়া পা নিয়ে আমায় তো তিলে তিলে উপোস করে মরতে হবে! তার চেয়ে এখানে মরাই ভাল ছিল। ও ধন্বন্তরীর গুঁড়ো দিয়ে কেন আমায় বাঁচাতে গেলেন?'

সমশেরের আক্ষেপের মধ্যেই মনঃস্থির আমি করে ফেলেছি।

কিট ব্যাগ খুলে কাগজের প্যাকেটটা তার সামনে ধরে নিয়ে বললাম, 'নাও।'

'নেব?' প্যাকেটটা খুলেই সমশের কিন্তু আঁতকে উঠল ভয়ে, 'এ কী! এ তো মমি দেখছি! পেটের ভেতর জন্মাবার আগে যেমন থাকে তেমনই সব বাচ্চার মমি!'

'মমি নয়।' অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে হল, 'এই হল সাতরাজার ধন জিন-সেঙের শেকড়। এই পাঁচ আঁটি নিয়ে দেশে চলে যাও, সারা জীবন খাবার ভাবনা আর তোমায় ভাবতে হবে না। আর এগুলোও যদি নেহাত ফুরোয় কি হারায়, তখন তোমাদের নেপালেরই রিন-সেন খুঁজে বার কোরো। জিন-সেঙ যে জানে রিন-সেন চিনতে তার অসুবিধা হবে না।'

সমশের আমার কথা যে ভোলেনি আজ তার বড় প্রমাণ পেলাম। জিন-সেঙ ফুরিয়ে ফেলে তার ছেলে বিক্রম থাপাই এখন বাপের হয়ে রিন-সেন-এর ব্যবসা করছে। না জেনেশুনে ন্যায্য দামই চেয়েছিল আমার কাছে। সমশের থাপার নাম করে পুরনো দুটো কথা বলতেই একবারে অন্যমূর্তি। একটু পরিচয় পেতেই একেবারে জোড়হস্ত হয়ে রিন-সেনের গুঁড়ো আমায় সেবন করিয়ে তবে ছেড়েছে। তা না হলে তোমাদের ওই সর্বনাশা মুলোর বিষক্ষয় আজ হয়, না আমি আর ফিরে আসি?"

কত বড় ফাঁড়া যে আমাদের গেছে তা ভাল করে বোঝবার সময় দেবার জন্যই ঘনাদা টঙের ঘরে এবার চলে গেছেন। শিশিরের সিগারেট টিনটাও সেই সঙ্গে গেছে অবশ্য!

হঠাৎ দিব্যজ্ঞান পেয়ে আমি সবিস্ময়ে বলেছি, "ও! মুলো দিয়েই তা হলে মুলোর বিষক্ষয়! জিন-সেঙও তো আসলে একরকম মুলো!"

"জিন-সেঙ নয়," শিশির গম্ভীরভাবে সংশোধন করেছে, "জংশন!"

টল

দিঘা, না দার্জিলিঙ?

তাই থেকে মুখ দেখাদেখি নেই!

মানে, না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু এক বাড়িতে বাস করে এক খাবার-ঘর এক সিঁড়ি এক বারান্দায় চলতে ফিরতে হলে তা আর কী করে সম্ভব?

তার বদলে বাক্যালাপ তাই বন্ধ।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে আজ প্রায় এক হপ্তা ধরে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার অবস্থা চলেছে। মনান্তর চরমে উঠে বৈদেশিক দূতাবাসে তালা-চাবি পড়বার পর তৃতীয় শক্তির মারফত যেমন কথা চালাচালি হয় আমাদের চলছে তাই।

কার সঙ্গে এ সম্পর্কচ্ছেদ?

না, বাহাত্তর নম্বরে বিপর্যয়ের খবর শুনলেই যা হয় তা এবার নয়। ঘনাদা সম্বন্ধে ভাবিত হবার কিছু নেই। এবার গৃহযুদ্ধের মহড়া যা চলেছে তা আমাদের নিজেদের মধ্যে। একদিকে শিশির আর শিবু, আর একদিকে গৌর আর আমি। আমাদের দুই জোটের মধ্যে এখন সব সম্পর্ক ছিন্ন।

সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলতে চাইলেও একই আস্তানার বাসিন্দা হিসাবে খবর দেওয়া-নেওয়া আর সুযোগমতো খোঁচা দেওয়ার কাজটা তো চালাতে হয়। তার জন্য মধ্যস্থ কাউকে না হলে চলে না।

খাবার ঘরে জমায়েত হবার সময় অবশ্য পুরনো ঠাকুর রামভুজ আমাদের ভরসা।

গৌরের হয়তো নুনের বাটিটা দরকার। আর দরকার থাক বা না থাক, বাটিটা যখন শিশিরদের টেবিলে তাদের পাতের কাছাকাছি তখন গলাটা একটু তেতো করে বলতেই হয়, "এ ঘরে একটা নোটিশ টাঙাতে হবে, বুঝেছ, রামভুজ?"

"হাঁ, বাবু!" বুঝুক না বুঝুক, রামভুজ তৎক্ষণাৎ এক কথায় সায় দেয়। আমাদের গৃহযুদ্ধের ঝামেলা এড়াবার এই সোজা ফিকির সে বার করে ফেলেছে।

"কী নোটিশ আবার?" আমিই কৌতূহলটা প্রকাশ করে প্রসঙ্গটা চালু রাখি।

"এই বলে নোটিশ যে," গৌর আমাকে বোঝাবার জন্যে গলাটা প্রায় গলির ওপার পৌঁছোবার মতো চড়িয়ে দিয়ে বলে, "বাহাত্তর নম্বরের এজমালি কোনও জিনিস কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।"

ওপক্ষের পালটা জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায়।

শিশির যেন শুধু শিবুকে শোনাতেই মাইক-ফাটানো গলায় বলে, "ক-দিন ধরে ভাবছি বাহাত্তর নম্বরের একটা নতুন নিয়ম করলে কী রকম হয়!"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!" শিবু সমর্থনের উৎসাহে সজোরে টেবিল চাপড়ে আমাদের থালা-বাটিগুলো ঝনঝনিয়ে তোলে, "একটা কেন! এখানে সব নিয়ম এবার নতুন হওয়া দরকার!"

টেবিল চাপড়ে থালা-বাটি কাঁপানোর জবাবে চোখা চোখা ক-টা বাক্যবাণ জিভের ডগায় এলেও শিশিরের প্রস্তাবিত নিয়মটা জানবার কৌতূহলে নিজেদের সামলে রাখতে হয় তখনকার মতো।

তেলে-বেগুনে জ্বালিয়ে তোলবার মতো নতুন নিয়মটা ঘোষণা করতে শিশিরের দেরি হয় না। যেন ঢেঁড়া পেটার মতো গলায় সে ঘোষণা করে, "বাহাত্তর নম্বরে ঠুঁটোদের জায়গা নেই!"

গৌর ও আমি দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। আমাদের বলে কিনা ঠুঁটো! মানে—নুনের বাটিটা হাত বাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই?

অ্যাপলো-র বদলে একটা ভোস্টক ছাড়বার পাঁয়তাড়াই তারপর কষতে হয়। মাঝে থেকে খাওয়ার পালাটাই মাটি। পাতে কী পড়ে আর পেটে কী যায় তা খেয়ালই থাকে না।

এমনই চলছে আজ প্রায় এক হপ্তা। হিসেব করে বললে, পাক্কা ছ-দিন। এই শনিবারেই হপ্তা ঘুরে আসবে।

আরম্ভ হয়েছিল কীসে?

কীসে আর? শিশির-শিবুর একগুঁয়ে আহাম্মকিতে।

আমরা তো কাজ প্রায় পনেরো আনা হাসিল করে এনেছিলাম। শুধু টিকিট ক-টা কিনলেই হয়। টাইম টেবল দেখে ক-টার ট্রেন, স্টেশনে কখন পৌঁছবে, নেমে কী করব, কোথায় যাব সব ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। যাঁর জন্য এত তোড়জোড় তিনিও তো সায়ই দিয়েছিলেন বলা যায়।

চুপ করে থাকা মানেই তাই নয় কি? তিনি মুখ বুজে ভুরু-টুরু কুঁচকে বেশ মন দিয়েই সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনেছিলেন । ভুলেও একবার কই উলটো কিছু তো বলেননি!

শিবু-শিশির কী কাজে কে জানে বেরিয়েছিল। তারা ফিরে আসতেই বিজয়গর্বে আহ্লাদে আটখানা হয়ে খবরটা তাদের শুনিয়েছিলাম।

এমন একটা সুসংবাদে কোথায় নেচে উঠবে আনন্দে, না দুজনেই চোখ পাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, "কী? কোথায় যাবেন ঘনাদা?"

"দিঘা!" সমস্বরে সোল্লাসে জানিয়েছিলাম আমি আর গৌর।

"দিঘা! দিঘা যাবেন ঘনাদা তোমাদের সঙ্গে?" শিশির-শিবু হেসেই খুন হয়েছিল। এমন আজগুবি মজার কথা কেউ যেন কখনও শোনেনি।

মেজাজ এতে গরম হয় কি না!

তবু নিজেদের সামলে যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ঘনাদা আমাদের সঙ্গে দিঘা যাচ্ছেন তাতে হাসবার কী আছে?"

"না, হাসবার আর কী আছে!" শিবু ব্যঙ্গ করেছিল, "টালার ট্যাঙ্কে ইলিশের গাঁদি

লেগেছে বললেও হাসবার কিছু নেই।"

"তার মানে কী, বলতে চাও কী?" এবার গলা না চড়িয়ে পারা যায়নি, "ঘনাদা দিঘা যাচ্ছেন না?"

"না, যাচ্ছেন না।" শিশির মুচকে হেসে যেন সরকারি গেজেট থেকে পড়ে শুনিয়েছিল, "কারণ তিনি যাচ্ছেন দার্জিলিঙ।"

"দার্জিলিঙ! ঘনাদা যাচ্ছেন দার্জিলিঙ!" এবার আমাদের হাসবার পালা! "তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়! ব্রেজিলের পেলে খেলচেন বেনেপুকুরের বি টিমে!"

হাসাহাসি তো নয়, একেবারে আদা-জল-খাওয়া রেষারেষি।

ঘনাদাকে যেমন করে হোক আমাদের সঙ্গে দিঘা নিয়ে যেতেই হবে।

মৌকাটা খুব ভাল পাওয়া গিয়েছিল। ছুটি-টুটির সময় নয়, কিন্তু কী সব বোমা ফাটাফাটি হয়ে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা-টরিক্ষা সব বন্ধ। রাস্তার হাঙ্গামা সামলাতে পুলিশ বাড়ন্ত বলে খেলার মাঠের রেফারি লাইনসম্যানেরা সব মার খেয়ে খেয়ে ধর্মঘট করেছে। কলকাতা শহরের অরুচির মুখটা ক-দিনের জন্য বদলে আসার এই সুবর্ণ সুযোগ।

ঘনাদার নিজের মুখেই তার একটু ইশারা একদিন পেয়ে উৎসাহটা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কাগজ খুললেই তো এখানে বোমা, ওখানে কাঁদানে গ্যাস, সেখানে গুলি। কোন এলাকায় কখন যে কী বাধবে কেউ জানে না।

ঘনাদা ক-দিন ধরে তাঁর সান্ধ্যভ্রমণটি বাতিল করেছেন।

সকালবেলা খবরের কাগজটির প্রথম পাতার শিরোনামা থেকে শেষ পাতার তলায় মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়া তাঁর প্রতিদিনের রুটিন।

সন্ধেবেলার বেড়ানো হঠাৎ বন্ধ করার সঙ্গে সকালের কাগজ পড়ার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেই আমাদের সন্দেহ।

ঘনাদা বিকেল না হতে ক-দিন ধরে আমাদের বৈঠকি ঘরই অলংকৃত করছেন। কিন্তু ওই দর্শন দেওয়া পর্যন্তই। আমাদের কপালে কণ্ঠসুধা বর্ষণ কিছু হয়নি। টঙের ঘর থেকে যে গড়গড়াটা বনোয়ারিকে দিয়ে নিত্য নীচে বয়ে আনিয়ে আবার যথাসময়ে ওপরে তোলান, শুধু তারই তরল ধ্বনি বেশির ভাগ আমাদের শুনতে হয়।

বুঝেসুঝে মাত্রা মতো একটু খোঁচা দিলে ঘনাদার কণ্ঠ থেকে তার চেয়ে সরস যদি কিছু ঝরে এই আশায় সে দিন একটু বাঁকা সুরেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বিকেলের বেড়ানো বুঝি ছেড়ে দিলেন, ঘনাদা? তা, যা দিনকাল, বাড়ি থেকে বেরুবার বিপদও আছে।"

"বিপদ!" ঘনাদার মনে গিয়ে লেগেছিল কথাটা। বেশ একটু চিড়বিড়িয়ে বলেছিলেন, "বিপদ আছে তো হয়েছে কী? বিপদের জন্য কি বেড়ানো ছেড়েছি?"

"ঠিক! ঠিক!" শিবু-শিশিরের দু জোড়া চোখ আমায় যেন ঘৃণায় ভস্ম করতে চেয়েছিল, "বিপদের ভয় করবেন ঘনাদা? কলম্বসের ভয় নালা ডিঙোতে! নেপোলিয়ন কাঁপবেন ঘোড়ায় চড়তে!"

গৌর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার বেয়াদপির জন্য মাপ-চাওয়া মিহি গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, "সত্যি বেড়ানোটা বন্ধ করলেন কেন বলুন তো?"

"কেন করলাম?" ঘনাদা আমাদের আর সেই সঙ্গে সমস্ত কলকাতা শহরের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিষোদগার করে বলেছিলেন, "এ শহরে বেড়াবার জায়গা আছে কোথাও? ওই তো তোমাদের গড়ের মাঠের উঠোন থেকে লেকের খিড়কি পুকুর! তাও গিজগিজ করছে যত বেতো, হাঁপানি আর অম্বুলে রুগিতে। বুক ভরে দম নেবার, পায়ের খিল ছাড়িয়ে ছোটবার, আকাশ ছাড়িয়ে চোখ মেলবার আছে কোনও জায়গা?"

ব্যস! আর কিছু শোনার দরকার হয়নি। ওইটুকু ইশারাই আমাদের যথেষ্ট।

তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেছি। দুজনে এক কামরারই বোর্ডার বলে প্রথমে গৌরের সঙ্গেই পরামর্শটা হয়েছে। শিশির শিবুকে তারপর জানাতে গিয়ে খুঁজে পাইনি। না পেলেও ভাবনা হয়নি কিছু। এমন একটা মতলব শোনামাত্র তারা যে লুফে নেবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন আমাদের নেই।

পছন্দমতো জায়গার নামটাও জলদি মাথায় এসে গেছে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, সেই ঝাউগাছ মার্কা ছবিটা দেখে।

দিঘা! এর চেয়ে জুতসই জায়গা আর হতে পারে না। শুধু ঘনাদাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবার জন্যই যেন জায়গাটা এতদিন ধরে তৈরি হয়ে আছে।

বুক ভরে নিশ্বাস নেবেন ঘনাদা? তা নিন না! সমস্ত বে অফ বেঙ্গলের হাওয়া-ই তিনি ভরে নিন না ফুসফসে!

পায়ের খিল ছাড়িয়ে ছুটবেন? তা কেয়া আর ঝাউ ঝোপ বাঁচিয়ে ছুটুন না বালির চড়া ধরে সেই কন্যাকুমারী অবধি।

আর দিগন্ত ছাড়িয়ে চোখ মেলতে চান? তা বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরই পার হয়ে যাক না তাঁর দৃষ্টি।

না, দিঘা যেন আমাদের ওপর দৈবের দয়া!

টুরিস্ট অফিসের পুস্তিকা-টুস্তিকা জোগাড় করে টাইম টেবল দেখে-টেখে প্রথমেই টঙের ঘরে উঠে ঘনাদাকে সুসংবাদটা জানিয়েছি।

গড়গড়ার টান দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘনাদা বেশ মনোযোগ দিয়েই প্রস্তাবটা শুনেছেন। শুনে হুঁ হাঁ কিছু করেননি। অবশ্য তা করবেন-ই বা কেন? আনন্দ যতই হোক, তাতে ধেই-নৃত্য করা তো আর তাঁর সাজে না!

কবে কোন গাড়িতে রওনা হব তাঁকে জানিয়ে সঙ্গে কী কী নেওয়া হবে তারই একটা ফিরিস্তি করতে আমরা নীচে নেমে গেছি।

সেই নীচে নামতেই শিশির শিবুর সঙ্গে দেখা আর তারপর থেকেই গৃহযুদ্ধ শুরু—দার্জিলিঙ, না দিঘা!

শিশির-শিবু ঘনাদাকে নিয়ে যাবে-ই দার্জিলিঙ।

আমরাও নাছোড়বান্দা। তাঁকে দিঘায় না নিয়ে ছাড়ব না।

প্রথমে তর্কাতর্কি ঠাট্টা টিটকিরি, তারপর বাক্যালাপই বন্ধ।

দিঘা ছেড়ে যারা দার্জিলিঙ যেতে চায় তারা কি কথা বলার যোগ্য!

পারতপক্ষে এক জায়গায় এক সঙ্গে থাকি না। খাবারঘরে মাঝে মাঝে যা বাধ্য হয়ে পরস্পরের সঙ্গ সহ্য করতে হয়। ঠারেঠোরে ঠোকাঠুকিটা তখনই বাধে।

তা না হলে এ জোট ও জোটের ছায়াই মাড়ায় না। আসরঘরে ওরা ঢোকে তো আমরা বেরিয়ে যাই। টঙের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামে তো আমরা উঠি।

হ্যাঁ, টঙের ঘরে সুবিধা পেলেই গিয়ে হাজিরা দিতে হয় বই কী!

শুধু হাতের হাজিরা নয়, সঙ্গে থাকে এবেলা ওবেলা হরেক রকম প্রণামী। সকালে যদি হিঙের কচুরির থালা হয় তো বিকেলে জিরের জলের বাটি বসানো ফুচকার কাঁসি।

প্রণামী আবার বাজারের হাওয়া বুঝে বদলাতেও হয়। ওরা কড়া পাক আমদানি করেছে বলে যদি আঁচ পাই তো আমরা তালশাঁসের রেকাবি সাজিয়ে তার ওপর টেক্কা দিই। ওদের কবিরাজি কাটলেটকে কানা করতে আমরা খোদ পার্ক স্ট্রিটের সেরা দোকানের সসেজ-রোল না আনিয়ে ছাড়ি না।

তা, এমন তোয়াজ না পেলে ঘনাদা ঘাড় কাত করবেন কেন? বাজি মাত আমরা তাইতে এক রকম করেই ফেলেছি। শনিবার সকালে শুধু তাঁকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে তোলার অপেক্ষা।

শিশির-শিবুর মুখজোড়ায় তখন কেমন ছাই মেড়ে দেয় শুধু তাই দেখবার আশাতেই প্রহর গুনছি।

দার্জিলিঙ! দিঘা ছেড়ে ঘনাদাকে কেমন দার্জিলিঙে নিয়ে যেতে পারে এবার দেখব! দার্জিলিঙ তো দূর, শিয়ালদাতেই নয়, ট্যাক্সি যখন যাবে সোজা হাওড়ায় তখনই ওদের চক্ষু সব কী চড়কগাছ-ই না হবে!

ঘনাদাকে সমস্ত প্রোগ্রামটা ক-দিন ধরেই শুনিয়ে দিয়েছি। প্রোগ্রাম আর সেই সঙ্গে দিঘা-প্রশস্তি।

"একেবারে স্বপ্নের রাজ্য, বুঝেছেন ঘনাদা!" গৌর নিজেই মধুর আবেশে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে বর্ণনা করতে গিয়ে, "ঝাউ বনগুলো যেন কোনও রূপকথার দেশের নার্শারি থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনানো। আর সমুদ্রের তীরের বালি? সে তো বালি নয়, যেন পরীদের হাসি-গুঁড়োনো ট্যালকম পাউডার।"

"হুঁ-উ?" ঘনাদা বনোয়ারির সযত্নে বয়ে আনা চায়ের ট্রের রং-বেরং-এর পেস্ট্রি সাজানো প্লেট থেকে পুরুষ্টু ক্রিম রোলটিই প্রথম তুলে অর্ধেক মুখে পুরে গৌরের দিকে যেন সবিস্ময়ে তাকিয়েছেন।

উৎসাহিত হয়ে গৌর আরও অনেক কিছুই বলে গেছে তারপর। জন্মে কখনও দিঘার ধারে-কাছে যায়নি বলে তার কল্পনাকে হোঁচট খেতে হয়নি কোথাও।

ক্রিম রোলের পর প্লেটের অর্ধেক পেস্ট্রি সাবাড় করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ঘনাদা কোনওবার হয়তো বলেছেন, "কিন্তু দীঘার জল নাকি ভাল নয়!"

"জল ভাল নয়!" আমরা একেবারে আকাশ থেকে পড়েছি। তারপর উঠেছি চিড়বিড়িয়ে, "কে বলেছে? ওই ওরা বুঝি? ওই দার্জিলিঙওয়ালারা?"

খানিকক্ষণ ঘনাদার কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। প্লেটের বাকি পেস্ট্রিগুলোর সদ্গতি করে চায়ের পেয়ালাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে যেন নেহাত বৈরাগ্যের সঙ্গে ট্রে-টা একটু সরিয়ে রেখে তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ। ওরা বলছিল দার্জিলিংঙের পাহাড়ি ঝরনার গলানো রুপোর মতো জল যেন স্বর্গের অমৃত!"

"অমৃত!" আমায় ভেংচি কাটতে হয়েছে।

ঘনাদার তক্তপোশের ধারে মেঝেতে নামানো প্লেটে দুটো হলদে গুঁড়ো দেখে আমাদের আগেই শিশির-শিবুর ঘুষটা কী ছিল খানিকটা অনুমান করে মুখ বেঁকিয়ে তারপর বলেছি, "বনস্পতি-তে ভাজা ওই অখাদ্য খাবারগুলো যারা আপনাকে এনে খাওয়ায় তারা অমৃতের জানে কী! ওদের দৌড় তো ওই পচা অমৃতি অবধি!"

দিঘার জলের মাহাত্ম্য কীর্তনেই মেতে উঠেছে এবার গৌর। "দিঘার জলের মর্ম ওরা কী বুঝবে! কোথা থেকে এ জল উঠছে ওরা জানে? একেবারে হাজার ফুটেরও বেশি গভীর টিউবওয়েল থেকে পৃথিবীর বুকের ভেতরকার লুকোনো জল ওখানে উথলে উঠছে। অমৃত যদি কিছু থাকে তো সে ওই জল। আর জলের জন্য যদি কোথাও যেতে হয় তো সে দিঘা।"

"দিঘার কাছে দার্জিলিঙের জল!" আমায় আবার ধুয়া ধরতে হয়েছে, "পায়েসের কাছে আমানি!"

দার্জিলিঙ আর তার ঝরনার জলের আদ্যশ্রাদ্ধ করে যা কিছু রোজ দুবেলা তারপর বলি, ঘনাদা যেরকম মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন, তাতেই আমাদের দিঘা-ভ্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি।

সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস একটু চিড় খেয়েছে একেবারে শনিবার দিন সকালবেলাই।

ট্রেনের জন্য সেই দশটায় বেরুলেও চলবে। তবু সাবধানের বিনাশ নেই বলে বনোয়ারিকে সকাল সাড়ে আটটাতেই হুকুম করেছি ট্যাক্সি ডাকবার জন্য!

জবাবে বনোয়ারি যা বলেছে তাই শুনেই আমরা তাজ্জব।

"তব্ তো দো ট্যাক্সি বোলাকে লাবে!"

দো ট্যাক্সি! দুটো ট্যাক্সির কথা কী বলছে আহাম্মকটা?

"দুটো ট্যাক্সি কী হবে আমাদের?" ধমক দিয়েছি বনোয়ারিকে, "তোকে দুটো ট্যাক্সির কথা বলেছি? বলেছি একটা ট্যাক্সি চট করে নিয়ে আসতে!"

"হাঁ, হাঁ, একঠো আনবে আপলোগের জন্যে," বনোয়ারি আমাদের ধমকে বিচলিত হয়নি, "আউর একঠো উ বাবুদের লিয়ে।"

"উ বাবুলোগ? তার মানে তো শিশির-শিবু? উ বাবুরা আবার ট্যাক্সি আনাচ্ছে নাকি? হঠাৎ এই সকালে ওদের আবার ট্যাক্সির দরকার হল কেন?"

ঘনাদাকে বাগাতে না পেরে মনের দুঃখে আগে থাকতেই কোথাও সরে পড়ার ব্যবস্থা করছে? তাদের লবডঙ্কা দেখিয়ে আমাদের চলে যাওয়াটা যাতে চোখে দেখতে না হয়?

কোথায় যাচ্ছে বনোয়ারির কাছে জেনে বেশ একটু খটকা কিন্তু লেগেছে। শিয়ালদা যাবার জন্য ওরা নাকি ট্যাক্সি ডাকাচ্ছে!

মনের দুঃখে যদি যেতেই হয় কোথাও তো শিয়ালদা কেন? ঝাঁকড়দা মাকড়দাও তো গেলে পারত, কিংবা বনবাসের শামিল আর কোনও জায়গা।

তা প্রাণের জ্বালা জুড়োতে যাক যেখানে খুশি। আমাদের আর দেরি করবার সময় নেই।

বনোয়ারিকে তাই তাড়া লাগিয়েছি, "শিয়ালদা-টিয়ালদা নয়, আগে তুই হাওড়ার ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়!"

কথাটা আর শেষ করতে হয়নি, তার আগেই কানের মধ্যে কে যেন বিষ ঢেলে দিয়েছে।

"এখনও দাঁড়িয়ে আছিস, বনোয়ারি? দার্জিলিঙ মেল শেষকালে ফেল করাবি নাকি? তোর বড়বাবু ওদিকে তৈরি হয়ে বসে আছেন।"

দার্জিলিঙ মেল! বড়বাবু! ওরা এসব বলে কী? বড় আশায় ছাই পড়ে সত্যিই খেপে গেল নাকি? ঘনাদাকে এখনও দার্জিলিঙ নিয়ে যাবার খোয়াব দেখছে!

বেচারাদের দিবাস্বপ্নটা ভাঙবার ব্যবস্থা এবার করতেই হয়। গৌরের দিকে চেয়ে হেসে তাকেই যেন শুনিয়ে দিলাম, 'দিঘায় ঘনাদার সমুদ্র স্নানের জন্যে যা একটা সুইমিং ট্রাঙ্ক নিয়েছি!"

কিন্তু আহাম্মকদের শিক্ষা কি সহজে হয়! সুশীল সুবোধ হয়ে হারটা কোথায় মেনে নেবে, না শিশির-শিবু সংবাদ শুরু করে দিলে তৎক্ষণাৎ। শিবু যেন ব্যস্ত হয়ে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঘনাদার কানঢাকা টুপিটা কিনতে ভুলিসনি তো? পাহাড়ি ঠাণ্ডা থেকে মাথাটা আগে বাঁচাতে হয়।"

"দিঘায় ওয়েদার এখন চমৎকার!" পালটা ঘা দিলে গৌর, আমাকেই যেন শুনিয়ে, "ঘনাদাকে ফিরিয়ে আনাই শক্ত হবে।"

কিন্তু বনোয়ারি এখনও অমন হাঁদারামের মতো দাঁড়িয়ে কেন?

দু জোড়া গলার ধমক খেয়ে সে কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইলে, এক সঙ্গে দুটো ট্যাক্সি যদি না পায় তা হলে আগে কোথাকার জন্য আনবে—হাওড়া না শিয়ালদা?

"কোথাকার জন্য আবার? হাওড়া! হাওড়ার জন্য!"

"শিয়ালদা! ট্যাক্সি পেলেই শিয়ালদার জন্য আনবি।"

"হাওড়া!"

"শিয়ালদা!"

"হাওড়া!"

"শিয়ালদা! ঘনাদা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে দার্জিলিঙ যাচ্ছেন।"

"দার্জিলিঙ! ছোঃ! ঘনাদা যাচ্ছেন দিঘা।"

"দিঘা! ফুঃ! ঘনাদা দার্জিলিঙ যাবেন নিজে কথা দিয়েছেন!"

"বিলকুল ঝুট।" এবার সরাসরি রুখে দাঁড়াতে হল—ঘনাদা দিঘা ছাড়া কোথাও যাবেন না, নিজে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।"

"অসম্ভব!" শিশির-শিবুর প্রায় হাতের আস্তিন গুটোবার অবস্থা, "তিনি আমাদের

কথা দিয়েছেন।"

"না, আমাদের!" গৌর আর আমার গর্জন।

"বেশ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? চলো ঘনাদার কাছে?" শিশির-শিবুর তর্জন।

"চলো!" আমরা কি পেছপাও?

কিন্তু সিঁড়ি কাঁপিয়ে টঙের ঘরে গিয়ে ঢুকে চারজনেই হতভম্ব। আমরা যখন দিঘা দার্জিলিঙ যাওয়ার তাড়ায় মাথা ফাটাফাটি করতে যাচ্ছি, ঘনাদা তখন স্রেফ ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে তক্তপোশের ধারে বসে গড়গড়ায় কলকেতে টিকে সাজাচ্ছেন!

আমাদের ঝড়ের মতো ঢুকতে দেখে মুখ তুলে একটু শুধু যেন আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এল?"

"কার কথা বলছেন? কে আবার আসবে?" আমরা ভ্যাবাচাকা।

"কে-টে নয়, আসবে একটা টেলিগ্রাম। এখনও তা হলে আসেনি বুঝতে পারছি।" ঘনাদা সাজানো শেষ করে টিকে ধরানোতে মন দিলেন।

"কোত্থেকে টেলিগ্রাম আসবে?" গৌর মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা রাখতে পারলে না, "আর যেখান থেকেই আসুক, আপনাকে এখন তো দিঘা যেতে হবে।"

"দিঘা নয়, দার্জিলিঙ!" শিশির দেরি করলে না সংশোধন করতে।

"বেশ সেইটেই আগে ঠিক হোক!" গৌরের গলায় রসকষ নেই, "দিঘা, না দার্জিলিঙ কোথায় উনি যাবার কথা দিয়েছেন, ঘনাদা নিজের মুখেই বলুন।"

জবাবের বদলে ঘনাদার মুখ থেকে ধোঁয়াই বার হল। সেই সঙ্গে যেন চাপা হাসির মতো গড়গড়ার 'ভুরুক! ভুরুক!'

কিন্তু এবার আমরা নাছোড়বান্দা।

"দিঘা, না দার্জিলিঙ বলতেই হবে ঘনাদাকে!" গৌরের সঙ্গে শিবুও যেন শমন ধরাবার গলা ছাড়ল।

"বলতেই হবে?" আমাদের আজগুবি আবদারে ঘনাদার ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে পড়ে, "কিন্তু বলে লাভটা কী? তাতে লাভ হবে কিছু? এখন এখান থেকে আমার নড়বার উপায় আছে?"

"নড়বার উপায় নেই? কেন?" সমস্বরে আমরা জানতে চাইলাম।

"টেলিগ্রামটা যদি আসে!" ঘনাদার গলায় এবার অজানা কোনও ভয়ংকর সম্ভাবনার আভাস!

"কীসের টেলিগ্রাম? কোথা থেকে?" বিস্মিত যেমন আমরা সবাই তেমনই বেশ সন্দিগ্ধও।

"কোথা থেকে জেনে আর কী হবে!" ঘনাদা যেন নিয়তির বিধান মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু এলে যেমন আছি সেই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ রওনা হতে হবে।"

"এমন জরুরি টেলিগ্রাম?" শিবুর গলার সুরটা একটু বাঁকা, "নিকসন কি ব্রেজনেভের বোধহয়।"

"সে যারই হোক," চুনি গোস্বামীকে যেন কোন টিমের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমনই একটু করুণার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন, "ও টেলিগ্রাম অমান্য করবার তো উপায় নেই। যদি আসে, কখন আসবে, তারই অপেক্ষায় তটস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছে তাই।"

"তা হঠাৎ টেলিগ্রামের এমন জরুরি তলব কী জন্যে?" আমরা আজ সহজে ছাড়বার পাত্র নই, "কী করতে হবে আপনাকে?"

"কী করতে হবে?" ঘনাদা যেন সদ্য জঙ্গল-থেকে-ধরে-আনা গণ্ডাখানেক বাঘের খাঁচায় একলা শুধু হাতে ঢুকতে যাবার মতো মুখ করে বললেন, "খোঁজ করতে হবে, বেশি কিছু নয়, শুধু এক ফোঁটা জলের।"

"এক ফোঁটা জলের খোঁজ!" আমাদের হাসি চাপাই তখন দায় হল, "তার জন্য এত ভাবনা?"

"দিঘায় চলুন না। পাতাল থেকে অফুরন্ত জলের ফোয়ারা উঠছে সেখানে!" গৌর জপাবার সুযোগ ছাড়লে না।

"দার্জিলিঙ রয়েছে কী করতে!" শিশির ঝটপট উলটো গাইলে, "পাহাড়ি ঝরনায় অনর্গল হিমালয়ের চূড়ার তুষারগলা জল!"

"হুঁ, জল!" ঘনাদা একটু যেন দুঃখের নিশ্বাস ছাড়লেন, "জল হলে তো সত্যিই ভাবনার কিছু ছিল না। এ ঠিক জল নয়, বরং টল বলা যায়!"

"টল!" আমাদের সকলের চোখ এবার সত্যি ছানাবড়া।

"হ্যাঁ জল-টল থেকে টল শব্দটা নিলে দোষ নেই।" ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন একটু, "টল হল জলের একেবারে আপন জাতভাই, গাঞী গোত্র পর্যন্ত সব এক। তফাত শুধু চেহারা-চরিত্রে।"

"তার মানে ভারী জল!" আমার বিদ্যে জাহির করলাম, "যার নাম ডিউটেরিয়াম অক্সাইড? যা থেকে হাইড্রোজেন বোমা হয়?"

"না।" ঘনাদা করুণাভরে মাথা নাড়লেন, "ভারী জল নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। ভারী জলের সঙ্গে টল-এর আকাশপাতাল তফাত। এমন তফাত যে দুনিয়ায় মাত্র একটি কি দুটি ফোঁটাই হয়তো এখন কোথাও কেউ জমাচ্ছে সন্দেহ করে পৃথিবীর বড় বড় চাঁইদের চোখে আর ঘুম নেই।"

"টেলিগ্রাম এলে এই টলের ফোঁটা খুঁজতে আপনাকে ছুটতে হবে?" আমাদের সবিস্ময় প্রশ্ন, "খুঁজে পেলে করবেন কী?"

"সেবার প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে যা করেছিলাম!" ঘনাদা গড়গড়ার নলে একটা লম্বা টান দিয়ে তাঁর কথার নমুনা হিসেবেই যেন এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "শুরু করেছিলাম খোদ নিউইয়র্কে, সেখান থেকে প্লেন-এ পেরুর লিমা হয়ে ভাড়া করা সুলুপ-এ গ্যালাপ্যাগস দ্বীপ। গ্যালাপ্যাগস থেকে একটা স্কুনার-এ হাওয়াই, হাওয়াই থেকে ব্রিগ্যানটাইন-এ সামোয়া, সামোয়া থেকে একটা কেচ-এ রারাটোঙ্গা, রারাটোঙ্গা থেকে একটা ইয়ল-এ ফিজি, ফিজি থেকে আবার একটা সুলুপ-এ নিউগিনির পোর্ট মোরেস-বি।"

ঘনাদা দম নিতে একটু থামতেই শিবু ফোড়ন কাটলে, "গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটাই ঘোল-মওয়া করে ফেললেন যে, যা কিছু জলে ভাসে তাই দিয়ে!"

"হ্যাঁ।" ঘনাদা নিজেই স্বীকার করলেন, "জেলে ডিঙি থেকে যাত্রী জাহাজ, প্রায় সব কিছুতে সমস্ত প্যাসিফিক এসপার ওসপার করে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের ডারউইন বন্দরে নেমে সেখান থেকে একটা জিপে দক্ষিণের আধা মরুর দেশ অ্যালিস স্প্রিংস-এর দিকে রওনা হয়েও দেখি জোঁকটা ঠিক সঙ্গে লেগে আছে। পেরুর লিমা থেকে গ্যালাপ্যাগস যাবার সময়ই তাকে প্রথম লক্ষ করেছিলাম। তাকে ছাড়াবার জন্যই প্যাসিফিকটা তারপর অমন এলোমেলোভাবে ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি।

ডারউইন থেকে বেরিয়ে আধা মরুর মধ্যে বিশ মাইল না যেতে যেতেই ধুধু তেপান্তরের ওপর একটা ছোট ধুলোবালির ঘূর্ণিকে ছুটে যেতে দেখে বুঝেছি, জোঁকটা-ই সঙ্গে লেগে আছে এতদূর পর্যন্ত।

তবে এবার চালটা একটু বদলে পেছনে নয়, সামনেই আছে অপেক্ষা করে।

খানিক বাদে ধুলোবালির চলন্ত মেঘটা থিতিয়ে যাবার পর জোঁকের বাহনটাও দেখা গেছে। আমার মার্কিন জিপ, আর তার বিলেতি ল্যান্ডরোভার। কায়দা করে আগে থাকতে একটু এগিয়ে গিয়ে, আমার জন্য এই নির্জন তেপান্তরে সে যে অপেক্ষা করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার কাজ যা জরুরি আর গোপন তাতে তাকে আর-একবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাই উচিত ছিল। কিন্তু এবারে আমার চালও আমি বদলালাম।

সোজা জিপটা ফুলস্পিডে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তার রোভারটায় দিলাম ধাক্কা।

কাছাকাছি যাবার পর আমার একবগ্‌গা খ্যাপার মতো চালাবার ধরনে মতলবটা বুঝে ফেলে রোভারটায় স্টার্ট দিয়ে সে যতদূর সম্ভব ধাক্কাটা বাঁচাবার চেষ্টা অবশ্য করেছিল। কিন্তু তখন একটু দেরি হয়ে গেছে। সাংঘাতিক দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলেও দুটো গাড়িই জখম হল বেশ। ল্যান্ডরোভারটাই বেশি।

রোভার-এর ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে যে আমার দিকে এবার দাঁত কিড়মিড়িয়ে ছুটে এল, সে মানুষ না অকারণে-খুঁচিয়ে-খ্যাপানো খাঁচা-ভাঙা একটা মানুষখেকো বাঘ তা বলা শক্ত।

আমি তখন জিপের ড্রাইভিং হুইলটায় হাত রেখে মুগ্ধ চোখে মরু-প্রান্তরের দৃশ্য দেখতে যেন তন্ময়।

'আয়! নেমে আয় কালা নেংটি!'

কানের পাশেই বজ্রগর্জন শুনে একটু যেন অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বললাম, 'আমায় কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোকেই বলছি, শুঁটকো মর্কট! ইষ্টনাম যদি কিছু থাকে তো জপ করে নিয়ে নেমে আয় চটপট! আমার পিছু নেওয়ার মজা আজ তোকে বোঝাচ্ছি!'

জোঁকটা বলে কী! আমি তার পিছু নিয়েছি! একটু হেসে বললাম, 'এ রকম শিক্ষা পাওয়া তো আমার সৌভাগ্য, কিন্তু কার পিছু নিয়ে সৌভাগ্যটা হল একটু যদি জানতে

পারতাম!'

'কার পিছু নিয়েছিস তা তুই জানিস না? বিচ্ছু শয়তান!' খ্যাপা বাঘ যেন তখুনি আমায় কামড়ে ছিঁড়ে খাবে, 'সেই নিউইয়র্ক থেকে কিছু না জেনে তুই এঁটুলির মতো সঙ্গে লেগে আছিস! না যদি জেনে থাকিস তো এই অন্তিমকালে জেনে নে। তোর সাক্ষাৎ শমনের নাম হল ক্যাপ্টেন ডোনাট। আজ তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যই এখানে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু তুই এসে যখন বিনা কারণে ধাক্কা দিয়েছিস তখন তোর নিয়তিই তোকে আজ ডেকেছে। নেমে আয় এখুনি, চিমসে চামচিকে, আজ তোকে নিংড়ে এই খাঁ খাঁ বালির তেষ্টা যেটুকু পারি মিটিয়ে যাব।'

'তা পারবেন কি!' আমি যেন দরদ জানিয়ে বললাম, 'অত লম্বা মুখসাপাটি করলে রাগের আঁচই যে পড়ে যায়!'

'কী!' গর্জন করে উঠলেন আবার জোঁক মশাই ক্যাপ্টেন ডোনাট। গর্জনটা একটু তবু ফাঁকা!

'না, বলছিলাম, প্রতিজ্ঞা রাখবার পর আপনার একটু অসুবিধে হবে বোধহয়। গাড়িটা তো আপনার অচল হয়ে গেছে। যাবেন কী করে?'

ধাক্কা-দিয়ে-ভাঙা গাড়িটার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে ক্যাপ্টেন ডোনাট উথলে-ওঠা শোকে সত্যিই নতুন করে খেপে উঠলেন। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে লাফ দিয়ে উঠে আমার হাত ধরে দিলেন এক প্রচণ্ড হেঁচকা টান।

সে টানে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে গিয়ে পড়লাম ঠিকই, কিন্তু ক্যাপ্টেন ডোনাট তখন আরও অনেক দূরে মরুর বালিতে উবুড় হয়ে যেন দণ্ডি কাটছেন।

কাছে গিয়ে একটার বেশি ধোবির পাট দেবার দরকার হল না। তারপর তাঁর ল্যান্ড-রোভারের গায়েই হেলান দিয়ে বসিয়ে জামার কলারটা ধরে বললাম, 'এবার বলুন তো, জোঁক মহাশয়, সেই নিউইয়র্ক থেকে আমার পেছনে কেন লেগে আছেন? কে-ই বা পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'আমি লেগে আছি আপনার পেছনে?' ক্যাপ্টেন ডোনাটের গলায় হতভম্ব একটা আন্তরিক সুরই যেন পাওয়া গেল, 'না, যার জন্য আমার এই হয়রানির টহল, সেই দাসের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর চরগিরি করবার জন্য আপনি গোড়া থেকে আমার পিছু নিয়েছেন? দাস যে এ পর্যন্ত আমায় দেখা দেননি, বুঝতে পারছি সে শুধু আপনার বাগড়ার জন্যই।'

এবার হতভম্ব হওয়ার পালা আমার। প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলছেন?'

'কার সঙ্গে যেন আপনি জানেন না?' ক্যাপ্টেন ডোনাট এই অবস্থাতেও এবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'দাসের সঙ্গে, জি দাস!'

'জি দাস-কে আপনি চেনেন? দেখেছেন কখনও?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন ডোনাটের দিকে তাকালাম।

'দেখিনি কখনও।' ক্যাপ্টেন ডোনাট একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তবে তাঁর

কীর্তি-কলাপ অনেক শুনেছি। পৃথিবীর এক আশ্চর্য মানুষ!"

শিশির ধমকাল গোরাকে, গোরা আমাকে, আমি শিবুকে, শিবু আবার শিশিরকে।

তা হঠাৎ ওরকম ছোঁয়াচে কাশির প্রাদুর্ভাবে পরস্পরকে ধমকাতেই হয়।

কাশি থামলে ঘনাদা কিন্তু নির্বিকারভাবেই আবার শুরু করলেন।

"ক্যাপ্টেন ডোনাটকে কড়া গলাতেই এবার জিজ্ঞাসা করতে হল, 'দাসের সঙ্গে দেখা হলে কী করতেন?'

'তা আপনাকে বলব কেন?' ভাঙলেও ক্যাপ্টেন ডোনাট মচকাতে রাজি নয়।

হেসে এবার বললাম, 'যদি বলি—এক ফোঁটা জল, তবুও কি আমায় বলবেন না?'

'দাস! আপনিই তা হলে দাস?' আমার মুখে কোডওয়ার্ড শুনে ক্যাপ্টেন ডোনাট যেমন উচ্ছ্বসিত তেমনই লজ্জিত হয়ে উঠলেন, 'ছি, ছি, কী ভুলই করেছি!'

এরপর আর বেশি কিছু বলবার নেই। যে ধান্ধায় বেরিয়েছিলাম আরেক তরফের পাঠানো ক্যাপ্টেন ডোনাটের কাছে তার আরও নতুন হদিস পেয়ে শেষ পর্যন্ত এক ফোঁটা জল মানে টল সত্যিই খুঁজে বার করলাম মধ্য অস্ট্রেলিয়ার বাঁজা পাহাড় ম্যাকডোনেল রেঞ্জের একটা চোরা উপত্যকায়। জলের ফোঁটাই পেলাম, কিন্তু আসল পাপী তখন পালিয়েছে। জলের ফোঁটা টল যা পেয়েছিলাম তার উপযুক্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও শান্তি তো নেই। ফেরারি সেই পাপী আর কোথাও লুকিয়ে একটি ফোঁটা টল-ও যদি জমিয়ে ফেলে, পৃথিবীর তা হলে কী সর্বনাশ যে হতে পারে কেউ জানে না।"

"এক ফোঁটা জল, থুড়ি আপনার ওই টল-এ পৃথিবীর একেবারে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে! কী সর্বনাশ?" আমরা রীতিমত সন্দিগ্ধ।

"কী সর্বনাশ বুঝতে গেলে টল বস্তুটা কী তা বুঝতে হবে।" ঘনাদা আমাদের প্রতি করুণা করে একটু বিস্তারিত হলেন, "টল আমাদের জলেরই জাতভাই, তবে জলের চেয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ ভারী আর দশ গুণ আঠালো। রাসায়নিক ফরমুলা তার H2 O-ই বটে, কিন্তু তার অণুগুলি এমন লম্বা শেকল বাঁধা যে তার চেহারা-চরিত্র একটু তরল গোছের আঠালো রবারের মতো। বৈজ্ঞানিকদের অনেকেরই ভয় যে, কোনওরকমে মেশামেশির সুযোগ থাকলে আমাদের সব সাধারণ জল ওই ছোঁয়াচ লেগে টল হয়ে উঠে পৃথিবীকে শুক্রগ্রহের মতো এমন অসহ্য গরম করে তুলবে যে তাতে প্রাণের অস্তিত্বই হবে অসম্ভব। টল সম্বন্ধে এত ভাবনা তাই। এ-জল প্রথম তৈরি করেন দুজন রুশ বৈজ্ঞানিক। সেই ১৯৬১-তে। তারপর এতদিন বাদে অস্ট্রেলিয়ার দুজন বৈজ্ঞানিক হঠাৎ ঘটনাচক্রে এ-জল তৈরি করে ফেলেছেন। এঁদের কাছ থেকে নয়, ভয় পাছে উটকো কোনও বৈজ্ঞানিক হঠাৎ এ-জলের ফোঁটা জমিয়ে ফেলে সারা দুনিয়াকে ব্ল্যাকমেল করে। সে-বিপদের জন্য সজাগ পাহারায় তাই থাকতেই হয়।"

দিঘা কি দার্জিলিঙ কোথাও যে যাওয়া হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবী বাঁচাবার দায় নেবার অনুরোধ টেলিগ্রামে যে-কোনও মুহূর্তে যাঁর কাছে আসতে পারে তাঁকে সামান্য শখের বেড়ানোর কথা কি বলা যায়!

নাচ

রবিবারের দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের ওপর থেকে নীচের ঘর ক-টিতেও এখন সবাইকার একটু গড়িয়ে নেবার সময়।

রবিবারের দুপুরের খ্যাঁটটা নেহাত মন্দ হয়নি। অন্তত অ্যাকিউট অ্যাঙ্গল-এ শুরু করে একেবারে পুরো অবটিউস না হোক, রাইট অ্যাঙ্গল-এ শেষ করতে হয়েছে সবাইকে।

এরপর, এই থেকে-থেকে দমকা বৃষ্টির দিনে একটু গা-হাত-পা ছড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আর কী করা যেতে পারে!

এমন একটা মধুর ঘুমের আমেজের সময় নীচে ওই বেয়াড়া কড়া নাড়া কীসের? একটা সাইকেলের বেলের আওয়াজও যেন পাওয়া গেছে তার আগে।

টেলিগ্রাম নাকি! গৌরই প্রথম উঠে বসল।

টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম আবার কার আসবে?

না, সাইকেলের বেল নয়, নীচে কড়া-ই নাড়ছে কেউ। সুতরাং টেলিগ্রাম বোধহয় নয়। কী তাহলে?

বারান্দায় গিয়ে রেলিং-এর ধার থেকে উঁকি দেবার আগেই হাঁকটাও শোনা গেল, "রেজেস্টিরি আছে, বাবু!"

রেজেস্টিরি মানে রেজেস্ট্রি চিঠি! কার নামে আবার রেজেস্ট্রি চিঠি এল?

পিয়নকে ওপরে ডাকলেই হয়, কিন্তু তার তর সইল না। বাহাত্তর নম্বরে রেজেস্ট্রি করা চিঠি আসা প্রায় একটা আজব ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং কার নামে এল জানবার আগ্রহে হুড়মুড় করে সবাই নীচে নেমে গেলাম।

রেজেস্ট্রি নয় ঠিক, পিয়ন-বই দিয়ে পাঠানো চিঠি। গুরুত্ব বোঝাতে পিয়ন রেজিস্টিরি বলেছে। তা রেজেস্ট্রির চেয়ে পিয়ন দিয়ে পাঠানো চিঠি তো বাহাত্তর নম্বরের পক্ষে আরও তাজ্জব ব্যাপার! ব্যস্ত হয়ে তাই চিঠিটা কার জানতে চাইলাম।

"কার? কার নামে চিঠি?"

"গানোসাবাবু!" পিয়ন বেশ একটু দ্বিধাভরে জানাল।

"গানোসাবাবু? গানোসাবাবুর চিঠি এখানে কী জন্য?"

আমরা একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করতেই পিয়ন থতমত খেয়ে বললে, "নেহি নেহি, সির্ফ গানোসাবাবু নেহি, গানোসা মাডোস বাবু।"

আমাদের, না পিয়নের, কার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে? বেছে বেছে আমাদের

এই বাহাত্তর নম্বরেই কি যত উদ্ভুট্টে কাণ্ড ঘটে!

“কী বলছ কী?” একটু ধমক দিয়েই বললাম, “মাডোসবাবু-টাবু এখানে কেউ নেই। কোথাকার কার চিঠি এখানে এনে হাজির করেছ?”

“লেকিন ঠিকানা তো হিঁয়েকে লিখা হ্যায়!”—পিয়ন তার ভুল স্বীকার করতে রাজি নয়,—“দেখিয়ে না!”

লেফাফাটা হাতে করে দেখলাম।

পিয়ন ঠিক কথা বলেছে। ঠিকানায় কোনও ভুল নেই। একেবারে স্পষ্ট বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন।

গৌরটা সব কিছুতেই হড়বড়ে। হঠাৎ পিয়নের হাত থেকে তার খাতাটা নিয়ে পকেট থেকে কলম বার করে খস খস করে সই করতে লেগে গেল।

“আরে! আরে! করছিস কী!” আমরা সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলাম, “কার না কার চিঠি সই করে নিচ্ছিস?”

কিন্তু ততক্ষণে সই হয়ে গেছে। গৌর চিঠিটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে অম্লান বদনে পকেটে ফেলে ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বললে, “ঠিকানা যখন ঠিক আছে তখন ও নামের গোলমালে কিছু আসে-যায় না। ও আমাদেরই কারও হবে।”

এরপর আর আপত্তি কে করবে! একমাত্র যে করতে পারত সেই পিয়ন বাহাদুর ঝামেলা মিটে যাবার জন্যই বোধহয় খুশি মনে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে তখন রওনা দিয়েছে।

গৌরের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে কিন্তু থামতে হল।

“কী ব্যাপার হে! নীচে হঠাৎ গুলতানি কেন এমন সময়ে?”

কাণ্ডটা একটু বেমক্কাই হয়ে গেছে। জবাব দেবার খুব উৎসাহ বোধহয় কারও ছিল না তাই। কিন্তু এ গলা অমান্য করবে কার ঘাড়ে এমন ক-টা মাথা!

স্বয়ং ঘনাদা তাঁর টঙের ঘরের ছাদের ফালি থেকে হাঁক দিয়েছেন।

“আজ্ঞে, গুলতানি কিছু না।” এ ব্যাপারের নাটের গুরু বলে গৌরই আমাদের হয়ে দায়টা সামলাল, “একটা রেজেস্ট্রি চিঠি এসেছে।”

এরপর সবাই একেবারে একসঙ্গে কেটে পড়া। আড্ডাঘরে যেতে গেলে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় টঙের ছাদে পাহারায় খাড়া ঘনাদার নজর এড়ানো যায় না। সবাই তাই গুটি গুটি সিঁড়ির সামনেকার শিশির-গৌরের কামরাতেই গিয়ে ঢুকেছি প্রায় পা টিপে টিপে।

ঘনাদা আর যাই করুন, এ-ঘরে টুঁ দিতে এসে নিজের মাথা কাটা যেতে দেবেন না।

ঘনাদাকে এড়িয়ে থাকার এত গরজ, কিন্তু কেন?

গরজ এই কারণে যে, মনে মনে সকলেরই একটা সন্দেহ তখন বেশ জোরে খোঁচা দিতে শুরু করেছে।

সন্দেহটা যে মিথ্যে নয় ঘরের ভেতর গিয়ে চিঠির খামটা খুলে ফেলার পরই টের

পাওয়া গেল।

আমরা নেহাত আহাম্মক, তাই গোড়াতেই বুঝতে না পেরে অমন একটি দারুণ অপকর্ম করে ফেলেছি।

গানোসা মাডোস যে আসলে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনশ্যাম দাস এইটুকু আমাদের কারও মাথায় এল না? এ তো সেই 'হরে কর কমবা জিওবা রুদে রকার খানা'র আরেক উদাহরণ। গানো সাম ডোস টাইপ করার দোষে হয়ে গেছে গানোসা মাডোস। আর আমরা ওই গানোসা মাডোস-এর ধোঁকায় পড়ে স্বয়ং ঘনাদার চিঠিই হাতিয়ে বসে আছি!

সব দোষ অবশ্য গৌরের। 'গানোসা মাডোস'-এর মানে না হয় বুঝিসনি, কিন্তু অমন হড়বড়িয়ে শুধু ঠিকানার জোরেই অন্যের নামের চিঠি সই করে নেবার কী দরকার ছিল? আর নিয়েছিলি নিয়েছিলি, সেটা সাত তাড়াতাড়ি খুলতে গেলি কী বলে?

চিঠিটা না খুললে তবু ঘনাদার হয়ে যেন সই করে নিয়েছি বলে তাঁর হাতে দেওয়া যেত। এখন কোন মুখে তাঁর কাছে যাব এ খোলা চিঠি নিয়ে?

কিন্তু গানো সাম ডোস বলে হঠাৎ এ চিঠি ঘনাদাকে লিখলই বা কে? লিখেছেই বা কী?

খোলাই যখন হয়েছে তখন চিঠিটা আর না পড়ে পারা যায়?

নিজেদের বিবেককে একটা করে কড়া ধমক শুধু দিলাম—পরের ভাঁড় যদি ভুলে ভেঙেই থাকি, তার রস দু-ফোঁটা গলায় গেলে কসুর কি আর বাড়বে!

কিন্তু চিঠি দেখে তো চক্ষুস্থির। এমন আজগুবি চিঠি ঘনাদাকে পাঠাবার মানে কী! তাও আবার পিয়ন-বই মারফত!

চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। আসলে চিঠিই তাকে বলা যায় না। ওপরে শুধু 'ডিয়ার ডস' বলে সম্বোধন। তার নীচে আবোল-তাবোল একটা যেন নকশা কেটে তার পাশে সংকেত চিহ্নের মতো 'নাইন এ এম' অর্থাৎ, সকাল ন-টা আর পরের রবিবার চ্যালেঞ্জ লেখা। সব শেষে সই হল Ah ar! চিঠিটা সবসুদ্ধ এই—

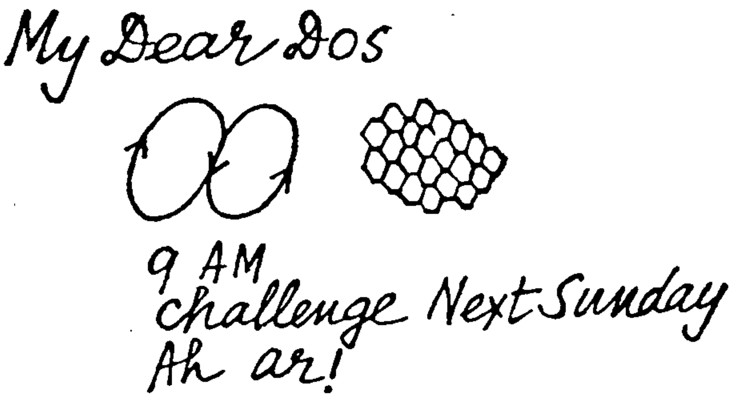

এ নির্ঘাত কোনও পাগলের কাণ্ড ভাবতে পারতাম, কিন্তু ঘনশ্যাম দাসকে গানো সাম ডোস শুধু নয়, গানোসা মাডোস করে লেখায় আমাদের বাহাত্তর নম্বর সম্বন্ধে একটু-আধটু ওয়াকিবহাল কারও যেন কারসাজি এ চিঠির পেছনে আছে বলে সন্দেহ হল। বিশেষ করে এই চ্যালেঞ্জ কথাটায় একটা বেয়াড়া ইশারা যেন লুকিয়ে আছে।

কিন্তু কেন, কীসেরই বা এ আজগুবি চ্যালেঞ্জ! এমন চ্যালেঞ্জ করেছেই বা কে?

সই করা নাম তো দেখা গেল Ah ar!

এ আবার কী রকম নাম? নামের ধাঁধা নাকি? ওই 'আহ্ আর'-এর ভেতরেই নামের হদিস দেওয়া আছে?

আকাশ-পাতাল ভেবে তো সে হদিস পেলাম না। সবাই এবার চেপে ধরলুম শিবুকে। রোজ তো সে কাগজ পেন্সিল ডিকশনারি নিয়ে ক্রসওয়ার্ড পাজল অর্থাৎ শব্দ চৌকি নিয়ে বসে, এই 'আহ্-আর'-এর মানেটা আর বার করতে পারবে না!

পারবে নিশ্চয়। কাগজ পেন্সিল আর গোটা তিনেক ডিকশনারি সাজিয়ে নিয়ে শিবু যে-রকম তন্ময় হয়ে বসে মাথার চুলগুলো আঙুলে জড়িয়ে টানতে শুরু করল, তাতে মাস দুয়েকের মধ্যে উত্তরটা সে যে ঠিক বার করে ফেলবে এ আশা অনায়াসে করা যেতে পারে। অবশ্য ততদিন তার মাথায় টানবার মতো চুল যদি কিছু বাকি থাকে!

শিবু নয়, ধাঁধার ভেদ করল হঠাৎ শিশির।

পেন্সিল চোষা আর চুল টানার ঘটা দেখে শিবুকে তখন আমরা তাড়া লাগাচ্ছিলাম। "কী রে, এখনও হল না?"

শিবু তাতে প্রায় অক্ষর-তত্ত্ব নিয়ে একটা বক্তৃতাই শুরু করে ফেলেছিল, "এক-একটা অক্ষরের কী গভীর মানে আর কী লম্বা ইতিহাস তা জানিস? এই A অক্ষরটাই ধর না। রোম্যান হরফটা এসেছে গ্রিক থেকে, গ্রিকরা নিয়েছে সেই আদি ফিনিসীয়দের আলেফ গোছের উচ্চারণের অক্ষর থেকে! সে অক্ষর ঠিক আরবি আলেফ নয়। ফিনিসিয়ানদের স্বরবর্ণ ছিল না, সব ব্যঞ্জন। গ্রিকরা তাকে স্বরবর্ণ বানিয়ে নাম দিয়েছে আলফা—"

এতদূর পর্যন্ত কোনও রকমে বরদাস্ত করেছি। থান ইট আর কোথায় পাব! হাতের কাছে একটা ডিকশনারিই তুলে শাসাতে হয়েছে। তাতে আমাদের মতো বর্বরদের প্রতি প্রায় ঘনাদার মতোই করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে শিবু বলেছে, "তাই বলছিলাম প্রত্যেকটি অক্ষরের হিসেব কষে এ ধাঁধার উত্তর বার করা অত সোজা নয়।"

"সোজা না হলে উলটোটাই হোক!" নেহাত সস্তা কথার প্যাঁচ কষে শিশির হঠাৎ নিজেই চমকে উঠেছে! "আরে! উলটো করলেই তো জবাব!"

"কী রকম?" আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

"Ah ar-কে উলটে পড়ো", শিশির সোৎসাহে বলেছে, "কী হয়—Raha তো?"

রাহা! আমাদের সেই রাহা! শিবুর মাসতুতো ভাই?

আমাদের বেয়াদবির শাস্তি দিতে ঘনাদা যাকে বোদ্রুমের কাসিম সাজিয়ে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন মহাশূন্যের ঢিল আমদানি করে?

আমাদের মুখগুলো হাই-পাওয়ার বালব-এর মতো জ্বলে উঠেই কিন্তু ফিউজ হয়ে গেল যেন হঠাৎ।

রাহা, সেই রাহা আমাদের কাছে দেওয়া কথা শেষ পর্যন্ত রেখেছে! কাজ যা করেছে তা জব্বর! ওই খুদে চিঠিতে মোক্ষম একটি যা ছেড়েছে তা চেহারায় ধানী পটকা, কিন্তু বহরে মেগাটন বোমা।

এই কথা-ই সে আমাদের দিয়েছিল। ঘনাদার কাছে সেদিনকার সেই নাজেহাল হওয়া সে ভোলেনি। বলেছিল, ঘনাদাকে সর্ষে ফুল দেখাবার মতো সে-নাকালের শোধ সে নেবেই পরের বার কলকাতায় ফিরে।

কথা সে রেখেছে। কিন্তু আনন্দে ধেই নৃত্য করার বদলে আমরা যে চোখে অন্ধকার দেখছি!

কেন, কী হল, বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে বৈশাখের খাঁ খাঁ রোদে-পোড়া, ফুটি-ফাটা মাঠের জন্য চাওয়া বৃষ্টি অঘ্রানের পাকা ধানের খেত ভাসালে যা হয়, হয়েছে তা-ই। মৌকা মতো পেলে যা দিয়ে বাজি মাত করা যেত তাই আমাদের সব পাকা ঘুঁটি এমন কাঁচিয়ে দিতে বসেছে।

ঘনাদার সঙ্গে আমাদের যে আপাতত অটুট সন্ধি চলেছে।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে এখন সুবর্ণ শান্তির যুগ।

মধুর এই সম্পর্ক এক ফোঁটা সন্দেহের ছোঁয়াচেই যে বিষিয়ে উঠবে! ঘনাদা আর আমাদের ক্ষমা করবেন? তিনি তো ধরেই নেবেন এটা আমাদের বেশরম বেইমানি। মখমলের দস্তানার মধ্যে আমরা যেন বিষের ছুরি লুকিয়ে চালিয়েছি। মার্কিন চর যেন আঁতাতের সুযোগ নিয়ে ক্রেমলিন উড়িয়ে দেবার ফন্দি করেছে। কিংবা রুশ রাজদূত হোয়াইট হাউসের মেহমান হয়ে টাইম বোমা বসাবার তাল খুঁজছে।

না, আশা-ভরসা আর কিছু নেই। বাহাত্তর নম্বরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার। "আহ্ আর'-এর চিরকুট চিঠিটি প্রকাশ পেলেই কালাপানিতে আবহাওয়ার নিম্নচাপ শুরু হয়ে যাবে, তারপর তুমুল তুফান।

অথচ আমাদের অবস্থা এখন এগুলে গর্দান, পেছুলে জান! ঘনাদাকে এ চিঠি দিলেই তো সর্বনাশ। আর জোর করে লুকোতে চাইলেও তাই। ঘুণাক্ষরে যখন জেনেছেন তখন আর কি এ চিঠি তাঁর হাতে তুলে না দিয়ে পার পাব!

তবু যদি আমাদের ভাগ্যে ভুলে গিয়ে থাকেন এই ক্ষীণ আশায় ভর করে বিকেলের আড্ডাঘরে গিয়ে ধুকধুকে বুক নিয়ে জমায়েত হলাম। যথাসময়ে ঘনাদার আবির্ভাব ও মৌরসি পাট্টার আসন গ্রহণ। শিশিরের সিগারেট নিবেদন, লাইটার প্রজ্বলন, ও ঘনাদার টাটানগরকে লজ্জা দেওয়া ধূম উদ্‌গীরণ।

তারপরই সেই অমোঘ বজ্রপাত।

"কার রেজিস্ট্রি চিঠি এল হে আজ দুপুরে?"

যতক্ষণ সম্ভব, ঠিক ঝোপে কোপ না পড়তে দিয়ে আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে বলা হল—"আজ্ঞে রেজেস্ট্রি নয়। পিয়ন-বই দিয়ে পাঠানো একটা চিঠি।"

"আমিও তো তাই ভাবি"—ঘনাদার মুখে যা ফুটে উঠল অন্য কারও বেলা

সেটাকে মুচকি হাসি বলা হত—"রবিবারে রেজেস্ট্রি চিঠি পাঠাচ্ছে, আমাদের ডাক বিভাগের এত কাজের আঠা কবে থেকে হল।"

ঘনাদা থামলেন। সিগারেটে আর-একটা টান পড়ল। ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট বাঁচিয়ে লাইন পালটাল কি?

বৃথা আশা। একমুখ ধোঁয়ার সঙ্গেই মারাত্মক প্রশ্নটা বেরিয়ে এল, "চিঠিটা কার তা তো বললে না!"

ঘরে যেন ভ্যাকুয়াম। আমরা সব বোবা কাঠের পুতুল। কারও নিশ্বাস পড়ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতেই হল।

"আজ্ঞে, আপনারই চিঠি!" গৌরই পকেট থেকে চিঠিটা প্রায় আড়ষ্ট হাতে বার করে ঘনাদার সামনের টেবিলে ধরে দিয়ে একটু সাফাই গাইবার চেষ্টা করলে, "আজেবাজে কার বাঁদরামি বলে এ-চিঠি দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।"

গৌরের সাফাইটা ধবধবে সাদার বদলে আমাদের কাছেই ম্যাড়মেড়ে পাঁশুটে ঠেকল।

"আমারই চিঠি!" ভুরু দুটো একটু বেশি রকম কুঁচকে ঘনাদা তখন পকেট থেকে বার করে চশমা জোড়া চোখে লাগিয়ে ফেলেছেন।

টেবিল থেকে চিঠিটা তিনি তুলে নিলেন, আমাদেরও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। চোখের পাতা পর্যন্ত না ফেলে আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। বিস্ফোরণ তো হবেই, কিন্তু সেটা কোন মাপের? চীন কি ফ্রান্সের, না রুশ বা মার্কিন বোমার? তার ফল-আউট, মানে তেজ-ঠাসা-ছাই বা ছড়াবে কতদূর?

প্রচণ্ড ধাক্কাটা একটু ভোঁতা করবার জন্য যতদূর সম্ভব পুরু নরম গদির ব্যবস্থা অবশ্য করে রেখেছি। বারান্দায় একটু আড়ালে ট্রের ওপর প্লেট সাজিয়ে বনোয়ারি এক পায়ে খাড়া আছে। এ-ঘরে ঘনাদার গলা এক পর্দা উঠতে না উঠতে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলে সবচেয়ে বড় প্লেটটা নামিয়ে দেবে। তাতে জোড়া চিংড়ির কাটলেট যেন হাসছে! সে হাসির মায়ায় ঘনাদার মেজাজের পারা কিছুটা কি আর নামবে না?

কিন্তু এ কী তাজ্জব ব্যাপার! জোড়া কাটলেটের আগে ঘনাদা-ই যে হাসছেন। প্রথমে মুচকে, তারপর বেশ একটু দন্ত বিকশিত করে।

"হতভাগা!"

হাসি মুখ থেকে বেরিয়েছে বলেই বাঁচোয়া। তবু চমকে উঠতে হল। কিন্তু এ স্নেহের ভর্ৎসনা কাকে? আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। না, আমাদের কারও সে ভাগ্য নয়। তাহলে এ কি রাহা-রই প্রাপ্য? রাহা-র সব চালাকি ধরে ফেলে তিনি তাকে চিনেও ফেলেছেন!

"হতভাগার চ্যালেঞ্জের সাধ এখনও মিটল না!" ঘনাদার মুখে প্রশ্রয় আর করুণার হাসি।

না, এ তো রাহা বলে মনে হচ্ছে না! কে তবে?

যে-ই হোক, ব্যাপারটা আমাদের কাছে তো হঠাৎ মরা নদীতে বান, বাঁজা ডাঙায় ধান, ভরাডুবি হতে হতে একেবারে মানিক-মুক্তোর চড়ায় ঠেকা।

বনোয়ারিটা এখনও করছে কী? তারই বা কী দোষ? ঘনাদার গলাও চড়েনি, সেও নড়েনি।

নিজে থেকেই সুতরাং ডাক দিয়ে আনাতে হয়। স্টাইলের একটু খুঁত থাকে বটে, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ হয় ঠিকই। টেবিলের ওপর প্লেটটা ঘনাদা যেন দেখেও না দেখতে পেয়ে শুরু করেন।

"বিছানা থেকেই হেলিকপ্টারটার আওয়াজ পেলাম। রোটর অর্থাৎ চরকি-পাখা চালিয়ে উঠতে শুরু করেছে। হেলিকপ্টার তো আর চুপি চুপি চালানো যায় না। গেলে তাই চালাত আহারা। তবে ভয় তার কিছু নেই। যেখানে আমায় বন্দি করে রেখে গেছে সেখান থেকে বার হওয়াই আমার পক্ষে অসম্ভব, তা আওয়াজ পাবার পর হেলিকপ্টার নামা-ওঠার মাঠ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ধরা!

ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুধু আওয়াজ শুনেই হেলিকপ্টারটা কতদূর উঠে কোন দিকে যাচ্ছে বোঝবার চেষ্টা করলাম—"

বোঝবার চেষ্টা করতে করতে ঘনাদার অন্যমনস্কভাবে একটা প্লেটে যেন ভুলে হাত পড়ে যায়। দেড়খানা কাটলেট সেখান থেকে উধাও হবার পর হেলিকপ্টারটা কোন দিকে গেছে বুঝে তিনি যেন তাঁর সেই বন্ধ করা ঘরেই ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেন, "যা বুঝলাম তাতে আশা করবার আর কিছু নেই।"

হতাশ হয়েই ঘনাদা একেবারে চুপ। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমরাও ব্যাকুল উদ্বিগ্ন।

শিবুই নিদানটা বার করে ফেলে বলে, "আরেকটা কাটলেট দেবে, ঘনাদা!"

"আরেকটা?"—ঘনাদা যেন বর্তমান মর্ত্যভূমিতে নেমে এসে প্লেটের দিকে প্রথম দৃষ্টি দেন—"তিন শত্তুর বলে না?"

একটা নয়, দুটো কাটলেট অগত্যা আনতে হয় বনোয়ারিকে। এরকম ইমারজেন্সির জন্য আমাদের অবশ্য মজুত করাই ছিল।

বাকি আড়াইখানা কাটলেট আর তার সঙ্গে দু পেয়ালা কফি শেষ করার আগে ঘনাদার হেলিকপ্টার চলে যাওয়ার হতাশা কাটে না।

বনোয়ারি প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাবার পর শিশিরের ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত টিন থেকে নিজেই একটি সিগারেট বার করে ধরিয়ে ঘনাদা তাঁর বন্দিদশায় ফিরে যাবার ফুরসত পান।

"নিজের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করলাম। অজানা ছোটখাটো দ্বীপের মতো একটা চর। তার চারিদিকে যোজনের পর যোজন বান-ভাসা নদীর অগাধ থই থই জল। মৈমনসিংহের হাওড়ের রাজসংস্করণের মতো সে বিশাল জলকে ঘিরে আবার সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এমন বিরাট দুর্ভেদ্য ভয়ংকর জঙ্গল যে, সভ্য মানুষের পা পড়া দূরে থাক, তার মাপজোখ পরিচয় মানচিত্রেও ওঠেনি এখনও।

এই চরের মাঝে একটা যেমন-তেমন করে কাদা-মাটিতে তোলা খুপরি গোছের জংলা আগাছায় ছাওয়া ঘরে মাথা আর পায়ের দিকে পোঁতা দুটো মোটা খুঁটিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমি পড়ে।

দেশটা হল দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, জায়গাটা তারই উত্তর-পুবের বেনি নদীর জলা বাদার অজানা অগম্য অঞ্চল—শুধু বলিভিয়ার নয়, ব্রেজিল-এরও গহন গভীর অরণ্য যাকে ঘিরে রেখেছে।

আহারা এই জায়গার মাঝখানে এমনই নিরুপায় অবস্থায় আমায় বেঁধে রেখে চলে গেল! নিরুপায় অবস্থায় বেঁধে রাখা নিয়ে কিছু বলবার নেই, কারণ শর্তটা তাই ছিল। কিন্তু তার চলে যাওয়াটা অবিশ্বাস্য শয়তানি। সে রকম কোনও কড়ারই ছিল না।

আহারার সঙ্গে মাত্র কিছুদিন আগে পরিচয় হয়েছে। যাচ্ছিলাম বলিভিয়ার আজব ট্রেনে সান্টাক্রুজ থেকে পুয়ের্তো সুয়ারেজ-এ। সে ট্রেন আমাদের হাওড়া-আমতা রেলওয়েরই নিকটজ্ঞাতি।

ইচ্ছে করলে বলিভিয়ার জাতীয় এয়ারলাইন লয়েড এইরিও বলিভিয়ানো-র প্লেনেও যেতে পারতাম। ভাড়া আমাদের দেশের হিসেবে শ-খানেক টাকা। কিন্তু তার চেয়ে এই লঝ্ঝড় রেলপথই পছন্দ করেছি দেশটা আর দেশের মানুষকে ভাল করে চেনার সুবিধের জন্য শুধু নয়, এই সস্তা মোট মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়ায় ঢিমে তালের ট্রেনের টহলেই দুরন্ত উত্তেজনার খোরাক অনেক বেশি মিলতে পারে বলে।

মিললও তাই। ট্রেনে আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী। থার্ড ক্লাস হল খোলা একটা ওয়াগন গোছের। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চাও তো নিজেই ওপরে কাপড় কি ক্যাম্বিস টাঙিয়ে ছাউনি করে নাও। আলো হাওয়ার অভাব নেই। প্রাণ ভরে দুধারের দৃশ্য দেখারও কোনও বাধা নেই। এর ওপর আর সামান্য কিছু দিলেই সেকেন্ড ক্লাসের বন্ধ বুক-চাপা একটা খুপরি কামরায় দুঃখভোগের চালিয়াতি দেখানো যেত, আর তার ওপর টাকা দশ দিলেই ফার্স্ট ক্লাসের কাঠের কামরায় স্রেফ কাঠের বেঞ্চির আরাম। সব দিক দিয়ে তাই থার্ড ক্লাসই সেরা বোধ হয়েছে, অবশ্য ফোর্থ ক্লাস বাদে। সেটার আবার টিকিটও লাগে না, একটু শুধু হুঁশিয়ার থাকতে হয় ঘুমের ঢুলুনিতে পড়ে না যাওয়ার জন্য। হাওড়া-আমতার খেলনা-ট্রেনে গাড়ির ছাদে এ ফোর্থ ক্লাসের নমুনা আমাদের দেখা আছে।

থার্ড ক্লাসে যাওয়া শুধু যে নিজে থেকেই বেছে নিয়েছিলাম তা বোধহয় নয়, তার পেছনে নিয়তির অলক্ষ্য হাত নিশ্চয় ছিল, ইগ্নাসিওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যই।

ইগ্নাসিও থার্ড নয়, ফোর্থ ক্লাসের যাত্রী, তবে তার জায়গা আমারই সামনের সেকেন্ড ক্লাস কামরার মাথায়। সেখান থেকে উঠতে নামতে দিনে অনেকবারই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কেমন একটা বোকা বোকা ভালমানুষ চেহারা। দেখা হলেই আমার দিকে চেয়ে হাঁদার মতো হাসে। যে দেশে ধলার চেয়ে আমার মতো কালাই বেশি সেখানে বিদেশি বলে চিনতে পারে বলে মনে হয় না। তবে আমার পোশাক-আশাক ঠিক থার্ড ক্লাসের সঙ্গে মিল খায় না বলেই বোধহয় একটু অভব্যের

মতো যখন-তখন তার ফোর্থ ক্লাসের উচ্চাসন থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

দু-দশ ঘণ্টার যাত্রা তো নয়, সান্টাক্রুজ থেকে পুয়ের্তো সুয়ারেজ চারশো মাইলের বেশি না হলেও এ ট্রেনে লাগে চার দিন। সেটাও টাইম টেবলের ছাপা সময়। আমাদের লেগেছিল পাক্কা পাঁচ দিন।

এই পাঁচ দিনের যাত্রায় ইগ্নাসিওর সঙ্গে দ্বিতীয় দিনেই আলাপ হয়ে গেল। আলাপ করলে সে নিজে থেকেই। হাঁদার মতো হাসতে হাসতে হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তুমি ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছ না কেন! আমার বন্ধু ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে।'

এই আলাপটুকুতেই ইগ্নাসিওর বুদ্ধির দৌড় বুঝে ফেলেছি। একেবারে হাঁদারাম যাকে বলে, কিন্তু ভারী সরল হাসিখুশি চেহারা। এরকম লোকের ওপর আপনা থেকে মায়া হয়।

হেসে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বন্ধু যাচ্ছে বলে আমি যাব কেন!'

'বাঃ!' অকাট্য যুক্তি দিলে ইগ্নাসিও, 'তোমার পোশাক যে আহারা-র মতো। থার্ড ক্লাসে কেউ এ-পোশাকে যায়!'

পোশাকের কথাটা চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বন্ধুর নাম তাহলে আহারা! তা বন্ধু হয়ে সে একা ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে কেন? তোমাকেও তো নিতে পারত!'

'কেমন করে নেবে?' ইগ্নাসিও বন্ধুর হয়ে ওকালতি করলে, 'আমার কাছে টিকিটের পয়সা নেই, তাই তো গাড়ির ছাদে যাচ্ছি।'

'কোথায়, যাচ্ছ কোথায়?' ইগ্নাসিওর বন্ধুর বিরুদ্ধে আর কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলাম।

'যাচ্ছি পুয়ের্তো সুয়ারেজ-এ।' গর্বভরে জানালে ইগ্নাসিও, 'সেখানে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে একটা পুরনো দলিল আছে। সেটা কিনে নিয়ে বন্ধু আমায় অনেক টাকা দেবে। তখন আমি জামাকাপড় কিনে বন্ধুর সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে ফিরব, জানো!'

'খুব ভাল কথা,' উৎসাহ প্রকাশ করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু দলিলটা কীসের?'

'কী-সব টিনের খনি-টনির', ইগ্নাসিও তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'ঠাকুরদাদার কোন ঠাকুরদাদার নাকি ছিল বলে গল্পই শুনেছি শুধু। এক দামড়িও কখনও পাইনি। হ্যাঁ, আমার নাম ইগ্নাসিও ব্যারোসো, তা জান? এই দেখো আমার কার্ড। আমার বয়স আঠারো।'

কার্ডটা সে আমার হাতে গুঁজেই দিল।

মাথা নেই মুণ্ডু নেই বেমক্কা এই নিজের পরিচয় দেওয়ার ঘটায় আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে কার্ডটা দেখলাম। ছেঁড়া ময়লা একটা ফিকে গোলাপি কার্ড। এই আইডেন্টিফিকেশন কার্ড না থাকলে বলিভিয়ায় কেউ চাকরি-বাকরি পায় না, ভোট দিতে পারে না, এমনকী বিয়ে পর্যন্ত আটকে থাকে। কার্ডটা দেখলাম সাত বছর আগেকার। তখনকার বয়স লেখা আছে আঠারো। তারপর থেকে ভদ্রলোকের এক-কথা।

এই ইগ্নাসিও ব্যারোসো। তার বন্ধু আহারার সঙ্গেও আলাপ হল সেই দিনই। নাম শুনে যেমন চেহারা দেখেও তেমনই ত াদি জাতের পরিচয়টা ঠিক বোঝা যায় না। বলিভিয়ায় নানা দেশের লোকের মধ্যে চিনা ও জাপানিরাও কয়েক পুরুষ বসত করে আসছে। আহারার চেহারায় চিনের ছাপই একটু যেন বেশি।

বেঁটে খাটো ইস্পাতের গোলার মতো চেহারা। ব্যবহারে অমায়িক ভদ্র শুধু নয়, বেশ একটু মিশুক। ইগ্নাসিওর কী দলিল কিনতে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে একটু চমকে ভুরু কোঁচকালে, তারপর হেসে বললে, 'ইগ্নাসিও এর মধ্যে সব বলেছে বুঝি! ছেলেটার পেটে কোনও কথা থাকে না। আমি না থাকলে কবে কোন ঠগবাজের হাতে পড়ত!'

'হ্যাঁ, আপনাকে তো ও বন্ধু বলে!' তারিফ জানিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কী যেন টিনের খনির দলিলের কথা বলছিল?'

'যার দলিল সে-খনি এতদিন আছে কিনা তারই ঠিক কী!' তাচ্ছিল্যভরে বললে আহারা, 'তবে পুরনো দলিল বলছে, তাই একবার দেখে ওকে কিছু দাম ধরে দেব বলেছি।'

আহারা খুব সরল আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছিল। মানুষটার ওপর একটু বিশ্বাসই জন্মেছে তাতে। সে বিশ্বাস একটু চিড় খেয়েছে তার পরদিন।

যেমন লঝঝড় লাইন তেমনি ফঙ্গবেনে ইঞ্জিন। পরের দিন ঘোর এক জঙ্গলের মাঝে ট্রেনটা হঠাৎ মাঝ রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ ভয়াবহ অবস্থা। এদিকে ওদিকে একশো মাইলের মধ্যে কোনও স্টেশন তো নেই, কোনও বসতিও না। ওই রেল লাইনটুকুই শুধু ভরসা। ট্রেন অচল হলে যাকে বলে একেবারে অকূল পাথারে, লাইন ধরে হাঁটা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

সেই আলোচনাই করছিলাম। এমন সময় আহারা হঠাৎ একটু যেন উপহাসের সুরেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'ধরুন এ লাইনটাও যদি না থাকত, এ অজানা জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিলে বার হতে পারতেন?'

আহারা-র আসল মতলব তখনও সত্যিই বুঝিনি। হেসে বলেছি, 'তা বাজি রাখলে পারতাম বোধহয়।'

'বেশ! রাখলাম বাজি!' আহারা নিজের বাঁ হাতটা চিত করে তাতে একটা চাপড় দিয়েছে।

'কিন্তু আমি রাখছি না।' আমি একটু অবাক আর বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'খামোকা ওরকম বাজি রাখতে যাব কেন?'

'মুখ দিয়ে যখন উচ্চারণ করেছেন বাজি আপনাকে রাখতেই হবে!' আহারা জুলুমবাজের মতো বলেছে।

'না, রাখব না।' আমি সত্যি চটে গিয়ে শক্ত হয়ে মাথা নেড়েছি।

'কথা দিয়ে বাজি না রাখলে আমরা কী করি, জানেন?' মুখে হাসি আর গলায় হিংস্র শাসানি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে আহারা।

'কী?'

'এই!' বলে আহারা হঠাৎ এসে আমায় ধরেছে আর দুটো ডিগবাজি খেয়ে আমি সাত হাত দূরে ছিটকে চিৎপাত হয়ে পড়েছি।

আহারা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এবার বলেছে, 'এর নাম জুদো! কেমন, বাজি এবার রাখবেন?'

নাঃ, লোকটার যেন বড় বেশি গরজ! ব্যাপারটা তাই তলিয়ে দেখা উচিত মনে হয়েছে।

যেন ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ককিয়ে বলেছি, 'আর বাজি না রেখে পারি! হাড়গোড়গুলো তাহলে যে আর খুঁজে পাব না।'

'এই তো মরদের মতো কথা।' আহারা আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ধনুক করে দিয়ে বলেছে, 'পুয়ের্তো সুয়ারেজ-এ পৌঁছেই আমি আপনাকে আমার হেলিকপ্টারে এক জায়গায় নিয়ে যাব, সেখানেই পরীক্ষা হবে।'

যে কথা সেই কাজ। পুয়ের্তো সুয়ারেজ-এ পৌঁছে ইগ্নাসিওর ভিটেবাড়ির পুরনো দলিলটা একবার দেখতে পর্যন্ত না দিয়ে আহারা আমায় নিয়ে তার হেলিকপ্টারে রওনা হয়েছে। ইগ্নাসিওকে বলে দিয়েছে তার দলিল নিয়ে সে যেন সুয়ারেজ-এ অপেক্ষা করে।

আমার সঙ্গে কড়ার যা হয়েছে তা এই—আমায় অজানা এক জঙ্গলের মাঝে নামিয়ে হাত-পা বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রেখে সে হেলিকপ্টার নিয়ে কাছেই এক জায়গায় সাতদিন অপেক্ষা করবে। সাতদিনের মধ্যে আমি যদি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে কাছের বড় জনপদে পৌঁছোতে পারি তাহলে আমার জিৎ। জিতি বা হারি হেলিকপ্টার নিয়ে সে আমার ওপর নজর রাখবে ও শেষ পর্যন্ত আমায় তুলে নিয়ে ফিরে যাবে।

আহারা তার বদলে গোড়াতেই বেইমানি করেছে। কেন যে করেছে তা তখন জানতে আমার বাকি নেই। অতিরিক্ত উৎসাহে হাত-পায়ের বাঁধন তাই খুলতে আমার দেরি হয়নি।

কিন্তু তারপর? হেলিকপ্টারে নামবার সময় ওপর থেকে জায়গাটার একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শূন্য থেকে দেখা ছবি মাটির ওপর অনেক সময়ে ভুল হদিসই দেয়। এ চরম নির্বাসন থেকে মুক্তি পাব কেমন করে?

মুক্তির উপায় হল একেবারে আশাতীতভাবে। হতাশ হয়ে দ্বীপের মতো চরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ক-টা মৌচাকের সন্ধান পেয়ে গেছি। খিদের জ্বালায় তারই একটা খুঁচিয়ে ভাঙতে গিয়ে ভাঙা আর হয়নি। তার বদলে পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বার করে নকশা কাটতে শুরু করেছি পাগলের মতো।

কী ভাগ্যি, নোটবই আর পেনসিলটা পকেটে ছিল। ঘণ্টা কয়েক ধৈর্য ধরে গোটা দুয়েক নকশা একেবারে নিখুঁত করে এঁকে ফেলেছি।"

"খিদের কথা ভুলে আপনি নকশা আঁকলেন?" আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কী সে নকশা?"

"ওই তোমাদের পিয়ন-বই-এ পাঠানো চিঠির মতোই!" ঘনাদা হেসে বললেন,

"তবে একটু আলাদা।"

ঘনাদা আমাদের হাতের চিঠিটাই টেনে নেন। তারপর শিশিরের কলমটা চেয়ে নিয়ে দুটো এই রকম নকশা

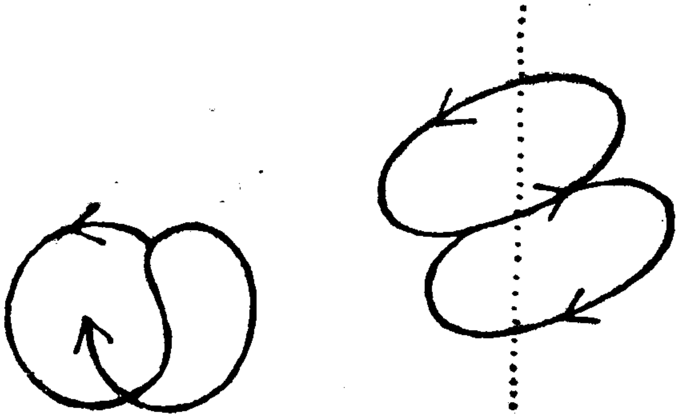

ঘন ঘন করে এঁকেই ফেলে দেন আমাদের সামনে।

"এ নকশায় হল কী?" আমাদের গলা প্রায় ধরা।

"হল আর কী!" ঘনাদা যেন উদাসীন, "সাত দিনের জায়গায় দুদিনে সে নির্বাসনের চর থেকে বেরিয়ে মাদ্রে দে দিয়স আর বেনি নদী যেখানে মিলেছে সেখানকার মোরেনো শহরে পৌঁছে সেখান থেকে সরকারি প্লেনে পরের দিনই পুয়ের্তো সুয়ারেজ পৌঁছে গেলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। শহর থেকে ইগ্নাসিওর বাড়ি গিয়ে দেখি, আহারা তাকে নিয়ে তার হেলিকপ্টারে সান্টাক্রুজ রওনা হবার জন্য প্রায় তৈরি।

আমায় দেখেই যেমন তাজ্জব তেমনই খাপ্পা।

'আপনি! আপনি তাহলে বার হতে পেরেছেন? তা এখানে এসেছেন কেন?' আহারার গলার আওয়াজে দাঁতের ঘর্ষণের শব্দ মেশানো।

'এখানে আসতে হল বাজির টাকাটা নিতে!' মোলায়েম করে বললাম।

'টাকার কথা কিছু হয়নি,' কথাগুলো আহারা প্রায় যেন গুলির মতো ছুড়ে মেরে হেলিকপ্টারটা চালাতে গেল।

'টাকার কথা না হয়ে থাকলে, আরও ভাল!' আমি আহারাকে ধরে ফেলে হাসি মুখে বললাম, 'বাজি জিতে একটা অন্য কিছু লাভ তো হওয়া চাই। টাকার বদলে ইগ্নাসিওর দলিলটা দেখলেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'তাহলেই সন্তুষ্ট হবি! জুদোর শিক্ষাটা বড় তাড়াতাড়ি ভুলে গেছিস মনে হচ্ছে!' আহারা জুদোর কড়া প্যাঁচ কষল।

গজ দশেক দূর থেকে যত্ন করে তুলে থুবড়ে-পড়া মুখের ধুলোমাটি রুমাল বার করে ঝেড়ে দিতে দিতে বললাম, 'এর নাম কারাটে। জুদোর বাবা বলে জাপানে।

এখন ইগ্নাসিওর দলিলটা দেখাতে আর আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কেন থাকবে?' আহারা এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে আর-এক মানুষ। আমার হাতে দলিলটা চটপট দিয়ে বলতে লাগল, 'বোকা পেলে কে না ঠকাতে চায়। ওর বংশের প্রায় ভুলে- যাওয়া টিনের খনিটা জলের দরে কিনে নেবার তালে ছিলাম। আপনি যখন ওর মুরুব্বি হয়েছেন তখন ন্যায্য দামই দেব।'"

"তা-ই দিয়েছিল আহারা। সই-সাবুদ হবার পর শুধু মিনতি করে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন করে সেই চর থেকে পথ খুঁজে বার হলাম!

'হদিস সেই চরেই রেখে এসেছি।'— তাকে বলেছিলাম—'খুঁজলে পেতে পারো।'

হন্যে হয়ে তারপর সে খুঁজেছিল নিশ্চয়। পেয়েও ছিল সেই ফেলে আসা নকশা-আঁকা চিরকুটগুলো।

অনেক বছর ধরে মাথা খুঁড়ে সে চিরকুটের মানে সে বার করতে পেরেছে মনে হয় তার এই চিঠি থেকে। আমার কাছে সে-বাহাদুরি জাহির করতে আর এতদিন বাদে আমার কতটা খেয়াল আছে একবার বাজিয়ে নেবার জন্য এ নকশা-আঁকা চিঠি পাঠানো। চালাকি করে আবার নকশার ভেতরে চাকের ছ-কোনা খোপগুলোও এঁকে দিয়েছে! তবে চিঠি তারই লেখা হলেও নিজে সে যাচাই করতে এ শহরে এসেছে বলে মনে হয় না। বলিভিয়া ছেড়ে আর একবার কারাটে-র সুখ পেতে এখানে আসবার শখ কি সাহস তার হবে না। তার কোনও সাকরেদ-টাকরেদই এ চিঠির হদিস দেওয়া জায়গায় হাজির থাকবে মনে হয়।"

"জায়গাটা কোথায়?" আমাদের সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

"নকশায় যদি ভুল না করে থাকে," ঘনাদা আমাদের প্রতি যেন কৃপা করে বললেন, "তাহলে বাহাত্তর নম্বরকে ঘাঁটি ধরে সকাল ন-টায় সূর্যের সঙ্গে অবটিউস অ্যাঙ্গল-এ নীলমণির বাজারটাই হবে। সেইখানেই পরের রবিবার সকালে ন-টায় কারও অপেক্ষা করার কথা।"

ঘনাদা কি গুল মারতে মারতে নিজের মাথায় সত্যিই গোল বাধিয়ে বসলেন! সূর্যের সঙ্গে অবটিউস অ্যাঙ্গল। এ সব কী প্রলাপ?

"ওই নকশার মধ্যে এত কাণ্ড?" আমরা একটু কড়া হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "এ নকশার হদিস তো বলিভিয়ায় আপনার সেই ফেলে দিয়ে আসা চিরকুট থেকেই আপনার আহারা পেয়েছে। কিন্তু আপনি পেলেন কোথায়? সেই মৌচাক থেকে! তা থেকে মধু খেতে গিয়ে নকশা করলেন কী আর তা থেকে পালাবার পথের হদিস বা পেলেন কী করে?"

"নকশা করলাম—নাচ!" ঘনাদা আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে চাইলেন।

"নাচ?"

"হ্যাঁ, নাচ, মৌমাছিদের!" ঘনাদা ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করলেন, "মৌমাছিরা রোঁদে বেরিয়ে কোথাও মধুর সন্ধান পেলে চাকের আর সবাইকে তা জানায় নানা ধরনের

নাচ দিয়ে। এক এক নাচের নকশায় এক এক রকম ইঙ্গিত। যেমন কাছাকাছি চারিদিকেই মধুভরা ফুল থাকলে এই নাচ।

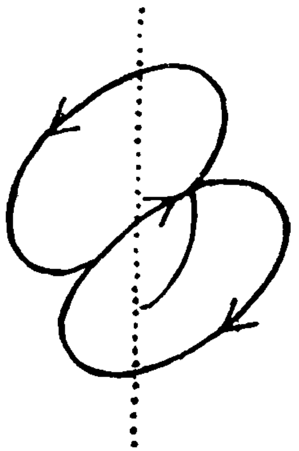

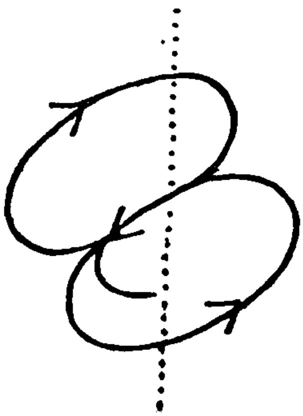

আর অন্তত একশো গজের চেয়ে বেশি দূর-দূরান্তরের ফুলের হদিস দিতে তারা যে নাচ নাচে, তখনকার আকাশে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে তাদের নাচের নকশায় মাঝের রেখা আর গতির অ্যাঙ্গল অর্থাৎ কোণ মেপে তা বুঝতে হয়। যেমন এই নাচের বেলা মাঝখানের ফুটকি দেওয়া রেখাটাকে সূর্যের বলে ধরে নিয়ে জোড়া ডিমের মতো নকশার তির মার্কা লাইনটার সঙ্গে তার অ্যাঙ্গলটা দিয়ে ফুলের মাঠের হদিস মেলে। ওই নকশা অনুসারে ফুলের খেত হবে মৌচাক থেকে এই দিকে—মৌমাছিরা যত ধীরে ধীরে নাচবে ফুলের মাঠ তত দূর বলে বুঝতে হবে।

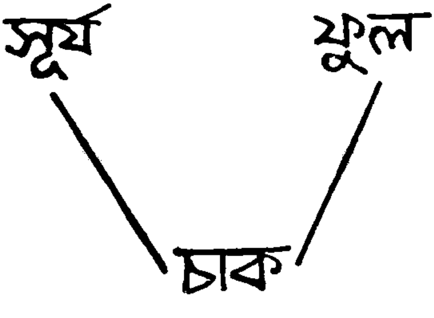

যেখানে আমায় বন্দী করেছিল তার চারিদিকেই প্রায় অপার জলা। কিন্তু মৌমাছিদের নাচ থেকেই আমি বুঝেছিলাম এক দিকে কোথাও শক্ত ডাঙা আছে। নাচ থেকে কোন দিকে তা খুঁজতে হবে তারও হদিস পেয়েছিলাম।”

ঘনাদা আমাদের হতভম্ব মুখগুলোর দিকে করুণাভরে চেয়ে সিগারেটের টিনটা নিয়ে উঠে গেলেন এবার। যেতে যেতে আসল কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেতে ভুললেন না, "আমার ঘড়িটার কথা ভুলো না শিশির।"

হাতঘড়ি কি দেওয়াল ঘড়ি নয়—নিজের মর্যাদার উপযুক্ত একটি ট্যাঁকঘড়ির শখ হয়েছে ঘনাদার। আমাদের সেটি খুঁজে এনে দিতে হবে।

ঘনাদার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সুদীর্ঘ সন্ধির এই হল রহস্য।

হ্যাঁ, পরের রবিবার সকাল ন-টায় নীলমণির বাজারে গিয়ে আহারা নয়, রাহাকে পেয়েছিলাম।

সে যেমন, আমরাও তেমনই তাজ্জব!

আহারা-ই তাকে পাঠিয়েছে কি না, প্রায় জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

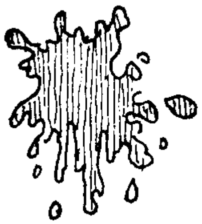

কাদা

ঘনাদা দরজাটা ঠেললেন, বেশ একটু অবাক হয়েই ঠেললেন। বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের বাইরের দরজা তো হাট করে খোলাই থাকে দিনরাত। সেটা এমন বন্ধ থাকার কথা তো ভাবাই যায় না।

সবে তো সন্ধে পার হয়ে রাতের প্রথম প্রহর। এমন সময় দরজা এভাবে বন্ধ কেন?

বন্ধ নয়, ভেজানো। ঘনাদা জোরে একটু ঠেলা দিতেই পাল্লা দুটো বেশ একটু যেন ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে খুলে গেল। বহুকাল তাদের শান্তিভঙ্গ তো কেউ করেনি। মরচে ধরা কবজাগুলোতে তাই ওই আপত্তির গোঙানি।

দরজা খুলে যাওয়ায় ঘনাদা যেটুকু আশ্বস্ত হয়েছিলেন, পুরনো আমলের খিলেন দেওয়া দেউড়ি পার হয়ে ভেতরে ঢুকে তা আর থাকতে পারলেন না।

বুকটা একটু কি হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল?

তা তো করতেই পারে। ভেতরে যে কোনও সাড়া শব্দ নেই! শুধু কি তাই! নীচের রান্না ভাঁড়ার খাবার ঘরের মহল একেবারে অন্ধকার। কারেন্ট ফেল যদি করে থাকে

তাহলে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তো জ্বলবে! রামভুজ সে বিষয়ে দারুণ হুঁশিয়ার। ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর ওপর পুরোপুরি ভরসা সে রাখে না। একটা নয়, দুটো লণ্ঠন তার সন্ধে থেকে তেলভরা পলতে-কাটা হয়ে মজুত থাকে।

সে লণ্ঠনের হল কী? রামভুজই বা কোথায়? রান্নাঘরে তো মানুষজন কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না!

ঘনাদা একটু দাঁড়িয়ে পড়ে কী যেন ভাবলেন। এ অবস্থায় কী করা উচিত, ভাবনাটা নিশ্চয় তাই। রান্নাঘরটা একবার দেখে আসতে যাবেন, না সোজা ওপরেই উঠবেন, মেসের সকলের খোঁজে?

দুটোর কোনওটাই না করে ঘনাদা উঠোনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হাঁক পাড়লেন। হাঁকটা ঠিক হুংকার বলে মনে হল না, কেমন একটা করুণ আর্তনাদের সুর তার সঙ্গে যেন মেশানো।

হাঁকটা কয়েকজনের নাম ধরে, "শিশির! গৌর! সুধীর!"

স্তব্ধ অন্ধকার বাড়িটায় সে হাঁক একটা যেন বিশ্রী প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল।

কোনও জবাব এল না কোথাও থেকে!

বাড়িতে কেউ নেই নাকি, কিন্তু তা কি সম্ভব? বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে নীচে-ওপরে সবাই হঠাৎ এক সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে? কোথায়? কেন?

"শিশির! গৌর!" ঘনাদার এবারের ডাক বেশ একটু কাঁপতে কাঁপতেই উঠল। স্বরটাও কেমন দুর্বল।

ঘনাদা তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা করলেন না।

যেভাবে ভেতরের উঠোন থেকে ছুটে বাইরের দরজায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, তাকে পড়ি-কি-মরি বললে অতিশয়োক্তি বোধহয় হয় না।

"এ কী! ঘনাদা, আপনি?"

শিশির ডানদিক থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে যেন তাজ্জব!

"ছুটে যেন পালিয়ে এলেন?"

বাঁদিক থেকে এসে শিবুর সবিস্ময় জিজ্ঞাসা।

"হ্যাঁ, এখনও তো হাঁফাচ্ছেন!"

সামনে থেকে এসে আমার অস্বস্তিকর মন্তব্য।

"ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

একেবারে পেছনের অন্ধকার দরজা দিয়েই বেরিয়ে এসে গৌরের চমকে দেওয়া সরব সন্দিগ্ধ অনুমান।

কী করলেন এবার ঘনাদা? কী আর করবেন? একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েও পিছলে বেরিয়ে যাবার কোনও ফাঁক তো আর রাখা হয়নি।

যাকে সত্যকার রাম-জব্দ বলে, তাই হয়ে একেবারে অধোবদন আর তোতলা। ঘনাদার যে অবস্থা, দেখলে সত্যি মায়া হয়।—

'রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা!'

সত্যি তো আর নয়, কল্পনা—ঘনাদাকে জব্দ করার কল্পনা। কিন্তু ওই কল্পনাই থেকে গেছে। বাস্তব হতে ওরা দিলে কই?

ফন্দিটা কিছু কি খারাপ এঁটেছিলাম? একেবারে যাকে বলে অব্যর্থ প্যাঁচ। ভেস্তে যাবার একটা ফুটোও রাখিনি।

ঘনাদাকে তাঁর সন্ধেবেলার সরোবর-সভা সেরে ফিরতেই হবে। তাঁর ফেরাও একেবারে নিয়মমাফিক, প্রায় ঘড়ি-ধরা, সাড়ে সাতটা বড় জোর আটটা। সাবধানের মার নেই বলে আমাদের সাড়ে ছ-টা থেকে আলো-টালো নিভিয়ে রামভুজ আর বনোয়ারিকে এ বেলার মতো ছুটি দিয়ে বাইরের দরজা ভেজিয়ে সবাই মিলে যে যার ঠিক-করা জায়গায় কিছুক্ষণ ঘাঁটি মেরে থাকা! আমরা সবাই বাহাত্তর নম্বরের বাইরে, গৌর একা নিঃসাড়ে ভেতরে। খুব বেশিক্ষণও অপেক্ষা করতে হত না! বাদলার দিন। পঞ্চাশ-পেরুনোদের সরোবর-সভা বেশিক্ষণ জমত না। ঘনাদা গুটি গুটি ঘরে ফিরতেন আর তারপর যা ছকেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত।

কিন্তু এমন সুপরামর্শটা কেউ নিলে?

নিলে যে নিজেদের খাটো হতে হয়! তাই, কী সব আহাম্মকের মতো ওজর!

"সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!" চোরা টিটকিরিটা শিশিরের, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা। যাবার আগে বিতস-কে শুধু একটু ফোন করে দিলেই হবে।"

শিশিরের গলার আওয়াজের বাঁকা সুরটা ঠিকই ধরেছি। সাড়ে আটানব্বই তখন নিরানব্বই ছাড়িয়েছে। তবু বিতস শুনে একটু ভড়কে যে গেছি তা অস্বীকার করব না।

ভুরু কুঁচকে হলেও প্রশ্নটা তাই যেন আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, "বিতস? তাকে ফোন কেন? সে আবার কে?"

"সে কে-ও নয়, কী -ও না," শিশিরের সে কী চিবিয়ে চিবিয়ে ব্যাখ্যা, "সে হল বি-ত-স অর্থাৎ সংক্ষেপে বিশ্ব-তস্কর-সংঘ। সবাই মিলে বাড়ি ছেড়ে গেলে তাদের ফোন না করলে চলে!"

কী রকম লাগে উজবুক-মার্কা এ রসিকতা? বিশেষ অমন একটা পয়লা নম্বরের মাথার কাজ দেখাবার পর? নিরেনব্বই একশোতে ওঠে কি না?

যা বলতে চেয়েছিলাম তা আর বলার ফুরসত মেলেনি।

শিশিরের মুখ থেকে কথাটা যেন লুফে নিয়ে শিবু চোখমুখে ভয় ফুটিয়ে বলেছে, "ফোন না করলে রক্ষে থাকবে না! পরের দিন-ই কাগজে কাগজে চোখ-রাঙানো চিঠি বেরিয়ে যাবে না? পেশাগত মৌল অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দায় কেন চাপানো হবে না তার কারণ দর্শাইবার নোটিশ যে আসবে না, তারই বা ঠিক কী? বি-ত-স-এর হালের ইস্তাহারের পাঁচ দফা দাবি দেখেছ তো!"

"তা আর দেখিনি!" শিবুর খেইটা চটপট ধরে ফেলেছে গৌর, "দাবিগুলো তো আমার মুখস্থ।"

আমি তখন একশো দুই! তবু কত বাড় এরা বাড়তে পারে দেখবার জন্য ফাটো-ফাটো বোমা হয়েও গৌরের ফিরিস্তি শুনেছি।

"পাঁচটা দাবি হল", গৌর তখনও বলে চলেছে, "চুরির সাজা চলবে না। তালাচাবি

বাতিল করো। গেরস্তর ঘুম বাড়াও। খালি বাড়ির খবর দাও। আর চোরেদের ভোট চাই।"

"না, আর একটা দাবিও আছে," একশো তিন হয়ে আমি ফেটেছি, "আকাট আহাম্মকদের সঙ্গ ছাড়ো!"

সবাই মিলে ধরে না থামালে আসর ছেড়ে আমি উঠেই আসছিলাম।

"আহা, চটেমটে চলেই যাচ্ছিস যে!" সবাই মিলে তারপর আমায় তোয়াজ করবার চেষ্টা করেছে, "বুদ্ধিটা তুই ভালই বাতলেছিস, তবে কিনা—"

উজবুক-মার্কা রসিকতার চেষ্টা আর হয়নি, কিন্তু একটার পর একটা তবে-কিনা-র ছররা-তেই আমার অমন ফন্দিটা তারপর ছেতরে গেছে।

"বাইরের দরজা ভেজানো দেখলে ঘনাদা আর তা ঠেলে ঢুকবেন?" আমার প্রস্তাবটা প্রথম ফুটো করেছে গৌর!

"যদি বা ঢোকেন, অন্ধকার দেখে আর পা বাড়াবেন?" শিবু ছিদ্রটা আরও বড় করে দিয়েছে।

সবচেয়ে মোক্ষম ফ্যাকড়া তুলে ফন্দিটা একেবারে বাতিল করে দিয়েছে শিশির।

"রামভুজ আর বনোয়ারিকে যে ছুটি দেবে, তারপর রাত্রের ব্যবস্থা কী হবে? হরিমটর?"

আমার পরামর্শটার পোকা বেছে নিজেরা আরও সরেস কিছু বাতলাতে পেরেছে কি?

তার বেলায় ঢু-ঢু! সারা বিকেলটা মাথা ঠোকাঠুকি করেও ঘনাদাকে সত্যিকার জব্দ করার একটা মনের মতো প্যাঁচ কেউ বার করতে পারেনি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়েছে। সন্ধে পার হয়ে ঘড়ির কাঁটা আটের ঘর ছুঁতে না ছুঁতে মার্কামারা জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেছে সিঁড়িতে। ঘনাদা প্রায় মিলিটারি কদমে উঠে আসছেন। নীচের সিঁড়ি থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে টঙের ঘরের সিঁড়ি।

ঘনাদার পায়ের আওয়াজ কি একটু ঢিমে হবে না আমাদের আড্ডাঘরের দরজার সামনে এসে? মিলিটারি কদমটা একটু মন্থর?

বৃথা আশা। বাহাত্তর নম্বরে আমাদের দোতলার আড্ডাঘর বলে কিছু আছে ঘনাদা যেন সে খবরই রাখেন না। একেবারে সমান তালে পা ফেলে তিনি তাঁর টঙের ঘরে উঠে গেছেন।

আমরা মুখ হাঁড়ি করে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছি।

না, এ তাচ্ছিল্যের একটা জুতসই জবাব না দিলেই নয়। ঘনাদাকে একটিবার অন্তত জব্দ না করলে আর মান থাকে না।

ঘনাদাকে জব্দ করার জন্য এত ছটফটানি কেন?

কেন হবে না?

বিনা দোষে ঘনাদা এবারে যা জ্বালা দিয়েছেন আর দিচ্ছেন, তাতে তাঁর দাওয়াই তাঁকেই একটু খাওয়াবার বাসনা কিছু অন্যায়?

গত বুধবারেই রাজনৈতিক সম্পর্কে চিড় ধরেছে বলা যায়। বৃহস্পতিবার দূতাবাসে তালাচাবি বলে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। তারপর শনিবার সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছিন্ন। সীমান্তের সব যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু রাজনৈতিক হাওয়া যতই গরম হোক, ঘনাদা রবিবারের দিন অমন একটা 'বিলো দ্য বেল্ট' মানে অধর্মের ঘা দেবেন ভাবতেও পারিনি।

সকালবেলায় সেজেগুজে সবাই তৈরি হয়ে আড্ডাঘরে জমায়েত হয়েছি এমন সময় আমাদের বারান্দা থেকেই ঘনাদার গলা শুনতে পেলাম। তাঁর মার্কা-মারা পাড়া-জাগানো সুমধুর স্বরে নীচে রামভুজকে ডেকে বলছেন, "ভাত নয়, আজ রুটি করবে রামভুজ। ঠিক বারোটায় খাব।"

সবাই একেবারে থ। অন্য কোথাও নয়, ঠিক আমাদের সামনের বারান্দায় এসে নীচের রান্নাঘরে নয়, যেন ওপাড়ার কোথাও কাউকে হেঁকে হুকুম শোনানোটাতেই প্রমাদ গনবার কথা, তার ওপর হুকুমের তাৎপর্য বুঝে একেবারে চক্ষু চড়কগাছ!

মান অভিমান ভুলে সবাইকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হয়েছে বাইরে।

"বারোটায় খাবেন কি ঘনাদা? তখন কি আমরা এখানে? স্টিমারে প্রায় ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছে যাব না ততক্ষণে?"

কাকে কী বলছি?

হয় আমরা সব স্বচ্ছ কাচ হয়ে গেছি, নয় ঘনাদা বাংলা ভুলে গেছেন।

তিনি মুখ ঘুরিয়ে চেয়েছেন, কিন্তু সোজা আমাদের ভেদ করে যেন তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে চলে গেছে। তাতেও আবছাভাবে আমাদের যদি দেখতে পেয়ে থাকেন, আমাদের ভাষা এক বর্ণও যেন বোঝেননি।

তাঁকে আবার টঙের ঘরের দিকে ঘুরতে দেখে শশব্যস্ত হয়ে পথ আগলে দাঁড়াতে হয়েছে।

আজ আমাদের স্টিমার পার্টি তা ভুলে গেলেন নাকি ঘনাদা?

আউটরাম ঘাটে লঞ্চ বাঁধা, এখুনি রওনা হতে হবে!

"না।" এবার ঘনাদা অনুগ্রহ করে সরব হয়েছেন, "আমার যাওয়া হবে না। যাবার মতো আমার পোশাক নেই। সব নোংরা!"

সামান্য ক-টি কথা, কিন্তু নিউক্লিয়ার বোমার চেয়ে সাংঘাতিক। ঘনাদা সেইটি ছেড়ে সোজা ওপরে উঠে গেছেন। আমরাও হঠাৎ নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গেছি রোগের আসল গোড়াটা কোথায় তা বুঝে।

ওই নোংরা পোশাকটাই যত নষ্টের মূল।

কিন্তু মূলটাই ঘনাদার একেবারে মনগড়া। সত্যি কথা বলতে, আমাদের কারও কোনও অপরাধ নেই। বনোয়ারির একটা সামান্য ভুল থেকে সব গণ্ডগোল শুরু।

আমাদের সব জামাকাপড় বড় রাস্তার এক ডাইংক্লিনিং-এ ধোয়ানো হয়। নিয়ে যায় বনোয়ারি। সেদিন আমাদের ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে কী ভাবে ভুল করে ঘনাদার একটা ফতুয়া ডাইংক্লিনিং-এ চলে গেছে।

দুপুরের পর বিকেলে সে ফতুয়ার খোঁজ না পেয়ে ঘনাদা যে রকম হুলস্থুল

বাধিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে লালবাজারকে বাদ দিয়ে মিলিটারি পুলিশকেই তৎক্ষণাৎ না তলব করলে নয়।

ভয়ে ভয়ে বনোয়ারি এবার স্বীকার করেছে যে, ফতুয়াটা অন্য কাপড়জামার সঙ্গে ডাইংক্লিনিং-এ দিয়ে এসেছে!

"আমার ফতুয়া ডাইংক্লিনিং-এ!" ঘনাদা যেন অপমানিত হয়েছেন।

"তাতে দোষটা কী?" গৌর বুঝি প্রবোধ দেওয়ারই চেষ্টা করেছে, "ময়লা ফতুয়া পরিষ্কার হয়ে আসবে।"

ব্যস, গৌর অজান্তে যা করে ফেলেছে তা আউরে-ওঠা কড়া মাড়িয়ে ফেলারই শামিল।

"আমার ফতুয়া ময়লা!" চড়ার বদলে ঘনাদার গলা খাদে নেমেই আমাদের বেশি সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, "হ্যাঁ, ময়লা তো নিশ্চয়ই। আমার তো আর ড্রাই ওয়াশিং করা নয়, নেহাত সাবানে কাচা।"

ঘনাদা সেই যে বিগড়েছেন হাজার সাধাসাধিতেও আর সিধে করা যায়নি। কিন্তু অভিমান যত হোক আমাদের অত সাধের স্টিমার পার্টিটা অমন করে ভণ্ডুল করে দেওয়াটা কোনওমতেই ক্ষমা করবার নয়। ঘনাদাকে জব্দ করে কিছুটা শোধ নেবার জন্য তাই এত জল্পনাকল্পনা।

কিন্তু জল্পনাকল্পনাই সার হত যদি না ভাগ্য অমন আশাতীতভাবে সহায় হত। সাহায্যটাও ভাগ্যের যেন একরকম রসিকতা। তা না হলে পালাটা অমন গোল হয়ে মিলে গিয়ে মুশকিলের যা মূল তাতেই আসানের ব্যবস্থা হবে কেন?

হপ্তা ঘুরে আবার এক শনিবার। আড্ডাঘরে আমরা জমায়েত হয়েছি সন্ধে থেকেই, কিন্তু আসর জমেনি। অন্য কিছুর অভাবে তাস নিয়ে বসেছি, কিন্তু তিন নো ট্রাম্পের ওপর পাঁচ ক্লাব ডেকে পাঁচশো ডাউন দিয়েও পার্টনার শিশিরের কাছে গালমন্দ দূরে থাক, একটা ঠাট্টা পর্যন্ত শুনতে হয়নি। অমন একটা মৌকা পেয়ে শিবু গৌর ডবল দিতেই ভুলে গেছে। আর শেষ পর্যন্ত রবার হবার জন্যও অপেক্ষা না করে খেলা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

শিবু না শিশির কে একবার যেন মোড়ের দোকান থেকে গরম খাস্তা-কচুরি আনাবার কথা তুলেছিল। কথাটা উঠেই আবার আমাদের অন্যমনস্কতায় চাপা পড়ে গেছে।

রাত অবশ্য প্রায় সাড়ে ন-টা। শনিবার বলে একটু দেরিতে রাত সাড়ে দশটায় খাবার ডাক আসবে। এই একটা ঘণ্টা কাটানোই দায়।

তবু বনোয়ারি ডাইংক্লিনিং থেকে এ খেপের ধোয়া কাপড়গুলো এনে ফেলায় একটু উত্তেজনার খোরাক জুটেছে।

ধোয়া জামাকাপড়গুলো মিলিয়ে নিতে নিতে গৌর হঠাৎ বনোয়ারিকে বকুনি দিয়েছে, "এ কী এনেছিস! একটু দেখে আনতে পারিসনি? পয়সা দিয়ে ডাইংক্লিনিং-এ পাঠিয়েছি কাদা মাখাবার জন্য?"

গৌরের বকুনিটা একটু অবশ্য মাত্রাছাড়া। একটা পাজামার পায়ের দিকে সামান্য

একটু যেন দাগ। সেটা সত্যিই কাদার কি না তাও গবেষণাসাপেক্ষ।

কিন্তু আসরের ঠাণ্ডা হাওয়াটা একটু চমকে তোলবার জন্য যে কোনও ছুতোই তখন সই।

আমরা সোৎসাহে গৌরের আর্তনাদে পোঁ ধরেছি।

"আরে, পাজামাটার তো একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!"

অন্য জামাকাপড়গুলোও খুলে দেখা দরকার। কাদা কি আর শুধু একটায় লাগিয়েছে!

বেছে বেছে ঠিক এই সময়টিতে ভাগ্য তার রসিকতাটি করেছে।

হঠাৎ ঘরদোর সব অন্ধকার। আমাদের মেন ফিউজ হয়ে গেছে, না পাড়ার কারেন্টই ফেল করেছে বোঝবার জন্য দু-চার সেকেন্ড অপেক্ষা করেছি।

না, আমাদের বাহাত্তর নম্বর শুধু নয়, পাড়াকে পাড়াই অন্ধকার।

এ রকম আকস্মিক বিপদের জন্যে শিশির তার ঘরে মোমবাতি রাখে। তাই সেগুলি আনতে যাচ্ছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি।

গৌর হঠাৎ অন্ধকারেই তাকে ধরে ফেলে চাপা গলায় বলেছে, "চুপ! নড়িস না! শুনতে পাচ্ছিস?"

শুনতে তখন সবাই পেয়েছি। আলো নিভে যাওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতে টঙের ঘরের দরজাটা বেশ একটু জোরে খোলার শব্দ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের খোলা ছাদে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গৌর চাপা গলায় বনোয়ারিকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে যেতে বলেছে। শহরের বিদ্যুৎ-শক্তির যদি কোনও দেবতা থাকেন আমরা তাঁর কাছে আকুল নীরব প্রার্থনা জানিয়েছি।

দেবতা থাকুন বা না থাকুন, প্রার্থনা আমাদের পূর্ণ হয়েছে। পাঁচ-দশ সেকেন্ড করে পুরো দুটি মিনিট পার হয়ে গেছে। সমস্ত পাড়া তখনও অন্ধকার।

ঘনাদার গলা খাঁকারি শোনা গেছে ছাদের আলসের ধারে। তারপর গলাটা খুব বেশি না তুলে যেন সহজ স্বাভাবিক ডাক—"বনোয়ারি!"

কোনও সাড়া নেই কোথাও। থাকবে কী করে? বনোয়ারিকে সেইরকম শিখিয়ে পড়িয়েই পাঠানো হয়েছে রামভুজকে সুদ্ধ সাবধান করে দেবার হুকুম দিয়ে।

"বনোয়ারি! রামভুজ!" ঘনাদার গলা ক্রমশ উদারা থেকে মুদারায় উঠেছে। সেই সঙ্গে একটু কেমন কাঁপনও যেন পাওয়া গেছে তার মধ্যে।

পায়ের শব্দে এবার বোঝা গেছে যে ঘনাদা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা বিফল হয়নি। ঘনাদা এক-পা এক-পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন টের পেয়েছি।

সিঁড়ি থেকে নেমে বারান্দা। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আড্ডাঘরের সামনে এসে একটু বুঝি দ্বিধা। তারপর মরিয়া হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে একটা প্রায় কাতর স্বগতোক্তি—"এখানে কেউ নেই নাকি?"

কলকাতা শহরের বিদ্যুৎ-বিধাতা সেদিন অলক্ষ্যে আমাদেরই সঙ্গী হয়েছেন তা কি

জানি!

ঠিক সেই মুহূর্তেই কারেন্ট ফিরে এসে ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

"আজ্ঞে, আছি বই কী!"

কথাটা পুরোপুরি তখনও আমরা উচ্চারণ করতে পারিনি আর ঘনাদা আড্ডাঘরের ভেতরে দু-পা মাত্র বাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

ঘনাদা এবার রাম-জব্দ যাকে বলে তাই নিশ্চয়? পিছলে গলে পালাবার আর কোনও উপায়ই নেই।

না। স্বয়ং বিদ্যুৎ-বিধাতাকেও হার মানতে হল।

ঘনাদা এক মুহূর্তের জন্য যদি একটু ভড়কে গিয়ে থাকেন তাহলেও হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় চোখধাঁধানিতে তা আমরা দেখতে পাইনি।

"যাক, আছ তাহলে!" পরের মুহূর্তেই নির্বিকার মুখে মন্তব্যটা করে ঘনাদা যেভাবে সোজা তাঁর মৌরসি কেদারায় গিয়ে বসলেন তাতে মনে হল মাঝখানে যা যা ঘটেছে তা আমাদের ভ্রান্তি!

"হ্যাঁ, তোমাদের ওই ডাইংক্লিনিং-এর ঠিকানাটা কী হে?"

আমরা সবাই হতভম্ব ও নির্বাক। ঘনাদা তাঁর যাকে বলে সংরক্ষিত আরাম-কেদারায় বসবার পর শিশির আপনা থেকেই অভ্যাস বশে সিগারেটের টিনটা খুলে ফেলেছিল। ঘনাদার এ প্রশ্ন শুনে টিনটা সে এগিয়ে দিতে ভুলে গেল।

ঘনাদা নিজেই হাত বাড়িয়ে শিশিরের ত্রুটি সংশোধন করতে গোটা টিনটাই তুলে নিয়ে আমাদের হাঁ-করা মুখগুলো যেন লক্ষ না করেই আবার বললেন, "ওইখানেই এখন থেকে সব কাচাব ঠিক করেছি।"

আমাদের মুখে তখনও রা নেই। ঘনাদার হঠাৎ যেন টিপয়ের ওপরে রাখা ধোয়া কাপড়গুলোর ওপরে চোখ পড়ল।

"এই বুঝি তোমাদের কলের কাচা কাপড়!" ঘনাদা যেন একটু উচ্ছ্বসিতই হলেন, "তা ভালই তো কেচেছে!"

"ভাল কী বলছেন!" এতক্ষণে আমাদের জিভের সাড় ফিরে এল। সেই সঙ্গে ঘনাদাকে এখনও একটু বেকায়দায় ফেলবার আশা।

"একেবারে যাচ্ছেতাই কাচা!" শিবু নাক সিঁটকাল।

কাচা কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে ঘনাদার ভুরুটা একটু কোঁচকাল কি? সেই ভ্রূকুটি আরও বাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় বললাম, "ডাহা ফাঁকিবাজি!"

ঘনাদার চোখ দুটো সন্দেহে একটু যেন ধোঁয়াটে হতেই গৌর তাতে ধুনো চাপাল, "দেখছেন না কী রকম কাদা-মাখানো!"

"তা আর দেখছি না!" ঘনাদা অম্লানবদনে তাঁর আণুবীক্ষণিক চোখের প্রমাণ দিয়ে যা বললেন তাতেই আমরা সত্যিকারের কাত। বললেন, "তা একটু-আধটু কাদা তো ভাল।"

"কাদা ভাল! কাচা কাপড়ে কাদায় আপনার আপত্তি নেই?"

"আপত্তি! বিলক্ষণ!" ঘনাদা আমাদের মূর্খতায় যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "এক

ফোঁটা কাদার দাম কী হতে পারে জানো! একটা কাদার ছিটে দিয়ে একটা রাজ্য উদ্ধার করা যায়!"

"সে কী রকম কাদা! আর্মস্ট্রং-অ্যালড্রিনের আনা চাঁদের মাটির নাকি?" ঘনাদাকে তখনও কাহিল করবার ক্ষীণ আশা নিয়ে খোঁচাটা দিলাম।

"না, চাঁদের নয়, এই আমাদেরই পৃথিবীর।" ঘনাদা খোঁচাটা যেন টেরই না পেয়ে বললেন, "দক্ষিণ আমেরিকার বান-ডাকানো দু-একটা নদীর আশীর্বাদ বলা যেতে পারে। এক ছিটে সেই কাদা না পেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ জলের দরে বিক্রি হয়ে গিয়ে তার মালিক আজ পথের ভিখিরি হত।"

"এক ছিটে কাদায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ-এর মুশকিল আসান হয়ে গেল! মন্তর পড়া দৈব কাদা বুঝি?" আমরা তখনও সঙ্গিন উঁচিয়ে আছি।

"না, মন্তর পড়া-টড়া দৈব-টৈব কিছু নয়!" ঘনাদা ধৈর্যের অবতার হয়ে বুঝিয়ে আর বাগড়া দেবার অবসর দিলেন না। "নেহাত সাধারণ কাদা—দৈব নয়, বরং জৈব বলা যেতে পারে। আমার একটা প্যান্টের একটা পায়ে এক ছিটে যে লেগে ছিল তা আমি নিজেই জানতাম না। আর্জেন্টিনা হয়ে তখন পুরনো বন্ধু বেলমন্টোর খোঁজ নিতে ব্রেজিলের মাতো গ্রস্‌সো অঞ্চলে আরাগুয়াইয়া নদীর দেশে তার র‍্যাঞ্চ-এ গেছি। গোরু ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ, কিন্তু ছোটখাটো কিছু নয়। আমাদের গোটা চব্বিশ পরগণা জেলাটা তার র‍্যাঞ্চ-এর এলাকার মধ্যে ধরিয়ে দিয়েও কলকাতা হাওড়া শহর দুটো ঢোকাবার মতো জায়গা কিছু থাকে।

বেলমন্টো একটু স্বপ্ন-দেখা গোছের মানুষ। ব্রেজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া-রই তখন সবে পরিকল্পনা' চলছে। উত্তরের আমাজনের মোহানায় বেলেম বন্দর থেকে দক্ষিণের রাজধানী ব্রাসিলিয়া পর্যন্ত দু-হাজারের ওপর কিলোমিটারের পাহাড়, জঙ্গল, জলা ফুঁড়ে- যাওয়া সড়ক তখন কল্পনারও অতীত। সেই তখনকার দিনেই বেলমন্টো তার পৈতৃক আর নিজের উপার্জন করা সব কিছু দিয়ে জলাজঙ্গলে এই অজানা অঞ্চল কিনে ছিল। তার স্বপ্ন হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ তৈরি করা, যেখানে এমন গোরু ঘোড়া সে পয়দা করবে পৃথিবীতে যার জুড়ি মিলবে না।

এই স্বপ্ন সার্থক করার পথে কতদূর সে এগিয়েছে দেখবার জন্যই সেবার পাহাড় জঙ্গল ভেঙে বেশ কষ্ট করে তার র‍্যাঞ্চ-এর মুল্লুকে গেছলাম।

রিও আরাগুয়াইয়া মানে আরাগুয়াইয়া নদীর এলোমেলো বিনুনিগুলো যেখানে এসে মিলেছে সেইখানে বেলমন্টোর প্রধান ঘাঁটি। নেহাত একটা সেকেলে প্লেন ভাড়া না পেলে সে ঘাঁটি খুঁজে পাওয়া শক্ত হত।

ঘাঁটিতে পৌঁছেই ভাড়াটে প্লেনটার পাওনা চুকিয়ে বিদেয় করে দিয়েছিলাম। বেলমন্টোর কাছে এসে তো আর দু-চার দিনে চলে যাওয়া যাবে না, সুতরাং মিছিমিছি প্লেনটাকে আটকে রেখে দিনের পর দিন ভাড়া গোনার দরকার কী!

কিন্তু বেলমন্টোর সঙ্গে দেখা হবার পর অবাক হলাম। এতকালের বন্ধুর এ কী অভ্যর্থনা!

দেখা হবার পর তার প্রথম প্রশ্ন হল, 'প্লেনটা ছেড়ে দিলে? না দিলেই পারতে।'

'কেন বলো তো! মিছিমিছি প্লেনটা বসিয়ে রেখে ভাড়া গুনতে যাব কেন?'

'না। ভাড়া গুনবে কেন? ও প্লেনে-ই ফিরে যেতে পারতে তাড়াতাড়ি।'

আমি হতভম্ব হয়ে খানিক বেলমন্টোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যি বেলমন্টোর হল কী! যা হয়েছে এবার ওই তাকিয়ে থাকার দরুনই ভাল করে চোখে পড়ল।

তার গলার স্বরে প্রথমেই একটা কেমন হতাশ কিছুতে-কিছু-আর-আসে-যায়-না গোছের সুর অবশ্য পেয়েছিলাম। সেটাকে গোড়ায় তেমন আমল দিইনি, এখন লক্ষ করে দেখলাম গলার স্বরে যার আভাস মাত্র পেয়েছি, মুখে তার ছাপটা একেবারে গভীরভাবে পড়েছে। তার চোখের কোলে পুরু করে কালি, কপালের চামড়ায় যেন সূক্ষ্ম লাঙল চালানো আর মুখটা শুকিয়ে প্রায় আমসি। স্ফূর্তিতে উৎসাহে ঝলমল যে বেলমন্টোকে জানতাম তার হঠাৎ হল কী!

বেশ দুর্ভাবনা নিয়েই এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার কী বলো তো, বেলমন্টো? তুমি কি চাও না যে আমি এখানে থাকি!'

বেলমন্টোর মুখে ফ্যাকাশে একটু হাসি দেখা গেল। প্রায় ধরা গলায় সে বললে, 'আমি নিজেই যখন থাকছি না, তখন তোমায় থাকতে বলব কোন মুখে?'

'তুমি নিজেই থাকছ না!' আমি আরও হতভম্ব—'যাচ্ছ কোথায় তোমার এ র‍্যাঞ্চ ছেড়ে?'

'এ র‍্যাঞ্চ আমি বিক্রি করে দিচ্ছি!' কথাটা যেন বেলমন্টোর বুক চিরে বেরিয়ে এল।

'বিক্রি করে দিচ্ছ? তোমার এত সাধের র‍্যাঞ্চ! কাকে বিক্রি করছ?'

'কাকে আর করব!' হতাশ সুরে বললে বেলমন্টো, 'এ জলা জঙ্গলের নরক অমনি দিলেও কেউ নেবে না। আমি তাই ব্রেজিল সরকারের কাছেই আবেদন জানিয়েছি। গতকাল তাদের জবাব এসেছে।'

বেলমন্টো তারপর ব্রেজিল সরকারের জবাব আমায় দেখাল। সে জবাবে ব্রেজিল সরকার সমস্ত র‍্যাঞ্চ-এর যা দর দিয়েছে তা দেখে আমার তো মেজাজ গরম।

রেগে বললাম, 'জায়গা-জমির কথা ছেড়ে দাও, তোমার যে হাজার কয়েক গোরু ঘোড়া আছে তার দামও তো এতে উঠবে না। তবু সবকিছু বেচে পালাবার এ ঝোঁক তোমার কেন?'

'কেন তা এখনও যদি না বুঝে থাকো,' বেলমন্টো এবার তিক্ত স্বরে বললে, 'তা হলে সন্ধে হলেই বুঝবে।'

বুঝতে তখনই কিন্তু আমি আরম্ভ করেছি। সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারলাম।

রূপকথায় সাতশো রাক্ষুসির হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে তেড়ে আসার গল্প আছে। যে বিভীষিকা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে দেখলাম শুনলাম তার তুলনায় সাতশো রাক্ষুসি যেন নিউক্লিয়ার বোমার কাছে পটকা।

সন্ধে হতে না হতে আকাশ বাতাস যেন আতঙ্কে কাতরে উঠল। সে কী নিদারুণ

অদ্ভুত আওয়াজ! বোমারু বিমানের ঝাঁক হানা দেবার সময় বুকের-রক্ত-জমিয়ে-দেওয়া যে গর্জন তোলে তাও বুঝি এ ভুতুড়ে শব্দ-বিভীষিকার চেয়ে ভাল।"

"আওয়াজটা কীসের?" সন্দিগ্ধ প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারলাম না, "ব্রেজিলের মাতো গ্রস্‌সো জঙ্গলের কোনও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের? দুনিয়ার সেই আদি রাক্ষস টিরানোসোরাস-এর নাতিপুতির?"

"না, তার চেয়ে ভয়ংকর কিছুর", ঘনাদা আমাদের হতভম্ব মুখগুলোর ওপর একবার আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "ঘন কালো প্রলয়ের মেঘের মতো সবকিছু ঢেকে-মুছে দেওয়া যোজনের পর যোজন মশার ঝাঁক।"

হাসি চাপতে কাশতে কাশতে যে টিপ্পনিটা সকলেরই গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল ঘনাদা আগে থাকতেই তার খোঁচাটা ভোঁতা করে দিয়ে বলল, "ভাবছ মশার ঝাঁককে এত ভয় কীসের? ডি ডি টি কি তখনও আবিষ্কার হয়নি?

হয়েছে। বেলমন্টোকে সেই কথাই বলেছিলাম। কিন্তু তাতে করুণমুখে সে জানিয়েছিল যে ডি ডি টি-কে ডরাবার মতো মশার জাত এ নয়। বিজ্ঞানের যুগে অনেক পোড়-খাওয়া এ মশার বংশের কাছে ডি ডি টি জলপান। খানায় ডোবায় জলা-জঙ্গলে যে কেরোসিন ঢালা হয় তা এরা শখ করে গায়ে মাখে। এদের ঠেকাতে মশারি ফেলে শুয়ে থাকা যায়, কাজকর্ম চলে না।

বেলমন্টোর কথা শুনে হায় হায় করে উঠলাম, তারপর তাকে কিছু না বলে ছুটে গেলাম নিজের সঙ্গে আনা স্যুটকেসটা খুলতে!

ভাগ্য সত্যিই ভাল! একটা জিনের প্যান্টের পায়ের মোড়া খাঁজে কাদার ছিটেটা পেলাম।

বেলমন্টো তখন পিছু পিছু এসে হতভম্ব হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। বেশ একটু চিন্তিত হয়ে বললে, 'আমার এই ক-বছরে যা হবার উপক্রম, তোমার এক দিনেই তা হল নাকি! মাথা খারাপ হয়ে গেল মশার ডাক শুনে?'

'তা যদি হয় তবু তোমার কোনও ভাবনা নেই।' বেলমন্টোকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ব্রেজিল সরকারকে তোমার রাজত্ব বেচা, বেশিদিন না পারো, একটা বছর অন্তত স্থগিত রাখো। আর বর্ষা এলে যা বানে ভাসবে এমন একটা শুকিয়ে আসা খাল-বিল আমায় দেখিয়ে দিয়ো কাল সকালে।'

পাগলের সঙ্গে তর্কে লাভ নেই বলেই বোধ হয় বেলমন্টো পরের দিন সকালে তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

মশারির ভেতর শুলেও সারারাত্রি মশাদের ভয়ংকর অর্কেস্ট্রায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। রাত-জাগা রাঙা চোখে যা আমি করেছি তা দেখে, পাছে বেশি খেপে যাই, এই ভয়েই বোধহয় বেলমন্টো টুঁ শব্দটি করেনি।

পরের দিন সামান্য কিছু লটবহর নিয়ে বেলমন্টো আমার সঙ্গে তার মোটর লঞ্চে আরাগুইয়া নদী দিয়ে রওনা হল। আমার পাগলামি বাড়লে সামলাতে পারবে কিনা সেই ভাবনায় বেশ একটু ভয়ে ভয়েই গেল বেলেম বন্দর পর্যন্ত সারা

পথ।”

ঘনাদা থামলেন।

“ব্যস! গল্প শেষ?” বিদ্রূপের সুর লাগাবার চেষ্টা করলেও আমাদের আগ্রহটা ঠিক বোধ হয় চাপা দেওয়া গেল না।

“হ্যাঁ, শেষই বলতে পারো।” ঘনাদা উদাসীনভাবে বললেন, “আমাজনের মোহনায় বেলেম বন্দর থেকে ব্রেজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া পর্যন্ত এখন পাহাড় জঙ্গল জলা ফুঁড়ে দু হাজারেরও বেশি কিলোমিটারের সড়ক বেরিয়েছে। ও অঞ্চল তো এখন সোনার দেশ আর বেলমন্টোর র‍্যাঞ্চ দুনিয়ার অদ্বিতীয় বললে ভুল হয় না।

“সব আপনার ওই প্যান্টের পায়ের ভাঁজে পাওয়া এক ছিটে কাদার কেরামতি!” আমরা প্রায় চোখ পাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, “তা দিয়ে করেছিলেন কী?”

“শুকনো খাল-বিলে তা একটু গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম।” ঘনাদার মুখে কোনও ভাবান্তর নেই।

“তাতে হল কী!” আমরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ।

“হল সাইনোলেবিয়াস বেলট্টি!” ঘনাদা আমাদের দিকে একটু অনুকম্পাভরে তাকালেন।

“কী বললেন!”—শিবু প্রায় খাপ্পা—“ওসব হ-য-ব-র-ল রেখে আসল ব্যাপারটা কী হল তাই বলুন।”

“সাইনোলেবিয়াস বেলট্টি ছাড়া আর আসল ব্যাপার তো বোঝানো যাবে না।” ঘনাদা যেন দুঃখের সঙ্গে জানালেন, “তবু নামটা বাদ দিয়েই বলছি! আমরা চলে যাবার কয়েক হপ্তা পরে ওদেশের যেমন দস্তুর তেমনই তুমুল বর্ষা নামল, বান ডাকল নদীতে। ওই শুকনো কাদার গুঁড়ো জল লেগে ভিজে তার আধঘণ্টার মধ্যে ভেলকি লাগিয়ে দিলে, দিনে দিনে শ থেকে হাজার, হাজার থেকে লাখে লাখ মশার যম হয়ে উঠে। এক বছর পেরিয়ে দু বছর পুরো না হতে হতে ও-অঞ্চলে মশার ডাক গল্প-কথা হয়ে দাঁড়াল।”

“ওই বেলট্টি না কী তাহলে কাদার গুঁড়ো, মানে ধুলো-পড়া ফুসমন্তর?”—একটু বাঁকা হাসি হাসবার চেষ্টা করলে গৌর—“এতক্ষণ তা বলতে হয়! ঝাড়ফুঁকে মশার বংশ নির্বংশ করলেন!”

“না, ঝাড়ফুঁক নয়।” ঘনাদা ধৈর্যের অবতার হয়ে বোঝালেন, “সাইনোলেবিয়াস বেলট্টি হল একরকম খুদে মাছ, দেখতে কতকটা আমাদের খলসের মতো। ওদেশে একটা ডাকনাম আছে মুক্তোমাছ বলে। আর্জেন্টিনার বান-ডাকা নদী যখন মাঠ বন ভাসায় তখন এই মুক্তোমাছ ঝাঁকে ঝাঁকে সেই বেনো জলে জন্মায় আর ডিম ফুটে বেরিয়েই মশার শূক মানে প্রায় বাচ্চা পোকা ধ্বংস করতে শুরু করে। পরীক্ষিৎ রাজা সর্পমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, আর এ মুক্তোমাছের জীবনের ব্রত হল যেন মশকমেধ। একটা মাছ একই দিনে পঞ্চাশটা অন্তত মশার বাচ্চা সাবাড় করে। ডিম ফুটে বার হবার তিন হপ্তা বাদেই মাদি মুক্তোমাছের নিজেরই ডিম পাড়া শুরু হয়। হপ্তায় শ

তিনেক ডিম প্রতিটি মুক্তোমাছ পাড়ে। বানের জল নেমে যাবার পর সেসব ডিম মাঠের কাদার মধ্যে তারই সঙ্গে শুকিয়ে জমে থাকে। পরের বছর আবার বানের জলের ছোঁয়া লাগতেই—আধঘণ্টার মধ্যে সে ডিম যেন জেগে উঠে বাচ্চা ফোটায়। এক রত্তি কাদায় দশটা ডিমের ছানা থাকলেই বছর ঘুরতে না ঘুরতে তারা রাবণের গুষ্টি হয়ে ওঠে। বেলমন্টোর কাছে আসবার আগে আর্জেন্টিনার ওই রকম বান-ডাকা ক-টা নদীতে ক-দিন ঘুরেছিলাম। সেখানেই কোথাও ওই কাদার ছিটে প্যান্টে লেগেছিল নিশ্চয়। তা না লাগলে আর সময় মতো সে কথাটা মনে না পড়লে, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা র‍্যাঞ্চ আজ বিফল স্বপ্ন হয়েই থাকত।

কাপড়-চোপড় একেবারে নিখুঁত ধোপদুরস্ত রাখার বাতিক সেই থেকে আমার কেটে গেছে।”

গল্পের ল্যাজের ওই হুলটুকু আমাদের বেয়াদবির জবাব।

ঘনাদা সেটা বেশ ভাল করে বিঁধিয়ে, উঠে পড়লেন নীচে খেতে যাবার জন্য। শিশিরের সিগারেটের টিনটা কিন্তু তখন তাঁর হাতে। ভুল করে নয়, এ নেওয়াটা মানহানির খেসারত স্বরূপ।

দুনিয়ার ঘনাদা

কাঁটা

লাল, না সবুজ?

সবুজ কোথায়? ফিকে গোলাপি পর্যন্ত নয়। একেবারে খুনখারাপি ঘোর লাল যে এখন!

হ্যাঁ, শুধু লাল আর সবুজ নিয়েই আছি ক-দিন ধরে। মাঝখানে হলদে-টলদে নেই। আমাদের এখানে হয় এসপার, নয় ওসপার। হয় 'ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা', নয় ধু-ধু বালির চড়া।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের কথা যে বলছি তা যাঁরা বুঝেছেন লাল-সবুজের মানে বুঝতেও তাঁদের নিশ্চয় বাকি নেই।

হ্যাঁ, লাল-সবুজ হল সিগন্যাল। রুখব, না এগোব তারই নিশানা।

হলদের মতো মাঝামাঝি ন যযৌ ন তস্থৌ দোনামনা রঙের বালাই আমাদের নেই। লাল আর সবুজ নিয়েই আমাদের কারবার।

গোড়া থেকে লালই চলছিল। আমাদের অবস্থাও অতি করুণ। দোতলার আড্ডাঘরে জমায়েত হই, কিন্তু আসর জমে না। হতাশ নয়নে টঙের ঘরের সিঁড়িটার দিকে তাকাই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ও সিঁড়িতে আমাদের পা বাড়ানো নৈব নৈব চ। লাল সিগন্যাল অমান্য যদি করো তো দুর্ঘটনা। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে শিবু যা বাধিয়েছে! সেই থেকেই ঘোর লাল চলছে।

"কীসের এত ভয়!" শিবু মরিয়া হয়ে একদিন বলেছিল, "আমরা সব মেনে নিই বলে উনিও জো পেয়ে যান। এতদিন গেঁজলাতে না পেরে পেট ফুলে ঢাক হয়ে গেছে এদিকে। আমি গিয়ে খুঁচিয়ে মুখ খোলালে বর্তে যাবেন। তোরা দেখ না, পনেরো মিনিট বাদেই তোদের ডাকছি। আমার আওয়াজ পেলেই সব ওপরে চলে আসবি।"

পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি।

পাঁচ মিনিট না-হতেই আওয়াজ পেয়েছি। তবে শিবুর গলার নয়, তার পায়ের।

শিবু চটপট সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

না, ভয়ে মুখ শুকনো-টুকনো নয়, কিন্তু লজ্জায় যেন কালি মেড়ে দেওয়া।

"কী হল কী?" গৌর জিজ্ঞাসা করেছে, "আমাদের না ডেকে নিজেই নেমে এলি যে!"

গৌরের সরল প্রশ্নের আড়ালে সামান্য একটু ঠাট্টার খোঁচা হয়তো ছিল, কিন্তু সেটা অত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার মতো কিছু নয়।

"হ্যাঁ, এলাম!" শিবুর ক্ষুব্ধ চাপা গুমরানি শোনা গেছে, "আমায় কী বলেছেন,

জানো?"

শিবুর কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ তারপর পাওয়া গেছে।

শিবু রীতিমতো হই চই করে টঙের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। যেন মাঝখানে কোথাও কোনও সুতো ছেঁড়েনি। 'ইয়ালটা' সম্মেলনের গলাগলিই চলছে, 'ন্যাটো'-র নামই জানা নেই।

"আরে, কী খবরের কাগজ পড়ছেন অবেলায় বসে বসে!" শিবু খবরের কাগজটা প্রায় টেনে নিতেই গেছে, "নীচে চলুন। সবাই বসে আছে হাপিত্যেশ করে। আর একটু জোরে নিশ্বাস টানুন না। গন্ধ পাবেন। ফ্রায়েড প্রন তো নয়, যেন মুনি ঋষির প্রতিজ্ঞা-ভাঙা প্রলোভন!"

যাঁর উদ্দেশে এই বাগ্‌বিস্তার তিনি কি কালাবোবা হবার ভান করেছেন?

না। পেন্সিল হাতে নিয়ে খবরের কাগজটার যে পাতায় তিনি দাগ দিচ্ছিলেন সেটা শিবুর প্রায় কোলের ওপরেই যেন নিজের অজান্তে সরিয়ে রেখে তিনি গম্ভীরভাবে শিবুর দিকে চেয়ে বলেছেন, "আপনাদের ভাবনা করবার কিছু নেই। যাবার আগে এ ঘরের ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়ে যাব। দেখতেই তো পাচ্ছেন—বাসা খুঁজছি।"

দেখতে শিবু খুব ভাল রকমই তখন পেয়েছে। কাগজে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনের কলমে ঘনাদা তাঁর লাল পেন্সিলে মোটা মোটা করে দাগ মেরেছেন।

কিন্তু সে দাগরাজি বা তাঁর টঙের ঘরের ভাড়া মিটিয়ে দেবার আশ্বাসে যতটা নয়, তার চেয়ে 'তুমি' থেকে 'আপনি'র চুড়োয় আচমকা চালান হয়েই শিবুর তখন টলটলায়মান অবস্থা।

আমাদের সকলেরও তাই।

"ঘনাদা 'আপনি' বললেন তোকে?" শিশিরের চোখ-কপালে-তোলা প্রশ্ন।

"তুই ঠিক শুনেছিস?" আমার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—শুনেছি। একবার নয়, অন্তত দশবার।" শিবু উত্তেজিতভাবে বলেছে, "শেষে হ্যান্ডনোটই না লিখে দেবার কথা বলেন, তাই পালিয়ে এসেছি।"

হ্যাঁ, লাল নিশানা খুনখারাপির রাঙা চোখে পৌঁছবার পর সেটাও অসম্ভব নয়।

খবরের কাগজের দাগরাজিই ছিল প্রথম লাল নিশানা।

ঘনাদা যে নিত্য নিয়মিতভাবে খবরের কাগজের 'টু-লেট' পঙ্‌ক্তি দাগাচ্ছেন, গোড়াতেই তা জানা গেছে। অজানা থাকবার জো কী!

ঘনাদার পড়া হয়ে যাবার পর কাগজগুলো আমাদের আড্ডাঘরেই এনে রাখা হয়। এখন আবার তাতে ভুল কি গাফিলি করবার উপায় নেই বনোয়ারির। ঘনাদার জরুরি নির্দেশটা প্রতিদিন টঙের ছাদ থেকে বেশ জোরালো গলাতেই ঘোষিত হয়।

"আরে, বনোয়ারি, কোথায় গেলি! কাগজগুলো নিয়ে যা। শেষে কাগজগুলোর ওপর মৌরসি পাট্টার দায়ে না পড়ি।"

এ ঘোষণাটা সকালে দুপুরে নয়, ঠিক বিকেলবেলা আড্ডাঘরে আমরা এসে জমায়েত হবার পরই শোনা যায়।

বনোয়ারির যেটুকু দেরি হয় কাগজ নামিয়ে আনতে আমাদের সেটুকু সবুরও যেন

সইতে চায় না। কাগজ এলেই একটি বিশেষ পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। ঘনাদার লাল পেন্সিলের দাগ সূক্ষ্ম-টুক্ষ্ম তো নয়, একেবারে লাঙলের ফলা দিয়ে যেন টানা।

কী রকম বাসা ঘনাদা খুঁজছেন তার একটু নমুনা দাগমারা 'টু লেট'-এর বিজ্ঞাপন থেকে অবশ্য পাই।

ঘনাদার বড় খাঁই-টাই নেই। চাহিদা তাঁর যৎসামান্য। মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই হলেই তিনি যে খুশি দাগানো বিজ্ঞাপন পড়লেই তা বোঝা যায়।

"এক বিঘা জমিতে বাগান ঘেরা একটি ত্রিতল হাল ফ্যাশানের বাড়ি। আগাগোড়া মোজেইক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উপরে নীচে চারিটি শয়নকক্ষ। আচ্ছাদিত বারান্দা। গ্যারেজ ও অনুচরদিগের পৃথক ব্যবস্থা। ভাড়া মাসিক বারোশত টাকা।"

কিংবা—

"নবনির্মিত বিশ তলা টাওয়ার বিল্ডিংসের উপর তলায় দুইটি সংযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যথোচিত আনুষঙ্গিক সহ তিনটি করিয়া শয়নকক্ষের ফ্ল্যাট। একটি স্বয়ংক্রিয় ও আর-একটি অনুচর চালিত লিফট।"

এর বেশি উঁচু নজর ঘনাদার নেই।

প্রতিদিন এই লাল পেন্সিলে দাগানো বিজ্ঞাপন তো পড়তেই হচ্ছে। তার ওপর দুবেলা বড় বড় দুটি টিফিন কেরিয়ারের সঙ্গে থালা বাটি গেলাসের ঝোলা আর জলের জগ বয়ে নিয়ে যাওয়ার মিছিল দেখেও ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু শিবুর সঙ্গে আমাদের হঠাৎ 'আপনি' হয়ে ওঠাটা ভাবনা ধরিয়ে দিল। রামভুজের কাছে গোপনে খবরটা তাই নিতে হল।

"বড়বাবুর সেবা ঠিক হচ্ছে তো, রামভুজ?"

"জি, হাঁ।" রামভুজ জোর গলায় জানালে।

"টিফিন-কেরিয়ার দুটো দুবেলা ঠিক মতো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তো?"

রামভুজ সে বিষয়েও আশ্বস্ত করলে। টিফিন কেরিয়ার বোঝাই করে পাঠাবার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি নেই। নিত্য নতুন পদ সে নিজে হাতে রেঁধে টিফিন কেরিয়ারে ভরে বনোয়ারিকে দিয়ে পাঠাচ্ছে। টিফিন কেরিয়ার দুটোয় অরুচির প্রমাণও পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। চাঁছাপোঁছা হয়েই তো ফিরে আসছে প্রতিদিন!

তাহলে উপায়?

উপায় ভাববার আগে টিফিন কেরিয়ারের রহস্যের একটু ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন।

ঘনাদা বেশ কিছুদিন থেকে খবরের কাগজের 'টু লেট' কলমে দাগ মেরে শুধ বাসা-ই খুঁজছেন না, আমাদের বাহাত্তর নম্বরের অন্নজলও ত্যাগ করেছেন।

তাই তাঁর জন্য আজকাল একটা নয়, দু-দুটো টিফিন কেরিয়ারে দুবেলা খাবার যায় তাঁর টঙের ঘরে। সে খাবার নিয়ে যায় অবশ্য রামভুজ আর বনোয়ারি। বাহাত্তর নম্বরের ওপর ওইটুকু দয়া তিনি এখনও রেখেছেন। রামভুজকেই বাইরে থেকে তাঁর খাবার আনবার গৌরবটুকু তিনি দিয়েছেন।

প্রথম দিনই রামভুজকে বাধিত হবার এই দুর্লভ সুযোগ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের এখানে ভাল হোটেল-টোটেল আছে, রামভুজ?"

রামভুজ তখন আমাদেরই পরামর্শে ঘনাদা নীচে, না ওপরে তাঁর ঘরে বসেই খাবেন সে কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

ঘনাদার উক্তির গভীর তাৎপর্য না বুঝে প্রথমে তাচ্ছিল্যভরে জানিয়েছে যে, হোটেল থাকবে না কেন? অনেক আছে। কিন্তু তাকে কি আর হোটেল বলে! তারপর হঠাৎ একটু টনক নড়ে ওঠায় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "হোটেল কী হোবে বড়াবাবু?"

"কী আর হবে!" ঘনাদা যেন নিরুপায় হয়ে বলেছেন, "ভাল হোটেল থাকলে সেখান থেকেই খাবারটা আনাতাম। তা যখন নেই বলছ তখন গ্র্যান্ড কি গ্রেট ইস্টার্নেই যেতে হবে।"

গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ন রামভুজ বোঝেনি। কিন্তু হোটেল থেকে খাবার আনাবার কথাতেই শঙ্কিত হয়েছে।

"আপনি হোটেল কেনো যাবেন, বড়াবাবু," শশব্যস্ত হয়ে বলেছে রামভুজ, "আপনার খানা তো হামি ইখানেই লায়ে দিচ্ছি।"

ঘনাদা রামভুজের দিকে স্নেহভরেই তাকিয়েছেন এবার।

"তা তুমি আনতে পারো, রামভুজ, কিন্তু এখানকার কিছু নয়। এখানে আমি আর খাব না।"

"খাইবেন না ইখানে!" মুখটা পুরোপুরি হাঁ হয়ে যাবার আগে ওইটুকু বলতে পেরেছে রামভুজ।

উত্তর দেওয়াও বাহুল্য মনে করে ঘনাদা শুধু মাথা নেড়েছেন দুবার।

ঘনাদার এ চরম ঘোষণার পর প্রায় বিহ্বল অবস্থায় নেমে এসে রামভুজ আমাদের সব জানিয়েছে।

একটা কিছু ধাক্কার জন্য আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। কিন্তু সেটা এমন উৎকট হবে ভাবতে পারিনি।

আমাদের অমন মুহ্যমান দেখে হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করেছে রামভুজ, "হামি এখোন কী কোরবে! হামাকে খানা তো বাহারসে লাতে বোলিয়েছেন।"

"লাতে বোলেছেন তো লাও," শিবু হঠাৎ চটে উঠেছে, "খাবার লাতে তো বোলেছেন, পয়সা দিয়েছেন?"

"পয়সা উনি আগে দেবেন!" শিশিরই ঘনাদার মান বাঁচাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, "উনি কি তোমার আমার মতো হেঁজিপেঁজি যে নগদা দামে সওদা করেন! যত ওপরে তত সব ধারে কারবার। মার্কিন মুলুক হলে ওঁর ক্রেডিট কার্ড থাকত তা জানো! শুধু একটু পাঞ্চ করিয়েই যেখানে যা প্রাণ চায় নিতেন।"

"হ্যাঁ, সেই ভুলই করেছেন নিশ্চয়।" গৌর শিশিরকে ঠোকা দিয়েছে, "বনমালি নস্কর লেনটা ভেবেছেন ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ।"

এর পর ঘনাদার ভুলটা আমাদেরই সামলাতে হচ্ছে তাঁর ক্রেডিট কার্ড-এর দায়

নিয়ে।

তার জন্য ঝামেলা বড় কম নয়। একটা নয়, দু-দুটো টিফিন কেরিয়ার আনতে হয়েছে কিনে। থালা-বাটি গেলাসগুলো অবশ্য আমাদের বাহাত্তর নম্বরেরই। ঘনাদা সেগুলো চিনতে পারেননি বা মাপ করে যাচ্ছেন।

তা মাপ করবার জন্য পুজোও চড়াতে হচ্ছে কি কম! দুটি টিফিন কেরিয়ার ভর্তি নৈবিদ্যি দুবেলা পাঠাতে হচ্ছে আমাদের ওই বাহাত্তর নম্বরের হেঁশেলেই রান্না করে।

সে রান্নার গন্ধ তাঁর টঙের ঘর থেকেই ঘনাদার পাবার কথা, কিন্তু নাকের সে কাজটা তিনি আপাতত মুলতুবি রেখেছেন বোধহয়। রামভুজ আর বনোয়ারি তাঁর খাবার নিয়ে যাবার পরে মাঝে মাঝে তিনি শুধু একটু তারিফ করে তাদের কৃতার্থ করেন।

"হোটেলটা তো ভালই খুঁজে বার করেছ, রামভুজ! রান্না-টান্না তো বেশ সরেস মনে হচ্ছে! হোটেলটা কোথায়?"

"এই নীচে, বড়াবাবু," রামভুজ লজ্জিত হয়ে বলে, "এই নীচেই আছে!"

ঘনাদা ওইটুকুর বেশি আর খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না, এই বাঁচোয়া।

কিন্তু এমন করেই বা চলবে কতদিন! ছুঁচ হয়ে শুরু হয়ে ব্যাপারটা সত্যিই যে ফাল হতে চলেছে! অথচ লাল পেন্সিলে 'টু লেট' বিজ্ঞাপন দাগানো আর বাহাত্তর নম্বরের পৃথগন্ন হওয়ার ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল অতি সামান্য ছুতো থেকে।

দোষটা অবশ্য শিবুর। ঘনাদা না হয় পাতে দু-দুটো প্রমাণ সাইজের বাটামাছ ভাজা নিয়েও একটি চিপটেন কেটেছিলেন, "বাটা মাছ এনেছ হে! এ যে বড় কাঁটা!"

তাই বলে পরের দিন ওই শোধটুকু না নিলে চলত না?

শিবুই আজকাল আমাদের পার্মানেন্ট মার্কেন্টিং অফিসার। ঘনাদাকে কচি মুলো খাওয়াবার সেই কেলেঙ্কারির পর মনে মনে তার বোধহয় একটু জ্বালাই ছিল। বাজারের সেরা বাছাই করা বাটার নিন্দায় সেটা আরও চাগিয়ে উঠেছে।

পরের দিন কী একটা ছুটির তারিখ। দুপুরবেলা বেশ একটু জমিয়ে খেতে বসে ঘনাদাকে ঘন ঘন আমাদের সকলের থালাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে দেখে একটু অবাক হয়েছি। আমাদের নজরও তখন গেছে ঘনাদার পাতে।

সত্যিই তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমাদের সকলের পাতে বড় বড় জোড়া কই আর ঘনাদার পাতে কী ও দুটো। আরে! ও তো বেলেমাছ! আমাদের কই আর ঘনাদার বেলে!!

"ঠাকুর!" আমরাই ঘনাদার আগে ডাক দিয়েছি।

কাঁচুমাচু মুখ করে রামভুজ এসে দাঁড়াতেই বুঝেছি ব্যাপারটা নেহাত দৈবদুর্ঘটনা নয়।

ঘনাদার পাতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেছি সবিস্ময়ে, "ঘনাদার পাতে বেলেমাছ কেন?"

রামভুজকে জবাব দিতে হয়নি! এতক্ষণ মাথা নিচু করে যে কইমাছের কাঁটা বাছছিল সেই শিবু মুখ তুলে চেয়ে এ-রহস্যে আলোকপাত করেছে।

সহজ সরল গলায় বলেছে, "বেলেমাছ আমি দিতে বলেছি।"

"তুমি দিতে বলেছ!" আমরা হতভম্ব! "আমাদের বেলা কই আর ঘনাদার বেলা বেলে!"

"হ্যাঁ," শিবু যেন আমাদের এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়িতেই অবাক, "অন্যায়টা কী হয়েছে তাতে! ঘনাদার কাঁটাতে ভয়, তাই ওঁর জন্য আলাদা মোলায়েম মাছ এনেছি।"

আমরা স্তম্ভিত নির্বাক।

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটা 'হুঁ' শোনা গেছে।

না, মেঘের চাপা গর্জন নয়, ঘনাদা তাঁর নিজস্ব মন্তব্য ওই ধ্বনিটুকুতে প্রকাশ করেছেন।

তারপর পাত ফেলে উঠে গেছেন কি? না, তা ঠিক যাননি, তবে এক মুহূর্তে আমরা যেন তাঁর কাছে হাওয়া হয়ে গেছি। আমাদের সাধ্যসাধনা মিনতি যেন তাঁর কানেই পৌঁছয়নি।

খাওয়া শেষ করে ঘনাদা ওপরে উঠে গেছেন। আমরা শিবুকে নিয়ে পড়ে তাকে প্রায় ছিঁড়ে খেয়েছি। কিন্তু হাতের তির ছুটে গেলে ধনুকের ছিলা ছিঁড়েখুঁড়ে আর লাভ কী! যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না।

তবু অল্পে-স্বল্পে রেহাই পাবার আশায় বিকেল না-হতেই রামভুজকে টঙের ঘরে পাঠিয়েছিলাম। ফল যা হয়েছে তা তো জানা। সেই থেকেই টিফিন কেরিয়ারে হোটেলের খানা আর কাগজ দাগানো লাল মানার দিন চলেছে।

কিন্তু একটা কোনও নিষ্পত্তি তো আর না হলে নয়।

মুশকিলের যে মূল, আসানের ফিকিরটা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছে। হ্যাঁ, শিবু-ই উপায়টা বাতলেছে নেহাত রাগের ঝাঁঝটা প্রকাশ করতে গিয়ে।

"লালের জবাব তো সবুজ! তাই দিতে হবে এবার।"

"সবুজ আবার কী জবাব?" আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

"উনি লাল পেন্সিলে দাগাচ্ছেন," শিবু ব্যাখ্যা করেছে, "আমরা সবুজে দাগাব কাল থেকে!"

"কী দাগাব?"

"কী আবার! ওই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন।" শিবু নিজের প্রস্তাবে নিজেই মেতে উঠে বুঝিয়ে দিয়েছে, "আমরাও এ-বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে দিচ্ছি—তাই কাল সকালে প্রথমেই 'টু-লেট'-এর পাতায় সবুজ দাগ পড়বে।"

শিবুর ওপর যত রাগই করি, ফন্দিটা তার নেহাত মন্দ নয়। অন্তত ডুবতে বসে শেষ কুটো হিসেবে একবার ধরা যায়।

কিন্তু তাতেই অমন বাজিমাত হবে আমরাই কি ভাবতে পেরেছি!

সবুজ পেন্সিল আগেই জোগাড় করা ছিল। ভোরে উঠে একেবারে রাস্তায় গিয়েই কাগজওয়ালার হাত থেকে ইংরেজি, বাংলা দুটো কাগজই নিয়েছি। তারপর সুবজ দাগ মেরেছি খাবারঘরেই বসে বসে।

দাগ মেরেছি খুব বিবেচনা করে মাত্র দুটি বিজ্ঞাপনে। ঘনাদার যেমন আমিরি নজর, আমাদের তেমনি ফকিরি। কোথায় দূরে শহরতলির কোন এঁদো গলিতে সস্তা ভাড়ায় টালির ছাদের দুটো ঘর। দাগ মেরেছি তাতেই। দাগ মেরেছি তারও অধম এজমালি উঠোন বাথরুমের আর একটা ঘর-ভাড়ার বিজ্ঞাপনে।

সকালের চায়ের ট্রের সঙ্গে—চা-টাও অন্য হোটেলের বলেই ধরে নেন ঘনাদা—বনোয়ারি যথারীতি খবরের কাগজগুলো নিয়ে গিয়েছে টঙের ঘরে।

আমরা সবাই মিলে তখন বাহাত্তর নম্বর থেকেই হাওয়া। প্রতিক্রিয়াটা পরে রামভুজের মারফতই জানতে পেরেছি।

সকালে কাগজ উলটে ঘনাদার চোখ যদি একটু কপালে উঠে থাকে, তার সাক্ষী কেউ নেই। কিন্তু দুপুরে টিফিন কেরিয়ার বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাত সাজাবার সময় রামভুজকে প্রথমে দু-একটা নেহাত যেন অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে।

"নীচে যে আজ সব কেমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, রামভুজ?"

এমনই একটু ছুতো পাবার আশাতেই রামভুজকে ভোর থেকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছে। সে আশা বিফল হয়নি। রামভুজও আমাদের শিক্ষার মান রেখেছে।

ঘনাদা কথাটা পাড়তে না পাড়তেই রামভুজ হতাশ মুখ করে জানিয়েছে যে তার আর বনোয়ারির হয়রানির অন্ত নেই। বাবুরা সেই ভোরবেলা বেরিয়েছেন। কখন ফিরে আসবেন কে জানে! যতক্ষণ না আসেন তাদের এই হেঁশেল পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে।

"তা ওঁরা গেছেন কোথায়!" এবার ঘনাদার প্রশ্নটা আর ঘোরালো নয়, গলাটাও তীক্ষ্ণ।

রামভুজ এবার আসল বোমাটি ছেড়ে যেন অত্যন্ত কাতরভাবে জানিয়েছে যে বাবুরা নাকি কোথায় নতুন বাসা দেখতে গেছেন। এ-বাড়ি তাঁরা ছেড়ে দেবেন।

"এ-বাড়ি ছেড়ে দেবেন!" ঘনাদার গলায় মেঘের ডাকটা যেন কেমন ঝিমোনো মনে হয়েছে।

"হাঁ, বড়াবাবু!" রামভুজ চিড়টায় চাড় লাগিয়েছে। "আপনে ই মোকান ছোড়কে যাচ্ছেন, বাবুরাও তাই ইখানে আর থাকবেন না।"

ব্যস, রামভুজের এর বেশি কিছু বলবার দরকার হয়নি। দুপুরে একটু দেরি করে ফেরার পর খাবারঘরে তার কাছেই বিবরণটা শুনে ওষুধ একটু যেন ধরেছে বলে আশা হল।

আশা হবার একটা কারণ ঘনাদার হাত-ফেরতা খবরের কাগজগুলো। সেগুলো নিয়মমতোই ঘনাদা ফেরত পাঠিয়েছেন, কিন্তু 'টু-লেট'-এর সারিতে লাল দাগ কোথায়? আমাদের সবুজ পেন্সিলের দাগরাজিই সেখানে একেশ্বর হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

হাওয়া একটু ঘুরেছে তাহলে নিশ্চয়। চাল বদলে এবার কোন দিকে মোড় ফিরবেন ঘনাদা?

মোড় যা ফিরলেন তা মাথা ঘোরাবার মতোই।

বিকেলে আড্ডাঘরে জমায়েত হয়ে ঘনাদার পরের চাল আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় সেই টেলিগ্রাম।

না, পোস্টাফিসের বিলি করা টেলিগ্রাম নয়, ঘনাদা রামভুজের হাতে টেলিগ্রাম করতে যা পাঠাচ্ছেন তারই খসড়া।

রামভুজ সে খসড়া নিয়ে অসহায়ভাবেই আমাদের শরণ নিতে এসেছে।

"বড়াবাবু তার আভি তুরন্ত ভেজতে বোললেন। হামি তো কৈসে ভেজবে কুচ্ছু জানি না।"

কী এত জরুরি টেলিগ্রাম! রামভুজের হাত থেকে নিয়ে দেখতেই হল খসড়াটা।

দেখে খানিকক্ষণ কারও মুখে আর কোনও কথা নেই। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই তখন হাঁ হয়ে আছি।

টেলিগ্রাম কোথায়! এ তো কেব্‌লগ্রাম। ভাষাটা এই—

PACIFIC COMMAND
GUAM

ACCEPTING OFFER BUT ANGRY BECAUSE PRESCRIPTION NOT FOLLOWED, HOWEVER DON'T PANIC, SHALL SAVE THE PACIFIC AGAIN.

DAS.

"মানে বুঝলে কিছু?" শিবুই প্রথম সবাক হল, "ঘনাদা প্যাসিফিক কম্যান্ড মানে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের মুরুব্বি কর্তাদের প্রায় ধমকে টেলিগ্রাম করেছেন।"

"গায়ে পড়ে নিজে থেকে টেলিগ্রাম নয়, এটা তাদের টেলিগ্রামের জবাব," বিস্তারিত করলে গৌর, "তারা সাধাসাধি করায় অনেক কষ্টে রাজি হয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার উদ্ধার করতে।"

"ওই 'আবার' কথাটা মনে রেখো।" শিশির স্মরণ করালে, "তাব মানে এর আগেও একবার উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিধান না শোনায় নতুন করে আবার বিপদ বেধেছে। আবার উদ্ধার করবার আশ্বাস দিয়েও তাই রাগটা জানাতে ছাড়েননি।"

"কিন্তু এটা লাল, না সবুজ?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"ঠিক! ঠিক!" সবারই এবার খেয়াল গেল কথাটা।

"লাল তো ঠিক নয়।" দ্বিধাভরে বললে শিশির।

"একটু সবজে ঝিলিক যেন মারছে!" গৌর আশায় দুলল।

"আলবত সবুজ!" তুড়ি মেরে বললে শিবু।

হাতে পাঁজি তো মঙ্গলবার কেন? খসড়াটা নিয়ে আমি টঙের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম। অন্যেরাও আমার পেছনে। শিশির শুধু চট করে নেমে গিয়ে হেঁসেলে কী যেন বলে এল।

পা তো বাড়ালাম, কিন্তু সিঁড়ির একটা করে ধাপ উঠি আর ধুকপুকুনিও বাড়ে।

কী করবেন ঘনাদা? রং চিনতে ভুল যদি হয়ে থাকে তাহলে তো সর্বনাশ। শিবুকে শুধু 'আপনি'তে তুলেছিলেন আর এবার আমাদের হাতে তো সত্যিই হ্যান্ডনোট লিখে দেবেন।

যা হবার হয় হোক। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কপাল ঠুকে তাই ঢুকে পড়লাম টঙের ঘরে।

কই, বিস্ফোরণ তো কিছু হল না। ঘনাদা এক মনে তাঁর কলকেতে টিকে সাজাতে সাজাতে একবার শুধু আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন মাত্র। সে চোখে কি ভ্রূকুটি? না, তাও তো নয়।

আর আমাদের পায় কে?

"ও কেব্‌লগ্রাম পাঠানো চলবে না, ঘনাদা।" গৌরই মওড়া নিলে। আমরা তখন তক্তপোশের যে যেখানে পারি বসে গেছি।

"পাঠানো চলবে না বলছ?" ঘনাদাও যেন ভাবিত, "কিন্তু ওরা যে আশা করে আছে!"

"থাক আশা করে!" আমাদের মেজাজ গরম! "একবার ডাকলেই আপনি মালকোঁচা মেরে ছুটবেন নাকি? আপনার মান সম্মান নেই?"

"আর তা ছাড়া আপনি তো একবার উদ্ধার করে এসেছেন!" গৌরের জোরালো যুক্তি, "শোনেনি কেন আপনার কথা!"

"এখন যদি যেতে হয় তো শুধু কেব্‌লগ্রামে হবে না।" আমাদের ন্যায্য দাবি— "প্যাসিফিক কম্যান্ডের মাতব্বরেরা নিজেরা এসে সাধুক!"

"ঠিকই বলেছ।" ঘনাদা প্রশান্ত মহাসাগরের জন্য একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন! "কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো। একেবারে যে শিরে সংক্রান্তি! এখুনি না রুখতে পারলে প্যাসিফিক যে ডেড সি হয়ে যাবে দুদিনে। প্রশান্তর বদলে গরল সাগর!"

"গরল সাগর হয়ে যাবে? কীসে?"

"কীসে আর," ঘনাদা তাঁর দৃষ্টিটা শিবুর ওপরই ফোকাস করে বললেন, "কাঁটায়।"

"কাঁটায়? কীসের কাঁটা?" শিবু তার অস্বস্তিটা সন্দেহের সুরে চাপা দিলে।

"বাটা কি কই-এর কাঁটা নয়," ঘনাদা চুটিয়ে শোধ নিলেন, "কাঁটা হল অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি-র, যার আরেক নাম হল কাঁটার মুকুট।"

"কী হয় সেই—ওই কী হলে একান যা যা..."

"থাক! থাক! জিভে গিঁঠ পড়ে যাবে!" ঘনাদার কাছে শিবুর আজ রেহাই নেই— "তার চেয়ে কাঁটার মুকুটই বলো। কী হয় ও-কাঁটার মুকুটে জিজ্ঞাসা করছ? যা হয় তা জানাতে গিয়ে ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফালিক অ্যাটল-এ সমুদ্রের তলাতেই হাড় ক-খানা মাছেদের ঠোকরাবার জন্যে প্রায় রেখে আসছিলাম।"

"মাছেদের রুচল না বুঝি!" প্রায় সর্বনাশই করে বসল শিবু তার গায়ের জ্বালাটা চাপতে না পেরে।

আমরা তো তখন দম্ বন্ধ করে আছি।

"রুচল না-ই বলতে পারো!" ঘনাদা কিন্তু একটু হেসে বললেন, "তবে তা রুচলে সিগুয়াটেরা আর শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন, স্কুবা গিয়ার আর দশানন রাবণেরও দর্পহারী ষোল থেকে একুশ বাহুবলে বলী সমুদ্রত্রাস অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি-র কথা অজানাই থাকত, আর প্যাসিফিক কম্যান্ডের টনক নড়বার আগে অর্ধেক প্যাসিফিকই যেত, সত্যি যাকে বলে, রসাতলে। যাক সে কথা।"

মাথাগুলো তখন ঘুরছে, কিন্তু ঘনাদাকে যে আবার না চাগালে নয়!

আমাদের কথা যেন ভুলে গিয়ে নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে তিনি যে তাঁর গড়গড়ায় টান শুরু করেছেন!

চোখের দৃষ্টিতে শিবুকে প্রায় ভস্ম করে ঘাটের কাছে এ ভরাডুবি বাঁচাবার উপায় খুঁজছি, এমন সময় টঙের ঘরের দরজায় স্বয়ং সংকট-মোচনের আবির্ভাব।

বেশটা অবশ্য তাঁর বনোয়ারির আর হাতে সদ্যভাজা দিগ্বিদিকে সুবাস ছড়ানো মশলা পাঁপরের একটি চ্যাঙাড়ি।

বুঝলাম তাড়াতাড়িতে এর চেয়ে জবর কিছুর ব্যবস্থা করে আসতে পারেনি শিশির।

কিন্তু দিনটা আমাদের পয়া। ওই মশলা পাঁপরেই ডবল প্লেট প্রন কাটলেটের কাজ হয়ে গেল। তার আগে ছোট একটু ফাঁড়া অবশ্য কাটাতে হয়েছে।

ঘনাদা গন্ধের টানেই মুখ ঘুরিয়েছিলেন। বনোয়ারি চ্যাঙাড়িটা তাঁর সামনেই সসম্মানে রাখবার পর গড়গড়ার নলটা সরিয়ে যেন অন্যমনস্কভাবে একটা তুলে নিয়ে কামড় দিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছেন, "নীচে রামভুজের ভাজা নাকি?"

বনোয়ারি কী যেন বলতে যাচ্ছিল। আমরা সবাই এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠেছি।

"রামভুজের ভাজা মানে! রামভুজের হাতের পাঁপর এমন, দাঁতে দিলে কথা বলবে। দস্তুরমতো মোড়ের রাজস্থানি পাঁপর!"

সেই সঙ্গে পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে বলে বনোয়ারিকেও তাড়া দিতে হয়েছে, "যা যা, দেরি করিসনি। চা নিয়ে আয় শিগগির।"

আমাদের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে চা আনতে আনতেই অর্ধেক চ্যাঙাড়ি অবশ্য একাই ফাঁক করে ফেলেছেন ঘনাদা।

তারপর মৌজ করে তাঁকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে সুতোটা আবার ধরালাম। ইচ্ছে করে একটু ন্যাকাও সাজতে হল, "প্যাসিফিকে কোথায় কোন টোলের কথা যেন বলছিলেন আপনি!"

"টোল নয়, অ্যাটল!" ঘনাদা শুধরে খুশি হলেন, "অ্যাটল কাকে বলে জানো নিশ্চয়। অকূল সমুদ্রের মাঝখানে প্রবালে গড়া এক-একটা গোলাকার স্থলের বালা আর সেই বালার মাঝখানে স্বপ্নের মতো এক সায়র। মাঝখানের এই সায়রটুকুর জন্য অ্যাটল সাধারণ প্রবালদ্বীপ থেকে আলাদা। আকারেও তা ছোট। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অসংখ্য এই সব প্রবাল-দ্বীপ আর অ্যাটল-এর ফুটকি ছড়ানো।

অ্যাটল তো নয়, সে যেন পৃথিবীতে নন্দনকাননের নমুনা।

গিলবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে তখন ক্যারোলাইনে গিয়েছি সেখানকার

ম্যালাও-পলিনেশিয়ান ভাষার আদি রূপ খুঁজে বার করতে।

সেটা রথ দেখা মাত্র। আসল কলা বেচার কাজ হল প্যাসিফিকে গোলনে শিঙে-শাঁখের শুমারি নেওয়া আর তার চোরা শিকারিদের শায়েস্তা করা। আই. জি. এম. সি. ও. মানে ইন্টার গভর্নমেন্টাল ম্যারিটাইম কনসলটেটিভ অর্গানিজেশনই অবশ্য পাঠিয়েছিল।”

না, কাশি-টাশি নয়। শিবুকে শুধু একটু চোরা রামচিমটি কাটতে হল তার জিভের রাশ টানবার জন্য।

“ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের ইফালিক বলে এক অ্যাটল-এ তখন গিয়ে উঠেছি।” ঘনাদা তখন বলে চলেছেন, “নামে অ্যাটল, কিন্তু সত্যিই যেন পরীস্থান। যেমন তার মাঝখানের কাকচক্ষুজলের সায়র, তেমনই পরীদের যেন পাউডার বিছানো তার তীর আর তেমনই তার সারা দিনরাত হাওয়ায় দোলা নারকেলের বন।

ইফালিক অ্যাটল-এই পামারের সঙ্গে দেখা। পামার আর তার তিন সঙ্গী মিলে সেই অ্যাটল-এ বাসা বেঁধেছে।

পামারকে দেখলে যেন সমুদ্রের তরুণ দেবতা বলেই মনে হয়। যেমন শক্ত সবল তেমনই সুঠাম শরীর। পামারের সঙ্গী তিনজনও সবাই লম্বা চওড়া জোয়ান, যেন অলিম্পিকস থেকেই সব ফিরেছে। শুধু তাদের মুখগুলো যেন শরীরের সঙ্গে খাপ খায় না। দেহগুলো তাদের গ্রিক দেবতার আর মুখগুলো যেন দানবের।

ইফালিক-এর দুধে ধোয়া বালির তীরে তারা সারাদিন শুধু একটু কোপ্‌নি মাত্র পরে জল-খেলা করে। জলে সাঁতার, ঢেউয়ের ওপর তক্তা ভাসিয়ে ঘোড়ার মতো সওয়ার হয়ে দূর সমুদ্র থেকে তীরে ছুটে আসা, যাকে বলে সারফিং, কখনও বা হাতে পায়ে মাছের ডানার মতো ফ্লিপার আর মুখে অক্সিজেনের মুখোশ নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব সাঁতার, এই নিয়ে তাদের দিন কাটে।

ইফালিক অ্যাটল-এ পামার আর তার সঙ্গীদের দেখে আমি প্রথমে বেশ একটু অবাকই হয়েছিলাম। মাইক্রোনেশিয়ার এক অত্যন্ত আদিম গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোক ইফালিক ও তার কাছাকাছি প্রবাল-দ্বীপে ও অ্যাটল-এ থাকে বলে জানতাম। ম্যালাও-পলিনেশিয়ান ভাষার মূল কিছু ধারা তাদের কাছে সংগ্রহ করবার আশায় এ দ্বীপে আসা। কিন্তু ইফালিক-এ তাদের তো কোনও চিহ্নই দেখতে পেলাম না।

পামারকে সেই কথাই গোড়ায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। পামার তাচ্ছিল্যভরে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ‘কে জানে কোথায় গেছে। এখানে থাকলে তো আমরাই এসে তাড়াতাম।’

কথাটা ঠাট্টা হিসেবেই নিয়েছিলাম। পামার আর তার সঙ্গীদের কতকগুলো রসিকতা কিন্তু একটু বেয়াড়া ধরনের। যেমন, আমাকে নিয়ে তাদের ঠাট্টা গোড়া থেকে যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেত।

আমি আমার ছোট ইয়ল-এ সেখানে গিয়ে নামবার পরই অভ্যর্থনাটা একটু জোরালো রকম পেয়েছিলাম। নোঙর ফেলে ইয়ল থেকে নামতে-না-নামতেই তো পামারের কোলাকুলিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। সাড়ে ছ-ফুট লম্বা জোয়ান পামার করমর্দন

করার ছলে হাতের হেঁচকা টানেই তো প্রথমে বালির ওপর আমায় আছড়ে ফেলল। সেখান থেকে ওঠার পরও রেহাই নেই। এক এক করে পামারের তিন সঙ্গীর হাত-ঝাঁকানির উৎসাহে আরও তিনবার বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে হল। শেষবার ওঠবার পর পামার কাছে এসে জড়িয়ে বুকের মধ্যে চিঁড়েচেপটা করে মার্কিন স্ল্যাং-এ যা বললে বাংলায় তা বোঝাতে গেলে বলতে হয়, 'কোথা থেকে এলে বল তো, চাঁদ?'

অতি কষ্টে ককিয়ে বললাম, 'দম না পেলে বলি কী করে?'

পামার সজোরে বালির ওপর আমায় ছুড়ে দিয়ে আমার অনুরোধ রাখলে। আমি অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে ওঠার পর দেখি চারজনই আমায় ঘিরে আছে। পামারের একজন সঙ্গী আবার প্রশ্ন করলে, 'সত্যি করে বল তো, কী মতলবে এখানে এসেছিস?'

যা সত্য তা বলে কোনও লাভ নেই জেনে মিথ্যে একটা অজুহাত তখনই বানালাম। বললাম, 'স্কুবা-ডাইভিং-এর শখ। তাই নির্জন একটা দ্বীপের খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়েছি। কোনও মতলব নিয়ে আসিনি।'

'বেশ, বেশ,' পামার পিঠে বিরাশি সিক্কার একটি থাপ্পড় মেরে উৎসাহ দিলে, 'স্কুবা-ডাইভিং-এর শখ তোমার মিটিয়ে দেব।'

তা সত্যিই তারা মিটিয়ে দিলে। রোজ দুবেলা হাতে পায়ে মেছো ফ্লিপার আর পিঠে সিলিন্ডার বেঁধে, মুখে অক্সিজেনের মুখোশ নিয়ে সমুদ্রের তলায় ডুব-সাঁতারে যেতে হয়। জলের তলায় যা নাকানিচোবানি তারা খাওয়ায় তাতে শেষ পর্যন্ত শুধু প্রাণটা নিয়ে কোনও মতে ফিরতে পারি।

একদিন সে আশাটুকুও আর রইল না।

পামার আর তার সঙ্গীদের অমানুষিক অত্যাচার তখন কিন্তু একদিক দিয়ে আমার কাছে শাপে বর হয়েছে। জুলুম জবরদস্তির ওই ডুব-সাঁতারেই প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বনাশ কেমন করে ঘনাচ্ছে আর তার আসানের উপায় কী, সে হদিস আমি আরও ভাল করে পেয়ে গেছি।

কিন্তু সমুদ্রের তলাতেই আমার কবর হলে সেখানকার যে ভয়ংকর রহস্য আমি জেনেছি তা তো আমার সঙ্গেই লোপ পাবে।

পামার আর তার সঙ্গীরা সেদিন সেই ব্যবস্থাই করেছে। চারজনেই একসঙ্গে সেদিন স্কুবা-গিয়ার নিয়ে সমুদ্রের তলায় টহলে নেমেছিলাম।

প্রবাল-দ্বীপের সমুদ্র সত্যিই যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। গভীর জলের তলায় নানা আকার ও রঙের প্রবাল যেন এক আশ্চর্য স্বপ্নের ফুলবাগান সাজিয়ে রাখে। সেখানে যেসব মাছেরা ঘুরে বেড়ায় তারাও যেন কোন খেয়ালি শিল্পীর হাতে তৈরি ও আঁকা সব রং-বেরঙের অবাক মাছের কল্পনা।

ইফালিক অ্যাটল-এ সমুদ্রের তলায় একটা ব্যাপার গোড়া থেকেই তাই বিস্মিত করেছে।

প্রবাল-দ্বীপের সমুদ্র—কিন্তু তার তলায় কোথায় সেই রং-বেরঙের জলের প্রজাপতির মতো মাছ আর প্রবালের সেই পুষ্পিত শোভা?

এখানে প্রথম থেকেই প্রবালের ওপর কী যেন এক অভিশাপ লেগেছে বলে মনে হয়েছে। রং-বেরঙের প্রবালের বদলে শুধু খড়িমাটির মতো ফ্যাসফেসে যেন প্রবালের কঙ্কাল। রঙিন মাছের বদলে সেই সাদা প্রবাল-কঙ্কালের ওপর যেন বিদ্‌ঘুটে সব কাঁটা গাছের ঝোপ।

এখানকার সমুদ্রের তলার এই কুৎসিত রূপ দেখতে সেদিন অবশ্য আমিই পামারদের এনেছিলাম। এনেছিলাম এই বিশ্বাসে যে আমায় নিয়ে তাদের ফুর্তি করার ধরনটা বেশ একটু আসুরিক হলেও, পামার আর তার সঙ্গীরা একেবারে অমানুষ হয়তো নয়।

আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আগের দিন পামারের এক সঙ্গী একা একাই সমুদ্রে সাঁতার দিতে গিয়েছিল। ফিরল যখন তখন প্রায় আধমরা। একটা পা যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে অনবরত বমি করছে।

ব্যাপারটা কী হয়েছে তা বুঝে তখনই আমি ওষুধ দিয়ে তাকে সারাবার ব্যবস্থা করি, আর সেই সঙ্গেই পামারকে কয়েকটা স্পষ্ট কথাও শোনাতে বাধ্য হই।

অন্য সময় হলে কী করত তা জানি না, তবে চোখের ওপর তার মরণাপন্ন সঙ্গীকে বাঁচাতে দেখার পর পামার তখন আমার কথায় একটু কান না দিয়ে পারেনি।

'কী বলতে চাও তুমি?' পামার ঝাঁঝের সঙ্গেই অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সমুদ্রের অভিশাপে লিও-র এই দশা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জোর দিয়েই বলেছি, 'আর সে অভিশাপ তোমাদের মতো অবুঝ, লোভী মানুষই প্রশান্ত মহাসাগরে ডেকে আনছে।'

পামারের বাকি দুই সঙ্গী জো আর মার্ফি তখন ঘুষি বাগিয়ে প্রায় মারমুখো।

পামার চোখের ইশারায় তাদের ঠেকিয়ে কড়া গলায় জানতে চেয়েছে, 'লোভটা আমাদের কোথায় দেখলে?'

'দেখেছি কাল তোমাদের স্কুনার-এরই গুদাম ঘরে।' শান্তস্বরেই বলেছি।

এবার মার্ফি আর জো দুদিক থেকে বুনো মোষের মতো প্রায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কী! কিন্তু পামারের ধৈর্য অনেক বেশি, দুহাতে দুজনকে রুখে সে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেছে, 'আমাদের স্কুনার-এ কার হুকুমে তুমি উঠেছিলে?'

একটু হেসে বলেছি, 'হুকুম দরকার বলে তো মনে হয়নি। আপনাদের স্কুবা-ডাইভিং-এর উৎসাহ যে একটা ছল মাত্র তা তো জানতাম না।'

পামার অনেক কষ্টে এবারও সঙ্গীদের সামলে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আমাদের লোভে যা ডেকে আনছি সমুদ্রের সে অভিশাপটা কী তা জানতে পারি?'

'কাল আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে একবার স্কুবা-ডাইভিং-এ গেলেই তা দেখাতে পারব।'

পামার আমার অনুরোধ রাখতে রাজি হয়েছে। তার ধৈর্য দেখেই একটু অবাক হয়েছিলাম। আসল মতলবটা তখনও বুঝতে পারিনি।

অসুস্থ লিওকে অ্যাটল-এর তাঁবুতেই রেখে এসে আমরা চারজন তখন

স্কুবা-গিয়ার-এর দৌলতে ইফালিক-এর বাইরের সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চলেছি। প্রবাল-সমুদ্রের অপরূপ রঙিন শোভার বদলে নীচে সেই ফ্যাকাসে সাদা পাথুরে মাটি আর কুৎসিত কাঁটার ঝোপ।

নীচের দিকে নেমে যা দেখাবার ভাল করে দেখাতে যাচ্ছি, এমন সময় পিঠে একটা হ্যাঁচকা টান টের পেলাম। পরমুহূর্তে বুঝলাম আমার পিঠের অক্সিজেন সিলিন্ডার ওপর থেকে পামারের দলের কেউ ছুরি দিয়ে কেটে টেনে নিয়েছে। যেন বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে ওপর দিকে ঘুরলাম। কিন্তু তখন আর সময় নেই, আমার অক্সিজেন সিলিন্ডারটা নিয়ে পামার আর তার দুই সঙ্গী তিরের বেগে দূরে চলে যাচ্ছে। বিনা অক্সিজেনে তাদের সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দেবার কোনও আশাই নেই। আর সাঁতরে তাদের ধরতে পারলেও লাভ কী হবে। তাদের তিনজনের কাছে আমি একলা। পামার যে মনে মনে এত বড় শয়তানি ফন্দি এঁটেছে সেটুকু বুঝতে না পেরেই আমি নিজের শমন নিজেই ডেকে এনেছি।

পামার আর তার সঙ্গীরা কী আনন্দে তারপর ইফালিক অ্যাটল থেকে তাদের স্কুনার-এ রওনা হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কিন্তু সত্যিই যেন সমুদ্রের অভিশাপ তাদের তখন তাড়া করে ফিরছে। সমুদ্রে প্রথম রাতটা কাটাবার পরই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাদের তিনজন যেমন অবাক একজন তেমনই ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত সেই লিও-ও। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখে কে একদিকে আলকাতরা আর একদিকে চুন মাখিয়ে দিয়েছে।

সেদিন খুনোখুনি একটা ব্যাপার প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। জো আর মার্ফি ছাড়া এ-কাজ আর কেউ করতে পারে না ধরে নিয়ে লিও প্রথমেই তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। নেহাত পামার এসে বাধা না দিলে ব্যাপারটা রক্তারক্তি পর্যন্তই গড়াত।

পরের দিন কিন্তু পামারের মাতব্বরিতেও ঝগড়াটা মিটতে চায়নি। সেদিন ভোরে দেখা গিয়েছে জো আর মার্ফির মাথার চুল খাবলা খাবলা করে কে যেন তাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রে কেটে দিয়েছে।

পামারকে এদিন গায়ের জোর খাটিয়েই দাঙ্গা সামলাতে হয়েছে। কিন্তু তার পরদিন সকালে তার নিজের মুখেই চুন আর আলকাতরার মাখামাখি দেখবার পর রাগের চেয়ে আতঙ্কটাই বেশি হয়েছে সকলের।

এসব কী ভুতুড়ে ব্যাপার?

সবচেয়ে ভুতুড়ে ব্যাপার তারা সেইদিনই আবিষ্কার করেছে। জাহাজে তাদের লুকোনো গুদামঘর খুলতে গিয়ে পামার একেবারে হতভম্ব। সে-ঘর একদম খালি।

পামার তার স্কুনার-এর ডেক-এ সঙ্গী তিনজনকে ডেকে রেগে আগুন হয়ে এসব কিছুর মানে জানতে চেয়েছে। জ্বলন্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ঠিক করে বলো, এ শয়তানি তোমাদের কার?'

সঙ্গীদের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

পামার তার হাতের শঙ্কর মাছের হান্টারটা দুবার শূন্যে আস্ফালন করে হিংস্র বাঘের মতো গর্জন করে জানতে চেয়েছে, 'জবাব না পেলে তিনজনের পিঠের ছাল

চামড়া এই চাবুকের ঘায়েই আমি ছাড়িয়ে নেব। এখনও বলো, কে এ-কাজ করেছে?'

'আজ্ঞে, আমি।'

পামার আর তার তিন সঙ্গী চমকে দিশাহারা হয়ে চারিদিকে চেয়েছে। কে দিলে এ জবাব? আশেপাশে কোথাও কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

কড়া রাখবার চেষ্টাতেও একটু কেঁপে-ওঠা গলায় পামার জিজ্ঞাসা করেছে, 'কে? কে কথা বলছে?'

'আজ্ঞে, আমি—ইফালিক-এর সমুদ্রে যাকে চুবিয়ে মেরেছিলেন সেই দাসের ভূত।'

'দাসের ভূত!' পামার আর তিন সঙ্গী দিশাহারা হয়ে এবার চারিদিকে খুঁজে দেখেছে। কই, কোথাও কারও কোনও চিহ্ন তো নেই।

আকাশবাণীর মতো সেই ভুতুড়ে স্বর আবার শোনা গেছে, 'অত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। চাক্ষুষই এবার আমি দেখা দিচ্ছি।'

দেখা দেবার আগে পামারের দল তখন ভুতুড়ে আওয়াজের হদিস পেয়ে গেছে। একটা মাস্তুলের তলায় বাঁধা একটা রবারের নলের মুখে লাগানো ছোট একটা স্পিকার।

তারা সেটা নিয়ে যখন টানাটানি করছে তখনই পাশের মাস্তুল থেকে ডেক-এর ওপর নেমে এসে দাঁড়িয়েছি।

'ওসব নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? অধীন আপনাদের সামনেই হাজির।'

স্কুনার-এ যেন বাজ পড়েছে এমনই চমকে চারজন আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে এবার।

'তুই—!'

পামার রাগে তোতলা হয়ে গেছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।' মোলায়েম গলায় বলেছি, 'ভূত হয়েও আপনাদের ছায়া ছাড়তে পারিনি।'

'এসব শয়তানি তাহলে তোর?'

'তুই-ই আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়েছিস?'

'আমাদের লুকোনো মাল তুই-ই সরিয়েছিস?'

চারজনই একসঙ্গে গর্জে উঠেছে তখন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' সবিনয় স্বীকার করে বলেছি, 'আপনারা অক্সিজেন সিলিন্ডার কেড়ে নিয়ে সমুদ্রের তলায় ছেড়ে দিয়ে আসবার পর দেহটি সেইখানে ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে ওপরে ভেসে উঠি। আপনারা তখন ইফালিক অ্যাটল থেকে ডেরা তুলে এই স্কুনার-এ সরে পড়বার জোগাড় করছেন। সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে এই জাহাজেরই ইঞ্জিনঘরে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হল আমায় নিয়ে যা রসিকতা এর আগে করেছেন তার একটু ঋণ শোধ না করলে ভাল দেখায় না। তাই আপনাদের মুখগুলোর ওপর একটু হাতের কাজ দেখিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আপনাদের বড় সাধের লুকোনো দৌলতও একটু হাতসাফাই করেছি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই চারদিক থেকে আফ্রিকার সবচেয়ে খ্যাপা চারটে জানোয়ার যেন আমায় তাড়া করে এল। তাদের একটা গণ্ডার, একটা বুনো মোষ, একটা হাতি, আর একটা সিংহ।

ঠকাস করে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল তারপর। আমি তখন জাহাজের রেলিঙের ধারে। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আহা, লাগল নাকি?'

চার ষণ্ডা যেন তুফানের ঢেউ হয়েই আবার ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে।

রেলিঙে লেগে দুজনের মাথা ফাটল, আর দুজন রেলিং টপকে পড়তে পড়তে কোনওরকমে রেলিঙের বার ধরে ফেলে নিজেদের সামলাল।

আমি তখন বাণ মাছের মতো পিছলে আবার মাস্তুলের দিকে চলে গেছি। সেখান থেকে যেন মিনতি করে বললাম, 'মিছিমিছি হয়রান হয়ে মরছেন কেন? বললাম তো, এখন আমি সূক্ষ্ম শরীরে আছি। ভূত-প্রেত কি গায়ের জোরে ধরা যায়?'

আমার উপদেশটা মাঠেই মারা গেল। চারমূর্তি আবার এল পাঁয়তাড়া কষে। বাধ্য হয়ে আরও কিছুক্ষণ তাই খেলতে হল তাদের নিয়ে। সে-খেল শেষ হবার পর ডেকের ওপর চার ষণ্ডাই লম্বা। হাপরের মতো তাদের শুধু হাঁপানিই শোনা যাচ্ছে।

চারজনকেই এবার একটু কষ্ট করে বাঁধতে হল। সবশেষে পামারকে বাঁধতে বাঁধতে বললাম, 'মাপ করবেন, বেশিক্ষণ বাঁধা থাকতে আপনাদের হবে না। গুয়াম-এর কাছেই প্রায় এসে পড়েছি। সেখানে পৌঁছেই আপনাদের ছেড়ে দেব।'

'গুয়াম!' ওই অবস্থাতেই পামার হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠল, 'গুয়াম এখানে কোথায়?'

'বেশি দূরে নয়।' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আমরা আপ্রা বন্দরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি। বেতারে প্যাসিফিক কমান্ডের অনুমতি পেলেই পিটি জেটিতে গিয়ে স্কুনার ভেড়াব।'

গুয়াম, আপ্রা, পিটি শুনে চারজনেরই চক্ষু তখন চড়কগাছ। তারই মধ্যে কী যেন বলতে গিয়ে পামারের গলায় অস্পষ্ট একটা গোঙানি শুধু শোনা গেল।

ব্যাখ্যাটা নিজেই এবার করে দিলাম, 'যতটা ভাবছেন ব্যাপারটা তত আজগুবি নয়। আপনারা ওপরের কনট্রোল রুমে হালের চাকা ঘুরিয়েছেন আর আমি এ ক-দিন ইঞ্জিনঘরে লুকিয়ে কল বিগড়ে দিয়ে জাহাজের গতি পালটে দিয়েছি।'

উত্তরে চারজনে প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করলে খানিক। চোখের দৃষ্টিতে আগুন থাকলে তখন ওইখানেই ভস্ম হয়ে যেতাম।

তাদের ওই অবস্থায় রেখে কনট্রোল রুমে গিয়ে রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে বসলাম। প্রথমেই তাতে ডাক পাঠালাম, 'প্যান-প্যান-প্যান।'"

প্যান-প্যান করলেন তাহলে?—জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল। কোনও রকমে নিজেকে সামলালাম। আমাদের মনের সন্দেহটা চোখে সম্পূর্ণ কিন্তু লুকোনো বোধ হয় যায়নি।

ঘনাদা তাই আমাদের ওপর একটু করুণা কটাক্ষ করে বললেন, "প্যান-প্যানটা

বুঝলে না বুঝি? ওটা হল আন্তর্জাতিক রেডিও সংকেত। প্যান-প্যান শুনলেই যেখানে যত রেডিও চালু আছে সব কান খাড়া করে থাকবে। এর পরেই জরুরি কিছু খবর দেওয়া হবে প্যান-প্যান তারই সংকেত।"

প্যান-প্যানের রহস্য বুঝিয়ে দিয়ে ঘনাদা আবার বলতে শুরু করলেন, "প্যান-প্যান সংকেতের পর যে খবরটা ছাড়লাম সেটি শুনতে দু-কথার হলেও একেবারে একটি মেগাটন বোমা। রেডিওতে জানালাম—প্যাসিফিক বাঁচাবার দাওয়াই নিয়ে এসেছি। বন্দরে ঢুকতে দাও।'

খানিকক্ষণ রেডিওতে কোনওদিক থেকে কোনও সাড়াই নেই। রেডিও-সংকেত আর সংবাদ যারা পেয়েছে তারা সবাই বোধহয় হতভম্ব। আমার সংবাদটা আরও দুবার পাঠাবার বেশ কয়েক মিনিট বাদে একটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রশ্নই শোনা গেল। নেহাত যান্ত্রিক রেডিও না হলে সেটা মেঘ-গর্জনের মতোই শোনাত।

প্রশ্নটা হল, 'কে তুমি? প্যাসিফিক বাঁচাবার কথা নিয়ে প্রলাপ বকছ?'

জবাবে জানালাম, 'আমার পরিচয় পরে পাবেন। আমার প্রলাপ আগে আর-একটু শুনুন। গুয়াম-এর বাইশ মাইল প্রবাল প্রাচীর কীসে ধ্বংস হয়েছে জানেন নিশ্চয়? অস্ট্রেলিয়ার একশো বর্গমাইল ব্যারিয়ার রিফ-ই বা ধ্বসে গলে গিয়েছে কীসে? সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়ানো সব প্রবাল-দ্বীপ আজ দিন গুনছে কোন অমোঘ সর্বনাশের? প্রশান্ত মহাসাগরের এই ভয়ংকর অভিশাপের নাম কি অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি?'

আর কিছু বলতে হল না। গুয়াম-এর প্যাসিফিক কমান্ডের ঘাঁটি থেকেই ব্যস্ত ব্যাকুল প্রশ্ন এল রেডিওতে, 'এ অভিশাপ কাটাবার উপায় সত্যিই আছে?'

জানালাম, 'আছে কিনা পরখ করেই যান না। আমি বন্দরের বাইরেই স্কুনার নিয়ে অপেক্ষা করছি।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দুটি গান-বোটে প্যাসিফিক হাই কম্যান্ডের তিন-তিন জন মাথা এসে হাজির।

প্রথমটায় তিনজনেই বেশ একটু সন্দিগ্ধ। একজন তো গরম হয়ে আমার ওপর তম্বিই করলেন, 'কই, কোথায় তোমার প্যাসিফিক বাঁচাবার দাওয়াই?'

একটু হেসে তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্কুনার-এর একটা গুপ্তঘর খুলে দিলাম।

তিনজনই তখন আমার ওপর খাপ্পা, 'রসিকতা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? এই তোমার দাওয়াই? এ তো এক জাতের শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন, ঘর সাজাবার জন্যে শৌখিন লোকেরা চড়া দামে কেনে।'

'হ্যাঁ, তা কেনে, আর তাই থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের চরম সর্বনাশের সূচনা। গত ক-বছর ধরে হঠাৎ রক্তবীজের মতো লাখে লাখে বেড়ে উঠে যে অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি প্রবাল আবরণ খেয়ে খেয়ে ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত ছোট-বড় দ্বীপ ধ্বংস করে দিচ্ছে ওই শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন তারই যম। বাচ্চা অবস্থাতেই অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি খেয়ে ফেলে এই ট্রাইটন তাদের অভিশাপ হয়ে ওঠার মতো বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। কিন্তু নিজেদের লোভে আর আহাম্মুকিতে

এই ট্রাইটন শিকার করে মানুষ তার নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মানুষের সেই রকম শত্রু চারজনকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে দিচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার সুস্থ করে তোলার দাওয়াই এই ট্রাইটন।'"

ঘনাদা চুপ করলেন। আমাদের সকলের মুখেই তখন এক জিজ্ঞাসা, "অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচিটা কী জিনিস?"

"জিনিস নয়, প্রাণী, ওর আর একটা ডাক নাম হল কাঁটার মুকুট।"

"কাঁটার মুকুট?" আমরা তাজ্জব, "ওই কাঁটার মুকুটেই অস্ট্রেলিয়ার একশো বর্গমাইল ব্যারিয়ার রিফ লোপাট হয়ে গেল? গুয়াম-এর বাইশ মাইল প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেল ওতেই?"

"হ্যাঁ।" ঘনাদা অর্ধনিমীলিত চোখে গড়গড়ায় একটা সুখ টান দিয়ে বললেন, "ওই কাঁটার মুকুট অ্যাকান্থ্যাস্টার প্লানচি বিকট এক জাতের তারা মাছ। রাবণের কুড়িটি হাত ছিল বলে শুনি, আর হাত-দেড়েক চওড়া এ তারা মাছের ষোলো থেকে একুশটা পর্যন্ত বাহু হয়। সমস্তটাই সাংঘাতিক কাঁটায় ভর্তি। সে কাঁটায় সিগুয়াটেরা নামে এমন এক দারুণ বিষ থাকে যা গায়ে ফুটলে শরীর অসাড় হয়ে যায় আর বমির ধমক থামতে চায় না। ইফালিক অ্যাটল-এ এই কাঁটা লেগেই লিও-র ওই দুর্দশা হয়েছিল। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত এই সর্বনাশা তারামাছ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হবার কোনও কারণই ঘটেনি। তারপর জানা-অজানা নানা কারণে সত্যিই রক্তবীজের মতো এ অভিশাপের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সমস্ত প্রবাল-দ্বীপের তলায় গিজগিজ করছে এখন এই কাঁটার মুকুট। এদের আহার হল প্রবাল। প্রবালের ওপরের খোলস খেয়ে ফেলার পর যে-প্রবাল প্রাচীর প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপের রক্ষাকবচ হিসেবে ঘিরে থাকে তা দুর্বল হয়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত আর ঠেকাতে পারে না। দ্বীপগুলির চারিধারে সেখানকার সাধারণ মাছ প্রবাল প্রাচীরের আড়ালে আর আশ্রয় পায় না। দ্বীপগুলিও ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। এ কাঁটার মুকুটের খিদে এমন রাক্ষুসে যে এদের একটি ঝাঁক এক মাসে আধ মাইল প্রবাল প্রাচীর খেয়ে ফেলতে পারে আর ফেলছেও তাই। এ রাক্ষুসে তারামাছের একমাত্র যম হল শিঙে-শাঁখ ওই ট্রাইটন। ট্রাইটন শিকার বন্ধ করে আবার কাঁটার মুকুটের ওই স্বভাবশত্রুকে বাড়তে দিলে প্রশান্ত মহাসাগরকে বাঁচানো এখন সম্ভব। প্যাসিফিক কম্যান্ডকে এই দাওয়াই-ই বাতলে এসেছিলাম।"

খানিকক্ষণ আমাদের জিভ-টিভ সব অসাড়।

কাঁটার খোঁচাটার আসল যে লক্ষ্য সেই শিবু তো লজ্জায় অধোবদন।

ঘনাদাকে প্যাসিফিক কমান্ডের ডাকে যেতে আমরা দিইনি। অত যদি তাদের গরজ তাহলে শুধু টেলিগ্রাম কেন, নিজেরা এসে ঘনাদাকে তারা নিয়ে যাক।

কিন্তু এলে ঠিকানাটা তো তাদের খুঁজে পাওয়া চাই। খবরের কাগজের টু-লেট

দাগানো ছেড়ে ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বরেই তাই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে।

আমাদেরও এ অবস্থায় ঘনাদাকে একলা এখানে ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

বাহাত্তর নম্বরই তাই এখনও গুলজার।

গান

সাংঘাতিক অবস্থা বাহাত্তর নম্বরের।

কেন, কী হল?

কী আবার হবে! খেয়ে বসে সুখ নেই। রাত্রে ঘুম নেই।

কী হয়েছে কী আসলে?

যা হয়েছে তাই জানাতেই তো টঙের ঘরে সাত সকালে গিয়ে হাজির হয়েছি।

আমাদের চেহারাগুলোই আমাদের বক্তব্যের বিজ্ঞাপন।

শিশিরের চুলে অন্তত হপ্তাখানেক তেল পড়েনি। মাথাটা যেন কাকের বাসা!

গৌর দাড়ি কামায়নি ক-দিন তা কে জানে! জামাটা যে ময়লা আর বোতামগুলো যে ছেঁড়া তা-ও তার খেয়াল নেই।

শিবু গালে ক্ষুর লাগায়নি, মাথায়ও তেল ছোঁয়ায়নি তো বটেই, তার ওপর ক-দিন ক-রাত্রি ঘুম না হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ দুচোখের কোণে কালি লাগিয়েছে।

আর আমি? ভয়ে ভাবনায় দিশেহারা হয়ে দুপাটির দুটো আলাদা জুতো দুপায়ে গলিয়ে ভুল করে শিবুর ঢাউস শার্টটাই গায়ে চড়িয়ে এসেছি।

টঙের ঘরে প্রায় ফাঁসির আসামির মতো কালিমাখা মুখে ঢুকে তক্তপোশের ধারে কোনও রকমে বসেও আমরা প্রথমটা যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছি।

যা বলতে এসেছি আমাদের ভয়ে শুকনো গলা ঠেলে তা যেন বেরুতেই চায়নি।

কী করছেন তখন ঘনাদা?

না, একেবারে নির্বিকারভাবে তাঁর তক্তপোশটির ওপর বসে গড়গড়ায় টান দেননি। এমন কী তাঁর কেরাসিন কাঠের শেলফ হাতড়ে আশ্চর্য কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টাও তাঁর দেখা যায়নি।

একটু ভাল করে শার্লকি দৃষ্টিতে মেঝেটা লক্ষ করলে একটু যেন সন্দেহজনক

ব্যাপারেরই আভাস পাওয়া যায়।

মেঝের ওপর গড়গড়ার কলকেটা টিকে ছাই ইত্যাদি ছড়িয়ে যেভাবে পড়ে আছে তাতে মনে হয় কেউ যেন অসাবধানে তাড়াতাড়ি সেটা পা দিয়ে লাথিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তাঁর অত আদরের গড়গড়া আর সাজা কলকেতে তাড়াতাড়ি অসাবধানে পা লাগানো কি ঘনাদার পক্ষে সম্ভব?

অমন অসাবধান তিনি হবেনই বা কেন হঠাৎ বিচলিত না হলে?

ছাদের ওপরে দেখার আগেই সিঁড়িতে আমাদের পদশব্দ আর হাহাকার শুনেই ঘনাদা হঠাৎ বেশ একটু বিচলিত হয়ে তাঁর ঘরের দরজাটাই বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, আর তাতেই পা লেগে তাঁর গড়গড়া কলকে উলটে পড়েছে এমন একটি সিদ্ধান্ত কি করা যায় না!

আর সে সিদ্ধান্ত সঠিক হলে আমাদের সঙ্গে ঘনাদার একটা সমব্যথীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাকি?

সম্পর্কের সুতোটা অবশ্য এখনও অতি সূক্ষ্ম! খুব সাবধানে পাকাতে হবে, কারণ একটু চালের ভুল হলেই ছিঁড়ে যেতে পারে।

খুব সাবধানেই পাকটা দেওয়া হয়।

হাহাকারটা সিঁড়িতেই শেষ করে এসেছি। টঙের ঘরে ঢুকে তক্তপোশের ওপর বসবার পর ঘনাদাকে দেখেই যেন মুখে আর কথা ফুটতে চাইছে না।

শিবুই যেন প্রথম কোনও রকমে কথাটা তোলে। হতাশ ভাঙা গলায় বলে, “কালও ঘুম হয়নি, ঘনাদা!”

“ঘুম হয়নি! ঘুম হয়নি!” তিরিক্ষি মেজাজে খিঁচিয়ে ওঠে গৌর, “ভাল লাগে না রোজ এই প্যানপ্যানানি। খালি নিজের সুখটুকুর ভাবনাই সারাক্ষণ। ঘুম আমাদের কার হচ্ছে শুনি!”

“আহা, শিবুকে মিছিমিছি গাল দিয়ে লাভ কী!” শিশির ক্লান্ত গলায় শিবুকে একটু সমর্থন করে, “শুধু ওর নিজের কথা নয়, ও আমাদের সকলের অবস্থাটাই বোঝাতে চেয়েছে। মাথা গুলিয়ে আছে বলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারেনি।”

“থাক! শিবুর হয়ে অত ওকালতি তোমায় করতে হবে না।” আমি গৌরের পক্ষ নিয়ে গরম হয়ে উঠি, “আমাদের অবস্থা কি শুধু ওই ঘুম-না-হওয়া দিয়ে বোঝাবার। কেন ঘুম হচ্ছে না তার কিছু ঘনাদাকে দেখিয়েছে?”

আমি পকেট থেকে একটা চৌকো কার্ড বার করে ঘনাদার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলি, “দেখুন, ঘনাদা।”

গড়গড়াতে টান বা শেলফ হাঁটকাবার মতো কোনও কিছুতে তন্ময় হবার ভান না করলেও আমরা ঢোকবার পর ঘনাদা বেশ একটু ছাড়ো-ছাড়ো ভাবই দেখাবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আমি চৌকো কার্ডটা বার করবার পর সে নির্লিপ্ত দূরত্ব আর রাখতে পারেন না।

হাতের যে ছোট আয়নাটা অকারণেই সামনে তুলে রেখে মুখের কিছু যেন

দেখবার ছল করছিলেন সেটা তাড়াতাড়ি ফতুয়ার পকেটে রেখে বেশ ব্যস্ত হয়ে কার্ডটা আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন।

তিনি যখন কার্ডটা দেখতে তন্ময় আমরা তখন মনসায় ধুনোর গন্ধ দিতে ত্রুটি করি না।

শিশির যেন সভয়ে বলে, "ও কার্ড তুইও তাহলে পেয়েছিস?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে একটা ভিন্ন রঙের অনুরূপ কার্ড শিশির বার করে দেখায়।

শিবু ও গৌর কেউ পেছপাও থাকে না।

"আমরাই কি পাইনি!" বলে দুজনেই দুটো কার্ড বার করে তক্তপোশের ওপর মেলে ধরে।

ঘনাদাকে এবার তক্তপোশেরই অন্য প্রান্তে বসে পড়ে কার্ড চারটে মিলিয়ে দেখতে হয়।

চার রঙের হলেও কার্ডগুলো মাপে এক। আর প্রত্যেকটির ওপর এক পিঠে যা আঁকা তা একই ছবির নকশা।

আর কী সে নকশা! দেখলেই গায়ে আপনা থেকে কাঁটা দেবার কথা।

কার্ডের তলা থেকে ফণা-তোলা একটা সাপের মাথা উঠে চেরা জিভের সঙ্গে যেন মুখের ভেতর থেকে বিষের হল্‌কা বার করছে।

কার্ডের মাথায় শুধু তিনটি শব্দ লাল হরফে লেখা, "এখনও সময় আছে।"

"এসবের মানে কী বলতে পারেন?" কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে শিবু, "ক্রমশ তো অসহ্য হয়ে উঠল।"

"কারও বিদঘুটে ঠাট্টা-টাট্টা হতে পারে?" আমি যেন হতাশার আশা হিসেবে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার চেষ্টা করি।

ধমকও খাই তৎক্ষণাৎ।

"ঠাট্টা!" খিঁচিয়ে ওঠে গৌর, "এই সব ভয়ংকর হুমকিকে ঠাট্টা ভাবছ! ঠাট্টা হলে স্বয়ং যমরাজই করছেন জেনে রাখো।"

"হ্যাঁ, বেনেপুকুরে ওই ভুল করে একজনদের সর্বনাশও হয়েছে।" শিবু গৌরের সমর্থনে এবার একটা জবর গোছের নজিরই হাজির করে, "একহপ্তা দুহপ্তা তিনহপ্তা বাড়ির কেউ গ্রাহ্য করেনি, পাড়ার বকা ছেলেদের বাঁদরামি ভেবেই উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর—"

"তারপর কী?" শিবুর নাটকীয়ভাবে থেমে যাওয়ার পর আড়চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে নিয়ে প্রায় বুজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করি, "কী হয়েছে তারপর?"

"ওই উড়িয়েই দিয়েছে!" শিবুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

"উড়িয়েই দিয়েছে মানে?" আমরা অস্থির হয়ে উঠি, "বকা ছেলের বাঁদরামি বলে উড়িয়েই দিয়েছিল সেই বেনেপুকুরওয়ালারা। তাহলে আর হলটা কী?"

"উড়িয়ে-দেওয়া জবাবই পেল তাদের আহাম্মুকির!" শিবু এবার একটু ব্যাখ্যা

করে বোঝায়, "প্রথমে চিলেকোঠার ঘরটাই দিলে উড়িয়ে।"

"চিলেকোঠার ঘর!" আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাই, "তার মানে এই ছাদের ঘরটাই!"

শিশির এই শুনেই গরম হয়ে ওঠে অদেখা অজানা আততায়ীদের ওপর—"তা ওড়াতে হলে ছাদের ঘরটাই কেন? আর ঘর ছিল না সে বাড়িতে?"

"ঘর তো ছিলই!" শিবু বুঝিয়ে দেয়, "সে সবের কী হবে তার ইশারাও ছিল ওই উড়ে যাওয়া ঘরের বাইরের পাওয়া একটা চিরকুটে। তাতে লেখা ছিল—যা হবে তার প্রথম নমুনা।"

"কিন্তু আমাদেরও সেরকম নমুনা দেখাবে নাকি?" আমার মুকখানা ঠিক ফ্যাকাশে না মারলেও গলাটা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে, "তাহলে তো—"

বাকি কথাটা উহ্য রেখে আমি সভয়ে ঘনাদার কাছেই যেন পাদপূরণটা চাই।

ঘনাদা পাদপূরণ করেন না, তবে কার্ডগুলো তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, "এ কার্ডগুলো কবে এসেছে?"

"আজ্ঞে, একদিনে তো আসেনি।" শিশির ঘনাদাকে সঠিক খবর দেয় ব্যস্ত হয়ে, "প্রথম শিবুর নামে একটা কার্ড আসে ডাকে, আমাদের সেটা দেখাতে আমরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টাই করেছি। তার পরে পায় গৌর—"

"ডাকে-টাকে নয়!" গৌর রিলে রেসের ব্যাটনের মতো শিশিরের কথার খেইটা ধরে নেয়, "খেলার মাঠ থেকে বাড়িতে এসে জামা খুলতে গিয়ে এক পকেটে শক্ত মতো কী একটা টের পেলাম। পকেট থেকে বার করে দেখি—এই কার্ড।"

"আমারটা আরও বিশ্রীভাবে পেয়েছি।" গৌর থামতেই শিশির শুরু করে দিতে দেরি করে না, "এই তো আর মঙ্গলবার ন-টার শো দেখে ফিরছি, হঠাৎ এই গলির মুখেই 'দাঁড়ান' শুনে চমকে গেলাম। গলির আলোটার অবস্থা তো দেখেছেন। সেই যে কবে বালব চুরি গেছে, তারপর থেকে আর করপোরেশনের করা হয়নি। জায়গাটা ঘুটঘুটি অন্ধকার। তারই মধ্যে ইলেকট্রিক পোস্টটার পাশেই দুটি ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে এল। দুজনের গায়ে রেনকোট বা ওভারকোট গোছের কিছু, মাথার টুপিও মুখের ওপর টানা। আমার বেশ কাছে এসে দাঁড়াবার পরও তাদের মুখগুলো দেখতে পেলাম না। শুধু গলার স্বর যা শুনতে পেলাম তাতেই যেন ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কী দারুণ খাদের গলা। যেন পাতাল গুহা থেকে ভুতুড়ে চাপা আওয়াজ উঠে আসছে। সেই গলাতেই শুনতে পেলাম—'আর পনেরো দিন মাত্র সময় পাবে, এই নাও তার পরোয়ানা।' এই বলেই আমার হাতে কী একটা দিয়ে ওদিকের অন্ধকারেই যেন মিলিয়ে গেল। কোনও রকমে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে পৌঁছে আলো জ্বেলে দেখি—এই কার্ড!"

"আর আমার বেলা!" শিশিরের বিবরণটায় উৎসাহিত হয়ে আমি তক্ষুনি শুরু করি, "সে যা হয়েছিল তা ভাবলেই গায়ে এখনও কাঁটা দেয়।"

"তাহলে এখন আর ভেবে দরকার নেই।" শিবু হিংসুকের মতো আমায় থামিয়ে দিয়ে বলে, "তুইও কার্ড পেয়েছিস এইটুকুই আসল খবর। এখন কথা হচ্ছে, এগুলো

পাঠাচ্ছে কারা?”

কারা আবার? দাঁত খিঁচিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে কি না, এ কীর্তি আমাদের এই চার জাম্বুবানের?

নিজেরা সব ফলাও করে যে যার গল্প সাজালেন, আর আমার বেলাতেই শুধু খবরটাই যথেষ্ট! আমাকে বলতে দিলে যে নিজেদের গল্পগুলো কানা হয়ে যাবে!

এমন হিংসুটেদের সঙ্গে এক দণ্ড আর থাকতে ইচ্ছে করে না, তবু যে থাকি সে নেহাত আমার মহানুভবতায়। ওদের হিংসের বিরুদ্ধে আমার মহত্ত্বেরই জয় হয়। এবারও তাই উদার হয়ে ওদের ক্ষমা করে ফেলি শেষ পর্যন্ত!

তবু ফাঁস যখন হয়েই গেছে ব্যাপারটা তখন এখানেই খুলে বলি।

এবারের ষড়যন্ত্র ঘনাদাকেই বাগ মানাবার জন্য। তবে প্যাঁচটা একটু নতুন আর চালটাও আলাদা।

আগে থাকতে উদ্দেশ্যটা জানাবার দরুন আমাদের অনেক প্ল্যান ঘনাদা এ পর্যন্ত ভেস্তে দিয়েছেন। এবার তাই একেবারে চোরা লড়াইয়ের ব্যবস্থা। আমাদের আসল মতলব না জানিয়ে আচমকা হামলায় কাবু করে ফেলব। ঘনাদা ভেবে চিন্তে পিছলে পালাবার সময়ই পাবেন না।

প্ল্যানটা খুব ভাল করেই ছকা হয়েছে। তার প্রথম বুদ্ধিটা এক হিসেবে ঘনাদা নিজেই দিয়েছেন নিজের অজান্তে। সেদিন ছুটির সকালে তাঁর কাছে দুপুরের ভোজের মেনু ঠিক করতে গিয়ে তাঁকে একটু বিচলিতই মনে হয়েছিল! কারণটাও জানতে দেরি হয়নি। হাতের খবরের কাগজটা থেকে অত্যন্ত চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিলেন, “জঙ্গল! জঙ্গল! জঙ্গল হয়ে গেল কলকাতা শহর!”

রসালো কিছুর আশায় তক্তপোশে চেপে বসে মুখচোখে যতদূর সাধ্য আতঙ্ক ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, “কোথায়? কোন পাড়ায়, ঘনাদা? বাঘ-টাঘ বেরিয়েছে নাকি? সেই ঝাড়খালির সুন্দরী, থুড়ি সুন্দর বাঘ এই কলকাতায়?”

“বাঘ নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর জানোয়ার!” গম্ভীর মুখে বলেছেন ঘনাদা, “বুঝলে কিছু!”

আমরা হাঁ-করা হাঁদা সেজেছি।

“মানুষ! মানুষ!” ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন, “এই কলকাতা শহরে তারই উপদ্রব বেড়েছে। এই দেখো-না, বুড়ো মানুষ পেনসন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি দোরগোড়ায় পিস্তল ছোরা দেখিয়ে তাঁর সব সম্বল কেড়ে নিয়েছে, আর হুমকি দিয়ে আরেক পাড়ায় একটা গলির মুখই দিয়েছে বন্ধ করে। লোকজনকে আধঘণ্টার হাঁটুনি হেঁটে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।”

ঘনাদার বিক্ষোভ শুনতে শুনতে কথাটা একেবারে জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলেছি নিজেদের। ঘনাদার কাছে দুপুরের মেনুর ফর্দের সঙ্গে কলকাতার জঙ্গল সম্বন্ধে দামি দামি সব টিপ্পনি শুনে এসেই বসে গিয়েছিলাম আমাদের লক্ষ্যভেদের প্ল্যান ছকতে।

হ্যাঁ, এবারেও ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বর থেকে সরানোই আসল লক্ষ্য।

তবে সেই 'ঘনাদাকে ভোট দিন' আন্দোলনের মতো চিরকালের জন্য বাহাত্তর নম্বর ছাড়াবার মতলবে নয়, দিঘা কি দার্জিলিঙের দ্বিধার মতো শখের বেড়াতে যাওয়া নিয়ে রেষারেষিও এর মধ্যে নেই। মাত্র মাসখানেকের জন্য ঘনাদাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই হয়। অনুরোধটা আমাদের বাড়িওয়ালার আর গরজটা আমাদের নিজেদেরও।

বাড়িটার অনেকদিন ধরে পুরোপুরি সংস্কার হয়নি। খাপছাড়া তালিমারা এখানে সেখানে একটু আধটু মেরামত হয়েছে মাত্র।

আমাদের পেড়াপিড়িতে এই চড়া বাজারেও বাড়িওয়ালা চুন বালি সিমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি বাহাত্তর নম্বরের ছাল চামড়া বদলাতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু আধাখেঁচড়া ভাবে সে কাজ তো আর হয় না। তাই পাছে হঠাৎ বেঁকে বসে বাধা দেন এই ভয়ে বাড়িওয়ালা ঘনাদাকে কোনও রকমে মাসখানেকের জন্য সরাবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ অনুরোধ না রাখলেই নয়, কিন্তু ঘনাদা কি সেই শান্ত সুবোধ ছেলেটি যে একবার সাধলেই সুড়সুড় করে বাহাত্তর নম্বর থেকে বেরিয়ে আসবেন!

ঘাড় তিনি যাতে না বাঁকাতে পারেন তার চাল ভেবে যখন সারা হচ্ছি তখন তাঁর নিজের কাছ থেকেই হদিসটা পেয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, 'কলকাতা মানে জঙ্গল' এই সুরটাই খেলিয়ে ঘনাদাকে কাবু করতে হবে। আর ঘুণাক্ষরে আগে থাকতে ঘনাদাকে কিছু না জানিয়ে! বাহাত্তর নম্বর তেমন বিভীষিকা করে তুলতে পারলে উনি 'মানুষ নামে জানোয়ারের' কলকাতা ছেড়ে খোকা বাঘ-সুন্দরের ঝাড়খালিতে যেতেও বোধহয় আপত্তি করবেন না। শুধু ভয়টাকে ঠিক মতো পাকিয়ে তুলে একেবারে স্ফুটনাঙ্কে মানে ফুট ধরতেই কথাটা পাড়া দরকার!

তাই জন্যেই এইসব পাঁয়তাড়া। শুধু শিউরে তোলবার ছবি আঁকা কার্ডই নয়, আরও অনেক রকম আয়োজনই হয়েছে। সাপের ছোবল আঁকা কার্ড ঘনাদাও পেয়েছেন, স্বীকার করুন আর না-করুন। মাঝরাত্রে বাইরের দরজায় বিদঘুটে কড়া নাড়াও শুনেছেন সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, ওই এক মোক্ষম প্যাঁচ কষা হচ্ছে দু-একদিন বাদে বাদে প্রায় হপ্তা খানেক ধরে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমে আস্তে, তারপর বাড়তে বাড়তে একেবারে পাড়া কাঁপানো আওয়াজ।

"কে? কে?" যেন ঘুম থেকে উঠে আমরা বারান্দা থেকেই চিৎকার করি। নেমে যাবার সাহস যেন কারওই হয় না।

ঘনাদা যে তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ন্যাড়া সিঁড়ির ধারে আলসের কাছে দাঁড়িয়েছেন তা টের পেয়ে আমরা আরও একটু হইচই বাড়াই।

"বনোয়ারি—! বনোয়ারি—! রামভুজ—! রামভুজ—! কোথায় গেল সব ওরা! সাড়া দেয় না কেন?"

"সাড়া দেবে কোথা থেকে!"—আমাদেরই একজনের হঠাৎ যেন স্মরণ হয়—"ওরা যে ক-দিন রাত্রে দেশোয়ালিদের গানের মজলিশে যাবার জন্য বাসায় থাকছে না সে কথা ভুলে গেছ!"

"তাহলে? তাহলে," শিবু যেন একটু ভেবে আমার দিকে চেয়েই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলে, "হ্যাঁ, তুই-ই একবার দেখে আয় না নীচে গিয়ে দরজাটা খুলে!"

"আমি? আমি যাব!"—আমায় আর ভয়-তরাসের অভিনয় করতে হয় না—"তার চেয়ে, কী-বলে, সবাই মিলেই তো গেলে হয়।"

প্রথম রাত্রে সবাই মিলেই নেমে গিয়েছিলাম। গিয়ে বড় রাস্তার চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে কথা-মতো একটা আধুলি দিয়ে, এর পর থেকে এখানে নয়, দোকানেই পাওনা মিলবে জানিয়ে ফিরে এসেছিলাম যেন ভয়ে বেসামাল হয়ে।

ওপরে এসে কাঁপা গলায় এলোমেলো এমন আলাপ চালিয়েছিলাম যাতে ব্যাপারটার রহস্য যেমন দুর্বোধ্য তেমনই ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

"কই, কেউ মানে কাকেও তো দেখতে পেলাম না!"

"এত রাত্রে অমন কড়া নাড়ার মানেটা কী!"

"এখনও মানে জিজ্ঞাসা করছ? এখনও বুঝতে কিছু বাকি আছে?"

"তার মানে, মানে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না!"

"না। আপাতত তো নয়।"

"চুপ চুপ, আস্তে!" এর মধ্যে ছায়াটা সরে যাবার আভাস পেয়ে মনে হয়েছে প্যাঁচটা নেহাত বিফল হয়নি।

ওষুধ যে ধরতে শুরু করেছে তা টের পেয়েছি পরের দিন থেকেই। ঘনাদা তাঁর সন্ধের আসরে যাচ্ছেন না এমন নয়, কিন্তু ফিরছেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি। সেই সঙ্গে সারাদিন সদর দরজা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে যেন একটু অতিরিক্ত সজাগ হয়ে উঠেছেন।

এ কয়দিনের প্রস্তুতি পর্বের পর আজ হাওয়াটা সব দিকেই অনুকূল মনে হচ্ছে। বক্তার বদলে এমন মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ঘনাদাকে বড় একটা দেখা যায় না।

আপাতত এ কাজ কাদের হতে পারে সেই গবেষণাই চলছে।

শিশির বুঝি ওয়াগন ব্রেকারদের কথা বলছিল। কোনও একটা গ্যাং, তাদের মালগাড়ি লুটের মাল রাখবার জন্য এ বাড়িটা হাত করতে চাচ্ছে, এই তার অনুমান!

"ছো!" বলে এ অনুমান নস্যাৎ করে দিয়ে গৌর তখন বলেছে, "ওয়াগন ব্রেকার! ওয়াগন ব্রেকার এখানে আসবে কোথা থেকে? কাছে পিঠে রেললাইন আছে কোনও! উহুঁ, ওসব নয়।"

গৌর তারপর রীতিমতো লোমহর্ষক একটা থিওরি খাড়া করে। তার মতে এ কাজ নিশ্চয়ই কোনও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর দলের। তারা এক ঘাঁটিতে বেশিদিন থাকে না। একবার এখানে, একবার ওখানে আস্তানা বদলায়। আর সে আস্তানা জোগাড় করে এমনই হুমকি দিয়ে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই, আর মায়াদয়ারও তারা ধার ধারে না!

একটা ঘাঁটি জোগাড় করতে দু-দশটা জান খরচ তাদের কাছে ধর্তব্যই নয়।

"কিন্তু এদের কাজটা কী? কী করে এরা!" বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করি আমি!

"কী না করে!" গৌর যেন সামনে মাইক ধরে বলে যায়, "এই যে দেশে এত গণ্ডগোল, এত সমস্যা, চুরি ছিনতাই রাহাজানি, নিশানে নিশানে হানাহানি, লাল নীল কালোবাজার ঘাটতি বাড়তি উঠতি পড়তি রকবাজ সাবোটাজ, পুরো দামে কম কাজ, ধর্মঘট লক আউট তুফান খরা বন্যা চাল তেল কয়লার জন্য ধরনা এ সব কিছুর মূল হল তারা। দেশটার আখের যাতে মাটি হয় তাই সারাক্ষণ তুর্কি নাচন নাচিয়ে সব কিছু ভণ্ডুল করে দেওয়াই তাদের মতলব।"

"তা এমন একটা গুপ্তচর দলের কথা ঘনাদা কি আর জানেন না!"

কথাটা বলে ফেলেই নিজের আহাম্মুকিটা বুঝতে পেরে মনে মনে জিভ কাটি।

এই এক ছুতো পেয়ে ঘনাদা একটি গল্প ফেঁদে বসলেই তো সর্বনাশ! আমাদের আসল উদ্দেশ্যই তাহলে মাটি। আজ ঘনাদার কাছে গল্প তো চাই না, চাই তাঁকে বেশ একটু ভড়কে দিয়ে বাহাত্তর নম্বরটা ক-দিনের জন্য ছাড়াতে।

আমার ভুলে এত কষ্টের আয়োজনের পর ঘাটের কাছে বুঝি ভরাডুবি হয়।

গৌরই সে বিপদ থেকে বাঁচায় অবশ্য।

ঘনাদা এই ছুতোটাই ধরতেন কি না জানি না। কিন্তু তিনি মুখ খোলবার আগেই গৌর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "ঘনাদা জানবেন মানে? এ কি ওপারের সেই সব বনেদি কোনও দল! নেহাত চ্যাংড়া গুপ্তচরদের মহলের সেদিনকার উঠতি মস্তান বলা যায়! ঘনাদারই এখনও নাম শোনেনি! তা না হলে বাহাত্তর নম্বরে মামদোবাজি করতে আসে!"

"সেই জন্যেই ভাবছি," একটু থেমে গৌর যেন গভীরভাবে কী ভেবে নিয়ে বলে, "এই সব চ্যাংড়াদের যখন বিশ্বাস নেই তখন দু-চারদিন মানে মানে একটু সরে গেলে বোধহয় মন্দ হয় না। ওদের দৌরাত্ম্যি তো মাসখানেকের বেশি নয়। তার মধ্যে নিজেরাই খতম হয়েও যেতে পারে। সেই মাসখানেক একটু চেঞ্জে ঘুরে এলে ক্ষতি কী? তাও দিঘা কি দার্জিলিঙ নয়, এই ডায়মন্ড হারবারে। গাঙের ধারে বাড়িটা মিনিমাগনা পাচ্ছি।"

আমরা সবাই সোৎসাহে সরবে এ প্রস্তাব অনুমোদন করি।

"বলিস কী! ডায়মন্ড হারবারে এমন বাড়ি!"

"গাঙের ধার মানে তো মিনি সমুন্দুর!"

"আর এক পা বাড়ালেই তো ডায়মন্ড হারবার। যাওয়া আসার কোনও হাঙ্গামাই নেই।"

"তা ছাড়া ওখানকার টাটকা মাছ! তপসে পারশে ভেটকি ভাঙর আর ইলিশ গুড়জাওলি একবার মুখে দিলে আর ডায়মন্ড হারবার ছাড়তে ইচ্ছে হবে না।"

গদগদ উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘনাদার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতেও ভুলি না।

না, বেয়াড়া কোনও লক্ষণ সেখানে দেখা যায় না। একটু গম্ভীর—যেন একটু ভাবিত। তা সেটা তো স্বাভাবিক।

জো বুঝে আসল কথাটা পেড়ে ফেলে শিশির, “কাল সকালেই তা হলে রওনা হচ্ছি, ঘনাদা! যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়ব। আপনি তো খুব ভোরেই ওঠেন।”

ঘনাদা উত্তরে শুধু বলেন, “হ্যাঁ, তা উঠি।”

ব্যস! এর বেশি আর কীভাবে মত দেবেন ঘনাদা! আমাদের মতো দু বাহু তুলে ধেই ধেই করে নৃত্য করবেন নাকি? স্পষ্ট ‘হ্যাঁ’ তিনি বলেননি, কিন্তু ‘না’-ও তো তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

আমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নীচে নেমে যাই। সারাদিন তোড়জোড় চলে বাহাত্তর নম্বর ছাড়বার। ঘনাদার সঙ্গে আর কোনও আলাপ আলোচনায় ঘেঁসি না, পাছে কোনও ভুল বোলচালে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

ঘনাদাকে একবার বিকেলের দিকে বেরুতে দেখি। ফেরবার সময় মুখটা যেন হাসি-হাসি মনে হয়। আর আমাদের পায় কে?

মাঝরাত্রে সেদিন বাইরের কড়া নাড়াটা শুধু একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, অদ্য শেষ রজনী বলে।

পরের দিন সকালে জিনিসপত্র গুছোনো বাঁধাছাঁদার মধ্যেই একবার ঘনাদাকে দেখে আসা উচিত মনে হয়। যাবার আগে কোনও সাহায্য-টাহায্য তো দরকার হতে পারে।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে চিলের ছাদ পর্যন্ত উঠেই যে পা দুটো সেখানে জমে যায়। টঙের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে যে-দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যি, না দুঃস্বপ্ন!

ঘনাদা নিশ্চিন্ত নির্বিকার হয়ে তাঁর খাটো ধুতির ওপর ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে এক হাতে গড়গড়ার নল ধরে টান দিতে দিতে তক্তপোশের ওপর উবু হয়ে বসে কাগজ পড়ছেন!

“এ কী, ঘনাদা!” ভেতরে গিয়ে এবার বলতেই হয় হতভম্ব হয়ে, “ভুলে গেছেন নাকি?”

ঘনাদা কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বেশ মধুর কণ্ঠে আমাদের আশ্বাস দেন, “না, ভুলব কেন!”

“তবে এখনও তৈরি হননি যে?” আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

“হইনি, দরকার নেই বলে।” ঘনাদার দৃষ্টি এখনও খবরের কাগজের ওপর, “গানটা দিয়ে দিলাম কিনা।”

“গানটা দিয়ে দিলেন!” তক্তপোশের ধারে আমাদের বসতে হয় এবারে, কিন্তু খুব সানন্দে সাগ্রহে নয়।

বিস্মিত প্রশ্নটা কিন্তু আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, “গান দিয়ে দিলেন কাকে? কেন?”

“কেন দিলাম!” এতক্ষণে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ঘনাদা আমাদের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন, “না দিলে এ সব উৎপাত বন্ধ হয় না যে। আর দিলাম

মাৎসুয়ো-কে।"

কে এক মাৎসুয়োকে কী গান দিলেন আর তাইতে সব উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমাদের আর কোথাও যাবার দরকার নেই বলছেন!

আমরা ঘুরপাক খাওয়া মাথাটাকে একটু থামাবার চেষ্টা করে প্রথম রহস্যটাই জানতে চাইলাম—"মাৎসুয়ো আবার কে?"

ঘনাদা যেন অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসলেন।

"ও, মাৎসুয়ো কে তা তো তোমরা জানো না। কিন্তু মাৎসুয়ো-র পরিচয় দিতে হলে ইয়ামাদো-র কথাও বলতে হয়, আর যেতে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মাঝামাঝি টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে এমন দুটি ফুটকিতে সাধারণ ম্যাপে অনুবীক্ষণ দিয়েও যাদের পাত্তা পাবার নয়। নাম লিমু আর নিফা, ঠিক কুড়ি অক্ষাংশের দুধারে একশো চুয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর দ্রাঘিমার মধ্যে দুটি ছেলেখেলার দ্বীপ। একটি দু মাইল আর অন্যটি বড় জোর দেড় মাইল লম্বা, কিন্তু এই মহাসমুদ্রে এই দুটি মাটির ছিটে নিয়েই মাৎসুয়ো আর ইয়ামাদোর মধ্যে কাটাকাটি ব্যাপার। লিমু দ্বীপটা মাৎসুয়ো-র আর নিফার মালিক ইয়ামাদো। গত মহাযুদ্ধের সময় দুজনেই জাপানের নৌ-বাহিনীতে ছিল। ওই অঞ্চলেই যুদ্ধের কাজে থাকতে হয়েছিল বলে দুজনেই ওই দ্বীপমালার রাজ্যকে ভালবেসে ফেলে। যুদ্ধ থামবার পর দেশে ফিরেও তারা ভোলে না। কিছুকাল ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ কিছু রোজগার করে দুই বন্ধুই ওই অঞ্চলে গিয়ে পাশাপাশি দুটি দ্বীপ কেনে।

দুজনের বন্ধুত্বে সেইখানেই দাঁড়ি। নিজের নিজের দ্বীপকে একেবারে অতুলনীয় স্বর্গ বানিয়ে ফেলার রেষারেষিতে দুজনেই যেন দুজনের মাথা নিতেও পেছপাও নয়।

ঠিক সেই সময় আমার সঙ্গে মাৎসুয়ো-র দেখা। দেখা না বলে ঠোকাঠুকিই বলা উচিত। জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের পাহাড়ে তুষার-ঢাল দিয়ে সে রাত্রে মশাল হাতে নিয়ে আমি স্কি করে নামছি।"

"কী করে নামছেন?" শিবুর প্রশ্নটার ধরনে ভক্তিভাবের একটু যেন অভাব মনে হল।

"স্কি করে," ঘনাদা প্রশান্তভাবেই বলে চললেন, "রাত্তিরে মশাল নিয়ে স্কি করায় একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। জাপানে মশাল নিয়ে স্কি করায় তাই খুব উৎসাহ। তবে দক্ষিণের সব স্কি-ঘাঁটিতে এ খেলা চললেও ঢাল একটু বেশি আর বিপজ্জনক বলে হোক্কাইদোতে মশাল নিয়ে স্কি কেউ বড় করে না।

মশাল নিয়ে মনের আনন্দে নামতে নামতে সেই জন্যই বেশ একটু অবাক হচ্ছিলাম কিছুক্ষণ থেকে। আমার পেছনে মশাল নিয়ে আর-একজন কে যেন নেমে আসছে। আর নামছে রীতিমতো বেগে। হোক্কাইদোর তুষার পাহাড়ের ঢাল রাত্তিরবেলা একেবারে নির্জন। অন্য কোথাও হলে এক আধজন স্কিয়ার তবু দেখা যায়। এখানে ওপরের লজ কেবিন পর্যন্ত বন্ধ। স্কি-লিফট নেই বলে আমি সিঁড়ি-পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। আমার মতো এই রাত্রে স্কি করবার বেয়াড়া শখ আবার কার!

কিন্তু শখই শুধু বেয়াড়া নয়, লোকটা যে একেবারে রাম আনাড়ি মনে হচ্ছে। নামছে একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো, কিন্তু কোথায় নামছে তার যেন ঠিক নেই। এত চওড়া তুষার ঢাল পড়ে থাকতে আমারই ঘাড়ের ওপর পড়তে যাচ্ছে যে!

গোঁয়ার্তুমি করে এই রাত্রে স্কি করতে নেমে এখন তাল সামলাতে পারছে না নাকি? সত্যিই পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে তো সর্বনাশ। দুজনের শরীর স্কি আর চাঁকা লাঠিতে জড়াজড়ি হয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাব যে!

এ বিপদ এড়াবার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করলাম। প্রথম স্টেম বোগেন নিলাম।"

"কী নিলেন! স্টেনগান?" আমাদের হাঁ-করা মুখের প্রশ্ন—"গুলি করবার জন্য?"

"না, স্টেন গান নয়, স্টেম বোগেন!" ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন একটু—"ওটা হল স্কি করার সময় এক রকম বাঁক নেওয়া। মোঙ্গল আর ল্যাপদের কাছে বিদ্যেটা শিখলেও নরওয়ে-সুইডেনই প্রথম স্কি-টা ইউরোপে চালু করে বলে শব্দটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান।"

আমাদের জ্ঞান দিয়ে ঘনাদা আবার তাঁর বিবরণ শুরু করলেন—"স্টেম বোগেন-এ খুব সুবিধা হল না। লোকটার আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়াই যেন নিয়তি।

কিন্তু সত্যি কি তাই?

স্টেম বোগেন-এর পর স্টেম ক্রিস্টিয়ানা বাঁক নিলাম, কিন্তু লোকটা তখনও যেন আঠার মতো পেছনে লেগে আছে। যে রকম আনাড়ি তাকে ভেবেছিলাম তা-ও তো সে নয়। শক্ত শক্ত উৎরাই-এর ঢাল আর বাঁক বেশ ভালই সামলাচ্ছে। মরিয়া হয়ে নামছে বলে প্রায় ধরেও ফেলেছে আমায়।

তাহলে আমায় জেনেশুনে জখম কি খতম করা কি তার মতলব? কেন? লোকটাই বা কে?

এ সব প্রশ্নের জবাব ভাববার তখন সময় নেই, যেমন করে হোক লোকটার মতলব ভেস্তে দিতে হবে।

তা-ই দিলাম। পর পর দুটো স্টেম বোগেন আর স্টেম ক্রিস্টিয়ানা বাঁক নিয়ে তাকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে ওই শক্ত তুষারেই নরম তুষারের সুইস টেলেমার্ক বাঁক নিয়ে ঘুরেই লাঙ্গল-পা করে থেমে গেলাম।

লোকটা আমার একেবারে গা ঘেঁসে ছিটকে গিয়ে খানিক দূরে ঘাড়মুড়ো গুঁজে পড়ল।

ভাবলাম ঘাড় ভেঙে শেষই হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু তা হয়নি। খুব কড়া জান। হাড়গোড় ভাঙা নয়, একটা পা মচকানোর ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেছে।

ধরে-টরে কোনও রকমে তুললাম। এখন তাকে নীচে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা।

কিন্তু নিয়ে যাব কাকে? খোঁড়া হয়েও লোকটার কী রোখ! আর আমারই ওপরে।

জাপানিতে সে যা বললে বাংলার চেয়ে হিন্দিতে বললেই তার ঝাঁঝটা বুঝি একটু ভাল বোঝানো যায়।

তাকে ধরে তোলবার আগে থেকেই সে আমার ওপর তম্বি শুরু করেছে। 'তুমকো

হাম খুন করেঙ্গে, মারকে কুত্তাকো খিলায়েঙ্গে—' এই হল তার বুলি।

ব্যাপারটা কী? লোকটা পাগল-টাগল নাকি!

না, তা তো নয়। মশালটা ভাল করে মুখের কাছে ধরতে মুখটা চেনাচেনাই লাগল। সঠিক মনে পড়ল তার পরেই।

হ্যাঁ, টোকিওর উয়েনো স্টেশন থেকে রওনা হবার সময় ছুটির দিন পড়ায় স্কিয়ারদের দারুণ ভিড় হয়েছিল। কলেজের ছেলেমেয়ে আর কমবয়সি চাকরেদের ভিড়ই বেশি। স্কি নিয়ে তারা সবাই জাপানের কোনও-না-কোনও স্কি রিসর্ট-এ যাচ্ছে। ট্রেন আসবার পর ঠেলাঠেলি করে ওঠবার সময় কে যেন পেছন থেকে আমায় টেনে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখুনি ফিরে চেয়ে হাতেনাতে কাউকে ধরতে পারিনি, কিন্তু এই মুখটাই যেন তার ভেতর দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।

শুধু উয়েনো স্টেশনে কেন, তার আগে আরও দু-তিন জায়গায় এই মুখটা দেখেছি বলে মনে পড়ল। লোকটা যেন বেশ কিছুকাল ধরে আমার পিছু নিয়েছে। কেন?

দুটো স্কিকে জুড়ে একটা স্ট্রেচার গোছের বানিয়ে তার ওপর লোকটাকে শোওয়াবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। সেই অবস্থায় তাকে তুষারের ওপর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম—'কে তুমি? আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

ওই অবস্থাতেই লোকটা গজরে উঠল, 'তোমায় খুন করবার জন্য!'

'বেশ সাধু উদ্দেশ্য!' হেসে বললাম, 'কিন্তু খুন করাই যদি তোমার নেশা হয় এই মহৎ কাজটার জন্য আমার চেহারাটাই পছন্দ হল কেন! এ পৃথিবীতে তো শুনি তিনশো কোটি মানুষ গিজ গিজ করছে। তাদের কাউকে মনে ধরল না!'

'না, তুমিই আমার একমাত্র শত্রু!' সে দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল, 'ইয়ামাদো-র সঙ্গে মিলে তুমি আমার কী সর্বনাশ করেছ জানো না।'

'ও, তুমি তাহলে মাৎসুয়ো! লিমু দ্বীপের মালিক!' এতক্ষণে অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম, 'কিন্তু তোমায় তো আমি কখনও চোখেও দেখিনি, তোমার লিমুতেও কখনও পা দিইনি।'

'তা দিলে তো তোমায় কুচি কুচি করে কেটে হাঙরদের খাওয়াতাম!' মাৎসুয়ো যেন মুখ দিয়ে আগুনের হলকা ছাড়ল, 'তুমি লিমুতে আসোনি, কিন্তু ইয়ামাদো-র হয়ে তার নিফা থেকে কী বিষ মন্তর ঝেড়ে আমার সোনার লিমু ছারখার করে দিয়েছ, জানো! আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম আর ইয়ামাদো তো নেহাত চাষার ছেলে। আমি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমার লিমুকে মর্তের স্বর্গ বানিয়ে তুলেছিলাম! সেই স্বর্গ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ।'

'তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে!' একটু হেসেই বললাম, 'হ্যাঁ, ইয়ামাদো-র অনুরোধে একবার তার দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে তোমার সঙ্গে তার রেষারেষির কথা শুনেছিলাম বটে। তোমার নামটাও সেই সময়ে শুনি আর তুমি যে তোমার লিমুকে নন্দন কানন বানাবার জন্য যা কিছু সম্ভব বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছ সে খবরও পাই। তখনই তোমার সম্বন্ধে তোমাদেরই একটা জাপানি প্রবাদ আমার মনে এসেছিল—রঙ্গো ইয়োমি নো

রঙ্গো শিরজু! এখন আমার বিরুদ্ধে তোমার আক্রোশের কারণ শুনেও সেই প্রবাদই আবার শোনাচ্ছি—রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু।'

তখন তুষার পাহাড়ের ঢাল থেকে নীচের বসতিতে পৌঁছে গেছি। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তুলে মাৎসুয়োকে হাসপাতালে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করলাম। তার জন্য যাই করি, মাৎসুয়ো কিন্তু তখনও আমার ওপর সমান খাপ্পা। তার ক্যাবিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় গলায় যেন বিষ ঢেলে বললে, 'পা খোঁড়া হয়েছে বলে তুমি আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে ভেবেছ! আমি অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে হোক্কাইদোর স্কি-ঘাঁটিতে যেমন তোমায় খুঁজে বার করেছি তেমনই যেখানেই যাও তোমার নিশ্চিত শমন হয়ে দেখা দেবই এই কথাটি মনে রেখো।'

'আমি তাহলে তোমাদের প্রবাদটাই এবার আমার বাংলা ভাষায় বলি, মাৎসুয়ো।' বেশ একটু গম্ভীর হয়েই বললাম, 'তোমার বেদ মুখস্থ, কিন্তু বুদ্ধি ঢু ঢু। তোমার নিজের সর্বনাশ তুমি নিজেই করেছ এইটুকু শুধু বলে যাচ্ছি। আর কথাটা যদি ধাঁধা মনে হয় তাহলে তার উত্তর বার করবার জন্যে ক-টা ইশারাও দিয়ে যাচ্ছি—তোমার আখের খেত, বুফো ম্যারিনাস আর বছরে চল্লিশ হাজার।'

এই বলেই চলে এসেছিলাম হোক্কাইদো থেকে। তারপর এতকাল বাদে গড়িয়াহাট মোড়ে কাল বিকেলে আবার দেখা। না, সে মাৎসুয়ো আর নেই। ভাবনায় চিন্তায় দুনিয়াভর টহলদারির ধকলে পাকা আম থেকে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। সে খ্যাপা নেকড়েও এখন একেবারে পোষা খরগোশ। আমায় দেখে রাস্তার ওপরই পায়ের ধুলো নেয় আর কী!"

"পায়ের ধুলো!" মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, "জাপানিরা আজকাল আবার পায়ের ধুলো নিতে শিখেছে নাকি।"

"আহা, মাৎসুয়ো আর কি জাপানি আছে নাকি!" ঘনাদা ঝটপট সামলে নিলেন, "এ-বাংলায় ও-বাংলায় আমায় খুঁজতে খুঁজতে আধা নয়, চৌদ্দ আনাই বাঙালি হয়ে গেছে। এই তোমাদের মতোই প্রায় চেহারা।"

ঘনাদা আমাদের চেহারাগুলো একবার যেন চেক করে নিয়ে আবার শুরু করলেন, "আফশোসেরও তার সীমা নেই, আমাকে মিছিমিছি শত্রু না মনে করলে কত আগেই তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত সেই কথা ভেবেই তার বেশি দুঃখ। আমি যে তিনটে ইশারা দিয়েছিলাম তাই থেকেই সে তার লিমু দ্বীপের অভিশাপের রহস্য বার করে ফেলে। কিন্তু তার নিজের অতি বুদ্ধির প্যাঁচই এখন তার নাগপাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে বলতে মাৎসুয়ো রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাঁফাচ্ছিল। চিনে হলে হবে না, জাপানি রেস্তোরাঁই বা কোথায় পাব। সামনে যে ময়রার দোকান পেলাম তাতেই নিয়ে গিয়ে বেশ একটু ভাল করে মাৎসুয়ো-কে কচুরি শিঙাড়া খাইয়ে চাঙ্গা করে তুললাম।"

ঘনাদা থামলেন। ইঙ্গিতটাও মাঠে মারা গেল না। আমরাও বুঝলাম। বাহাত্তর নম্বর থেকে ঠাঁই বদল যখন হবেই না তখন মিছে আর মেজাজ বিগড়ে থেকে লাভ কী! আমাদের দিক দিয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি যাতে না থাকে শিশির তাই চট করে একবার নীচে থেকে ঘুরে এল। তারপর চ্যাঙাড়ি ভর্তি কচুরি শিঙাড়া তো এলই, টিন ভর্তি

সিগারেটও।

ঘনাদা কেমন অন্যমনস্কভাবে গোটা কৌটোটাই হাতাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধেক চ্যাঙাড়ি ফাঁক করে যেন মাৎসুয়োর খিদের বহরটাই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শিস-দেওয়া কৌটো খুলে শিশিরকে উদার হয়ে একটা বিলিয়ে আর নিজে একটা ধরিয়ে রামটান দিয়ে নতুন করে শুরু করলেন, "হ্যাঁ, মাৎসুয়োর দুঃখের কাহিনী শুনে এবার বলতেই হল, আসলে ওই বুফো ম্যারিনাসই যে তোমার লিমু দ্বীপের কাল তা এখন বুঝেছ তো? ইয়ামাদোর নিফা দ্বীপে অতিথি হবার সময়েই আখের খেতের নারকুলে পোকা মারতে তোমার এই বুফো ম্যারিনাস আমদানির কথা শুনে আমি 'রঙ্গো ইয়োমি নো রঙ্গো শিরজু' বলে তোমাদের প্রবাদটা আওড়েছিলাম। সত্যিই এটা পুকুরের বোয়াল মারতে খাল কেটে কুমির আনার শামিল আর বেদ মুখস্থ বুদ্ধি ঢু ঢু-র দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে গিয়ে তুমি মূর্খের মতো বেয়াকুবি-ই করেছ। তোমার আমদানি-করা বুফো ম্যারিনাস এসে প্রথমে আখের খেতের সব পোকা ঠিকই সাবাড় করেছে, তারপর হয়ে উঠেছে রূপকথার সেই অজর অমর রাক্ষুসির পাল। রক্তবীজের মতো দিন দিন বেড়ে এরা তোমার গোটা লিমু দ্বীপটাকেই পেটে পুরতে চলেছে। লম্বায় এরা আধ হাতেরও ওপরে, ওজনে কম-সে-কম সওয়া কিলো। ভাল মন্দ সব পোকামাকড় শেষ করেও এদের খিদে মেটে না, খাবার মতো সাপ ব্যাঙ যা পায় এরা অম্লান বদনে গিলে ফেলে। এদের গায়ের গ্রন্থির এক রকম রসে কুকুর বেড়াল মারা যায় আর বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার গুণ বেড়ে এরা যেখানে থাকে সেই জায়গাই শ্মশান করে তোলে।'

'আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন,' আমার কথার পর ককিয়ে উঠল মাৎসুয়ো। 'ওই বুফো ম্যারিনাস-ই সব সর্বনাশের মূল জানবার পর আমি আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে দ্বীপ থেকে তাদের নির্মূল করবার আয়োজন করেছি। কিন্তু অমন করে মেরে ক-টাকে শেষ করা যায়। বছরে চল্লিশ হাজার যারা ডিম পাড়ে, তাদের একশোটা যখন মারি তখন হাজারটা নতুন করে জন্মায়। নিরুপায় হয়ে আমি টোঙ্গা সামোয়া থেকে ভাড়া করা ধাঙড় আনালাম। একটা বুফো মারলে দশ টাকা। কিন্তু তাতেও রক্তবীজের ঝাড় বেড়েই যাচ্ছে। একেবারে হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আপনার খোঁজেই এসেছি, এ অভিশাপ কাটাবার উপায় কিছু আছে কি না জানতে। তা যদি না থাকে তো লিমুতে আর ফিরব না। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।'

'নিরুদ্দেশ তোমায় হতে হবে না, মাৎসুয়ো!' একটু সান্ত্বনা দিয়ে এবার বললাম, 'এ সমস্যা তোমার শুধু ওই লিমু দ্বীপের নয়! অস্ট্রেলিয়ার মতো বিরাট দেশও আজ এই সমস্যা নিয়ে দিশাহারা। তবে হতাশ হোয়ো না। উপায় আছে। একমাত্র গান দিয়েই তোমার লিমুকে এখন বাঁচানো যায়।'"

"গান!" আমাদের চোখই ছানাবড়া—"গান দিয়ে লিমুকে বাঁচাবেন!"

"হ্যাঁ, মাৎসুয়ো-ও ওই প্রশ্ন করেছিল," অবোধকে বোঝাবার হাসি হাসলেন ঘনাদা, "তাকে তাই বলতে হল যে ওষুধপত্র গুলিবারুদ কোনও কিছুতে কিছু হবে না। বুফো ম্যারিনাস-এর সমস্যার ফয়সালা যদি কিছুতে হয় তো গানে-ই হবে।

চৌরঙ্গির একটা বড় রেডিও গ্রামোফোন ইত্যাদির দোকানে তাকে নিয়ে গিয়ে টেপ রেকর্ডে খানিকটা গান তুলে দিয়ে বললাম, 'যেটুকু মনে আছে তাতে এই টেপটুকু যেমনভাবে বলে দিচ্ছি সেইভাবে বাজালেই কাজ হাসিল হবে বলে বিশ্বাস।' নির্দেশগুলো তারপর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। মাৎসুয়ো কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আজ-কালের মধ্যেই লিমুর জন্য রওনা হবে। সুতরাং আর কোনও উপদ্রবের ভয় নেই।"

"তা তো নেই, কিন্তু বুফো ম্যারিনাস কী বস্তু আর আপনি সব সংকট-মোচন যে টেপটা তাকে দিলেন সেটি কীরকম গানের?"

"বুফো ম্যারিনাস হল এক জাতের কোলা ব্যাঙ।" ঘনাদা সদয় হয়েই আমাদের বোঝালেন, "আদি জন্ম দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখান থেকে হাওয়াই ঘুরে অস্ট্রেলিয়ায় আমদানি হয়েই সর্বনাশ করতে শুরু করেছে। টেপে তুলে যে গানটা মাৎসুয়োকে দিলাম সেটা এই ব্যাঙ বাবাজি বুফো ম্যারিনাস-এরই বিয়ের গান বলতে পারো। মদ্দা ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে এই গান গাইলে তার টানে দলে দলে কনে ব্যাঙেরা সব হাজির হয়। সুবিধে-মতো জায়গায় এ গান বাজিয়ে তাই চল্লিশ হাজারি ডিমের ব্যাঙ-বউদের ধরে কোতল করা যায়। কিছু দিন একাজ করতে পারলেই বুফো ম্যারিনাস-এর বংশ সব নির্বংশ।"

"কিন্তু ওই কোলা ব্যাঙের বিয়ের গান আপনি গাইলেন কী করে?"

"ঠিক কি আর গাইতে পেরেছি!" ঘনাদা বিনয় দেখালেন, "তবে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোরবার সময় বনে বাদাড়ে শুনে যেটুকু মনে ছিল তাই একটু গেয়ে দিয়েছি। ওতেই অবশ্য কাজ যা হবার হবে। ব্যাঙ-বরেরাও সবাই নিশ্চয় কালোয়াত নয়।"

"কিন্তু", আমাদের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি, "আপনার ওই মাৎসুয়ো আপনার ওপর অত ভক্তিমান হয়ে উঠবার পরও অমন ভয় দেখানো কার্ড পাঠাচ্ছিল কেন?"

"ওটা ভয়ে! ভয়ে!" ঘনাদা যেন স্নেহের প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন, "প্রথমেই সোজাসুজি আমার কাছে আসতে সাহস করেনি। তাই আগেকার ধরনটাই রেখে তারই ভেতর আমায় পরীক্ষা করে দেখবার কায়দা করেছিল। আমি অবশ্য গোড়াতেই কার্ডগুলো দেখেই বুঝেছিলাম। ওতে ছবিগুলো ভয়ের, কিন্তু সেই সঙ্গে মাৎসুয়োর নামটাও জাপানি গুপ্ত হরফে লেখা।"

" তাই লেখা নাকি!"

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বেশ একটু ঘুরপাক খাওয়া মাথা নিয়েই নীচে নেমে গিয়েছি এরপর। এ অবস্থায় শিশিরের সিগারেটের গোটা টিন-টাই ফেলে আসা খুব স্বাভাবিক নয় কি?

শেষ চমকটা অবশ্য তখনও বাকি ছিল।

বড় রাস্তায় চায়ের দোকানে গিয়েই সেটা পেলাম। সেখানকার চা-পরিবেশনের ছোকরাকে সেদিন থেকে আর রাত্রে কড়া না নাড়বার কথা জানাতে গেছলাম। তার দরকার হল না।

আমাদের দেখেই একটু বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এসে সে বললে, "আজ থেকে আর মাঝরাত্রে কড়া নাড়তে হবে না তো বাবু!"

"না, হবে না। কিন্তু তোমায় বললে কে?"

"আজ্ঞে, ওই আপনাদের বড়বাবু! কাল বিকেলে আর ক-দিন একাজ করতে হবে জানতে যাচ্ছিলাম। উনি তখন বেড়াতে বার হচ্ছেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করতে জানিয়ে দিলেন যে আজ থেকে কড়া নাড়া বন্ধ।"

সকালে একবারের বেশি চা আমরা কেউ খাই না। কিন্তু এরপর ওইখানেই বসে পড়ে পর পর কড়া করে দু-কাপ না গলায় ঢেলে আর উঠতে পারলাম না।

কীচক বধে ঘনাদা

উপমাটা কী দেব ভেবে পাচ্ছি না।

আহ্লাদে আটখানা হয়েই বোধহয় কথা জোগাচ্ছে না মাথায়। তাই বেড়ালের শিকে ছেঁড়া, না মরা গাঙে বান ডাকা, কোনটা জুতসই হবে ঠিক করতে দেরি হচ্ছে।

যাক, গুলি মারো উপমায়! আসল কথাটা শোনালেই যখন নেচে উঠতে হবে, তখন উপমার কী দরকার? আর নেহাত যদি উপমা না দিলে মান থাকে না মনে হয়, তা হলে র‍্যাশনে যেন মিহি চাল পুরো দিয়েছে বলতে দোষ কী?

ব্যাপারটা অবশ্য র‍্যাশনে মিহি চাল পাওয়ার চেয়েও খুশিতে ডগমগ করবার। বাহাত্তর নম্বরের তাই প্রায়ই সবাই হাজির টঙের ঘরে।

বাহাত্তর নম্বর বলতেই রহস্যটা বোঝা গেছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, অনুমানটা কারওই ভুল নয়। ঘনাদা সত্যিই সদয় হয়েছেন।

আবহাওয়ার এই অভাবিত পরিবর্তনটা সকালবেলাতেই টের পেয়েছি। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই গৌর আর আমি সকালবেলা একবার হালচালটা বুঝে নিতে টহলদারিতে এসেছিলাম। ক-দিন ধরে যা খরা হচ্ছে তাতে বৃষ্টি তো বৃষ্টি, একটু মেঘের টুকরোও দেখবার আশা অবশ্য করিনি।

কিন্তু ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘর পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বুকগুলো দুলে উঠেছিল। না, বৃষ্টি তখনও না পড়ুক, আকাশ যাকে বলে মেঘমেদুর। ধান একটু মাপতে না মাপতেই ঝেঁপে নেমে আসবে মনে হয়।

ঘনাদা ঘরের মধ্যে অন্যদিনের মতো তাঁর জগদ্দল কাশীরাম দাসে মুখ গুঁজে বসে নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপরেই পায়চারি করছেন।

ঘনাদার ছাদে পায়চারি! এমন দৃশ্য আগে তো কখনও কেউ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ পায়চারির অর্থ কী? আর লক্ষণটা শুভ, না অশুভ? কিছুই ঠিক বুঝতে না পেরে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করেছি, "কী হয়েছে, ঘনাদা?"

"হয়েছে?" যেতে যেতে ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যস! ওই ফেরাটুকুতেই যা বোঝবার, আমরা বুঝে নিয়েছি। বুক আমাদের তখনই দশ হাত।

যেটুকু ধন্দ ছিল, ঘনাদার পূরণ করা বাক্যাংশেই তা দূর হয়ে গিয়েছে।

"না, হয়নি তো কিছু!" ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথাটা শেষ করেছেন ঘনাদা, "একটু যুদ্ধের কথা ভাবছিলাম।"

যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন ঘনাদা!

শুনেই 'কেল্লা ফতে!' বলে চিৎকার যে করিনি, সে আমাদের কঠোর আত্মসংযম।

মনে মনে অদ্ভুত ব্যাপারগুলো শুধু একবার ভেবে নিয়েছি। এ পর্যন্ত যা দেখলাম শুনলাম, সবই তো হিসেবের বাইরে।

ঘনাদা সাতসকালে ছাদের ওপর পায়চারি করছেন।

আমাদের ডাকে তিনি ফিরে দাঁড়িয়েছেন ও তখন তাঁর মুখের পেশির কুঞ্চনে যে ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে প্রসন্ন হাসি বললে মানহানির দায়ে বোধহয় পড়তে হয় না।

সবচেয়ে মোক্ষম কথা হল এই যে, ঘনাদা প্রত্যূষের পদচারণার সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভাবছেন বলে নিজমুখে স্বীকার করেছেন।

এর পর আর আমাদের পায় কে!

নেহাত ওপরে আসবার ছুতো হিসেবে বিকেলের মেনুটা একটু আলোচনা করেই নীচে নেমে গেছি তৈরি হয়ে আসবার জন্য।

যুদ্ধের কথা ভাবছেন ঘনাদা। সুতরাং জঙ্গি দপ্তরের সব বিভাগেই খবর চলে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ! বনোয়ারি চলে গেছে গরম জিলেবির দোকানে, রামভুজ কড়া চাপিয়েছে নিজেদের হেঁশেলেই কচৌরি ভাজবার জন্য।

আর আমরা ঠিকমতো তোড়জোড় করে সদলবলে গিয়ে হাজির হয়েছি টঙের ঘরে। উপস্থিতিটা ঠিক সময়েই ঘটেছে। ছাদের পায়চারি শেষ করে ঘনাদা ঘরে এসে তাঁর নিজস্ব চৌকিতে বসে বসে গড়গড়ায় দু-একটি টান মাত্র দিয়েছেন।

"যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন, ঘনাদা?" গৌর চৌকাঠে পা দিয়েই শুরু করেছে, "যুদ্ধের সেরা কিন্তু মল্লযুদ্ধ, শুনলেই গা গরম হয়ে ওঠে।"

গরম হয়ে ওঠার প্রমাণ হিসেবে গৌর আবৃত্তি শুরু করতেও দেরি করেনি—

"মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥

কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন ॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হইতে নহে উন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে জড়াজড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাতে নখে ॥"

গৌর আরও খানিক আবৃত্তি চালিয়ে যেতে পারত বোধ হয়। কিন্তু ঘনাদার মুখের দিকে চেয়েই তাকে একটু দ্বিধাভরে থামতে হল।

তখন আমাদেরও বুকে একটু ধুকপুকুনি শুরু হয়েছে।

এই খানিক আগে যেখানে অমন অনুকূল বাতাস বইছিল, সেখানে হঠাৎ একটু গুমোটের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?

ঘনাদা গড়গড়ার নলটা হাতে নিয়ে যেন টানতে ভুলে গেছেন। ভাতের গ্রাস মুখে দিতে দাঁতে যেন একটু বালি পেয়েছেন এমনই মুখের ভাব।

মনে মনে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

এমন সুদিনে কোনখানে পান থেকে চুন খসল বুঝতে না পেরে শিশির তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে বলল, "তামাকটা বুঝি ঠিক জুতসই হয়নি আজ?"

ঘনাদা শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের দিকে দৃকপাতও করলেন না। সেই ঈষৎ বালি-চেবানো মুখের ভাব নিয়ে কোন সুদূর ভাবনায় যেন মগ্ন হয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "না, ভুল।"

ভুল! আমরা তো তাজ্জব! ভুলটা কোথায়? তামাক সাজায়?

নিজেদের বুদ্ধির দৌড় মাফিক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তামাকটা আর একবার সাজিয়ে দেব, ঘনাদা?"

"না, ভুল তামাক সাজায় নয়," ঘনাদা গড়গড়ার নলে দু-তিনটে চটপট টান দিয়েই বুঝিয়ে বললেন, "ভুল ওই লড়াইয়ের বর্ণনায়।"

"লড়াইয়ের বর্ণনায় ভুল!" ক-দিন ধরে লাইনগুলো মুখস্থ করেছে বলে গৌর বেশ ক্ষুণ্ণ, "কিন্তু কাশীরাম দাসের খাঁটি সংস্করণ থেকে তুলে এনেছি।"

"তা ছাড়া," আমিও এবার একটু মদত দিলাম গৌরকে, "কালী সিংহীর আদি মহাভারতের অনুবাদেও তো ওই রকম আছে।"

"যা আছে তা ভুল।" যেন নিতান্ত আফশোসের সঙ্গে জানালেন ঘনাদা, "আসলটা পাওয়া যায়নি বলে অমনই করে গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে।"

"আসলটা পায়নি?"

"মূল মহাভারতেও গোঁজামিল?"

"কীচক-ভীমের অমন জবর যুদ্ধটার বর্ণনাও বেঠিক?"

আমাদের চোখগুলো কপালে ওঠার সঙ্গে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাগুলো ভেতরে আর

চাপা রাখা গেল না।

তার অমন আবৃত্তিটা মাঠে মারা যাওয়ার জন্যে গৌরের মেজাজটাই সবচেয়ে খারাপ। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলাতেই সে জিজ্ঞাসা করলে, "আসলটা কী ছিল?"

"কী ছিল?" ঘনাদা একটু জীবে দয়া গোছের মুখের ভাব করে বললেন, "ছিল সত্যিকার একটি নিযুদ্ধের বিবরণ।"

নিযুদ্ধ ! সে আবার কী?

প্রশ্নটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই ঘনাদা অবশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, "নিযুদ্ধ মানে বিনা অস্ত্রে লড়াই। তখনকার দিনের শাস্ত্রীয় মল্লযুদ্ধের ওই ছিল আরেক নাম। আর ভীমসেন কীচকের সঙ্গে শাস্ত্রমতেই লড়েছিলেন।"

"শাস্ত্রমতে লড়েছেন ভীমসেন! তবে যে—?"

"ওই 'তবে যে'-টুকুই ফাঁকি।" আমাদের বাধা দিয়ে বিবৃত করলেন ঘনাদা, "ভীমসেনের অন্য যা দোষই থাক, রাজাগজার মানের জ্ঞান টনটনে। তাই সে মহলের আদবকায়দা সম্বন্ধে খুবই হুঁশিয়ার। জংলি বলে ধরে হিড়িম্বের সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ করেছেন, কীচকের বেলা তা ভাবতেও পারেন না। যত বড় পাপিষ্ঠই হোক, কীচক রাজাগজাদেরই তো একজন। বিরাট রাজার সম্বন্ধী, তার ওপর আবার মৎস্য দেশের সেনাপতি। তাই তাকে মোক্ষম শিক্ষা দিতে গিয়েও শাস্ত্রের বাইরে ভীমসেন যাননি।"

"শাস্ত্রমতে আসল নিযুদ্ধটা কী রকম হয়েছিল, শুনি!" গৌরের গলায় বেশ ছুঁচোলো সন্দেহ।

"শুনবে? শোনো তা হলে।" ঘনাদা চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ফ্ল্যাশব্যাক-এ দেখার ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন, "শাস্ত্রমতে নমস্কার আর হাত নেওয়ার পর কীচক করল কক্ষাস্ফোটন আর ভীমসেন স্কন্ধতাড়ন। এবার দুজনে কক্ষাবন্ধ হয়েছে। ওই কীচক ভীমসেনকে পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ করছে। ভীমসেন টলছে, টলছে, চোখে যেন সর্ষেফুল দেখছে, পড়ে যাচ্ছে কাটা কলাগাছের মতো। ওই পড়ছে, পড়ছে, পড়ল,— না, না, পড়েনি। পড়তে পড়তে ভীমসেন সামলে বাহুকণ্টক লাগিয়েছে। গেল গেল, কীচক বুঝি জরাসন্ধ হয়ে গেল, চিড় খাচ্ছে, খাচ্ছে,—না, ভীমসেনের কৃত-এর পর কৃতমোচন করেছে কীচক, সুসংকট দিয়ে সন্নিপাত করে অবধূত করেছে ভীমসেনকে—"

"দোহাই! দোহাই, ঘনাদা! একটু থামুন।"

সবাই মিলে আর্তনাদ করেই ঘনাদাকে থামাতে হল। 'কক্ষাস্ফোটন' 'স্কন্ধতাড়ন' থেকে 'কক্ষাবন্ধ', 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' পর্যন্ত কোনওরকমে সহ্য করা গেছল, কিন্তু 'বাহুকণ্টক' থেকে 'কৃত', 'কৃতমোচন' হয়ে 'সুসংকট', 'সন্নিপাত' ছাড়িয়ে 'অবধূত'-এ পৌঁছবার পর আমাদেরই অবস্থা কাহিল। চরকিপাক-লাগা মাথায় তাই প্রায় খাবি খাওয়া গলায় বলতে হল, 'বনোয়ারিকে দিয়ে ক-টা অ্যাসপিরিন আগে আনিয়ে নিই।"

"ওঃ!" ঘনাদা অনুকম্পায় কোমল হলেন, "মাথায় কিছু ঢুকছে না বুঝি! আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসব হল সেকালের আখড়াই বুলি। বিরাটপুরীর জিমূত পালোয়ানের

আখড়া ছিল সবচেয়ে নামকরা। নিযুদ্ধের বুলি সেখান থেকেই বেশির ভাগ আমদানি। 'কক্ষাস্ফোটন' আর 'স্কন্ধতাড়ন' হল লড়াইয়ের আগে মল্লদের হাত-পা নেড়ে যাকে বলে গা-গরম করা—'কক্ষাবন্ধ' হল লড়াইয়ের প্রথম জাপটাজাপটি মানে আলিঙ্গন। 'পূর্ণকুম্ভপ্রয়োগ' হল দুহাতে আঙুল শক্ত করে শত্রুর মাথায় চাঁটি! এক পা চেপে ধরে আরেক পা টেনে ছেঁড়ার নাম 'বাহুকণ্টক'। শত্রুকে মারের প্যাঁচ হল 'কৃত', আর সে প্যাঁচ ছাড়ানো মানে কৃতমোচন হল 'প্রতিকৃত'। শক্ত ঘুষি-পাকানো হল 'সুসংকট', আর তার কাজ হল 'সন্নিপাত'। 'অবধূত' হল শত্রুকে ধরে দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া।"

ঘনাদার এ ব্যাখায় মাথা ঘোরা বন্ধ না হলেও ভীমসেনকে 'অবধূত' করার খবরে বেশ একটু বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল, "স্বয়ং ভীমসেনকে 'অবধূত' মানে দূরে ছুড়ে ফেললে কীচক?"

"তা তো ফেললেই।" ঘনাদা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে যেন বাধ্য হলেন, "শুধু কি 'অবধূত'? মাটিতে ফেলে তারপর যা 'প্রমাথ' মানে দলাইমলাই দিতে লাগল তাতে মনে হল, ভীমসেনের হাড়গোড়ই বুঝি গুঁড়ো হয়ে যায়। 'প্রমাথ'তেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভীমসেনকে তুলে ধরে 'উন্মথন' মানে পেষাই দিতে লাগল কীচক।"

ঘনাদা এমন একটা মহাসংকটের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যই একটু থামলেন। তারপর ত্রিকালদর্শী টেলিফটো লেন্সটা যেন ঠিক ফোকাস করে নিয়ে চাক্ষুষ ধারাবিবরণীতে মেতে উঠলেন আবার—"এখনও উন্মথিত করছে কীচক। কী হল, কী, ভীমসেনের? সাড় নেই নাকি শরীরে? কীচক তো এবার প্রাণের সুখে 'প্রসৃষ্ট' মানে আলগা হাতের চাপড় লাগাচ্ছে। এরপর তো 'বরাহোদ্ধতনিঃস্বন' মানে কাঁধে তুলে মাথা নীচে ঝুলিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দূরে আছড়ে মারবে। তা হলেই তো খেল খতম!

নাচঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী ভয়ে কাঁপছেন। কাঁপছেন অলক্ষ্যে বিনা টিকিটে যাঁরা লড়াই দেখতে এসেছেন সেই ছোট-বড় দেবতারা। ভীমসেনের রুস্তম-ই-হিন্দ থুড়ি ভারত-মাতঙ্গ খেতাব বুঝি যায়, ভীমসেন বুঝি মহাভারত ডোবায়! ন্-ন্-ন্-ন্-না—। ওই তো 'শলাকা' মানে, সোজা লোহার মতো শক্ত এক আঙুলের খোঁচা লাগিয়েছে ভীমসেন। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে ভীমসেনকে কাঁধ থেকে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে কীচক। মাটিতে পড়েই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে ভীমসেন। ভীমসেন, না মত্ত মাতঙ্গ। কীচকের চারিধারে 'অভ্যাকর্ষ' অর্থাৎ বাগে পাবার মৌকা পেতে পাক দিয়ে ফিরছে ভীমসেন। এক আচমকা 'অবঘট্টন' মানে হাঁটু আর মাথার গুঁতো কীচকের বুকে আর পেটে। তারপর 'আকর্ষণ', মাটিতে ফেলে 'বিকর্ষণ', কোলে তুলে হাত-পা দুমড়ে 'প্রকর্ষণ' আর সর্বশেষে 'প্রাণ-হরণ'।"

ঘনাদা থামলেন। আমরা অভিভূত স্বরে বললাম, "এই তা হলে কীচক-বধের আসল বৃত্তান্ত! কিন্তু এতে তো ভীমসেনের লজ্জার কিছু নেই। যা আছে বরং যুদ্ধ হিসেবে গৌরবের। সুতরাং এ সব কথা মহাভারত থেকে লোপাট করার দরকারটা কী ছিল?"

"কিছুই ছিল না।" ঘনাদা যেন মুখখানা তেতো করে বললেন, "ওই দুটো বোকা ফালতু ভাইয়ের দোষেই এই হিতে বিপরীত।"

বোকা ফালতু ভাইদুটো মানে নকুল-সহদেব বুঝলাম। কিন্তু তাদের বুদ্ধির দোষটা কী, আর তাতে হিতে বিপরীতটা কীরকম?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ঘনাদাকে।

"কীরকম তা বলতেও মেজাজ খিঁচড়ে যায়!" ঘনাদা যেন আমাদের কাছেই সাড়ে তিনহাজার বছরের জমানো গা-জ্বালাটা প্রকাশ করলেন, "দুই হাঁদা ভাইয়ের মাথায় হঠাৎ বাই চাপল, আদি পর্ব থেকে জতুগৃহদাহ অধ্যায়টা একটু ছাঁটাই করতে হবে। মানে কুন্তী মায়ের নামে কোনও নিন্দে যেন কখনও না উঠতে পারে।"

"কুন্তী মায়ের নামে নিন্দে উঠবে কেন?" আমরা অবাক, "জতুগৃহ পোড়াবার প্ল্যান তো দুর্যোধনের হুকুমে পুরোচনের!"

"তা ঠিক।" ঘনাদা আমাদের জ্ঞান দিলেন, "কিন্তু আসলে ও মোম-গালার ঘরে আগুন দিয়েছিল তো ভীমসেন, আর ছেলেদের সঙ্গে লুকিয়ে কাটা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাবার আগে কুন্তী দেবীর একটা দারুণ অন্যায় হয়েছিল।"

"কুন্তী দেবীর আবার কী অন্যায়?" আমরা বিমূঢ়।

"অন্যায় পালাবার আগে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নামে ভুরিভোজের ব্যবস্থা।" ঘনাদা কুন্তী দেবীর সমালোচনায়, না সেই সুদূর ভুরিভোজের গন্ধে নাক কুঁচকোলেন, ঠিক বোঝা গেল না—"যে এসেছে তাকেই গাণ্ডেপিণ্ডে খাইয়ে একেবারে অচল করে দিয়েছেন। সেই নিষাদ মা আর তার পাঁচ ছেলে ওই ফাঁসির খাওয়া খেয়েই না পেট ঢাক হয়ে অমন বেহুঁশ হয়েছিল! নিজেরা পালাবার সময় ওই মা-ছেলেদের জাগিয়ে দিয়ে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল না কুন্তী দেবীর? এ সব কথা কেউ যাতে আর না তুলতে পারে, নকুল-সহদেব তাই কুন্তী দেবীর ভোজ দেবার ব্যাপারটাই বাদ দিতে চেয়েছিল মহারভারত থেকে।"

"কিন্তু সে সব কথা তো মহাভারতে জ্বলজ্বল করছে এখনও।" আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ও দুই হাঁদা ভাই আসল জায়গায় মানে দারুক-মূষিক এজেন্সিতে যায়নি বুঝি? সেখানে গেলে তো গণেশের বাহন-বাহাদুর কবে বেমালুম সব কেটে উড়িয়ে দিত।"

"হাঁদা হোক, ফালতু হোক, যমজ দুভাই সে কথা কি আর জানত না!" ঘনাদা নকুল-সহদেবের হয়ে একটু বললেন, "ভীমদাদা আর পুরুতমশাই ধৌম্য ঠাকুরের কাছে একটু আঁচ পেয়েই তো তারা মতলবটা ভেঁজেছিল। কিন্তু তারা যখন খোঁজ করতে গেছে, তখন ইন্দ্রপ্রস্থের চোরাগলিতে সব ভোঁ ভোঁ। দারুক-মুষিক কোম্পানি লালবাতি জ্বেলে গণেশ উলটে পালিয়েছে।"

"দারুক-মূষিক এজেন্সি ফেল!" আমরা যেমন বিস্মিত তেমনই একটু হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

"কেন আর!" ঘনাদা গোপন তথ্যটা জানালেন, "গণেশঠাকুরের বাহনটি ঘুষ খেয়ে খেয়ে শুয়োরের মতো এইসা মোটকা তখন হয়েছে যে, পুথিঘরের গর্ত দিয়ে গলতেই পারে না। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক বাবাজির পেছনেও তখন খাজাঞ্চি দপ্তরের চর লেগেছে। সব দিক দিয়ে বেগতিক বুঝে দ্বারকাতে গিয়ে ডুব মেরেছেন

তাই।

দারুক-মূষিকের খোঁজ না পেয়ে দুই হাঁদা ভাই যখন দিশেহারা তখন একদিন দুপুরে শোনে তাঁদের রাজড়াপাড়ার রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে—'কান কটকট, দাঁতের দরদ, ছাতা-জুতো সারাই, উই লাগাই, উই ধ—রা—ই।'

ছাতা-জুতো-জামা-কাপড় সারানোর কথা তো জানা, দাঁতের কানের ব্যথা সারানোও। কিন্তু উই লাগানো, উই ধরানো আবার কী!

'ডাক! ডাক তো ওকে।' দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ করে দুই ভাইয়ের আহ্লাদ আর ধরে না। মোক্ষম যা একটি প্যাঁচ এবার পাওয়া গেছে, তার কাছে দারুক-মূষিক কোম্পানির কসরত কোথায় লাগে!

ফেরিওয়ালার কাঁধে ঝোলানো বিজ্ঞাপনে তার খেতাব লেখা আছে, বল্মী-বিশারদ। গালভরা নামটার আসল মানে হল উই পোকার ওস্তাদ। ফেরিওয়ালা উই পোকা পোষে। সেই পোষা উই দিয়ে পুঁথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ সব সে যেমনটি চাই তেমনই সংশোধন করে দিতে পারে।

তাকে ঠেকাবার ক্ষমতাও কারও নেই। দারুকের শুয়োর মার্কা মূষিক তো ছার, সবচেয়ে পুঁচকে নেংটি ইঁদুরের ল্যাজও যেখানে ঢোকে না। চুলের মতো মিহি তেমন একটা ফুটো পেলেই তার কাম ফতে। তার পোষা উইয়েদের অসাধ্য কিছু নেই। হুকুম পেলে তারা রাজধানীর মহাফেজখানাই এক রাত্রে সাফ করে দিতে পারে!

মহাফেজখানা নয়, সামান্য ক-টা ছত্র। আনন্দে গদগদ হয়ে নকুল-সহদেব বারণাবতের জতুগৃহদাহের কোন জায়গাটা লোপাট করতে হবে বুঝিয়ে মোটা বায়না দেয় বল্মী-বিশারদকে।

তাইতেই সর্বনাশ হয়।

পোষা উই-বাহিনী কাজ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু একচুল দিক ভুলের দরুন বারণাবতের জতুগৃহের বদলে বিরাট পর্বের ভীম-কীচক যুদ্ধটাই দেয় চিরকালের মতো কেটে লোপাট করে।"

পৃথিবী বাড়ল না কেন?

চিত্রার্পিত কথাটা সবাই নিশ্চয়ই জানে।

আমি জানতাম না।

অন্তত অমন চাক্ষুষভাবে মানেটা বোঝবার সুযোগ কখনও পাইনি।

সেদিন পেলাম।

সেদিন মানে, শুভ ২৪ আষাঢ় * খ্রিস্টাব্দ ৯ জুলাই অ ২৪ আহাব মুং ১৫ জম-য়ল, প্রতিপদ দং ২৫।৩৬।০ ঘ ৩।১৪।৪৯ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দং ৪৮।৩০।৫৬ রাত্রি ঘ ১২।২৪।৪৭ ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারিখটা তো বুঝলাম, কিন্তু সালটা কী কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে বলব পাঁজি দেখে নিন।

আর মানে জানতে চাইলে অকপটে সত্য কথাটা স্বীকার করব।

মানে আমি কিছুই জানি না এবং বুঝিনি।

শুধু দিনটা পার হয়ে যাবার পর তার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার কারণ কিছু কোথাও পাওয়া যায় কি না খোঁজার চেষ্টায় পাঁজি খুলে ওই সব বুকনি পেয়ে মাথাটা আরও গুলিয়ে গিয়েছিল।

দিনটা সত্যিই অদ্ভুত।

অমন যে বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের দোতলার আড্ডাঘর—সেখানেও অমন কাণ্ড বুঝি কখনও হয়নি।

সে কাণ্ড বর্ণনা করতে গেলে প্রথমে ওই চিত্রার্পিত দিয়েই শুরু করতে হয়।

হ্যাঁ, আমরা সবাই চিত্রার্পিত।

আমরা মানে আমি,শিবু, শিশির, গৌর তো বটেই, তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারায় স্বয়ং ঘনাদাও তাই।

সবাই মিলে যেন নড়ন-চড়ন-হীন একটা আঁকা ছবি।

ছবিটা আবার সহজ স্বাভাবিক নয়। যেন একটা সচিত্র রহস্যগল্পের পাতা খুলে বার করা।

রহস্যটাও যে সাধারণ নয় তা ঘনাদা আর আমাদের সকলের চোখমুখের ভাব থেকেই বোঝবার। আমরা সবাই যেন ভূত দেখেছি।

ঘনাদার চেহারাটাই সবচেয়ে দেখবার মতো। চোখগুলো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জোগাড়। আর মুখটা একেবারে হাঁ।

তা চোখমুখের আর অপরাধ কী?

ব্যাপার যা ঘটেছে তাতে আর কেউ হলে খানিকটা বেহুঁশ হলেও বলার কিছু থাকত না। ঘনাদা বলেই তাই শুধু চোখদুটো ছানাবড়ার বেশি আর কিছু করেননি।

ধানাই পানাই একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে মনে করে যদি কেউ ধৈর্য হারিয়ে থাকেন তা হলে ব্যাখ্যাটা আর চেপে রাখা নিরাপদ হবে না। সবিস্তারে খুলেই বলা যাক ঘটনাটা।

শুক্রবারের সন্ধ্যা, নীচের হেঁশেলে রামভুজ রাতের জন্য স্পেশাল মেনুর আয়োজনে ব্যস্ত। বনোয়ারিকে যখন দেখা যাচ্ছে না তখন সেও সেই বড় ধান্দায় নিশ্চয় কোথাও প্রেরিত হয়েছে ধরে নিতে হবে।

সন্ধের আসর ইতিমধ্যে জমে ওঠবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রাত্রের স্পেশাল মেনু আগাগোড়া ঘনাদার নির্দেশ মাফিকই তৈরি হয়েছে। ঘনাদা তাই প্রসন্ন মনে একটু আগে আগেই আমাদের আড্ডাঘরে এসে তাঁর মৌরসি কেদারা দখল করেছেন। আমরাও হাজিরা দিতে দেরি করিনি।

আসল নাটকের যবনিকা ওঠবার আগে যেমন সামান্য একটু অর্কেস্ট্রা-বাদন তেমনই রাতের ভুরিভোজের ভূমিকা হিসাবে কিছু টুকিটাকির ব্যবস্থা হয়েছে।

বনোয়ারি অনুপস্থিত। তাই আমরা নিজেরাই পরিবেশনের ভার নিয়েছি। কাঁথামুড়ি-টি-পটের সঙ্গে পেয়ালা-টেয়ালা ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম সমেত ট্রে-টা শিশির নিজেই নিয়ে এসেছে বয়ে। ট্রের ওপর এখনও-না-খোলা চোখ জুড়োনো সিগারেটের টিনটা সাজিয়ে আনতেও ভোলেনি।

শিশির তার ট্রে-টা একটা টিপয়ে রাখতে-না-রাখতে আমি আর-একটা ট্রে নিয়ে এসে হাজির হয়েছি। সিগারেটের টিনটা না আমার ট্রের প্লেটগুলোর দিকে চোখ দেবেন ঠিক করতে না পেরে, ঘনাদার তখন প্রায় ট্যারা হবার অবস্থা।

আমি আমার ট্রে থেকে জোড়া ফিশরোলের প্লেটটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সে সংকট কিছুটা মোচন করেছি।

তারপর আমরা নিজেরাও এক একটা প্লেট নিয়ে যথাস্থানে বসবার পর বর-টর দেবার আগে দেবতাদের মতো একটা প্রসন্ন হাসি মুখে মাখিয়ে ঘনাদা তাঁর প্লেট থেকে একটি ফিশরোল সবে তুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে—

এমন সময়েই সেই তাজ্জব কাণ্ড!

হঠাৎ যেন বাইরের বারান্দায় শুনলাম—"অয়মহম্ ভোঃ!"

তারপরের মুহূর্তেই "তিষ্ঠ" শুনে মুখ ফেরবার আগেই ঘনাদার দিকে চেয়ে চক্ষুস্থির।

ঘনাদার প্লেটের ফিশরোল তাঁর হাতে নেই, মুখে নেই, তাঁর ঠিক নাকের ওপরে ঝুলছে!

এমন ব্যাপারে একেবারে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য যা হলাম তাকে চিত্রার্পিত বলে বর্ণনা করা খুব ভুল হয় কি!

এ ঝুলন্ত ফিশরোলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আসরঘরের মধ্যে এক নাটকীয় প্রবেশে আমাদের চটকা ভাঙল।

ঘরের মধ্যে যিনি তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বর্ণনা করব কেমন করে সেইটাই ভেবে পাচ্ছি না।

জটাজুটধারী বলে শুরু করে ওখানেই থামতে হয়। তারপর সন্ন্যাসী আর বলা চলে না। কারণ মাথায় বোটানিকসের বটের ঝুরির মতো জটা আর মুখে একমুখ গোঁফ দাড়ির কঙ্গো থুড়ি জাঙ্গির-এর জঙ্গল থাকলেও তারপর কৌপিন বাঘছাল কমণ্ডুলু চিমটে-টিমটে কিছু নেই। নেহাত সাধারণ পাঞ্জাবি পাজামা। তবে ছোপটা একটু অবশ্য গেরুয়া।

এ হেন মূর্তি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যেন ঘনাদাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে বজ্রস্বরে ভর্ৎসনা করলেন, "লজ্জা করে না তোমাদের! অতিথি যখন দ্বারে সমাগত তখন তাঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা না করে নিজেদের ভোজনবিলাসে মত্ত হয়েছ?"

কথাগুলোয় সংস্কৃতের ঝংকার থাকলেও এবার ভাষাটা মোটামুটি বাংলা।

কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃত যা-ই হোক ওই ভর্ৎসনায় আমাদের অবস্থাটা খুব সুবিধের হবার তো কথা নয়।

ঘনাদার দিকে একবার চেয়ে তাঁর অবস্থাটাও বুঝে নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আর ফুরসত মিলল না।

আধা-সন্ন্যাসী আগন্তুকের বজ্রস্বর আবার শোনা গেল আর সেই সঙ্গে আর-এক ভোজবাজি!

"যে লোভে অতিথির অমর্যাদা করেছ," দুর্বাসার আধুনিক সংস্করণ তখন গর্জন করছেন, "সেই লোভের গ্রাসেই তা হলে ছাই পড়ুক!"

এই অভিশাপবাণী মুখ থেকে খসতে না খসতে ঘনাদার নাকের সামনে ঝুলন্ত ফিশরোল যেন লাফ দিয়ে ছাদে গিয়ে ঠেকে ছত্রাকার হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আমরা তখন হাঁ হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছি।

আমাদের শোক তখন ছাদে ঠেকে ছত্রাকার ফিশরোলের জন্য নয়। আমাদের সব উদ্বেগ ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে।

ব্যাপারটা কেমন মাত্রাছাড়া হয়ে গেল কি?

কী করবেন এবার ঘনাদা?

এসপার ওসপার একটা কিছু করে ফেলবেন নাকি? আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠেই চলে যাবেন নাকি গটগটিয়ে তাঁর টঙের ঘরে? না, দুর্বাসার নতুন এডিশনকে পালটা গর্জন শুনিয়ে ছাড়বেন?

ভুল, সব অনুমান আমাদের ভুল।

ঘনাদাকে অত সহজে যদি চেনা যেত তা হলে আমরা এমন কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে থাকি!

দ্বিতীয় দুর্বাসার প্রতি গর্জন বা নিজের টঙের ঘরে সটান প্রস্থান, কিছুই করলেন না ঘনাদা।

তার বদলে আমাদের সকলকে একেবারে থ করে নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে উঠে

ঘনাদার সে কী বিনয়ের ভঙ্গি!

"ননুক্রিয়াতামাসনপরিগ্রহঃ। অবহিতোঽস্মি!"

কিন্তু এ সব আবোলতাবোল বলছেন কী ঘনাদা! হঠাৎ নাকের ডগা থেকে ফিশরোল উধাও হয়ে গেছে বলে মাথাটাই বিগড়ে গেল নাকি!

আমরা যখন ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে, ঘনাদা তারই মধ্যে নিজের কেদারাই ঠেলে দিয়েছেন দু নম্বর দুর্বাসার দিকে।

দুর্বাসা ঠাকুরও কি একটু দিশাহারা!

তাঁর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঘনাদার বিনয়েই বোধহয় রাগটা তখন তাঁর প্রায় জল হয়ে গেছে মনে হল। ঘনাদার এগিয়ে দেওয়া কেদারাটা না নিয়ে তিনি নিজেই কোণ থেকে আর-একটা চেয়ার টেনে বসে একটু প্রসন্ন কণ্ঠেই বললেন, "যাক আমি প্রীত হয়েছি তোমার বিনয়ে আর দেবভাষার প্রয়োগে! আমার ক্রোধ আমি সংবরণ করলাম।"

আমাদের ভাগ্য ভাল যে যত খটমটই হোক, দ্বিতীয় দুর্বাসার কথাটা এবার বাংলা বলেই বুঝলাম। কিন্তু দেবভাষার কথা কী বললেন উনি।

দেবভাষা মানে তো সংস্কৃত। আবোলতাবোল নয়, ঘনাদা তা হলে সংস্কৃতই বলেছেন জবাবে!

এবার দুর্বাসা দ্য সেকেন্ডের সঙ্গে আলাপে তিনি যদি সেই সংস্কৃত চালান তা হলেই তো গেছি!

না। সে বিপদটা কলির দুর্বাসার একটা চালের দরুনই কাটল বলা যায়। দুর্বাসা ঠাকুর শুধু ক্রোধ সংবরণ করেই তখন ক্ষান্ত হলেন না, সেই সঙ্গে ক্ষমায় উদার হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের মধ্যে ঘনশ্যাম কার নাম?"

প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম। যত উদার ভাবেই করা হোক, চালটা নেহাত কাঁচা হয়ে গেল না? বাহাত্তর নম্বরে ঢুকে ঘনশ্যাম কার নাম ঘনাদাকেই জিজ্ঞাসা করা!

এই এক বেয়াড়া প্রশ্নেই অন্যদিন হলে তো সব বানচাল হয়ে যেত।

আজ কিন্তু যাকে বলে অঘটন ঘটার দিন। শুধু ফিশরোল-এর বেলা নয়, সব কিছুতেই যেন ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে! কাঁচা চালেই কাজ হয়ে গেল।

অমন একটা প্রশ্নেও ঘনাদা চটলেন না, বরং বিনয়ে গলে গিয়ে সংস্কৃত থেকে সরল না হোক, কাঁকর-বালি সমেত অন্তত বোধগম্য বাংলায় নেমে এলেন।

"আজ্ঞে, অধীনের নামই ঘনশ্যাম!" ঘনাদার মুখে লজ্জিত স্বীকৃতি শুনে আমরাই তাজ্জব, "আপনার প্রতি অমনোযোগের অপরাধে মার্জনা ভিক্ষা করছি। সত্যিই আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।"

"প্রথমে চিনতে পারোনি!" দুর্বাসা ঠাকুরের গলা যেন একটু কাঁপা, "এখন পেরেছ নাকি?"

"না।" কুণ্ঠিতভাবে জানালেন ঘনাদা, "তবে গোড়ায় আপনাকে সেই মালাঞ্জা এমপালে বলে ভুল করেছিলাম।"

"মা-লা-ঞ্জা এম-পা-লে!" দুর্বাসা মুনির গলার স্বরটা এবার দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেই যেন প্রায় চাপা পড়ে গেল, "আমাকে ওই—ওই—তাই ভেবেছিলে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," ঘনাদা নিজের ভুলের জন্য যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বললেন, "সেই যে সাংকুর নদীর ধারে এমবুজি মাঈ থেকে চোরাই হিরে পাচার করার জন্য আমায় ম্যাজিকের ধোঁকা দিয়ে এপুলু-তে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে খবরে ইতুরি-র গহন বনে পাঠিয়ে জংলিদের ঝোলানো ফাঁদে ফাঁসিতে লটকে মারবার চেষ্টা করেছিল, আর যার মতলব হাসিল হলে পৃথিবী আরও বিরাট হয়ে দুনিয়ার কী দশা হত জানি না, সেই মালাঞ্জা এমপালে ভেবেই আপনাকে একটু তাচ্ছিল্য করেছিলাম গোড়ায়। তবে—" অত্যন্ত বিশ্রী কষ্টকর স্মৃতি মনে না আনবার জন্যই ঘনাদা যেন চেপে গিয়ে দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বললেন, "থাক সে কথা!"

"থাকবে মানে!" আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। "বলেন কী ঘনাদা!" চোরাই হিরে ম্যাজিকে পাচার করার ব্যাপারে ইতুরি না ফিতুরির জঙ্গলে ঘনাদা-ঝোলানো-ফাঁস থেকে ফাঁসি যেতে যেতে বাঁচলেন, আর দুনিয়া তাতে আরও বিরাট হতে না পেরে কী দশা থেকে বাঁচল কেউ জানে না—এতদূর শুনে আমরা ঘনাদাকে 'থাক' বলে থামতে দেব! কিন্তু আমাদের মুখ খুলতে হল না।

"না, না, থাকবে কেন?" আমাদের আগে দুর্বাসাই নাছোড়বান্দা হলেন, "মনে যখন হয়েছে তখন বলেই ফেলো। বদখত কিছু হলে সে স্মৃতি পেটে রাখতে নেই, বুঝেছ কিনা? তাতে আবার বদহজম হয়।"

"না, বদহজম আর কী হবে!" ঘনাদা একটু যেন হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "পেটেই যখন কিছু পড়েনি।"

"তাও তো বটে। তাও তো বটে!" দুর্বাসা ঠাকুরই এবার ব্যতিব্যস্ত, "আমি আবার অভিশাপটা ভুল করে দিয়ে ফেলে খাওয়াটাই নষ্ট করে দিয়েছি। তা তোমরা—"

দুর্বাসা আমাদের দিকে ফিরলেন। ফেরার অবশ্য দরকার ছিল না। ঘনাদার মুখের খেদটুকু শেষ হতে না হতে শিশির-শিবু দুজনেই ছুটে নেমে গেছে নীচে।

দুর্বাসা যখন মুখ ফেরালেন তখন দুজনেই ফিরে দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতরে এসে হাজির দুটি প্রমাণ সাইজের প্লেট হাতে নিয়ে।

তার একটা ঘনাদার আর অন্যটি দুর্বাসার হাতে দিতে দুর্বাসাই অত্যন্ত বিব্রত। "আমি মানে—আমি—" প্লেটটার জোড়া ফিশরোলের দিকে চেয়ে তাঁর যেন করুণ আর্তনাদ—"আমি তো কী বলে—"

তা দুর্বাসার আর্তনাদ নেহাতই অকারণ নয়। মাথার জটা ছাড়া দাড়ি গোঁফের যা জঙ্গল তিনি মুখে গজিয়েছেন তার ভেতর দিয়ে কিছু চালান করাই তো সমস্যা।

ঘনাদা নিজের প্লেটটির প্রতি যথাবিহিত মনোযোগ দিতে দিতেই আমাদের সেজন্যে ভর্ৎসনা করলেন, "কী তোমাদের আক্কেল! ওঁকে ওই সব খাবার দিয়ে অপমান করছ!"

"অপমান!" আমরা সত্যিই সন্ত্রস্ত—"অপমান কী করলাম?"

"অপমান নয়?" ঘনাদা বেশ ধীরে সুস্থে তাঁর ফিশরোল দুটির সদ্গতি করে চায়ের

পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, "ওঁকে কিছু খেতে বলাই তো অপমান। তোমার আমার মতো গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে ওঁর এমন যোগশক্তি হয়, না ওই জটাজুটের ভার উনি বইতে পারেন? যিনি স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে হয়তো দু-ফোঁটার বেশি জল মেশান না, তাঁকে দিয়েছ কিনা ফিশরোল! ছি ছি তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।"

আমাদের লজ্জা থেকে বাঁচাতে ঘনাদা এখন চায়ের পেয়ালা রেখে দুর্বাসা দ্য সেকেন্ডের কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ফিশরোলের প্লেটটা দুর্বাসার কোল থেকে সরিয়ে নিজের আসনে এসে বসতে বসতে বললেন, "চোখের ওপর জিনিসটা নষ্ট হতে দিতে খারাপ লাগে—তাই, নইলে ওঁর সামনে কিছু মুখে দিতেই সংকোচ হয়।"

ঘনাদার ডান হাতের কাজ তখন আবার শুরু হয়ে গেছে। তা দেখে আমরা যদি অবাক হওয়ার সঙ্গে একটু মজা পেয়ে থাকি, আমাদের দুর্বাসা ঠাকুরের চেহারাটা যেন হতভম্ব হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু মনে হল। দাড়ি গোঁফের অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর দুচোখের দৃষ্টির প্রায় জ্বলন্ত ভাবটাও খেতে দেওয়ার অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য ঘনাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা কি না ঠিক বোঝা গেল না।

ঘনাদা ইতিমধ্যে অবশ্য আমাদের সকলের হয়ে তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা সেরে ফেলে পেয়ালায় নতুন করে চা ঢেলেছেন। শিশিরও তার যথাকর্তব্য ভোলেনি।

শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সে সিগারেট থেকে বার-করা ধোঁয়ার বহর দেখে একটু ভরসা পেয়ে কেমন করে আবার আসল কথাটা তুলব ভাবছি, এমন সময় ঘনাদা নিজে থেকেই সদয় হলেন।

আমাদের যোগীবর দুর্বাসার কাছ থেকেই যেন অনুমতি চেয়ে বললেন, "পেটের কথা চেপে রাখতে নেই বলছিলেন না! আপনার উপদেশই মানতে চাই। শুধু ভাবছি এ সব বিশ্রী কথা আপনার সামনে বলা কি ঠিক হবে?"

"খুব হবে! খুব হবে!" দুর্বাসার হয়ে আমরা এবার সমস্বরে উৎসাহ দিলাম।

আমাদের উৎসাহটুকুর জন্যই ঘনাদা যেন অপেক্ষা করছিলেন।

এর পর আর তাঁকে উসকে দেবার দরকার হল না। নিজের স্টিমেই বলে চললেন, "আসল কথা কী, জানো? ওঁকে মালাঞ্জা এমপালে ভাবার জন্যই এখন লজ্জা হচ্ছে। কোথায় উনি আর কোথায় সেই শয়তানের শিরোমণি। চেহারায় মিল আছে ঠিকই। মালাঞ্জা অবশ্য আরও ফরসা ছিল, আরও মোটাসোটা জোয়ান চেহারার। তবে ওঁকে দেখে ভেবেছিলাম নিজের শয়তানির সাজাতেই বুঝি মালাঞ্জা এমন শুঁটকো মর্কট মার্কা হয়ে গেছে।"

ঘনাদা গলা খাঁকরি দেবার জন্য একটু থামলেন। আমাদের তখন যোগীবর দুর্বাসার দিকে একবার তাকাবারও সাহস নেই।

"মালাঞ্জার ম্যাজিকও ছিল উঁচু দরের," ঘনাদা আবার শুরু করে আমাদের যেন বাঁচালেন, "প্রথমে ম্যাজিক দেখিয়েই সে আমায় মোহিত করে। একটা মানুষের খোঁজে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তখন এমবুজি মাঈ শহরে এসে ক-দিনের জন্য আছি। এমবুজি মাঈ শহর হিসেবে এমন কিছুই নয়, কিন্তু সেখান থেকে মাসে দুবার

নিতান্ত ছোট দু এঞ্জিনের এমন একটা প্লেন ছাড়ে যা হুমকি দিয়ে একবার হাইজ্যাক করতে পারলে, মঙ্গলগ্রহে না হোক, চাঁদে অমন পাঁচটা রকেট নামানোর খরচ উঠে যায়!" ঘনাদা দুর্বাসাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হঠাৎ। "এমবুজি মাঈ-এর কথা আপনি তো সবই জানেন!"

"আমি...মানে...আমি"—দুর্বাসার অবস্থা যেন একটু কাহিল বলে মনে হল।

"আপনার তো সশরীরে যাবারও দরকার নেই।" ঘনাদা ভক্তিভরে বললেন, "যোগবলেই সব জানতে পারেন। তার সময় পাননি বুঝি? আমিই তা হলে বলে দিই, এমবুজি মাঈ আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের এক রাজ্যের এমন এক শহর যার চারিধারের মাটি আঁচড়ালেও হিরে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে শখ করে পরবার দামি হিরের অন্য অনেক বড় খনি আছে, কিন্তু যা দিয়ে সত্যিকার কাজ হয় শিল্পের দিক দিয়ে সে রকম দামি হিরের অদ্বিতীয় আকর হল ওই এমবুজি মাঈ শহরের চারদিকে কাসাই প্রদেশের লাল মাটি।

সেখানে একটি মাত্র সরকারি কোম্পানি মিবা-ই হিরে তোলবার অধিকারী। তারা প্রতিদিন যে পরিমাণ হিরে তোলে তার দাম কম পক্ষে দশ লক্ষ টাকা।

এ এমবুজি মাঈ শহর আর কাসাই প্রদেশ হল 'জানতি পারো না'র জ-দেওয়া জাঈর রাজ্যের অংশ। এ জাঈর রাজ্যের আগের নাম ছিল কঙ্গো। ১৯৬০ সালে এ রাজ্য স্বাধীন হবার পর নাম বদলে জাঈর রাখা হয়।

হিরের খোঁজে এমবুজি মাঈ শহরে আসিনি। এসেছি এমন একজনের খোঁজে দুনিয়ার সব হিরের চেয়ে যার দাম তখন আমার কাছে বেশি।

তার খোঁজ শুরু করেছিলাম উত্তর আমেরিকায় পৃথিবীর এক গভীরতম গিরিখাতে।"

"তার মানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে!" গৌর বিদ্যে জাহির করবার সুযোগটা ছাড়তে পারলে না।

"না"—কানমলাও খেল তৎক্ষণাৎ—"গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন-এর চেয়ে অন্তত আড়াই হাজার ফুট বেশি গভীর গিরিখাত ওই আমেরিকাতেই আছে।" ঘনাদা অনুকম্পাভরে জ্ঞান দিলেন, "আইডাহো আর ওরিগন স্টেট যা প্রায় দুশো মাইল ধরে ভাগ করে রেখেছে সেই স্নেক নদী-ই কমপক্ষে বিশ লক্ষ বছর ধরে পাহাড় কেটে এই গিরিখাত তৈরি করেছে। নাম তার হেলস ক্যানিয়ন।

নামে হেলস ক্যানিয়ন, অর্থাৎ নরকের নালা, কাজেও তাই। তা দিয়ে স্নেক অর্থাৎ যে সাপ-নদী বন্যাবেগে দক্ষিণ থেকে বয়ে যায় নামের মর্যাদা সেও রেখেছে।

লিকলিকে সাপের মতো আঁকাবাঁকাই তার গতি নয়, এক-এক জায়গায় দারুণ স্রোতের বেগে সংকীর্ণ গিরিখাত তোলপাড় করা ঘূর্ণিতে জল যেন বিষের ফেনায় সাদা করে তুলে তার প্রচণ্ড ঝাপটা দিচ্ছে ছোবলের মতো।

এই দুরন্ত স্নেক দিয়ে জেট বোটে উজানে যেতে যেতে বোটের ক্যাপ্টেন ডিন ম্যাকের কাছ থেকে ড. লেভিনের কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম।

এত জায়গা আর এত লোক থাকতে একটা প্রায় অজানা বিপজ্জনক গিরিখাতে

নগণ্য একজন জেট বোটের ক্যাপ্টেনের কাছে ড. লেভিনের খোঁজ করতে আসা একটু আহাম্মুকি মনে হতে পারে, কিন্তু খোঁজখবর নেবার আর কোথাও কিছু তখন বাকি নেই বলেই শেষ এই হতাশ চেষ্টা। ড. লেভিন সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগে এই হেলস ক্যানিয়নেই এসেছিলেন। এসেছিলেন নাকি এখানকার গিরিখাতের একদিকের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কোনও অজানা আদিবাসীদের খোদাই করা সব লেখা আর ছবি দেখার জন্য।

তিনি কি তা হলে এই দুরন্ত সাপ-নদীর স্রোতে কোথাও ডুবে-টুবে গেছেন নাকি? যা ভয়ংকর গিরিখাত আর জলের তোড় তাতে সেরকম কিছু ঘটা অসম্ভব নয় মোটেই।

কিন্তু সেরকম কিছু যে হয়নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। হেলস ক্যানিয়নের অভিযান থেকে ফেরার পর তাঁকে স্বচক্ষে সেখান থেকে প্লেনে উঠতে দেখেছে এমন সাক্ষীর অভাব নেই। তা ছাড়া ড. লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতে রেখে যাওয়া তাঁর লেখা চিরকুটটাই যে এ সব কল্পনার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

ড. লেভিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই-চোখে-পড়ে এমন ভাবে একটা কাগজ এঁটে রেখে গিয়েছিলেন। সে কাগজে তাঁর নিজের হাতে যা লেখা তার মর্ম হল— আমি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হচ্ছি। কেউ যেন আমার খোঁজ না করে!

কিন্তু কেউ যেন খোঁজ না করে বলে লিখে গেলেই কি ড. লেভিনের মতো মানুষের সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেশ ও পৃথিবী হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে! খোঁজ তাই তখন থেকেই সমানে চলছে। শুধু এত দিনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও ধরে এগোবার মতো একটা খেই-ও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ড. লেভিনের মতো মানুষের নিরুদ্দেশ হতে চাওয়াটাই যে অবিশ্বাস্য। জৈব রসায়নের অসামান্য গবেষক হিসেবে যাঁর নাম নোবেল প্রাইজ-এর জন্য বহু জায়গা থেকে প্রস্তাবিত হয়েছে, অত্যন্ত আদর্শবাদী ও সফল বিজ্ঞানসাধক হিসেবে যাঁর জীবনে কোনও দিকে কোনও দুঃখের কিছু নেই, তিনি হঠাৎ স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হতে যাবেন কেন? আর তা হয়ে থাকলে কোথায় বা গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন দুনিয়ার সেরা সন্ধানীদের চোখ এড়িয়ে? রহস্যটা সত্যিই যেন একেবারে আজগুবি।"

"আমেরিকার এফ বি আই-ও কোন কিনারা করতে পারেনি বুঝি?" চোখেমুখে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"কই আর পারল!" ঘনাদা একটু করুণা ফোটালেন দৃষ্টিতে।

শিবু তোয়াজটা বাড়াবার জন্য একটু উলটো গাইল, "জেমস বন্ডকে তো ডাকলে পারত!"

"আরে তা কি আর ডাকেনি!" শিশির ধমক দিল শিবুকে, "তাতে কিছু হয়নি বলেই না শেষ পর্যন্ত ঘনাদার শরণ নিয়েছে! না নিয়ে যাবে কোথায়? ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো চলে!"

"ঠিক বলেছ!" শিশিরকে গলা ছেড়ে সমর্থন করবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি। বললাম, "কীসে আর কীসে! ধানে আর শিষে! আরে জেমস বন্ড তো সেদিনের

মাতব্বর। তার জন্ম হবার অন্তত বিশ বছর আগে ঘনাদা মশা মেরে নুড়ি তুলেছেন সে হুঁশ কারও আছে!"

"যেতে দাও, যেতে দাও ও সব কথা!" ঘনাদা উদার মহত্ত্বে নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, "ব্যাপারটা হাতে নেবার পর থেকে আমিও কোথাও ছিটেফোঁটা একটা খেইও পাইনি। হতাশ হয়ে তাই তাঁর শেষ অভিযানের জায়গা সেই হেলস ক্যানিয়নে গেছলাম হার স্বীকার করার আগে আর-একটিবার অপ্রত্যাশিত কিছু সূত্র সেখানে মেলে কি না দেখতে।

যাওয়াই পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে। স্নেক নদী দিয়ে জেট বোটে পাড়ি দেওয়ার উত্তেজনা মিলেছে যথেষ্ট, কিন্তু আসল লাভ কিছুই হয়নি। জেট বোটের ক্যাপ্টেন ডিন ম্যাকেকে নানারকমে জেরা করেও কোনও ফল না পেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপরই অবিশ্বাস এসেছে। মনে হয়েছে আমার এ চেষ্টাটাই পাগলামি। এত দিকের এত রকম সন্ধানে যে রহস্যের এতটুকু কিনারা হয়নি, তার খেই মিলবে ডা. লেভিনের মোটমাট একদিনের একটা বোটের পাড়িতে?

তাই কিন্তু মিলেছে আশাতীতভাবে অকস্মাৎ।

গিরিখাতের ধারের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার লুপ্ত কোনও জাতির খোদাই-এর কাজ দেখাতে দেখাতে ম্যাকে হঠাৎ বলেছে, 'আপনাদের ডা. লেভিন কিন্তু একটু খ্যাপাটে ছিলেন।'

ম্যাকের এ কথায় বিশেষ কান দিইনি। ড. লেভিনের মতো মানুষ সাধারণের কাছে একটু অদ্ভুত মনে হবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

কিন্তু ম্যাকের পরের কথায় একটু চমকে উঠে কানটা খাড়া করতে হয়েছে।

'ড. লেভিন এইসব খোদাই দেখতে দেখতে কী বলেছিলেন জানেন?' ম্যাকে তখন আমায় শোনাচ্ছে—'বলেছিলেন যে পৃথিবীটাকে আরও বড় করতে হবে, অনেক বড়। শুনে আমার তো তখন হাসি পাচ্ছে। পৃথিবী আবার বড় করবে কী? পৃথিবী কি বেলুন যে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে বড় করবে! তাঁর লোকটা কিন্তু খোসামোদ করে তাঁকে যেন তাতিয়ে বলল—একা আপনিই তা পারেন হুজুর। এই পাহাড়ের খোদাইকার জাতের মতো কাউকে তা হলে আর দুনিয়া থেকে মুছে যেতে হবে না।'

ম্যাকের মুখে ড. লেভিনের পৃথিবী বড় করার কথা শুনেই তখন আমার মাথার ভেতর ভাবনার চাকা ঘুরতে ঘুরতে শুরু করেছে। তার ওপর আর একটা প্রশ্নও খোঁচা দিচ্ছে অবাক করে। ড. লেভিনের লোকটা আবার কে? তাঁর সঙ্গে কেউ কি আরও ছিল?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ম্যাকেকে। ম্যাকের কাছে যা জানলাম তা এমন কিছু অদ্ভুত নয়। ড. লেভিনের সঙ্গে তাঁর একজন অনুচর গোছের ছিল। অমন অনুচর থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ড. লেভিনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে যা যা বিবরণ আমায় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এ রকম অনুচরের বক্তব্যও কি থাকা উচিত ছিল না? যত তুচ্ছই হোক এ বিষয়ে কারও কথাই তো উপেক্ষা করবার নয়।

আগেকার সন্ধানের এ-ত্রুটি শোধরাতে হবে ঠিক করে আসল কাজের জন্য

আইডাহোর রাজধানী বয়েস-এ ড. লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতেই গিয়ে হাজির হলাম। তারপর তাঁর সহকারীদের সাহায্যে তন্নতন্ন করে ড. লেভিন সম্প্রতি যে-গবেষণার কাজে মেতে ছিলেন তার সন্ধান নিতে কিছু বাকি রাখলাম না।

যা আঁচ করেছিলাম সে রকম কিছু সত্যিই তার মধ্যে পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর সঙ্গে যে অনুচর হেলস ক্যানিয়ন-এ স্নেক নদীর পাড়িতে গিয়েছিল, তার সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। লোকটার কোনও পাত্তাই নেই। ড. লেভিন একা তাঁর যে-বাসায় থাকতেন সেখানে তাঁর নিয়মিত জ্যানিটরের বদলি লোকটা নাকি কিছুদিন মাত্র কাজ করেছিল। নেহাত ক-দিনের বদলি বলে তার সম্বন্ধে খোঁজখবরের কথা কেউ ভাবেনি।

ড. লেভিনের আসল জ্যানিটরও লোকটাও সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না। সে ক-দিনের ছুটিতে যাবার সময় তাদের ইউনিয়ন থেকেই চিঠি নিয়ে লোকটা নাকি বদলিতে এসেছিল। জ্যানিটরের কাছে অনেক কষ্টে লোকটার নামটা শুধু উদ্ধার করা গেল।

সে নামটা বেশ অবাক করবার মতো। নাম হল মালাঞ্জা এমপালে।

নাম শুনেই সন্দিগ্ধ ভাবে জ্যানিটরকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, 'নামটা ঠিক তোমার মনে আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলেছিল জ্যানিটর, 'নামটা অদ্ভুত বলেই মনে আছে। আমাদের এ দিকে আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান, কাফ্রি ও কিছু কিছু এস্কিমোও আছে। তাদের নানা রকম মজার নামের ভেতর এরকম বেয়াড়া নাম কখনও পাইনি।'

'মালাঞ্জা এমপালে যার নাম বলছ, সে লোকটা কি চেহারায় কাফ্রি, আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান বা এস্কিমোদের মতো?' এবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'আজ্ঞে না,' বলেছিল জ্যানিটর, 'নামটা উদ্ভুট্টে হলেও চেহারায় আমাদেরই মতো!'

নাম মালাঞ্জা এমপালে, অথচ চেহারায় ইউরোপীয় এই রহস্যটা মাথায় নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।

তারপর ড. লেভিনের ল্যাবরেটরির কাগজপত্র ঘেঁটে যা পেয়েছি আর মালাঞ্জা এমপালে নাম থেকে যা হদিস মিলেছে তাই সম্বল করে বারো আনা পৃথিবী ঘুরে একবার ফিলিপাইনস আর তারপর উত্তর বর্মা হয়ে সোজা জাঈর-এ গিয়ে রাজধানী কিনশাসা, আর কানাঙ্গা হয়ে এমবুজি মাঈতে এসে উঠলাম।

দুই-এ দুই-এ চার জুড়তে ভুল যে আমার হয়নি দুদিন ওই ছোট শহরে একটু শোরগোল তোলবার পরই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

ওখানকার প্রধান মাইনিং কোম্পানির ম্যানেজারের সুপারিশেই হোটেলের বদলে সাংকুরু নদীর ধারে নির্জন একটা ছোট বাংলো বাড়িতে থাকবার সুবিধে পেয়েছিলাম। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার পর সেই বাংলোতেই এক দর্শনপ্রার্থী এসে হাজির।

কেউ একজন আসবে বলেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু আমার চাকরের আনা কার্ডে যে নামটা ছাপানো সেটা আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত।

নামটা মালাঞ্জা এমপালে!

চাকরকে তক্ষুনি রাত্রের মতো ছুটি দিয়ে আগন্তুককে বসবার ঘরে ডাকলাম।

কার্ডের নামটা পড়ে যেমন মানুষটাকে স্বচক্ষে দেখে তেমনই অবাক হতে হল।

আইডাহো-র রাজধানীতে ড. লেভিনের বাসার জ্যানিটরের কাছে যার বর্ণনা শুনেছিলাম, ইউরোপিয়ানদের মতো ফরসা চেহারা। আর এ লোকটি পোশাক-আশাক থেকে চেহারাতেও ঝামা-ইটের রং-এর বাণ্টু।

কথাবার্তা আর উচ্চারণে কিন্তু নির্ভুল ফ্লেমিশ।

সেই ভাষাতেই প্রথম ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে, 'খুব অবাক হয়েছেন, না মঁসিয়ে দাস?'

'তা একটু হয়েছি!' যেন লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলাম।

'কীসে অবাক হয়েছেন?' আমার ঘাড়ের ওপর সচাপটে একটা হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এমপালে, 'এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়েছি বলে?'

'না।' কাঁধ থেকে তার হাতের চাপটা সরাবার যেন বৃথা চেষ্টা করে একটু অস্বস্তি দেখিয়ে বললাম, 'আপনাকে খোঁজার জন্য আমার যত গরজ, আপনার আমাকে খোঁজার গরজও যে তার চেয়ে কম নয় তা জানতাম। তবে নিজেই প্রথমে দর্শন দেবেন এটা আশা করতে পারিনি, আর গায়ের রংটা আইডাহো থেকে জাঈর-এ এসেই রোদে পুড়ে এতটা পালটাবে সেটা ধারণার মধ্যে ছিল না।'

'যা দরকারি তা অন্যকে দিয়ে আমি করাই না।' মালাঞ্জা এমপালে আমার এক কাঁধ ছেড়ে আর কাঁধে চাপ দিয়ে বললেন, 'আর এ-ই আমার আসল রং। আইডাহোতে যা লোকে দেখেছে সে রং মেক-আপ করা নকল। কিন্তু আইডাহো থেকে আপনি এই জাঈর-এ আমার খোঁজে এলেন কী করে?'

'সামান্য একটু বুদ্ধি তার জন্য খাটাতে হয়েছে!' আবার যেন এমপালের হাতের চাপটা সরাতে গিয়ে হার মেনে কাতর গলায় বললাম, 'তা ছাড়া আপনি নিজেই একটা সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলেন কিনা!'

'আমি সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলাম?' সত্যিই চমকে উঠে কাঁধের ওপর চাপ দেওয়া ছেড়ে আমার নড়া ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'কী খেই?'

'আজ্ঞে, আপনার নামটা!' গলাটা যেন যন্ত্রণায় নাড়তে নাড়তে বললাম।

'আমার নামটা!' আর ভদ্রতার মুখোশ না রাখতে পেরে এমপালে হিংস্র গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ওই নাম থেকে তুই এখানে আমার খোঁজ করতে আসার হদিস পেয়েছিস।'

'শুধু আপনাকে নয়, আপনি যাকে সঙ্গে এনে লুকিয়ে রেখেছন সেই ড. লেভিনকে খোঁজ করার হদিসও ওই নামটা থেকে অনেকটা পেয়েছি!' যেন ভয়ে ভয়ে বললাম, 'বাকিটা পেয়েছি ড. লেভিনের ল্যাবরেটরির কাজকর্ম দেখে আর হেলস ক্যানিয়নে তাঁর একটা বাতুল ইচ্ছের কথা জেনে।'

আমার কথায় হতভম্ব হয়ে এমপালে এবার বোধ হয় আমায় শারীরিক শাস্তি দিতে ভুলে গেল। শুধু দাঁত খিঁচিয়ে জানতে চাইলে, 'ও সব বাজে বাকতাল্লা ছেড়ে আমার

নাম শুনে কী করে এখানে এলি তাই আগে বল।'

'আজ্ঞে! এটা আপনার কাছে এত শক্ত মনে হচ্ছে কেন?' একটু রেহাই পেয়ে যেন সভয়ে একটা দেয়ালের দিকে ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দুনিয়ার সব জায়গায় নামের বিশেষত্ব আছে জানেন তো! আপনাদের এই অঞ্চলেরই পশ্চিম টাঙ্গানাইকা হ্রদের ওপরে টানজানিয়া কি দক্ষিণ পূর্বে জামবিয়ায় যে ধরনের নাম, জাঈর-এর নামের ধরন তা থেকে আলাদা। মালাঞ্জা এমপালে শুনেই তাই বুঝেছিলাম আসল বা ছদ্মনাম যা-ই হোক নামটা এই জাঈর অঞ্চলের। এ নাম যে নিয়েছে জাঈর-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক যে নিশ্চিত আছে, ড. লেভিনের গবেষণার ধারা জেনে আর তাঁর পৃথিবী বড় করার ইচ্ছের কথা শুনে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হই।'

'আমার নাম শুনে জায়গাটা না হয় আঁচ করেছিস বুঝলাম, কিন্তু ড. লেভিনের পৃথিবী বড় করার ইচ্ছে থেকে নিশ্চিত বুঝলি আমরা জাঈর-এ এসেছি! চালাকি করবার আর জায়গা পাসনি!' হতভম্ব থাকার দরুনই এবারও এমপালে আমায় মারধোর দেবার চেষ্টা করলে না।

'চালাকি করবার এই তো এখন জায়গা!' একটু যেন সাহস পেয়েছি ভাব দেখিয়ে জোর গলায় বললাম, 'আর পৃথিবী বড় করার মতো আশ্চর্য চালাকি এই জাঈর ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়। তাই জেনেই ড. লেভিনকে বোঝাতে এখানে তাঁর খোঁজে এসেছি।'

'সে খোঁজ তা হলে তোকে ছাড়তে হবে!' এবার আর দাঁত খিঁচুনি নয়, এমপালের গলায় যেন বজ্রের হুমকি, 'কোথায় তোর দেশ জানি না। তা যে চুলোতেই হোক, ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যা।'

'আমার ঘর যে বড় দূর!' যেন দুঃখের সঙ্গেই বললাম, 'সেই গোটা আফ্রিকা আর আরব সাগর পার হবার পরও যেতে হবে ভারতবর্ষের একেবারে পুব প্রান্তে। তার চেয়ে আপনার ঘরে ফিরে যাওয়াই সোজা নয়? প্লেন যদি না জোটে তা হলে মাতাদি-র বন্দর থেকে জাহাজে চেপে সোজা উত্তরে আপনার বেলজিয়মে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। অবশ্য বেলজিয়াম যদি আপনার আসল দেশ হয়। আমায় মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করেও যেরকম ভাঙা ফ্লেমিশ-এ কথা বলছেন তাতে মনে হয় বেলজিয়মও আপনার দেশ নয়। যুদ্ধে হারবার পর শয়তান নাৎসিদের অনেকে অসংখ্য পাপের শাস্তির ভয়ে দেশবিদেশে পালিয়ে লুকিয়ে আছে শুনেছি। কে জানে আপনি তাদেরই একজন কি না, পৈশাচিক এক মতলব নিয়ে ছদ্মনামে আর চেহারায় এই ঘোর জঙ্গলের দেশে পড়ে আছেন! এখন চলে গেলে ড. লেভিনকে তাঁর স্বপ্ন আর আদর্শের টোপ দিয়েই ভুলিয়ে নিয়ে এসে সে মতলব হাসিল করা আপনার আর হয়ে উঠবে না বটে, তবে আমি যখন এসে গেছি তখন সে উদ্দেশ্য সফল তো আপনার আর হবার নয়। তাই ভালয় ভালয় আপনারই এখন চলে যাওয়া ভাল। বেলজিয়মে জায়গা না জোটে জাঈর ছেড়ে যেখানে খুশি গেলেই হবে। জাঈর-এর ইতুরি-র জঙ্গলের অন্তত ধারে কাছে থাকবেন না।'

ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে গেলেও শুধু আমি কতটা কী ধরে ফেলেছি তা

জানবার অদম্য কৌতূহলেই নিশ্চয়ই, আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় এতক্ষণ কোনও বাধা দেয়নি মালাঞ্জা। এবার ইতুরি কথাটা আমার মুখ থেকে খসতেই একেবারে বোমার মতো সে ফেটে পড়ল।

'ইতুরি! কী জানিস তুই ইতুরি-র?' এমপালে চোখের আগুনেই আমায় যেন ভস্ম করবে।

'কিছুই এখনও জানি না,' সহজ সরল ভাবে ভালমানুষের মতো বললাম, 'শুধু অনুমান করছি যে পৃথিবী বড় করবার পরীক্ষা চালাবার পক্ষে ইতুরি-র চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। সেইখানেই আপনার গুপ্ত ঘাঁটি বসিয়ে ড. লেভিনকে এনে রেখেছেন মনে হচ্ছে—'

আর কিছু বলতে হল না। জাঙ্গির-এর দুর্দান্ত পাহাড়ি গোরিলার মতোই মণ পাঁচেক কয়লার বস্তার ভার নিয়ে এমপালে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দড়াম করে একটা শব্দ হল দেওয়ালে। বেচারার মাথাটা ফেটে রক্তারক্তি।

ধরে তুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সুযোগ দিলে না। মালাঞ্জার জেদ আছে বটে। ফাটা মাথা নিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। একবার দুবার নয়, পাঁচ-পাঁচবার। কপাল মাথা কিছু আর আস্ত রইল না।

বেচারার আর দোষ কী? আমায় তাগ করে যেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে শুধু দেয়ালের সঙ্গেই মোলাকাত হয়। আমি তার আগেই সরে গেছি।

পাঁচ-পাঁচবার এমনই দেয়ালবাজি দেখাবার পর সত্যিই ধরে তুলতে হল মালাঞ্জাকে। ধরে তুলে আমার চেয়ারটাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমি বড়ই দুঃখিত, হের মালাঞ্জা। এ বাংলোবাড়ির দেয়ালে গদি আঁটা থাকা উচিত ছিল।'

'আমিও দুঃখিত যে,' ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে মালাঞ্জা এমপালে, 'আমার কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতেই পারিনি। আমি এতক্ষণ শুধু আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম, মি. দাস? ড. লেভিনের নিজের হুকুমেই এত কড়া পরীক্ষা করতে হয়েছে। বুঝতেই তো পারছেন, ড. লেভিন যা করতে যাচ্ছেন অমন আশ্চর্য একটা গবেষণার কথা একেবারে ষোলো আনা খাঁটি মানুষ ছাড়া কাউকে জানানো যায়! আপনাকে এখান থেকে ড. লেভিনের কাছেই নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি—পরীক্ষাটা আগে শুধু করে নিলাম।'

'আমায় পরীক্ষা করছিলেন?' চোখ দুটো আপনা থেকেই কপালে উঠল।

অবাক হবার তখনও কিছু তবু বাকি।

মালাঞ্জা যন্ত্রণায় মুখটা একটু বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, 'হ্যাঁ, সে পরীক্ষা আমার শেষ হয়েছে, শুধু শেষ হুঁশিয়ার করাটা এখনও বাকি। এখান থেকে আপনার যাবার আসল বাধাটা তাই কাটিয়ে দিই।'

'আসল বাধা?' সন্দিগ্ধ ভাবে বললাম, 'সে আবার কী?'

'এই দেখুন,' বলে মালাঞ্জা এবার যা দেখাল তা সত্যি তাজ্জব করার মতো ব্যাপার।

গাছ থেকে ফুল তোলার মতো আমার মাথা মুখ নাক কান হাতা পকেট যেখানে

খুশি হাত দিয়ে সে একটার পর একটা ছোট বড় হিরে বার করে আনতে লাগল।

তারপর সেগুলো সামনের টেবিলে রেখে ওই রক্ত-মাখা মুখেই একটু কাতরানির হাসি হেসে বললেন, 'যতই আপনি ম্যানেজারের বন্ধু হন, এই সব চোরাই হিরে নিয়ে আপনি এমবুজি মাঈ ছেড়ে যেতে পারতেন? এবার বুঝতে পারছেন আমি আপনার বন্ধু, না শত্রু! শত্রু হলে এই সব হিরে দিয়েই আপনাকে আমি ধরিয়ে দিতাম না?'

আমার মুখে তখন আর কথা নেই। এ ম্যাজিকের পর আর বলার কী বা থাকতে পারে?

শত্রু না বন্ধু মালাঞ্জার সঙ্গেই তারপর এমবুজি মাঈ থেকে বোয়ামা জলপ্রপাতের শহর কিসানগানি হয়ে এপুলু গেলাম। সেখান থেকে দুনিয়ার সব চেয়ে রহস্যময় জঙ্গল ইতুরি। ইতুরি-র জঙ্গলে মালাঞ্জার সাধ্য নেই একা পথ চিনে যাবার। তাই সেথো নেওয়া হল মাকুবাসি নামে ইতুরি-র বিখ্যাত বামন জাতের এক সর্দারকে! মাকুবাসি মাথায় চার ফুটের বেশি লম্বা নয়, পরনে তার নেংটি। হাতে যেন খেলাঘরের একটা ছোট ধনুক। কিন্তু যেমন সে ধনুকের তিরের অজানা অব্যর্থ বিষ তেমনই আশ্চর্য তার সব ক্ষমতা। গহন জঙ্গলের সঙ্গে তার যেন গোপন দোস্তি আছে এমনই তার সেখানকার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান।

এই মাকুবাসিকেও কিন্তু মালাঞ্জার বিশ্বাস নেই। দুদিন মাকুবাসির কথা মতো চলবার পর তিনদিনের দিন এক জায়গায় রাত কাটিয়ে ভোর না হতেই মালাঞ্জা আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললে, 'এবার আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে, দাস!'

হেসে বললাম, 'এতক্ষণ কি শুধু আরাম করেছি?'

'না, না,' লজ্জিত হয়ে বললে মালাঞ্জা, 'এবার খানিকটা পথ আপনাকে ও আমাকে একলা একলা আলাদা যেতে হবে। মাকুবাসি রাত থাকতেই উঠে জালে শিকার ধরতে গেছে। সে আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে। ড. লেভিনের গোপন আস্তানা ওই বামন জাতের কাউকেও আমরা জানাতে চাই না।'

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একলা অমন কতদূর যেতে হবে? পথ চিনতে পারব তো!'

'খুব পারবেন!' ভরসা দিলে মালাঞ্জা, 'এখান থেকে সোজা গেলেই মাইল খানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বাওবাব গাছ দেখতে পাবেন। সেই বাওবাবের প্রকাণ্ড একটা কোটরের ভেতর দিয়ে মাত্র মিনিট দুইয়ের একটা সুড়ঙ্গ, ড. লেভিনের গোপন আস্তানায় যাবার রাস্তা। আমি ভিন্ন রাস্তায় সেখানেই যাচ্ছি। আপনি আগে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভাবনা নেই। শুধু একটু দেখে শুনে যাবেন মাকুবাসির নজরে না পড়েন।'

দেখে শুনেই যাচ্ছিলাম। তাতে এক মাইলও যেতে হল না। তার আগেই মাকুবাসির নজরে পড়ে যাব কে জানত!

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোনওরকমে পথ করে যাচ্ছি। হঠাৎ পেছনে জামায় টান পড়ে থেমে যেতে হল। ফিরে তাকিয়ে দেখি কাঁধে এমবোলোকো নামে ছোট্ট খুদে একটা নীল হরিণ নিয়ে মাকুবাসি। সে উত্তেজিত ভাষায় যা বলল তা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বোঝাবার জন্যই কাঁধের ছোট্ট নীল হরিণটা সে আমার

সামনে এক পা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে।

বুঝতে আর তখন কিছু বাকি রইল না। হরিণটা সেখানে পড়া মাত্র মাটির ওপর পাতা জংলি-লতা ফাঁস তার পা দুটোতে জম্পেশ করে আটকে তাকে এক ঝটকায় শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে। মাকুবাসি মোক্ষম সময়ে টেনে না ধরলে ইতুরি-র জংলি বামনদের ফাঁদে আমারও ওই অবস্থাই হত।

মাকুবাসি তার হরিণটা ঝোলানো ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে তখুনি আমাদের রাতের আস্তানায় ফিরে যেতে চাইছিল, তাকে তা দিলাম না। কোনও রকমে আমার মনের কথাটা তাকে বুঝিয়ে রাত পর্যন্ত তাকে রেখে দিলাম সঙ্গে।

তারপর—

হ্যাঁ, তারপর নাটকের শেষ দৃশ্যটা একরকম জমাটি-ই হল।

ইতুরি-র জঙ্গলের মাঝখানে সত্যিই বেশ মজবুত করে তৈরি বাঁশ বেত আর জংলি লতাপাতার একটা ছোটখাটো বাসা। তার একটা ঘর গবেষণাগারের সাজ-সরঞ্জামেই সাজানো! কী কষ্ট করে শুধু সে সমস্ত লটবহর নয়, ঘরের জোরালো হ্যাসাক বাতিটাও আনানো হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

অবাক হতে হয় সেখানকার দুটি মানুষের আলাপ শুনেও। তাদের একজন ড. লেভিন, আর-একজন মালাঞ্জা এমপালে।

ড. লেভিন তখন জিজ্ঞাসা করছেন, 'যাঁর খোঁজে গিয়েছিলে বলছ, সত্যিই তাঁর দেখাই পেলে না। তিনি তো আমাদের বন্ধু বলছ।'

'হ্যাঁ, পরম বন্ধু!' হতাশভাবে বললে মালাঞ্জা, 'তিনি এলে অনেক উপকার আমাদের হত। তাই গোপনে খবর পাঠিয়ে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতুরি-র জঙ্গলের ভয়েই বোধহয় আসতে পারলেন না।'

'না, ঠিকই এসেছি, মালাঞ্জা, আর বোধহয় ঠিক সময়েই। নমস্কার ড. লেভিন।'

বাইরের বেতের দরজা প্রায় ভেঙে আমায় হঠাৎ ঢুকতে দেখে মালাঞ্জা আর ড. লেভিন দুজনেই একেবারে স্তম্ভিত হতবাক।

তার মধ্যে ড. লেভিনই প্রথম চাঙ্গা হয়ে বললেন, 'একী—তুমি মি. দাস? তোমায় আনতে গিয়ে মালাঞ্জা খুঁজে পায়নি! তুমি যে আমার খোঁজে আসছ তা আগে আমায় বলেনি কেন?'

'বলেনি একটু বাধা ছিল বলে বোধহয়,' হেসে মালাঞ্জার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'প্রথমত, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যে বহুদিনের তা ওর জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, আগে থাকতে বললে ইতুরি-র ঝোলানো ফাঁসে আমাকে লটকাবার ব্যবস্থা করা যেত না।'

'ফাঁসে লটকানো? কী বলছ তুমি, দাস?' ড. লেভিন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, 'তোমাকে ঝোলানো ফাঁসে লটকাতে যাবে কেন মালাঞ্জা?'

'যাবে, আমার মতো পথের কাঁটা না সরালে ওর আসল মতলব হাসিল হবে না, তাই। কী বলো মালাঞ্জা?' মালাঞ্জার দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

মালাঞ্জা একেবারে চুপ। তার বদলে ড. লেভিনই বিমূঢ় এবং একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, 'কী তুমি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না, দাস। আমার এই একা

লুকোনো আস্তানার খোঁজ পাওয়াই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই বলেই তা তুমি পেয়েছ বুঝলাম, কিন্তু সে খোঁজ পাবার পর আমার একান্ত বিশ্বাসের সহকারী সম্বন্ধে এ সব মিথ্যা অভিযোগ করতেই কি তুমি এসেছ!'

'মিথ্যা অভিযোগ নয়, ড. লেভিন, সব সত্য।' এবার গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কিন্তু শুধু তার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'আমায় নিয়ে যেতে!' ড. লেভিন এবার গরম হলেন, 'আমায় তুমি নিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব? আমি কী জন্য এখানে এসেছি তা তুমি জানো?'

'তা জানি বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে চাই।' কঠিন হয়ে এবার বললাম, 'আর আপনার সন্ধান যে পেয়েছি তা আপনার নিরুদ্দেশ হবার কারণ থেকেই। শুনুন ড. লেভিন, আপনি মস্ত বৈজ্ঞানিক, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গের স্বপ্ন-দেখা কবি। আপনি পৃথিবীকে আরও বড় করতে চান মানুষের ভালর জন্য।'

'হ্যাঁ,' এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ড. লেভিন, 'মানুষের এত সব সমস্যা, জাতিতে জাতিতে এত মারামারি কাটাকাটি শুধু পৃথিবীতে এখন জায়গার অভাব বলে। পৃথিবী বড় করতে পারলে মানুষের বারো আনা সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।'

'আপনি পৃথিবীকে বড় করতে চান জেনেই,' ড. লেভিনকে বাধা দিয়ে থামিয়ে বললাম, 'কোথায় আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারেন তার নিশ্চিত হদিস পেয়েছি।'

'কেমন করে?' ড. লেভিন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, 'পেয়েছি, পৃথিবী বড় করার আসল রহস্যটা বুঝে। পৃথিবী তো সত্যি বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা যায় না। পৃথিবী যা আছে তা-ই থাকবে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীকে আরও বিস্তৃত করতে হলে মানুষকে ছোট করতে হয় এই বুদ্ধি আপনার মাথায় এসেছে। মানুষ যদি এখনকার মাপের বদলে সমস্ত বর্তমান বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ছোট হতে হতে ইঁদুর, আর তারও পরে পিঁপড়ের মতো ছোট হয়ে যায় তা হলে পৃথিবী তার পক্ষে কী বিরাটই না হয়ে যাবে। তাই ভেবেই আপনার জৈব-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে আকারে ছোট করার উপায় আপনি খুঁজতে শুরু করেছেন। সে খোঁজে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর এই একটি দেশ জাঈরের-এর ইতুরি জঙ্গলে আপনাকে আসতেই হবে।'

'কেন আসতে হবে তা তুমি বুঝেছ?' ড. লেভিন বেশ একটু মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে চাইলেন।

'হ্যাঁ, কিছুটা তার বুঝেছি, ড. লেভিন,' বিনীতভাবেই জানালাম, 'পৃথিবীতে বামন জাত, বামন প্রাণী অনেক জায়গাতেই আছে, কিন্তু জাঈর-এর এই ইতুরি-র জঙ্গল যেন সে রহস্যের আসল ঘাঁটি। এখানে শুধু আদ্যিকালের এক বামন জাতের মানুষই নেই, এখানকার আরও অনেক কিছুর আকার ছোটর দিকে, যেমন এখানকার খুদে লাল মোষ, বামন হাতি ইত্যাদি। এখানকার মাটি আর জলে সুতরাং আকার কমাবার কোনও রহস্য লুকোনো আছে। নিজের গবেষণায় যা জেনেছেন তার সঙ্গে এখানকার রহস্যও আপনার না জানলে নয়।'

'সবই বুঝলাম,' এবার ড. লেভিন আবার একটু সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, 'কিন্তু

আমার একান্ত বিশ্বাসী সহকারী মালাঞ্জার বিরুদ্ধে তোমার ও সব অভিযোগ কেন?'

'প্রথমত, ও সত্যি মালাঞ্জা এমপালে নয় বলে।' মালাঞ্জার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে এবার বললাম, 'দ্বিতীয়ত, আপনার গবেষণার ফল ও নিজের লাভেই লাগাবে বলে মতলব করে আপনাকে এখানে এনেছে বলে অভিযোগ।'

'এ সব কথা তুমি কীসের জোরে বলছ, দাস?' ড. লেভিনের গলা এবার কঠিন হল।

'বলছি কীসের জোরে—এই দেখুন!' মালাঞ্জার নাক মুখ চোখ থেকে টুক টুক করে যেন ফুল ছেঁড়ার মতো হিরে টেনে বার করতে করতে বললাম, 'মালাঞ্জা চোর। এমবুজি মাঈ থেকে ও এমনই করে হিরে পাচার করে এনেছে।' "

ঘনাদার কথা শুনে যত না, তাঁর কাণ্ড থেকে তখন আমরা সবাই থ। করছেন কী ঘনাদা। মালাঞ্জার নাক মুখ থেকে হিরে বার করা দেখাতে গিয়ে আমাদের দুর্বাসার জটাজুট দাড়ি থেকেই যে মার্বেলের গুলি আর তার সঙ্গে ক-টা আস্ত ডিম বার করে ফেললেন!

সে সব মার্বেল আর ডিম টেবিলের ওপর রেখে ঘনাদা আবার বললেন, "হিরেগুলো বার করবার পর ঘরের একটা তাক থেকে একটু স্পিরিট হাতে লাগিয়ে মালাঞ্জার গালে একটু জোরে একটা আঙুল ঘসতে যেতেই ড. লেভিন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

আমি আঙুল ঘসতে আরম্ভ করার সঙ্গেই প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'আরে, ক-হ কী, দাস! মালাঞ্জা যে গায়ে পেন্ট করে আইডাহোতে সাহেব সেজেছিল তা ও আমার কাছে স্বীকার করেছে।'

'না, ড. লেভিন,' আঙুলটা ভাল করে মালাঞ্জার গায়ে ঘসে তুলে নিয়ে বললাম, 'মালাঞ্জার এখনকার রংটাই পেন্ট করা কি না এই দেখুন। আসলে ও একজন ইউরোপিয়ান, হয়তো ফেরারি নাৎসি। আপনার গবেষণা সফল হলে তাই দিয়ে পৃথিবীর কী সর্বনাশ করা ওর মতলব কে জানে! আপনাকে তাই আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে।'

কেমন যেন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে ড. লেভিন বললেন, 'কিন্তু আমার গবেষণা? আমার স্বপ্ন?'

'আপনার গবেষণা আপনার স্বপ্ন মানুষের পক্ষে সর্বনাশা ড. লেভিন!' সহানুভূতির সঙ্গেই বললাম, 'মানুষকে আকারে ছোট করলেই তার বেশির ভাগ সমস্যা মিটবে এ কথা ভাবা আপনার ভুল। শুধু পৃথিবীই তার পক্ষে বিশাল করলে চলবে না, মানুষের মনটাকেও সেই সঙ্গে আরও বড় আরও উদার করতে হবে। তার উপায় যত দিন না হয় ততদিন পৃথিবীর বদলে সারা ব্রহ্মাণ্ড পেলেও সমস্যা মিটবে না। যা ভুল করতে যাচ্ছিলেন তা ছেড়ে এখন আমার সঙ্গে চলুন।'

'চলুন।' হঠাৎ হা হা করে হেসে দাঁড়িয়ে উঠল মালাঞ্জা। 'খুব তো বড় বড় কথা শোনালে, দাস। কিন্তু চলুন বললেই কি এই ইতুরি-র জঙ্গল থেকে যাওয়া যায়! আমি ফেরারি নাৎসি বা যে-ই হই, যে গবেষণার জন্যে ড. লেভিনকে এখানে এনেছি তা

শেষ না করা পর্যন্ত এখান থেকে এক পা-ও ওঁকে যেতে দেব না। সেই সঙ্গে তোমাকেও যে এখানে বন্দী থাকতে হবে তা বুঝতে পারছ, দাস?'

'ঠিক পারছি না তো!' একটু হেসে ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে মাকুবাসি ঘরে এসে ঢুকতেই তাকে দেখিয়ে বললাম, 'বরং মনে হচ্ছে চলুন বললেই ইতুরি থেকে যাওয়া যায়। তবে তোমার যখন ইতুরি-র ওপর এত মায়া তখন তোমাকেই কিছুদিন এখানে রাখবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। ভয় নেই, আলগা করেই বাঁধন দেব। একটু চেষ্টা করলে একদিনের মধ্যেই যাতে খুলতে পারো।'

মালাঞ্জা এমপালেকে সেইরকম ভাবে বেঁধেই সেখান থেকে ড. লেভিনকে নিয়ে মাকুবাসিকে গাইড নিয়ে চলে এসেছিলাম। মাকুবাসিকে ফিরে গিয়ে মালাঞ্জার খোঁজ নিতে বলতেও ভুলিনি।"

ঘনাদা কথাগুলো শেষ করেই আচমকা উঠে পড়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। যেতে যেতে দরজার কাছ থেকে ফিরে শুধু বলে গেছেন, "আমার ফিশরোল সরানোর জন্য ছাদের সঙ্গে বাঁধা কালো সুতোটা এখনও ঝুলছে। ওটা ছিঁড়ে ফেলো। আর তোমাদের ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জটাজুট দাড়ি গোঁফ একটু খুলে আরাম করে বসতে বলো। যা গরম।"

টঙের ঘরের সিঁড়িতে ঘনাদার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে। আমরা তখন চোরের মতো এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

দুর্বাসার দিকে চাইতেই চোখ উঠতে চাইছে না।

অত সাজগোজ শেখানোপড়ানোর পর অমন নাকাল হয়ে যা কটমট করে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে!

এরপর তাদের ক্লাব থেকে আর কাউকে কোনওদিনও কিছু সাজিয়ে আনা যাবে!

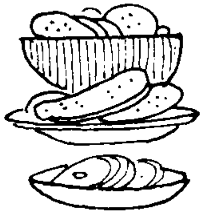

ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ

আবার সেই ভুল।

আর সেই ভুলেই বুঝি বাহাত্তর নম্বরের বারোটা বেজে যায়!

সবাই তখন আফশোসে হাত কামড়াচ্ছি আর গালাগাল দিচ্ছি পরস্পরকে!

"সব দোষ তো এই আহাম্মকের!" শিবু আমার ওপরই গায়ের ঝাল ঝাড়ছে, "মেসের খরচার দিকটাও তো ভাবতে হবে—বলেছিলেন। ভাবো এখন খরচার দিক! বাহাত্তর নম্বরই যে এখন খরচার খাতায়!"

"আর তুমি!" আমিও পালটা ঘা দিতে ছাড়ছি না, "সুপারিশটা কে করেছিল? তুমি না? না, না খুব ভাল ছেলে! সাত চড়ে রা নেই। শুধু পড়াশুনা নিয়েই নাকি রাতদিন থাকবে। আমরা টেরই পাব না কেউ আছে! কেমন? টের কি এখনও পাওয়া যাচ্ছে!"

"শিবুকে দুষে কী হবে!" শিশির শিবুর পক্ষ নিচ্ছে, "আসল আসামি তো গৌর। শিবু তো ওর গ্রামোফোন ছাড়া কিছু নয়। গৌর যা গায় তাই ও বাজায়! গৌরই তো খবর এনেছে প্রথম। ওঁর মোহনবাগানের সি-টিমের কোন হবু প্লেয়ারের মাসির সইয়ের বকুল ফুলের ভাগনে না ভাইপো শুনেই উনি গদগদ হয়ে লাইন ক্লিয়ার লিখে দিয়েছেন।"

"আমি না হয় রেফারেন্স ভুল করেছি, আর উনি বুঝি একেবারে ধোয়া তুলসি পাতাটি!" গৌর শিশিরকে ভেঙাচ্চে, "চেহারা দেখেই উনি চরিত্র গুণে বলে দিতে পারেন! দেখিস বাহাত্তর নম্বরের একেবারে আদর্শ বোর্ডার হবে! কী বিনয়! কী আদবকায়দা দুরস্ত। ঘনাদাকে পর্যন্ত দুদিনে মোহিত করে দিয়েছে। সামলাও এবার তোমার মোহিত মোহনকে!"

হ্যাঁ, ওই মোহিত করার জ্বালাতে জ্বলেই নিরুপায় হয়ে নিজেরা খাওয়া-খাওয়ি করে মরছি। সেই সঙ্গে দু-দুবার ঠেকেও কিছু না শিখে সেই পুরনো ভুলটা করার জন্য ধিক্কার দিচ্ছি নিজেদের। সত্যি তিন-তিনবার এমন ভুলটা কী বলে করলাম!

হাঁস খাইয়ে পেটে যে চড়া পড়িয়ে দিয়েছিল সেই বাপি দত্তর কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। বিশেষণটা তার বুনো হলেও মানুষটা এমনিতে সাদাসিধে আর সরল ছিল একথা মানতেই হবে। জ্বালা যদি সে কিছু দিয়ে থাকে তা হলে পেয়েছে অনেক বেশি।

কিন্তু তারপর সেই ছাতার মালিক সুশীল চাকী! নতুন বোর্ডার নেবার সুখ সে তো হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে!

এই সব নজিরের পর আমাদের মতো ন্যাড়ার আর বেলতলায় যাওয়া উচিত?

তা ছাড়া বোর্ডার নিতে গেলাম কিনা ধনু চৌধুরিকে?

বাহাত্তর নম্বরে আমাদের ভাগীদার নেওয়াটাই আহাম্মুকি হয়েছে একথা স্বীকার করবার পরও অবশ্য আমাদের তরফের কিছু বলার থাকে। চোখে তো আমাদের সেরকম এক্সরে যন্ত্র নেই যে বুকের হাড়-চামড়া ফুঁড়ে একেবারে ভেতরের চেহারাটা দেখিয়ে দেবে। ধনু চৌধুরির সার্টিফিকেটগুলো বাইরে থেকে দেখলে তো সবই মিলে যায়। সেই অতি সভ্য-ভব্য ছেলে! সাত চড়ে রা নেই। যেমন আদব-কায়দা দুরস্ত তেমনই বিনয়ী। ব্যবহারে একেবারে মোহিত হতে হয়। ঘনাদাকে পর্যন্ত মোহিত করে দিয়েছে!

কিন্তু ওই মোহিত করা যে এমন সর্বনাশা তা কি আগে ভাবতে পেরেছি! গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে ছাড়ছে।

ওপর থেকে দোষ ধরবার কিছু নেই। প্রথম দিনই বিকেলে আমাদের আড্ডাঘরে ভক্ত হনুমানটির মতো একটি কোণে এসে বসেছে। আমাদের পাঁচজনের দয়ায় ঘনাদার একটু দর্শন পেয়ে আর বাণী শুনেই যেন ধন্য। তার স্বরূপটির একটু আঁচ

পাওয়া গেছে প্লেট সাজানো ট্রে নিয়ে বনোয়ারির ঘরে ঢোকার পরেই।

ঘনাদাকে টোপে ধরবার জন্য সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্লেটে একটি করে স্পেশ্যাল কবিরাজি কাটলেট। ঘনাদার প্লেটে অবশ্য দুটো।

প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘনাদা যে খুশি হয়েছেন তা তাঁর রসিকতার নমুনা থেকেই বোঝা গেছে।

"কবিরাজি কাটলেট বুঝি? তা এক সঙ্গে চরক-সুশ্রুতকেই আমদানি করেছ যে হে।"

"হ্যাঁ," যথারীতি কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলেছি আমরা, "স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম সকালে।"

"তাই নাকি!" বলে ঘনাদা সোৎসাহে স্পেশ্যাল কবিরাজির মান রাখতে যাবেন। এমন সময়ে বিনীত গলার কুণ্ঠিত প্রশ্ন আমাদের চমকে দিয়েছে—

"ওই কাটলেট কি ওঁর খাওয়া ঠিক হবে?"

কাটলেট-এর টুকরো তুলতে গিয়ে ঘনাদার হাতটা মুখের কাছেই থমকে থেমে গেছে। আর আমাদের কপাল, ভুরু কুঁচকে গেছে নিজেদের কানগুলোকে বিশ্বাস করতে না পেরে?

"কী বললেন?" শিবু বেশ সন্দিগ্ধভাবে ধনু চৌধুরির দিকে চেয়ে জানতে চেয়েছে।

"বলছিলাম কী," ধনু চৌধুরি যেন অতি সংকোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করেছে, "আপনারা নিজেরা যা খান না-খান, বাজারের আজেবাজে জিনিস ওঁর না খাওয়াই ভাল, নয় কি?"

"বাজারের আজেবাজে জিনিস!" গৌরের স্তম্ভিত গলায় কথাগুলো যেন আটকে গেছে, "আমাদের পাড়ার কমরেড কেবিনের কবিরাজি কাটলেট আজেবাজে বাজারের জিনিস! আপনি খেয়ে দেখেছেন কখনও?"

"আজ্ঞে না!" সেই বিনয়ে গলে পড়া কিন্তু-কিন্তু ভাব—"দোকানের ও সব বনস্পতিতে ভাজা জিনিস তো খাই না, দাসবাবুর খাওয়া বোধহয় উচিত নয়!"

একে কমরেড কেবিনের কবিরাজি কাটলেটের নামে বনস্পতিতে ভাজার কলঙ্ক! তার ওপর আবার দাসবাবু!

আমাদের মুখে খানিকক্ষণ আর কথা সরেনি!

ঘনাদাই অত্যন্ত শঙ্কিত গলায় শুধু আমাদের নয়, বিশ্বসংসারকে যেন প্রশ্ন করছেন, "তা হলে কী হবে? এ তো গোলমেলে ব্যাপার দেখছি!"

আমরা সভয়ে এবার ঘনাদার প্লেটের দিকে তাকিয়েছি। শেষে তাঁর খাওয়াটাই মাটি হল নাকি এই উজবুকের তোলা ফ্যাকড়ায়?

না, তা হয়নি। ঘনাদা তাঁর প্লেটের দ্বিতীয় কাটলেটটার শেষ টুকরো মুখে দিয়েই তাঁর ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিত হয়ে উঠেছেন।

অনেক কষ্টে বাকশক্তি ফিরে পেয়ে তাঁকে আমরা এবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি।

"গোলমাল আবার কোথায়?" শিশির তাঁকে সাহস দিয়েছে।

"গোলমাল যদি থাকে তো কারও মাথায় আছে!" শিবু তার সন্দেহটা জানিয়ে দিয়েছে।

"কিন্তু ওই যে শুনছি, বনস্পতি না কী!" ঘনাদা তাঁর উদ্বেগটা প্রকাশ করেছেন।

"শুনলেই হল!" আমি ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছি, "কাটলেট কীসে ভাজা তা কি কানে শুনে বুঝবেন?"

"কমরেড কেবিন কোনওদিন ঘি ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করে!" গৌর জোর গলায় ঘোষণা করেছে।

"ঘি-এ ভাজলেই ভাল।" আবার সেই মোলায়েম গলার সবিনয় মন্তব্য শোনা গেছে, "কিন্তু বাজারের ঘি-ও ভেজাল কিনা।"

"ঠিকই বলেছ!" ঘনাদা চিন্তিতভাবে বনোয়ারির নিয়ে আসা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলছেন, "খাঁটি বলে কিছু কি আর আছে! যা তা খেয়ে বেশ একটু ভাবনাই হচ্ছে তাই।"

ঘনাদার ভাবনা সামলাতে হজমি-গুলি, চূরণ-জোয়ানের আরক সমেত অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তাতেও আমাদের আসর কিন্তু আর জমানো যায়নি।

যা তা খাওয়ার ভাবনায়, শরীরটায় কেমন যেন জুত পাচ্ছেন না বলে ঘনাদা তাঁর টঙের চলে গেছেন তাড়াতাড়ি।

ধনু চৌধুরিকে তখনকার মতো একা পাবার সুযোগও আমাদের হয়নি। শরীর খারাপ শুনে ব্যস্ত হয়ে সে তার দাসবাবুকে উপরে তুলে দিতে সঙ্গে গিয়েছে।

ওই দিয়েই কলির শুরু। তারপর ধনু চৌধুরির আদিখ্যেতায় বাহাত্তর নম্বর আমাদের কাছে বনবাস হয়ে উঠেছে।

এত বড় ভক্ত গরুড়পক্ষী ঘনাদার ছিল কে আর জানত! ঘনাদার তোয়াজ-তদ্বির ছাড়া ধনু চৌধুরীর আর কোনও চিন্তাই নেই।

খেতে বসেছি এক সঙ্গে সবাই রাত্তিরে। বাপি দত্ত ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে শুক্রবারের বদলে শনিবার রাত্রের খ্যাঁটটাই একটু এলাহি হয়।

রামভুজ হয়তো পারশে ঝালের সবচেয়ে ডাগর মাছটা ঘনাদার পাতে দিতে যাচ্ছে, হঠাৎ চমকে রামভুজের হাত থেকে মাছের গামলাটাই প্রায় পড়ে-পড়ে।

চমকে উঠি আমরাও। ঘনাদাও বাদ যান না।

আমাদের চমকিত সকলের দৃষ্টিই গিয়ে পড়ে অবশ্য একই জায়গায়। সেখানে ধনু চৌধুরি হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, "আরে করছ কী, ঠাকুর! ওই বড় মাছটা দাসবাবুকে দিচ্ছ?"

হতভুদ্ধি রামভুজ, হতভম্ব আমরা, আর স্বয়ং ঘনাদাও কেমন ভ্যাবাচাকা। বলে কী ধনু চৌধুরী? সবচেয়ে বড় মাছটা ঘনাদাকে দেওয়া হচ্ছে বলে আপত্তি?

রামভুজ হাতের গামলার সঙ্গে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, "হাঁ, এই সবসে বড়াঠোই তো বড়বাবুকে লিয়ে রাখিয়েছি। ইসমে ডিমভি আছে!"

"ওই ডিম আছে বলেই তো ভাবনা।" ধনু চৌধুরি তার বীরপূজার সঙ্গে

বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, "ডিম থাকলেই মাছ আগে নষ্ট হয় কিনা! তাই বলছি ও মাছটা দাস বাবুকে না-ই দিলে। হাজার হোক, সকালের মাছ তো।"

"আচ্ছা, জো হুকুম আপনাদের!" রামভুজ নিতান্ত অনিচ্ছায় পুরো দেড় বিঘত মাপের পারশে-কুলতিলকটিকে আবার গামলায় রাখতে যায়।

আমাদের বাকযন্ত্র তখনও বিকল। ঘনাদাই মৃদু একটু আপত্তির সঙ্গে উদার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখান, "থাক! থাক! মাছটা আর তুলে রেখে কী হবে! খেয়ে খারাপ যদি কিছু হবার হয় তো আমারই হোক। আমি থাকতে তোমাদের তো আর বিপদে ফেলতে পারি না!"

"কিন্তু আমরা সব আর আপনি এক কথা হল!" ধনু চৌধুরি ভক্তির পরীক্ষায় আমাদের উপর ট্রিপল প্রমোশন নিয়ে এগিয়ে যায় তো বটেই, সেই সঙ্গে যেভাবে আমাদের দিকে তাকায় তাতে মনে হয় বানর-সেনা হয়ে আমরা যেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকেই খামচে দিয়েছি।

এরপর এসপার-ওসপার একটা কিছু করে ফেলবার গোঁ হয় কি না?

বিশেষ করে সেইদিনকার ওই যজ্ঞনাশের পর।

ধনু চৌধুরি আসবার পর থেকে ঘনাদাকে একবারের জন্যও মুখ খোলাতে তো পারিনি! সেদিন অনেক কষ্টে সলতেটা প্রায় ধরে-ধরে হয়েছে। হয়েছে, বাগড়া দিয়ে জলের ছাট দেবার ধনু চৌধুরি তখন আড্ডাঘরে নেই বলে নিশ্চয়।

কিন্তু হায় আমাদের কপাল!

সবে সলতেটা দু-একটা ফুলকি ছাড়ছে, ঠিক সেই সময়েই ধনু চৌধুরির আবির্ভাব। মুখে গভীর বেদনার ছায়া আর হাতে একটা যেন কী?

সেই বস্তুটাই ঘনাদার সামনের সেন্টার টেবিলটায় নামিয়ে রেখে প্রায় বুক-ফাটা গলায় ধনু চৌধুরী বলেছে, "দেখেছেন?"

আণবীক্ষণিক কিছু নয়। একটা দেশলাইয়ের বাকস! ঘনাদার সঙ্গে দেখতে আমরাও পেয়েছি। শুধু তার ভিতর এমন শোকাবহ কী আছে বুঝতে পারিনি।

ধনু চৌধুরি আকুল আক্ষেপে সেটা তারপর বুঝিয়ে দিতে দেরি করেনি, "আপনার ওপরের ছাদটা একটু দেখতে গেছলাম। ফাটা ছাদ তো মেরামত না করলে নয়, তার ওপর কেউ একটু ঝাঁট দেবার ব্যবস্থা করায় না। আপনার ছাদে এইসব জঞ্জাল জমে থাকে!"

"জমে আছে তো! তুমি বলে তা-ই দেখলে!" ঘনাদা জমে থাকা জঞ্জালটা দু আঙুলে তুলে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাসেই আমাদের ধরে-আসা আশার সলতে নিবে গেল সেদিনকার মতো।

যা হয় হোক, অপারেশন ধনুর্ভঙ্গ আর শুরু না করে পারি! যেমন বেয়াড়া ব্যামো তেমনই কড়া চিকিৎসার একেবারে নিখুঁত আয়োজন সারাদিন ধরে করে রেখেছি সেদিন।

সন্ধেবেলা তাঁর সরোবর-সভা সেরে বাহাত্তর নম্বরে ঢুকতে না ঢুকতেই গন্ধটা নিশ্চয় পেলেন ঘনাদা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আড্ডাঘরে ঢুকে একেবারে চাক্ষুষই পেলেন

দেখতে।

চোখ কি তখন তাঁর কপালে উঠেছে? উঠলেও আমরা আর দেখব কী করে! আমরা তখন যে যার প্লেটে দিস্তেখানেক করে হিং-এর কচুরি সামলাতে ব্যস্ত।

"বসুন, ঘনাদা," ওরই মধ্যে কোনও রকমে যেন ভদ্রতাটুকু করবার অবসর পেল শিশির।

ঘনাদা বসলেন। জেগে আছেন না স্বপ্ন দেখছেন ঠিক করবার জন্য নিজেকে যদি দুবার চিমটি কেটে থাকেন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঘনাদা বর্তমানে বাহাত্তর নম্বরে তাঁকে বাদ দিয়ে এ-রকম ভোজ-সভার দৃশ্য সত্যই তো বিশ্বাসের অতীত!

একটু উসখুস করে ঘনাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "ধনু গেল কোথায়?"

"ধনু?" এতক্ষণে আমরা মুখ তুলে চাইবার ফুরসত পেলাম, "এইখানেই তো ছিলেন । এ সব বাজারের মাল তাঁর আবার দুচক্ষের বিষ কিনা। তাই হয়তো আপনাকে সাবধান করতে বেরিয়ে গেছেন।"

"আমাকে সাবধান করতে!" ঘনাদার গলার গর্জন না আর্তনাদ বোঝা শক্ত। "আমাকে সাবধান কী জন্য!

যে জন্য সাবধান, বনোয়ারি ট্রেতে করে সেই মুহূর্তেই তা চাক্ষুষ এনে হাজির। ট্রে-র ওপর চার চারটি প্লেটে দুটি করে প্রমাণ সাইজের চিংড়ির কাটলেট!

বনোয়ারি অভ্যাস মতো প্রথমেই একটা প্লেট ঘনাদার অর্ধেক বাড়ানো হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম সমস্বরে, "আরে করছিস কী? ঘনাদাকে ওই আজেবাজে জিনিস!"

শিশির অপরাধীর মতো সভয়ে প্লেটটা ঘনাদার মুখের কাছে থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বললে, "মাপ করবেন, ঘনাদা। এ সব যে আপনার বারণ তা বনোয়ারি আর কী করে জানবে।"

"হুঁ!" ঘনাদার নয় যেন একটা সদ্য জাগা আগ্নেয়গিরির ভেতরের গোমরানি শোনা গেল।

ঘনাদা তখন আরাম-কেদারা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিমান প্রভুভক্ত শ্রীমান ধনু চৌধুরির প্রবেশ।

কিন্তু কই? যা ভেবে রেখেছিলাম তা হল কোথায়? আমাদের অত তোড়জোড়ই তো মিথ্যে! আগ্নেয়গিরির গুরুগুরু ধ্বনিই শুনলাম, ফেটে আগুনের হলকা আর ছুটল না!

ধনু চৌধুরি অক্ষত শরীরে আড্ডাঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আমাদের প্লেটগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে যেন শিউরে উঠল।

"এইসব আপনারা দাসবাবুকে খাওয়ালেন?" ধনু চৌধুরি বুঝি কেঁদেই ফেলে।

আমাদের কিছু বলতে হল না। আমাদের হয়ে ধনু চৌধুরির দাসবাবুই জবাব দিলে, "না। কেমন করে খাওয়াবে? তুমি না বারণ করে গেছ!"

এ কি ঘনাদার গলা! আমাদেরই দুবার তাঁর দিকে তাকাতে হল। একসঙ্গে স্নেহ, প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতা উথলে-ওঠা এমন গলা তো আমাদের শোনার ভাগ্য কখনও

হয়নি।

ধনু চৌধুরি তখন কৃতার্থ হয়ে সলজ্জ একটু হাসি হাসছে, "আজ্ঞে আপনার জন্য যেটুকু পারি না করলে এখানে আছি কেন?"

"হ্যাঁ, তাই তো দুঃখ হচ্ছে আরও বেশি!" ঘনাদা একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার তাঁর কেদারায় গা ঢাললেন, "তোমার মতো মানুষের দেখা যখন পেলাম তখনই আবার ডেরা তুলতে হবে!"

ডেরা তুলতে হবে! শুনেই আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। কঠিন চিকিচ্ছে করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হল নাকি? আগাছা নিড়োতে ফসলই সাবাড় করলাম!

"ডেরা তোলার কথা কী বললেন যেন?" নেহাত সহজভাবে হালকা সুরে বলার ভান করলাম। কিন্তু গলার কাঁপুনি যাবে কোথায়?

কিন্তু কাকে কী বলছি! আমরা যে ঘরে আছি তা-ই যেন ভুলে গিয়ে ঘনাদা তখন তাঁর ভক্ত প্রবরকে নিয়ে ব্যস্ত।

উদাস সুরে তাকে জানালেন, "এখানে থেকে তোমাদের বিপদ বাধাতে তো আর পারি না!"

"কেন? আমাদের বিপদ কেন?" এবার ধনু চৌধুরি উদ্বিগ্ন।

"কেন এখনও বুঝতে পারোনি?" ঘনাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "সেদিন আমার ছাদে গিয়ে কী পেয়েছিলে?"

"ছাদে পেয়েছিলাম?" ধনু প্রথমটা একটু ভাবিত।

"দেশলাইয়ের বাকস।" ধনুর স্মরণশক্তি একটু উসকে দিতে হল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দেশলাইয়ের একটা খালি বাকস!" ধনু সবিস্ময়ে জানালে, "সে তো আপনাকে দেখালাম।"

"হ্যাঁ, দেখিয়েছ," ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে বললেন, "শুধু খালি বাকসটা। তার ভেতর কী ছিল তা তো জানো না।"

"ভেতরে মানে"—ধনু একটু হতভম্ব—"ছিল তো দেশলাইয়ের কাঠি।"

"হুঁ"—ঘনাদা তাঁর পেটেন্ট নাসিকা ধ্বনি করলেন—"এক হিসেবে দেশলাইয়ের কাঠিই বটে, তবে সাক্ষাৎ শমনের হাতে তৈরি। মাপে আধ ইঞ্চিও হবে না, কিন্তু একটু ছোঁয়ালে নখের ডগা থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে যাবে।"

হাওয়া বুঝে আমরা বোবা হয়ে থাকাই উচিত বুঝেছি। ধনু চৌধুরিই সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ছিল তা হলে ও বাকসে?"

"লক্সোসেলেস রেকলুস!" ঘনাদা তাঁর খুদে বোমাটি ছাড়লেন।

আমাদের মতো ঘাগীরাই এবার কাত। ধনু চৌধুরির অবস্থা আরও কাহিল। সামলে উঠবার আগেই ঘনাদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে, "এ ক-দিনের মধ্যে কোথাও কিছু কামড়ায়-টামড়ায়নি তো?"

"এ ক-দিনে?" ধনুর মুখ প্রায় ফ্যাকাশে—"না, কামড়াবে আবার কী! ওই কালো একটা বিষ পিঁপড়ে—"

"বিষ পিঁপড়ে!" ধনুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘনাদা প্রথমটা অস্থির হয়ে উঠলেন

"বিষ পিঁপড়ে—ঠিক দেখেছ তো, ভুল হয়নি তো কিছু?"

"না, ভুল কেন হবে!" ধনু এবার দিশাহারা—"বিষ পিঁপড়েই তো দেখলাম।"

"হ্যাঁ, বিষ পিঁপড়েই হবে।" ঘনাদা এতক্ষণে ভেবেচিন্তে আশ্বস্ত হলেন, "তা না হলে এতক্ষণে আর দেখতে হত না। জ্বর, বমি, পেটের অসহ্য কামড় তো শুরু হয়ে যেতই। তারপর কামড়ের জায়গায় ঘা থেকে গ্যাংগ্রিন হতেই বা কতক্ষণ। হয় একেবারে কেটে বাদ, কি চামড়া বদল ছাড়া সারাবার কোনও উপায় নেই।"

"এ সব হত ওই আপনার—কী বললেন—লকলকে কীসের কামড়ে?" ধনু চৌধুরির গলায় দু আনা অবিশ্বাসের সঙ্গে চোদ্দো আনা আতঙ্ক।

"লকলকে কী নয়, লক্সোসেলেস রেকলুস।" ঘনাদা এবার ব্যাখ্যা করলেন, "নেহাত খুদে একরকম মাকড়সা, মাপে আধ ইঞ্চি, কিন্তু বিষ একেবারে সর্বনাশা, আলোয় দেখা দেয় না। কোণে-কানাচে, কাপড়-জামার ভাঁজে ছায়া-ছায়ায় লুকিয়ে থাকে। সহজে ধরাও যায় না।"

"কিন্তু আমাদের দেশে তো এমন মাকড়সা নেই। এ সর্বনাশা তা হলে আসবে কোথা থেকে?" ধনু চৌধুরির শেষ আশার কুটো ধরবার চেষ্টা।

"আসবে ওই দেশলাইয়ের বাকসে আর পাঠাবে টেকসাস-এর সেই লুই মার্ডেন, যাকে শয়তানির জন্য একবার আড়ংধোলাই দিয়েছিলাম। মনে পড়ছে মার্ডেনের কথা?"

শেষ প্রশ্নটা আমাদের প্রতি। ঘনাদার কৃপাদৃষ্টি আমাদের দিকে পড়া মাত্র কী চটপট যে আমাদের স্মরণশক্তি সাফ হয়ে গেল! গৌরই আমাদের হয়ে তার লক্ষ্মণের ফল-ধরে-রাখার মতো না-ছোঁয়া পুরো প্লেটটা ঘনাদার দিকে যেন তুলে বাড়িয়ে দিয়ে উৎসাহে মুখর হয়ে উঠল, "মার্ডেনের কথা আর মনে নেই! সেই যে আপনার কাছে প্রায় কীচক বধ হয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল একদিন আপনাকে দেখে নেবেই। সে-ই তা হলে এতদিন বাদে ঠিকানা পেয়ে এই শোধ নেবার ব্যবস্থা করেছে?"

"হ্যাঁ," ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে চিংড়ির কাটলেটে কামড় দিয়ে ফেলে হতাশভাবে বললেন, "তাই এ ডেরা আমায় ছাড়তেই হবে। একটা দেশলাইয়ের বাকস পাঠিয়ে সে তো আর থামবে না। এরপর কিলবিল করবে এ বাড়িতে লক্সোসেলেস রেকলুস! সে বিপদে তোমাদের কী বলে ফেলব! এখনও তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে। খুদে শয়তানগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে!"

না, ঘনাদাকে বাহাত্তর নম্বর ছাড়তে হয়নি। তার বদলে ধনু চৌধুরি দুদিন বাদে পাওনা-টাওনা চুকিয়ে হঠাৎ বিদেয় নিয়ে গিয়েছে।

ধনুর্ভঙ্গটা সুতরাং ঘনাদার-ই।

ঘনাদার ফুঁ

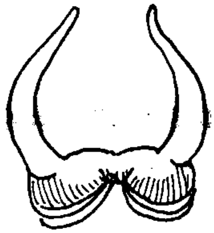

ঘনাদার ফুঁ

"জুদশি," বলেছেন ঘনাদা।

মাথার ঘিলু ঘোলানো চক্ষু ছানাবড়া করা উচ্চারণটা শুনতে কিছু ভুল হয়েছে কি না বুঝতে না পেরে আমাদের হতভম্ব মুখ দিয়ে অজান্তে এই শব্দটাই আপনা থেকে আবার বেরিয়েছে—"জুদশি!!!"

"হ্যাঁ, জুদশি!" আমাদের মাথাগুলো আরও চরকি পাকে ঘুরিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "সব কিছু একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।"

এরপর ঘনাদা আরও একটু বিশদভাবে আমাদের যা বুঝিয়েছেন, তাতে ঘনাদার সঙ্গে আমরা দুই-এ দুই-এ চার-এর জগতে আছি, না কোন ভেলকিতে হঠাৎ আয়নার ওপিঠের আবোলতাবোলের মুল্লুকে চালান হয়ে গেছি, এই ধোঁকায় পড়ে খানিক প্রায় বোবা আর বে-এক্তিয়ার হয়েই থেকেছি। ঘনাদার আড্ডাঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা আটকাবার চেষ্টা করতেই পারিনি।

আচমকা জুদশি-র এই মাথার ঘিলু ঘোলানো বিভ্রান্তিতে পৌঁছবার জন্য তার আগের ইতিহাস একটু জানা দরকার।

সে ইতিহাস এক হিসেবে দারুণ সেই বিস্ফোরণ থেকেই শুরু বলা যায়।

কোথাকার কী বিস্ফোরণ না বলতেই কেউ কেউ কিছুটা বুঝেছেন নিশ্চয়। ঠিকই তাঁরা বুঝেছেন।

বাহাত্তর নম্বরে বিস্ফোরণ! হ্যাঁ, প্রায় পারমাণবিক বিস্ফোরণই বলা যায়।

সেই বাপি দত্ত বিগড়ি হাঁস খাইয়ে খাইয়ে আমাদের পেটে চড়া পড়িয়ে এ মেস ছেড়ে যাবার পর থেকে এমন হুলুস্থুলু কাণ্ড আর হয়নি।

গৌরের সেই ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী তেলের শিশির সেই নিদারুণ পরিণামের পরও বাহাত্তর নম্বরে এমন সাংঘাতিক সংকট দেখা দেয়নি।

কারণ এবার গৌর, শিবু কি আর কেউ তো নয়, খেপেছে স্বয়ং শিশির। সেই শিশির যার শরীরে সত্যিকার রাগ আছে বলে আমরা কখনও জানতে পারিনি।

কিন্তু সেই শিশির এখন একেবারে যেন বাহাত্তর নম্বরে দাবানল।

দাবানলটা যে হঠাৎ তুমুল হয়ে উঠবে, তার আভাস কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। আভাস যে পাইনি তাও ঠিক নয়। কেমন একটু কোথায় যেন ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে সেটা নেহাত ধোঁয়া বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

ধোঁয়ার আভাসটা ছিল শিশিরের নতুন এক বাতিক।

যখনই সময় সুবিধে পায় শিশির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে কী যে দেখে প্রথমটা বোঝা যায়নি।

আমরা ঠাট্টায় সরব হয়ে তখনও উঠিনি। মুখ টিপে শুধু হাসাহাসি করি। সরব ঠাট্টার খোঁচাটা গৌরই প্রথম দিলে।

আমাদের দোতলার আড্ডাঘরে আর যাই থাক আয়না-টায়নার কোনও বালাই নেই।

শিশিরকে কিছুদিন থেকে আড্ডাঘরে সময়মত দেখা যায় না। এলে একটু দেরি করেই আসে। কোনও কোনও দিন তার দেখাই পাওয়া যায় না।

দেখা যখন পাওয়া যায় তখনও কেমন গম্ভীর অন্যমনস্ক। কী যেন একটা ভাবনা ওর ওপর চেপে আছে।

সুস্থ সবল নির্ঝঞ্ঝাট ছেলে। তার হঠাৎ এমন গুরুতর ভাবনার ব্যাপার কী হতে পারে? আর সে ভাবনার সঙ্গে ফাঁক পেলেই আয়নায় ঘন ঘন চেহারা দেখার সম্বন্ধটা কী?

শিশির কি হঠাৎ সিনেমার হিরো হবার কথা ভাবছে নাকি! চেহারা নিয়ে তাই এত মাথাব্যথা!

সেদিন আমাদের সবাইকার পরে শিশির অমনই অন্যমনস্ক চেহারা নিয়ে আড্ডাঘরে এসে ঢোকবার পর গৌর খুব গম্ভীর হয়ে প্রস্তাব করলে, "আচ্ছা, আমাদের এ বৈঠকের ঘরে একটা বড় আয়না রাখলে হয় না? কী বলিস, শিশির?"

"অ্যাঁ?" শিশির কথাটা যেন বুঝতেই না পেরে প্রথমটা কেমন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আয়না?"

"হ্যাঁ," গৌর গম্ভীর মুখেই ব্যাখ্যা করে বোঝালে, "এই আড্ডাঘরে একটা বড় আয়না রাখার কথা বলছি। কত সুবিধে হয় বল তো? যখন খুশি চেহারা-টেহারা দেখে ঠিক করে নিতে পারি।"

আমরা তখন কোনও রকমে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে হাসি চাপবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু এত বড় একটা মোটা ঠাট্টার খোঁচা শিশির যেন টেরই পেল না। ক্ষুণ্ণ হওয়া কি রেগে ওঠার বদলে, ও ধার দিয়েই না গিয়ে, গম্ভীরের সঙ্গে একটু যেন করুণ হয়ে একেবারে অন্য লাইনে চলে গেল।

"এখানে আয়না?" একটু বিব্রত হয়েই আপত্তি জানিয়ে সে বললে, "না না, এখানে আয়না রেখে কোনও লাভ নেই। আর নিজে নিজে দেখে কিছু বোঝাই যায় না।"

ঠাট্টার খোঁচা দিতে গিয়ে আমরাই তখন হতভম্ব। আবোলতাবোল কী বলছে শিশির? আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে মাথাটাতেই গোলমাল হয়ে গেল নাকি? কথার সঙ্গে কথার কোনও জোড়-ই নেই যে!

জোড়টা কোথায় শিশিরের পরের কথায় কিছুটা বোঝা গেল।

আমাদের একেবারে অবাক করে দিয়ে শিশির বেশ একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তোরা কিছু বুঝতে পারছিস?"

"কী বুঝব আমরা!" আমাদের হতভম্ব জিজ্ঞাসা।

"এই, মানে, এই," শিশির একটু আমতা আমতা করে বললে, "আমার চেহারা কি ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে?"

খানিকক্ষণ আমাদের কারও মুখে আর কথা নেই।

গৌরই প্রথম সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, "তোর চেহারা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে কি না তাই আমাদের কাছে জানতে চাইছিস? চেহারা খারাপ হচ্ছে কি না বোঝবার জন্যই তুই আজকাল আয়না নিয়ে এত মত্ত?

"হ্যাঁ," শিশির বেশ হতাশ সুরে বললে, "কিন্তু নিজে দেখে কিছু বোঝা যায় না। এই একদিন মনে হয় একটু বোধ হয় চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, তার পরের দিন বেশ ফ্যাকাশে দেখায়। গালের হাড় দুটোর ওপর তো রোজ দুবেলা নজর রাখি, কিন্তু এবেলা একটু পুরন্ত মনে হলেও ওবেলা ঠিক একটু করে ঠেলে উঠেছে বোঝা যায়। তাই বলছি—ও আয়নায় নিজে দেখে কিছু বোঝা যায় না।"

"কিন্তু চেহারা নিয়ে অত বোঝাবুঝির দায়টা কীসের?" আমি জানতে চাইলাম, "তোর হয়েছেটা কী?"

"কী হয়েছে?" শিশির এবার একটা মডেল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল, "কী হয়েছে তা যদি জানতেই পারতাম!"

হ্যাঁ, এই ভাবেই শুরু। তারপর দিন দিন মাত্রা চড়েছে।

প্রথমে শুধু চেহারা দেখা, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল।

সেই সঙ্গে একটু একটু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ।

যেমন, "আজ সকালের কাশিটার আওয়াজ শুনলি?"

"কাশির আওয়াজ!"—আমরা সত্যিই বেশ অবাক—"কাশির আওয়াজ আবার কোথায়? কার কাশি?"

"কার কাশি আবার? আমার কাশি।" শিশির বেশ ক্ষুব্ধ আমাদের উদাসীনতায়—"আজ সকালে কীরকম কাশলাম, শুনলি না? খেয়ালই করিসনি বোধহয়।"

"খেয়াল করব না কেন? করেছি বলেই জোর দিয়ে বলতে পারি—ওই সকালের কাশির কথা বলছিস। সে আবার কাশি কোথায়! ও তো তুই ডিমের পোচ খেতে গিয়ে বিষম খেলি!"

"বিষম খেলুম"—শিশির যেন অপমানিত—"তোরা তো তাই বলবি।" বলে রেগে উঠেই চলে যায় ঘর থেকে।"

তখন রাগে সঙ্গ ছেড়ে গেলেও ছাড়াছাড়িটা স্থায়ী নয়। শারীরিক দুঃসংবাদ দেবার জন্য আবার আমাদের কাছেই আসতে হয়।

"কাল রাত্রে কীরকম ঘাম হয়েছে জানিস?" শিশির গভীর হতাশা ফুটিয়ে তোলে তার গলায়।

"ঘাম! কাল রাত্রে ঘাম!" আমরা হেসে না উঠে পারি না।

হাসতে হাসতেই গৌর বলে, "কাল রাত্রে গুমোট গরমের ওপর লোডশেডিং-এ পাখা বন্ধ। কার না ঘাম হয়েছে কাল। আমাদেরও তো হয়েছে।"

"তা তোদের হতে পারে। কিন্তু আমার ঘাম আলাদা!" বলে নিজের সাংঘাতিক ঘামের গর্বে আর দুঃখে শিশির আমাদের সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দেয় কিছুক্ষণ।

শুরুতে এই গুমোট আগুনের আঁচ আর ধোঁয়াটুকুই ছিল।

এ শুরুর অবশ্য আরও আগের সূচনা আছে। সে সূচনা হল শিবুর একটি মারাত্মক আহাম্মকি থেকে।

কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে ডাক্তারি শিখে দাতব্য চিকিৎসা করে দেশের সেবা করবে।

এ সংকল্পের তাগিদে, না, কোথাও মেডিক্যাল কলেজে কি স্কুলে ভর্তি হয়নি—বাজার থেকে একটি মহাভারতপ্রমাণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই কিনে এনেছে।

কিনে আনার পর কী তার আস্ফালন। বইটা বেশ একটু কোঁত পেড়ে তুলে ধরে আমাদের দেখিয়ে বলেছে, "জানিস কীরকম বই এটা! দুনিয়ায় হেন রোগ নেই—যার চিকিৎসার কথা এখানে পাবি না।"

শিবুর কিন্তু বইটা পড়ে দাতব্য চিকিৎসা করা আর হয়ে ওঠেনি। তার বদলে বইটা পড়তে শুরু করেছে শিশির।

আর সেই থেকেই একটু একটু করে অ আ ক খ-র ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে সে বুঝেছে যে, যে অক্ষরের পাতায় সে এখন পৌঁছেছে, তা পর্যন্ত দেওয়া সব ক-টি রোগের সে একটি ডিপো।

অ থেকে এসে ক-এ ষ-এ ক্ষ-এ পৌঁছে তাই সে প্রতিদিন সাংঘাতিক সব লক্ষণ নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে।

লক্ষণ তো একটা নয়, অনেক। আর সব যে একেবারে 'বৃহৎ চিকিৎসা-বারিধির' বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শিশির তা বিশদভাবে আমাদের বুঝিয়েছে—এই যেমন সকাল বিকেল তার দারুণ খিদে পাওয়া। এটা তো আর তার নিজের নয়, এ হল তার রোগের রাক্ষুসে হ্যাংলামি।

আর ওই যে ঘুম। এত সব দুর্ভাবনা থাকলেও বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা ঠেকাতেই যে ঘুমে বেহুঁশ হয়ে যায় এ তো একেবারে সাংঘাতিক খারাপ লক্ষণ!

শিশির নিত্য নতুন এমনই সব লক্ষণ আবিষ্কার করে আমাদের শোনায় আর আমরা ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে আর উৎসাহ না পেয়ে তার জন্য রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠি।

বাহাত্তর নম্বরের এত বড় যখন সমস্যা, তখন সেই টঙের ঘরের সেই তিনি করছেন কী? তিনি কি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, না তাঁর শরণ আমরা নিতে চাইনি।

না, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেননি, বহাল তবিয়তেই তাঁর টঙের ঘরে বিরাজ করছেন, আর আমরাও তাঁর শরণ নিতে ভুল করিনি।

কিন্তু ভাগ্যের দোষে চালটা যেন কেমন কেঁচে গিয়েছে। শিশিরের রোগের সেই গোড়ার দিকেই খেইটা ঘনাদাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। ঘনাদা সেদিন সবে এসে তাঁর মৌরসি কেদারাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রাত্যহিক অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের একটু ত্রুটি হয়েছে বলেই মুখটা খুব প্রসন্ন দেখায়নি।

তিনি এসে আরাম-কেদারাটি দখল করার পরেই শিশির তার ডান হাতের তুলে ধরা তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে একটি সিগারেট গুঁজে দিয়ে ভক্তিভরে লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে এই হল বাহাত্তর নম্বরের দস্তুর।

কিন্তু শিশিরই তখনও ঘরে আসেনি, এ অনুষ্ঠান আর পালন করবে কে?

খানিক বাদে শিশির অবশ্য এসেছে কিন্তু এ তো অন্য শিশির। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে মনটা যেন আর কোথাও ফেলে রেখে এসে একটা চেয়ারে বসেছে শুধু।

শিশিরকে দেখে ঘনাদা উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানিয়েছেন, "এই যে শিশির।"

শিশির তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। সিগারেট সে যে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে, তা না জানাক, একটু হেসেও ঘনাদার সম্ভাষণের মান রাখেনি। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ডান হাতের কবজি ধরে সে তখন তার নাড়ি দেখতে তন্ময়।

ঘনাদা ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়েছেন। আমরাও অস্বস্তি চাপা দিয়ে আসল কথাটা তোলবার সুযোগ নিয়েছি ওই নাড়ি টেপা থেকেই।

"নাড়িটা আজ কীরকম দেখছিস?" জিজ্ঞাসা করেছে গৌর।

"খুব খারাপ, খুব খারাপ!" শিশির যেন তার ফাঁসির হুকুম শুনিয়েছে, "আঙুলে একেবারে স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে।"

বলতে পারতাম—তা যাবে না তো কি, নাড়ি ছেড়ে গেছে মনে হবে! কিন্তু তা না বলে খেইটা ওইখান থেকে ধরাবার চেষ্টা করেছে শিবু। বলেছে, খুব গম্ভীর হয়ে, "নাড়িটা আপনি একবার দেখুন তো, ঘনাদা?

বরাদ্দ মাফিক সিগারেটের নজরানা না পেয়ে ঘনাদার মেজাজ এমনিতেই তখন খিঁচড়ে আছে! নাড়ি দেখার অনুরোধে হঠাৎ তেতো চিবিয়ে ফেলার মতো মুখ করে বলেছেন, "কী দেখব? নাড়ি? কার নাড়ি?"

তাঁর মুখের চেহারা লক্ষ করতে গেলে আমাদের তখন চলে চলে না। সেদিকে যেন চোখই না দিয়ে মিনতি করেছি, "ওই শিশিরের নাড়িটা একটু দেখতে বলছি। ও ক-দিনে কীরকম শুকিয়ে গেছে তাও একটু যদি দেখেন।"

মুশকিল আসান হয়ে সব গোল মিটে যেতে পারত ঘনাদাকে একটু কেরামতি দেখাবার সুযোগ তখন দিলেই।

কিন্তু তা হবার নয়।

'বৃহৎ চিকিৎসা-বারিধি'তে নতুন কী পড়ে জানি না, তার মেজাজ সেদিন একেবারে যেন বুনো কাঁটা নটে। ঘনাদার নাড়ি দেখবার কথায় জিভে যেন ক্ষুর এঁটে বলেছে, "ঘনাদা দেখবেন! কী দেখবেন উনি শুনি? ওঁর চোখে কী এক্স-রে আছে, না ওর আঙুলগুলো ই সি জি-র যন্ত্র, ডাক্তারি মানে আজকাল কী, তা উনি জানেন? মাণ্টু টেস্ট, ই এস আর, স্টারন্যাল পাংচারের নাম শুনেছেন কখনও? কী জানেন উনি এ সব ব্যাপারে?"

সর্বনাশা ব্যাপার। সভয়ে আমরা এবার ঘনাদার দিকে তাকিয়েছি। বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘর বুঝি চিরকালের মতো খালিই হয়।

কিন্তু না, সে রকম কোনও লক্ষণ নেই। তার বদলে ঘনাদার মুখে রহস্যময় প্রশান্ত

এক হাসি আর সেই সঙ্গে আমাদের মাথার ঘিলু ঘোলানো চক্ষু-ছানাবড়া করা উচ্চারণটুকু—"জুদশি!"

"অ্যাঁ!" নিজেদের অজান্তেই আমাদের গলায় বিহ্বল বিস্ময়ের প্রশ্নটা বেরিয়েছে— "জুদশি!!!"

"হ্যাঁ," আমাদের মাথাগুলো একেবারে চরকি পাকে ঘুরিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "সব কিছু একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। সেনাপতি ঘোর জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিলেন পথ হারিয়ে, মন্ত্রী খুঁজে খুঁজে গাছ কাটলেন ভোঁতা কুড়ুলে। বোটকা বুনো গন্ধই ছড়াল। রাস্তা বেরুল না। শেষে রাজা এসে জঙ্গলই জ্বালিয়ে উনুন পেতে বসালেন। ব্যস, তাতেই কাম ফতে! কিন্তু রাজার নাগাল পাচ্ছে কে?"

কথাগুলো বলেই ঘনাদা কেদারা ছেড়ে উঠে গট গট করে ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে তাঁর টঙের ঘরে উঠে গিয়েছেন। শিশিরের বেয়াড়া ব্যাধির ছোঁয়াচে ঘনাদারই হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, না আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বুঝতে না পেরে দিশাহারা অবস্থায় ঘনাদাকে ডেকে থামাবার চেষ্টা পর্যন্ত আমরা কেউ করতে পারিনি।

চেষ্টা করলেও লাভ কিছু হত বলে মনে হয় না, কারণ ঘনাদা এক রকম যেন অটল জেদ নিয়েই আমাদের ছেড়ে গেছেন। আর সেই যে গেছেন তারপর থেকে আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখছেন না বললেই হয়।

তা না রাখুন। বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে যাবার হুমকি যে দেননি বা এখানকার হেঁশেলের অন্ন স্পর্শ না করবার গোঁ যে ধরেননি এই আমাদের ভাগ্যি।

তাঁকে নিজেদের খুশিমত থাকতে দিয়ে শিশিরকে নিয়েই আমাদের ব্যস্ত হতে হয়।

ঘন ঘন একটু আয়না দেখা আর নাড়ি টেপা থেকে বাতিকটা শিশিরের তখন ক্রমশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ডাক্তার থেকে সে ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি, তা থেকে ইউনানি তো বটেই, সেই সঙ্গে ওষুধ কেনা আর তা বাতিল করার সে কী সৃষ্টি ছাড়া খ্যাপামি!

ওষুধ মানে অবশ্য শরীরের তাকত বাড়াবার সালসা অর্থাৎ টনিক যে বাজারে এত আছে তাই বা কে জানত। কোনও টনিকই শিশির কিনতে বাকি রাখে না, দুদিন বাদে ব্যাজার হয়ে বাতিল করতেও তার দেরি হয় না।

এক ভিটামিন টনিকের বোতল সিকি না খরচ হতে হতে আসে কডলিভার অয়েলের শিশি, সেটার দু চামচ পেটে যেতে না যেতেই বাতিল হয়ে গ্লিসেরো ফসফেট না কী সব নার্ভ টনিককে জায়গা করে দেয়। নার্ভ টনিকের রাজত্বও দু-চারদিনের বেশি টেকে না। তারপর ঝাড়েবংশে সব অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ নিয়েই তাকে বিদেয় হতে হয়। তার জায়গায় যারা আসে সেই হেকিমি ইউনানি। সালসাও বেশি দিন কেউ পাত্তা পায় না। শিশিরের ঘরের শিশি-বোতলের কাঁড়ি সাফ করতে বনোয়ারিকে ঘন ঘন শিশি-বোতল বিক্রিওয়ালা ডাকতে হয় রাস্তা থেকে।

বাজারের জানা-অজানা সব টনিক পরীক্ষা শেষ হলে পর শিশিরের এ রোগ যদি

সারে এই আশায় যখন দিন গুনছি, তখন হঠাৎ একদিন এই সালসার পাত্র থেকেই বাহাত্তর নম্বরের অমন একটা বিস্ফোরণ হবে ভাবতেও পারিনি।

আজকাল শিশিরের রোগের ওষুধ যেমন পথ্যিও তেমনই একটু আলাদা। শিশির আমাদের আর সকলের আগেই দিনে রাত্রে তার খাওয়াটা তাই সেরে আসে।

সেদিন সে তাই নিয়েছিল।

হঠাৎ নীচে থেকে তার একেবারে বাড়ি-ফাটানো চিৎকার শুনে আমরা সবাই তাজ্জব! কী হল কী শিশিরের? তার রোগের বাতিক এতদিন যা দেখে আসছি তা তো এমন বিকারের প্রলাপে দাঁড়াবার মতো কিছু নয়।

হুড়মুড় করে সবাইকে নীচে নেমে যেতে হল তৎক্ষণাৎ। শিশির তখন আমাদের খাবার টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করছে, "এ বাড়ির মেস করা আমি ঘুচিয়ে দেব! বাড়িওয়ালাকে দিয়ে নোটিশ দেব সকলকে ঘাড় ধরে বার করবার। আর কিছু না হোক ঘুণ ধরা 'কনডেমন্ড' পোড়ো বাড়ি বলে করপোরেশনকে দিয়ে ভাঙিয়ে ছাড়ব। আর ওই টঙের ঘর সবার আগে গুঁড়ো করতে পারি কি না তাই দেখাচ্ছি!"

শিশিরের খাবার টেবিলের ওপর একটা অর্ধেক খালি কাঁচের ছোট জার, আর তার এলোমেলো আর্তনাদ মেশানো আস্ফালন থেকে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময়ই লাগল।

ব্যাপারটা যা বুঝলাম তা অবশ্য রীতিমত গুরুতরই বলতে হয়। অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ইউনানি হেকিমি ছেড়ে শিশির সম্প্রতি কবিরাজির শরণ নিয়েছে। আর দু পকেট প্রায় খালি করে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী এক কবিরাজকে দিয়ে দুনিয়ার সেরা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত তৈরি করিয়ে এনেছে ওই কাচের জারে। জারটা সুবিধের জন্য নীচে রামভুজের কাছেই থাকে, সকাল বিকেল চা জলখাবারের সময় শিশিরের যাতে খেতে ভুল না হয়।

টঙের ঘরের তাঁর ওপর কেন শিশির এতখানি খাপ্পা তা বুঝতে এরপর আর দেরি হল না।

শিশির বিবরণটা দিতে দিতেও একেবারে যেন চিড়বিড়িয়ে উঠে ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "আর উনি, তোমাদের ওই উনি সেই সাত রাজার ধন ওষুধ খাবলা খাবলা নিয়ে ভাতে মেখে খেয়েছেন।"

দম নিতেই একটু থেমে শিশির গলাটা আরও চড়িয়ে দিল তারপর, "এটা কি পাতে খাবার ঘি?"

"না, পাতে, ভাতে, কি শুধু, কোনওভাবেই ও ঘৃত খাবার জিনিস নয়।"

এ কার গলা? চমকে আমরা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছি, আমাদের অনুমানে ভুল হয়নি। স্বয়ং ঘনাদাই—যেন ঘড়ি ধরে যথাসময়ে যথাস্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয়েছেন।

আমরা যত খুশিই হই, শিশির তাঁকে দেখে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। শিশির রাগে প্রায় তোতলা হয়ে উঠল—"আপনি—আপনি আবার মুখ দেখাতে এসেছেন এখানে! লজ্জা নেই আপনার! জানেন কী জিনিস আপনি নষ্ট করেছেন?

জানেন আমার এই জীবন-মরণ সমস্যায় প্রতিটি ফোঁটা যার অমৃত, সেই অমূল্য জিনিস আপনি ভাতে মেখে খেয়ে—"

"জুদশি!"

কথার মাঝখানে ঘনাদার ওই বিদঘুটে উচ্চারণে আপনা থেকেই একবার থেমে যাবার পর, শিশির আরও গনগনে আগুনে হয়ে উঠল, "রাখুন রাখুন আপনার সব বুজরুকি। ও সব আমাদের ঢের দেখা আছে! আপনি—"

"হ্যাঁ, জুদশি!" ঘনাদা আবার গম্ভীর ভাবে বাধা দিলেন, "সব একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে!"

"কী জুদশি? কী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে?" এবার হলকা ছোটানো গলায় আমাদের জিজ্ঞাসাটাও প্রকাশ করলে।

"কী মিলে যাচ্ছে?" ঘনাদা স্থির ধীর ভাবেই জানালেন, "মিলে যাচ্ছে তোমার যা হয়েছে তাই। নিদান-বিধান সবই যাচ্ছে মিলে।"

"কী আবোলতাবোল বকছেন, কী?"—এবার শিশিরের সুর একটু পালটানো, "নিদান বিধান কোথায় কী মিলেছে?"

"ওই যে তোমাদের তখন শোনালাম," ঘনাদা আমাদের স্মরণশক্তি একটু উসকে দিলেন, "ওই যে সেনাপতি দিলেন জঙ্গলে দিশাহারা করে, মন্ত্রী গাছ কাটলেন আর শেষে স্বয়ং রাজা এসে জঙ্গল সুদ্ধ জ্বালিয়ে উনুন পাতিয়ে বসালেন। ব্যস, রাস্তা খুলে গেল তাতেই।"

"এটা কী পাগলা গারদ পেয়েছেন!" শিশির আবার খাপ্পা হয়ে উঠল, "না, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ভাতে মেখে আপনার ঘিলুটাই গেছে ঘণ্ট হয়ে?"

"আমার হয়ে যায়নি, কিন্তু তোমার তা-ই হত।"

ঘনাদার এ নিষ্ঠুর টিপ্পনি শুনে শিশিরের শোক আবার উথলে উঠল, "আমার তা-ই হত! আমার প্রাণ বাঁচাতে স্বয়ং ধন্বন্তরীর মতো কবিরাজ অত কষ্ট করে যা তৈরি করেছেন, আমার অনিষ্ট হত সেই ছাগলাদ্য ঘৃত খেয়ে?"

"হ্যাঁ, হত"—ঘনাদা এতক্ষণে খাবারঘরের একটা চেয়ার টেনে জুত করে বসলেন, "কারণ ছাগ-টাগ তো নয়, তোমার ওই অমূল্য ঘৃতটি ছাগি দিয়ে তৈরি।"

"ছাগি দিয়ে তৈরি!" ঘনাদার এ ধানিলঙ্কা ফোড়নের টিপ্পনিতে শিশির মারমুখোর সঙ্গে একটু যেন কাঁদো কাঁদো—"আপনি পাতে একবার খেয়েই বুঝতে পারলেন। ঘি-টা ছাগলের নয়, ছাগলির?"

"হ্যাঁ, পারলাম।" ঘনাদা করুণা করে বললেন, "যেমন বুঝতে পারছি তোমার নিদান-বিধান সব দিয়ে গেছে জুদশি!"

"ফের! ফের সেই জুদশি!" শিশির বুঝি শেষবার মেজাজ দেখাল, "কে? কে আপনার জুদশি?"

"কে নয়, বলো, কী!" ঘনাদা কৃপা করে তারপর বিশদ হলেন, "জুদশি হল দুনিয়ার সবচেয়ে দামি সবচেয়ে বিরল, রোগচিকিৎসার গুপ্ত পুঁথি। জুদশির মানে হল অষ্টাঙ্গ গুপ্ত বিদ্যার মৌল চতুর্সূত্র, চোদ্দো হাজার ছন্দে বাঁধা শ্লোকে তা লেখা।"

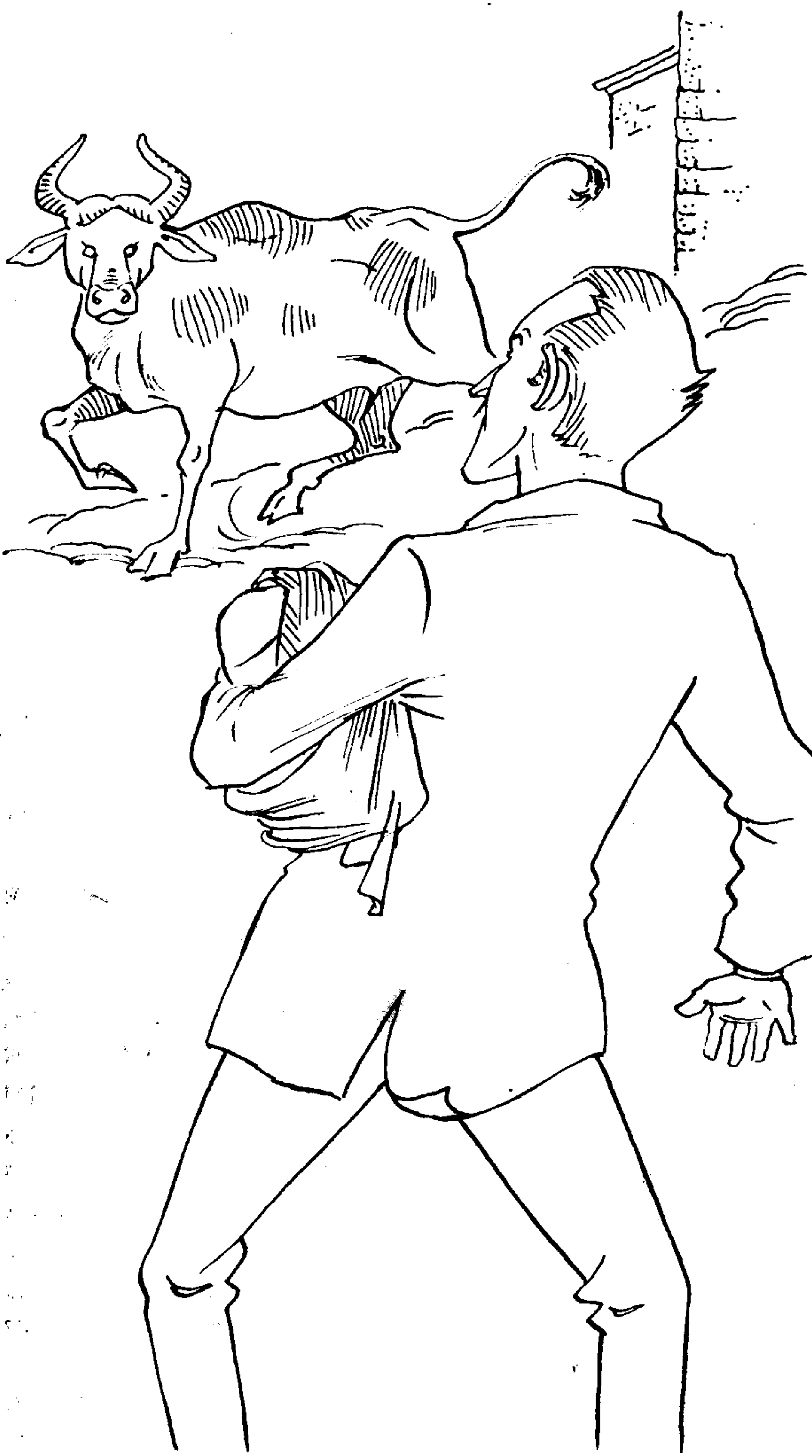

"সেই পুঁথি আপনার কাছে আছে?" এবার জিজ্ঞাসার ছলে উসকানিটা অবশ্য আমাদের। খাবার টেবিলের দুধারে ঘনাদা আর শিশিরকে ঘিরে আমরা তখন বসে পড়েছি।

"আমার কাছে ও পুঁথি?" ঘনাদা সত্যের মান রাখতে মহৎ হলেন, "জুদশির একটিমাত্র গোটা পুঁথি আছে বুরিয়াতিয়া-র উলান উদে শহরের লোক-সংস্কৃতি সংগ্রহশালায়।"

"সেই চোদ্দো হাজার শ্লোকের গোটা পুঁথিটি আপনি বুঝি পড়ে মুখস্থ করে রেখেছেন?" আমাদের বিস্ময় মেশানো সরল জিজ্ঞাসা।

"পড়ে মুখস্থ করে রেখেছি!" সত্যের খাতিরে ঘনাদা আবার অকপট হলেন। একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন, সে পুঁথি পাব কোথায় যে পড়ে মুখস্থ করব। সে পুঁথি আমি চোখে দেখিনি এখনও।"

"তা হলে?" আমরা এবার একটু বিমূঢ়, "ও পুঁথির তো আর দ্বিতীয় কপি কোথাও নেই বলছেন!"

"তা তো নেই-ই।" ঘনাদা হেঁয়ালিটা আরও গভীর করলেন, "আর একটি গোটা পুঁথি জোগাড় করবার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সাইবেরীয় শাখার একটি স্বতন্ত্র কমিটিই তৈরি হয়ে তিব্বত মঙ্গোলিয়া আর বুরিয়াতিয়ায় আপ্রাণ সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।"

"তাতেও কিছু পাওয়া যায়নি?"—আমরা সত্যিই খুব উদ্‌গ্রীব।

"গেছে। আগের মতোই এখানে ওখানে ছেঁড়াখোঁড়া এক-আধটা পাতা।" ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে জানালেন—"অমন আরও কত পাতা মর্ম না বোঝার দরুন যে লোকে হেলায় নষ্ট করেছে তার ঠিক নেই।"

"মর্ম না বুঝে নষ্ট করেছে ওই অমূল্য জিনিস!" আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—"কারা সেই আহাম্মক!"

"আহাম্মক তাদের বলা একটু অন্যায় হয়।" ঘনাদা তাঁর মহানুভবতায় আসামিদের পক্ষ নিলেন—"হাতে পেলেও ও পুঁথির মর্ম বোঝা তো যার-তার কাজ নয়। প্রথমত, পুঁথির পাতাগুলোই একেবারে অদ্ভুত। অনেকটা পুরনো ফিলম নেগেটিভ-এর মতো দেখতে কালো বার্নিশ করা কাগজে সোনালি রঙে লেখা। সে লেখাও বোঝার ক্ষমতা আছে ক-জনের। হয় প্রাচীন আলংকারিক ব্রাহ্মী লিপিতে, নয় ওপর থেকে নীচে লাইন ধরে লেখা নিখুঁত আদি মঙ্গোলীয় হরফে ঠাসাঠাসি করে যা ওখানে লেখা তা একেবারে কঠিন ধাঁধা। সে ধাঁধা ভেদ করার বুদ্ধি না থাকলে কাগজগুলোর কোনও দাম নেই।"

"তা হলে?" শিশির তার আসল প্রশ্নটা এবার তুললে, "ওই একটি ছাড়া জুদশির গোটা পুঁথি আর যখন নেই তখন আপনি জুদশি জুদশি করে অত আদিখ্যেতা করছেন কেন? আর নিদান বিধানই অত পাচ্ছেন কোথা থেকে?"

"কোথা থেকে পাচ্ছি?" ঘনাদা সব ধৃষ্টতা ক্ষমা করার হাসি হেসে বললেন, "পাচ্ছি খাঁটি জুদশি থেকেই। গোটা না থাক, আর একটা কাটা-ছেঁড়া পুঁথি ছিল।"

"আরেকটা পুঁথি ছিল!" আমরা উৎসাহিত হতে গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, "কোথায় সে পুঁথি? আপনার কাছে তো নেই বললেন!"

"না, আমার কাছে নেই।" ঘনাদা অকপটভাবে স্বীকার করলেন। "তার কিছুটা আছে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটার খোটো-র জাদুঘরে আর বাকিটা স্পেনের সেভিলের এক ষাঁড়ের পেটে।"

"ষাঁড়ের পেটে!"—আমরা একটু সন্দেহ নিয়েই ঘনাদার দিকে চাইলাম। সন্দেহ ঘনাদার সত্যবাদিতায় নয়। তিনি তুচ্ছ সব সত্যের নাগালের বাইরে বলেই আমরা মেনে নিয়েছি। এবারের সন্দেহটা তাঁর সামলাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে। এবার তিনি একটা কড়া ফরমাশ নিজেকে দিয়ে ফেলেননি কি? মঙ্গোলিয়া-তিব্বত-বুরিয়াতিয়ার বিরলতম গুপ্ত পুঁথির খানিকটা সেভিলের ষাঁড়ের পেটে ঢুকিয়ে শেষরক্ষা কি করতে পারবেন?

ঘনাদা কিন্তু অকুতোভয়। অর্ধনিমীলিত চোখে যেন সেই পুরনো স্মৃতির পাতায় তন্ময় হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সেভিলের ষাঁড়, যেমন তেমন ষাঁড় নয়, আন্দালুসিয়ার অদ্বিতীয় ষণ্ড-বিশারদ ডিউক অফ ভেরাগুয়ার সেরা ভাকাদ্দা-র সবচেয়ে বড় ঘরানার ষাঁড়। ও বাহাদুর বংশের ষাঁড়ের কীর্তি আর নাম-ডাক সেভিল স্পেন ছাড়িয়ে সেই দক্ষিণ আমেরিকায় পর্যন্ত ছড়ানো। ওই ভাকাদ্দার ছাপ দাগা জাত-ষাঁড়ের শিঙে তখনও পর্যন্ত হাজার হাজার পিকাডোর-এর ঘোড়া পেট-দোফলা হয়ে খতম হয়েছে, চুলো জান দিয়েছে অমন গণ্ডা দশ, আর ব্যান্ডেরিলেরোস আর পিকাডোরেস দশ-বিশটার ওপর খোদ এসপাদা বা মাটাডোর-ই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে অন্তত পাঁচ-ছটি। প্লাজা দে টোরোস-এর এই কংস-মার্কা বংশের এক বিভীষিকা—"

এই পর্যন্ত বলেই ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়ে আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই বোধহয় থামলেন। তারপর জীবে দয়ার নীতি স্মরণ করে ব্যাখ্যা করে বললেন, "ও, ঠিক কূল পাচ্ছ না বুঝি? তা হলে জেনে রাখো, প্লাজা দে টোরোস হল বুনো খ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই-এর খেলা যেখানে হয় সেই চারদিক ঘেরা গোল রণাঙ্গন। এসপাদা বলে সবার ওপরের ষণ্ড-বীরকে, ছোট একটি তলোয়ার আর রঙিন একটা নিশান নিয়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যে শেষ পর্যন্ত ষাঁড়েদের খেলিয়ে তার পর খতম করে। পিকাডোরেস হল সওয়ারি বীর যারা লড়াই শুরু হবার পর ষাঁড়কে তাদের খাটো বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খেপিয়ে তোলে আর ব্যান্ডেরিলেরোস হল এসপাদাদের পরের ধাপের বীর—যারা লাল দোলাই নেড়ে ষাঁড়কে খেলানো আর খেপানো থেকে তাদের গায়ে কাঁটা দেওয়া তীর বসিয়ে শেষ লড়াই-এর জন্য তৈরি করবার সব কাজ করে।"

ঘনাদা স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই-এর কুশীলব আমাদের চেনাবার মধ্যে একটু থামতেই শিবু যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে বললে, "আপনি ষাঁড়ের লড়াই-এও তা হলে নেমেছেন?"

কিন্তু ওই একটু তোয়াজের চেষ্টায় প্রায় হিতে বিপরীত হবার উপক্রম হবে কে জানত? যেন তাঁকে গালাগাল দেওয়া হয়েছে এমনই গরম হয়ে উঠে ঘনাদা বললেন,

"ষাঁড়ের লড়াই করব আমি! ওই একটা নিষ্ঠুর পৈশাচিক খেলার আমি হব একটা অংশীদার?"

এ প্রশ্নের জবাব শিবুর ওপর খাপ্পা হয়েই দিতে হল।

"শিবুটা একটা হাঁদারাম!" বললাম আমি।

"শুধু হাঁদারাম!" গৌর তার ওপর আর এক পরদা চড়ালে—"ওটা আহাম্মক। নইলে অমন আজগুবি কথা ভাবে!"

শিবুর চোখমুখের চেহারা দেখে আমায় আবার দুদিকই সামলাতে হল। বললাম, "ওই যে আপনার জুদশির খানিকটা ষাঁড়ের পেটে থেকে গেছে বললেন, তাইতেই ও ভেবেছে বোধহয় যে আপনি ষাঁড়ের লড়াই করতেই ওখানে গিয়েছিলেন।" এর পর শিবুকে একটু জ্ঞান বন্টন, "আরে খেলা দেখতে গেলেই কি খেলায় নামতে হয়। তা হলে তো ইস্ট-মোহন খেলার মাঠে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে যেত। সেভিলের ষাঁড়ের লড়াই-এর অত নাম-ডাক। ঘনাদা তাই দেখতে গিয়েছিলেন।"

"না, সে লড়াই দেখতে যাইনি।"—ঘনাদা এতেও আপত্তি জানালেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গের হাসিটা ক্ষমার—"আমি গেছলাম চেয়াক গাম্বোকে বাগে পেতে।"

"চেয়াক গাম্বো!" একটু আড়ষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে প্রশ্নটা আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—"সে আবার কে?"

"সে-ই হল সব নষ্টের মূল, শয়তান চূড়ামণি"—তার কথা মনে করতেই ঘনাদার গলাটা যেন ঝাঁঝালো হয়ে উঠল—"নামটা শুনে তাকে মঙ্গোলিয়ান মনে হয়, কিন্তু ওটা তার ছদ্মনাম। আসলে তার নিজের কোনও দেশই নেই। গুপ্তচরগিরি থেকে যে কাজে শয়তানি বুদ্ধি মোটা লাভে খাটানো যায়, এ সব কিছুর ধান্দায় দুনিয়াময় টহল দিয়ে বেড়ায়।

জুদশির পুরনো পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে টাকলা মাকানের উত্তরে ঘোরাঘুরির সময়েই ওকে সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলাম। ও খুব করুণভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী বলেছিল। মরুর ঝড়ে ও নাকি নিজের কাফিলা থেকে ছিটকে পড়ে তখন একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়েছে। আমি সঙ্গে না নিলে সে এই মরুতে শুধু পিপাসাতেই শুকিয়ে মারা যাবে।

তার মুখ আর বিশেষ করে চোখের চাউনি দেখে তার আসল চরিত্র কিছুটা আন্দাজ করলেও, তার বিশাল দশাসই চেহারা আর এ অঞ্চল সম্বন্ধে বেশ কিছু জানা আছে দেখে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছিলাম।

গোড়ার দিকেই একদিন অবশ্য একটু শিক্ষা দিতেও হয়েছিল।

তখন আমার জুদশি পুঁথি সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকটা পাতা শুধু বাকি। সে পাতাগুলো পাবার নয় জেনে আর ক-টা দিন মাত্র একটু চেষ্টা করেই পুঁথিটা উলানবাটারে নিয়ে যাব বলে তখন ঠিক করে ফেলেছি।

ঠিক সেই সময়ে একদিন রাত্রে হঠাৎ কী একটা খসখস শব্দ শুনে বিছানায় উঠে বসতে হল। উঠে বসে টর্চটা জ্বেলে অবাক হয়ে দেখি চেয়াক গাম্বো আমার তাঁবুতে ঢুকে আমার পিঠে বেঁধে চলার নিজস্ব ঝোলাটা হাঁটকাচ্ছে।

আমায় টর্চ জ্বেলে তাকে লক্ষ করতে দেখে বিন্দুমাত্র সে ঘাবড়াল না। যেমন ঝোলা হাঁটকাচ্ছিল তেমনই হাঁটকাতে হাঁটকাতে অম্লান বদনে বললে—'আপনার তাঁবুতে একটা ইঁদুর ঢুকে কী কাটছে মনে হল। তাই একটু দেখতে ঢুকলাম।'

খুব ভাল করেছ। টর্চটা জ্বেলে রেখেই বললাম, 'তবে ভুল করেছ একটু। যেটা ইঁদুর ভেবেছ সেটা ইঁদুর নয়, ছুঁচো।'

ততক্ষণে জুদশির পুঁথির লাল শালু মোড়া তাড়াটা সে বার করে ফেলেছে। সেটা বগলদাবা করে ঝোলাটা ফেলে দিয়ে সে বললে, 'ইঁদুর নয়, ছুঁচো ঢুকেছে বলছেন। তা হতে পারে। তবে সাবধানের বিনাশ নেই। পুঁথিটা এখন থেকে আমার কাছেই রাখা ঠিক করলাম।'

'তাই নাকি! খুব ভাল!' আমি খুশি হয়ে বললাম, 'একটা বড় দায় থেকে আমায় বাঁচালে!'

'আপনাকে আরও একটা দায় থেকে বাঁচিয়েছি।' আমায় বাধিত করার সুরে বললে চেয়াক গাম্বো, 'আপনাকে পিস্তল-টিস্তল আর ছুঁতে হবে না। বড় বেয়াড়া জিনিস কিনা! কখন হাত ফসকে কী হয়ে যায় তার ঠিক নেই। আপনার পিস্তলটা বালিশের তলা থেকে তাই আগেই সরিয়ে নিয়েছি।'

'শুধু পিস্তলটাই নিয়েছ তো আর—' বলে হঠাৎ থেমে গেলাম থতমত খেয়ে।

'আর—বলে থামলেন কেন?' গাম্বো ভুরু কুঁচকে একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী, বলছিলেন কী!'

'না, ও কিছু নয়।'—আমি যেন তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিতে চাইলাম।

গাম্বো কিন্তু নাছোড়বান্দা। গলা চড়ালেও বেশ অস্বস্তির সঙ্গে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কথা চাপবার চেষ্টা করবেন না। আর কী বলতে যাচ্ছিলেন বলে ফেলুন।'

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যেন বাধ্য হয়েই একটু থেমে থেমে বললাম, 'বলছিলাম যে, বালিশের তলার পিস্তলটাই শুধু নিয়েছ আর বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢোকানো বেরেটাটা—'

ব্যস, ওইটুকুতেই কাম ফতে! বালিশের ওয়াড়ের ভেতর লুকোন বেরেটা-র নামে সেদিকে চাইতে গিয়ে দু সেকেন্ডের একটু অন্যমনস্কতার মধ্যেই গাম্বো ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে তাঁবুর ধারে গিয়ে ঘাড়মুড় গুঁজে পড়ল। দু সেকেন্ডের ফাঁকে কংফুর একটি মোক্ষম লাথিতেই সে তখন কোঁকাচ্ছে।

সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে তুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, 'বলো, এবার কী বলার আছে এখন।'

চেয়াক গাম্বোর সে কী কান্না তখন 'না, না, আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনি আমায় কড়া শাস্তি দিন, কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এই শুধু আমার মিনতি।'

তবু ক্ষমাই তাকে করলাম, আর বললাম, এরপর আর বেইমানি করার চেষ্টা করলে তাকে আরও নতুন বেরেটা দেখিয়ে দেব।

বেইমানি সে তবুও করল। কখন কোন ফাঁকে আমার মুখ-বাঁধা জলের থলেতে বাইরে থেকে মিহি ইনজেকশনের ছুঁচে বিষ ঢুকিয়ে আমায় অজ্ঞান করে ফেলে আমার

জুদশির পুঁথি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল একদিন।

আমাকে অজ্ঞান করার পর একেবারে খতম করেই সে যেত, কিন্তু তখন দূরবিনে আর-এক কাফিলাকে আমাদের তাঁবুর দিকেই আসতে দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যা পেয়েছে তাই নিয়েই আমার উটটি নিয়ে সে চম্পট দেয়।

অজানা কাফিলার লোকজন আসাতেই অবশ্য সে যাত্রা আমার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু গাম্বো তখন একেবারে পগার পার।

তারপর ছ-টি মাস ধরে গাম্বোকে ধরবার জন্য সারা দুনিয়া প্রায় চষে ফেলেছি বলা যায়। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকো, টোকিও থেকে লন্ডন, প্যারিস থেকে রিও দ্য ঝানেরো—কোথাও খুঁজতে আর বাকি রাখিনি। হদিস কিন্তু কিছু মেলেনি।

ছ মাসের মধ্যে জুদশির চুরি করা পুঁথির কোনও ব্যবস্থা সে করতে পারেনি বলেই আমার তখন বিশ্বাস। তা সে করতে পেরে থাকলে জুদশির মতো দামি ও বিরল জিনিসের চোরা বাজারে একটু কানাঘুষা শোনা যেতই। সুতরাং গাম্বো যে কোথাও ঘাপটি মেরে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিয়ে সে এমন হাওয়া হয়ে গেল কী করে?

আমার মাথাতেও যা আসবে না এমন কোনও মহলে সে নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সে জায়গা কীরকম হতে পারে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করিডা মানে এই ষাঁড়ের লড়াই-এর জগতের কথা মনে পড়েছে। এ খেলা আমি ঘৃণা করি, তাই সে মহলে খোঁজ করার কথা আমি ভাবতেই পারিনি এতদিন।

ওই জগৎটাই তা হলে এখুনি খুঁজে দেখা দরকার বুঝেছি। খোঁজা সফলও হয়েছে প্রথম চেষ্টাতেই। চেয়াক গাম্বো সেভিলের প্লাজা দে টোরোস মানে ষাঁড়ের লড়াই-এর ঘাঁটির মহলেই নিজেকে নিপাত্তা করে রেখেছে।

সন্ধান পেলেও তাকে বাগে পাবার মতো সুযোগ সহজে মেলবার নয়। আমি একটু দূরে দূরে থেকে তার ওপর সব সময়ে নজর রাখি।

একটি বড় সুবিধের ব্যাপার এই যে, গাম্বো কোথায় তার চোরাই পুঁথি লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে বার করতে আমায় হয়রান হতে হবে না। কখন কী অবস্থায় সরে পড়তে হবে ঠিক নেই বলে গাম্বো সে পুঁথি কখনও হাতছাড়া করে না। আমার সেই লাল শালু মোড়া বান্ডিলেই সারাক্ষণ সেটি সঙ্গে নিয়ে ফেরে।

ষাঁড়ের লড়াই দেখা গাম্বোর এক প্রচণ্ড নেশা। প্লাজা দে টোরোস-এ যে-কোনও-একটা লড়াই থাকলেই হল। সে একেবারে সামনের দামি সিটের টিকিট কিনে খেলা দেখবেই।

দূর থেকে তার সব চাল-চলন লক্ষ করে যে সুযোগ খুঁজছিলাম তাই একদিন আশাতীতভাবে এসে গেল।

বড় জবর ষাঁড়ের লড়াই-এর দিন সেটি। সারা স্পেনের সব চেয়ে খুনে ঘরানার সেরা একটি ষণ্ড টোরিল মানে লড়াকু ষাঁড়েদের খাঁচা থেকে খেলার মাঠে বেরিয়ে এসেই একেবারে লন্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে।

প্রথম চার-চারটি পিকাডোরের ঘোড়ার পেট ফাঁসিয়ে খতম করার পর দুজন

পিকাডোরকেই হাসপাতালে পাঠিয়ে সে তিন-তিনজন ব্যান্ডেরিলেরোস আর জনা-পাঁচেক চুলো-কে আতঙ্কে মাঠছাড়া করেছে। তারপর স্বয়ং এসপাদা অর্থাৎ সবার ওপরে ষণ্ড-বীরের যা অবস্থা করেছে, তা আর বলার নয়।

এ সাংঘাতিক ষাঁড় আবার শুধু শিং দিয়ে গুঁতোয় না, দাঁত দিয়ে কামড়েও দেয়।

সেরা এসপাদার সব জারিজুরি ভেঙে সে তো দিয়েছেই, যে লাল রেশমি নিশান নাড়ার কেরামতিতে এসপাদারা ষাঁড়েদের নাচিয়ে খেলিয়ে খেপিয়ে হয়রান করে, সেই মুলেট্টাই কামড়ে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। মাটিতে ফেলে পায়ের খুরে দিয়েছে থেঁতলে।

মানের দায়ে এসপাদাকে এবার মুলেট্টা ছাড়া শুধু এসতোক মানে খাটো তলোয়ার নিয়েই এসতোকাদা মানে মরণ-ঘা দেবার জন্য এ সর্বনাশা ষাঁড়ের মহড়া নিতে হয়েছে।

কিন্তু এ ষাঁড় যেন স্বয়ং যমরাজের বাথান থেকে আমদানি মহাকালের বাহন। সেভিলের সেরা মাটাডোর, অমন পাঁচ-দশ গণ্ডা খুনে ষাঁড়কে একেবারে নিখুঁত এসতোকাদা মানে ঘাড়ের ঠিক পেছনে এক মোক্ষম মারে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত খাটো তলোয়ার গেঁথে দেওয়ার বাহাদুরিতে যে কাবার করেছে, তারই টিপ দিয়েছে ভণ্ডুল করে ওই সৃষ্টিছাড়া ষাঁড়। তারপর শিং-এর এক ঝাঁকানিতে এসপাদার হাতের এসতোক খসিয়ে তাকে প্রাণের দায়ে ছুটিয়েছে এধরনের বিপদ ঠেকাবার লড়াইয়ে ময়দানের ধারের বেড়ার ওপারে।

সমস্ত প্লাজা দে টোরোস-এ তখন একেবারে হুলুস্থুল হই রই কাণ্ড। এসপাদা-তাড়ানো সাক্ষাৎ মহাকালের বাহন দুই ধারালো শিং উঁচিয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর চারদিকের দর্শকরাও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে যেন খ্যাপার মতো চেঁচামেচি করছে।

এমন একটি মওকা আমারও আশাতীত ছিল। দর্শকদের এই উন্মত্ত উত্তেজনার মধ্যে ওপরে আমার সস্তা টিকিটের গ্যালারি থেকে আমি অবাধে নেমে এসেছি নীচে একেবারে লড়াইয়ের মাঠের ওপরেই ঝোলানো গাম্বোর দামি গ্যালারিতে।

সে তখন উত্তেজনায় দিশাহারা, আর সকলের মতো হাত-পা ছুড়ে এসপাদাকে গাল দিয়ে ষাঁড়টাকে বাহবা দিচ্ছে।

বেশি কষ্ট করতে হয়নি। তার বগলের শালু মোড়া বান্ডিলটা একটু আলগাভাবেই ধরা ছিল। এই অবস্থায় ব্যবহার করবার জন্য যে ম্যাজিক বড়িটা পকেটে এনেছিলাম সেটা মুখে দিতে হয়নি। এক হেঁচকা টানে বান্ডিলটা কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছি তার পর।

কিন্তু পালাব কোথায়? উত্তেজনায় উন্মত্ত দর্শকের ভেতর দিয়ে পথ পাওয়াই শক্ত। এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে গাম্বো তখন চিৎকার করতে করতে আমার পেছনে তাড়া করেছে। একা তার হাত থেকে পালানো হয়তো শক্ত হত না। কিন্তু পেছনে সে আর সামনে ওপরে চেয়ে দেখি তারই ভাড়াটে পাহারাদার ক-জন যমদূতের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এ সংকটে একমাত্র যা করবার তাই করতে হল।”

“কী করলেন আপনি? ধরা দিলেন?” ঘনাদা দম নিতে একটু থামবার পর শিশিরেরই প্রথম উদ্বিগ্ন প্রশ্নে হাওয়া একটু ঘুরছে বলেই আশা হল।

“না, না, ধরা দেবেন কী?” চাকাটা চালু রাখলাম আমি, “ঘনাদা ওই যে কী বড়ির কথা বলছিলেন—সেইটি বোমার মতো ছাড়লেন।”

“যেমন তুমি আহাম্মক!” শিবু খিঁচিয়ে উঠল, “সে তো মুখে দেবার বড়ি! মুখে দেবার বড়ি কখনও বোমা হয়?

“ওসব কিছু নয়,” গৌর পরম বিজ্ঞের মতো বললে, “ঘনাদা একমাত্র যা ওই অবস্থায় করা যায় তা-ই করলেন। অর্থাৎ লাল শালুর পুঁটলিটি ফেরত দিলেন গাম্বোকে। গাম্বোর হদিস যখন মিলেছে তখন একদিন তার হাত থেকে ও-বান্ডিল উদ্ধার করবার সুযোগ হবেই। তার জন্যে বেফায়দা বেঘোরে প্রাণটা তো আর দেওয়া যায় না। তাই না, ঘনাদা?

“না।” ঘনাদা সত্যের খাতিরে যেন বলতে বাধ্য হলেন, “যা বললে তার কোনওটাই নয়। ওই বান্ডিল নিয়ে নীচের অ্যারিনাতেই লাফিয়ে পড়লাম।”

“লাফ দিলেন নীচে!” আমরা স্তম্ভিত।

“ওই সাক্ষাৎ শমন যেখানে শিং বাগিয়ে ওত পেতে আছে সেইখানে?” আমাদের গলা যেন বুজে আসছে আতঙ্কে।

“হ্যাঁ।” নিরুপায় ভঙ্গিতে বললেন ঘনাদা, “সেই শিং বাগানো শমনের কোটের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। সমস্ত প্লাজা দে টোরোস তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় উল্লাসে। চিৎকার করে রুমাল স্কার্ফ নেড়ে চারদিক থেকে সবাই আমায় উৎসাহ দিচ্ছে। কেউ ফ্রানসিসকো রোমেরো-র নাম করছে, কেউ এল সিড বলে চেঁচিয়ে ডন রোডরিগো দিয়াজ দে ভাইভার-এর পুরো নামটাই উচ্চারণ করছে।

আমার হাতে শুধু ওই লাল শালুর বান্ডিল ছাড়া বল্লম কি এসতোক কিছুই নেই। কিন্তু সে ভাবনা আমায় ভাবতে দিলে না গোটা প্লাজা দে টোরোসের দর্শকেরা। মুহূর্তের মধ্যে ঝপ ঝপ করে চারদিক থেকে অমন গোটা দশেক বল্লম আর খাটো তলোয়ার আমার সামনে এসে পড়ল।

ষাঁড়টা তখন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে আগুনের হলকার মতো নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ফেনা-মাখানো মুখে আমার দিকে চেয়ে পায়ের খুর মাটিতে ঠুকছে।

ক-বার অমনি পা ঠুকেই শিং বাগিয়ে মেল ট্রেনের মতোই সে ছুটে এল আমার দিকে।”

ঘনাদা আবার একটু থামলেন।

“কী করলেন তখন?” আমাদের মধ্যে শিশিরই সব চেয়ে উদ্‌গ্রীব, “ওই এসতোক না যা-হোক-একটা তুলে নিলেন তো?”

“না।” সত্যাশ্রয়ী ঘনাদা যেন বাধ্য হয়েই স্বীকার করলেন, “এসতোক কি বল্লম কিছুই তুললাম না। ও গোহত্যা আমার কাজ নয়।”

“তা হলে?”আমরা উৎকণ্ঠিত।

গাম্বোর জন্য আনা সেই গুলিটা পকেট থেকে বার করে মুখে দিলাম। ষাঁড়টা তখন একেবারে সামনে এসে বাগানো শিং জোড়া তুলতে যাচ্ছে। তার মুখের ওপর বুকের সমস্ত নিশ্বাস জমা করে সজোরে দিলাম এক ফুঁ!”

“ফুঁ দিলেন!” আমাদের চোখ ছানাবড়া।

“হ্যাঁ, শুধু ফুঁ,” সবিনয়ে বললেন ঘনাদা, “তাইতেই ধেই নৃত্য করতে করতে মাটিতে মুখ ঘসবার চেষ্টায় তার কী আছাড়িপিছাড়ি। আমার ভয়ের আর তখন কিছু নেই, কিন্তু শিং বাগিয়ে চড়াও হবার পর আমার ফুঁ দেবার আগেই আমার লাল শালুর বান্ডিলের এক খাবলা সে যে কামড়ে তুলে নিয়েছে।

সমস্ত অ্যারিনার লোক যেন তখন পাগল হয়ে গিয়েছে উত্তেজনায়। ষাঁড়ের খাবলানো পুঁথির ভাগ আর উদ্ধার করবার নয় বুঝে যেটুকু পেরেছি তাই নিয়েই আমি সেই হট্টগোলের মধ্যে সরে পড়বার পথ খুঁজছি।

প্লাজার আর কেউ তা গ্রাহ্য না করুক, চেয়াক গাম্বো তাতে চুপ করে থাকতে পারে! মরিয়া হয়ে আমায় ধরবার জন্য সে-ও লাফিয়ে পড়েছে লড়াইয়ের মাঠে।

আর তাতেই হয়েছে সর্বনাশ। মাটিতে নাক-মুখ ঘসবার চেষ্টা করেই ষাঁড়টা আমার ফুঁ-এর ধাক্কা খানিকটা তখন সামলে উঠেছে। গাম্বোকে ওভাবে লাফিয়ে পড়তে দেখে সে একেবারে প্রলয়ের বাহন।

একটা ছুট, একটা চিৎকার আর সেই সঙ্গে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় শিংয়ের গুঁতো।

প্লাজা ভরতি সমস্ত দর্শকই তখন দিশাহারা হলেও কর্তব্যে ত্রুটি কর্তাদের হয়নি। ওই হট্টগোলের মাঝে অ্যাম্বুলেন্সকে গাম্বোর দিকে ছুটে যেতে দেখে তুমুল গোলমালের সুযোগে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছি। জুদশির পুঁথির অনেকখানিই সেই খুনে ষাঁড়ের পেটে গেছে, কিন্তু যা বেঁচেছে তাও বড় কম নয়। সেই অমূল্য জিনিস নিজের কাছে আর রাখিনি। যে মুল্লুকের জিনিস, সেই মঙ্গোলিয়ার উলানবাটারে নিয়ে সবটাই জমা করে দিয়ে এসেছি।”

“তা হলে?” শিশিরকে একটু বেশি ভাবিত মনে হল, সে জুদশি তো এখন নাগালের বাইরে। আপনি তো ভাল করে পড়েও দেখেননি।

“তা কি আর দেখিনি?” ঘনাদা শিশিরের ভুল ভাঙলেন।

“পড়েছেন!” শিশির অত্যন্ত উৎফুল্ল। “কিন্তু যা পড়েছেন তা কি আর মনে আছে?”

“মনে থাকবে না কেন?” ঘনাদা যেন এরকম সন্দেহে অপমানিত। “গোটা পুঁথিতে চোদ্দো হাজার আর আমার ওই ছেঁড়াটায় ন-হাজার শ্লোক মাত্র।”

“মাত্র ন-হাজার?” ঘনাদার স্মৃতিশক্তির এই যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনে আমাদের মুহ্যমান গলা দিয়ে ওই বিহ্বল উচ্চারণটুকু বার হল।

“হ্যাঁ, ন-হাজারের বেশি নয়।” ঘনাদা একটু বিশদ হলেন, “তবে মানে না বুঝে শুধু মুখস্থ করে লাভ কী? সেই মানে বোঝাই দায়—”

“কেন? কেন?” আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন, “ভাষা খুব শক্ত বুঝি!”

"ভাষা তো বটেই, তার চেয়ে বেশি কঠিন ভাব।" ঘনাদা ব্যাখা করলেন, "সব জটিল ধাঁধায় লেখা কিনা।"

"সব ধাঁধায় লেখা!" আমাদের বিস্মিত কৌতূহল!

"কীরকম ধাঁধা শুনবে?" ঘনাদা সদয় হয়ে উদাহরণ দিলেন, "এই একটা শোলোক গদ্যে বলছি শোনো—খারাপ আওয়াজের রোগ। তার জন্য সেনাপতির কাছে যেতে তিনি দিলেন লুক-মিক। রোগ কিন্তু সারল না। তখন চাবুক হাতে রাজা যেই এসে দাঁড়ালেন অমনই রোগ গেল পালিয়ে।"

"এই আপনার জুদশির ধাঁধার নমুনা?"—হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল—"এ ধাঁধার আবার মানে আছে?"

"তা আছে বইকী!" ঘনাদা আমাদের অজ্ঞানতিমির ঘোচালেন—"রোগটা হল বাচ্চাদের চোখ দিয়ে জল পড়া। বুরিয়াতিয়ায় কি মঙ্গোলিয়ায় ও রোগ বোঝাবার শব্দটা বেশ বিদঘুটে। তাই তাকে বলা হয়েছে খারাপ আওয়াজের রোগ। আর লুক-মিক হল ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো পাপড়ির তিব্বতি এক জাতের চন্দ্রমল্লিকা। বাচ্চাদের চোখের জল পড়া ওই চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ির রস দিলে সারে। তবে সঙ্গে কড়া অনুপান চাই। সেনাপতি শুধু লুক-মিক-ই বিধান দিয়েছেন। তাতে সারেনি, কিন্তু চাবুক হাতে রাজা মানে আরও কড়া অনুপান মেশাতেই ওষুধ অব্যর্থ হয়ে গেল।"

"তা হলে?" আমরা বিহ্বলভাবে জানতে চাইলাম, "শিশিরের অসুখের কথায় সেদিন ধাঁধা মতো যা শুনিয়েছিলেন তা আপনার ওই জুদশি থেকেই নেওয়া? শিশিরের রোগের নিদান-বিধান ওরই মধ্যে লুকোনো আছে?"

"তা আছে বই কী!" বলে ঘনাদার উঠবার উপক্রম দেখে শিশিরই তাঁকে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে থামিয়ে প্রথম মিনতি জানালে, "ও ধাঁধাটার যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।"

"ব্যাখ্যা করতে বলছ?" ঘনাদা কেমন একটু উসখুস করে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, "কিন্তু কী জানো—"

ঘনাদাকে তাঁর বাক্যটি আর শেষ করতে হল না। শিশিরই তার আগে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বললে, "একটু বসুন! আমি এখুনি আপনার সিগারেট আনছি। এই যাব আর আসব।"

শিশির তখুনি এক লাফে ঘরের বাইরে।

"শোনো! শোনো!" ঘনাদা পিছু ডাকলেন, "সিগারেট তো আনছ সেই সঙ্গে তোমার ওই কী চিকিচ্ছের বই, কী বারিধি না কী, সেটাও নিয়ে এসো একবার।"

"সেটাও আনব!"—শিশির একটু অবাক হয়েই ওপরে চলে গেল। আমরাও তাই।

শিশিরের সিগারেট আনতে দেরি হল না। প্যাকেট-ট্যাকেট নয়, একেবারে আনকোরা সিগারেটের টিন। অসুখের বাতিকে খাওয়া ছেড়ে দিলেও ঘর থেকে বিদেয় করতে পারেনি। টিনের সঙ্গে 'বৃহৎ চিকিৎসা-বারিধি' বইটাও শিশির এনেছে।

শিশির যথারীতি সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার পর মৌজ করে দুটো রাম টান দিয়ে শিশিরের বইটা একটু নাড়তে নাড়তে ঘনাদা তাঁর ধাঁধার ব্যাখ্যা শোনালেন

নাটকীয়ভাবে।

"ধাঁধাটা কী? সেনাপতি ঘোর জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে দিলেন পথ হারিয়ে, মন্ত্রী খুঁজে খুঁজে গাছ কাটলেন ভোঁতা কুড়ুলে। তাতে শুধু বদগন্ধই ছড়াল, কাজ হল না কিছু। তখন রাজা এসে জঙ্গল জ্বালিয়ে উনুন পেতে বসাতেই সব সমস্যা মিটে গেল। —এ ধাঁধার মোদ্দা মানে শুধু এই যে তোমার যা রোগ এখন তাতে সেঁক নেওয়া দরকার।"

"সেঁক? কীসের সেঁক?" আমাদের সকলেরই হতভম্ব প্রশ্ন।

"রাজা যা জ্বালিয়ে উনুন পেতে বসালেন সেই জঙ্গলের মতো গোলমেলে মস্ত প্রকাণ্ড কিছুর।" ঘনাদা বোঝালেন, "যে জঙ্গলে ঢুকে ব্যাধি শুরু, ছাড়া-ছাড়া ভাবে সামলাতে গিয়ে যা রোগ বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই গোটা জঙ্গলই চেলাকাঠ করে উনুনে দিয়ে তার সেঁক নিতে হবে। পারবে তা নিতে?"

প্রশ্নটা শিশিরকে করলেও আমরা সবাই নিজেদের সম্মতি আর উৎসাহ জানালাম— "পারবে না মানে! নিশ্চয়ই পারতে হবে। এত বড় রোগ বলে কথা!"

"কিন্তু সেঁকটা নেব কী জ্বালিয়ে?" শিশিরের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

"কী জ্বালিয়ে নেবে? দাঁড়াও, দাঁড়াও," ঘনাদা যেন তৎক্ষণাৎ আকাশ-পাতাল সব খুঁজে নিয়ে বললেন, "একটা খুব মোটা ঢাউস বই হলে হয়। বই মানেই তো জঙ্গল। তা তোমার এই 'বৃহৎ চিকিৎসা-বারিধি'টাই সবচেয়ে ভাল।"

"ওই বই!" শিশির আপনা থেকেই একটু শিউরে উঠে বললে, "কিন্তু ও বই যে—"

"কিন্তু-টিন্তু কিছু নয়," ঘনাদা তাকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিলেন, "ওই বই-ই তোমার জঙ্গল। ভাল চাও তো পুড়িয়ে সেঁক নাও আজই।"

ঘনাদা আর এ ঘরে থাকলেন না। গট গট করে ওপরে নিজের টঙের ঘরে চলে গেলেন, শিশিরের সিগারেটের টিনটা অবশ্য সঙ্গে নিয়ে।

শিশির সেদিকে চেয়ে একটু দ্বিধাভাবে বললে, "আচ্ছা, এটা কি সত্যি ওই জুদশির বিধান?"

"আলবত জুদশির বিধান!" আমরা সমস্বরে তাকে আশ্বস্ত করলাম, "ধাঁধার নমুনা দেখেই বুঝতে পারলি না, একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল জুদশি!"

জুদশির বিধান অব্যর্থ। শিশিরের সব রোগ সেরে গিয়েছে।

পু:—ঘনাদার মারাত্মক ফুঁ-এর ম্যাজিক বড়িটা কীসের, সে রহস্যভেদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। ঘনাদাকে আড্ডাঘরে পেয়ে সেদিন আমি বলেছি, "ওটা বড়ি নয়, ক্যাপসুল। অ্যামোনিয়া কারবোনেট, মানে স্মেলিং সল্ট-এ ভরা। ঘনাদা মুখে নিয়ে দাঁতে কেটে বলীবর্দের মুখে ফুঁ দিয়ে ওটা ছিটিয়েছেন।"

"না," শিবু আমার থিওরি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে, "ওটা ক্যাপসুল, তবে স্মেলিং সল্ট-টল্ট নয়। শুকনো ধানি লঙ্কার গুঁড়োয় ভরা। না ঘনাদা?"

ঘনাদা জবাব না দিয়ে ঈষৎ হেসে তাঁর টঙের ঘরের দিকে চলে গেছেন।

ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ পাবার পর গৌর বলেছে, "ও কিচ্ছু নয়, স্রেফ হ্যালিটোসিস।"

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে! সে আবার কী?

শুনে হাসি পাচ্ছে তো? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? কাঠবিড়ালিরাও যেমন কাজে লেগেছিল, ভারত-যুদ্ধে মানে কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধে পিঁপড়েদেরও সেইরকম কোনও মদত ছিল বলে মনে হচ্ছে হয়তো।

না, সরাসরি ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়েদের কোনও পার্ট ছিল বলে জানা নেই।

তবে—যাক, বলেই ফেলা যাক—পিঁপড়েদের—না, বহুবচনটা ভুল, আসলে—একটি ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে তার কেরামতিটুকু না দেখালে ভারত-যুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাসে ওই পাঁচ লহমার ফাঁক মানে ফাঁকিটুকু থাকত না।

ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে! তার কেরামতিতে ভারত-যুদ্ধের ইতিহাসে ফাঁক?

কেরামতিটা কী?

তা বোঝবার জন্য গোড়া থেকে শুরু করা উচিত। একেবারে বাহাত্তর নম্বরের সেই দোতলার আড্ডাঘরে বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে শুরু এক রবিবারের গুমোট সকালবেলায়।

কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছে —সারাদিন ভ্যাপসা গরম, বিকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কাগজে তো হপ্তাভোর রোজই ওই ভাঁওতা দিচ্ছে। কিন্তু সব ভরসাই ফরসা। না আকাশ, না টঙের ঘর থেকে এক ছিটেফোঁটা বর্ষণের লক্ষণ পাচ্ছি।

আকাশে কি টঙের ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎ অবশ্য নেই। কিন্তু তাতেই তো আরও জ্বালা।

বজ্র-বিদ্যুতের জায়গায় দুবেলা কোকিলের বদলে দাঁড়কাক গিলে-খাওয়া গলার অমৃতসমান মহাভারতের কথা শুনছি।

কখনও—

গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ৷৷
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ৷৷
তিল অর্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয় ৷৷

কখনও বা—

অশ্বত্থামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনই উত্তম গজবর।
বর্ণে তিনি জলধর, ঈষা সম দন্ত সর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর
ভীমসেন করিতে সমর।

গলাটি কার তা আর বলে দিতে হবে না নিশ্চয়।

হ্যাঁ, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম তেতলার টঙের ঘরে তিনি কিছুদিন ধরে আর সব ছেড়ে মহাভারত ধরেছেন। আমরাও সেই সঙ্গে পথে বসেছি।

সময়ে অসময়ে তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক-মারা গলায় ওপর থেকে কাশীরাম দাসের পয়ার ভেসে আসে। সে পয়ারের ঢেউ ঠেলে কোনওরকমে যদি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছই, তিনি যেন মহাভারতের অমৃতরসে ডুবে আমাদের দেখতেই পান না।

তাঁর মতিগতি একটু ফেরাবার আশায় স্বস্ত্যয়নের উপচার জোগাতে আমরা কিছু ত্রুটি করিনি এ পর্যন্ত। কখনও আমিষ কখনও নিরামিষ, সাত্ত্বিক বা তামসিক বেশ কিছু আমাদের সমভিব্যাহারে গিয়েছে।

নৈবেদ্য সামনে ধরে দিয়ে আমরা একান্ত বশংবদ হয়ে এধারে ওধারে বসেছি। তাঁর শূন্য দৃষ্টি দু-একবার আমাদের দিকে ফিরলেও এ স্থূল বর্তমান ভেদ করে সেই সূদূর হস্তিনাপুরেই বোধ হয় চলে গেছে। আমরা যে তাঁর গোচরীভূত তার কোনও প্রমাণ পাইনি।

শুধু দক্ষিণ হস্তটা তাঁর নিজের অজান্তেই প্লেটের প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর প্রসারিত হয়েছে। অচেতনভাবেই মুখে গিয়ে পৌঁছেছে তারপর।

সেখানে যান্ত্রিক দন্ত নিষ্পেষণ চলতে চলতে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য থামায় আমরা শশব্যস্ত হয়ে বলার সুযোগ পেয়েছি—"কবিরাজিটা কি জুত হয়নি, ঘনাদা? একেবারে টাটকা ভাজিয়ে এনেছি কিন্তু!"

ঘনাদার কর্ণকুহরেই বোধ হয় কথাগুলো প্রবেশ করেনি। সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে অগ্নিদেবের খিদের বায়নাই তিনি তখন শুনছেন।

হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ ॥
আমি অগ্নি, বলি দিয়া নিজ পরিচয়।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয় ॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।

সেই বন ভক্ষ্য মোরে কর ধনঞ্জয় ॥
উদর পুরিয়া খাই এই অভিরুচি।
কোনও পশুপক্ষী মৎস্যে নাহিক অরুচি ॥

অগ্নিদেবের খিদের আবদার শোনাতে শোনাতে খাণ্ডব বনের অভাবে সামনে ধরে দেওয়া প্লেটগুলো ঘনাদা চেটে পুটে সাবাড় করেছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যায়নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে নীচে নেমে এসেছি সবাই। আর তারপরই ঘনাদাকে কাত করবার এই নতুন মতলব ভাঁজা হয়েছে।

ফন্দিটা বিষে বিষক্ষয়, মানে যাকে বলে অটোভ্যাক্সিন। যা দিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছেন তাই দিয়ে ঘনাদাকে জব্দ করাই অর্থাৎ তাঁর ওপরই মহাভারত চাপানো।

সকাল থেকেই আমাদের তর্কটা শুরু হয়েছে। ঘণ্টার কাঁটা ছ-টা থেকে সাতটার দিকে যত এগিয়েছে আমাদের গলা ধাপে ধাপে তত তেতলার টং পর্যন্ত পৌঁছেছে নিশ্চয়।

একদিকে শিবু আর আমি, অন্য দিকে গৌর আর শিশির।

তর্ক তো নয়, যেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র।

ছ-টা একুত্রিশে শিবুর হাঁক ন্যাড়া সিঁড়িটা বোধহয় পেরিয়ে গেছে, "আলবত হারত পাণ্ডবেরা।"

"কখনও না!" শিশিরের প্রতিবাদ খোলা ছাদ পর্যন্ত নিশ্চয়।

"কচুকাটা হত তা হলে!" আমি গলাটা টঙের ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছি বোধহয়।

ওপরে ঘনাদার সুরেলা মহাভারত শোলোক আওড়ানো হঠাৎ যেন থেমেছে। এই 'জিরো আওয়ার' বুঝে নিজেদের গলার পেছনে আমরাও এবার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। পেছন দিকে তাকিয়ে খাবারের ট্রে সমেত বনোয়ারি ঠিক হিসেব মতো হাজির হবার জন্য তৈরি কি না দেখে নিতে ভুলিনি।

তারপর টঙের ঘরে গিয়ে দোতলার তর্কটা একেবারে যেন তপ্ত খোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছি ঘনাদার সামনে।

গৌর প্রায় বিধানসভার মেজাজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘনাদার কাছে স্পিকারের রুলিং চেয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—"শুনেছেন, শুনেছেন এদের কথা! বলে পাণ্ডবরা নাকি গোহারান হারত কুরুক্ষেত্রে!"

"হারতই তো," শিবু তাল ঠুকেছে ঘনাদার তক্তপোশটাই চাপড়ে, "দুর্যোধন অমন গবেট না হলে তুলো ধোনা হত পাণ্ডবেরা।"

"তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা!" শিশির আর গৌর যেন অর্জুনের গাণ্ডীব আর ভীমের গদা-ই হাতে নিয়ে হুংকার দিয়েছে, "কে তুলোধোনা করত, কে? দুর্যোধনের নিরানব্বই-এর বদলে আরও নশো নিরানব্বইটা ভাই থাকলেও তাতে কুলোত না।"

"দুর্যোধনের ভাইদের আবার ডাকা কেন?" আমি গলায় একেবারে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে বলেছি, "তাদের মাঠে নামবার দরকার হত না। গ্যালারিতে বসেই তারা

ফাইন্যাল দেখতে পেত। দেখত কর্ণ—হ্যাঁ, একা সূতপুত্র কর্ণ কেমন করে কুরুক্ষেত্রের কাঁকুরে মাটিতে পাঁচ ভাই পাণ্ডবের নাকগুলো ঘসে দেয়। নেহাত দুর্যোধন নিজের আহাম্মুকিতে রেফারিকেই খচিয়ে দিলে তাই।"

কথাগুলো বলতে বলতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে অবশ্য নজর রেখেছি। এত পাঁয়তারা যে জন্য কষা সে মতলব একটু হাসিল হচ্ছে কি?

কোথায়—

ঘনাদা তাঁর কাশীরাম দাসের বিরাট গন্ধমাদনটি সামনে খুলে ধরে শোলোক আওড়ানো থামিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে যেন তাঁর এই টঙের ঘরেই আর নেই। দেহটা শুধু ফেলে রেখে কুরুক্ষেত্রেই বুঝি চরতে গেছেন।

তা গেছেন, যান। ফিরতে যাতে হয়, তার জন্য নারাচ, নালিক, পাশুপত থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত সবরকম অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আজ আমরা আসিনি।

দু-এক সেকেন্ডের ফাঁক যা পড়েছিল রেফারি কথাটার খেই ধরে তা ঢেকে গৌর খিঁচিয়ে উঠল "রেফারি! রেফারি আবার কে?"

"রেফারি কে জানো না!" সঙ্গে সঙ্গে শিবুর টিটকিরি আর আমার নব মহাভারত পাঠ শুরু।

শিশির আর গৌরের দিকে চেয়ে কানমলা দেওয়া গলায় বললাম, "মহাভারতটাও পড়িসনি! শোন তা হলে—

মহাভারতের কথা কী কহিব আর।
কী হলে যে কী হইত অন্ত পাওয়া ভার ॥
দুর্যোধন দুর্ভাগার মতিচ্ছন্ন হইল।
পদতল ছাড়িয়া বুদ্ধু শিয়রে বসিল ॥
তাই না চটে চতুর কৃষ্ণ গাড়োয়ান হইয়া।
পাণ্ডু বয়েজ টিমকে দিলেন ম্যাচটা জিতাইয়া ॥
চালের ভুলে রুষ্ট যদি না হতেন রেফারি।
কুরুক্ষেত্রে যায় কুরুরা পেনাল্টিতে হারি ? ॥

ঘনাদার দিকে চোখ রেখেই পদগুলো আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু শুভলক্ষণ কিছু দেখলাম না। ঠিক কুরুক্ষেত্রে না থাকলেও এখনও হস্তিনাপুর ছেড়ে তিনি আসতে প্রস্তুত নন মনে হল।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট। বনোয়ারি তখন ঘরে ঢুকে ঘনাদার সামনে খাস্তা কচুরির আর অমৃতির প্লেট দুটো ট্রে থেকে নামিয়ে রাখছে।

ঘনাদার মুখের ভাব দেখে মনে হল এবারে তাঁর হস্তিনাপুরের প্রবাস থেকেই তিনি আনমনে সে প্লেটে হাত বাড়াতে দেরি করবেন না।

ব্রহ্মাস্ত্রটা চটপট তাই প্রয়োগ করতে হল এবার।

ঘনাদার লুব্ধ হাত প্লেটে এসে পৌঁছবার আগেই দুদিক থেকে গৌর ও শিবু চক্ষের নিমেষে দুটি প্লেট তুলে নিয়ে বনোয়ারিকে ধমকে উঠল "কী, হচ্ছে কী এসব! যখন

তখন খাবার দিলেই হল! এখন এসব কে আনতে বলেছে!”

বনোয়ারি অভিনেতা নয়। আগে থাকতে অনেক শেখানো পড়ানো সত্ত্বেও গৌর শিবুর ধমক খেয়ে সে সব ভুলে তোতলা হয়ে গিয়ে দুবার শুধু ‘হামি হা...মি...তো’ গোছের কিছু একটা উচ্চারণ করল। আমাদের মতলব হাসিলের পক্ষে তাই কিন্তু যথেষ্ট।

ঘনাদার মুখের চেহারাটা তখন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশো পঁচাত্তরের বাহাত্তর নম্বরে এসে পড়ার জন্যই বোধহয় বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

আর যাই হোক এরকম একটা অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতেই পারবেন না জেনে মতলবটা ভাঁজা হয়েছিল।

কচুরি অমৃতির প্লেট দুটো বনোয়ারির ট্রেতে তুলে তাকে চলে যাবার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ যা হবার হল।

ঘনাদা অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে এতক্ষণে যেন আমাদের সম্বন্ধে সচেতন আর বনোয়ারির প্রতি করুণাময় হয়ে উঠলেন, “আহা, বেচারাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? আবার তো সেই আনতেই হবে ওকে!”

“ওগুলো রেখে যেতেই বলছেন!” আমাদের গলায় একটু মৃদু প্রতিবাদের সুরই ফোটালাম, “কিন্তু আমাদের জরুরি কথাগুলো...”

“কী তোমাদের জরুরি কথা বলো না!” ঘনাদা বনোয়ারির হাত থেকে পুরো ট্রেটা একরকম কেড়ে নামিয়ে নিলেন, “এগুলোর তো আর গলা নেই যে গোলমাল করবে। বলে ফেলো কী তোমাদের জরুরি কথা!”

ঘনাদার শেষ কথাগুলো মুখে ঠাসা কচুরি ভেদ করে একটু জড়ানো অবস্থাতেই বার হল। আবার পাছে মুখের গ্রাস ফসকে যায় এই ভয়ে তিনি তখন প্রায় দুহাতে কচুরি আর অমৃতি মুখে বোঝাই করছেন।

তা যা করেন, করুন। আমরা এতদিনে তাঁকে বাগে পেয়েই খুশি। বেশ একটু জমিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, “জরুরি কথাটা কী, তা এখনও বোঝেননি? শুনুন না ওই আহাম্মকের কথা। বলে কিনা কৌরবরা কিছুতে হারত না!”

আহাম্মকেরা মানে শিশির আর গৌর। তারাও ঠিক সিনেরিও মাফিক ঝাঁপিয়ে উঠল—“কখনও হারত না, কিছুতেই হারত না।”

“শুনলেন? শুনলেন তো!”—একটা জমজমাট বৈঠকের আশায় জ্বলজ্বলে চোখে ঘনাদার দিকে তাকালাম—“এই ওদের মহাভারতের বিদ্যের দৌড়! কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের জিৎ নাকি হতই! আপনিই বলুন তো ঘনাদা!”

ওই উসকানিটুকু দিয়েই আমরা চুপ। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতে মচমচে অমৃতি চিবানোর শব্দ ছাড়া ঘরে আর আওয়াজ নেই। যে খেইটা জুগিয়ে দেওয়া গেছে তা থেকে কী গুলগল্পর গালিচা ঘনাদা বুনে তোলেন তা দেখবার জন্য আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু ঘনাদা অমন করে শোধ নেবেন তা কি জানি! শোধ তাঁর মুখের খাবার সরিয়ে নিয়ে তাঁকে দাগা দেবার।

গালচের আশা একেবারে খঞ্চেপোশে কুঁকড়ে দিয়ে ঘনাদা যেন মর্স কোডে জানালেন, "তাই!"

"তাই! কী তাই?" আমরা যেমন হতাশ তেমনই অস্থির। "পাণ্ডবদের জিৎ হত-ই বলতে চান?"

"হ্যাঁ।" এবার ঘনাদার সংক্ষিপ্ত সরল জবাব।

"দুর্যোধন যদি দলে টানতে গিয়ে ঘুমন্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে না বসে পায়ের দিকে বসত তবুও?" আমরা শেষ আশায় যেটুকু সাধ্য চাগাড় দিলাম।

"যদি কেন, পায়ের দিকেই তো বসেছিল দুর্যোধন!" ঘনাদা এতক্ষণে বোমাটি ছাড়লেন।

"পায়ের দিকেই বসেছিল দুর্যোধন?" চোখগুলো যতটা পারি ছানাবড়া করে বললাম, "কিন্তু মহাভারতের কোথাও তো নেই! পায়ের বদলে মাথার দিকেই দুর্যোধন বসেছিল বলে তো লেখা আছে।"

"লেখা আছে যা তাও ঠিক!"

"তাও ঠিক?" ঘনাদার ধাঁধায় এবার একটু কাবু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "পায়ের দিক মাথার দিক হয় কী করে?"

"হবার কারণ অতি সোজা!" ঘনাদার মুখে যেন একটু অনুকম্পার হাসি, "শ্রীকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যে উলটে শুয়েছিলেন বলেই পায়ের দিকটা মাথার দিক হয়ে গিয়েছিল।"

"ঘুমের মধ্যে উলটে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ?" এবার আর আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

"হ্যাঁ, উলটে শুয়েছিলেন।" ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, "দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনই গড়িমসি আলসেমিও তার ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ের দিকেও তেমনই একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত সে পায়ের দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুশকিলে। তাঁর তো কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উলটোটা করেছে জেনে, আর কোনও উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠে পড়ার ভান করে উলটে শুলেন।

দুর্যোধন আহাম্মক নয়, কিন্তু অহংকারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উলটে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মতো রাজাগজাকে পায়ের দিকে রাখতে বাধছে। এই দম্ভেই হল তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না!"

"কিন্তু?" আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব কথা মহাভারত থেকে

সরালে কে? সেই আপনার ভীমসেন দারুক আর বনবরা মার্কা মূষিক কোম্পানি?"

"না।" ঘনাদা বনোয়ারির সদ্য এনে হাজির করা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন, "এ বৃত্তান্ত সরাবার দরকার হয়নি, কারণ লেখাই হয়নি মহাভারতে।"

"লেখাই হয়নি!" আমরা সত্যিই তাজ্জব—"কেন?"

"কেন জানতে চাও?" ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে রামটান দিয়ে তার ধোঁয়ার সঙ্গেই চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

এ ধ্যান কি ভাঙবে?

আমরা গরুড়পক্ষী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

ধ্যান শেষ পর্যন্ত ভাঙল আর চক্ষু উন্মীলন করে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তিনি ত্রিকালদৃষ্টির যে নমুনা দেখালেন তাতে আমরা হাঁ।

"কেন লেখা হয়নি তা," সামনের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে সিগারেট-ধরা আঙুল দুটোই উঁচিয়ে তিনি বললেন, "ওই ওর তস্য তস্য আদি সপ্তশত সংঘ-ভ্রাতা হয়তো বলতে পারত!"

মাথাগুলো তখন ঘুরতে শুরু করেছে। ঘোরার আর অপরাধ কী? সংঘ-ভ্রাতা, তস্য তস্য, আদি সপ্তশত—এ সব কী বলছেন ঘনাদা! আর বলছেন কিনা ওই সেদিনের চুনকাম-করা সাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে!

ওখানে ও সব বলে সম্বোধন করছেন কাকে?

যাকে করছেন অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করা গেল এরপর। আবিষ্কার যা করলাম চক্ষু তাতে চড়কগাছ। ঘনাদার দিকে ফিরে হতভম্ব হয়েই তাই বলতে হল, "ওখানে তো একটা শুধু সুড়সুড়ে পিঁপড়েই দেখছি!"

"হ্যাঁ, ওই।" ঘনাদা ধ্যাননিমীলিত হয়েই বললেন।

"হ্যাঁ, ওই! সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ওরই কী বললেন, তস্য তস্য সার্ধতিনসহস্র-আদি—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ!" ঘনাদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জ্ঞান দিলেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, "কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের আগে-পরে যা যা হয়েছে দিব্যদৃষ্টিতে সবই ব্যাসদেবের জানা। তিনি রেখে ঢেকে কিছু বলবার মানুষ নন, আর যত ঝড়ের বেগেই বলুন, গণেশঠাকুরের শর্টহ্যান্ডে তা ধরা না পড়েই পারে না। তবু যে মহাভারত থেকে ওই মোক্ষম খবরটুকু বাদ পড়েছে, তার মূল হল ওই সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ও মানে, ওরই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তস্য তস্য কোনও বাসাতুতো ভাই। পরমায়ু ওদের চার থেকে সাত বছরের বেশি নয় বলে গড়পড়তা হিসেবে আদি সপ্তশত সংঘ-ভ্রাতা বলছি। কথায় কথায় বুকের মধ্যে যিনি বিশ্বরূপ দেখান, বিশ্বচরাচর যাঁর রেফারিগিরিতে চলে, সেই চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণ তাঁর মান বাঁচাতে ওই সামান্য পিঁপড়েটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। পিঁপড়ে তো নয়, ও আদি কীটাবতার, একাই পৃথিবীর প্রথম পঞ্চমবাহিনী।"

ঘনাদা থামলেন। আমাদের ধরা গলায় আর টুঁ শব্দটিও নেই দেখে ঘনাদা শেষ জ্ঞানটুকুও দিলেন।

“দুনিয়া যাঁর নখের টেলিভিশনে, কোথায় কী হচ্ছে তা তো আর তাঁর জানতে বাকি থাকে না। দ্বারকায় বসেই তিনি টের পেলেন, ব্যাসদেব তাঁর কপট নিদ্রার বৃত্তান্ত এবার বলতে শুরু করছেন। গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, সড়সড় করে কলম চলছে গণেশ ঠাকুরের, এমন সময় লেখার চৌকির ওপরই গড়িয়ে রাখা গণেশ ঠাকুরের শুঁড়টা সুড়সুড়িয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও সামলাতে পারলেন না গণেশ ঠাকুর। দুর্দান্ত একটি হ্যাঁচ্চোতে পুঁথির পাতা উড়ল, কলমও থামল ক-টি পলকের জন্য। আবার যখন চলল ব্যাসদেবের ডিকটেশন, তখন কেষ্টঠাকুরের কারসাজি পার হয়ে গেছে।”

বেড়াজালে ঘনাদা

চিলের ছাদে কীসের আওয়াজ?

কীসের আর, একজোড়া বিদ্যাসাগরি চটির।

বিদ্যাসাগরি চটির আওয়াজ তারপর চিলের ছাদের ওপর থেকে খোলা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়।

চটির আওয়াজ গোড়ার দিকে যা ছিল, নীচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে আস্তে হয়ে আসবে।

বারান্দায় এসে তা একেবারে থেমে যাবে কি?

না। একেবারে থামবে না, তবে এখন আওয়াজটা হবে যেমন নিচু তেমনই আবার আস্তে। সে চটাপট চটাপট আর নেই, এখন ক্ষীণ একটু চট, এরপর পটটা অনেক দেরি করে শোনা যাবে।

কেউ যেন থতমত খাওয়া পা দুটো কেমন হতভম্ব হয়ে কোনও রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগরি চটি-পরা হতভম্ব হয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া পা জোড়া কার?

তা কি আবার বলে দিতে হবে?

হ্যাঁ, বুঝতে যা কারও বাকি নেই ব্যাপারটা তাই—ও বিদ্যাসাগরি চটি-পরা পা জোড়া স্বয়ং ঘনাদার।

তা, তিনি তাঁর টঙের ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের খোলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দায়

এসে অমন থতমত খাবেন কেন? আর তারপর কেমন হতভম্ব হয়ে যেন পা টেনে টেনে যাওয়ার কারণই বা কী?

কারণ গুরুতর। ঘনাদা ভোরবেলা উঠে তাঁর নিজের রুটিনমাফিক সব কিছু করার মধ্যে তেমন খেয়াল হয়তো না করতে পারেন, কিন্তু টিকে ধরিয়ে তামাকটি সেজে তাতে সুখটান দেবার জন্য তৈরি হয়ে বেশ একটু অবাক হবেন।

তাঁর তামাক সাজা শেষ হবার আগেই তো বনোয়ারি বাহাদুরের ভালমন্দ কিছু সমেত ধূমায়িত চায়ের পট পেয়ালার ট্রে নিয়ে হাজির হবার কথা। এখনও তার দেখা নেই কেন?

একটু খেয়াল করার পর নীচেটা কেমন যেন ঠাণ্ডা বলেও মনে হবে। সকালবেলার নিয়ম মাফিক সাড়া-শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে না।

আরও মিনিট কয়েক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে ঘনাদাকে চিলের ছাদে বেরিয়ে আসতে হবে। সেখান থেকে গম্ভীর গলায় ডাকও দিতে হবে বনোয়ারি বলে।

তাতেও কোনও সাড়া মিলবে না।

এবার বেশ একটু চিন্তিত হয়ে ঘনাদাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে আশ্চর্য ব্যাপারটার খোঁজ নেবার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দা পর্যন্ত নামবার পরই কিন্তু চক্ষুস্থির।

বৈঠকিঘরের দরজা বন্ধ শুধু নয়, তার কড়ায় মজবুত একটা তালা এঁটে ঝোলানো।

এই দৃশ্য দেখবার পর হতভম্ভ হয়ে পা টেনে চলার আর অপরাধ কী? ঘনাদা ওই অবস্থাতেই সমস্ত বারান্দাটা পার হয়ে নীচে রান্না আর খাবারঘর পর্যন্ত ঘুরে আসবেন নিশ্চয়।

সব দরজায় তালা ঝুলছে, মায় রান্না ভাঁড়ার খাবারের ঘরে পর্যন্ত।

কী হল হঠাৎ বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের? রাতারাতি কোনও যখ কি জিন ভোজবাজিতে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে নাকি? হঠাৎ মাঝরাতের কোনও হামলার ভয়ে সবাই একসঙ্গে বাড়ি ছাড়া?

তা হলে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঘনাদা কিছু টের পাননি কেন?

এরকম দিশাহারা অবস্থায় কী করবেন এখন ঘনাদা এই খাঁ-খাঁ শূন্য পুরীতে?

সেইটেই দেখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।

এবার আর শুধু মনে মনে কল্পনা করা নয়, পুরোপুরি ব্যাপারটা ঘটাবার জন্য যা কিছু দরকার তার কোনওটা বাদ দিইনি। রামভুজ আর বনোয়ারিকে সাচ্চা ঝুট নানা রকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মাঝরাতেই চুপি চুপি বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে রাতটা অন্য কোথাও কাটাতে রাজি করিয়েছি, নীচের রান্নাঘর ভাঁড়ার-খাবার-ঘর সমেত ওপরে বৈঠকিঘর নিয়ে আমাদের সকলের সব ক-টা ঘরের তালা জোগাড় করবার ব্যবস্থা করেছি আর ঘনাদার নাজেহাল অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য নিজেদের মধ্যে লটারি করে একজনকে শেষ তালাটা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য বাছাই করতেও ভুলিনি।

লটারিতে এ দুর্ভাগ্যটা শিশিরের ওপরই পড়েছে। লটারিতে ফাঁকি আছে বলে

গোড়ায় বেশ একটু বেয়াড়াপনা করলেও এ ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত শিশিরকে মেনে নিতে হয়েছে। বনোয়ারি আর রামভুজ চলে যাবার পর, আমাদের বাকি সকলকে এক এক ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে, শিশির বাইরে কোথাও গিয়ে রাতটা কাটিয়ে সকালে এসে আমাদের খালাস করবে এই হল ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা একটু অন্যায় বলে মনে হচ্ছে কি?

ঘনাদাকে জব্দ করার দিক দিয়ে একটু হয়তো বাড়াবাড়ি আছে ব্যবস্থাটায়, তবু তার জন্য নিজেদের খুব বেশি দোষ কি দিতে পারি?

যা জ্বালান তিনি জ্বালাচ্ছেন কিছুদিন ধরে তাতে একটু দাওয়াই তাঁকে না দিলে নয়। আর যদি দিতেই হয় তা হলে কোনও কাজ যাতে হবে না এমন জাদুর গায়ে হাত বুলোনো গোছের দাওয়াই দিয়ে লাভ কী! তাঁর ওল যতখানি বুনো, আমাদের তেঁতুলও তাই ততখানি বাঘা।

এমন বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর তোয়াজ করতে কি কিছু বাকি রেখেছি? বুঝিয়েছি, মিনতি করেছি, ঘুষও দিয়েছি যতখানি সম্ভব দুটি বেলা, শুধু বাঁকা ঘাড়টা অন্যদিকে একটু হেলাবার জন্য।

"কী বাহার ছাদটার হবে দেখবেন, ঘনাদা!" শিবু তাঁকে লোভ দেখিয়েছে, "দরজা খুলেই দেখবেন যেন ফুলের দেওয়াল। আর তার সঙ্গে কী সব পাখির মিষ্টি ডাক। বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে আছেন তাই ভুলে যাবেন।"

"আর আপনার খোলা ছাদ ঢাকা তো পড়ছে না।" শিশির বুঝিয়েছে, "শুধু মিহি তারের জাল দিয়ে সামনেটা ঘেরা থাকবে।"

এসব শুনতে শুনতে কী করেছেন ঘনাদা? যেন কানেই যাচ্ছে না এমন ভাবে নিজের গড়গড়ার নলে টান দিতেই তন্ময় হয়ে থেকেছেন?

না। তা থাকেননি বলেই তো মুশকিল। তাঁর কালা বোবা সাজার প্যাঁচ আমাদের জানা। তা কাটাবার উপায়ও আছে অনেক রকম।

কিন্তু এবার ঘনাদা যে নতুন চালাকি ধরেছেন! যেন উৎসাহভরে খোঁজ নিয়েছেন আমাদের ওই খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'প্রকল্পের'।

"ও! ছাদটাকে তোমরা ফুলের বাগান আর চিড়িয়াখানা বানাতে চাও?" যেন সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছেন, "তার জন্য লোহার জাল-টাল দিয়ে সব ঢেকে দেবে?"

"না, না—সব ঢাকব কেন?" আমাকেই মৃদু প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে, "ওই উত্তরের আলসের ওপর দুটো খুঁটি বসিয়ে তাতে লোহার খানিকটা জাল টাঙাব, আর তার নীচে শুধু একটা লম্বা খাঁচা থাকবে জালের। টাঙানো জালে ফুলের লতা উঠবে আর খাঁচায় থাকবে দুর্গা, টুকটুকি, ফুল-চুকি, মুনিয়া গোছের ক-টা পাখি।"

"খুব ভাল কথা!" ঘনাদা যেন আগ্রহই দেখিয়েছেন।

আর তখন আমাদের পায় কে? উৎসাহভরে আমাদের পেটে যা ছিল সব কিছু ঘনাদার কাছে উজাড় করে দিয়েছি।

"আমাদের ভাগ্যে যে এখন মণিকাঞ্চন যোগ!" বলেছে শিশির।

"শিবুর এক মামা এসেছেন আলিপুর হর্টিকালচারাল গার্ডেনে কাজ নিয়ে।"—

আমি ব্যাখ্যা করেছি, "আর গৌরের এক কাকা পেয়েছেন শহরে নতুন এক এভিয়ারি খোলার ভার।"

"এই দুজনের ভরসাতেই আমাদের এই মিনি বাগান বানাবার শখ।" বলেছে গৌর।

আর শেষ জোরালো যুক্তিটা জানিয়ে শিবু বলেছে, "এমন সুযোগ তো আর রোজ রোজ মেলে না!"

"ঠিক! ঠিক!" ঘনাদা শিবুর যুক্তিতেই যেন পুরোপুরি কাত হয়ে বলেছেন, "তা এতই যখন করছ তখন আমারও কিছু সাধ যদি মেটাতে—"

"মেটাতাম মানে!" আমরা সবাই তখন একবারে এক পায়ে খাড়া—"বলুন-না কী চান? আপনার সাধ তো আমাদের কাছে হুকুম! সবার আগে সে সাধ না মেটালে বাগানই বাতিল।"

আমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসেই যেন ভরসা পেয়ে ঘনাদা এবার তাঁর বাসনাটুকু জানিয়েছেন।

"বেশি কিছু নয়," একটু যেন দ্বিধাভরেই বলেছেন ঘনাদা, "তোমাদের ওই সব পাখির সঙ্গে আমার পছন্দের দুটো পাখি রাখতে বলছি। তার একটার জন্য অবশ্য একটু স্পেশাল জাল লাগবে!"

"তা লাগুক-না যা লাগবার।"—আমরা তাঁকে ঢালাও আশ্বাস দিয়েছি—"কোনও ভাবনা নেই আপনার। বাজারের একেবারে সেরা জাল আমদানি করব দেখবেন, এখন পাখি দুটো কী বলুন।"

ঘনাদা পাখি দুটোর নাম-গোত্র সব জানিয়েছেন এবার।

"একটাকে পাহাড়ি লৌয়া বলতে পারো," ঘনাদা বিস্তারিত পরিচয়ই দিয়েছেন, "পোশাকি নাম হল ওফ্রিসিয়া সুপারসিলিওসা, আর অন্যটাকে গুণগুনিয়া বলা যায়, পোশাকি নাম হল, মেল্লিসুগা হেলেনি।"

"ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না।" গৌর পকেট থেকে নোটবই বার করে পোশাকি আর ডাক নাম টুকে নিতে নিতে জোর গলায় জানিয়েছে, "আগে আপনার পাখির ব্যবস্থা করে তার পরে বাগানের কাজ শুরু।"

ঘনাদাকে অত সহজে রাজি করতে পেরে হাতে একেবারে চাঁদ পেয়ে যেদিন নেমে এসেছিলাম, সেইদিনই ঘণ্টা দুয়েক বাদে সবাই চোখে অমন অন্ধকার দেখব তা কি জানতাম!

অন্ধকার দেখলাম গৌরের কথা শুনে।

ঘনাদার আবদার নোটবই-এ টুকে নিয়ে গৌর ছুটেছিল তার পক্ষীতত্ত্ববিদ কাকার কাছে।

সেখান থেকে ফিরে আসার পর তার মুখের চেহারা দেখেই আমরা সন্ত্রস্ত। ভগ্নদূতের পার্ট করতে হলে তার কাছে কিছু শেখা যায়।

গৌরের মুখে প্রথমে কোনও কথাই নেই।

"ব্যাপার কী?"—জিজ্ঞাসা করতেই হল উদ্বিগ্ন হয়ে—"ঘনাদার পাখি পাওয়া যাবে

তো?"

"না।" উত্তর নয়, গৌর যেন একটি হাত-বোমা ছাড়ল।

"পাওয়া যাবে না মানে?" তবু শেষ আশাটুকু আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঘনাদা বাজে গুল ছেড়েছেন? যা চেয়েছেন সেরকম কোনও পাখি দুনিয়ায় নেই?"

"না, আছে ও ছিল!" গৌরই হেঁয়ালি ছাড়ল।

"তার মানে?" খিঁচিয়ে উঠতে হল আমাকেই, "এখন কী তামাশার সময়?"

"তামাশা করছি না।" গৌর প্রায় করুণ হয়ে বোঝাল—"সত্যিই যা বলেছি, তা-ই। উনি যা বায়না ধরেছেন তার একটা পাখি থেকেও নেই, আর অন্যটা এককালে ছিল, কিন্তু এখন নিপাত্তা। দুটোর কোনওটাই তাই জোগাড় করা অসম্ভব।"

আমাদের খোঁচাখুঁচিতে এরপর গৌর সবিস্তারে যা বোঝালে তাতে আমরা সত্যিই অকূল পাথারে।

ঘনাদা যে দুটি পাখি চেয়েছেন, তার মধ্যে গুনগুনিয়া বা মেল্লিসুগা হেলেনি নিপাত্তা নয়। দুনিয়ায় এ পাখিটা যথেষ্ট সংখ্যাতেই আছে। তবে আমাদের ভারতভূমিতে তো নয়ই, সমস্ত এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকাতেও নেই। এ পাখিটিকে পাওয়া যায় শুধু মাত্র আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের মাঝামাঝি অঞ্চলে। গুনগুনিয়া এর নামও নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট প্রায় একটা ভোমরার মতো খুদে এ পাখির চলতি নাম হামিংবার্ড। ঘনাদা তাই থেকে গুনগুনিয়া বানিয়েছেন। ঘনাদার দ্বিতীয় পাখিটি কিন্তু দুনিয়াতেই আর আছে কি না সন্দেহ। পাখিটি আমাদের দেশের হলেও আঠারোশো ছিয়াত্তরে শেষ পর্যন্ত একবার নৈনিতালের পাহাড়ি জঙ্গলে পাবার পর আর কেউ এ পর্যন্ত এ পাখি কোথাও দেখেনি। পাহাড়ি লৌয়া নামটাও হয়তো ঘনাদারই দেওয়া। পাখিটি কিন্তু নির্বংশ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

গৌরের এ বিবরণ শুনে সবাইকে এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়েছে।

ঘনাদা যে ল্যাংটি মেরেছেন, তারপর কী আমাদের করা উচিত?

সোজা তাঁকে গিয়ে অবশ্য চেপে ধরতে পারি, আজগুবি অন্যায় আবদার করেছেন বলে।

কিন্তু তাতে নিজেরা গবেট বলে ধরা তো পড়বই, তার ওপর হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ?

তার চেয়ে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির প্যাঁচই ভাল। আমরা যে ডাহা উজবুক বনেছি তা বুঝতে না দিয়ে ঘনাদার আবদারটা কোনওরকমে পালটে দেবার ফিকিরে থাকা।

সেই ফিকিরেই তোয়াজ সাধাসাধি ঘুষ কিছু আর বাকি রাখিনি। সেদিন বিকেলেই বনোয়ারির সযত্নে বয়ে-আনা জোড়া কবিরাজি কাটলেটের প্লেট তাঁর হাতে ধরিয়ে বলেছি, "মিস্ত্রিদের শনিবারই তা হলে কাজ শুরু করতে বলে দিই? কী বলেন?"

"শনিবারই কাজ শুরু করতে চাও বুঝি?" ঘনাদা কাটলেট জোড়ার সদ্ব্যবহার করতে করতে যেন ভাববার সময় নিয়েছেন।

তারপর চাঁছাপোঁছা প্লেটটি ট্রের ওপর রেখে চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়িয়ে

জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমাদের সব জোগাড়-যন্ত্র হয়ে গেছে বুঝি?"

"তা একরকম হয়ে গেছে!" গৌর অম্লান বদনে বলেছে, "একটু শুধু অদলবদল হয়েছে আগের ফর্দের!"

"অদলবদল!" ঘনাদা চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়েছেন।

"হ্যাঁ।" গৌর যেন তাঁর কোঁচকানো ভুরু জোড়া লক্ষ না করেই বলেছে, "ওই আপনার গুনগুনিয়া আর পাহাড়ি লৌয়া-র বদলে আরও ভাল পাখির ব্যবস্থা করেছি।"

"আরও ভাল পাখি!" ঘনাদার মুখ এক মুহূর্তেই একেবারে আষাঢ়ের মেঘ। জোড়া কাটলেটের খুশির বাষ্পও সেখানে নেই।

কিন্তু এখন সে দিকে কালা-কানা না সেজে উপায় কী? গৌর তাই যেন বাহাদুরি জানাতে বলেছে, "ভাল বলে ভাল! আপনার ওই গুনগুনিয়ার বদলে তুরপ আনাচ্ছি। মেল্লিসুগা হেলেনির বদলে মুস্কিকাপা পার্ভা।"

অনেক কষ্টে কাকার কাছ থেকে মুখস্থ করে আসা নাম দুটো বলে গৌরকে থামতে হয়েছে। ঘনাদার মুখে আর তখন কথাই নেই।

গৌর ততক্ষণে পরের মুখস্থ নাম দুটোও মনে মনে আউড়ে নিয়ে গড়গড় করে বলে গেছে, "আর আপনার ওই পাহাড়ি লৌয়া-র বদলে আনছি চানক। ওফ্রিসিয়া সুপার সিলিওসার জায়গায় কোটরনিক্স কোরামাণ্ডালিকা।"

"হুঁ," যেন পাতাল গুহা থেকে আওয়াজ বেরিয়েছে এবার, "তা অত কষ্টই বা করা কেন? তোমাদের চিড়িয়াঘরে তোমাদের পাখি-ই থাক। ভালমন্দ কোনও পাখিরই আমার দরকার নেই।"

এই থেকে শুরু হয়ে একেবারে ছক-বাঁধা ধাপে ধাপে ঠাণ্ডা লড়াই তারপর এগিয়ে গেছে। প্রথমে আমাদের আড্ডাঘরে আসা বন্ধ, তারপর নিজের ঘরে রামভুজকে দিয়ে দুবেলার খাবার আনানো, তারপর বনোয়ারি মারফত বার্তা প্রচার।

"হামাকে তো এক গো লরি বন্দোবস্ত কোরতে বোলিয়েছেন বড়াবাবু!"

পরের দিন বিকেলে আড্ডাঘরে চা দিতে এসে বনোয়ারির বিহ্বল করুণ অসহায়তা প্রকাশ।

"লরি! লরি! কী হবে বড়বাবুর?" আমার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

"আঃ! লরি কী হবে বুঝলে না?" শিবুর জ্ঞান দান—"বড়বাবু দুর্জন সংসর্গ ত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন।"

"তা করতে চান করুন।" গৌর এবার খাপ্পা—"কিন্তু তার জন্য লরি কী হবে? ওঁর যা অস্থাবর তার জন্য একটা টেম্পোও তো লাগে না। টঙের ঘরখানাই উনি লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন নাকি? বেশ, তাই যেন যান, আর যত তাড়াতাড়ি হয়।"

রাগের অভিমানের হলকাটা গৌরের মুখ দিয়ে বার হলেও আমাদের সকলের মনের কথাটা তখন এক।

হামেশা ভারী ভয় দেখান আমাদের ছেড়ে যাবেন বলে। কথায় কথায় এ হুমকি আর সহ্য হয় না। ছেড়ে যাওয়ার মজাটা ওঁকে বোঝানো দরকার।

বোঝাবার সেই পণ থেকেই এ কাহিনীর গোড়ার পরিকল্পনার জন্ম। সে পরিকল্পনা অমন বেয়াড়া ভাবে ভেস্তে যাবে তা কি জানি! জোর করে বলা যায়, আমাদের কোথাও গলতি কিছু হয়নি। যেমন ছকা হয়েছিল পরিকল্পনাটা ঠিক সেই লাইন ধরেই এগিয়েছে। রাত ভোর না হতে রামভুজ আর বনোয়ারিকে আগে বিদেয় করে শিশির আমাদের ক-জনকে আড্ডাঘরেই তালা বন্ধ করে, অন্য সব কামরাতেও সেই সঙ্গে তালা লাগিয়ে বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

বাড়ি ছেড়ে গেলেও বেশি দূরে কোথাও সে যাবে না। সকালে ওঠবার পর খাঁ খাঁ বাড়িতে ঘনাদার একটু উচিত শিক্ষা হবার পরই ফিরে এসে আমাদের তালা খুলে বার করবে।

শিশির যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে তালা এঁটে চলে যাবার পর থেকেই আমরা একেবারে কান খাড়া করে সজাগ।

কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন, ছাদের সিঁড়িতে ঘনাদার সেই ভয়ে ভাবনায় নামা পায়ের আওয়াজ কই?

ঘনাদার খাওয়া শোয়া ওঠা বসা সব তো একেবারে ঘড়ি ধরা। আজ তাঁর সেই ঘড়িই বিকল হয়ে গেল নাকি? তাঁর এতটুকু সাড়া-শব্দও নেই।

না। আছে। ওই তো চিলের ছাদে তাঁর বিদ্যাসাগরি চটির কেমন একটু অধৈর্যের চটপট ফটফট। তারপর খোলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে অধৈর্যের আওয়াজটা একটু দ্বিধা-সংশয়ে ঢিমে হয়ে আসা।

তারপর ঠিক যেমনটি কষে রাখা হয়েছিল, ঘনাদার পদধ্বনি একেবারে সেই ছন্দে মেলানো।

বারান্দায় নেমেই চটপটের জায়গায় চটি জোড়ায় যেন একটু ঘসটে চলা। ঘনাদা এখন হতভম্ব হয়ে তালাগুলো দেখছেন নিশ্চয়।

আড্ডাঘরের সামনে থেকে যেন নেহাত দিশাহারা হয়ে পরের কামরাটা পর্যন্ত পা দুটো টেনে নিয়ে যাওয়া।

তারপরই সভয়ে আবার ওপরের দিকে ছুটের উপক্রম।

"কী, ব্যাপার কী, ঘনাদা!"

ঠিক একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে সেই মুহূর্তে নীচের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শিশিরের যেন বিস্মিত সম্ভাষণ।

সেই সঙ্গে ঝটপট তালা খুলে দেওয়ার সঙ্গে আমাদেরও ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘনাদাকে ঘিরে ধরা।

"এ কী! আপনি এমন সময় এখানে!" আমাদের কেমন একটু সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

হাতে হাতে ধরা পড়ে এবার ঘনাদা একেবারে বেড়াজালে ঘেরা।

কোনও দিকে কোনও ফাঁক নেই পিছলে বার হবার। কী করবেন এখন, কী বলবেন?

ঘনাদা কিন্তু বললেন। যা বললেন, তাতে সবাই আমরা হাঁ। আমরা তাঁকে লজ্জায় ফেলব কি, তিনিই আমাদের অভয় দিলেন।

"না, আর কোনও ভয় নেই।" ঘনাদার দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকে গলার স্বরে পর্যন্ত পরম বরাভয় আশ্বাস। আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রশস্তি—"খুব ভাল করেছ দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে। ওই তালা দেখেই চলে গেছে।"

এসব শুনে মাথায় চক্কর দেওয়াটা খুব অন্যায় নিশ্চয় নয়। কীসের ভয় ছিল আর কেন তা আর নেই, দরজায় তালা দেখে কে-ই বা চলে যাওয়ায় আমাদের বিপদ কাটল এ সব খোলসা করবার জন্য ঘনাদাকে আর ওপরে যেতে না দিয়ে বৈঠকিঘরেই টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কী করতে পারি তখন?

বনোয়ারি রামভুজের এখনও আসতে দেরি হবে হয়তো, কিন্তু আরাম-কেদারাটা আছে, শিশিরের সিগারেটের টিনও। তাই প্রণামী দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, "দরজায় তালা দেখে চলে গেছে কে?"

"কে আর!" ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে জুত করে টান দিয়ে বললেন, "সেই সেরা দো মার-এর শিকারের আস্তানা থেকে হন্যে হয়ে যে আমায় সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কার্ল পাউলো।"

"কার্ল পাউলো!" নামটা দুবার জিভে সড়গড় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সেই পাউলোকেই আপনার ভয়? তা সে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন! মারবে-টারবে নাকি?"

"হ্যাঁ, পারলে সে আমায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটবে, কিন্তু তার আগে সেরা দো মার-এর ধাঁধাটার উত্তর না বার করতে পারলে শান্তি পাবে না।"

"ওই পাউলোকে একটা ধাঁধা শুনিয়ে তার উত্তর না জানিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন বুঝি!" আমাদের বলতেই হল, "খুব অন্যায় কিন্তু।"

"হ্যাঁ, অন্যায় একদিক দিয়ে তো বটেই।" ঘনাদা স্বীকার করলেন, "তা ছাড়া কার্ল পাউলোর ধারণা, তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

"সত্যি তাই করেছেন নাকি?" আমাদের গলায় অবিশ্বাস।

"হ্যাঁ, যা করেছি তা একরকম বিশ্বাসঘাতকতাই ভাবতে পারে পাউলো। কারণ সে-ই তো আমায় সঙ্গে করে তার নিজের প্লেনে—"

ঘনাদা থামলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফিরিয়ে দেখি দরজায় স্বয়ং শ্রীমান বনোয়ারি হাজির। আমাদের নির্দেশ মতো ভোরটা পার করে দিয়ে রামভুজের সঙ্গে সে যথাসময়েই ফিরে এসেছে।

অবস্থাটা আমাদের পক্ষে একটু অস্বস্তির হতে পারত, কিন্তু গৌর চায়ের সঙ্গে টা হিসেবে টোস্ট, ডবল অমলেট আর পাড়ার বিখ্যাত খাস্তা কচুরির লম্বা ফরমাশ দিয়ে সেটা কাটিয়ে দিলে।

ঘনাদাকে এবার আর উসকে দেবার দরকার হল না। বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন থেকে সোজা কার্ল পাউলো-র প্লেনে গিয়ে উঠলেন আমেরিকার টেক্সাসের ডালাস শহরের এয়ারপোর্টে।

বললেন, "ডালাসের এয়ারপোর্টে আমি পাউলোকে দেখে যতখানি বিব্রত, সে আমায় দেখে ততখানি অবাক আর খুশি।

'আরে দাস! তুমি এখানে কী করছ?' দূর থেকে আমায় দেখেই কাছে এসে পেটে একটা বুলডোজার মার্কা আদরের গুঁতো দিয়ে পাউলো বলল, 'তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

'আমিও পারিনি!' পেটের আচমকা গুঁতোটার ঠেলা একটু কষ্ট করে সামলে নিয়ে বললাম, 'তা এখন চলেছ কোথায়?'

'কোথায় যাচ্ছি দেখতেই তো পাবে!' বলে পাঁচমণি বপুটি কাঁপিয়ে পাউলোর সে কী হাসি!

'আমি দেখতে পাব!' তার লাউঞ্জ-ফাটানো হাসির মাঝখানে বলতেই হল অবাক হবার ভান করে, 'কী বলছ?'

'ঠিকই বলছি।' হাসির মাত্রাটা একটু শুধু কমিয়ে বললে পাউলো, 'তুমি তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ। দেখা যখন হয়েছে তখন আর তোমায় ছাড়ি!'

ছাড়লে না সত্যিই। কার্ল পাউলোর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে ব্রেজিলের আনাকোন্ডার পাক কি অক্টোপাসের নুলোর আলিঙ্গন ছাড়ানো সোজা।

পাউলোর সঙ্গে দেখা হয়ে তারই প্লেনে সঙ্গী হয়ে যাওয়া নেহাত নিয়তির বিধান বলেই মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বেশি আপত্তি করলাম না। নিজের প্লেনের টিকিট আমার পকেটেই রইল, সেইসঙ্গে জুয়ান ভার্গাস-এর চিঠিটাও।

ডালাসের এয়ারপোর্টে প্লেনে চড়তেই আমি এসেছিলাম। তবে সেটা নেহাত সাধারণ প্যাসেঞ্জার প্লেনে, পাউলোর নিজস্ব জেট বিমানে নয়। সে প্যাসেঞ্জার প্লেনে গেলে আমার যা গন্তব্য, সেখানে একটু দেরিই হত ঘুর-পথে পৌঁছতে। কার্ল পাউলো আমার সে কষ্টটুকু যদি জোর করে বাঁচিয়ে দেয়, তা হলে কত আর আপত্তি করা যায়?

নিজস্ব প্লেনটা পাউলো একেবারে বাদশাহি মেজাজে সাজিয়েছে। কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরই সেখানে অভাব নেই। প্লেনে নয়, পাউলোর নিজের বাড়িতেই যেন বসে আছি।

সেই বাদশাহি বিলাসের মধ্যে বসিয়ে প্লেনে যেতে যেতে পাউলো তার নতুন পরিকল্পনার কথা সোৎসাহে আমায় শোনালে।

ব্রেজিলের মাথায় উত্তর-পুব দিকে সেরা দো মার পর্বতমালা। সেই সেরা দো মার-এর দক্ষিণে বিরাট এলাকার সে মালিক। সেখানে সে এতদিন শুধু শিকারে গিয়ে থাকবার একটা আস্তানাই করে রেখে ছিল। এখন সেখানে সে রবারের একটা বিরাট কারখানা বসাতে চায়। মোটর এরোপ্লেন ইত্যাদির টায়ার টিউব থেকে শুরু করে রবারের যা কিছু সম্ভব সব সেখানে তৈরি হবে। ও অঞ্চলে মজুরি সস্তা। দুনিয়ার সেরা বেলেম-এর রবারও কাছেপিঠেই জন্মায়। তা ছাড়া সমুদ্রের কাছে আর আবহাওয়া জুতসই বলে মাল তৈরি আর চালানের অন্য সুবিধেও যথেষ্ট। এমন একটা লোভের পরিকল্পনা শুধু এক তেএঁটে হাড়-বজ্জাতের বদমায়েশির দরুন ভেস্তে যেতে বসেছে।

এতদূর পর্যন্ত শুনে একটু অবাক হবার ভান করে বলতেই হল, 'তাই নাকি?'

'শোনো না আগে!' তার রবারের কারখানায় যে বাদ সাধছে তার ওপরকার রাগটা একটা দুরমুশপেটানো কিলে আমার পিঠেই ঝেড়ে পাউলো বললে, ' কয়েক বছর আগে এ কারখানার কথা যখন মাথায় আসেনি, তখন না বুঝে এক হতভাগা জুয়ান ভার্গাস-কে ওখানকার অনেকখানি জায়গা ইজারা দিয়েছিলাম। সে হতভাগা জুয়ান সেখানে গোরু ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ বসিয়েছে। এখন এত সাধাসাধি করছি, তার ইজারার টাকা ফেরত দিয়ে গোরু-ঘোড়া সমেত সমস্ত র‍্যাঞ্চ কিনে নেব বলছি, তবু সে বদমাশটা কিছুতেই তার দখল ছাড়বে না। ডেকে পাঠালে আসে না। লোক দিয়ে বলে পাঠায় যে রবারের কারখানার চেয়ে গোরু-ঘোড়ার কারবার অনেক পবিত্র জিনিস। প্রাণ থাকতে তার দখল সে ছাড়বে না। এরকম বদমায়েশকে শায়েস্তা করবার সোজা ওষুধ আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে কারখানা বসানোর ব্যাপার নিয়ে ওই জুয়ান-এর সঙ্গে গোলমালের কথাটা রাজধানী ব্রাসিলিয়ার খাস দপ্তরে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খবরের কাগজেও লেখালেখি হয়েছে এই নিয়ে। এখন হঠাৎ ওই বদমাশটার ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে, বড় বেশি জবাবদিহির দায়ে পড়তে হতে পারে। কারখানা তাতে আরও পিছিয়ে যাবে।'

একটু থেমে আমার আগাপাশতলা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার আসল মতলবটা জানালে পাউলো।

গলায় যেন একটু আদর ঢেলে বললে, 'তোমাকে যে পেয়ে গেছি এইটেই আমার ভাগ্য, দাস। তোমায় একটা কাজ আমার করে দিতেই হবে। সেই জন্যই তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

মুখে কিছু না বলে তার দিকে অবাক-হয়ে-চাওয়া চোখেই প্রশ্নটা রাখলাম।

'তুমি প্যাঁচের রাজা।' আমায় তাতিয়ে বললে পাউলো, 'যে কোনও ফিকিরে হোক ওই পাজি জুয়ান ভার্গাসকে তোমায় বাগ মানাতে হবেই।'

'আমাকে!' এবার বিস্ময়ে সরব হলাম।

'হ্যাঁ, তোমাকে!' সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাউলোরও মুখের চেহারার সঙ্গে গলার স্বরটা বদলাল। আগের সে মধু আর নেই।

'না, না, ওসব আমি পারব না!' ইচ্ছে করেই আপত্তিটা বেশ জোর দিয়ে জানালাম, 'আমায় খাতির করে নিয়ে যাচ্ছ, যাচ্ছি। তোমার ওসব ঝামেলায় আমি ঘাড় পাতব কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড একটি রদ্দা।

'ঘাড় পাতবি জান বাঁচাবার জন্য রে কেলে নেংটি!' পাউলোর গলা যেন এবার কার্বলিক অ্যাসিডে মাখানো, 'তোর মতো একটা উচ্চিংড়েকে কি এমনই ধরে নিয়ে যাচ্ছি মনে করছিস! ভুজুং দিয়ে, কি তুরুম ঠুকে, যা করে হোক, জুয়ান ভার্গাস-এর ও ইজারা বাতিল করাতে তোকে হবেই। আর কিছু না পারিস, চুরি করবি ওর সে ইজারার দলিল। কী? বুঝেছিস এবার?'

মাথা নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি। তারপর বেশ যেন ঢিট হওয়া করুণ বশংবদ গলায় জানালাম, 'কিন্তু আমায় তা হলে একটু সুবিধে দিতে হবে যে।'

'কী সুবিধে?' কার্ল পাউলো খেঁকিয়ে উঠল।

'একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবার সুবিধে!' যেন ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলাম—'ও তল্লাটে দু-চারদিন টহলদারি করতে করতে ওই তোমার কী নাম জুয়ান না তুয়ানের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে তো। নইলে হট করে গিয়ে হাজির হলে সন্দেহ করবে যে!'

'থাম, থাম!' ধমকে থামিয়ে দিয়ে পাউলো বললে, 'বেশি বকতে হবে না। ঘোরাফেরা করার জন্য আমার শিকারের আস্তানার একটা জিপ-ই তুই পাবি। আর কিছু চাস?'

'না।' কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে গিয়ে জানালাম, 'ওই জিপটা যে দিচ্ছ সেই দয়াই যথেষ্ট।'

'কিন্তু তুই—?'হঠাৎ একটু যেন সন্দিগ্ধ সুরে পাউলো জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই তো শুধু ওই একটা ফোলিওব্যাগই সঙ্গে এনেছিস। আর কিছু নেই?'

'না। আর কিছুতে কী দরকার?' সবিনয়ে জানালাম, 'আকাশে উড়তে যত হালকা থাকা যায়।'

কোঁচকানো ভুরু জোড়া সোজা হয়ে এল এবার। পাউলো একটু ঠাট্টার সুরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কী আছে ওই ব্রিফকেস-এ? কী এমন দামি নথিপত্র?'

'না, সে সব কিছু নেই।' সরলভাবেই জানালাম, 'দাঁতমাজা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর এক প্রস্থ হালকা পোশাক বাদে যা আছে তা শুনলে হাসবে।'

'বেশ, হাসা তা হলে।' পাউলোর মেজাজ এখন খোশ।

আস্তে আস্তে বেশ স্পষ্ট করে বললাম, 'আছে খানিকটা জাপানি কুয়াশা, এক কৌটো ভেসলিন, ছোট এক শিশি ডাইফেনাডিয়োন আর এক জোড়া মোটা চামড়ার দস্তানা।'

সেকেন্ড দুয়েক সামান্য ভুরু-কুঁচকে থেকে সত্যিই এবার হেসে ফেলল পাউলো। তারপর একটু কড়া গলাতেই বললে, 'ও সব ভড়কি আর যাকে পারিস দিস। কাজ যা দিয়েছি তা হাসিল করতে না পারলে ওসব ভড়কি তোর সঙ্গে গোরেই যাবে মনে রাখিস। নামবার পর এক হপ্তা তোকে সময় দেব। তার মধ্যে জুয়ান ভার্গাসকে বাগ মানানো চাই-ই।'

নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে মনে মনে বললাম, আমার পকেটের জুয়ান ভার্গাসের চিঠিটা যদি এখন দেখতে পেতে, পাউলো!

সেরা দো মার পাহাড়ের ধারে কার্ল পাউলোর শিকারি আস্তানায় নামবার পর নিজের একটা কামরা পেয়ে একটু নিরিবিলি হবার পর জুয়ান ভার্গাস-এর চিঠিটা আবার বার করে পড়লাম।

চিঠির কথাগুলো আমার প্রায় অবশ্য মুখস্থ হয়ে গেছে। নিউ অর্লিনস থেকে ওয়াশিংটন যাবার পথে আমার ট্র্যাভেল এজেন্সি মারফত এই চিঠিটা পেয়েই আমি প্ল্যান বদলে ডালাস থেকে ব্রেজিলের ব্রাসিলিয়া যাবার প্যাসেঞ্জার প্লেন ধরবার জন্য এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানে যেন নিয়তির নিজের কারসাজিতে কার্ল পাউলোর সঙ্গে দেখা। সে অমন জোর করে ধরে না নিয়ে এলে বেশ একটু ঘুর-পথে আরও

দেরিতে এই জুয়ানের কাছে আমায় পৌঁছতে হত। জুয়ান যে দারুণ ব্যাপারের কথা লিখেছে তাতে, যেমন করে হোক, না এসে অবশ্য আমি পারতাম না।

জুয়ান তার চিঠিতে প্রায় দিশাহারা হয়ে আমার সাহায্য চেয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলের বিস্তৃত জমি ইজারা নিয়ে সে যখন গোরু-ঘোড়ার পাল বাড়াবার র‍্যাঞ্চ বসায় তখনকার কথা আমি জানি। নিজের যা কিছু সম্বল সব সে এই আদর্শ র‍্যাঞ্চে ঢেলে দিয়েছিল। সে দুঃসাহস তার বৃথা হয়নি। এই ক-বছরে তার র‍্যাঞ্চ—সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক সর্বনাশা অভিশাপে সব ছারখার হবার জোগাড়। তার গোরু-ঘোড়ার পালে ভয়ংকর রকম মড়ক লেগেছে। সে মড়কের কারণও অবিশ্বাস্য। পালে পালে তার গোরু-ঘোড়া মরছে জলাতঙ্ক রোগে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তার এ অঞ্চলের জমির মালিক কার্ল পাউলো কিছু দিন থেকে তার কাছে জমিগুলো ফেরত চাইছে। কারখানা বসিয়ে এই পবিত্র সুন্দর অঞ্চলটা নোংরা বিষাক্ত করতে দিতে চায় না বলে এতদিন সে পাউলোর পেড়াপিড়ি বা হুমকি কিছুতেই আমল দেয়নি। কিন্তু এবার বোধহয় হয়ে তাকে নিজে থেকে সেধেই র‍্যাঞ্চ বেচে চলে যেতে হবে। এই বিপদের মধ্যে শেষ পরামর্শের জন্য সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

কার্ল পাউলো আমায় সাতদিন মাত্র সময় দিয়েছিল।

সাতদিন কিন্তু আমার লাগল না। মেয়াদের দুদিন বাকি থাকতেই সেদিন বিকেলে পাউলোর নিজের কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। হাতে আমার নিজের ব্রিফকেসটি।

পাউলো তখন তার আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে কী একটা ডায়রি গোছের খাতার পাতা ওলটাচ্ছে।

কোনও সম্ভাষণ না করে তার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

একটু চমকে ওঠার সঙ্গে মুখটা একটু লাল হয়ে উঠলেও পাউলো নিজেকে সামলাল। তারপর গলার স্বরটা যথাসম্ভব হালকা করে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী? এ ক-দিন তো চুলের টিকিটি দেখতে পাইনি। কেন? আর দু-দিন মাত্র বাকি তা তো মনে আছে?'

দু-দিন আর লাগবে না।

আমার গলায় তাচ্ছিল্যের সুরটাতেই কেমন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পাউল এবার সোজা হয়ে উঠে বসে ভ্রূকুটির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, 'লাগবে না মানে? কাজ হাসিল হয়ে গেছে এর মধ্যে? জুয়ান ভার্গাস রাজি হয়েছে?'

'জুয়ান ভার্গাস-এর রাজি না রাজি হওয়ার কী আছে!' আগের মতোই তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছি, 'তার সঙ্গে দেখাই হয়নি। হয়নি মানে করিনি।'

'তার সঙ্গে দেখাই করিসনি!' রাগে পাউলোর মুখ দিয়ে যেন ফেনা বেরুবে মনে হল, 'আর পাঁচ দিনেও কাজ হাসিল না করে তুই আমার কাছে সাহস করে এসে বসেছিস!''

পাউলো খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ইজি-চেয়ারটার খোল থেকে উঠতে গেল।

পিঠে একটি ছোট কিল দিয়ে তাকে আবার কেদারাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'অস্থির হচ্ছ কেন মিছিমিছি? আসল যা কাজ তা পাঁচ দিনে সত্যিই হাসিল হয়ে গেছে যে! আজ এক বছর ধরে মোক্ষম শয়তানি ফন্দি তুমি খাটাচ্ছ বটে। আমার সঙ্গে এবারের প্লেনেও একটি ক্রেট-এ শয়তানি চক্রান্তের সব যমের দূতদের বয়ে এনে নামাতে দেখলাম। তাদের সব খেল কিন্তু এবার খতম। জুয়ান ভার্গাসকে বাগ মানাতে না পেরে তাকে একেবারে ধনে প্রাণে মারবার যে ফন্দি তুমি করেছিলে তা যেমন পৈশাচিক তেমনই ভয়ংকর। কোথাও কিছু নেই, তার গোরু-ঘোড়া পালে পালে আচমকা মারা যেতে শুরু করল এক বছর আগে থেকে। আর মারাও যাচ্ছে এ-রোগ সে-রোগে নয়, হাইড্রোফোবিয়া মানে জলাতঙ্ক রোগে, যার চিকিৎসা নেই। কোথা থেকে এ-রোগ এল গূঢ় রহস্য না জানলে কেউ ভেবেও পাবে না। ক-জন জানে যে জলাতঙ্ক রোগ শুধু খ্যাপা কুকুরের কামড়েই হয় না, তার চেয়ে মারাত্মক উৎস এ রোগের আছে।'

পাউলো আবার একবার লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই একটি আলতো রদ্দায় তাকে কেদারায় কাত করে দিয়ে বললাম, 'সে উৎস হল প্রাণীজগতের সত্যিকার রক্তখাকি এক রাক্ষসি, ডেসমোডাস রোট্যনডাস, যার চলতি নাম হল ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে সত্যি মিথ্যে অনেক রকম কিংবদন্তীই আছে। প্রাণীটিকে চোখে দেখলে তার সর্বনাশা ভীষণতা বোঝা কঠিন। এক কাঁচ্চা থেকে খুব বেশি হলে তিন কাঁচ্চা এই জীবটির ওজন। কিন্তু রাত্রে ঘুমন্ত মানুষ গোরু-ঘোড়ার রক্তই শুধু সে চুষে খেয়ে যায় না, সাংঘাতিক জলাতঙ্ক রোগের বিষও শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের এই ভয়ংকর ক্ষমতার কথা জেনে তুমি অনেক টাকা খরচ করে বিশেষভাবে তৈরি কাঠের খাঁচায় তোমার প্লেনে বেশ কিছু ঝাঁক সে বাদুড় আনিয়ে জুয়ানের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি সেরা দো মার পাহাড়ের গুহায় তো ছাড়বার ব্যবস্থা করেছ। এবারও এক ঝাঁক তুমি এনে ছাড়তে ভোলোনি। কিন্তু সব শয়াতনি ফন্দি তোমার ভণ্ডুল। যত ভ্যাম্পায়ার তুমি ছেড়েছ তার একটাও আর বেঁচে নেই। কাল নিজে গিয়ে সবগুলো পরীক্ষা করে তুমি দেখে আসতে পারবে। আসল মরণকাঠি নেড়ে রক্তচোষা মরণ-বিষ-ছড়ানো সব রাক্ষসি আমি শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি।'

শেষ একটি থাবড়ায় পাউলোকে ইজি চেয়ারে একেবারে চিত করে শুইয়ে দিয়ে বললাম, 'অকারণে ব্যস্ত হয়ো না। এখন ওঠার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তুমি যতক্ষণে উঠে দাঁড়াবে ততক্ষণে আমি তোমারই দেওয়া জিপে প্লেনে পৌঁছে যাব। সেখানে একজন পাইলটকে আমি সব কথা বলে নিজের দলে টেনেছি। আর একজনকে আগে থাকতে সেখানে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা আছে। তোমার প্লেন আমি চুরি করব না। শুধু কিছুক্ষণের জন্য ধার নিয়ে ওই প্লেনে হন্ডুরাস কী গুয়াতেমেলা কোথাও গিয়ে নামব। বেঁধে রাখা পাইলট ছাড়া পেয়ে সেখান থেকে তোমার প্লেন ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তোমায় শেষ একটা উপদেশ। এরপর আর কোনও শয়তানি চালাকির চেষ্টা কোরো না। এখানে কারখানা বসানোর মতলব ছেড়ে অন্য কোনও কারবারে তোমার শয়তানি বুদ্ধি খাটাও গিয়ে। আচ্ছা, বিদায়!'

আমি উঠে আসতেই কেদারা থেকে ওঠবার চেষ্টা করে পাউলোর সে কী করুণ মিনতি!

'শোনো, শোনো, দাস! সত্যি তোমার কাছে হার স্বীকার করছি। রাক্ষুসি ভ্যাম্পায়ারদের মরণকাঠি কী তা-ই শুধু বলে যাও!'

কে তার জবাব দেয়!

তার আকুল মিনতি জিপের আওয়াজেই তখন চাপা পড়ে গেছে।"

ঘনাদা থামলেন।

দরজায় ট্রে হাতে বনোয়ারি। ট্রে থেকে প্লেট নামানো থেকে সেটি একবারে চাঁছাপোঁছা না হওয়া পর্যন্ত ঘনাদার মুখে আর কথা নেই।

আমাদের ধৈর্য অসীম।

প্লেটটা তিনি নামাবার পরই মুখিয়ে থাকা কথাটা জানালাম।

"জবাবটা কিন্তু আমাদের যে চাই! রাক্ষুসিদের মরণকাঠিটা কী, ঘনাদা?"

"মরণকাঠিটা হল," শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটের টিনটা খুলতে খুলতে ঘনাদা বললেন, "ওই ডাইফেনাডিয়োন। মানুষের, বিশেষ করে হার্টের রুগির, পক্ষে এটা দামি ওষুধের সামিল, কিন্তু ইঁদুর বাদুড় গোছের প্রাণী মারবার একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। রক্ত চুষে যারা বাঁচে এ ওষুধ তাদের রক্ত জল করে দিয়েই মারে। ওষুধটার গুণ জানবার পরও এটা ব্যবহারের উপায় প্রথমে পাওয়া যায়নি। রাক্ষুসে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় এ ওষুধ খেলে মরবে। কিন্তু তাদের খাওয়ানো যাবে কী করে? এক-একটা করে বাদুড় ধরে ওষুধ গেলানো তো যায় না। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের একটা অভ্যাসের কথা জেনে এ সমস্যার আশাতীত সমাধান বার করা গেছে। ভ্যাম্পায়ারের একটা অভ্যাস হল বাঁদরদের মতো পরস্পরের গা চেটে পরিষ্কার করা। চামড়ার দস্তানা পরা হাতে একটা রাক্ষুসিকে ধরে তার গায়ে আধ চামচ ভেসলিনের সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম ডাইফেনাডিয়োন মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই হল। একটা ওষুধ মাখানো রাক্ষুসির গা চেটে গোটা পঁচিশ ত্রিশ অন্য রাক্ষুসির ভবলীলা শেষ হবে।

ক-দিন ধরে পাউলোর জিপে ঘুরে ঘুরে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের গুহাগুলো খুঁজে বার করে এই কাজই করেছিলাম। পাউলো তার শয়তানি ফন্দিতে মোটমাট ষাট-সত্তরের বেশি ভ্যাম্পায়ার আমদানি করতে পারেনি। তার উদ্দেশ্য অবশ্য তাতেই সিদ্ধ হয়েছে। আমারও সুবিধে হয়েছে দিন তিনেকের মধ্যে তাদের সব ক-টাকে খতম করার।

ওষুধের গুণ যতই হোক, ওই জাপানি কুয়াশা যাকে বলেছি তা না থাকলে সব কিছুই মিথ্যে হয়ে যেত। জাপানি কুয়াশা আসলে হল কুয়াশার মতো সূক্ষ্ম নাইলনের একরকম অদৃশ্য জাপানি জাল। তার সুতোগুলো এত সূক্ষ্ম যে রাত্রে তা অতি তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতেও একেবারে দেখাই যায় না, বাদুড়দের শব্দতরঙ্গও তাতে কাজ করে না। অত বেশি মিহি বলেই এ জালের নাম জাপানি কুয়াশা জাল।

ভ্যাম্পায়ারদের গুহার মুখে এই কুয়াশা জাল টাঙিয়েই তাদের সব ক-টাকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরতে পেরেছিলাম।"

ঘনাদা মুখের সিগারেট ধরিয়ে যথারীতি শিশিরের টিনটা ভুলে হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন।

তিনি দরজার কাছে যাবার পর শেষ প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ল।

গলা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এতদিন বাদে ওই কার্ল পাউলো আপনার খোঁজ পেল কী করে?"

"ওই জাপানি কুয়াশা থেকে!" ঘনাদা ফিরে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করলেন, "চলে আসবার পর নির্দেশ লিখে ওটা ওষুধপত্র সমেত জুয়ান ভার্গাস-এর কাছে পার্শেল করে পাঠিয়েছিলাম কিনা। সেদিন আবার তোমাদের চিড়িয়াঘরের কথায়, আশার গুনগুনিয়া রাখবার জন্য জুয়ানের কাছে সেটা আবার চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই চিঠি কোনওভাবে পাউলোর হাতে পড়েছে বোধহয়। জাপানি কুয়াশা সুতরাং আর পাবার আশা নেই।—তার দরকারও নেই অবশ্য।" ঘনাদা একটু যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "তোমরা গুণগুনিয়া তো আর আনছ না।"

ঘনাদা চলে গেলেন।

এরপর চিড়িয়াঘর বানাবার উৎসাহ আর থাকে?

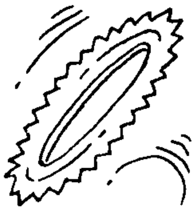

কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা

"ভুল!" বললেন ঘনাদা।

মনে মনে বললাম, শুরু হল গুল! মুখে কিন্তু পুরো ভ্যাবাচ্যাকা ভাব ফুটিয়ে বললাম, "বলেন কী, ঘনাদা? কুরুক্ষেত্রের ওই পরিণাম হল দুর্যোধনের শুধু একটি ভুলে?"

"কী ভুল বলব?" শিবু আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে—বিচক্ষণতা দেখাতে এল, "যুদ্ধের তারিখটা আরও একটু পিছিয়ে না দেওয়া।"

ঘনাদা তো নয়ই, আমরাও কেউ তার বিচক্ষণতায় উৎসাহ না দেখালেও সে সবিস্তারে তার ব্যাখ্যাটা আমাদের না শুনিয়ে ছাড়ল না। "এই যেমন আমাদের ইলেকশনে হয়। বেশ জাঁকিয়ে যারা গদিতে বসে আছে তারা ভাবে তাড়াতাড়ি ইলেকশন করালে নতুন উটকো দল জোগাড়যন্তর করে লড়বার জন্য তৈরি হবার

সময়ই পাবে না। দখলদার দলই ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘুরিয়ে বাজিমাত করবে। কিন্তু সেইখানেই হয় ঠিকে ভুল। দুর্যোধন ভেবেছিল তাড়াতাড়ি যুদ্ধটা আরম্ভ করিয়ে দিলে পাণ্ডবেরা কৌরবদের মতো সৈন্য জোগাড় করতে পারবে না—"

"তা তো পারেইনি।" শিশির একটানে শিবুর মাঞ্জা দেওয়া যুক্তির সুতো ভোকাট্টা করে দিল। "কোথায় কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য আর পাণ্ডবদের মোটে সাত। ভুল এখানে নয়, দুর্যোধনের মারাত্মক ভুল হয়েছে পাণ্ডবেরা বোকার মতো যে প্রস্তাব করে বসেছিল তাতে তৎক্ষণাৎ রাজি না হয়ে যাওয়া। কী চেয়েছিল পাণ্ডবেরা? পাঁচটা মাত্র গাঁ। কেমন গাঁ, কোথায়, তা তো কিছু বলেনি। একসঙ্গে দিতে হবে এমনই কথা ছিল না। পাঁচ ভাইকে জম্বু দ্বীপের পাঁচ ধাড়ধাড়া গোবিন্দপুরে পাঁচটা অখদ্দে গাঁ দিলেই চুকে যেত ল্যাটা। নামগুলো যাই হোক ম্যালেরিয়া কালাজ্বর পেলেগ-টেলেগ তখন কি আর ছিল না ! খুব ছিল। বেছে বেছে সেই রকম ক-টা গাঁয়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে বসিয়ে দিলেই—ব্যাস, আর দেখতে হত না। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব তো নস্যি! ওই ভীমার্জুনও বছর ঘুরতে না ঘুরতে কুপোকাত! কী বলেন, ঘনাদা?"

"ঘনাদা আবার কী বলবেন?" গৌর শিশিরের বাহাদুরির ফাঁপা ফানুসটা ঘনাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই খুঁচিয়ে ফুটো করে বললে, "ভীমার্জুন পাঁচ ভাইকে পাঁচটা বনগাঁ দিলেই দুর্যোধন যেন কুরুক্ষেত্রে না নেমে পাণ্ডবদের রামঠকান ঠকাতে পারতেন! আরে পাঁচটা মাত্র গ্রাম চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। শুনতে ভারী সহজ সরল আহাম্মকের মতো প্রস্তাব। কিন্তু ওর ভেতর যা প্যাঁচ, তা শকুনির পাশার ঘুঁটিতেও ছিল না সেই দ্যূতক্রীড়ার সময়। ও প্যাঁচ যার-তার তো নয়—প্যাঁচের চ্যাম্পিয়ন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথা থেকে বার করা। এ প্রস্তাব মেনে নিলে দুর্যোধন কীরকম গাঁ যে দিতেন তা বাসুদেবের ভাল করেই জানা ছিল। তাঁর প্যাঁচের খেলা শুরু জম্বুদ্বীপের পাঁচ কোনায় পাঁচটি গ্রাম পাবার পর।"

গৌরের ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে চোখটা ঘনাদার দিকেই রাখতে হয় তাঁর মেজাজের ওয়েদার রিপোর্ট ঠিকঠাক নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর দান ফেলতে দেরি করিয়ে দেবার জন্য একটু আধটু তাতলে কোনও ক্ষতি নেই। বরং গরম হলে তুবড়ি ছুটবে ভাল বলে একটু তাতাতেই চাই। কিন্তু তাতাতে গিয়ে তেতো না হয়ে যায় সেটাও খেয়াল রাখা চাই।

ঘনাদার একটু যেন সেরকম ভাবগতিক দেখে গৌরকে একটু তাড়া দিতে হল।

"প্যাঁচটা কী কেষ্ট ঠাকুরের? পাঁচ গাঁয়ের প্রত্যেকটিতে পাণ্ডবভবন বসিয়ে পাণ্ডব কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে খেপানো?"

"উঁহুঃ!!" গৌর একেবারে কৌটিল্য সেজে বললে, "করিডর দাবি।"

"করিডর দাবি?" আমরা যথাবিহিত আর যথোচিত হতভম্ব।

"হ্যাঁ, করিডরই"—গৌর বিশদ হল। "আয়ুব খাঁ যেমন তখনকার পুব পশ্চিমের দুই পাকিস্তানের মধ্যে করিডরের কথা ভেবেছিলেন, সেইরকম করিডর দাবি করা পাঁচ-ভাইয়ের পাঁচ রাজ্যের মধ্যে। দুর্যোধন সস্তায় সারবার লোভে পাঁচ গাঁ দেবার

প্রস্তাবে রাজি হলেই জম্বুদ্বীপ এফোঁড় ওফোঁড় করা এই পাঁচ করিডরের ঠেলাতেই কুপোকাত হতেন। শ্রীকৃষ্ণের লুকোনো প্যাঁচটি ধরে ফেলেই বিনা যুদ্ধে ছুঁচের ডগার জমিও দেব না বলে তিনি যে তম্বি করেছিলেন সেটা তাঁর ভুল নয়। দুর্যোধনের ভুল হল ওই এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য।"

"তার মানে?" গৌরকে কড়া গলায় জেরা করতে হল, "ওই অত সৈন্য জোগাড় করাই দুর্যোধনের ভুল তুমি বলতে চাও।"

"হ্যাঁ, দারুণ ভুল!" গৌর তার সিদ্ধান্তে অটল, "ওই অত সেনাদের সামলানো কি সোজা কথা! তখন তো আর রেডিয়ো ছিল না, টেলিফোনও নয়। শুধু তুরী ভেরী বাজিয়ে দরকারের সময় ঠিক মতো কাউকে কি পাওয়া যায়। ধনুর্ধারী বাহিনীকে চাইলে জগঝম্প বাজিয়েরা এসে কান ঝালাপালা করে। অত অগুনতি সৈন্যে বেসামাল হয়েই দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রে কাবু। তাই না, ঘনাদা?"

'না'—বলে একটি প্রচণ্ড ধমক শোনবার জন্য ঘনাদার দিকে উৎসুক ভাবে চাইলাম।

তাঁকে এতক্ষণ কিউ-এ দাঁড় করিয়ে রাখার শোধ কেমন করে তিনি নেন তাই দেখবার জন্যই তো এত তোড়জোড়।

কিন্তু এ কী হল? দুমফটাস করে যা ফাটবে তা যে শুধু একটু ফুস করল মাত্র!

"একদিক দিয়ে তা অবশ্য বলা যায়!" আমাদের যেমন হতাশ তেমনই হতভম্ব করে ঘনাদা গৌরের কথাতেই সায় দিলেন যে!

শুধু কি সায়! সেই সঙ্গে গৌরের তরফে নজিরও হাজির করে যেন হাতের খবরের কাগজের মতো পড়ে গেলেন, "মিলিটারি রেকর্ডে তো পাচ্ছি, হস্তিনাপুর নগরে ধরেনি বলে শুধু পঞ্চনদে নয়—সমস্ত কুরু জাঙ্গাল, রোহিতকারণ্য, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকুল, বারণ, বাটধান, সামুন পর্বত পর্যন্ত তাদের চালান করা হয়েছে।"

"কুরুক্ষেত্রের মিলিটারি রেকর্ডে তাই আছে বুঝি?" আমরা হতাশ হয়ে ঘনাদার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তা হলে ওই এগারো অক্ষৌহিণীই দুর্যোধনের কাল হয়েছে বলতে হবে!"

"হ্যাঁ, তা-ই হত।" ঘনাদা গলাটায় যেন একটু বাঁকা সুর দিয়ে বললেন, "যদি—"

"যদি?" আমরা যেন মৃতসঞ্জীবনীর কৌটায় চাঙ্গা হতে হতে বললাম, "যদি কী?"

"যদি, গুনতিটা ঠিক হত।" ঘনাদা হাতের শেষ করা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরে বললেন।

আর কি কিছু আমাদের ভুল হয়!

তাঁর ফুরোনো সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভানো হতে না হতে শিশির তার নতুন টিনটা খুলে সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "গুনতিতেই ভুল আছে বুঝি? এগারো অক্ষৌহিণী নয়?"

ঘনাদা শিশিরের টিন থেকে নতুন সিগারেট নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর ঠুকতে ঠুকতে একটু নাসিকাধ্বনি করলেন মাত্র। শিশির ততক্ষণে লাইটার জ্বেলে সামনে ধরেছে।

সিগারেটটা মুখে নিয়ে সেই লাইটারের আগুনে ধরিয়ে একটানেই একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘনাদা অবজ্ঞাভরে বললেন, "মেরে-কেটে আট অক্ষৌহিণী হলেও যথেষ্ট!"

"তা হলে?" আমরা পালা করে বিস্মিত জিজ্ঞাসা চালালাম।

"ওই যে এগারো অক্ষৌহিণী বলে লেখা?" আমি বিস্ময়ে মুখব্যাদান করলাম।

"সে লেখার তা হলে কোনও দাম নেই!" শিবু হাঁ হল!

"মাত্র আট অক্ষৌহিণী তা হলে এগারো বলে চালু হল কী করে?" গৌরের সোজাসুজি প্রশ্ন।

সেই সঙ্গে শিশিরের ছোট্ট একটু টিপ্পনি—"দুর্যোধনের হামবড়াই নিশ্চয়!"

"না, দুর্যোধনের হামবড়াই নয়।" ঘনাদা শিশিরকেই আগে জবাব দিয়ে আর একরাশ ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁর মোক্ষম সম্মোহন শর কয়টি ছাড়লেন, "আট অক্ষৌহিণী এগারো হওয়ার মূলেই আছে দুর্যোধনের সর্বনাশা ভুল, যার নাম হল উলূক।"

"উলূক?" এবার আমাদের আর অবাক হবার ভান করতে হল না।

"হ্যাঁ, উল্লুক নয়, উলূক!" ঘনাদা বিশদ হলেন—"তবে নামটা যে একদিন ওই গালাগাল হয়ে উঠবে ভারত-বীর ভগদত্ত শাপ দিয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী তখনই করে গিয়েছিলেন।"

"এই উল্লুক থুড়ি উলূকই হল দুর্যোধনের ভুল?" আমরা আঁচটা পড়তে না দেবার জন্য উসকে দিয়ে বললাম, "যে কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের হারের মূল? কে ইনি?"

"ইনি কে জানো না!" ঘনাদা খুশি হয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর করলেন, "ইনি হলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধী, দুর্যোধনের মাতুল স্বনামধন্য শকুনির ছেলে। বাপের চেয়ে এক কাঠি সরেস। ছোকরা খুব চটপটে চালাক চতুর, চোখে মুখে খই ফোটে বলে এই মামাতো ভাইটিকে দুর্যোধনের খুব পছন্দ। পাণ্ডবদের কাছে তাকেই পাঠিয়েছেন দূত করে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকায় পর্যন্ত দৌত্য করতে গেছে এই উলূক।"

"দৌত্য করতে গিয়ে সব গুবলেট করেছিল বুঝি উল্লুকটা থুড়ি ওই উলূক?" সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"উঁহু!" মাথা নাড়লেন ঘনাদা। "এ পক্ষে ও পক্ষে কথা যা চালাচালি করেছে তা একেবারে যেন টেপ রেকর্ডারের মতো। একটি কথাও ভুলচুক নেই।"

"তবে?" আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা—"উলূককে নিয়ে দুর্যোধনের ভুলটা কোথায়?"

"ভুল!" ঘনাদা এবার বোঝালেন, "তার দৌত্যের বাহাদুরি দেখে তাকে যুদ্ধের কমিশেরিয়াটের মাথায় বসিয়ে দেওয়া—উলূক এইটেই চেয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই সে রীতিমত গুছিয়ে নিয়ে তার নিজের দেশ গান্ধারে যা পাঠালে তাতে, কৌরব পাণ্ডব যে পক্ষই জিতুক, তার কিছু আসবে যাবে না। পায়ের ওপর পা দিয়ে অমন সাতপুরুষ তার সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে।"

"তার মানে চুরি করেছিল উলূক?" আমরা স্তম্ভিত—"কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ করবার

আগে অত চুরি করল কী করে?”

“কী করে আবার?” ঘনাদা ঈষৎ হাসলেন। “স্রেফ ওই গুনতির ফাঁকিতে। দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করতে এক এক রাজা তাঁর দলবল আর লটবহর নিয়ে আসেন আর উলূক তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা থেকেই মোটা রোজগারের ব্যবস্থা করলেন। বেশি কিছু ঝামেলা তো নয়, শুধু একটা দুটো শূন্য বাড়িয়ে যাওয়া। এক অক্ষৌহিণী কীসে হয় জানো তো? পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, রথ আর হাতি নিয়ে মোট দু লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো সেনায় এক চতুরঙ্গ। পুরো চতুরঙ্গ হবার তো দরকার নেই উলূকের কাছে। এখানে একটা, ওখানে একটা শূন্য বসিয়েই সে অক্ষৌহিণী পুরো করে দিয়ে তাদের খানাপিনা তোয়াজ তদ্বির বাবদ দুর্যোধনের খাজাঞ্চিখানা ফাঁক করবার ফিকির করে নেয়, সামনাসামনি রাখলে পাছে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মতো ধুরন্ধর সেনাপতিদের চোখে ধরা পড়ে যায় বলে জায়গার অভাবের ছুতোয় উলূক যত দলকে পারে, পাঠিয়ে দেয় দূর-দূরান্তরে।”

ঘনাদা একটু থামতে তাঁর এ ব্যাখ্যানের একটু খুঁত ধরতেই হল। “তা উলূকের এই চুরির জন্য, কুরুক্ষেত্রে কৌরবদের হার হয়েছিল বলতে চান?”

“পাগল!” ঘনাদা অবজ্ঞাভরে প্রতিবাদ জানালেন, “ও চুরি তো দুর্যোধনের খাজাঞ্চিখানায় একটা বড় গোছের ফুটোও করতে পারেনি। ও চুরির ওপর উলূক যদি হস্তিনাপুরের সব ক-টা পুকুর মায় কুরুক্ষেত্রের দ্বৈপায়ন হ্রদটাও চুরি করে পাচার করত কৌরবেরা তাতেও কাবু হত না।”

“তা হলে কাবু তারা হল কেন?” আমরা যুক্তি দেখালাম, “গুনতির ফাঁকি-টাকি সব বাদ দিয়ে ধরেও দুর্যোধনের পক্ষে মোটমাট আট অক্ষৌহিণী তো ছিল। পাণ্ডবদের চেয়ে পুরো এক অক্ষৌহিণী বেশি। তাতে তাদের হার হওয়া কী উচিত?”

“কখনও নয়। তবু হার হল কেন?” নিজেই প্রশ্ন তুলে ঘনাদা তার উত্তর দিলেন, “হার হল উলূকের চুরির দরুন নয়, তার মুখ্খু মাতব্বরিতে। একাই গাণ্ডিবী অর্জুন সমেত পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে যিনি কুপোকাত করতে পারতেন সেই বীরের সেরা বীরকেই উলূক দিয়েছে খেপিয়ে। নেহাত এক কথার মানুষ বলে দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্য চলে যেতে আর পারেননি। তবে নিজের যা বড় মূলধন তার অর্ধেকেই দিয়েছেন দেশে পাঠিয়ে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শুকনো ন্যাড়া পাহাড়ের দেশ গান্ধারের ছেলে উলূক, ওই বীরের সেরা অতিরথ বীরের মর্ম সে আর কী জানবে!

কাজকর্মের পর সন্ধেয় ইয়ারবন্ধুর কাছে ওই বীরের সেরা বীরকে সে ঠাট্টা-তামাশাই করেছে।

ইয়ারবন্ধু তার অবশ্য হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। দুর্যোধনের ছেলে লক্ষ্মণ, দুঃশাসনের ছেলে বৃহদ্বল, কর্ণের ছেলে বৃষসেন, এদের কাছেই ঠাট্টা করে নাক সিঁটকে সে বলেছে, ‘কী সব মাল যে এই যুদ্ধের টানে আমদানি হচ্ছে হস্তিনাপুরে! আজ এক চিজ এসেছিলেন আমাদের কৌরবপক্ষকে কৃতার্থ করতে! জিভের এখনও আড়ই ভাঙেনি। সমস্তকে বলে হমস্ত! চোর বলতে বলে চুর, আর সঙ্গে যাদের এনেছে প্রায়

অর্ধেক হস্তিনানগরই চাই তাদের থাকার জন্য।'

বৃষসেন বাদে অন্য সবাই এ কথায় উলূকের সঙ্গে হেসে উঠেছে। কর্ণের ছেলেই একটু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'মানুষটা নিশ্চয় পূর্বী। পূর্বীদের উচ্চারণ এমনই একটু বাঁকা হয়। কিন্তু তাতে হাসবার কী আছে! ওরা উচ্চারণ যেমনই করুক, যুদ্ধ যা করে দেখলে চোখ টেরা হয়ে জিভ এড়িয়ে যাবে তোমারও। মানুষটা কোথাকার বলো তো? মনে আছে তার দেশটার নাম?'

'আছে, আছে।' তাচ্ছিল্য ভরে বলেছে উলূক, 'ওই পুব সীমান্তের প্রাগজ্যোতিষপুর না কী যেন বললে।'

'প্রাগজ্যোতিষপুর!' চমকে উঠে বলেছে বৃষসেন, 'সেখানকার ভগদত্ত নয় তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভগদত্তই যেন বলছিল নামটা।' উলূক অবজ্ঞাভরেই বলেছে, 'যা কথাবার্তার ধরন আর উচ্চারণ, ভাল করে বুঝতেই পারিনি। তা ছাড়া তোমার এই ভগদত্ত সঙ্গে করে কী এনেছেন জানো? একটি দুটি নয়, শ-দুয়েক এক হাতির পাল। সেই হাতির পালের জন্য জায়গা দিতে হবে শুনে বলেছি—'অত হাতির আমাদের কিচ্ছু দরকার নেই।'

'তুমি তা-ই বললে?' উলূকের দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে হতাশ সুরে বলেছে বৃষসেন, 'প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে তুমি বললে যে তার হাতিতে আমাদের দরকার নেই! তা তুমি গান্ধারের নীরস ন্যাড়া পাহাড়ের গাধা আর অশ্বতরই চেনো, পুব মুলুকের বিশেষ করে প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তের হাতির দাম আর তুমি কী করে জানবে? ভগদত্তের কথা ছেড়েই দাও, তার ওই এক-একটা হাতি প্রায় আধা অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গ সেনার সমান তা জানো?'

'খুব জানি! খুব জানি!' উলূক ব্যঙ্গের সুরে বলেছে,' ও পূর্বিয়াদের দৌড় আমার খুব জানা আছে! নিজেদের বনজঙ্গলে সবাই ওরা খুব বাহাদুর। এখানে লড়াইয়ের দুটো হাঁক শুনলেই দাঁত ছিরকুটিয়ে ভির্মি যাবে। ওই মালেদের এক পাল হাতি পুষতে আমি রোজ রোজ এক জঙ্গল করে খোরাক জোগাতে পারব না।'

উলূক অতিরথ ভগদত্তের কোনও খাতির গোড়া থেকেই রাখেনি। প্রথম দিনই ভগদত্ত অতি কষ্টে নিজেকে সামলেছেন। তিনি যে কে তা ওই একটা চ্যাংড়া ছোকরা জানবে কোথা থেকে! ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের ভেতর সেরা যারা, তাদের বলে রথ, রথের ওপর হল মহারথ। যেমন দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামা, জরাসন্ধ। এই মহারথদের ওপর যাঁরা তাঁরা হলেন অতিরথ, যেমন ভীষ্ম দ্রোণাচার্য অর্জুনের মতো প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্ত। এই অতিরথ ভগদত্তের মতো মানুষকে চিনে যোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্য দুর্যোধনের পয়লা নম্বর হুঁশিয়ার পাকা লোক রাখা উচিত ছিল।

ভগদত্ত তো যুদ্ধের নামে রাজধানী হস্তিনাপুরটা একটু বেড়িয়ে যেতে আসেননি। যুদ্ধ করা কাকে বলে তিনি কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষকে দেখিয়ে দিতে এসেছেন। তা দেখতে শুধু হাতে আসবেন কেন? সঙ্গে যা এনেছেন দরকার হলে একাই তাতে বুঝি কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধের ফয়সালা করে দিতে পারেন।

আমাদের কাশীরাম দাস তো সে সৈন্যসামন্তের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া বহর বোঝাতে অঙ্ক-টঙ্কই সব গুলিয়ে ফেলেছেন—

ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্বুদ অর্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন ॥
সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্ঠী-কোটি মহারথী তার পরিবার ॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতি।
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধর।
মিলিত হইল কুরু সৈন্যের ভিতর ॥

মিলিত হওয়া আর হল কই! প্রথম থেকেই উলূকের সঙ্গে খটাখটি।

দপ্তরে বসে ভারিক্কি চালে জাবদা খাতা খুলে টুকতে টুকতে মুখ না তুলেই বলেছে, 'কী নাম? ভগদত্ত। ঠিকানা? প্রাগজ্যোতিষপুর। সঙ্গে লটবহর লোকজন কত?'

অতিরথ ভগদত্ত তখনই রাগে ফুলছেন। তবু নিজেকে সামলে উত্তর যা দিতে গিয়েছেন তার ক-টা শব্দ উচ্চারণ করতে না করতেই উলূক খাতায় চোখ রেখেই ক-টা টিক মারতে মারতে বলেছে, 'যান, চলে যান যামুন পর্বতে।'

'যামুন পর্বতে কেন?' ভগদত্তের গলা তখনও নামানো। 'যুদ্ধ করতে এসেছি কুরুক্ষেত্রে, যামুন পর্বতে যাব কোন দুঃখে!'

'যামুন পর্বত পছন্দ না হয় চলে যান রোহিতকারণ্যে।' উলূক তখনও মুখ তোলেনি, 'অঢেল জায়গা পড়ে আছে।'

'অঢেল জায়গার লোভে তো আসিনি', ভগদত্ত কোনও রকমে নিজের ওপর রাশ টেনে বলেছেন, 'অঢেল জায়গার অভাব আমার দেশে নেই। আমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছি। এখানেই কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা চাই।'

মনে মনে ভগদত্তের উচ্চারণের খুঁতগুলোতে মজা পেলেও মানুষটার জেদের দাবিতে তখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে উলূক। জাবদা খাতায় কী লিখতে লিখতে মাতব্বরি চালে যেন হুকুম শুনিয়েছে, 'কাছাকাছি কোথাও হবে না। এখানে বড় ভিড়। হয় যামুন পর্বত নয় রোহিতকারণ্যে যেতেই হবে।'

'না।'

এবার চমকে উলূককে মুখ তুলতে হয়েছে। হঠাৎ এই বাজ পড়ার আওয়াজ যিনি গলা থেকে বার করতে পারেন, দেখতেও হয়েছে সে মানুষটাকে একটু মন দিয়ে।

হ্যাঁ, বাজের আওয়াজ বার করবার মতোই যে চেহারা তা স্বীকার করতে হয়েছে মনে মনে। লম্বা চওড়া তেমন নয়, কিন্তু একেবারে যেন লোহা পিটিয়ে গড়া। মুখের দিকে চাইলে তো একটু শিউরে উঠতেই হয়। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বার হচ্ছে।

উলূক আর তর্কাতর্কি করেনি। হস্তিনানগরের কাছেই জায়গা দিয়েছে

প্রাগজ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে। কিন্তু সে জায়গায় তাঁর সৈন্য-সামন্ত আর হাতির পাল নিয়ে কুলোবে কেন?

বিরক্ত হয়ে ভগদত্ত তাঁর সেরা এক কুড়ি হাতি ফেরতই পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রাগজ্যোতিষপুরে।

উলূক একদিকে হার মানতে বাধ্য হলেও এ হারের শোধ নিয়েছে আর-এক দিকে। হাতে না মারতে পেরে ভাতে মেরেছে বলা যায়। ভগদত্তের সেইসব মত্ত মাতঙ্গের খোরাক দিয়েছে যেন ঘোড়ার মাপে।

এই নিয়ে ভগদত্তকে প্রায় রোজ আসতে হয়েছে উলূকের কাছে নালিশ জানাতে।

শকুনির ছেলে উলূক এখন ভগদত্তের সামনে যেন ননীর মতো নরম। হাত জোড় করে নালিশ শুনে তার অনুচরদের লোক-দেখানো গালাগাল দেয়, কিন্তু হাতিদের খোরাকের ব্যবস্থা থাকে যথাপূর্বম।

ভগদত্ত শেষে একদিন তাই আগুন হয়ে উঠে শাপ দিয়েছেন উলূককে, 'তোমার জন্য যমদূতেরা তো নরকের দরজা খুলেই রেখেছে, তোমার নামটাকে আমি অভিসম্পাত দিয়ে গেলাম। যুগ যুগ বাদেও এ নামটা লোকের মন থেকে মুছে যাবে না, গালাগাল হয়ে থাকবে মানুষের মুখে।'"

"ও!" আমরা যথারীতি বিস্মিত হয়ে বললাম, "ও! উলূকই হয়েছে উল্লুক।"

"হ্যাঁ," ঘনাদা মুখটাকে যেন করুণ করে এবার বললেন, "কিন্তু উল্লুক না উলুক যাই বলো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার পরিণাম ওলট-পালট হয়ে যাবার মূল হল সে-ই। তাকে তোমরা যাকে বলো কমিশারিয়েট, সেখানে বসাবার মতো ভুল যদি দুর্যোধন না করতেন তাহলে কোথায় থাকে পাণ্ডবদের জারিজুরি, "পাঁচ ভাই পাণ্ডবের মধ্যে যিনি মধ্যমণি সেই গাণ্ডিবী অর্জুনই টেঁসে যান সবার আগে।"

"ওই উল্লুক, থুড়ি উলুক সৈন্যসামন্তদের তদ্বির তদারক আর খানাপিনার সেরেস্তাদার হয়েছিল বলে স্বয়ং অর্জুনের নির্ঘাত মৌথের ফাঁড়া কেটে গেল।"—ঘনাদার কাছ থেকেও এতটা বাড়াবাড়ি হজম করা যে একটু শক্ত গলায় তার সুরটা একেবারে গোপন রাখলাম না।

কিন্তু ঘনাদা নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু! রীতিমতো জোর দিয়ে বললেন, "তাই তো গেল। ভগদত্তের সৈন্যসামন্ত আর হাতির পালের কথাই শুনেছ, সে কী রকম লড়িয়ে তা আর কতটুকু জানো! কাশীরাম দাস তো বর্ণনা দিতে গিয়েই হার মেনে শুধু লিখেছেন,

অতি ক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপম ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমেষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্যোধন হাসে ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহা ভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির ॥

এ তো কাশীরাম দাসের তিন হাত ফেরতা বিবরণ। আদি মূল মহাভারতেই কী লিখেছেন, শোনো—এইরূপ গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

গোপাল বনমধ্যে দণ্ড দ্বারা পশুগণকে যেরূপ তাড়িত করে, মহাবীর ভগদত্ত তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারবার তাড়িত করিতে লাগিলেন।

এ ভগদত্তকে ভয় করে না কুরুক্ষেত্রে এমন কেউ নেই। ধনঞ্জয় অর্জুন নিজেই স্বীকার করেছেন—মহাবীর ভগদত্ত গজযান বিশারদ ও পুরন্দর-সদৃশ। উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোধীগণের প্রধান। উঁহার গজের প্রতিগজ নাই। ওই গজ কৃতকর্মা জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহনক্ষম। অদ্য ওই হস্তী একাকী সমুদয় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিবে।

শুধু পাণ্ডব সৈন্য নয়, স্বয়ং অর্জুনেরও মরণ বাণ ওই ভগদত্তের হাতে।"

"ঠিক ঠিক!" গৌর বিদ্যে জাহির করবার সেই মৌকাটা ছাড়তে পারল না, "ভগদত্তের সেই বৈষ্ণবাস্ত্র কেমন! কিন্তু সে অস্ত্র তো শ্রীকৃষ্ণ নিজের বুক দিয়ে ঠেকিয়ে বৈজয়ন্তীমালা বানিয়ে ফেললেন।"

"বানিয়ে ফেললেন আবার কোথায়?" ঘনাদা প্রায় ধমকই দিলেন আমাদের, "সে অস্ত্র বজ্র হয়ে পড়তে গিয়ে আলোর মালাই হয়ে গেল আকাশে! কিন্তু কেন? ভগদত্তের অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্রের ও দশা হল কেন?"

আমরা নির্বাক। কারও মুখে আর কথা নেই।

ঘনাদা নিজের জিজ্ঞাসার জবাব নিজেই দিলেন, "এ ভেস্তা বৈষ্ণবাস্ত্রের মূলেও দুর্যোধনের সেই ভুল—উলূক। তাঁর হাতিদের ন্যায্য খোরাক না দিতে পেরে ভগদত্তের কিছুদিন থেকেই মেজাজটা খুব খারাপ। যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার জন্য তাই তিনি অস্থির। সেই মতলবেই ক-দিন থেকে রোজ তিনি উলূককে ক-টা জিনিস আনিয়ে দেবার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। তিনি নিজে হস্তিনার বাজারে জিনিসগুলোর সরেস নমুনা পাননি বলেই অন্য কোনও শহর থেকে সেগুলো আনিয়ে দেবার জন্যে উলূককে এই ফরমাশ। উলূক কিন্তু যেন গা-ই দেয় না তাঁর কথায়। দু-চারটে নমুনা যা এনে তাঁকে দেখিয়েছে ভগদত্ত তা দেখেই হস্তিনার বাজারেরই রদ্দি মাল বলে চিনে বাতিল করলেন। হস্তিনার বাজারে রদ্দি ছাড়া কোনও মাল কেন নেই এই বিষয়েই কোনও সন্দেহ শুধু তাঁর মাথায় আসেনি। সত্যের খাতিরে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে বাজারের সরেস মাল উধাওর ব্যাপারে উলূকের কোনও হাত ছিল না। অন্য শহরে গিয়ে সওদা করে আনার দায়টুকু শুধু সে নেয়নি, আর গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত হস্তিনার বাজার থেকে সে রদ্দি মাল এনে দিয়েছে, নিরুপায় হয়ে ভগদত্তকে কাজ সারতে হয়েছে তাই দিয়েই।

সেই জন্যেই বজ্র হয়ে যার নামবার কথা অব্যর্থ সে বৈষ্ণবাস্ত্রের ওই দশা। হাউইট্‌জার হয়ে ছোটার বদলে আকাশে হাউই-এর তারাবাজি। বাসুদেব সত্যিই গলায় পরুন বা না পরুন, তাঁর নামে গল্পটা ভালভাবেই রটেছে যুগের পর যুগে।"

ঘনাদা থেমে শিশিরের সিগারেটের টিনটা হাতিয়ে উঠে যাবার উপক্রম করতেই আমাদের এবার তাঁকে ধরে থামাতে হয়েছে।

"রদ্দি মশলার জন্যেই কি ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্রের ওই দুর্দশা?" আমার প্রশ্ন।

"মশলাগুলো কী?" গৌরের কৌতূহল।

"হস্তিনার বাজার থেকে সরেস মশলা সব উধাও হয়ে রদ্দি মালই শুধু রইল কেন?" শিবুর সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

"মশলাগুলো হল সোরা, গন্ধক আর চিনি," ঘনাদা সংক্ষেপে তাঁর জবাব সেরেছেন। "মশলা বাজে হওয়ায় কামানের বারুদের কাজ না হয়ে তাতে শুধু তারাবাজির হাউই-ই উড়েছে, আর বৈষ্ণবাস্ত্রের মশলা জেনে তা ভণ্ডুল করবার জন্য স্বয়ং কেশব বাসুদেবই বাজার থেকে সব সরেস মাল আগে থাকতে সরিয়ে ফেলেছেন।"

"শুনুন! শুনুন, ঘনাদা!"

আরও অনেক প্রশ্ন তখন আমাদের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে সেগুলোর জবাবের জন্য ঘনাদাকে বৃথাই আকুলভাবে ডেকেছি।

ঘনাদা ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর টঙের ঘরে। শিশিরের সিগারেটের টিনটা নিয়ে অবশ্য।

খাণ্ডবদাহে ঘনাদা

"না, নেই।"

বাজখাঁই গলাটা শিশিরের। তবে শুধু আমাদের আড্ডাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকবার জন্যে নয়, বাহাত্তর নম্বরের সব ক-টা তলা ছাড়িয়ে বনমালি নস্কর লেনে বাঁক পর্যন্ত পৌঁছবার মতো।

গলাটা অত চড়াবার অবশ্য দরকার ছিল না। তেতলার টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার মতো হলেই চলত। কারণ সেখানে তালতলার চটিজোড়ার পেটেন্ট আওয়াজ শোনামাত্রই পালাটা শুরু করা হয়েছে।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়িতে তালতলার চটির আওয়াজটা যে কার পায়ের তা নিশ্চয় কাউকে বলে দিতে হবে না।

আওয়াজটা ঘনাদারই পায়ের, আর উঠতি নয়, নামতি। মানে ঘনাদা তাঁর টঙের ঘর থেকে নেমে আসছেন। আসছেন মানে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। না এসে যাবেন কোথায়? দু-দিন ধরে প্ল্যান করে সেই ব্যবস্থাই করেছি। মাছের জন্য যেমন চার ফেলা, তেমনই তাঁকে টঙের ঘর থেকে টেনে বার করে আনার জন্য সকাল থেকেই গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে বাতাসে।

প্রথমেই সকাল সাতটা না বাজতে বাজতে নীচের রসুইঘরে রামভুজের তেলের কড়ায় ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে কী যেন ভাজার শব্দ।

সে শব্দ যদি তেতলা পর্যন্ত না পৌঁছয়, যা ভাজা হচ্ছে তার সুবাস গোটা বাড়ি তো বটেই, ছাদ ডিঙিয়ে পাশের বাড়ির মানুষের জিভেও জল না ঝরিয়ে ছাড়বে না।

সে হিঙের কচুরির মোহিনী সুরভিতে যদি কাত না হন, তার পরেই পাড়া আমোদ করা চাকাচাকা গঙ্গার ইলিশ ভাজার গন্ধ।

হিঙের কচুরির সঙ্গে ইলিশ ভাজা কি রসে রুচিতে মেলে?

মিলুক না মিলুক, কার্যোদ্ধার হওয়া নিয়ে কথা। তা যে হয়েছে ন্যাড়া সিঁড়িতে চটির আওয়াজেই তো বোঝা যাচ্ছে। নীচে থেকে এসব গন্ধ তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে অথচ বনোয়ারির চুলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না ওপরের ছাদে, এ যন্ত্রণা কতক্ষণ আর সহ্য হয়!

আমাদের গণনা মতো ঘনাদাকে নিজেই একবার তাই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য নামতে হচ্ছে।

তাঁর নেমে আসার খবর জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দোসরা চাল শুরু। সে চাল হল শিশিরের ওই পাড়া কাঁপানো গলায়—"না, নেই।"

"নেই?" গৌরের পাল্লা দেওয়া গলার প্রতিবাদ—"মহাভারতে খাণ্ডবদাহের ঠিক বিবরণ নেই? শোন তাহলে—

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্বত আকার ॥
কৃষ্ণার্জুন দুই দিকে রহে দুই জন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন, শুনি গড়গড়ি।
নানা জাতি বৃক্ষ পোড়ে শুনি চড়বড়ি ॥
নানাজাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ ॥"

গৌর এ পর্যন্ত আওড়াবার মধ্যেই ঘনাদা আড্ডাঘরে পৌঁছে যান। দরজা থেকে ভেতরে আসবার মধ্যেই সবাই আমরা দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশব্দে অভ্যর্থনা জানাই তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারাটা ওরই মধ্যে একটু ঝাড়ামোছার ভান করে এগিয়ে দিয়ে।

ঘনাদা সে কেদারায় যথারীতি গা এলিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের পালা-কীর্তন কিন্তু থামে না। এতক্ষণ ধরে সবকিছুর মধ্যে তা সমানে চলে এসেছে। গৌর তার আবৃত্তি শেষ করতে না করতে শিবু পয়ার থেকে ত্রিপদীতে নামার ভূমিকা করে

বলেছে, "শুধু ওই খাণ্ডবদাহ ঠেকোবার জন্যে যুদ্ধটার কথা কি ভুলে যাব নাকি? সব ক-টি দেবতা আর চর অনুচর নিয়ে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন খাণ্ডব বন বাঁচাতে—

এই মত গুটিগুটি দেবতা তেত্রিশ কোটি
গেল বন রক্ষার কারণে।
আইল গরুড় পক্ষী সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে।
যক্ষরক্ষ ভূতদানা সহ নিজ নিজ সেনা
নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত ত্রিভুবন আছে যত
রহে সবে আকাশ জুড়িয়া।
তবে দেব পুরন্দরে আজ্ঞা দিল জলধরে
বৃষ্টি করি নিবায় অনল।
আজ্ঞামাত্র অতি বেগে সম্বর্তাদি চারি মেঘে
মূষল ধারায় ঢালে জল।
প্রলয় কালের বৃষ্টি যেন মজাইতে সৃষ্টি
শিলা জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে ঝনঝনা ঘন পড়ে
তিন লোকে লাগিল তরাস।
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টি জল
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ ওড়ে ॥"

গৌর শিবুর চেয়ে আমি-ই বা কম যাই কেন? শিবু দম নিতে একটু থামতেই আমি একেবারে মূল মহাভারত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম —"আদি মহাভারতে স্বয়ং ব্যাসদেব কী বলে গেছেন জানিস? বলে গেছেন, ভগবান হুতাশন সপ্ত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকাল যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল—"

"গুল!" শিশির বাধা দিয়ে মাতব্বরি চালে বললে, "গুল না হলে বেবাক ভুল!"

শিশিরের এই টিপ্পনিই করবার কথা। কিন্তু আমাদের রিহার্সেল দেওয়া সিনেরিওর মতো আমায় কথাটা শেষ করতে দেওয়া উচিত ছিল নাকি! আর দুটো লাইন মাত্র বলাটুকুর তর সইল না!

তকখুনি ঘনাদার সামনে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে খাণ্ডবদাহ পালার ভুষ্টিনাশ করে দিতে ইচ্ছে করে কি না?

তবু নিজের মহানুভবতায় রাগটা সামলে পরের সংলাপটা সিনেরিও মাফিক-ই বললাম, "গুল! গুল না হলে ভুল? মহাভারতের? কী বলছ, কী?"

"ঠিক কথাই বলছি।" শিশির যেন তুরীয়লোক থেকে বললে, "মহাভারতে কি ভুল কোথাও নেই?"

"তুমি যখন বলছ তখন আছে হয়তো!" আড়চোখে একবার ঘনাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু ভুল বা গুলটা কী জানতে পারি?"

"তা পারো বইকী," শিশির যেন বাণী বিতরণের ভঙ্গিতে ঘনাদাকেও টেক্কা দিয়ে বললে, "খাণ্ডব বন জ্বালাতে নয়, তার আগুন নেভাতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে লেজে-গোবরে হতে হয়েছিল।"

"তার মানে খাণ্ডব বনে আগুন লাগাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন সাহায্য করেননি? তাঁরা আগুন নেভাবার জন্যই অস্থির হয়েছিলেন?"

একেবারে যেন হাঁ হয়ে প্রশ্নটা শিশিরকেই করলাম বটে, কিন্তু চোখগুলো আমাদের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়া ঘনাদারই দিকে।

কী করছেন কী ঘনাদা? এত রকম টোপ ফেলে তাঁকে নামিয়ে আনা, তার ওপর তাঁর মুখের সামনে তাঁরই দেখানো চাল চেলে এই সব বাজে বুকনির বেয়াদবি করা, এতেও ঘনাদা খেপে উঠবেন না? তাঁকে একেবারে চিড়বিড়িয়ে তোলবার জন্য আয়োজনের কোনও ত্রুটি তো কোথাও রাখিনি। আমাদের এই গা-জ্বালানো বাজে-বুকনির সঙ্গে নীচের রসুইঘর থেকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ ভাজার গন্ধটুকুই শুধু তাঁকে পেতে দিয়েছি, আসল মালের এখনও পর্যন্ত দেখাই মেলেনি।

এসব জ্বালার ওপর খাণ্ডবদাহের এই নয়া ব্যাখ্যায় ঘনাদার তো নিজেরই আগুন হয়ে হুংকার দিয়ে ওঠবার কথা!

কিন্তু তার বদলে ঘরে ঢোকা মাত্র শিশিরের কৌটো খুলে বার করে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটটি মৌজ করে টানতে টানতে তিনি যেন নির্বিকার হয়ে আমাদের কথা শুনছেন মনে হচ্ছে।

এ দিকে আমাদের কথার প্যাঁচের পুঁজি যে ফুরিয়ে এসেছে।

এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ঘনাদা তেতে উঠতে উঠতে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে আমাদের বেয়াদপির উচিত শিক্ষা দেবেন এই ছিল আমাদের হিসেব।

কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলা কোথায়, ঘনাদার একটু উষম গরম হবার লক্ষণও যে নেই।

শিশির ইতিমধ্যেই বেশ ফাঁপরে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে।

রিহার্সেল মাফিক আমাদের তখন একটু বাঁকা সুরে শেষ প্রশ্নটা ঝুলি থেকে ছাড়তে হয়েছে।

"জ্বালাবার বদলে কৃষ্ণ আর অর্জুন তো আগুন নেভাতে হন্যে হয়েছিলেন। খাণ্ডব বনে আগুনটা তাহলে লেগেছিল কেন?"

"কেন লেগেছিল?" জবাবের পুঁজি ফুরিয়ে ফেলে শিশিরের অবস্থা তখন কাহিল। হালে পানি না পেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাটাই সে আবার আউড়ে বললে, "কেন লেগেছিল জিজ্ঞাসা করছ?"

"হ্যাঁ, করছি।"—কথার পিঠে খোঁচাটা দিতেই হল—"অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ তো আর

বনের মধ্যে লুকিয়ে সিগারেট থুড়ি তামাক খাচ্ছিলেন না!"

"তামাক খাবেন কেন!" সুরটা চড়া হলেও শিশিরের গলায় তখন আর যেন জোর নেই—"তামাক বলে কিছু তখন ছিল? ভারতে তো নয়ই, ইউরোপে এশিয়াতেও কেউ এ জিনিস জানত না।"

শিশিরের এ বিদ্যে জাহিরের চেষ্টাতেও কিন্তু আসল সমস্যার সুরাহা কিছু হল না। আমরা শিশিরকে নাকাল করতে চাই না। কিন্তু যেমন করে হোক তর্কটাকে গরম রাখবার জন্য শিশিরকেই না খুঁচিয়ে আমাদের উপায় কী?

"থাক, তামাক নিয়ে আর জ্ঞান দিতে হবে না!" বলতেই হল আমাদের, "খাণ্ডব বনে আগুন কী করে লাগল, সেইটেই আগে শোনাও।"

"আগুন লাগল মানে"—শিশির এবার তোতলা হতে শুরু করেছে—"আগুন, কী বলে বনে আগুন কি কখনও লাগে না?"

"নিশ্চয়ই লাগে!"—আমরাও তখন জুতসই জবাব খুঁজতে দিশাহারা।

"কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে আলাদা—" বলে কোনও রকমে খেইটা টেনে রেখে ঘনাদার দিকে চাইলাম। দৃষ্টিটা এবার সত্যিই অসহায় করুণ। সত্যি, হল কী ঘনাদার? এখনও তিনি নির্বিকার! আমাদের বেয়াদবির শোধ নেবার এমন মৌকা পেয়েও মুখ বুজে থাকবেন! এই ভারত-যুদ্ধে সত্যিই অস্ত্রগ্রহণ করবেন না একেবারে?

আমাদের তো তাহলে নাকে খত দিয়ে রণে ভঙ্গে দিতে হয়। নইলে ওদিকে হিঙের কচুরি আর ইলিশ ভাজা তপ্ত খোলা থেকে নেমে যে ক্রমশ জুড়িয়ে মিইয়ে যাবে।

মরিয়া হয়ে তাই সোজা ঘনাদাকেই মুরুব্বি মানলাম—"শুনেছেন তো, ঘনাদা, আজগুবি কথা! মহাভারতের গুল না ভুল বার করেছে শিশির!"

কিন্তু কই, তাঁর সাড়া কই। ঘনাদার চোখ দুটো যেন একটু কোঁচকানো, কিন্তু মুখ দিয়ে তো স্রেফ খানিকটা ধোঁয়াই ছাড়লেন!

আর কোনও আশা আমাদের নেই ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। ঘটল শিশিরেরই ডুবতে গিয়ে কুটো ধরার এক চালে।

আমরা যখন ঘনাদার মুখের দিকে আকুল হয়ে চেয়ে আছি তখন হঠাৎ বারান্দা থেকে তার বাজখাঁই গলা শোনা গেল—"বনোয়ারি, রামভুজ! বলি, তোমরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ নাকি! খাবারগুলো কি ভিজে ন্যাকড়া করে আনবে!"

ব্যস, ওই ক-টা কথাতেই অমন ভোজবাজি হয়ে যাবে কে ভেবেছিল!

ঘনাদাকে আরাম-কেদারায় হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসতে দেখা গেল।

তারপর আমাদের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মুখও খুললেন!

কিন্তু যা আশা করছিলাম সে বজ্রস্বর কোথায়? তার বদলে নরম গলায় যেন একটু আসকারা দেওয়া জিজ্ঞাসা—"শিশির খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্তটা বেঠিক বলছে, না?"

তা গলাটা খাদেই হোক বা নিখাদে, আমরা ওই মুখ খোলাটুকুতেই কৃতার্থ।

আগুনের ওই ফুলকিটুকুই গনগনে করে তোলবার আশায় প্রাণপণে হাওয়া দিলাম।

শিশির তখন বারান্দা থেকে তার জায়গায় এসে বসেছে। তাকে প্রায় খুনের আসামির কাঠগড়ায় তুলে কড়া নালিশ জানালাম, "শুধু বেঠিক কী! ও বলছে ভুল না হলে গুলও হতে পারে। কৃষ্ণ আর অর্জুন নাকি খাণ্ডব বনে আগুনই লাগাননি!"

"তা, শিশির ভুল আর কী বলেছে!"

একেবারে হাঁ হয়ে গিয়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম। না, আমাদের শোনার কিছু ভুল হয়নি। কথাগুলো ঘনাদার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।

"কিন্তু, খাণ্ডব বনে আগুন তাহলে লাগল কী করে?" হতভম্ব মুখে আগের মিথ্যে করে বানানো প্রশ্নটা এবার সত্যি করেই বললাম ঘনাদাকে।

উত্তর তখনই মিলল না। ঘনাদার চোখ তখন বনোয়ারি যেখান দিয়ে ঢুকছে সেই দরজার দিকে।

উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করতে হল তাই। একটু মানে, আলুর দম সমেত ডজন খানেক হিঙের কচুরি আর প্রায় ততগুলি ইলিশ ভাজার সদ্‌গতির পর বনোয়ারির দেওয়া প্লেটটি চাঁচাপোঁছা হয়ে যতক্ষণ না ঘনাদার কোল থেকে আবার সামনের টেবিলে নামল।

প্লেট নামিয়ে চায়ের পেয়ালাটা মুখে তোলবার পর নিজে থেকেই আমাদের প্রশ্নটা স্মরণ করে বললেন, "কেমন করে খাণ্ডব বনে আগুন লাগল জিজ্ঞাসা করছ? কেমন করে আর! অগ্নিদেব নিজেই আগুন লাগালেন নিজের গরজে।"

"মহাভারতেও তো তাই আছে"—আমরা উৎসাহিত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না।

ঘনাদা তর্জনী আর মধ্যম আঙুলের মাঝে শিশিরের জ্বালিয়ে দেওয়া পরের সিগারেটটি ধরে বাধা দিয়ে বললেন, "ওইটুকুই মহাভারতে ঠিক আছে, তার বেশি নয়।"

"তার মানে?" আমাদের বিস্ফারিত চোখে বলতেই হল, "ইন্দ্রদেব মেঘের পাল নিয়ে বৃষ্টিতে আগুন নেভাতে আসেননি?"

"আসবেন না কেন?" ঘনাদা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "ইন্দ্রদেবও বৃষ্টি নামিয়েছেন, কৃষ্ণার্জুনও সে বৃষ্টি উড়িয়ে দিয়েছেন অস্ত্রের কেরামতিতে, কিন্তু সে লড়াই তো আপোসের। তলায় তলায় ইন্দ্রদেবের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের সড়-ই ছিল ওই রকম।"

"ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ আর অর্জুনের সড়!"—আমরা সত্যিই এবার থ— "অগ্নিদেবের বিরুদ্ধে?"

"বিরুদ্ধে কেন হবে! তাঁরই মঙ্গলের জন্য!" ঘনাদা কেদারায় হেলান দিয়ে এবার করুণা করে একটু বিশদ হলেন—"আসলে কৃষ্ণ অর্জুন খাণ্ডব বনে এসেছিলেন ময়দানবকে খুঁজতে। দুনিয়ায় ময়দানবের মতো এত বড় কারিগর আর নেই। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের যে সভাঘর তৈরি হবে তার জন্যে ময়দানবকে দরকার।"

কিন্তু খাণ্ডব বনের কাছে পৌঁছতে এক চিমসে হাড্ডিসার বামুন ধুঁকতে ধুঁকতে

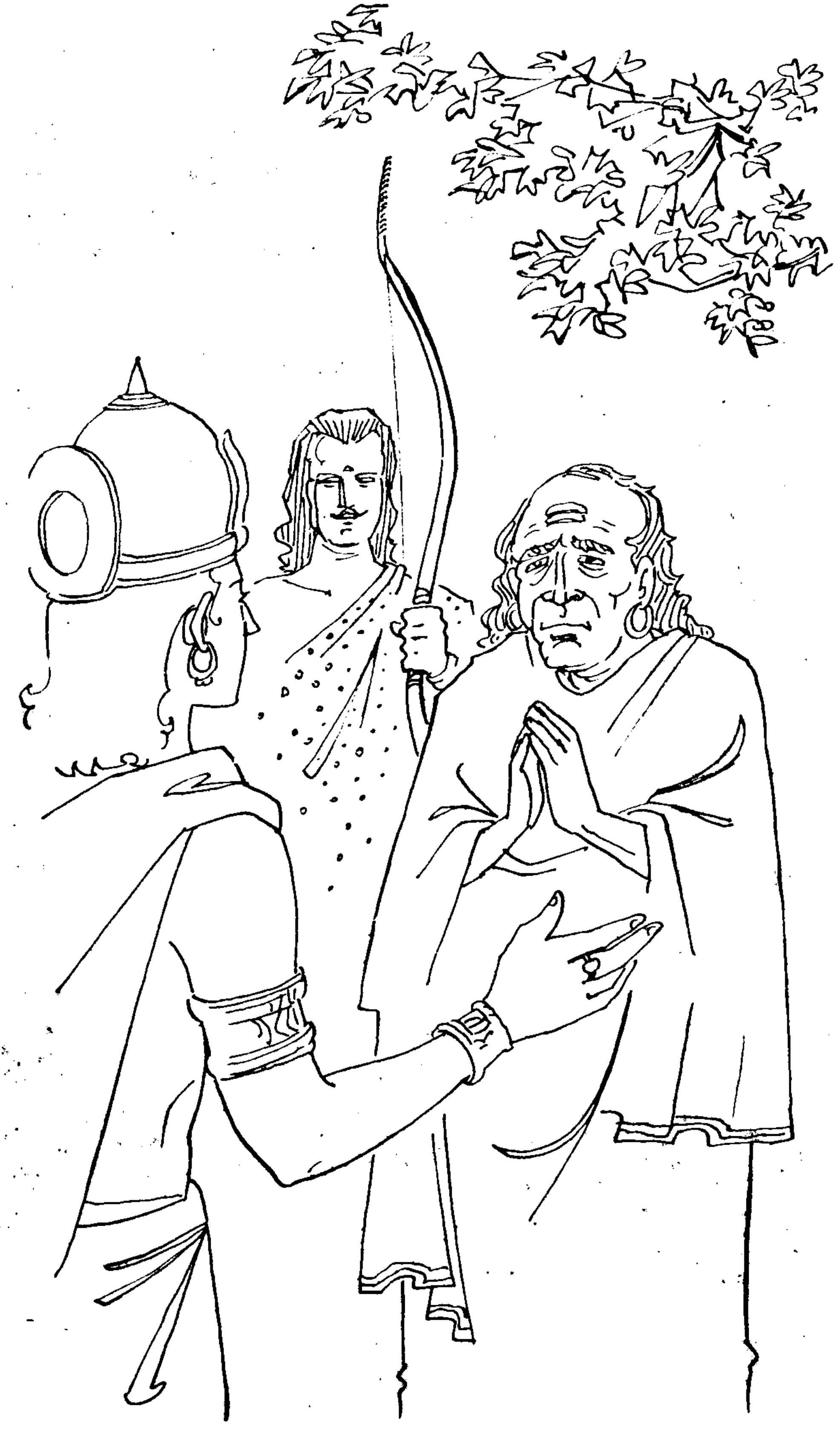

তাঁদের সামনে এসে হাজির। ধনঞ্জয় চিনতে না পারলেও বাসুদেব তাঁকে দেখেই চিনেছেন।

'এ কি অগ্নিদেব? এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!'

'আর বলো কেন!' বলে অগ্নিদেব তাঁর অসুখের যে লম্বা ইতিহাস শুরু করলেন তা আর শেষই হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত তা থেকে মোদ্দা কথা যা জানা গেল তা এই যে, শ্বেতকী নামে এক রাজার যজ্ঞের বাতিকেই অগ্নিদেবের শরীরের এই দশা। শ্বেতকী রাজার যজ্ঞ করে আর আশ মেটে না। বছরের পরে বছর এক পুরুত হার মানলে রাজা অন্য পুরুত দিয়ে শুধু যজ্ঞই করে যায়, আর অগ্নিদেবকে সেই অফুরন্ত যজ্ঞে বসে বসে জালা জালা ঘি খেতে হয়। সেই ঘি খেয়ে খেয়েই অগ্নিদেবের এমন অগ্নিমান্দ্য যে কিছু আর হজম হয় না, কিছু মুখে রোচে না। সারাক্ষণ শুধু পেট জ্বালা আর চোঁয়া ঢেকুর।

'তা আপনাদের স্বর্গের অত বড় কবিরাজ অশ্বিনীকুমারদের একবার দেখালেই তো পারেন!' না বলে পারলেন না ধনঞ্জয়।

'তা কি আর দেখাইনি!' করুণ স্বরে বললেন অগ্নিদেব, 'আর তাঁদের বিধান শুনেই তো আপনাদের কাছে এসেছি।

'তাঁদের বিধান শুনে আমাদের কাছে?' অর্জুনও অবাক, 'কী তাঁদের বিধান?'

'বড় কুমার বলেছেন, মাংস খান যত পারেন আর ছোট বলেছেন, সেদ্ধ-টেদ্ধ নয়, শুধু আগুনে ঝলসানো টাটকা মাংস খেতে।' অগ্নিদেব নিজের সমস্যাটা ব্যক্ত করলেন, 'তাই এই খাণ্ডব বনটা জ্বালাতে এসেছিলাম। কিন্তু এ বন আবার দেবরাজ ইন্দ্রের খাস তালুক। কোথাও দুটো মরা গাছের শুকনো কাঠ একটু ধরাতে না ধরাতেই একেবারে আকাশ-ফুটো-করা জল ঢেলে নিভিয়ে দেন। এই দুঃখেই আপনাদের কাছে এসেছি। দোহাই আপনাদের, দেবরাজ ইন্দ্রকে যেমন করে হোক ঠেকিয়ে খাণ্ডব বনটা আমায় পুড়িয়ে খেতে দিন।'

অগ্নিদেবের মিনতি শেষ হতে না হতেই শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন, 'তথাস্তু। আপনি খুশিমত খাণ্ডব বন পোড়ান গিয়ে যান। দেবরাজ ইন্দ্রকে আমরা সামলাচ্ছি।'

অগ্নিদেব তো শুনেই খুশি হয়ে চলে গেলেন। অর্জুন কিন্তু হতভম্ব।

'এ কী করলে, বন্ধু!' কৃষ্ণকে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কিছু না ভেবে-চিন্তে অগ্নিদেবকে তথাস্তু বলে দিলে! খাণ্ডব বন আমরা পোড়াতে দেব কেন? এত কষ্ট করে যাঁকে খুঁজতে এসেছি সেই ময়দানব ওখানে থাকেন। তা ছাড়া বনের জন্তু জানোয়ার আমাদের কী করেছে যে, তাদের এমন সর্বনাশে সাহায্য করব! দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেও বা এমন অন্যায় করে যুদ্ধ করতে যাব কেন?'

'আহা—সত্যি কি ওসব করব নাকি!' হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'দেবরাজকে স্মরণ করে এখুনি চালটা সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। অগ্নিদেব নিজে যা পারেন করুন, আমরা বাইরে থেকে তাঁর হয়ে দারুণ যুদ্ধ করার ভান করে ইন্দ্রদেবকে আগুন নেভাতেই সাহায্য করব।'

'বলছ কী?' ধনঞ্জয়ের দুচোখ এবার কপালে—'অগ্নিদেবকে অমন মিথ্যে ভরসা

দিলে!'

'দিলাম ওঁরই ভালর জন্য!' আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাসুদেব, 'শুধু ঘি খেয়ে তো নয়, নাগাড়ে যজ্ঞস্থানে থুম হয়ে বসে বসে ভুজ্যি খেয়ে ওঁর পেটের ওই অবস্থা। মাংসের চেয়ে ওঁর বেশি দরকার একটু ছোটাছুটি। তা এই খাণ্ডব বনে ছোটাতে ছোটাতে ওঁর কালঘাম বার করবার ব্যবস্থা করব। উনি কোথাও দুটো শুকনো কাঠ ধরাতে না ধরাতেই দেবরাজ পশলা পশলা বৃষ্টি ঢালবেন তা নেভাতে, আমরাও তা ঠেকাবার নামে পবনদেবকেই রাখব রুখে, যাতে আগুন না ছড়ায়। তাতে অগ্নিদেবকে সারাক্ষণ ছোটাছুটিই করতে হবে সারা বন, শুকনো জায়গার খোঁজে। তাতে শিকার পান বা না পান, তাঁর পেটের রোগ একেবারে যাবে সেরে।'

'কিন্তু—'

অর্জুন একটু আপত্তি জানাতেই শ্রীকৃষ্ণ হেঁকে বললেন, 'অগ্নিদেব যদি জানতে পারেন সেই ভয় করছ তো? না, সে ভয় নেই। অগ্নিদেব জানবেন আমরা দুজনে যুদ্ধ করে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছি। কেমন করে জানবেন? ওই যে বায়স ক-টি দেখছ, মাথার ওপর কা কা করছে, ওরা হল বার্তা বিশারদ, সংবাদ দেবার নেবার সাংবাদিকও বলতে পারো। কা কা করে ওরা খবর কুড়িয়ে আর ছড়িয়ে বেড়ায়। ওদের মুখেই আমাদের চুটিয়ে লড়াই করার খবর অগ্নিদেবকে আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আপাতত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভাতেও এই বিবরণই যাবে। শেষকালে শুধু ছোট একটু টীকা থাকবে,—এ অলীক বিবরণের কারণ বুঝিয়ে তা সংশোধন করার।'"

ঘনাদা থামলেন।

তারপর নিজে থেকেই আমাদের জিজ্ঞাসাটা আঁচ করে নিয়ে বললেন, "মহাভারতে সে টীকাটা কেন নেই জানতে চাইছ তো? না, দারুক মূষিক কোম্পানি কি বল্মী বিশারদের কাজ এটা নয়। দোষ তালপাতা জোগান যে দিয়েছিল সেই ব্যাপারীর। গণেশঠাকুরকে যেসব তালপাতার জোগান দেওয়া হয়েছিল তার কিছু ছিল রীতিমতো পুরনো, ঘুন-ধরা, মুচমুচে। পুঁথির রাশ নাড়াচাড়ার সময় তার খাস্তা হয়ে যাওয়া একটা টুকরো কখন কোথায় খসে পড়েছে কেউ টেরই পায়নি। টীকাটুকু ওখানেই ছিল।"

ঘনাদা কেদারা ছেড়ে উঠলেন। তাঁকে আর চাইতে হল না। পকেট থেকে গোটা একটা সিগারেটের টিন বার করে শিশির নিজেই তাঁর হাতে গুঁজে দিল।

ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্

ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্

“রান্না হয়েছে?”

“না। ঘোড়াগুলো বাগানে।”

“সে কী? কামড়ালেই তো হয়।”

“মোটে সাততলা যে।”

এ পর্যন্ত পড়ে কী মনে হচ্ছে? কোনও পাগলা গারদে হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন বলে যদি ভয় হয় তা হলে অন্যায় কিছু নয়।

পাগলা গারদে ছাড়া আর কোথাও ওরকম আলাপ চলতে পারে কি?

হ্যাঁ, পারে। একটিমাত্র তেমন জায়গা দুনিয়ায় আছে। বলতে না বলতেই মনে পড়েছে নিশ্চয়। হ্যাঁ, অনুমানে কারও ভুল হবার কথা নয় । সে সৃষ্টিছাড়া জায়গাটির ঠিকানা হল বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন।

সেই বাহাত্তর নম্বরের নীচের তলায় খাবারঘরে বসে এক ছুটির দিনের সকালবেলা আমাদের এই আজগুবি আলাপের আতশবাজি চলছিল।

এ খেল বেশিক্ষণ চালানো বড় সোজা কথা নয়। আমাদের দুর্বুদ্ধির ভাঁড়ারে তখন প্রায় টান পড়ার জোগাড়।

তবু থামলে আমাদের তো চলবে না।

যার জন্য এসব কারসাজি তিনি একেবারে কাবু না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ছুটি নেই।

কাবু হবার কিছু লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে! যেভাবে নিজের টং থেকে হাঁক না পেড়ে সকালের দোসরা দফা চায়ের জন্য নেমে এসেছেন, তাতে মনে হচ্ছে ভেতরের চিড়বিড়িনিটা শুরু হয়ে গেছে বা হতে দেরি নেই।

আমাদের সঙ্গ সম্পূর্ণ পরিহার না করে এইখানেই যে নেমে এসেছেন সেটা এই চিড়বিড়িনিরই একটা লক্ষণ। যেখান থেকে জ্বালার উৎপত্তি শোধ নেবার আশায় সেখানেই ঘুরে ফিরে আসাটা আশাপ্রদ। কিন্তু শোধটা কী নেবেন ঘনাদা তা-ই দেখতে চাই।

আমরা মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিই তিনি ঘরে ঢুকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে রান্নাঘরমুখো চেয়ারটায় বসবার পর।

“যাক, খেলাটা আজ থলথলে,” শিবুই শুরু করে।

“তাহলে বি-কম পাশ্ বেয়াই চাই,” আমি যোগ দিই।

"চিনেমাটির কথা আসছে কেন?" শিশির বলে।

"সন্দেহ থাকে তো বেলের পানা খাও!" বলে গৌর পালাটা শেষ করে দেয়।

বনোয়ারি তখন সকলের সামনে চায়ের পেয়ালা ধরে দিয়েছে। সেই সঙ্গে একটা বড় থালায় টেবিলের মাঝখানে এক পাহাড় পাঁপর ভাজা।

হ্যাঁ, আমরা এ ক-দিন ধরে এমনই হিসেবিই হয়েছি। খরচখরচা সম্বন্ধে দারুণ কড়াক্কড়ি চালাচ্ছি। পয়সা খরচের কিপটেমিটা পুষিয়ে নিচ্ছি প্যাঁচালো কথার ঝুড়ি উজাড় করে।

কিন্তু সে ঝুড়িও যে প্রায় ফুরিয়ে এল।

থালা থেকে পাঁপর তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে আড়চোখে ঘনাদার ওপর নজর রাখি।

ঘনাদা অবজ্ঞা করে পাঁপর স্পর্শ করেননি। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবার ধরনটা কিন্তু ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ফাটব ফাটব হয়েছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু সলতে যে একটু ধরেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর একটু প্যাঁচ কষে সুতরাং দেখতে হয়।

গৌরের ইশারায় শিবুই রামভুজকে হাঁক পেড়ে ডাকে।

আমাদের সঙ্গে এতকাল থেকে রামভুজ বাহাত্তর নম্বরের চালচলনে পোক্ত হয়ে গেছে। সব কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত।

সে ভাবলেশহীন মুখে রান্নাঘর থেকে কোমরে বাঁধা গামছাটায় হাত মুছতে মুছতে এ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যেন আদেশের অপেক্ষায় বলে, "হাঁ, বাবু?"

"হাঁ!" শিশির উত্তেজিত হয়ে ওঠে রীতিমত, "হাঁ কী বলছ, রামভুজ। উইটজেনস্টাইন কী প্রমাণ করেছেন জানো তো?"

"হাঁ, বাবু।" রামভুজ অম্লান বদনে বলে।

"ফের হাঁ।" এবার শিবু আপত্তি জানায় দুঃখের সঙ্গে।

"হাঁ বলে কিছু নেই—সব চোখ আর কান।"

"তা গতকালের মেনু কী করছ বলো?" গৌর আগ্রহভরে জানতে চায়!

"এত আগে থাকতে কেন?" আমি প্রবল আপত্তি জানাই, "গতকালের তো এখনও এক বছর বাকি।"

"তা বটে!" এক কথায় স্বীকার করে গৌর, "তা হলে পাঁজিটা এখন ছেঁড়া যাক।"

"আরে! আরে!" যেন ককিয়ে ওঠে শিবু, "ওটা ময়রার ভিয়েনে ভাজা!"

"না—আ!"

প্রতিবাদ নয়, যেন হুংকার মেশানো হ্রেষা ধ্বনি। আর ও ধ্বনি যে কার তা বোধহয় বলতে হবে না।

হ্যাঁ, অবশেষে সলতের ধিকি ধিকি আগুন বোমার খোল পর্যন্ত পৌঁছয়।

ঘনাদাই দাঁড়িয়ে উঠে হুংকার ছেড়ে বলেন, "ভিয়েন নয়, হোয়েল! তিমি! তা তিমি না ধরে বুনো সিম খুঁজলেই পারো! হোয়েল ছেড়ে হো-হো-বা।"

মনে মনে 'সাবাস' বলতেই হয়। প্রলাপের পাল্লাতেও ঘনাদা যে আমাদের টেক্কা দিয়েছেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কথাগুলো জ্বলন্ত স্বরে আমাদের শোনাতে শোনাতেই ঘনাদা কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে দোতলার সিঁড়িতে।

সেখানে তাঁর স্যান্ডালের শব্দ শুনতে শুনতে আমরা একেবারে যাকে বলে বেপথু অবস্থায় পরস্পরের মুখের দিকে চাই।

ঘনাদার এ চালটার কী মানে করব?

যেমনটি আমরা চেয়েছি তাই হল কি?

না, ঘনাদা আমাদের আর-এক ল্যাং মেরে গেলেন।

তাঁর এই ল্যাং মারার অপমানেই তাঁকে জব্দ করার জন্য এ ক-দিন বাহাত্তর নম্বরকে এমন পাগলা-গারদ বানিয়েছি। নিজের দাওয়াই তিনি নিজেই একবার চেখে দেখুন কেমন লাগে।

একদিন-দুদিনে নয়, হপ্তার পর হপ্তা এক জ্বালা সয়ে সয়েই না আমরা এমন খেপেছি!

অপরাধ আমাদের কী ছিল? না, কথায় কথায় আমাদের মাথায় মহাভারতের গাঁট্টা আমরা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ঘনাদাকে তখন পুরাণের প্রেতে পেয়েছে। দিন-রাত শুধু মহাভারতই দেখছেন সব কিছুতে সর্বত্র—যা কিছু বলো, যা কিছু করো, মহাভারত এনে ফেলবেনই সেই সুবাদে।

দিনকয়েক মন্দ লাগেনি। তার সঙ্গে দু-চারবার সঙ্গতও করেছি।

কিন্তু তারপর আর কতদিন ভাল লাগে। আমরা ক্রমে ক্রমে একটু বাঁকা সুর ধরছিলাম। মহাভারতের কথা তুললেই যেন জরুরি দরকারে কেটে পড়ছিলাম টঙের ঘর থেকে।

তাইতেই আমাদের ওপর বিগড়ে ঘনাদা এক বেয়াড়া চাল ধরলেন।

এবার আর বাক্যালাপ বন্ধ কি মেস ছেড়ে যাবার হুমকি নয়। এক হিসেবে যেন মিছরির ছুরি চালানো।

আমরা অনেক আশা করে বনোয়ারিকে দিয়ে প্লেটজোড়া কবিরাজি কাটলেট আর মটন চপ সযত্নে বইয়ে নিয়ে টঙের ঘরে হাজির হই।

ঘনাদা সাদরেই আমাদের অভ্যর্থনা করেন। প্লেট সাফ করার ব্যাপারেও কর্তব্যের ত্রুটি করেন না। শুধু আমরা উসকে দেবার জন্য যে কথাই তুলি তা যেন কান শুনতে ধান শোনেন।

তাঁকে একটু তাতাবার মতলবে বড় রাস্তার সেরা ময়রার অমৃতি আর খাজার ঘুষ সমেত আমরা হয়তো পাটনার ভয়াবহ বন্যার খবরটা একটু ফলাও করে বলি। তিনি খাজার পাঁপরগুলো তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে চিবোতে আমাদের দিকে দৃকপাতই যদি না করতেন তা হলেও আগের নজির মনে করে আমরা একটু ভরসা পেতাম।

কিন্তু তিনি চাল একেবারে পালটে ফেলেছেন।

আমাদের দিকে ফিরে তিনি উৎসাহভরে খাজার পাঁচালি শুরু করে দেন। কোথায়

যেন ময়রার হাতে খাজার পাক একেবারে আহামরি এই আলোচনা।

আমরা একটু খোঁচা দিয়ে যদি আসল প্রসঙ্গটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাতে আরও বে-লাইনে তিনি চলে যান।

পাটনাকে সাতনা শুনে তিনি সেখানকার রেল-স্টেশন থেকে নেমে একেবারে খাজুরাহোই প্রায় রওনা হয়ে পড়েন।

অনেক কষ্টে তাঁকে থামিয়ে অন্য টোপ ধরাবার চেষ্টা করতে হয়।

কিন্তু যা-ই করি, ফল সেই একই। ঘনাদা কোনও টোপ তো গেলেন-ই না, তার বদলে উলটো বোঝার ভান করে আমাদের সব চাল বেচাল করে দেন।

তাঁর এই মতলবি বেয়াড়াপনাতেই মেজাজ বিগড়ে গেছে সবচেয়ে বেশি।

পাটনার বন্যায় তাঁকে ভাসাতে না পেরে আমরা পরদিন বিকেলে হয়তো রুশ-মার্কিন মহাকাশ মিতালির কথা একটু পাড়তে গেছি। ফাঁকা কথার উসকানি নয়, তার পেছনে একটা গোটা কমিসারিয়েট আছে বলা যায়। পার্ক স্ট্রিটের সেরা কেটারার-এর প্যাটি রোল থেকে পেস্ট্রির রকমফের।

ঘনাদার সামনে এই নৈবিদ্যে সাজিয়ে একটু উৎসুকভাবেই হয়তো বলেছি, "মহাকাশের কোলাকুলি এবার কি আর মাটিতে নামবে না? কী বলেন, ঘনাদা?"

ঘনাদা চুপ করে থাকেননি। ছোটখাটো পাশবালিশের মতো সসেজ রোলটি প্রায় চোখ বুজে গলাধঃকরণ করতে করতে ঘাড় নেড়ে যেন আমাদের কথাতেই সায় দিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয়!"

আমাদের তখন আর পায় কে? ঘনাদা আমাদের দিকেই ঘাড় কাত করে বলেছেন, 'নিশ্চয়!' আমরা উৎফুল্ল মুখে পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ঘনাদার দিকে চাতকের মতো চেয়ে থেকেছি।

ঘনাদা বিমুখ করেননি।

কিন্তু জল চাইতে ছুড়ে দিয়েছেন একটি নিরেট বেল!

সসেজ-রোল-এর মর্যাদা রেখে চিকেন প্যাটি-টির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছেন, "মাটিতে নিশ্চয় নামবে। ওরা গাছে গাছেই থাকতে ভালবাসলেও মাটিতে মাঝে-সাঝে নামে। বড় গেঁতো জানোয়ার—আমেরিকার স্লথের যেন মামাতো ভাই। নামটা অবশ্য কোলা নয়, কোয়ালা। ডাক-নাম ছেড়ে আসল নামও বলতে পারো—ফ্যাসকোলার্কটস সিনেরিয়স।"

কী মনে হয় এরকম বুকনি শুনলে?

সিনেরিয়স শুনে ভেতরে ভিসুভিয়সই জেগে উঠেছে বলে ভয় হয় না?

সে রকম কিছু হবার আগেই অবশ্য মুখ গোঁজ করে সবাই নীচে নেমে যাই। নীচে নেমেই ইমার্জেন্সি মিটিং বসে যায় এ অত্যাচার আর নীরবে সহ্য করবার নয়। পালটা জবাব এর দিতেই হবে। তাতে এসপার ওসপার যা হয় হোক।

সেই জরুরি পরামর্শ-সভাতেই বাহাত্তর নম্বরকে বাতুলাশ্রম বানাবার এই নতুন প্যাঁচ আমরা ছকে বার করেছি।

সোজা প্যাঁচ তো নয়, একেবারে সূচিকাভরণ। ঘনাদা হয় পুরো ঠাণ্ডা মেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবেন, নয় তেতে উঠবেন, স্ফুটনাঙ্ক মানে বয়লিং পয়েন্ট পর্যন্ত।

তা, পয়লা নম্বরের প্রলাপটি ছেড়ে যেভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তাতে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো ছাড়িয়ে গেছেন বলেই মনে হয়।

পারাটা এমনই তুঙ্গে থাকতেই থাকতেই যা করবার করতে হয়। সময় নষ্ট না করে তাই অভিযানটা তখনই শুরু করে দেওয়া হল।

আক্রমণের কায়দাটা এবার একটু ভিন্ন। সেই সবাই মিলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে টঙের ঘরে গিয়ে ওঠা নয়। তার বদলে প্রায় অগোচরে অনুপ্রবেশ।

প্রথম পাঠানো হবে বনোয়ারিকে। সঙ্গে টুকটাক কিছু ঘুষ তো নয়ই, এক কাপ উপরি চা-ও না। হাতে একটা শুধু কাগজের চিরকুট।

'এহি কাগজ পড়িয়ে দেখেন বড়াবাবু!' বলে বনোয়ারি কাগজের চিরকুটটি নিবেদন করবে।

ঘনাদা বেশ একটু অবাক হবেন নিশ্চয়। অবাক আর সেইসঙ্গে গরমও।

বনোয়ারি ওপরে এসেছে খালি হাতে শুধু তাঁকে একটা চিরকুট দিতে!

মেজাজ গরম হোক, চিরকুটটা দেখবার কৌতূহল ঘনাদা বোধহয় সামলাতে পারবেন না।

কিন্তু হাতে নিয়ে একটু চোখ বুলোতে না বুলোতেই মেজাজের পারা চড় চড় করে চড়বে।

চিরকুটের ওপর লেখা রাত্রের মেনু। তার নীচে যে ফর্দটি থাকবে তাই ঘনাদার বিস্ফোরণের পক্ষে যথেষ্ট।

সেখানে খাবারের ফর্দে থাকবে মাত্র তিনটি আইটেম—চাপাটি, সবজি, চাটনি।

রাত্রের মেনুর এই হাল দেখে ঘনাদার ফাটবার উপক্রম হতে না হতেই প্রথমে আমার প্রবেশ।

টঙের ঘরে প্রবেশের পরই বনোয়ারিকে বকুনি। 'বুদ্ধিশুদ্ধি কোনওকালে কি হবে না! ও চিরকুট কে আনতে বলেছিল!'

নিজেই চিরকুটটা তারপর ঘনাদার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, বা তিনি গোড়াতেই ও চিরকুট অবজ্ঞাভরে ফেলে দিয়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিয়ে, আমি নাক বাঁকিয়ে পড়ব, 'চাপাটি! সবজি! চাটনি! একেবারে ভারতীয় থ্রি কোর্স ডিনারের মেনু করেছেন ওঁরা। খাদ্য বাঁচাও আন্দোলনের সব নেতা! না, না, ও সব চলবে না!'

চিরকুটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি পকেট থেকে আর-একটি ফর্দ বার করব।

ঘনাদা সেটি পড়তে উৎসাহ প্রকাশ করুন বা না করুন, তার অপেক্ষায় না থেকে, নিজেই পড়তে শুরু করব সেটা। 'এই দেখুন না—মিহি বাসমতী চালের ভাত, ভাজা মুগের ডাল, মাছভাজা, মাছের ডালনা—'

ওই পর্যন্ত পড়তে পড়তেই পেছন থেকে বাঁকা সুরে ভ্যাংচানি শোনা যাবে—'ভাত, ডাল, চচ্চড়ি! ভারী আমার মেনু শোনাতে এসেছেন, যেন শ্রাদ্ধবাড়ির নেমন্তন্ন!'

গলাটা শিশিরের। বলতে বলতে সে এগিয়ে এসে ঘনাদার তক্তপোশে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েই বলবে, 'না, না, ঘনাদা। ও সব বাজে মেনু একদম বাতিল! এই নতুন মেনু শুনুন—লুচি, বেগুনভাজা, ধোঁকার ডালনা, কুমড়োর ছক্কা, ছোলার ডাল নারকেল দিয়ে, মাছের কালিয়া—'

'থাক।' গৌরের কড়া গলা শোনা যাবে এবার। দরজা থেকেই প্রায় ধমকের সুরে ওই কথাটি বলে গৌর ঘরে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করবে—'কী সব যা-তা মেনু শুনিয়ে ঘনাদার খিদেটা নষ্ট করছ তোমরা! লুচি বেগুনভাজা! যেন পাত পেড়ে নেমন্তন্ন খাওয়াতে ডাকছ ঘনাদাকে! না, ঘনাদা ওসব কথায় কান দেবেন না। আজকের যা মেনু সব অর্ডার দিতে পাঠিয়েই আসছি। ও লুচি-ফুচি নয়, স্রেফ বিরিয়ানি পোলাও, আর রগন জুশ আর মাংসের হাঁড়িয়া কাবাব—'

এই পর্যন্ত বলতে বলতেই শিবু এসে হাজির হবে।

'কী! যা যা বলেছি, অর্ডার দিয়ে এলি তো?' গৌর আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করবে শিবুকে।

শিবুর শুধু সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা যাবে—'না।'

'না!' গৌরের গলা থেকে যেন ভূমিকম্পের গুরু গুরু শোনা যাবে—'না মানে? বিরিয়ানি, পোলাও, রগন জুশ—এ সবের অর্ডার দিয়ে আসিসনি?'

'না তো বললাম!' শিবু মাতব্বরি চালে জানাবে, 'এই বর্ষার দিন, এমনিতেই সব শরীর নরম যাচ্ছে, তার ওপর ওই সব ঘি মশলার বাদশাহি খানা খেয়ে ঘনাদার ভালমন্দ কিছু হোক আর কী? ওধার দিয়েই তাই যাইনি!'

'তা হলে?' গৌরের বদলে শিশিরই খিঁচিয়ে উঠবে, 'জল বার্লি আর থিন অ্যারারুট বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে এসেছ নাকি?'

'তা কেন দেব!' শিবু ভারিক্কি চালে বলবে, 'এই পোলাও কালিয়া ছাড়া পেটের সুসার আর মুখের তার দুই জোগাবার কিছু নেই?'

'কী আছে কী শুনি?' আমাদের যেন সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

'ফ্রায়েড রাইস! ফ্রায়েড প্রন! চিকেন চাউমিন! সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ফিশ। বেক্‌ড্‌ ক্র্যাব—'

শিবু একটা করে চিনে খাবারের নাম করবে আর আমাদের অন্ধকার মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

ঘনাদারও কি নয়!

এই প্রোগ্রাম ধরেই ঘনাদাকে শেষ পর্যন্ত কাত করে তাঁর প্রলাপের জবাবদিহির কালীয়দহে নিয়ে গিয়ে ফেলব এই ছিল মতলব।

আমাদের ওপর খেপে যে পাগলা-গারদ মার্কা গুলটি আজ ছেড়েছেন তা থেকে কেমন করে বেরিয়ে আসেন তাই দেখব এই আশাতে তখন আমরা ডগমগ।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা কি আর ঘটে!

বনোয়ারিই প্রথম দফায় তার বোকামিতে সব প্ল্যান গুবলেট করে দিলে। তারপর আমি।

হ্যাঁ, আমিই সেই আসল অপরাধী বাহাত্তর নম্বরের কলঙ্ক, সে কথা নিরুপায় হয়ে স্বীকার করছি।

অবশ্য বনোয়ারি জমিটাই গোড়ায় অমন নষ্ট করে না দিলে আমি অমন বেসামাল হই না। কিন্তু একটা প্যাঁচ যখন কষতে গেছি, তখন সব কিছু সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা আমার উচিত ছিল নাকি! বনোয়ারির গলতিটা তো আমিই শুধরে নিতে পারতাম।

তার বদলে যা হল, গোড়া থেকেই ব্যাখ্যান করি।

পাকা টাইমটেবল মাফিক বনোয়ারির মেনুর চিরকুট দাখিল করার ঠিক গুণে গুণে ত্রিশ সেকেন্ড বাদে আমার প্রবেশটা একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরেই হয়েছিল।

ঘনাদা তখন বনোয়ারির দেওয়া চিরকুটটাই ভুরু কুঁচকে পড়ছেন।

ঘনাদা নিজেই যখন পড়তে শুরু করেছেন তখন হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পড়ার চেষ্টাটুকু বাদ দিয়েছি। বাদ না দিলে ঘনাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরকুটটা তাঁর হাত থেকে নিতে হয়। ঘনাদা কোনখানে বসে চিরকুটটা পড়বেন সে বিষয়ে হিসেবের একটু ভুলের জন্যই এই অবস্থাটা হয়েছে অবশ্য।

লেখাটা কেড়ে নেওয়া যখন হল না তখন দূরে দাঁড়িয়েই ঘনাদাকে সেটা পড়ায় সাহায্য করবার চেষ্টা করলাম।

"কী পড়ছেন ওটা?" বিক্ষোভের সুর লাগিয়ে বললাম, "বনোয়ারিটা যেমন হাঁদা—একেবারে ভুল মেনুর ফর্দটা দিয়েছে আপনাকে।"

"ভুল!" ঘনাদা চিরকুটটা চোখের সামনে থেকে নামিয়ে যেন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন।

"হ্যাঁ, ভুল নয়?" আমি মাত্রামাফিক গরম হয়ে উঠলাম, "এই আমাদের রাত্রের ডিনার খাওয়া নাকি? চাপাটি, সবজি, আর চাটনি। আমরা যেন হেলিকপ্টার থেকে বিলানো খাবার প্যাকেট নিতে যাচ্ছি? না, না ফেলে দিন ও চিরকুট। আমরা—"

কথাটা আর শেষ করতে পারলাম না। ঘনাদা যেন দুঃখের সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন, "ফেলে দিতে বলছ? কিন্তু তা হলে একটু লোকসান হয়ে যাবে না?"

"লোকসান!" আমি একটু হোঁচট খেলাম। তারপর সেটা সামলে নিয়ে ব্যাখ্যাটা নিজের মনের মতো করে বললাম, "লোকসান ওই বন্যাত্রাণ মার্কা থ্রি কোর্স ডিনারটা বাতিল করছি বলে। তা হোক লোকসান। বাহাত্তর নম্বরে ও মেনু চলবে না। ছিঁড়ে ফেলে দিন ও চোথা চিরকুট।"

"কিন্তু চিরকুটটা খাবারের মেনুটেনুর যে নয়।" ঘনাদা যেন দুঃখের সঙ্গে জানালেন।

"খাবারের মেনুর নয়? তা হলে?" বলতে বলতেই আমার চক্ষু তখন স্থির হয়ে গেছে।

মেনুর চিরকুট ছাড়া আর একটি কাগজের টুকরোও তো আমাদের খাবার টেবিলে ছিল। সেইটিই আমাদের মূর্তিমান বনোয়ারিলাল যদি ঘনাদার হাতে এনে দিয়ে থাকে তা হলেই তো চিত্তির!

ঘনাদার দিকে চেয়ে কী বলব কী ভেবে না পেয়ে তোতলা হয়ে গেলাম এবার।

"মে-মে-মেনুর—কী বলে—!" বলতে গিয়ে পেছন থেকে শুনলাম, " 'কী বলে' কী?" গলাটা শিশিরের।

টাইমিং না রাখতে পারার গলতিতে শিশির তখন হাজির হয়ে গেছে টঙের ঘরে।

তার পিছু পিছু গৌর আর শিবুকেও তখন টঙের ছাদে দেখা যাচ্ছে।

শিশিরের কড়া প্রশ্নের উত্তরে তার দিকে বেশ একটু কাঁপা গলাতেই বললাম, "বনোয়ারি ঘনাদাকে যে চিরকুটটা দিয়েছে সেটা নাকি রাত্রের খাবারের মেনুর নয়।"

"না—।" ঘনাদা যেন নিরীহ ভাল মানুষের গলায় বললেন, "এটা যে কী বাজি রাখার হিসেব মনে হচ্ছে। এই যে লেখা—বাজি শিশির—দুদিনে ঠাণ্ডা—নইলে দুদিন চীনে হোটেল। তারপর শিবু—শায়েস্তার পুরো একটি হপ্তা। তার আগে হলে জোড়া ইলিশ। এবার সুধীর—পাঁচ দিনে জরুর হিট—নইলে আইসক্রিমের চার দুকুনে আটটি ইঁট। শেষে গৌর—যখন হবার তখন হোক—বাজি রাখে আহাম্মক।"

ঘনাদা সমস্তটা পড়ে টুকরোটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দেখো না তোমরা।"

দেখব আর কী, ও চিরকুট যে কী তা কি আমাদের বুঝতে বাকি আছে?

ঘনাদা আসবার আগে নীচের খাবার ঘরে আর কিছু না-করার পেয়ে আমরা ওই বাজি রাখারাখি খেলছিলাম। ঘনাদার এবারের ঠাণ্ডা লড়াই কতদিন চলবে তাই নিয়ে বাজি।

শিশির সব চেয়ে আশাবাদী। সে বলেছে, দুদিনের মধ্যে ঘনাদাকে ঠাণ্ডা হতেই হবে। তার ভবিষ্যদ্বাণী যদি না ফলে তা হলে সে দুদিন আমাদের চিনা হোটেলে খাইয়ে দেবে কথা দিয়েছে।

শিবু কিন্তু অতটা আশা করে না। তার ধারণা হপ্তাখানেক লাগবে ঘনাদাকে ধাতে আনতে। এক হপ্তাতেও কিছু না হলে সে মেসে জোড়া ইলিশ কিনে আনতে রাজি হয়েছে।

গৌর কিন্তু এ বাজিটাজি রাখার একেবারে বিপক্ষে। তাই সে সোজা জানিয়ে দিয়েছে, এ সবের মধ্যে সে নেই।

গৌরের ওপর টেক্কা দেবার এমন মৌকা কি ছাড়া যায়!

আমি তাই শিশির আর শিবুর মাঝামাঝি পাঁচ-ই পাকড়ে ধরেছি। ঘনাদাকে পাঁচদিনেই সন্ধির সাদা নিশান ওড়াতে হবে এই আমার গণনা।

নিজেদের এই সব বেয়াদবি হাতে হাতে ধরা পড়ায় যখন আমরা লাল থেকে বেগনে হয়ে উঠেছি তখন ঘনাদাই আমাদের অমন করে সামলাবার সুযোগ দেবেন তা ভাবতে পারিনি।

আমাদের মুখের চেহারাগুলো যেন লক্ষই না করে ঘনাদা বললেন, "তা বাজি কীসের বলো তো?"

প্রশ্নটায় নয়, সেটা উচ্চারণের স্বর আর ভঙ্গিতেই আমরা তখন চমকিত। পুলকিতও সেই সঙ্গে হতে পারি বলে যেন একটু আশা হল। ঘনাদার গলায় রাগ-বিরাগের ঝাঁঝ কই? তার বদলে প্রায় মিঠে মোলায়েমই তো যায়—ঘনাদার

জন্য স্পেশাল মার্জিন দিয়ে।

সাহস করে মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখলাম ক-দিনের মেঘলা গুমোট একেবারে কেটে গিয়ে রীতিমত পরিষ্কার আকাশ।

"বাজিটা! বাজিটা!" আমি আমতা আমতা করে শুরু করবার এবার ভরসা পেলাম।

কিন্তু বাজিটা কীসের তা বলি কী করে?

শিশির আমার কাছ থেকে খেইটা টেনে নিয়েও সুবিধে করতে পারলে না। "বাজিটা বুঝেছেন কিনা—" বলে একবার ঘনাদার, একবার আমাদের দিকে চেয়ে বোকার মতো একটু হাসিতেই পদ পূরণ করতে চাইলে।

এদিকে সময় যে গড়িয়ে যাচ্ছে! ঘনাদার মুখ এখনও খুশি-খুশি। কিন্তু আমরা বাজির কথাটা নিয়ে আর কিছুক্ষণ এমন মিথ্যে লোফালুফি করলে এ খুশি ভাব আর থাকবে কি?

একটা কিছু এখন না বার করলেই নয়।

গৌর তারই একটু ভূমিকা করবার চেষ্টা করলে, "বাজিটা মানে, ওই চিরকুটে যা লেখা সেরকম কিছু নয়, মানে—"

মানেটা ওইখানেই আটকে থাকত। পরিষ্কার আর হত না। যদি না শিবুর মাথায় পট করে মুশকিল আসানের বুদ্ধিটা এসে যেত।

গৌরের হাতড়ে ফেরা খেইটাই ধরে ফেলে সে বললে, "মানেটা সত্যি কী, জানেন? মানে বলতে আপনাকে একটু লজ্জা হচ্ছে।"

"তাই নাকি?" ঘনাদার সুরটা এখনও কিন্তু বাঁকা নয়।

তাইতেই উৎসাহ পেয়ে শিবু যেন বেপরোয়া হয়ে বলে ফেলল, "আসলে আমরা বাজি ধরেছিলাম আপনার হারা-জেতার ওপর।"

"আমার হারা-জেতার ওপর!" ঘনাদা একটু যেন অবাক, কিন্তু মুখের কোথাও এখনও মেঘের চিহ্ন নেই।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—একবার লাইন পেয়ে গেলে আর ভাবনা! শিশির গড়গড়িয়ে এবার এজাহার চালিয়ে দিলে, "আপনি হারলে ক-দিনে হারবেন তারই হিসেবের ওপর আমরা বাজি রাখছিলাম।"

"আমি কিন্তু রাখিনি," গৌর তার সাধুত্ব ঘোষণা করলে, "আমি জানতাম, ও বেড়াটা আপনি তুড়ি দিয়ে উতরে যাবেন। ওরা যখন পাঁচদিন সাতদিন বলছে তখন আমি মনে মনে হাসছি। ভাবছি ঘনাদার কেরামতি নিয়ে বাজি ধরছে, পরীক্ষা করছে তাঁর ধাঁধা জোড়ার বাহাদুরি। যেন কবজির মাপ নিচ্ছে মহম্মদ আলির।"

গৌরের গাছের মগডালে তোলার প্যাঁচ বিফলে যায় না। ঘনাদা যেন যে-বর চাই, দেবার জন্য মুখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তা পরীক্ষাটা কীসের?"

"আরে—তাকে কি পরীক্ষা বলে! আপনার কাছে সেটা নস্যি—" গৌর নাকটা সিঁটকেই বললে, "ওই যে আপনি শেষ বলে এলেন-না—তা তিমি না ধরে বুনো সিম খুঁজলেই পারো। হোয়েল ছেড়ে হো—হো—বা।"

গৌর একটু থামতে আমরা আড়চোখে ঘনাদার মুখের দিকে তাকালাম। একটু ভারী ভারী যেন লাগছে।

ঠিক মাপা সেকেন্ডের ফাঁক দিয়ে গৌর তার কথাটা শেষ করলে, "ওরা বলছে যে মুখ ফসকে অমন প্রলাপের বুজকুড়িটা বেরিয়ে গেছে বলেই আপনি নাকি টঙের ঘরে পালিয়ে এসেছেন। ওই তিমির সঙ্গে সিম মেলাতে ক-দিন আপনাকে হিমসিম খেয়ে মরতে হবে, বাজি ধরেছে তার ওপর। আমি তাই ভাবছি, এতদিন সঙ্গ পেয়েও থোড়াই চিনেছে ওরা আপনাকে। হেঁঃ!"

শেষের নাসিকাধ্বনিটা গৌরের। সেটা আমাদের প্রতি নকল অবজ্ঞার, না যেমন মগডালে ঘনাদাকে তুলেছে, তেমনই সেখান থেকে মই কেড়ে নেবার বাহাদুরির তা বলা শক্ত।

কিন্তু গৌরের নাসিকাধ্বনি শেষ হতে না হতে তার প্রতিধ্বনি আসছে কোথা থেকে!

না, প্রতিধ্বনি তো নয়, এ যে ঘনাদার নিজেরই অকৃত্রিম পেটেন্ট করা নাসানাদ।

মগডালে তোলার পর মই কেড়ে নেওয়া মেজাজের মতো তো ঠিক শোনাচ্ছে না? ঘনাদা যেন করুণা আর কৌতুক মেশানো হাসি চাপছেন মনে হচ্ছে!

আমরা বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে ঘনাদা নাসিকা ছেড়ে রসনাই ব্যবহার করলেন আমাদের আমাদের প্রতি কৃপা করে।

"আরেকটা বাজির কথা মনে পড়ল কিনা, তাই হাসি পাচ্ছে।" ভাষায় প্রকাশ করেন ঘনাদা।

"আরেকটা বাজি!"

"হ্যাঁ, আরেকটা বাজি।" আমাদের সন্দিগ্ধ কৌতূহলটা মেটালেন ঘনাদা, "বাজি রেখেছিল গাওয়ার, ড্যানি গাওয়ার। গাওয়ার না বলে গোঁয়ার বলা যায়, আর তার চেয়ে গোরিলা বললেই মানায়।"

ঘনাদা সেই গোঁয়ার গোরিলার স্মৃতিতেই যেন তন্ময় হয়ে যেতে তাঁকে একটু উসকে দিতে হল।

"হ্যাঁ, কী যেন বাজির কথা বলছিলেন, ওই কোন গোরিলার সঙ্গে!"

"গোরিলা নয়, গাওয়ার।" ঘনাদা বর্তমানে ফিরে এসে আমাদের সংশোধন করলেন, "তবে চেহারাটা লোম-ছাঁটা সাদা গোরিলারই মতো।"

ঘনাদা আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে থামলেন। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে কী যেন মনে করবার চেষ্টায় বললেন, "কিন্তু তোমরা তখন কী যেন বলছিলে, কী যেন কী মেনুর কথা!"

এরপর আর আমাদের কিছু বলতে হয়! রাত্রের খাবারের মেনুর কথা সবে শুরু হয়ে ভারতীয় থ্রি-কোর্স চাপাটি ভাজি চাটনির বেশি তখন এগোয়নি। কিন্তু নিজেদের তাড়ায় মাঝখানের ধাপগুলো টপকে একেবারে চিনে ফ্রায়েড রাইসে পৌঁছতে আমাদের দেরি হল না।

"হ্যাঁ, সেই গোঁয়ার গোরিলা মার্কা ড্যানি গাওয়ার," ঘনাদার অন্যমনস্কতাও এবার

দূর হল, "তাকে ড্যানি বলে ডাকতাম। সেই ড্যানিই একবার জবর এক বাজি রেখেছিল আমার সঙ্গে।"

"আপনার সঙ্গে বাজি?" গোঁয়ার গোরিলা ড্যানির স্পর্ধায় আমরা বিদ্রূপের হাসি হাসলাম—"নাকে খত দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল নিশ্চয়!"

"না।" ঘনাদা আমাদের তাজ্জব করলেন—"সে বাজি হেরেছিলাম আমি, গো-হারান হার যাকে বলে। কিন্তু সে বাজি জিতেই শেষ পর্যন্ত খেপে গিয়েছিল ড্যানি। হারের বদলে জেতার শোধ নিতেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি যেখানে থাকি, খুঁজে বার করে হারপুন কামানে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় না করতে পারলে গোঁফদাড়ি আর কামাবে না।

ড্যানিও তখন তার পেশা-নেশা ছেড়ে হন্যে হয়ে সারা দুনিয়া আমায় খুঁজে ফিরছে, আর আমিও ওই তিমির সঙ্গে সিম মেলাতে অ্যারিজোনার মরু থেকে আলাসকার বেরিং সাগর পর্যন্ত পালিয়ে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অ্যাটকায় গিয়ে লুকিয়েছি। তিমির সঙ্গে সিম মেলাবার সময়টুকুর জন্যই অবশ্য এমন করে পালিয়ে বেড়ানো।"

"পালিয়ে বেড়ানো, কী বললেন, ওই তিমির সঙ্গে সিম মেলাতে?" আমাদের চোখগুলো ছানাবড়া হতে খুব দেরি নেই মনে হল।

"হ্যাঁ," ঘনাদা যেন সত্যের খাতিরে স্বীকার করলেন, "ওইটেই আসল দরকার। আর তার জন্য লুকিয়ে থাকার পক্ষে অ্যাটকা একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে।

অ্যাটকা কোথায় জানো না বোধহয়। না জানবারই কথা। কারণ, পৃথিবীর ভূগোল কোনও দেবতারই হাতের কেরামতি যদি হয়, তা হলে আলাসকা থেকে পূর্ব সাইবিরিয়া আঁকতে যাবার সময় অসাবধানে তাঁর তুলির কিছু ছিটে পড়ে গিয়েছিল বেরিং সাগরে। অ্যাটকা সেই ছিটেফোঁটার একটি।

দ্বীপটা লম্বায় চওড়ায় কুড়ি-বাইশ মাইলের বেশি কোনওদিকে নয়। সারা দ্বীপে পাহাড়ের ছড়াছড়ি। সবসুদ্ধ মোট শ-দেড়েক অ্যালুট আদিবাসী দ্বীপের ওই অ্যাটকা নামের গ্রামেই থাকে। বাকি দ্বীপটা জনমানবহীন। সেখানে শুধু বলগা হরিণের রাজ্য।

বেরিং সাগরের ওপর ভূগোলের দেবতার তুলির ছিটেগুলোর সাধারণ নাম অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

এ-দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী অ্যালুটরা সতেরোশো খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের স্বাধীন জীবন কাটিয়েছে। তারা মাটির চাপড়ার ঘরে থাকত, সমুদ্রের মাছ আর সিল ধরত, কখনও বা দ্বীপের ভেতরে পাহাড়ে জলায় বলগাহরিণ শিকার করত একটা-আধটা।

তাদের দুঃখের দিন শুরু হল প্রমিসলেন্নিকি শব্দটার সঙ্গে পরিচয় হবার পর। প্রমিসলেন্নিকি শব্দের মানে হল পশুলোমের ব্যাপারী। প্রথমে এ সব ব্যাপারী যারা আসত তারা রুশ। রুশরাই সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে সেখানে সাগর-ভোঁদড়, মেরু-শেয়াল—এইসব জানোয়ারের লোমওয়ালা চামড়া জোগাড় করবার জন্য আসতে শুরু করে।

রুশ ব্যাপারীরা অ্যালুটদের অনেক কিছু উপকার করেছে। তাদের ধর্ম দিয়েছে,

খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ শিকার ইত্যাদির নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছে। ব্যাপারী হয়ে এলেও লাভের লোভে তারা কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি। সাগর-ভোঁদড়ের চামড়ার দাম বরাবরই খুব বেশি। প্রমিসলেন্নিকিরা এই অ্যাটকা দ্বীপে বছরে তিনশোর বেশি সাগর-ভোঁদড় কিন্তু কখনও মারত না।

রুশ ব্যাপারীদের সংস্পর্শে এসে অ্যালুটদের সভ্যভব্য হবার দিকে যত ঝোঁকই হোক, ভাগ্যের মার তারা খেল সম্পূর্ণ অন্য এক অভাবিত দিক থেকে।

অ্যালুটরা হাজার বছর তাদের দ্বীপে প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে স্বাভাবিক জীবন কাটিয়েছে। সভ্য মানুষের কাছে সে ভাল অনেক কিছু যেমন পেল তেমনই পেল তাদের রোগ। সে সব রোগ তাদের রাজ্যে একেবারে অজানা বলে তা রোধ করবার ক্ষমতা তাদের হল না। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুখ মহামারি হয়ে তাদের বসতি-কে-বসতি উজাড় করে দিলে।

রুশরা আসবার আগে যাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার তারা দুশো বছরে প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ হয়ে মাত্র দু হাজারে নেমে এল।

১৮৬৭-তে আমেরিকা রাশিয়ার কাছ থেকে আলাসকার সঙ্গে এই দ্বীপপুঞ্জ কিনে নেবার পর অবস্থা আরও সঙ্গিন হল। রুশ ব্যাপারীরা বুঝেসুঝে চামড়ার জন্য সাগর-ভোঁদড় বা মেরু-শেয়াল শিকার করত। প্রথমে মার্কিন ব্যাপারীরা এসে মায়াদয়ার ধার না ধেরে কোনও নিয়মকানুনই আর মানলে না। দেখতে দেখতে উনিশশো দশ সালে সাগর-ভোঁদড়ের বংশই যেমন লোপ পেল তেমনই নির্বংশ হল মেরু-শেয়াল। অ্যাটকা দ্বীপের আদিবাসীদের নিয়তিও যেন মনে হল তাই। তারাও গুনতিতে তখন আধা হয়ে গেছে।

এর পর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। প্রথমে জাপানি, তারপর আবার মার্কিনরা ছিনিমিনি খেলল অ্যাটকাবাসীদের ভাগ্য নিয়ে। যে ক-জন তাদের তখনও টিকে ছিল, তাদের চালান করা হল আর-এক অখদ্দে অ্যালুসিয়ান দ্বীপে। সেখান থেকে যুদ্ধের শেষে ফিরল মাত্র গোনা-গুনতি ক-জন।

অ্যাটকার এই বিবরণ বেশ একটু যত্ন করেই আমায় জোগাড় করতে হয়েছিল, লুকোবার জায়গা হিসেবে দ্বীপটা বেছে নেবার আগে।

অ্যাটকা দ্বীপের সুবিধে অনেক মনে হয়েছিল আমার। প্রথমত সারা দ্বীপের একটি মাত্র গ্রাম-গোছের বসতিতে শ-দেড়েকের বেশি মানুষ থাকে না । দ্বীপের বাকি অংশের দুর্গম পাহাড় আর জলা বাদার রাজ্যে ইচ্ছে আর ক্ষমতা থাকলে সারা জীবনই বুঝি লুকিয়ে থাকা যায়। পাহাড়ে গুহা আছে, শুকনো শ্যাওলা বিছিয়ে নাও আরামের জন্য। বলগা হরিণ আছে পালে পালে। দরকার মতো শিকার করো, মুখ বদলাবার জন্য মাছ ধরতে পারো ছোটখাটো খাঁড়িতে কিংবা টারমাগান বা বুনো হাঁসও মারতে পারো একটা-আধটা। আর জলের জন্য পাহাড়ি ঝরনা একটা-দুটো মিলবে, দারুণ শীতের দিনে পাহাড়ের গায়ের একেবারে নির্মল বরফ গালিয়ে নিলেই হল।

আমার পক্ষে অ্যাটকা দ্বীপের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল এই যে সেখানে

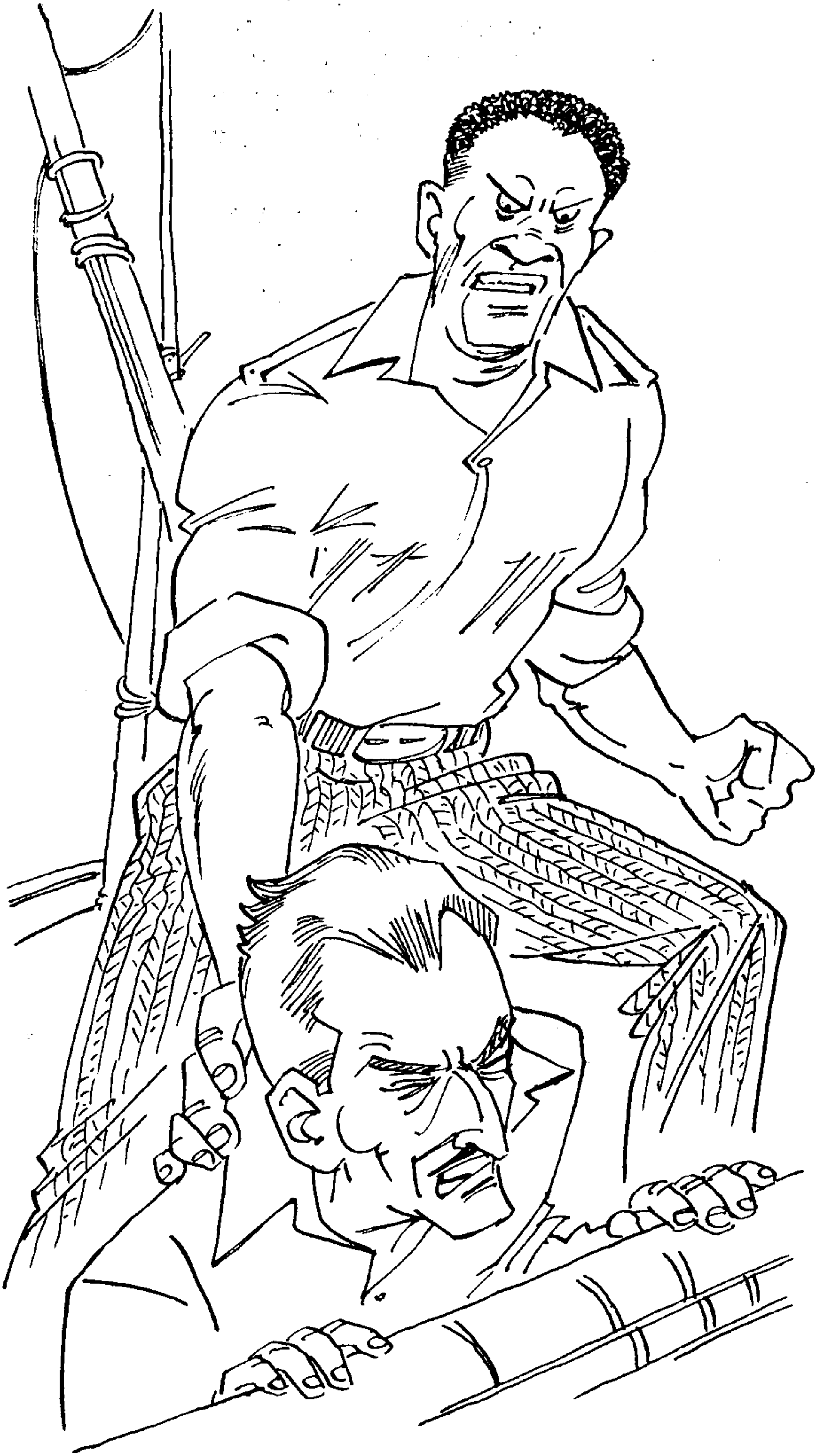

আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা একরকম নেই বললেই হয়। মাসে একবার আবহাওয়া ভাল থাকলে একশো কুড়ি মাইল দূরের নৌঘাঁটি আডাক থেকে একটা ছোট টাগবোট অ্যাটকায় আসে। অ্যাটকায় চেষ্টা করলেও প্লেন নামাবার উপায় নেই। এমনকী রেডিও সেখানে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিন অচল হয়ে থাকে।

অনেক ভেবেচিন্তেই তাই একদিন ঝড়ের দোলা খেতে খেতে মোচার খোলার মতো টাগবোটে অ্যাটকায় এসে নেমেছিলাম। বেশিদিন তো নয়, আমার হিসেব মতো মাস তিনেক এখানে গা ঢাকা দিতে পারলেই ড্যানি গাওয়ারের মওড়া আমি নিতে পারব।

কিন্তু তার আগে সে আমায় খুঁজে পেলেই সর্বনাশ!

তার হাতে আমার কী হাল হবে জানি না, কিন্তু দুনিয়ার মানুষের জাত ক্ষমাহীন একটা পাপের ভাগী হয়ে থাকবে চিরকাল।

দ্বীপের খুদে বন্দর আর গ্রাম অ্যাটকায় নেমেই সামান্য কিছু দরকারি জিনিসপাতি নিয়ে আমি অজানা পাহাড়-বাদার অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিলাম।

ক-টাই বা অ্যাটকার বাসিন্দে। তবু কম বলেই নতুন মানুষের প্রতি তাদের কৌতূহল বেশি। আমি ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে অ্যাটকার মাটি পাথর পরীক্ষা করতে এসেছি বলে তাদের ভুল বোঝাতে হয়েছিল। ফন্দিটা যা হয়েছিল তা একেবারে চমৎকার।

মাসে একটিবার শুধু দ্বীপের ভেতরের আমার অজ্ঞাতবাস আডাক থেকে সরকারি টাগবোট আসার দিন চিঠিপত্রের জন্য আমায় অ্যাটকায় আসতে হত।

এই চিঠিপত্রের জন্য আমার না এলে নয়। হয় সানফ্র্যানসিস্কো, নয় লেনিনগ্রাডের একটা চিঠির ওপর আমার জীবনমরণ শুধু নয়, তার চেয়েও দামি কিছু ব্যাপারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এ চিঠির জন্য দিন গুণেই জংলি জানোয়ারের মতো এই দুনিয়ার-বার দ্বীপে লুকিয়ে কাটাচ্ছি।

প্রথম মাসে চিঠির খোঁজে এসে পুরোপুরি হতাশ হতে হল। সানফ্র্যানসিস্কো থেকে জানিয়েছে যে কাজ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আশ্চর্য কিছু ফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

লেনিনগ্রাড একেবারে চুপ। সেখান থেকে কোনও সাড়াশব্দই নেই।

দ্বিতীয় মাসে চিঠির আশায় বন্দরে এসে একটু অসুবিধেতেই পড়তে হল। আবহাওয়া ভয়ানক খারাপ বলে টাগবোট নির্দিষ্ট দিনে ছাড়তে পারেনি আডাক থেকে।

সুতরাং বোটের জন্য অ্যাটকাতেই অপেক্ষা না করে উপায় নেই। তাও একদিন, না দুদিন, না কতদিনে আবহাওয়ার মেজাজ ফিরবে তা কে জানে। তেমন অবস্থা হলে হপ্তাখানেক বোট না আসতে পারে।

বোটের অপেক্ষায় না থেকে আমার অজ্ঞাতবাসে ফিরে যেতে তো পারব না।

চিঠিপত্র কী আসে না আসে তার জন্য আমায় অপেক্ষা করতেই হবে।

কিন্তু এই বন্দর গ্রামে থাকব কোথায়? অজানা পাহাড়ের রাজ্যে গুহায় থাকতে পারি। এখানে তো সে সুবিধে নেই। এই দেড়শো মানুষের বসতিতে হোটেলও নেই থাকবার। শেষ পর্যন্ত ওখানকার রুশ পাদ্রির দয়ায় তাঁর অর্থডকস লজের এক কোণে একটু থাকার জায়গা হল।

প্রথম দিনই সন্ধের সময় গ্রামের বয়স্ক দু-চারজন আলাপ করতে এলেন।

কী করে ওই জনমানবহীন পাহাড়ের রাজ্যে একলা কাটাচ্ছি। শিকার-টিকার পাচ্ছি কী রকম, দামি পাথরটাথর কি পেট্রলের খনিটনির হদিসটদিস কিছু সত্যি মিলেছে কি না এই সব প্রশ্নের সত্যিমিথ্যে মিলিয়ে জবাব দিলাম।

যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি লোককে গোড়া থেকেই কেমন একটু বেয়াড়া লাগছিল। তাঁর কৌতূহল অন্যদের থেকে একটু আলাদা।

এ দ্বীপে কী করছি না করছি সে বিষয়ে নয়, কোথা থেকে আসছি কোথায় থাকি এই সবই যেন তার জানবার আগ্রহ।

দ্বীপে যে নাম ভাঁড়িয়ে ছিলাম তা আর নিশ্চয় বলবার দরকার নেই। নকল নামের সঙ্গে মিলিয়ে পরিচয়ও কিছু তাঁকে বানিয়ে বলতে হল তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে।

আলাপ করবার সময়ই জানলাম লোকটির নাম মাইক মর্গান। নামটা ইঙ্গ-মার্কিন হলেও লোকটা অ্যালুট আদিবাসী। এ দ্বীপের ঠিক বাসিন্দাও নয়, আলাসকার রাজধানী জ্যুনোতেই থাকে। ক-দিনের জন্য এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছে।

আলাপ-টালাপ শেষ হবার পর আর সকলের সঙ্গে মাইক মর্গানও বিদায় নিয়ে গেল। কিন্তু খানিকবাদেই তাকে আবার ফিরে আসতে দেখে যেমন অবাক তেমনই একটু বিরক্তই হলাম।

গলাটা খুব প্রসন্ন না রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু কি এখানে ফেলে গেছেন, মি. মর্গান?'

'না।' বেশ গম্ভীর হয়েই বললে মাইক, 'আপনাকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে এলাম, মি. দাস।'

'দাস!' আমি বেশ গরম মেজাজেই বললাম, 'দাস কাকে বলছেন? আমি তো দাস নই, আমার পদবি হল রাও।'

'আচ্ছা, বেশ, রাওই হল।' মাইক একটু হাসল, 'আপনাকে শুধু জানাতে এলাম যে যত তাড়াতাড়ি পারেন এ অ্যাটকা ছেড়ে চলে যান। পারেন তো এবারের বোট এলে তাইতেই।'

'কেন?' ভেতরে ভেতরে ভাবনায় পড়লেও বাইরে আমি রীতিমত অবাক হবার ভান করে বললাম, 'অ্যাটকা ছেড়ে আমার পালাবার কী হয়েছে! আমি কি চোর-ডাকাত না খুনে!'

'চোর ডাকাত খুনে হলে তবু হয়তো রক্ষা পেতেন,' মাইক মর্গান ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার অবস্থা তাদের চেয়ে ভয়ংকর। যার বিষ নজরে আপনি পড়েছেন, বুকে আপনার একটু ধুকধুকুনি থাকা পর্যন্ত, সে

আপনাকে রেহাই দেবে না।'

'শুনুন! শুনুন!' আমি যেন ধৈর্য হারাবার ভান করলাম, 'কার কথা কাকে আপনি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি বোধহয় সম্পূর্ণ ভুল করছেন মানুষ চিনতে।'

'তা যদি হয় তা হলে আপনার ভাগ্য ভাল,' এবার মাইক মর্গান একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই বললে, 'তবু ভুল খবরটা একটু শুনে রাখুন। ড্যানি গাওয়ার বলে কারও নামই হয়তো আপনি শোনেননি। কিন্তু তিনি আডাক পর্যন্ত এসেছেন এইটুকু জেনে রাখুন। আমি আগের মাসের টাগবোটে আডাক থেকে আসবার সময় ড্যানি গাওয়ারকে ওখানকার বন্দরে দেখেছি। তিনি একটা হোটেলের বার-এ দু-একজনের কাছে তাঁর এক বন্ধু দাসের কথা গল্প করছিলেন। বন্ধু দাসের নাম করবার সময়েই তাঁর চোখে যে ঝিলিকটা দেখেছি তাতে বন্ধু প্রীতিটা একটু খুনখারাপি রঙের মনে হয়েছে।'

একটু থেমে মর্গান আবার বললে, 'আচ্ছা, গুডনাইট। আপনি রাও হলে আপনাকে মিছিমিছি ভয় দেখাবার জন্য মাপ চাইছি। আর যদি আপনি দাস হন তা হলে বলছি, এখনও সময় আছে সাবধান হবার।'

মাইক মর্গান চলে যাবার পর বেশ একটু ফাঁপরে পড়েই ভাবতে বসলাম। মাইক মর্গান-এর ওপর মিছিমিছিই বিরূপ হয়েছি। সে তো আমার সত্যিকারের হিতৈষীর কাজ করেছে। কিন্তু এখন কী আমার করা উচিত?

ড্যানি গাওয়ারকে আর কোথাও নয়, একেবারে আডাক-এই দেখা গেছে। কেমন করে কী সূত্র ধরে সে আডাক পর্যন্ত আমার খোঁজে আসতে পেরেছে তা জানি না। কিন্তু গন্ধে-গন্ধে অতদূর পর্যন্ত আসতে পারলে টাগবোটে এই অ্যাটকা পর্যন্ত পাড়ি দিতে পেছপাও হবার মানুষ সে নয়।

অবশ্য মাইক মর্গান ড্যানিকে একমাস আগে আডাক-এ দেখেছিল। ইচ্ছে থাকলে ড্যানি সেবারের টাগবোটেই মাইকের সঙ্গী হতে পারত।

তা যখন হয়নি তখন একমাস ধরে সে কি আর আডাক-এ বসে কাটাচ্ছে! তার যা স্বভাব তাতে এতদিনে তার পৃথিবীর উলটো পিঠেই আমার খোঁজে ফেরবার কথা।

কিন্তু তবু ওই বিশ্বাসে অ্যাটকায় নিশ্চিন্ত হয়ে আটকে থাকা কি চলে?

দুটি মাত্র রাস্তা এখন অবশ্য আমার সামনে খোলা। এক, এবারের টাগবোটের জন্য বন্দরে অপেক্ষা না করে দ্বীপের ভেতরে গিয়ে এখুনি লুকিয়ে পড়া, আর নয়তো, একটু হুঁশিয়ার হয়ে থেকে ড্যানি এবারের বোটে আসছে কি না দেখে নিয়ে ফিরতি খেয়াতেই আডাক-এ ফিরে যাওয়া।

প্রথম উপায়টার আসল অসুবিধে এই যে, এখন বন্দর ছেড়ে দ্বীপের ভেতর গিয়ে লুকোলে সানফ্র্যানসিস্‌কো কি লেনিনগ্রাডের চিঠির খবর আর নেওয়া হয় না।

চিঠিটিঠি এলে পোস্টাফিসেই অবশ্য মজুদ থাকবে আমার জন্য। কিছুদিন বাদে টাগবোট চলে যাওয়ার পর এসে সেগুলোর ডেলিভারি নেওয়া যাবে। কিন্তু তা করলে চিঠির জন্য হাপিত্যেশ করে থাকার উদ্দেশ্যই তো ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। যা আশা করছি সে রকম কিছু যদি কোনও চিঠিতে থাকে তা হলে তখুনি তো আমার

অ্যাটকা ছেড়ে যথাস্থানে যাওয়া দরকার। এখন টাগবোট ছেড়ে দিলে তার জন্য তো আরও একমাস অপেক্ষা করে এই দ্বীপে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত এবারের টাগবোটের ওপরই একটু আড়ালে থেকে নজর রাখব বলে ঠিক করলাম। এ খেপের ফেরি থেকে ড্যানি গাওয়ারকে যদি নামতে না দেখি তা হলে ফিরতি পাড়িতেই যাব আডাক। তারপর দরকার হলে সানফ্র্যান্‌সিসকো আর লেনিনগ্রাডের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য কোথাও লুকোব, কিন্তু এ অ্যাটকা দ্বীপে আর নয়।

আবহাওয়া একটু ভাল হতে তার পরের দিনই টাগবোটটা এল। বোট নাজান বে-তে ঢুকে বন্দরে নোঙর ফেলতেই সাত-আটটা ডিঙি বোট এগিয়ে গেল টাগবোট থেকে মাল আর সওয়ারি তীরে নিয়ে আসতে। অ্যাটকায় সমুদ্রের গভীর জল পর্যন্ত বাড়িয়ে ধরা জেটি নেই। তীরের কাছে অগভীর জলে তাই ছোট ডিঙি বোটেই আসতেযেতে হয়।

বন্দরের ধারের একটা ডাঙায় তোলা বোটের ধারে বসে সব ক-টা ডিঙি নৌকোকেই লক্ষ করলাম।

না, ড্যানি গাওয়ার কোনও বোটে নেই।

যা ছদ্মবেশই সে নিক না, ওই গোরিলার মতো চেহারাটা কুঁচকে ছোট করবার মতো কোনও দাওয়াই তো নেই।

ড্যানি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পোস্টাফিসে গিয়ে চিঠির খোঁজ করার পর যা পেলাম তাতে আনন্দে নিজেকে সামলে রাখাই শক্ত হল।

চিঠি এসেছে সানফ্র্যানসিস্‌কো আর লেলিনগ্রাড দু জায়গা থেকেই।

লেনিনগ্রাড থেকে চিঠি এসেছে অনেক আগেই। আগের বারের টাগবোট আসাযাওয়া করার কিছু পরে এসেছে বলে একমাস ধরে আডাক-এই আটকে পড়ে ছিল।

ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্র্যানসিস্‌কো থেকে চিঠিটা মাত্র দুদিন আগেই এসে পৌঁছেছে আডাক-এ। সেটা তাই লেনিনগ্রাডের চিঠির সঙ্গেই আমি এখন পেলাম।

চিঠি পাওয়া নিয়ে তো কথা নয়, কী আছে চিঠির মধ্যে সেইটেই হল আসল। যা আছে তা একেবারে আশাতীত। দু জায়গার চিঠির মধ্যেই এমন মিল যে একটা আর-একটা দেখে টোকা বলে মনে হয়। এ দুই চিঠি পড়বার পর আর অ্যাটকায় থাকার কোনও দরকার নেই। সেখানকার স্বেচ্ছানির্বাসন আমার শেষ।

সামান্য জিনিসপত্রের যে ঝোলাঝুলি নিয়ে অ্যাটকার পাহাড় জঙ্গলে এতদিন লুকিয়ে কাটিয়েছি তাই নিয়ে ফিরতি টাগবোটে তুলে দেবার জন্য একটা ডিঙিতে যথাসময়ে উঠে বসলাম।

টাগবোটে গিয়ে জানলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা ছাড়বে। তারপর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার মামলা। ছাড়বার জন্য যত অধীরই হই—টাগবোটের ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পাহাড় আর নীল জলের দ্বীপটির দিকে চেয়ে মনটা খারাপই হয়ে গেল।

'মনটা খারাপ লাগছে বুঝি! তা ভাল করে দেখে নাও। দুনিয়াটাই দেখে নাও শেষবারের মতো।'

ঠিক একেবারেই পেছনেই হাঁড়ি-গলায় কথাগুলো শুনলাম। কে বলছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখার উপায় কিন্তু তখন নেই।

বিশমনি একটি থাবা আমার ঘাড়টাকে একেবারে যেন জাঁতা কলে ধরে আছে।

দেখতে পাই না-পাই বিশমণি থাবাটি আর হাঁড়ি গলার আওয়াজটি যে কার তা বুঝতে তখন আর বাকি নেই।

গলায় একটু খুশির সুর লাগাবার চেষ্টা করে বললাম, 'যাক, তুমি তা হলে নিজেই এসে গেছ! তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম?'

'তাই নাকি?' আমার ঘাড়টা ধরে এবার ঘুরিয়ে দিয়ে একেবারে মিছরির ছুরির মতো গলায় ড্যানি গাওয়ার বললে, 'অমন জানলে আমার জাহাজটাই আগে পাঠিয়ে দিতাম! যাক, আমায় দেখে খুশি তো হয়েছ।'

ড্যানি আমায় বেড়ালের মুখের ইঁদুরের মতো বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে খুশিটার বোধহয় মাপ নিতে চাইল।

'বাঃ, খুশি না হয়ে পারি,' ড্যানির হাতের ঝাঁকুনি খেতেখেতেই বললাম, 'তোমার সুমতি আনবার জন্য এতদিন এত কষ্ট করলাম, আর তোমায় দেখে খুশি হব না! তা বদ খেয়ালটেয়ালগুলো সব ছেড়ে দিয়েছ তো!'

'দিই নি, তবে দেব।' এবার আর দাঁতে দাঁত না ঘষে পারল না ড্যানি, 'তোকে হারপুন বন্দুকে এফোঁড়ওফোঁড় করেই সব ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। এখন ভালয় ভালয় সুবোধ ছেলে হয়ে আমার সঙ্গে আসবি না কোঁৎকাটোঁৎকা দিতে হবে?'

'কিচ্ছু দিতে হবে না।' আমি উদার আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তোমায় না খুঁজতেই যখন পেয়েছি তখন প্রাণ থাকতে আর তোমায় ছাড়ব না জেনে রাখো।'

'বেশ! বেশ!' ড্যানি ঠাট্টার সুরটা আবার গলায় ফিরিয়ে এনে বললে, 'চল, তা হলে আমার সঙ্গে। ক্যাপ্টেনের কেবিনটা এই সামনের কয়েক ঘণ্টার জন্য ধার নিয়ে রেখেছি। সেখানে বসেই দুজন দুজনের সব কথা শোনা যাবে।'

ক্যাপ্টেনের ছোট কেবিনটা সত্যিই ড্যানি আগে থাকতে বলে-কয়ে বা টাকা দিয়ে যেভাবে হোক নিয়ে রেখেছিল। আমায় সেখানে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে বললে, 'নে, বল শুনি তোর ইতিহাসটা এবার।'

'না,' আমি যেন আবদার ধরলাম, 'তোমার বৃত্তান্তটাই আগে শুনতে চাই। তার আগে অবশ্য তারিফ করি তোমার বুদ্ধিকে। টাগবোটে থেকে তীরে না নেমেই তুমি কিস্তিমাত করেছ। তুমি যে টাগবোটেই ওত পেতে আছ শিকারের জন্য তা বোঝাই যায়নি।'

'বুঝলে আর আহাম্মকের মতো টাগবোটেই এসে উঠতিস না, কেমন?' যেন ভেংচি কেটে জিজ্ঞাসা করেছে ড্যানি।

'উঠতাম না মানে!' আমি যেন ক্ষুণ্ণ হলাম, 'জানলে তো আরও খুশি হয়ে আসতাম। একটা কথা শুধু যদি বলো। তা হলে খুশিটা এখন আমার ষোলো কলায়

পূর্ণ হয়।'

'বটে!' টিটকিরি দিলে ড্যানি, 'কী কথাটা জানতে চাস, শুনি!'

'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এই ভূগোলের ভুলে যাওয়া দ্বীপটায় আমার ঠিকানা পেলে কী করে?' সত্যিকার আগ্রহ নিয়েই এবার জিজ্ঞাসা করলাম।

'ঠিকানা কী করে পেলাম?' বলতে বলতেই ড্যানির হাসি আর যেন থামতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললে, 'কী করে পেলাম, শুনবি? অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি বলে। আমার কাছ থেকেই তুই লুকিয়েছিস। কিন্তু নিজের আহম্মকির বাতিকের কাছে লুকোবি কী করে। সেই আহাম্মুকিই তোকে ধরিয়ে দিয়েছে! বুঝলি কিছু।'

গলাটা আপনা থেকেই গম্ভীর হয়ে এল। বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝলাম এবার। ইন্টার—'

'ঠিকই বুঝেছিস!' ড্যানি আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললে, 'ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং কমিশন। সেখানে আহাম্মকের মতো লুকিয়ে থাকবার সময়ও তুই যে চিঠি লিখেছিস তার আমি যে সন্ধান পাব তা তুই ভাবতে পারিসনি।'

'তা পারিনি।' সত্যিই একটু খুশি হয়ে উঠে বললাম, 'কিন্তু তুমি যে ইন্টারন্যাশন্যাল হোয়েলিং কমিশনে গেছলে এ খবরটুকু শুনেই সব দুঃখ আমার ঘুচে গেল।'

'অত অল্পে দুঃখ ঘোচাতে যাসনি রে, আহাম্মক,' ড্যানি গাওয়ার গলাটা তেতো করে বললে, 'তুই যা ভাবছিস সে জন্য হোয়েলিং কমিশনে যাইনি! গেছলাম ওদের আইনের প্রতিবাদ দাখিল করতে।'

'প্রতিবাদ দাখিল করতে!' একটু ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রতিবাদটা কী?'

'প্রতিবাদ—ওরা যা হিসেব বেঁধে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে।' ড্যানি নিজের কথায় নিজেই উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমাদের অস্ট্রেলিয়ায় বেঁধে দিয়েছে মাত্র ন-শো আর পাঁচশোয়। সব রকম তিমি নিয়ে ন-শো মদ্দা শিকার করতে পারব আর পাঁচশো পাঁচটা মাদি। পাঁচশোর ওপর ওই পাঁচটা কীসের বলতে পারো?'

নিজের মামলার ওকালতির উৎসাহে ড্যানিকে তুই থেকে আবার তুমিতে উঠতে দেখে মনে মনে একটু হেসে বললাম, 'তা পারি বোধহয়। তোমার মতো যাদের হাত হারপুন ছুঁলেই খুনে হয়ে ওঠে তাদের জন্য ও পাঁচটা ফাউ। কিন্তু ন-শো আর পাঁচশো পাঁচটার বরাদ্দ পেয়ে অত গোঁসা হচ্ছে কেন? ওই ন-শোটা ন-টায় আর পাঁচশো পাঁচটা শুধু পাঁচটায় নামতে যে আর দেরি নেই।'

'হ্যাঁ, তোর মতো উজবুক নচ্ছাররা সেই চেষ্টা করছে তা জানি,' ড্যানি গাওয়ার রাগের জ্বালায় আবার তুমি থেকে তুই-এ নেমে গর্জন করে উঠল, 'কিন্তু মুখখু গবেটরা কি জানে যে তিমিদের দুঃখে গলে গেলে দুনিয়ার কত কারবার লাটে উঠবে! জানে যে—'

'তা জানে ড্যানি, ওরা কেন, সবাই জানে।' ড্যানিকে এবার আমিই বাধা দিয়ে বললাম, 'তিমির চর্বি, বিশেষ করে স্পার্ম হোয়েলের মাথার তেল আর স্পার্মাসেটি যে কতদিক থেকে অমূল্য তা স্কুলের ছেলেদেরও আজকাল মুখস্থ। সাবান মোমবাতি থেকে আমাদের প্রসাধনের জিনিস আর তার চেয়েও বেশি ইস্পাত থেকে শুরু করে

অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য তিমির তেলের কোনও জুড়ি নেই বলেই মানুষ জানে। খনি থেকে তোলা বা বাদাম তিল কি সরষের মতো বীজ পিষে বার করা দুনিয়ার কোনও তেল স্পার্ম তিমির মাথার তেলের মতো অত চড়া উত্তাপ কি চাপ সইতে পারে না। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে স্পার্ম তিমি শিকার বন্ধ করলে দুনিয়ার অনেক দামি কাজ কারবার বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় করাটা মিথ্যে নয়। তবু একবার ভেবে দেখো—'

'থাক!' দাঁত খিচিয়ে উঠল এবার ড্যানি, 'তোর ওসব বক্তিমে ঢের শুনেছি। সময় তোর ফুরিয়েছে। ইচ্ছে হয় তো যত খুশি তিমিদের কথা এ কামরায় বসে ভাব। এখানেই আপাতত তোকে বন্দী করে যাচ্ছি। আর একটা কথাও শুনে রাখ। তোকে হারপুনে এফোঁড় ওফোঁড় করব বলেছিলাম। কিন্তু এ দেশের আইনগুলোর কোনও মাথামুণ্ড নেই। তোর মতো একটা আরশোলা মারার জন্যও হয়তো আমায় ইলেকট্রিক চেয়ারে তুলবে। তাই ঠিক করেছি, যেখানে প্রথম তুই আমার সঙ্গে শয়তানির বাজি রেখে চালাকি করেছিলি অস্ট্রেলিয়ায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণের সেই অ্যালব্যানির বন্দর থেকেই তোকে আরেকবার তিমি শিকারে নিয়ে যাব। তারপর হারপুন-কামান দেব তোকেই শুধু ছুড়তে। যতগুলো স্পার্ম পাত্তা মিলবে, একটিবারও না ফসকে সব যদি শিকার করতে পারিস তা হলে এ যাত্রা তোকে ছেড়ে দেব। কিন্তু একটিবার ফসকালেই হারপুন-গোলার রশিতে কী করে তোর পা জড়িয়ে যাবে কে জানে। তারপর হারপুন ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দড়িতে জড়িয়ে পাকিয়ে মাংসের দলা হয়ে হাঙরদের খোরাক হতে সমুদ্রের জলে পড়বি। গোড়া থেকেই এবার কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবি, সুতরাং অন্য চালাকির সুবিধে পাবি না সেটা মনে রাখিস।'

'বাঃ!' রীতিমত প্রশংসার সুরে বললাম, 'এই তো সাচ্চা খেলোয়াড়ের মতো কথা। শুধু একটা অনুরোধ তোমায় করছি। অ্যালব্যানিতে নিয়ে যাবার আগে একটিবার যদি অ্যারিজোনায় আমায় কয়েক ঘণ্টা থাকতে দাও।'

'অ্যারিজোনায়?' ড্যানি সত্যি একটু অবাকই হল। 'অ্যারিজোনায় কী? সে তো মরুভূমি বললেই হয়।'

'ওই মরুভূমির ওপরই আমার কেমন একটা টান।' গলা একটু ভারী করে বললাম, 'নিজের জীবনটার সঙ্গে মিল আছে বলেই বোধহয়।'

'বেশ! বেশ!' ড্যানি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। 'অ্যালব্যানির ঠাণ্ডা সমুদ্রে চোবাবার আগে তোকে একবার অ্যারিজোনার গরম বালিতে সেঁকে নিয়ে যাব। আডাকে আমার প্লেনটাই মজুত রেখে এসেছি। অ্যারিজোনার মরুতে তোকে ঘণ্টা কয়েকের জন্য নামাতে কোনও অসুবিধা হবে না। এখন দরজায় তালা দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত হয়ে ইষ্ট চিন্তা মানে তোর তিমি কুটুমদের কথা ধ্যান কর।'

ড্যানি বাইরে থেকে কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে চলে যাবার পর তার পরামর্শই না নিয়ে পারলাম না।

ড্যানি যেখানে আমায় নিয়ে গিয়ে তার বাজি জেতার শোধ নিতে চায় মনটা

সেখানে চলে গেল আপনা থেকেই।

বাজি জিতে খুশি হবার বদলে যে হেরো তারই ওপর এ রকম আক্রোশের কথা শুনতে একটু অদ্ভুত সন্দেহ নেই। কিন্তু বাজিটা কী আর খেলাটা হয়েছিল কী রকম তার বিবরণ শুনলে ড্যানিকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে না।

দুনিয়ার একজন সেরা হারপুনার হিসেবে ড্যানির সঙ্গে পরিচয় একটু আধটু আমার ছিল। ড্যানি শুধু হারপুন ছোড়ায় ওস্তাদ নয় তার নিজের একটা তিমি শিকারের কোম্পানিও আছে। অস্ট্রেলিয়াতেই তার প্রধান ঘাঁটি হলেও দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত শিকারযোগ্য সবরকম তিমির চরবার এলাকাতেই সে তার নৌ-বহর নিয়ে তিমি শিকার করে ফেরে।

নৌ-বহর তার খুব ছোটখাটো নয়। তিমি ধাওয়া করবার তিনটে সব হালের যন্ত্রপাতি সাজানো জাহাজ ছাড়া একটা প্লেনও সে ব্যবহার করে ওপর থেকে তিমির পাত্তা নেবার জন্য।

কোনও জাতের তিমিতেই অরুচি না থাকলেও ড্যানি গাওয়ারের আসল ঝোঁক হল স্পার্ম হোয়েল শিকারের দিকে।

নির্মম বেহিসেবি মানুষের অবাধ শিকারের ফলে পৃথিবীর বহু অংশেই তিমির বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে। অনেক দেশ তাই তিমি শিকারের বরাদ্দ আইন করে এখন বেঁধে দিয়েছে।

লুকিয়েচুরিয়ে দু-চারটে শিকার কেউ কেউ করলেও সাধারণভাবে ড্যানির মতো বড় কোম্পানিওয়ালাদের এ আইন মোটামুটি মানতে হয়।

তিমি শিকার যারা কমাতে বা বন্ধ করতে চায় তাদের ওপর ড্যানি তাই খাপ্পা। বিশেষ করে স্পার্ম তিমি শিকারের বরাদ্দ বেঁধে দেওয়ায় তার বেশি আপত্তি।

অ্যালবানির একটা খানদানি ক্লাবের বাইরে খোলা আকাশের তলায় পাতা টেবিলে বসে ওখানকার ক-জন রহিস আদমির সঙ্গে সেদিন গল্প করছিলাম। সেই গল্প করতে করতেই তিমি শিকারের কথা উঠতে, উত্তেজিত হয়ে উঠে টেবিলটাই প্রায় ঘুসি মেরে ভেঙে ড্যানি বলেছিল 'স্পার্ম তিমির আবার বরাদ্দ কী? স্পার্ম তিমি কি লোপ পেতে যাচ্ছে! এ সমস্ত হচ্ছে যত বেঁড়ে মাতব্বরদের মহানুভব সাজবার প্যাঁচ। আসল মতলব তো ইলেকশনে ভোট কুড়োনো।'

'সবারই কি তাই?' আমি নিরীহ ভালমানুষ সেজে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'একটা প্রাণীকে নির্বংশ হয়ে যেতে দেখলে দুঃখ পায়, এমন মানুষও তো আছে। তা ছাড়া জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্বও কি নেই?'

'আছে নাকি!' ড্যানি তখনই যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে তার দায়িত্বটা সে তখুনি ঘাড়টা একটু মুচড়ে ঢুকিয়ে দিতে চায়।

তার মেজাজের পারাটা চড়াবার জন্যই আরও ন্যাকা সেজে আমি বলেছিলাম, 'নিশ্চয় আছে, বিশেষ করে তিমির মতো একটা মহৎ প্রাণীর বিষয়ে। ভেবে দেখো

তো, কী একটা আশ্চর্য প্রাণী সমুদ্রের রাজ্যে সম্রাট হয়ে ফেরে অথচ মাছেদের জাত নয়। এককালে ডাঙায় উঠে এসে চার পায়েই চলাফেরা করত। তারপর ওদের কোনও আদি পূর্বপুরুষ কী সুবিধে বুঝে আবার ফিরে গিয়েছিল সমুদ্রে। হাতপাগুলো বদলাতে বদলাতে মাছের ডানার মতো হয়ে গেছে, কিন্তু মাছের মতো কানকো দিয়ে জল থেকে হাওয়ার অক্সিজেন নিতে পারে না। জলে ডুবে সাঁতার কেটে ফিরলেও পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট অন্তর ওপরে উঠে নিশ্বাস ছাড়তে আর নিতে হয়। বাচ্চাদেরও স্তন্যপায়ীদের মতো বড় করে। আর চেহারায় তাদের কোনও বংশ হাঙরটাঙর এমনকী ডাঙার হাতিকেও ছাড়িয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট প্রাণী হয়ে উঠেছে। স্পার্ম হোয়েল বা ক্যাচালটদের মদ্দারাই তো পঁচাশি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, তার চেয়েও বড় হয় নীল তিমি, যাদের বলে সালফার-বটম হোয়েল। পৃথিবীর সমুদ্রের এই আশ্চর্য বিরাট প্রাণীকে শুধু আমাদের নোংরা নীচ লোভে নিশ্চিহ্ন করে দেব!'

ড্যানি গাওয়ার যে ক্রমশ গোঁয়ার গোরিলা হয়ে উঠছে তা এই দীর্ঘ বক্তৃতা ইচ্ছে করে তাকে শোনাতে শোনাতেই বুঝতে পারছিলাম। তাকে ভাল করে তাতাবার জন্য শেষকালে বলেছিলাম, 'তিমি শিকার আজকাল তো এমনিতে শক্ত কিছু নয়। একটা জাহাজ আর একটা হারপুন কামান থাকলেই হল। তারপর শুধু দেখো আর মারো। তার মধ্যে বাহাদুরিটা কোথায়?'

'বাহাদুরি নেই?' এবার যেন আগ্নেয়গিরির ভেতর দিয়ে চাপা গর্জন উঠেছিল, 'তুমি পারো দেখতে আর মারতে?'

'পারি মানে!' আমি যতদূর সম্ভব তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলেছিলাম, 'কামানে যতগুলো হারপুন ততগুলো শিকার করতে পারি। একটা ফসকে যাবে না। শুধু চোখে একবার দেখতে পেলেই হল।'

টেবিলের অন্য সবাই বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এবার। কারণ ড্যানি গাওয়ারের চেহারা দেখেই তখন বোঝা যাচ্ছে যে তার ফাটতে আর বেশি দেরি নেই।

কিন্তু ড্যানি পরে শোধ নেবার জন্য নিজেকে তখনকার মতো সামলে নিয়ে গলাটা মোলায়েম করেই বলেছিল, 'বেশ কালই আমার সঙ্গে চলুন না। আমার খাস চেজার জাহাজে আপনাকে নিয়ে যাব। হারপুন কামানও আপনার হাতে থাকবে। আপনার গোলন্দাজিটা দেখিয়ে আমাদের একটু ধন্য করবেন। কেমন রাজি?'

'আলবত রাজি। এমন একটা খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জ ফিরিয়ে দিতে পারি!' উৎসাহ ভরে বলেছিলাম।

'একটা কিছু বাজি তা হলে ধরা উচিত নয় কি?' ড্যানি গলাটা যথাসম্ভব সহজ রেখে বলেছিল।

তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বলেছিলাম, 'বাজি তো রাখতেই হবে। বাজি না রাখলে এ রকম একটা চ্যালেঞ্জের মান থাকে! কী বাজি রাখতে চান বলুন!'

'আপনিই বলুন না সেটা,' ড্যানি আমাকেই প্রথম সুযোগ দিয়েছিল।

'বেশ', একটু যেন ভেবে নিয়ে বলেছিলাম, 'যা বলেছি তাই ঠিক মতো করে আমি

যদি জিতি তা হলে আপনাকে একবার কানমলা খেয়ে ওই আপনার জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। আর আমি যদি হারি তা হলে কানমলা খেয়ে ঝাঁপ দেব আমি।'

প্রথমটা চোখগুলো এরকম আজগুবি বাজিতে একটু জ্বলে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সে রাজি হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই শর্তের ওপর হাত মেলাবার জন্য।

করমর্দনের নামে আমার হাতটা গোরিলার থাবায় ধরে সে প্রায় গুঁড়িয়েই দিয়েছিল অবশ্য।

আমিও মুখটা কাঁদো কাঁদো করে যেন কাতরাতে কাতরাতে বলেছিলাম, 'তা হলে এই বাজিই রইল।'

যতক্ষণ সে ছিল ডান হাতটা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অনেকক্ষণ বাঁ হাত দিয়ে ঘষাঘষি করেছিলাম যেন সাড় ফেরাবার জন্য।

বেশিক্ষণ সে অবশ্যি থাকেনি। আমার হাত দলাই-মলাইটা বেশ তৃপ্তিভরে খানিক দেখে উঠে যাবার সময় বলেছিল, 'তা হলে ওই কথাই রইল, কাল ভোর ঠিক সাড়ে তিনটেতে। অত আগে না বেরুলে ঠিক জায়গায় সময়মতো পৌঁছনো যাবে না।'

আমি মুখে যেন কথা না বলতে পেরে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

পরের দিন ভোর সাড়ে তিনটের জায়গায় মাত্র মিনিট পনেরো দেরি করে, রাত পৌনে চারটেতেই, অ্যালব্যানির ছোট পাহাড়ঘেরা বন্দর থেকে ড্যানির তিমি শিকারের জাহাজে তার সঙ্গে রওনা হলাম।

অ্যালব্যানি অস্ট্রেলিয়ার দিক থেকে বেশ পুরনো শহর। প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকে সেটা তিমি শিকারিদের একটা বড় ঘাঁটি।

অ্যালব্যানির বন্দরের জেটি থেকে জাহাজ নিয়ে আমাদের কন্টিনেন্টাল শেলফ পর্যন্ত যেতে হল। কন্টিনেন্টাল শেলফ হল স্থলভাগ যেখানে অগভীর সমুদ্র প্রথম থেকে একেবারে সমুদ্রের গভীরে নেমে গেছে সেই খাঁজ। সেই অতল সমুদ্রের ধার দিয়েই ও অঞ্চলের তিমিরা পুব থেকে পশ্চিমের দিকে সাঁতরে পাড়ি দেয়। তিমি শিকারের পক্ষে তাই সেটা স্বর্গ।

ভোর পৌনে চারটেয় বেরিয়ে সকাল হতে না হতে যথাস্থানে আমরা পৌঁছে গেলাম।

ভাগ্যটা আমাদের ভাল। গভীর জলের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ড্যানি, 'দেখো, দেখো! স্পার্ম তিমির একেবারে যেন যুবরাজ আসছে। অন্তত পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা মদ্দা, ওজন কিছু না হোক পঞ্চাশ টনের কম হবে না।'

উৎসাহের চোটে ড্যানি বাজির কথা ভুলে গিয়ে নিজেই হারপুন কামানের পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

স্পার্ম তিমিটা তখনও নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে ভেসে যাচ্ছে।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ড্যানি কামান থেকে হারপুন ছোড়বার জন্য তৈরি হয়েছে

এমন সময়ে পিঠে হাতটা পড়ায় একটু চমকেই উঠল।

এমন মোক্ষম সময়ে এই উপদ্রবের জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী চাও এখন?'

'চাই ওই কামানটা চালাতে', শান্ত বিনীত স্বরেই বললাম, 'হারপুন ছোঁড়বার পালাটা আজ আমার কিনা। কারণ বাজিটা আমিই রেখেছি। সুতরাং তোমায় একটু সরতে হবে দয়া করে।'

ড্যানি সরেই এল। কিন্তু কীভাবে দাঁতে দাঁত চেপে তাকে নিজেকে সামলাতে হল সে স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

নিজেকে সামলে সরে এলেও ভেতরের জ্বালা আর গলার ঝাঁঝটা সে লুকোতে পারল না। দাঁতে দাঁত চেপেই বললে, 'হারপুন কামান নাও। কিন্তু অমন একটা তিমি হাতছাড়া যেন না হয়ে যায়।'

'হাতছাড়া!' আমি এবার অবজ্ঞার ভঙ্গি করে বললাম, 'একটু ধৈর্য ধরে কেরামতিটা আমার দেখোই না।'

আরও গা জ্বালানো ভঙ্গিতে যেন হাত পায়ের খিল ছাড়াবার ভান করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক-টা হারপুন আছে তোমার জাহাজে, গোটা ছয়েক জোড়া হবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে!' অধৈর্যের সঙ্গে প্রায় খিঁচিয়ে উঠল ড্যানি গাওয়ার, 'তুমি এখন একটাই সামলাও তো।'

'আরে, ওটা তো গাঁথা হয়ে গেছে ধরে নিতে পারো।' আমি আরও গড়িমসি করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'হারপুনগুলোর প্রত্যেক জোড়ায় একটা করে বোমা-মাথা আছে তো?'

'আছে! আছে!' ড্যানি নেহাত বাজি রাখার কড়ারের দরুনই নিজেকে সামলে রেখে বললে, 'আজকাল প্রত্যেক জোড়া হারপুনে একটার মাথায় খুদে বোমা লাগানোই থাকে তা আবার বলতে হবে!'

'বেশ, বেশ'—আমি যেন আশ্বস্ত হয়ে এবার আমার সামনের শিকারে মন দিলাম।

ঝানু তিমি শিকারির কোনও ভাবভঙ্গিই বাদ দিলাম না।

একবার ডান হাতটা নেড়ে ডানদিক দেখলাম, তারপর আবার বাঁ হাতটা নাড়লাম।

'আস্তে,' বলে হঠাৎ চিৎকার ছেড়ে কামানের ওপর যেন কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়লাম।

তারপর কামানের মুখটা একটু এদিক ঘুরিয়ে দিলাম হারপুনের গোলা ছুড়ে।

কামান ছোড়ার পর আর সমুদ্রের দিকেই চাইলাম না। 'বাহাদুরিটা তোমরাই দেখো' ভাব করে মুখ ঘুরিয়ে ড্যানির দিকে চেয়ে গায়ের জামা থেকে যেন কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে ফেললাম টুসকি দিয়ে।

ড্যানি তো বটেই, জাহাজের মাল্লামাঝি সবাই প্রথমটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হতভম্ব হয়ে চুপ!

তারপর হঠাৎ সে কী হাসির ধুম।

আগের রাগটাগ ভুলে ড্যানিও তখন দুমড়ে গিয়ে পেটে হাত চেপে হাসতে হাসতে বলছে, 'কী হারপুন ছুড়লে হে তুমি! স্পার্ম তিমি যে বাসায় তাই নিয়ে গল্প করতে চলে গেল।'

'চলে গেল!' একেবারে যেন তাজ্জব হয়ে সমুদ্রের দিকে ফিরে আমার শিকারের তিমিটাকে বহাল তবিয়তে ডুব মারতে দেখে যেন রেগেই গেলাম সকলের ওপর।

প্রায় গর্জন করে বললাম, 'হতে পারে না কখনও।'

'হতে পারে না?' ড্যানি তখন হাসিটা কিছুটা সামলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'এমন আজব গোলন্দাজি? তা ঠিকই বলেছ। তিমিটাকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাতে তাকে মারতে গিয়ে ফসকানো রীতিমত উঁচুদরের কেরামতি।'

যেন এ সব ঠাট্টা কানেই না নিয়ে আমি গোমরাতে গোমরাতে বললাম, 'আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তাই দেখাও,' ড্যানি আবার হাসতে শুরু করে বললে, 'তবে তোমার যা হাতের তাগ তাতে ভরসা করে আর কোনও তিমি এ রাস্তা মাড়ালে হয়।'

কোনও জবাব না দিয়ে গোমড়া মুখে আমি কামানটা একবার পরীক্ষা করার ভান করলাম, তারপর হারপুন জোড়াও দেখলাম খুব মন দিয়ে।

আমার কাণ্ডকারখানায় হাসাহাসিটা তখন মাঝি-মাল্লাদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে।

তাদের হাত তুলে একটু থামিয়ে ড্যানি বললে, 'অত খুঁচিয়ে দেখছ কী হে? কামানটা এ লাইনের সেরা কারখানায় তৈরি। আর প্রত্যেকদিন শিকারে আসবার আগে জাহাজের পাকা মিস্ত্রি দিয়ে পরীক্ষা করানো।'

একটু থেমে সত্যি কথা থেকে আবার ঠাট্টায় ফিরে গিয়ে ড্যানি বললে, 'কিন্তু এ সব বাজে কামানবন্দুকে তোমার বোধহয় হাত খোলে না। একটা গুলতি-টুলতি এনে দেব কি?'

কথাটা আর সে শেষ করতে পারলে না। হঠাৎ ওপরের এক মাল্লা চিৎকার করে উঠল, 'সামনে বাঁয়ে! চল্লিশ ফুটিয়া মাদি স্পার্ম—'

ওই হাসি ঠাট্টার ভেতরও এ হাঁক শুনে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাফঝাঁপ দিয়ে একটা হই-চই বাধিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'ঘোরাও জলদি স্টারবোর্ড।'

'স্টারবোর্ড কী বলছে আহাম্মক কোথাকার!' হাসতে হাসতেই ধমক দিয়ে উঠল এবার ড্যানি, 'কোন দিকে পোর্ট কোন দিকে স্টারবোর্ড জানো না?'

'সব জানি, সব জানি।' গম্ভীর আর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমায় আর জাহাজের বিদ্যে শেখাতে এসো না, তাড়াতাড়িতে মুখ ফসকে একটু ভুল বেরিয়ে গেছে, তা নিয়ে অত কী?'

'না, তাতে অত কিছুই হয়নি।' ড্যানি এখন আমায় নাচাবার খেলা ধরে বললে, 'কিন্তু মুখ ফসকে যা বার হয় হোক, কামানটা আর যেন না ফসকায়।'

তাই কিন্তু ফসকাল।

প্রথম হারপুনটা মাদি তিমিটার ঠিক পেছনে পড়ে লেজে যেন একটু সুড়সুড়ি দিলে

আর বোমার বারুদ-ভরা মাথা নিয়ে পরেরটা মাথার একেবারে কাছে দিয়ে গিয়ে গভীর জলে পড়ে ফাটল।

অন্যেরা হাসল কি রাগল কিছুই যেন খেয়াল না করে আমি হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিলাম জাহাজ সরগরম করে।

'বুঝেছি, বুঝেছি,' আমি যেন চেঁচিয়ে আমার ভাগ্যকেই শোনালাম, 'আমার ওপর শাপ লেগেছে দুনিয়ার সব তিমির। সেই আদ্যিকাল থেকে যত তিমি মানুষের হাতে জান দিয়েছে তাদের প্রেতগুলোই আমার হাতের তাগ নাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। শরীরী অশরীরী যে যাই করুক সব শত্রুতা তুচ্ছ করে আজ স্পার্ম তিমি একটা ঘায়েল করবই। এবার যেটা আসবে সেটাকে শমনেই টেনেছে জেনো।'

ভাগ্যও সেদিন যেন আমাদের বাজির খেয়ালে হাত লাগিয়েছে মনে হল। শমনে টানার খবর পেয়েই কি না জানি না, পর পর আরও তিনটে স্পার্ম তিমি আমাদের শিকারের জাহাজের নাকের সামনে দিয়ে নইলে ঘুরে যায়!

তারা ঘুরেই গেল শেষ পর্যন্ত। ক্রিকেটের ব্যাটে-বলে না হওয়ার মতো আমার ছোড়া হারপুনের সঙ্গে তাদের একটু ছোঁয়াছুঁয়িও হল না।

দুটোর পর তিনটে হারপুন ফসকাবার সময়েই ড্যানি গাওয়ারের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর চারটে ফসকাতে তার মুখে যেন ঝড়ের কালো মেঘ।

পাঁচটা ফসকাবার পর তার দিকে আর না তাকিয়ে আমি নিজেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছি কামানটাকে ধরে।

'অসম্ভব! অসম্ভব! এ নিশ্চয় কারও কারসাজি! আমায় জব্দ করবার জন্য কামানটা বিগড়ে রাখা হয়েছে!'

একটা করে কথা বলি আর কামানটায় এটা-সেটা নেড়ে, পড়ে থাকা শেষ হারপুনটা দিয়েই তাতে খোঁচা দিই।

বেশিক্ষণ এ খেলা আর খেলা গেল না। একেবারে যেন সাক্ষাৎ গোরিলা হয়ে কামানটার দিকে ছুটে এসে ড্যানি বললে, 'কামান খারাপ? কেউ বিগড়ে রেখেছে? দেখবি তাহলে কামান ঠিক আছে কি না, আয় তোকেই কামানের সামনে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছি কামান বিগড়েছে কি না!'

কিন্তু দেখিয়ে দেবে কী! হারপুন কামানটা তখন সত্যিই অচল হয়ে গেছে আমার খোঁচাখুঁচিতে।

বেশ কিছুক্ষণ সেটা নাড়াচাড়ার চেষ্টা করেও বাগে আনতে না পেরে ড্যানি যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তাতে মনে হল বিনা হারপুনেই বুঝি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাব।

শুধু তাকিয়েই ক্ষান্ত হবার পাত্র সে নয়। হরিণ ছানার দিকে কেঁদো বাঘের মতো আমার দিকে এগোতে এগোতে তার মুখ দিয়ে যেন ফেনা ওঠার মতো দাঁত কিড়মিড় করা ক-টা আওয়াজ তখন বেরিয়ে আসছে—'তুই! তুই এই শয়তানি মতলব নিয়ে জাহাজে এসেছিলি! পাঁচ পাঁচটা শিকার আমার নষ্ট করেছিস, তারপর আবার কামানটাও দিয়েছিস বিগড়ে!'

ড্যানি যত এগোয় আমি তত যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ আর অবাক হয়ে পেছোই জাহাজের ডেকের ওপর।

পেছোতে পেছোতে নালিশের সুরে বলি, 'এ তোমার কী রকম ব্যাভার! বাজি জিতে অত রাগারাগি কীসের? তুমি জিতেছ আমি হেরেছি। এইতেই তো সব চুকে গেল, ব্যস। হারার শাস্তি আমি অবশ্য নিচ্ছি। এই যে মলছি নিজের কান আর—'

ড্যানি শেষটা ঝাঁপিয়ে আসবার আগে আমি কান দুটো মলে, ডেকের রেলিং টপকে নীচের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম।

সেই যে পড়লাম তার পর থেকে ড্যানি গাওয়ারের কাছ থেকে পালিয়েই বেড়াচ্ছি।

শেষ লুকোবার জায়গা অ্যাটকা থেকে তার কাছে ধরা পড়ায় খুব দুঃখিত কিন্তু আমি নই। ঠিক এই সময়টিতেই ধরা পড়ায় তার মধ্যে যেন ভাগ্যের হাত আছে বলতে ইচ্ছে করে।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ড্যানি এসে যখন কেবিনের দরজা খুলল তখন ভাবনা-চিন্তা যা করবার করে নিয়ে ক্যাপ্টেনের বিছানাতেই আমি ঘুমোচ্ছি।

'ঘুমোচ্ছ তুমি!' আমায় এই অবস্থায় ঘুমোতে দেখেই ড্যানি আবার তুই থেকে তুমি-তে উঠে এল কিনা কে জানে! কিন্তু নিজেই বেশ একটু যেন অপমানিত বোধ করে রেগে বললে, 'মাথার ওপর এমন খাঁড়া নিয়ে ঘুমোতে তুমি পারছ!'

'পারলাম তো দেখছি!' আমি যেন এ বেয়াদবির জন্য দুঃখিত হয়ে বললাম।

'হুঁ, পাগল!' ড্যানি গাওয়ার গজরাতে গজরাতে বললে, 'ভাবছ—খাঁড়াটা ওই পেপার টাইগার-এর মতো কাগজে আঁকা খাঁড়া! ড্যানি গাওয়ার কি সত্যিই অ্যালব্যানিতে ধরে নিয়ে গিয়ে যা বলেছে তাই করতে পারবে—এইরকম ভাবছ, কেমন? ভাবছ ড্যানি মুখেই শাসাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দুটো গালাগাল আর গাঁট্টাটাট্টা দিয়ে ছেড়ে দেবে! কিন্তু ড্যানিকে তাহলে চেনো না। ওই যেমন যেমনটি বলে রেখেছি ঠিক তাই করব অ্যালব্যানিতে নিয়ে গিয়ে। তিমিদের ওপর বড় দয়া তোমার। একেবারে দয়ার সাগর! তিমি মারবে না বলে ইচ্ছে করে হারপুনগুলো ভুল টিপ করে ছুড়েছ! আমার কামানটা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে এসেছ। তার শোধ আমি নিই কি না দেখবে! তোমায় দিয়ে ওই তিমিই শিকার করাব। আর এবারে একটা হারপুন যদি ফসকায় তাহলে হারপুন বাঁধা রশি গায়ে জড়িয়ে দিয়ে গোলা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিমা বানিয়ে ছাড়ব।

ভাবছ, এসব পারব না! পারি কি না দেখবে। আমার বুকের ভেতরটা জ্বলছে না এই এক বছর ধরে? কী লোকসান আমার করিয়েছ তা জানো? তিমি ধরা মহলে আমার মান সম্মান তো গেছেই, তার ওপর এক বছরে একটা তিমি না ধরতে পেরে সব কাজ-কারবার আমার লাটে উঠেছে। আমি ড্যানি গাওয়ার আজ দেউলে হতে চলেছি, শুধু তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য!'

ড্যানি গাওয়ারের এই সমস্ত গজরানি অ্যাটকা থেকে আডাক যাবার টাগবোটের

কেবিনে বসেই অবশ্য শুনতে হয়নি।

টাগবোটের কেবিনে যা আরম্ভ হয়েছিল, আডাকে নেমে তার নিজের প্লেনে চড়ার পরও সে গজরানি সমানে চলেছে, আর শেষ হয়েছে সে প্লেন থেকে অ্যারিজোনার গিলা নদীর উপত্যকায় আমার নির্দেশমত নামার পর।

যতক্ষণ সে কথা বলে গেছে ধৈর্য ধরেই শুনেছি। শুধু প্লেন থেকে আমার দিকে আঙুল তুলে তার শেষ আস্ফালন মেশানো আক্ষেপ জানাবার পর যেন অনুশোচনার সঙ্গে বললাম, 'তোমার এসব লোকসানের হিসেব করে রেখেছি। আশা করি তা পুষিয়ে দিয়ে শোধ করার ব্যবস্থা করতে পারব।'

শোধ করার কথা শুনেই আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে ড্যানি গাওয়ার।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তৎক্ষণাৎ তুমি থেকে তুই-তে নেমে বলেছে, 'লোকসান শোধ করে দিবি তুই? তোর মতো চিমসে চামচিকে করবে ড্যানি গাওয়ারের কারবারের ক্ষতিপূরণ? জানিস কত লক্ষ লক্ষ ডলার এই তিমি শিকারের কোম্পানিতে আমি ঢেলেছি? অ্যালব্যানির মূল ঘাঁটি ছাড়া সারা পৃথিবীতে কত আমাদের তিমি ধরা আর তেল বার করার আস্তানা আছে তা জানিস? সে সব লোকসান তুই মিটিয়ে দিবি?'

'দেব,' একটু জোর দিয়েই বললাম এবার, 'শুধু একটি শর্ত তোমায় মানতে হবে।'

'শুধু একটি শর্ত?' ড্যানি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, 'কী শর্ত?'

'বলছি, একটু দাঁড়াও!' বলে যা করতে যাচ্ছিলাম ড্যানি তা করতে দিলে না।

আমি তার সঙ্গে আবার কিছু চালাকি করছি ভেবে ঘাড়টা ধরে আমায় আটকে রেখে জ্বলন্ত গলায় বললে, 'কী সে শর্ত বলবার আগে আমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দে? যে শর্তের কথা বলতে চাইছিস তা কি প্লেনের তেল পুড়িয়ে এতদূরের এই অ্যারিজোনার মরুভূমির মাঝখানে না নেমে বলা যেত না। কথাটা সেই অ্যাটকা থেকে আডাকে এসেই কি বলতে পারতিস না।'

'না, তা বলা যেত না', মাথা নেড়ে জানালাম, 'তা ছাড়া অন্য কোথাও বললে কথাটা তোমায় বিশ্বাস করাতেই পারতুম না। এখানকার মতো এমন জোরও হত না কথাটায়।'

'হুঁ?' এবারে বিদ্রূপ না করে যেন পারল না ড্যানি—'এই আগাছার ঝোপ-সম্বল মরুভূমিটায় এমন জাদু আছে যে এখানে কথা বললেই তার দাম বেড়ে যাবে?'

একটু থেমে বেশ একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করতে করতে ড্যানি তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, বেশ বলো শুনি, কী তোমার শর্ত যা পালন করলে আমার সমস্ত লোকসান তুমি মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।'

'শোনো তাহলে', ধীরে ধীরে বললাম, 'তিমি শিকারের কারবার তোমায় একেবারে ছাড়তে হবে আর—'

এর বেশি এগোবার আর সুযোগ পেলাম না।

এবারে একটু ধৈর্য ধরেই শোনবার চেষ্টা করছিল ড্যানি। কিন্তু শর্তটা রাখতে তিমি শিকার চিরকালের মতো ছাড়তে হবে শুনে এক মুহূর্তে সত্যিকার গোঁয়ার গোরিলা হয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এখন আর অহংকারে সুড়সুড়ি দেবার সময় নেই। তাই গাটায় একটু ঝাঁকুনি দিতে হল।

তারপরও তাকে ঠাণ্ডা করতে একটু সময় লাগল।

অ্যারিজোনায় গিলা নদীর উপত্যকার সেই আধামরুর একটা বুনো ঝোপের ওপর সচাপটে গিয়ে পড়েও তার রোক কি সহজে যায়!

'তুই সুঁটকো চামচিকে! তোর এতবড় আস্পর্ধা!' বলে আবার এল আমার দিকে ছুটে। তবে এবার আর আগের মতো অসাবধানে নয়। বেশ একটু হুঁশিয়ার হয়েই এল।

তা সত্ত্বেও আবার সেই ঝোপটার ওপরেই গিয়ে পড়ে ড্যানি সত্যি এবার হতভম্ব।

খানিকক্ষণ তার আর নড়ন-চড়ন নেই।

হাড়গোড় কিছু ভাঙল কিনা দেখবার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতেই আবার একবার তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠবার চেষ্টা করলে।

তারপর নিজেই কী বুঝে হতাশভাবে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে একটু বেঁকেচুরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বলো কী বলতে চাও! তিমি শিকার না হয় ছাড়লাম, তারপর আমার লাভ-লোকসান পুষিয়ে যাবে কীসে?'

যে-ঝোপটার ওপর সে দু-দুবার গিয়ে পড়েছিল সেই বুনো ঝোপটারই জংলা খুঁটি সমেত একটা ভাঙা ডাল কুড়িয়ে এনে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এই তোমার সব দুঃখু ঘোচানো মুশকিল আসান। স্পার্ম তিমির বংশ বাঁচানোর জাদুকাঠি।'

এক পলকের জন্য ড্যানির চোখ দুটো জ্বলে উঠতে গিয়েই আবার নিভে গেল।

মড়ার ওপর যেন খাঁড়ার ঘা দিয়েছি এমনই করুণ কাতর মুখ করে বললে, 'তোমার জন্যই সর্বস্বান্ত হয়ে তোমার হাতেই এখন পড়েছি। যত পারো ঠাট্টা করে নাও।'

'ঠাট্টা তোমায় করছি না, ড্যানি', গাঢ় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাকে বললাম, 'সত্যিই এ মরুভূমির এই বুনো সিমের ঝোপ স্পার্ম তিমির বংশরক্ষা থেকে দুনিয়ার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির তেল জোগানো পর্যন্ত অবিশ্বাস্য সব অসাধ্যসাধন করতে পারে।

অ্যারিজোনা মরুভূমির এ বুনো সিমের ঝোপকে এখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা বলত, হো-হো-বা! এ অঞ্চলের মানুষ সেকালে এই বুনো সিমের তেল ধন্বন্তরী মনে করত পেটের অসুখ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত সব রকম রোগের। এ যুগের সভ্য শিক্ষিতেরা বুনো সিমের এসব গুণের খ্যাতি হেসে উড়িয়ে দিলেও তেলটা একেবারে অবহেলায় পড়ে থাকেনি। এ অঞ্চলের প্রথম স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকরা এই জলের মতো রংছুট মোম জাতের তেল তাদের গোঁফ পাকাতে অন্তত ব্যবহার করত।

তারপর উনিশশো ত্রিশ সালে এই অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কৃষি কলেজের এক রাসায়নিকই গবেষণা করে বার করেন যে স্পার্ম তিমির মাথার তেলের সঙ্গে এই বুনো সিম হো-হো-বা-র তেলের আশ্চর্য মিল আছে।

রাসায়নিকের সে আবিষ্কারে কেউ তেমন নজর দেয়নি, কারণ তখনও অবাধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পার্ম তিমি শিকার চলছে সারা দুনিয়ায়। স্পার্ম তিমি তখন নির্বংশ হবারও উপক্রম হয়নি।

আজ এ-তিমির বংশ লোপের সম্ভাবনা দেখে দুনিয়ার সর্বত্র বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী মহলের টনক নড়েছে। স্পার্ম তিমির তেলের বদলি কী হতে পারে তাই খুঁজছে সবাই হন্যে হয়ে।

যা খুঁজছে তা হাতের কাছে এই মরুভূমিতেই কিন্তু প্রায় অবহেলায় পড়ে আছে।

তিমির বংশ বাঁচাবার জন্য যোঝবার সময়ই অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাসায়নিকের গবেষণার রিপোর্ট আমার চোখে পড়ে।

অ্যালবানির সমুদ্রে ওইভাবে তোমার সঙ্গে চালাকি করে তিমি শিকার বন্ধ করার পর সেখান থেকে পালিয়ে নানা জায়গা আমি অকারণে ঘুরে বেড়াইনি। ইনটারন্যাশন্যাল হোয়েলিং কমিশনকে চিঠির পর চিঠি যেমন লিখেছি, লেনিনগ্রাড আর সানফ্র্যানসিস্‌কোর বড় বড় ল্যাবরেটরিতে হো-হো-বা সিমের তেলের গুণাগুণও তেমনই পরীক্ষা করিয়েছি। অ্যাটকা থেকে চলে আসার সময় যেদিন তুমি আমায় ধরে ফেলো, সেইদিনই একসঙ্গে দু ল্যাবরেটরির চিঠি আমি পাই। দু জায়গার রিপোর্টই এক। হো-হো-বা সিমের তেল অনায়াসে স্পার্ম তিমির তেলের বদলে ব্যবহার করা যায়।'

একটু থেমে পকেট থেকে দু জায়গার রিপোর্ট দুটো বার করে ড্যানির হাতে দিয়ে এবার বললাম, 'এই নাও সব রিপোর্ট। এখন এর পর যতটা পারো ইজারা নিয়ে ফলাও করে হো-হো-বা-র চাষ শুরু করো। লোকসান যা দিয়েছ তার ডবল লাভ পাবে।'

ড্যানি গাওয়ার সেই চাষই শুরু করেছে বলে জানি।"

ঘনাদা থামলেন। তারপর একটু উসখুস করে বললেন, "ওহে একটা কথা মনে হল হঠাৎ। তোমাদের ওবেলার মেনুতে চপ-সুই-টা কি লেখা আছে?"

"থাকবে, ঘনাদা, থাকবে!" আমরা সমস্বরে ভরসা দিলাম।

গুল-ই ঘনাদা

হ্যাঁ, সত্যিই অবিশ্বাস্য অঘটন।

ঘনাদা রাজি। কষ্টেসৃষ্টে অনেক সাধাসাধির পর নয়, রাজি এক কথায়। মুখ থেকে কথাটা পড়বামাত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছেন ঘনাদা। আর সেইটেই অবিশ্বাস্য অঘটন।

সত্যি কথা বলতে গেলে এরকম অঘটনের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাদের সব প্যাঁচ তাই কেটে গেছে, সব চাল বানচাল, সব বুদ্ধি গুলিয়ে গিয়ে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি।

তা হতবুদ্ধি হওয়া আর আশ্চর্য কী!

আমরা আটঘাট বেঁধে কিস্তিমাতের জন্য যেভাবে সব ঘুঁটি সাজিয়েছিলাম, ঘনাদা একটি চালে তা ভেস্তে দিয়েছেন।

ঘনাদা রাজি হবেন না কিছুতেই এই নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপরই আমাদের সব চাল ছকে রাখা ছিল।

তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন আমাদের বায়না এড়াবার জন্য, আর আমরা তাঁর নিজের হামবড়াইয়ের প্যাঁচেই তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে জব্দ করব, এই ছিল মতলব।

সেই মতলবেই সবাই মিলে সেদিন একেবারে চোখেমুখে যেন আগুনের হলকা নিয়েই ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে টঙের ঘরে ঢুকেছিলাম।

"না, এ অপমান আর সহ্য করা যায় না।"

"এর একটা বিহিত না করলেই নয়।"

"আমাদের একেবারে জাত তুলে যা-তা বলা!"

ঘনাদা কি একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত?

না। তা ঠিক নয়। চোয়ালের-হাড়-ঠেলা কুড়ুল-মার্কা মুখে ভাবান্তর কিছু অবশ্য দেখা যায়নি। কিন্তু গড়গড়ায় টান দেওয়ার মাত্রাটা বেশ একটু বেড়ে যাওয়াতেই আশ্বস্ত হয়েছি। ওষুধটা প্রথম দাগ পড়তেই কাজ হচ্ছে বোঝা গিয়েছে।

হুঁকোয় ঘন-ঘন টান দেওয়াটা তাঁর হুঁশিয়ারিরই লক্ষণ। আমরা কোন দিক দিয়ে কীরকম হানা দিতে যাচ্ছি তা আঁচ করে তার মওড়া নেবার ফিকিরই তিনি ভাবছেন নিশ্চয়।

খুশি হয়ে আমরা আমাদের পরের চাল এবার চেলেছি।

"কোন হাটে যে ছুঁচ বেচতে এসেছে, বাছাধন এখনও জানে না!" নাক বেঁকিয়ে বলেছে এবার শিশির।

"থোঁতা মুখ কেমন করে ভোঁতা করতে হয়, এবার দেখাচ্ছি!" গৌর দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছে।

এরপর শিবু আমাদের সাজানো ছক মাফিক একটু উলটো সুর ধরেছে, "কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঘনাদাকে জ্বালাতন করা কি ঠিক হচ্ছে?"

"তুচ্ছ ব্যাপার!" আমি খেপে উঠেছি শিবুর ওপর, "আমরা বন্দুক ধরতেই জানি না বলে টিটকিরি দেওয়াটা তুচ্ছ ব্যাপার হল?"

"বেশ, তুচ্ছ ব্যাপারই সই," গৌর শিবুর কথাটাই পেঁচিয়ে ধরে বলেছে, "কত যে তুচ্ছ, ঘনাদা তা-ই শুধু দেখিয়ে দেবেন। ডান হাতটাও লাগাতে হবে না ওঁকে। বাঁ হাতেই বুলস আই শতকরা-নিরানব্বই-বার।"

ঘনাদার নীরব সম্মতিটা যেন পেয়েই গেছি, এমনই উৎসাহে সবাই এবার ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠেছি।

"ঘনাদাকে তো আর চেনে না!" শিশির শুরু করেছে, "ওকে নিয়ে আজ বিকেলে হাজির হলে সেই রকম টিটকিরিই নিশ্চয় দেবে। বলবে, 'কী! বন্দুক ছোড়ার শখ এখনও মেটেনি বুঝি? বুকে হাতে এমব্রোকেশন মালিশ করে আবার·তাই এসেছ! সঙ্গে এ মূর্তিমানটি আবার কে?' "

" 'উনি, মানে উনি', আমরা যেন আমতা আমতা করে বলব," আমি এবার কল্পনার সুতো ছেড়েছি, " 'উনি একটু চেষ্টা করে দেখতে চাইছেন।' চেষ্টা শুনেই ভুরু দুটো কোঁচকাবে নিশ্চয়ই, আর সেই সঙ্গে টিপ্পনি শোনা যাবে। 'চেষ্টা করবেন উনি? বন্দুকটা তুলতে পারবেন তো!' "

"ঘনাদা তারপর অতি কষ্টেই যেন বন্দুকটা তুলবেন।" এবার খেই ধরেছে গৌর, "তারপর ডান কাঁধ না বাঁ কাঁধে লাগাবেন ঠিক করতে না পেরে শুধু হাতে ধরেই ঘোড়াটা টিপে বসবেন।"

"তারপরই হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার!" শিবুও যেন আর মেতে না উঠে পারেনি, "নিশানার মাঝখানের লাল আলোর ডুমটাই ফটাস!"

"বন্দুকওয়ালার চোখ কি ছানাবড়া?" আমি নিজেই জিজ্ঞেস করে তার জবাব দিয়েছি, "উঁহুঃ, এখনও নয়। হঠাৎ বেটপকা গুলিটা লেগে গিয়েছে ভেবে সে বদমেজাজে একটু ঠোঁট বাঁকিয়েই বলবে, 'কী! আরও ছোড়ার শখ আছে নাকি!'"

"কী বলবেন তাতে ঘনাদা?"

"ঘনাদা কেন, আমরাই যা বলবার বলব।" শিশির এবার দোহার দিয়েছে, "মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলব, 'তা একটু আছে।' "

" 'বেশ, ছুড়েই দেখ তাহলে!' বন্দুকওয়ালা এবার দাঁত খিঁচিয়েই বলবে নিশ্চয়।"

"তাতে আমরা যেন আরও ভড়কে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলব, 'কিন্তু নিশানার মাঝখানে আর একটা লাল আলোর ডুম দিলে হয় না?' "

" 'আবার লাল বাল্‌ব?' লোকটার মুখটা যা তখন হবে! রীতিমত চিড়বিড়িয়ে উঠে বলবে, 'লাল বাল্‌বের বুল্‌স্ আই আবার দাগবার আশা আছে নাকি! থাক! থাক! খুব কেরামতি হয়েছে। আর দুটো গুলি পাওনা আছে। এমনি ছুড়ে দিয়ে বিদেয় হও।' "

" 'কিন্তু এখানকার চাঁদমারির যা নিয়ম,' আমরা সবিনয়ে বলব, " 'সেটা মানা উচিত নয় কি?' "

" 'ও, নিয়ম দেখাতে এসেছে?' আমাদের চিবিয়ে খাবার মতো গলায় বলবে বন্দুকওয়ালা, 'বেশ, বুল্‌স্‌ আইয়ের লাল বাল্‌বই লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখি নিশানদারির দৌড়। দেখি ক-টা বাল্‌ব ফাটে!' "

"বুল্‌স আইয়ের লাল আলোর ডুম কিন্তু ফাটবে। একটা দুটো নয়, পর পর পাঁচটা দশটা পনেরোটা!"

"শেষকালে লাল আলোর বাল্‌বই হবে বাড়ন্ত।"

"বন্দুকওয়ালার মুখখানা তখন কী হবে? কেলে হাঁড়ি, না জালা? আর চোখ দুটো নেহাত কোটরে কুলোবে না বলেই—ছানাবড়ার বদলে মালপো হতে পারবে না।"

"ওঃ, কী শিক্ষাটাই হবে!"

কল্পনার শেষ দিকের তুলিটা চারজনে মিলেই চালিয়ে এসে এবার ঘনাদার দিকে যেন আকুলভাবে ফিরেছি।

"আপনাকে কিন্তু আজ যেতেই হবে, ঘনাদা।"

"বন্দুকওয়ালার নাকটা একেবারে ওর ওই নকল চাঁদমারির মাটিতেই ঘষে দিয়ে আসব।"

"একজিবিশনে বিকেল চারটে থেকে লোক জমতে শুরু হয়। সন্ধে ছ-টা নাগাদ পুরস্কারের লোভে চাঁদমারি মানে শুটিং গ্যালারি জমজমাট হয়ে ওঠে।"

"ঠিক সেই মোক্ষম সময়টিতে আপনাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হব। আজ সাতটায় একজিবিশনের চাঁদমারিতে বাহাদুরকা খেল হবে বলে লাউডস্পিকারে ঘোষণার ব্যবস্থাও আমরা করে এসেছি।"

"আঃ! ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চাঁদমারির সামনে লোকে লোকারণ্য। বন্দুকওয়ালা হতভাগা চিপটেন কেটে কেটে সকলকে অপমান করে তাল ঠুকছে, 'কই! সব ঠুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? কার কত মুরোদ বন্দুকটা ছুড়ে দেখিয়ে যাক।'—ঠিক সেই সময়ে আপনাকে নিয়ে ঢুকব। বন্দুকওয়ালা তো টিটকিরি দেবেই। অন্য সবাইরাও নিশ্চয় ভাববে, এ তালেবরটি আবার কে?"

"তালেবরটি যে কে তা ভাল করে বুঝিয়ে ওই মেলাভর্তি লোকের মাঝখানে নাক খত খাইয়ে সব টিটকিরির শোধ আজ নিতেই হবে। আপনি তৈরি থাকবেন ঘনাদা, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ-টায়।"

আমরা সব কথা যেন পাকা করে ওঠবার উপক্রম করেছি।

আসল খেলা এইবারই শুরু হবার কথা। ঘনাদা কেমন করে এ দায় থেকে পিছলে বার হবার চেষ্টা করেন সেই মজা দেখাই আমাদের মতলব।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে ঘনাদার "আ—চ্ছা—" বলে একটু টান দেওয়ায় সেই আশাতেই ফিরে তাকিয়েছি।

কিন্তু এ কী বলছেন ঘনাদা! প্রশ্নটা একটু বেয়াড়া নয় কি?

ঘনাদা অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, "বন্দুকটা কী বলো তো। গান, না

রাইফেল?”

“বন্দুকটা—বন্দুকটা?” আমরা একটু বুঝি থতমত খেয়েছি। তারপর গৌরই প্রথম সামলে উঠে বলেছে, “বন্দুকটা রাইফেল।”

“ভাল। ভাল।” ঘনাদা যেন খুশি হয়েছেন। আর আমরা বেশ ভাবিত হয়ে উঠেছি। লক্ষণটাও ভাল নয়। ঘনাদার কি এখন বন্দুকের খবর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়! দায় এড়াবার জন্য এখনই তো তাঁর আঁকুপাঁকু শুরু হয়ে যাওয়া উচিত।

রাইফেলের খোঁজ নেওয়াটা ঘনাদার সেই ভড়কানিরই হয়তো একটা লক্ষণ ভেবে মনকে অবশ্য প্রবোধ দিয়েছি। তাঁর পরের প্রশ্নে সেই আশায় একটু হাওয়াও লেগেছে।

“আচ্ছা,” ঘনাদা গড়গড়ায় দুটো টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, “তোমাদের ওই খেলার চাঁদমারির মালিকের নামটা কী তা জানো নাকি?”

“তা আর জানি না?” এবার আমাদের জবাব দিতে দেরি হয়নি। সকালে সবাই মিলে ঠিক করা নামটা চটপট বলে দিয়েছি। “নাম হল অটো কালেদ।”

“অটো কালেদ!” নামটা বার তিনেক যেন জিভে তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করেছেন ঘনাদা।

আর তারপর আমাদের একেবারে আক্কেলগুড়ুম করে দেওয়া সেই বাণীটি শুনিয়েছেন। ঘাড় নেড়ে বলেছেন, “বেশ। যাব তাহলে।”

“যাবেন?”

আমাদের ধরা গলায় উল্লাসটা একটু বোধহয় আর্তনাদের মতো শুনিয়েছে।

তবু সেই রকমই একটা ভাব বজায় রেখে উলটো প্যাঁচ কষা শুরু করতে হয়েছে তখনই।

“ভাবছি, আগে থাকতে একটা পোস্টার ছাড়লাম না কেন?” শিশির আফশোস করেছে, “সারা শহরে একটা শোরগোল তুলে দিতে পারতাম।”

“শোরগোল এমনিতে কিছু কম হবে ভাবছিস?” গৌর শিশিরকে সংশোধন করেছে, “মুখেই যা রটাবার ব্যবস্থা করেছি তাতে কাতারে কাতারে লোক ওখানে গিয়ে জড়ো হবে দেখিস।”

“তা ছাড়া ওখানে গিয়েই তো একজিবিশনের লাউড স্পিকারে সব ঘোষণা করে দেব।” শিবু তার পরিকল্পনাটা জানিয়েছে।

“ঘোষণাটা কী হবে কিছু ভেবেছিস?” জিজ্ঞাসা করেছি আমি।

“তা আর ভাবিনি?” শিবু গড়গড় করে তার ঘোষণা শুনিয়েছে, “আসুন, আসুন, দলে দলে চাঁদমারিতে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিশানাদারি দেখে জীবন সার্থক করুন।”

“শুধু ওই নয়, বলতে হবে,” শিশির ঘোষণাটা আরও চটকদার করতে চেয়েছে, “পৃথিবীর অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় বন্দুকবাজ শ্রীঘনশ্যাম দাসকে স্বচক্ষে দেখার এমন সুযোগ আর পাবেন না।”

ঘোষণাটা বাতলাতে বাতলাতে ঘনাদার দিকে চেয়ে শিশির জিজ্ঞাসা করেছে, “আপনার সেই ইউরোপের কীর্তিটাও বলব নাকি, ঘনাদা?”

ঘনাদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি জানতে চেয়েছি, "কোন কীর্তিটার কথা ভাবছিস? লেনিনগ্রাডে রিভলভারে সেই মাছি মারা, না ড্যানিউব দিয়ে হাইড্রোফয়েলে যেতে যেতে সেই—"

কীর্তিটা চটপট ভেবে নিতে না পেরে যে অপ্রস্তুত অবস্থাটা হতে পারত, শিবু ধমক দিয়ে তা থেকে আমায় বাঁচিয়েছে।

"কী আজেবাজে বকছিস?" শিবুর গলাটা কড়া—"ওসব বললে কে কতটুকু বুঝবে! তার চেয়ে বার্লিনের সেই রেকর্ডের কথা বলব, সেই দাঁড়িয়ে, বসে, কাত কি চিত হয়ে শুয়ে যে-ভাবে হোক বন্দুক ধরে দুশোর মধ্যে একশো সাতানব্বইর নীচে নিশানাদারি নামেনি।"

"ওই রেকর্ডের কথাই বলব তো?" প্রশ্নটা এবার সরাসরি ঘনাদাকে।

"বলবে?" ঘনাদার কোনও ভাবান্তর দেখা যায়নি। একটু যেন সবিনয়ে বলেছেন, "কিন্তু ওসব কথা না বলাই তো ভাল।"

ঘনাদা বলছেন, না বলাই ভাল। তার মানে বলাতেও ঘনাদার বিশেষ আপত্তি নেই। অর্থাৎ ঘনাদা তাঁর সায় দেওয়া নাকচ করছেন না। সত্যিই আমাদের আবদার রেখে বিকেলে বন্দুকের কেরামতি দেখাতে একজিবিশনের মেলায় যেতে রাজি।

এরপর 'তদা নাশংসে বিজয়ায়' মার্কা মুখে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে নেমে আসা ছাড়া আর করবার কী আছে। নামতে নামতে ভেবেছি, আমাদের চালাকি কি বুমেরাং হয়ে আমাদের ওপরই এসে হানা দিতে যাচ্ছে?

সকাল থেকে দুপুর আর দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পর সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

এর আগে দু-দুবার ঘনাদা মুখে এমনই আমাদের আবদারে সায় দিতে বাধ্য হলেও জিরো আওয়ারের আগে একটা-না-একটা ফিকিরে আমাদের ফাঁস ফসকে বেরিয়ে গেছেন।

একবার গেছলেন তক্তপোশের তলায় লুকিয়ে সেখান থেকে একটা কাচের টুকরো বার করে, আর একবার কেঁচোর ওপর ভক্তি গদগদ হয়ে।

ঘনাদা শেষ মুহূর্তে সেই রকম একটা ছুতো বার করবেন এ আশা কিন্তু বিফলই হল। ছ-টার পর সাড়ে ছ-টা বাজতে ঘনাদাকে নিয়ে একজিবিশনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় রইল না।

তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েও শেষ চেষ্টা করতেও বাকি রাখলাম না। ঘনাদাকে বেমালুম সরে পড়বার যত রকম সম্ভব—সব সুযোগই দিলাম। ট্যাক্সির নামও না করে ইচ্ছে করেই ঘনাদাকে সসম্মানে পেছনের দিকে বসিয়ে নিজেরা ট্রামের সামনে গিয়ে বসলাম আর সারা রাস্তায় ভুলেও একবার পেছন ফিরে তাকালাম না।

এমন একটা মৌকা ঘনাদা কি অবহেলা করবেন? চুপিসারে যে-কোনও স্টপে নেমে গেলে তাঁকে রুখছে কে?

নামবার জায়গার কাছাকাছি এসে দুরুদুরু বুকে বেশ একটু ব্যাকুলভাবেই পিছন

ফিরে তাকালাম। তাকিয়ে বুকগুলো দমে গেল।

ঘনাদা জাজ্জ্বল্যমান চেহারায় সেখানে বসে আছেন। মুখ ঘোরাতে দেখে বেশ একটু উৎসুকভাবেই যেন বললেন, "কী হে, এইখানেই নামতে হবে না?"

সেইখানেই নামলাম, আর তারপর থেকে ভূমিকা বদলাতে হল।

ঘনাদার নয়, আমাদেরই এখন পালাবার ফিকির খোঁজার গরজ। ট্রাম স্টপ থেকে নেমে একজিবিশনের গেটে যেতে যেতেই ফন্দিটা ঠিক করে নিয়ে কাজে লাগালাম।

বুদ্ধির বাহাদুরি-টুরি কিছু নয়, নেহাত ছেলেমানুষি ফন্দি। কোনওরকমে কায়দা করে ঘনাদাকে টিকিট কিনে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার পর নিজেরা গেট থেকেই হাওয়া।

এ-রকম একটা কাঁচা চালে শেষরক্ষা হবে না জানি, তবু আপাতত মান বাঁচিয়ে চলনসই একটা কৈফিয়ত বানাবার ফুরসত তো পাওয়া যাবে।

কিন্তু যত ফুরসতই পাই, চলনসই একটা কৈফিয়ত খাড়া করাও কি সম্ভব?

একজিবিশনের গেট থেকে পালিয়ে এলোপাথাড়ি এ রাস্তায় সে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পরামর্শ করে কোনও কূলই পেলাম না। যে-গল্পই সাজাই সবই যে শতচ্ছিদ্র, তা বুঝতে পারি। কিন্তু সারারাত তো বাইরে কাটানো যায় না, পালিয়েও যাওয়া যায় না বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই বনমালি নস্কর লেনে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘনাদাকে কী মূর্তিতে যে দেখব তা তো বুঝতেই পারছি। কপালে যা আছে তার কাছে ফাঁসি-দ্বীপান্তরও তুচ্ছ। তবু যা হয় হোক, সাফ-সাচ্চা কথাই বলে দেব।

বলব যে—

বলার ভাবনাগুলো নীচে থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখেই জমে পাথর হয়ে গেল। বনোয়ারি তখন আমাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে ওপরে যাচ্ছে।

কিন্তু ওর হাতের ট্রেতে ওসব ঢাকা দেওয়া প্লেট কীসের?

"এসব কী, বনোয়ারি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" জিজ্ঞাসা করতেই হল হতভম্ব হয়ে।

বনোয়ারি যা জবাব দিলে তাতে একেবারে তাজ্জব। প্লেটগুলো নাকি কবিরাজি কাটলেটের আর বনোয়ারি এসব নাকি বড়বাবু মানে ঘনাদার ফরমাশেই তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

"কিন্তু ট্রেতে অমন পাঁচ-পাঁচটা প্লেট কেন? তোমার বড়বাবু কি পাঁচ প্লেটই সাঁটবেন?"

"না, তা নয়", বনোয়ারি হাসিমুখে জানাল যে, পাঁচটার মধ্যে চারটে প্লেট আমাদেরই জন্য।

"আমাদের জন্য? আমাদের জন্য ঘনাদা নিজে থেকে কবিরাজি কাটলেটের অর্ডার দিয়ে রেখেছেন? তা তিনি কোথায়? তাঁর টঙের ঘরে?"

না, টঙের ঘরে নয়, দোতলায় আমাদের আড্ডাঘরেই তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঘনাদার অপেক্ষা করাটা কী ধরনের? আমাদের জন্য এ-ভোজের ব্যবস্থা করারই

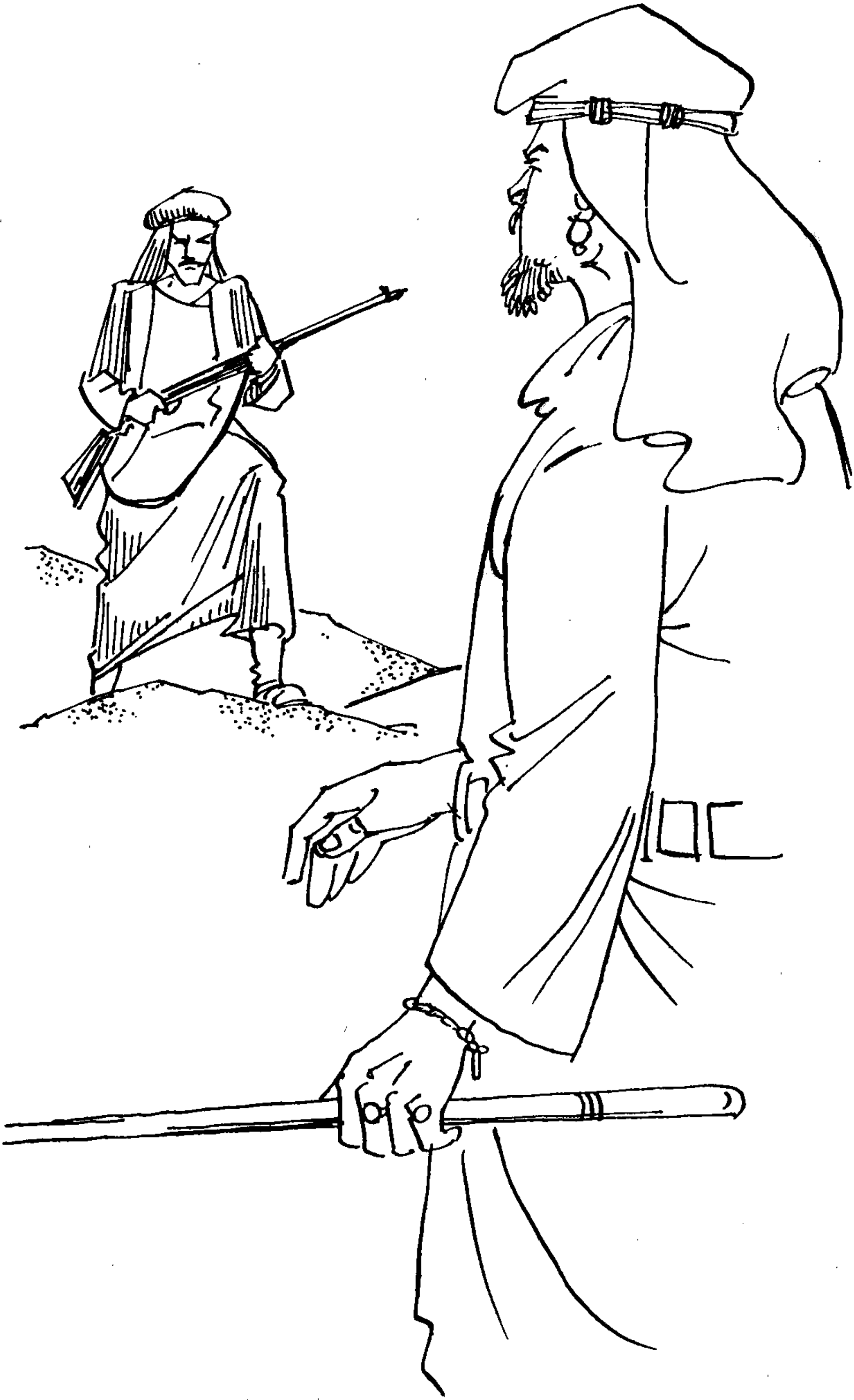

বা মানে কী?

খাঁড়ার কোপ দেবার আগে বলির ছাগেদের জন্য যেমন নধর ঘাসের ব্যবস্থা থাকে তেমনই কিছু?

দুরুদুরু বুকে ওপরে উঠে দোতলার বারান্দা দিয়ে আড্ডাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে হতভম্ব। ঘনাদা বেশ মৌজ করে তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে গড়গড়া টানছেন। তাঁর সামনের টেবিলেই পাঁচ-পাঁচটি প্লেট সমেত বনোয়ারির ট্রেটি রাখা।

হতভম্ব শুধু ঘনাদাকে অমনভাবে শায়িত দেখে নয়, আমাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিশ্বাস্য সম্ভাষণ শুনেও।

"এসো, এসো," ঘনাদা যেন সাদরে বললেন, "মিছিমিছি হয়রান হয়ে এলে তো!"

কথাগুলো বাঁকা না সোজা আর ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে ধরতে না পেরে খুনের আসামিদের মতোই ভয়ে-ভয়ে যে যেখানে পারি টান হয়ে গিয়ে বসলাম।

বনোয়ারি তার ট্রেটা সামনের টেবিলে রেখে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা বসবামাত্র হাতে হাতে এক-একটা প্লেট ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু প্লেট থেকে যত মনমাতানো গন্ধই পাই, সেদিকে দৃষ্টি দেবার মতো মেজাজ কি তখন আছে?

অবস্থাটা বুঝে ঘনাদাই এবার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করলেন। নিজের ম্যাগনম প্লেটটির প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, "নাও, নাও খেয়ে নাও। মোড়ের প্যারিস গ্রিল থেকে অর্ডার দিয়ে আনা স্পেশ্যাল কবিরাজি। ঠাণ্ডা হলে আর তার পাবে না।"

ঘনাদার কথায় কবিরাজি কাটলেটের সদ্‌গতিতে মন দিতে হল, কিন্তু রহস্যটা কী তখনও ভেবে থই পাচ্ছি না। ঘনাদার মহানুভবতা একটু মাত্রাছাড়া মনে হচ্ছে না এ ব্যাপারে? আমাদের নির্বোধ চালাকি হাতেনাতে ধরে ফেলেও তিনি প্রসন্ন মনে আমাদের জন্য নিজে থেকে আমাদেরই হয়রানির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছেন।

যা দেখছি শুনছি, তা কি স্বপ্ন না সত্যি!

তা স্বপ্ন বলে মনে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

নিজের ঢাউস প্লেটের জোড়া-কাটলেট চেটেপুটে শেষ করে আমাদের এই ঘোর-লাগা অবস্থাতেই ঘনাদা তাঁর প্রথম সম্ভাষণের খেই ধরলেন, "তোমাদের ওই অটো কালেদ না কী নাম, তাকে আর খুঁজে পাওনি তো? আর পাবেও না। আমিও পাইনি।"

"আপনিও পাননি?" আমাদের ধরা গলা থেকে তাঁর কথায় একটু অস্ফুট প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু বার হল না।

"হ্যাঁ," ঘনাদা গলায় একটু যেন করুণা মিশিয়ে বললেন, "বেচারা আজ সকালেই মেলা থেকে সব পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে। তবে আমার কাছ থেকে পালাবে কোথায়? মেলায় না গেলেও যেখানে ধরবার, ঠিক তাকে গিয়ে ধরেছি।"

"আপনি ওই অটো কালেদকে শেষ পর্যন্ত ধরেছেন? কী করে? কোথায় ধরলেন?

তাঁর খোঁজ পেলেন কী করে?"

"খোঁজ পেলাম ওই নামটা থেকেই।" ঘনাদা স্নেহের দৃষ্টিতে আমাদের যেন একটু তিরস্কার করে বললেন, "অমন একটা আজগুবি নাম দেখেই তো লোকটা যে নকল জাল তা বোঝা উচিত ছিল। অটো হল খাস জার্মান নাম, আর কালেদ খাঁটি যুগোশ্লাভ পদবি। নেহাত আহাম্মক ছাড়া ওই দুটো বেজাত শব্দ জুড়ে কেউ নকল নাম বানায়?"

ঘনাদা একটু থেমে জবাবের আশাতেই আমাদের দিকে চাইলেন কি না জানি না, কিন্তু আমাদের চোখগুলো তখন ঘরের মেঝেতেই নেমে গেছে।

ঘনাদা একটু হেসে তারপর আবার শুরু করলেন, "নামটা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। বন্দুকের নিশানাদারি নিয়ে দেমাক আর মেলায় চাঁদমারি খুলে কারবার করার কথা জেনে ছদ্মনামের ধড়িবাজটি যে কে তা আর বুঝতে বাকি রইল না। মেলায় গিয়ে ধরবার আগেই সে হয়তো হাওয়া হবে এ ভয় অবশ্য আমার ছিল, তাই তার পালাবার ফিকির আর রাস্তাটাও আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।"

"আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন? কী করে?" আমাদের ঘোর লাগা অবস্থাটা ক্রমশ তখন আরও সঙ্গিন।

"ও কথা তোমাদের ওই অটো কালেদও জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে তার লুকোনো আস্তানায় গিয়ে ধরবার পরে।" ঘনাদা বলে চললেন, "প্রথমে তো দেখাই করতে চায় না। ডকের পাহারাদার ভেতর থেকে খবর নিয়ে এসে জানালে যে কালেদ সাহেব কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না।

দেখা করতে চান না? বটে? মোক্ষম মন্ত্রটি এবার লাগাতে হল। একটা চিরকুটের ওপর শুধু মন্তরটি লিখে পাহারাদার সেপাইকে বললাম, 'এইটি শুধু সাহেবের কাছে দিয়ে এসো। দেখা যাক, তিনি কী বলেন।'

ব্যস্, চিরকুটে লেখা ওই দুটি শব্দতেই একেবারে যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। পাহারাদার খবর আনবে কী, তোমাদের কালেদ সাহেব নিজেই ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে।"

"এমনই মন্ত্রের গুণ? মন্ত্রটা কী?"

"মন্ত্রটা শুনতে চাও? মন্ত্রটা এমন কিছু নয়, শুধু দুটি শব্দ। পার্দাচিরস মার্মোরেটস।"

"কী বললেন? পর্দা চিরে মারমার ঠাস? ওই হিং-টিং-ছট শব্দের এত গুণ?"

"হ্যাঁ," ঘনাদা মৃদু একটু হাসলেন, "ও দুটো তোমাদের ওই কালেদ সাহেবের কাছে যেন সাপের মন্তর। একবার আওড়ালেই ফণা নামিয়ে সুড়সুড়-করে যেদিকে চাও সেদিকে চলে যাবে। ওই মন্তরটি জানলে তোমরাই ওকে বাঁদর-নাচ নাচাতে পারতে। বন্দুক ছোড়া নিয়ে টিটকিরি দেবার সাহস আর ওর হত না।

কাঁপতে কাঁপতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার পর ওকে অবশ্য ভাল রকম ধাতানিই দিয়েছি। বলেছি, 'তোমার চাঁদমারির নামডাক শুনে হাতের তাক একটু ঝালাতে এসেছিলাম যে হে। দেখতে এসেছিলাম স্কিট, না সোজাসুজি টার্গেট শুটিং-এর ব্যবস্থা করেছ।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে তোমাদের কালেদ বলেছিল, 'না, না, স্কিট কি ট্রাপের ব্যবস্থা কী করে করব? শুধু ওই একটু টার্গেট শুটিং—'

ওই পর্যন্ত শুনেই ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'টার্গেট শুটিং? ভড়কিবাজির আর জায়গা পাওনি? বুল্‌স্ আই-এ লাল বালব দিয়ে টার্গেট শুটিং কোথায় দেখেছ শুনি? আর যত মুখ্‌খু গোলা লোক পেয়ে রাইফেলের ভাঁওতা দিয়েছ? কী রাইফেল তোমার? কত গেজের? বারো, কুড়ি, না আটাশের? উনিশশো তিনের স্প্রিংফিল্ড আরমারি, না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেমি-অটোমেটিক?'

'আজ্ঞে, কেন আর লজ্জা দিচ্ছেন?' করুণ মুখ করে বলেছে তোমাদের কালেদ, 'সবাই সমান মুখ্‌খু জেনে এয়ারগান্‌কেই আসল রাইফেল বলে চালিয়েছি। বন্দুকের বিদ্যে তো আমাদের সকলের ঢু ঢু। বন্দুকের কথা ছেড়ে আমার খোঁজ পেলেন কী করে সেইটে যদি বলেন!' ”

আমাদেরও এই এক কথা। বন্দুকের কুলুজির চেয়ে ঘনাদার খালেদ, থুড়ি কালেদ সন্ধানের রহস্যটাই আগে জানতে চাই। কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি কোন মুখে!

ঘনাদা নিজে থেকেই অবশ্য দয়া করে আমাদের অটো কালেদেরই যেন মিনতি রাখলেন। “বললাম, 'কেমন করে খোঁজ পেলাম? খোঁজ পাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। সকালের খবরের কাগজটা পড়েই তো যা জানবার জেনে গেছি?' ”

“খবরের কাগজ পড়ে!”

এবার সবিস্ময় উক্তিটা অটো কালেদের নয়, আমাদেরই।

“হ্যাঁ”, ঘনাদা করুণাভরে জানালেন, “খবরটা কাগজেই ছিল। কাগজটা কি ভাল করে পড়েছ আজ সকালে?”

“আজ্ঞে, তা তো তন্নতন্ন করেই পড়েছি মনে হচ্ছে,” আমরা বিমূঢ় গলায় নিবেদন করলাম, “কোনও খবর তো কোথাও পাইনি।”

“পাওনি?” ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন, “দেখোনি—বালবোয়া :— এডেন, অ্যাকোয়াবা, সাফানা, লোডিং—১৭ কে পি ডি—রেডি—ক্রোজিং ১২।৩?”

এগুলো কাগজে ছাপা খবর? তার ওপর কালেদের সন্ধানের খেই?

আমাদের হাঁ-করা মুখগুলো এর পর আর কি বোজানো যায়! অবস্থাটা বুঝে ঘনাদা তাই ব্যাখ্যাটা করে দিলেন। “বুঝতে পারছ না বুঝি কিছু? খুব তো খবরের কাগজ পড়ো তন্ন তন্ন করে, ও খবর কোনওদিন দেখোনি? আরে, ওগুলো জাহাজি খবর। শিপিং নিউজ-এ সব চেয়ে খুদে হরফে রোজ পাবে। যা এইমাত্র বললাম তার মানে হল বালবোয়া নামে জাহাজ এডেন অ্যাকোয়াবা ইত্যাদি বন্দরে পাড়ি দেবার জন্য বারো তারিখ মানে আজই রওনা হচ্ছে।”

“এই খবর দেখেই বুঝলেন যে ওই আমাদের খালেদ না কালেদ এইতেই পালাচ্ছে?” আমাদের বিস্ময়যুক্ত সংশয় এবার সরবই হল।

“তা আর বুঝব না?” ঘনাদা আমাদের বুদ্ধির স্থূলতায় বেশ যেন হতাশ হলেন, “তোমাদের অটো কালেদ যা চরিত্র তাতে হট করে প্লেনে পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে ভিসা পাসপোর্টের অনেক ঝামেলা আছে। তা ছাড়া তার নকল চাঁদমারির

লটবহর তো সে ফেলে যেতে পারে না। তাই বালবোয়া গোছের কোনও মাল-জাহাজে যাওয়াই তার পক্ষে সুবিধে। প্লেনে নয়, সে এসেওছিল নিশ্চয় ওই রকম কোনও জাহাজে। কাল হঠাৎ পালাবার তাড়ায় বালবোয়া জাহাজটাই যে সে বেছে নেবে, তা ওই বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝলাম। কাল পর্যন্ত বালবোয়া জাহাজের লোডিং চালু ছিল। আজই সে জাহাজ ছাড়ছে। নিজের লটবহর বোঝাই করে চটপট সরে পড়বার এমন সুযোগ তোমাদের কালেদ ছাড়তে পারবে না বুঝেই ঠিক সময়ে গিয়ে ওই খিদিরপুরের সতেরো নম্বর ডকে তাকে ধরেছিলাম।"

"ধরে তাকে করলেন কী?" আমরা এবার উদ্‌গ্রীব, "পুলিশে দিলেন?"

"পুলিশে! পুলিশে দেব অমন একটা বেচারা মানুষকে?" ঘনাদা আমাদের যেন ধিক্কার দিয়ে বললেন, "এখানে ওখানে তোমাদের মতো মক্কেলদের একটু আধটু ভাঁওতা দিয়ে করে খায়, তাকে পুলিশে দেবার কী আছে? বন্দুকের ব না জেনে বোকার মতো বাহাদুরি করাটা তো আর তার দোষ নয়।"

লজ্জায় আমাদের অধোবদন হওয়াই বোধহয় উচিত, তবু কৌতূহলটা চাপা গেল না। একটু বাধো-বাধো গলাতেই তাই জিজ্ঞাসা করলে শিবু, "কিন্তু ওই যে, আপনার পর্দা চিরে মারমার ঠাস, না কী মন্ত্র—"

"পর্দা চিরে মারমার ঠাস নয়," ঘনাদা প্রায় ধমক দিয়ে শিবুকে থামিয়ে বললেন, "কথাটা হল পার্দাচিরস মার্মোরেটস।"

"তা সে যাই হোক, ওই মন্তর ঝাড়তেই ওই আমাদের খালেদ, থুড়ি কালেদ অমন সুড়সুড়িয়ে এল কেন?" শিবু এবার নাছোড়বান্দা, "একটা কিছু গলদ নিশ্চয় তার মধ্যে আছে। নইলে ও সাপের মন্তরে অত ভয় কেন?"

"ভয় নয়," ঘনাদাকে এবার প্রাঞ্জল হতে হল, "ও মন্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ওই মন্তরের কল্যাণেই একদিন যে প্রাণে বেঁচেছিল সেটুকু তোমাদের ওই কালেদ ভোলেনি।"

"ওই মন্তরের কল্যাণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল?" আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হল। "কী থেকে? সাপের কামড়?"

"না, তার চেয়ে অনেক ভয়ংকর কিছু।" ঘনাদা গম্ভীর হলেন, "দুনিয়ায় যার চেয়ে হিংস্র আর সাংঘাতিক আর কোনও প্রাণী নেই।"

প্রাণীটা কী জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দিয়েই ঘনাদা আবার শুরু করলেন, "ধু ধু এক মরুভূমির মাঝখানে সমুদ্রের বাড়িয়ে ধরা নুলোর মতো এক উপসাগরের ধারে সেদিন ছিপ ফেলে বসে ছিলাম। উপসাগরটা হল গাল্‌ফ অফ আকাবা আর মরুভূমিটা সাইনাই। তখনও উনিশশো সাতষট্টির যুদ্ধের অনেক দেরি। ইসরায়েল তখনও সাইনাই মরুভূমি দখল করেনি, সেটা লোহিত সমুদ্রের ধারে প্রায় বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে।

কিছুদিন আগেই এক আরব দৌ মানে বারদরিয়ার দেশি নৌকোয় সাইনাইয়ের দক্ষিণের রামমহম্মদে নেমে এই মরুর মাঝে একটা আস্তানা করেছি।

আকাবা উপসাগরের জল একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ। পাড়ের এক জায়গায়

বসে নীচের চেতল মার্কা মাছটা যে আমার ছিপের টোপটার কাছে ঘোরাফেরা করছে তা তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মাছটা টোপ গেলার সঙ্গে সঙ্গে টান দেওয়া কিন্তু আর হল না। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে মরুভূমির নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে একটা গুলি আমার ছিপের ডগাটা প্রায় ছুঁয়ে ডান দিকের বালিতে গিয়ে বিঁধেছে টের পেলাম।

গুলি কে ছুড়েছে তা জানতে দেরি হল না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কাছের একটা বালিয়াড়ির পাশ থেকে দুই মূর্তিকে বেরিয়ে আমারই দিকে আসতে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন তোমাদের এই অটো কালেদ, আর অন্যজন লম্বায় চওড়ায় প্রায় দৈত্যের মতো তামাটে রঙের একটি মানুষ।

সেই মানুষটাই যে সর্দার আর তোমাদের কালেদ যে তার শাগরেদ, তা বুঝতে দেরি হয় না। লোকটার চেহারা দুশমনের মতো হলেও ব্যবহারটা খুব হাসিখুশি প্রাণখোলা।

আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসির দমকে মরুভূমি কাঁপিয়ে বললে, 'কী দরবেশ বাবাজি, পেটের পিলে চমকে গেছে নাকি?'

'তা গেছে!' হেসেই বললাম, 'তবে মাছটা যে ফসকাল সেইটেই দুঃখ।'

'ফসকেছে আমারও। আর একটু হলে নাকের ডগাটাই উড়িয়ে দিচ্ছিলাম,' বলে লোকটার আবার সে কী হাসির ধূম।

হাসি থামিয়ে সে কিন্তু খুব উৎসাহের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করলে। বেসিল এস্‌কল বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার নামটা জানবার পর আমার হাত ধরে সে কী আদরের ঝাঁকানি!

তার ঝাঁকানিতে আমায় বারতিনেক বালির ওপর আছড়ে ফেলে তারপর তার যেন হুঁশ হল।

'আরে! তুমি যে বালিতেই শুয়ে আছ,' বলে আমায় হেঁচকা টানে তুলে মিঠে গলাতেই জিজ্ঞাসা করলে, 'তা কী মাছ ধরছিলে?'

'যা ধরছিলাম তা তো তোমার বন্দুকের গুলিতেই ফসকে গেল!' আমি অসাড় ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে যথাসম্ভব মাসাজ করতে করতে বললাম, 'তবে একটা-দুটো মাছ আগেই ধরেছি।'

'তাই নাকি! কী ধরেছ দেখি।' এস্‌কল উদগ্রীব হয়ে উঠতে মাছের থলিটা খুলে তাকে দেখিয়ে বললাম, 'ধরেছি এই দুটো মোজেসের সোল!'

'মোজেসের সোল!' এস্‌কল ভুরু কুঁচকে মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'ও আবার কী নাম!'

'না, অন্য নামও আছে!' তাকে আশ্বস্ত করলাম, 'তবে নামে কী দরকার? মাছ খাবার মতো হলেই হল।'

'খাবার মতো মাছ ধরবার আর কি জায়গা ছিল না!' এস্‌কলের গলায় এবার একটু বাঁকা সুর, 'মরতে এই মরুভূমিতে এসেছ কেন?'

'মরতে তুমিও তো এখানে এসেছ!' একটু হেসে বললাম, 'মরু হলে কী হয়, এখানে মধু আছে নিশ্চয়।'

'আছে নাকি?' এস্‌কলের চেহারা আর গলাটা একসঙ্গে রুক্ষ হয়ে উঠল হঠাৎ, 'তা, তোর মধু তো এই আকাবা খাঁড়ির মাছে। এই পুঁচকের বদলে বড় মাছ ধরলেই পারিস।'

'বড় মাছ আবার এখানে কী?' আমি একটু বোকা সাজলাম।

'বড় মাছ কী, জানিস না?' এবার হিংস্র গলায় বললে এস্‌কল, 'জলের দিকে চেয়েই দেখ না একবার।'

যা দেখবার তা আগেই আমি দেখেছি। যেখানে আমি ছিপ নিয়ে বসেছিলাম, ঠিক তার নীচেই খাঁড়ির কাকচক্ষু জলে এক সঙ্গে তিন-তিনটে সমুদ্রের যমদূত ঘুরছে।

যেন ঠাট্টা ভেবে সরল ভাবে বললাম, 'বাঃ! ওগুলো তো হাঙর, আবার যেমন তেমন নয়, আসল মানুষ-খেকো ট্রাইনোডন ওবেসস্‌!'

'হুঁ', এস্‌কল চিবিয়ে বললে, 'হাঙরদের ঠিকুজি-কুষ্টি জেনে ফেলেছিস দেখছি!'

'তা জানতে হবে না!' আমি যেন তার প্রশংসায় একটু ফুলে উঠে বললাম, 'শুধু কি এখানকার হাঙর, এ বালির রাজ্যের আরও অনেক সুলুকসন্ধানই যে এ ক-দিনে নিয়ে ফেলেছি।'

'নিয়ে ফেলেছিস,' এস্‌কলের চোখ দুটো এবার যেন জ্বলছে মনে হল, 'তাহলে হাঙর ধরাই তো তোর এখন দরকার!'

'কী করে ধরব?' আমি যেন এস্‌কলের কাছেই আর্জি জানালাম, 'এ ছিপে কি হাঙর ধরা যায়?'

'তাহলে জাপটে গিয়ে ধর!' বলে সেই তামাটে দৈত্য আমায় খাঁড়ির পাড় থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে।

ইচ্ছে করলে চক্ষের নিমেষে সরে গিয়ে ওই পাঁচমণি লাশকে নিজের ঠেলাতেই খাঁড়ির তলাতে পাঠাতে পারতুম। কিন্তু তার বদলে এক হাতে আমার মাছের থলে নিয়ে আর এক হাতে এতক্ষণ যে তার ওস্তাদের পাশে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তোমাদের সেই অটো কালেদকে জড়িয়ে টান দিয়ে খাঁড়ির জলে গিয়ে পড়লাম।

হাঙর ক-টা তখনকার মতো সেখান থেকে চলে গেছে। তারা ফেরার আগেই এস্‌কল তার নিজের শাগরেদ তোমাদের ওই কালেদকে তোলবার ব্যবস্থা করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু সেরকম কোনও মতলব তার দেখা গেল না। তোমাদের কালেদের দরকার তার কাছে বোধহয় ফুরিয়েছিল। তাই আমার সঙ্গে আরেকটা আপদ যেন বিদেয় হল এমনই তখন তার মুখের চেহারা। সেই চেহারায় আমায় একটি টিটকিরির সেলাম দিয়ে তাকে চলে যেতে দেখে একবার শুধু তাকে ডেকে ফেরালাম। 'একটা কথা রাখবে, দোস্ত?'

'কী, কী কথা?' সে বিদ্রূপভরে জিজ্ঞাসা করলে।

'এই শেষ একটা উইল করে যাবার ইচ্ছে ছিল। একটু শুনে নেবে?'

হাঙর ক-টা তখন আবার আমাদের দিকেই আসছে। সে দিকে চেয়ে সে হায়নার হাসি হেসে উঠে বললে, 'উইলের অত তাড়া কীসের? কাল আসিস। শুনব।'

তার হুকুম মেনে পরের দিনই এলাম। এস্‌কল তখন একা-একা খাঁড়ির পাড়ে

আমারই মতো ছিপ ফেলে বসে আছে।

হঠাৎ বন্দুকের গুলিতে তার ছিপের সুতোটা গেল ছিঁড়ে। এস্‌কল তো একেবারে ভ্যাবাচাকা। তার একশো গজের মধ্যে কাউকে না দেখতে পেয়ে আরও তাজ্জব। এত দূর থেকে ছিপের সুতো ছেঁড়বার মতো গুলির তাগ কার?"

না, আমাদের কাশি পর্যন্ত এবার শোনা গেল না। ঘনাদা আমাদের ওপর একবার চকিত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন, "যার তাগ, বালিয়াড়ির ধার থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখে যেমন অবাক তেমনই রেগে আগুন হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এস্‌কল বললে, 'তুই—তুই এখনও বেঁচে আছিস?'

'হ্যাঁ, আছি।' কাছে এসে সবিনয়ে বললাম, 'ভূত হয়ে যে নেই তা বোঝাবার জন্য গুলিটা করতে হল। কিন্তু বাতাসে কেমন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ যেন পাচ্ছি, তাই না?'

গন্ধ শুধু নয়, দূরের আগুনের শিখা আর ধোঁয়াটাও এবার দেখা গেল। 'তোমার আস্তানার তাঁবুগুলোই যেন জ্বলছে মনে হচ্ছে এস্‌কল!' আমি সমবেদনার সুরেই বললাম।

এস্‌কল কিন্তু খেপে গেল একেবারে।

'তুই! তুই এ আগুন জ্বালিয়েছিস!' বলে বুনো মোষের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

বালির ওপর তার থোবড়ানো মুখটা একটু ঘুরিয়ে সোজা করে দিয়ে বললাম, 'কিছু মনে করো না, দোস্ত, বাধ্য হয়েই আগুনটা দিতে হল। এখানে হাইজ্যাকিঙের প্লেন নামাবার যে ঘাঁটিটি তুমি তোমার দলের হয়ে পাতছিলে যন্ত্রপাতি সমেত সেটা বরবাদই হয়ে গেল এখন। তোমাদের এই শয়তানি চক্রান্ত ভাঙবার জন্যই এ ক-দিন এই সাইনাই মরুর হাওয়া আমায় খেতে হয়েছে।'

'আমাদের চক্রান্ত ভাঙবি তুই?'

বালিতে চিত হয়ে থাকা অবস্থাতেই এস্‌কল আমায় বেকায়দায় পেড়ে ফেলার জন্য হড়কে যাওয়া কাঁচির জুডোর প্যাঁচ চালাল।

'না,' খাঁড়ির জল থেকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'উইল যদি করতে চাও, আমি শুনতে কিন্তু রাজি। তবে তোমার নিজের নামেই করতে হবে। নাম তো তোমার বেসিল এস্‌কল নয়। বেসিল হল গ্রিক আর এস্‌কল ইহুদি, তুমি যে তা নও, সেটা কাল আমার ধরা মাছের নাম বলার সময়েই বুঝেছি। ইহুদি হলে মোজেসের সোল বললে অমন হাঁ করে থাকতে না। তুমি না-ইহুদি না-আরব, এদের দুপক্ষের ঝগড়ার সুবিধে নিয়ে সাইনাই মরুভূমিতে শুধু নিজের শয়তানি মতলব হাসিল করতে এসেছ। তা এ যাত্রা যদি রক্ষা পাও তাহলে সে চেষ্টা করে দেখো।'

এবার আমার হাতের পুঁটলিটা তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললাম, 'রক্ষা পাবার একটা উপায় তবু করে দিয়ে যাচ্ছি। কাল যে মাছ দেখে নাক সিঁটকেছিলে সেই মাছই ও থলিতে আছে। ওরা গা টিপে দুধের মতো যে রস বেরোয়, তাই একটু করে চারধারের জলে দিয়ো, হাঙরের চোদ্দ পুরুষের কেউ তোমায় ছোঁবে না। হাঙর

খেদানো এ মাছের নামটাও মন্ত্রের মতো মনে রেখো। কাল প্রাণে বাঁচবার পর তোমার শাগরেদও এই মন্ত্র আমার কাছে শিখে তোমার মতো শয়তান সর্দারের সংশ্রব চিরকালের মতো ছেড়ে গেছে। মন্তরটা ধীরে ধীরে বলছি, ও মাছের গা টিপতে টিপতে মুখস্থ করে ফেলো—পার্দাচিরস্ মার্মোরেটস।' "

ঘনাদা তাঁর বিবরণ শেষ করে আমাদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর নিজের টঙের ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, "ও একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম। এ আরাম-কেদারাটা একটু পুরনো হয়ে গেছে। একজিবিশনের মেলায় আজ নতুন একটা অর্ডার দিয়ে এসেছি। ওরা কালই হয়তো পাঠিয়ে দেবে।"

ঘনাদা আর দাঁড়ালেন না।

কালেদের মতো কাঁচা চালাকি চালাতে যাবার খেসারত তখন আমরা মেনে নিয়েছি।

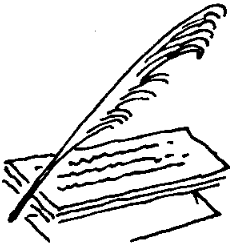

শান্তিপর্বে ঘনাদা

চিলের ছাদে যাবার ন্যাড়া সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই আমরা সবাই থ।

এ কী শুনছি, কী!

না, শোনার ভুল নয়, সত্যিই টঙের ঘর থেকে পয়ার ছন্দে গাঁথা কাব্য-লহরী ভেসে আসছে।

কণ্ঠটা অবশ্য কিঞ্চিৎ রাসভ-বিনিন্দিত, কিন্তু তাতেও তার লালিত্য ঝংকার একেবারে মেরে দিতে পারেনি।

দাঁড়িয়ে পড়ে একটু শুনতেই হয়।

"...মুনি বলে, অবধান করহ রাজন।
হস্তিনা নগর মাঝে ধর্মের নন্দন ॥
মহাধর্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন, তেজে বৈশ্রবণ ॥
সর্বত্র সমানভাবে গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন পূর্বে ছিল রাম ॥

নানা বাদ্য বাজে সদা শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনা নগরবাসী সবাকার সুখ ॥...”

মহাভারত বলে মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ, নির্ঘাত মহাভারত! কাশীরাম দাসেরই সই যেন পাচ্ছি।

হঠাৎ আমাদের এই বাহাত্তর নম্বরের বাতাস পবিত্র করতে এ সব আমদানি কেন!

ব্যাপারটা বুঝতে ছাদ পর্যন্ত গিয়ে আরও শুনতে হয়।

“জাতিবন্ধু কন সবে সতত আনন্দ।
মহারাজ বিদ্যাশীল সকলি স্বচ্ছন্দ ॥
রাজার প্রসাদে রাজ্যে সকলের সুখ।
মৌন হয়ে মহারাজ একা অধোমুখ ॥
নাহি রুচে অন্নজল কান্দিয়া ব্যাকুল।
পাত্র মিত্র ভ্রাতা আদি ভাবিয়া আকুল ॥
নৃপতির শোকে শোকাতুর সর্বজন।
একসঙ্গে ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন ॥
পাত্র-মিত্র-বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে নৃপে করে প্রবোধ অর্পণ ॥
অনেক প্রকারে সবে বুঝায় রাজারে।
যোগমার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে ॥”

এতক্ষণে গুটি গুটি পা ফেলে টঙের ঘরে সবাই পৌঁছে গেছি।

সেখানে যা দেখি সকলেই তাতে ভ্যাবাচাকা।

ঘনাদার এ আবার কী রূপ!

তক্তপোশের ওপর এদিকে ওদিকে ভারী ভারী ডবল থান ইটের মতো সব বই সাজানো। তার মাঝখানে কাঠের বইদানির ওপর প্রায় এক বিঘত চওড়া একটি বই খুলে ঘনাদা সুর করে মহাভারত পড়ছেন!

আমাদের দেখে ঘনাদা একটু ভ্রূকুটিভরে মুখ তুলে চাইলেন।

ভ্রূকুটিটা আমাদের উদ্দেশে ভেবে একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর পরের মন্তব্যে বোঝা গেল ভ্রূকুটির লক্ষ্য ভিন্ন।

“না, নেই! নেই!”—ঘনাদার গলায় রীতিমত তিক্ত বিক্ষোভ—“স্রেফ বাদ দিয়ে দিয়েছে। আর বর্ধমান-কাটোয়ার ইন্দ্রাণী পরগণার সিদ্ধি গ্রামের কমলাকান্তের পো কাশীরামের তো তা জানার ভাগ্যই হয়নি।”

মুখে আমাদের কথা নেই, কিন্তু আমাদের চেহারাগুলোই চারটি হাঁ-করা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

ঘনাদা তাই দেখেই একটু সদয় হন বোধ হয়। বলেন, “কী বলছি, বুঝতে পারছ না নিশ্চয়! বলছি মহাভারতের কথা—আদি ও অকৃত্রিম মহাভারত।”

“আজ্ঞে, কী যেন ‘নেই’ বলছিলেন!” —আমাদের মুখে এই বিস্ময়টুকুই ফোটে।

“হ্যাঁ, দেখছি, নেই!” ঘনাদা একটু বিশদ হন—“কোথাও নেই! কাশীরাম দাস,

সঞ্জয়, শঙ্কর, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বোস, পরাগল খাঁর মহাভারতে তো নয়ই, এমনকি ব্যাসদেবের নামে যা চলছে সেই মূল মহাভারতেও না।"

একটু থেমে আমাদের বোধহয় একটু দম নিতে দিয়ে ঘনাদা আবার একটা অ্যাটমিক টিপ্পনি ছাড়েন—"নেই বটে, তবে ছিল।"

"কোথায়?" ধরা-গলায় প্রশ্ন করি।

"তা বলে দিলেই তো অর্ধেক রহস্য ফাঁস। তবু সেটুকুও বলে দিচ্ছি।"—প্রথমে একটু বাঁকা হাসি হাসলেও ঘনাদা কৃপা করে আমাদের আর অজ্ঞান-তিমিরে রাখেন না—"ছিল শান্তি পর্বে রাজধর্মানুশাসন পর্বাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে।"

যেমন ছিল তেমনই থেকেই যেত। যুদ্ধটুদ্ধ শেষ করে পাণ্ডবরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করতে যাচ্ছেন তখন ঘটা করে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ঢোকবার মুখে যা হয়েছিল তা ঠিকঠিকই বর্ণনা করা থাকত মহাভারতের পাতায়।

"তোমরা বলতে পারো," ঘনাদা আমাদের মনের কথাই যেন আঁচ করে বলেন, "তাই না হয় থাকত! তাতে হতটা কী? ওই জগদ্দল আঠারো পর্বের পুথির পাহাড়ের আশি হাজার শ্লোক ঘেঁটে কে ওই কেচ্ছাটা খুঁজে বার করতে যেত! আর গেলেই পেত নাকি?

দিঘার বালির তীরে দুটো ভাঙা ছুঁচ খোঁজা তো তার চেয়ে সোজা!

তার চেয়ে থাক না যেমন আছে তেমনই আশি হাজার শ্লোকের মধ্যে হারিয়ে। কী দরকার ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে লোকের নজরে পড়বার!

এই বুদ্ধিই দিয়েছিল নকুল সহদেব।

ভীমসেনেরও তা মনে ধরেছিল। তিনি অবশ্য আর-একটা যুক্তিও দিয়েছিলেন। সে যুক্তিটা আরও জোরালো।

'আরে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটুদ্ধ পর্যন্ত শেষ হয়ে আমাদের রাজত্ব পাবার পর মহাভারতে আর পড়বার কি কিছু আছে যে লোকে কষ্ট করে পাতা ওলটাবে?'—বলেছিলেন ভীমসেন—'গণেশঠাকুরের কলম চালিয়ে শুধু আঙুল টনটন-ই সার। ব্যাসদাদুর ওসব বকবকানি শুনতে কারও দায় পড়েছে!'

কিন্তু পুরুতঠাকুরের ঘ্যানঘ্যানানি তাতেও থামেনি।

পুরুতঠাকুর মানে ধৌম্য শর্মা। পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে সেই আদিপর্ব থেকেই আঠার মতো লেগে আছেন।

হাজার হোক সুদিনে দুর্দিনে সমানভাবে যিনি সঙ্গে থেকেছেন তাঁর আবদার-বাহানা একটু রাখতেই হয়।

কিন্তু আবদারটা যে বড় বেয়াড়া।

শান্তিপর্বের অশান্তির ব্যাপারটুকু মহাভারত থেকে বাদ দিতে হবে।

তা না দিলে নাকি সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেশে নীতি ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। রাজার রাজত্ব লাটে উঠবে। দেবতা বামুন কেউ আর মানবে না। ক্রিয়াকর্ম পুজো-আচ্চা সব কিছু যাবে উঠে।

'বলছেন কী, পুরুত মশাই! সভাঘরের দোরগোড়ায় ওই কী-একটু কথা কাটাকাটি, তা মহাভারতে থাকলে একেবারে সৃষ্টি রসাতলে যাবে!'

'তা তো যাবেই'—ধৌম্য শর্মার সেই এক কাঁদুনি-–'আর স্বয়ং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নামটাই ইতিহাসে পুরাণে যে কালিমাখা হয়ে থাকবে।'

'কক্‌খনও না!' জোর গলায় হুঙ্কার দিয়ে একবার প্রতিবাদও করেছিলেন মধ্যম পাণ্ডব, 'বড়দার নামে কেচ্ছা করে কার এত বড় বুকের পাটা দেখি। থেঁতলে ছাতু করে দেব না!'

গলার হুংকারে আর হাতের গদার আস্ফালনের ভয়ে দু-পা পেছিয়ে গেলেও ধৌম্য শর্মা নিজের কোট ছাড়েন না।

কাঁপা গলাতেই বলেন, 'আরে, তুমি গদা হাঁকিয়ে ক-জনকে থামাবে! হস্তিনাপুরে না হয় সবাই ভয়ে মুখ খুলবে না, কিন্তু অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কোশল মদ্র মৎস্যের কানাকানি থামাবে কী করে? আর তাও যদি পারো, তবু এই ত্রেতা থেকে কলি পর্যন্ত তোমার গদা কি পৌঁছবে?'

'তাহলে উপায়?'

'যেমন করে হোক, আশি হাজার থেকে অন্তত এই গণ্ডা দুয়েক শ্লোক সরিয়ে দিতেই হবে।'

'তাই তো!' ভীমসেনকে বেশ ভাবিত হতে হয়, 'কিন্তু শোলোক ক-টায় আসলে কী আছে বুঝিয়ে বলুন তো!'

ধৌম্য বুঝিয়েই বললেন। বৃকোদর বাহাদুরের রদ্দা-খাওয়া নিরেট মাথায় সবটা ঠিক ঢোকে এমন নয়' কিন্তু ঢোকে না বলেই পুরুতঠাকুর মশায়ের কথায় বিশ্বাসটা বাড়ে।

'না, ওই বিষমাখা শোলোক ক-টা মহাভারত থেকে বাদ না দিলেই নয়।'

কিন্তু উপায়টা তার কী?

ব্যাসদাদুকে এ নিয়ে জ্বালাতন করতে গেলে তিনি তো এবার নির্ঘাত শাপমন্যি দিতেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়াই বা যাচ্ছে কোথায়। তিনি তো গোটা মহাভারতটি উগরে দিয়ে তাঁর জন্মস্থান সেই কৃষ্ণ দ্বীপে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করছেন।

গণেশঠাকুরকেও কিছু বলে লাভ নেই। তিনি সেই হিড়িম্বের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারটা কাটছাঁট করা থেকেই পঞ্চপাণ্ডবের ওপর বেশ একটু ব্যাজার হয়ে আছেন। এ নতুন আবদার করতে গেলে পুরনো কেচ্ছাটাই হয়তো আবার ঢুকিয়ে দেবেন।

তাহলে শেষ ভরসা কৃষ্ণের সারথি সেই দারুক।

আরবারের মতো একটা উপায় যদি বাতলে দেয়।

কিন্তু কিছুদিন ধরে দারুকের যে দেখাই নেই। নোলার ঠেলায় ভালমন্দ খাওয়ার লোভে ভীমসেনের ভোজসভাতেও হাজিরা দেয়নি।

সে তাহলে আছে কোথায়? করছে কী?

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য ভীষ্মদেবের মহাপ্রয়াণের পর বাবা-মাকে দেখার জন্য দ্বারকায় গেছেন। কিন্তু দারুক রথ চালিয়ে তাঁকে দ্বারকায় পৌঁছে দিয়েই তো ফিরে এসেছে

হস্তিনাপুরে।

এখানে এসেও তার এমন উধাও হবার মানে কী?

দারুকের খোঁজ করতে করতে হস্তিনাপুর প্রায় চষে ফেলার পর দারুককে পাওয়া গেল, মানেটাও বোঝা গেল তার অন্তর্ধানের।

দারুক কারবারে নেমেছে। দারুণ লাভের কারবার।

কারবারটা কীসের?

তা বোঝা বেশ শক্ত। হস্তিনাপুরের বিপণিকেন্দ্র মানে বড়বাজারে নয়, সেই যাকে বলে মান্ধাতার আমলের রাজা হস্তীর সময়কার এক এঁদো পুরোনো গলির মধ্যে প্যাঁচার কোটরের মতো দারুকের ছোট্ট একটা দোকানঘর।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু মান্ধাতার আমলের রাজা হস্তীটা কে?

কে আবার? পাণ্ডবদের ঠাকুরদার ঠাকুরদা রাজা প্রতীপ, তাঁর সাতপুরুষ আগেকার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কুরু। সেই কুরুর আবার চার পুরুষ আগেকার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হলেন রাজা হস্তী। শহরটা তিনিই পত্তন করেছিলেন বলে তার নাম হস্তিনাপুর।

সেই সাবেকি এঁদো গলির কোটরের মতো একটা কুঠুরিতে কারবার খুললে কী হয়, দারুক তাতেই দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে ঢোল।

কারবারটা হয় কী ভাবে তাও ধরবার উপায় নেই।

সারাক্ষণ বেচাকেনার খদ্দের আসছে যাচ্ছে এমন তো নয়। দিনে কেন, হপ্তায় একবার একজন এলেই কিন্তু কাম ফতে।

যারা আসে তারাও কেমন যেন চোরের মতো আসে লুকিয়ে চুরিয়ে। দিনের চেয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েই বেশি।

এসে দারুকের সঙ্গে কী যেন গুজগুজ ফুসফুস করে। তারপর উত্তরীয়র আড়ালে লেনদেন যা হবার হয়।

লেনদেন যা হয় তা যে মোটা কিছু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে দারুকের অত রবরবা কীসের?

রথ চালাবার বদলে সে নাকি তার নিজেরই চড়বার রথ বানাবার বায়না দিয়েছে। হস্তিনাপুরের খানদানি রাজাগজাদের পাড়ায় বাড়িই কিনে ফেলেছে একটা।

এমন ফলাও কারবারের অমন চোরাগলির ঠিকানা কেন?

সেইটেই বুঝতে পারেননি ভীমসেন। দারুকের এ আস্তানা খুঁজে বার করতে কি কম হয়রানি হয়েছে! পাঁচ-পাঁচটা তাঁর চর পাঁচ দিন হস্তিনাপুর চষে ফেলে তবে ঠিকানা এনে দিয়েছে ভীমসেনকে।

যে সে তো আর এখন নয়। ভীমসেন দস্তুরমতো এখন যুবরাজ। যেমন-তেমন জায়গায় তাঁর যাওয়া কি আর এখন চলে!

তবু গরজ বড় বালাই। দারুককে বারবার ডেকে পাঠিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আসব, আসব বলেও সে এখনও সময় পায়নি আসবার। মধ্যম পাণ্ডবের বাড়ির ভুরিভোজের নেমন্তন্ন সত্ত্বেও।

অগত্যা পুরুতঠাকুর ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে ভীমসেনকেই যেতে হয় পুরনো হস্তিনাপুরের সেই এঁদো গলিতে। একটু ছদ্মবেশেই অবশ্য যান। কিন্তু ওই পাহাড়-প্রমাণ-চেহারা কি ছদ্মবেশে লুকোবার!

সন্ধের পর অন্ধকারে পিঠে পাঁচমণি বস্তা নিয়ে মুটে সেজে গেলেও রাস্তায় কারও না কারও চোখে পড়তেই হয়। আর একবার যার চোখে পড়ে সে আবার মুখ ঘুরিয়ে একটু না দেখে পারে না। হস্তিনাপুরের মতো পালোয়ানদের শহরেও ওরকম একটা চেহারা তো খুব সুলভ নয়!

যাই হোক কোনওমতে তো খুঁজে পেতে সে এঁদো গলিতেই পৌঁছনো যায়, কিন্তু আসল কাজ হাসিল করাই যে দায় হয়ে ওঠে।

এমনিতেই ঠিকানা চিনে গলি দিয়ে আসতে আসতে পুরুতঠাকুরের একবার ভিরমি যাবার অবস্থা হয়েছে।

এ পথ ও পথ ঘুরে দারুকের গলিতে সবে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় আর্তনাদ করে ধৌম্য শর্মা ভীমসেনকেই জড়িয়ে ধরলেন। ভীমসেনকেও তখন অবশ্য ভয়ে না হোক, বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে।

ব্যাপারটা চমকে দেবার মতো ঠিকই। একে আঁকাবাঁকা সরু গলি, তার ওপর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সামনে থেকে এসে পিপের মতো প্রকাণ্ড কী যেন একটা জানোয়ার বিদঘুটে আওয়াজ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'দেখলে! দেখলে বরাহটাকে!' কাঁপতে কাঁপতে বললেন পুরুত-ঠাকুর ধৌম্য, 'হস্তিনাপুরের মতো শহরের মাঝখানে অত বড় বুনো বরা।'

'বরা!' ভীমসেন বেশ একটু ভাবিত হয়ে বললেন, 'এখানে বরা আসবে কোথা থেকে? আর বরা তো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। এটার আওয়াজ কীরকম বিদঘুটে না!'

'তাহলে এ আবার কী জানোয়ার!' ধৌম্যঠাকুরের মুখখানা শুকিয়ে আমসি।

নেহাত প্রাণের দায় মানের দায় না হলে ওইখান থেকে পিটটান দিতেন নিশ্চয়।

কোনওরকমে কাঁপতে কাঁপতে ভীমসেনের বিরাট বপুর আড়ালে শেষ পর্যন্ত ধৌম্যঠাকুর ঠিক ঠিকানায় পৌঁছন।

দোকানঘর তো নয়, অন্ধকার একটা কোটর বললেই হয়। মিটমিটে একটা মোমবাতি জ্বেলে নিচু একটা কাঠের পিঁড়েয় বসে আর একটা চৌকির ওপর খেরো বাঁধানো একটা জাবদা খাতা রেখে দারুক কী যেন সব লিখছে।

হিসেবটিসেবই হবে নিশ্চয়। কিন্তু এই তো দোকানের ছিরি! এক রত্তি মালও কোথাও নেই। তার আবার এত হিসেব কীসের!

যুবরাজ মধ্যম পাণ্ডবকে দেখে দারুক খাতির করতে অবশ্য ভোলে না। কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খাতা লেখার চৌকিটাই তাঁর জন্য এগিয়ে দেয়।

তারপর করজোড়েই বলে, 'আপনি এখানে আসবেন ভাবতেই পারিনি। এ আমার কী সৌভাগ্য, আবার কী লজ্জা! আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি তো এই কালই যাচ্ছিলাম।'

মুখে যতই ধানাইপানাই করুক, আসল কাজের ব্যাপারে দারুক কিন্তু বাগ মানতে

চায় না। ভীমসেনের সঙ্গেও সে বেশ কিছুক্ষণ লেজে খেলে।

ফরমাশটা শুনে প্রথমে তো একেবারে যেন থ।

'আজ্ঞে বলেন কী!'—দারুকের মুখটা যেন ভয়ে সিঁটোনো—'তা কি কখনও সম্ভব?'

'সম্ভব নয় মানে?'—ভীমসেন গরম না হয়ে পারেন না—'আরবারে তুমিই তো বুদ্ধি বাতলে আমার গোলমালটা মিটিয়ে দিয়েছিলে।'

'আজ্ঞে, সে তখন কোনওরকমে দিতে পেরেছিলাম,' দারুক সবিনয়ে বলে, 'কিন্তু সে দিনকাল কি আর আছে!'

'এই তো সেদিনকার কথা!' ভীমসেন যত না গরম তার চেয়ে বেশি অবাক হয়ে বলেন, 'এর মধ্যে দিনকাল আবার কী বদলাল?'

'আজ্ঞে অনেক বদলেছে,' অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানায় দারুক, 'রাজপুরীর মধ্যে সেসব খবর তো আর আপনারা পান না। সেদিন যারা ছিল আঙুল এখন তারা ফুলে কলাগাছ।'

'তা কলাগাছ বটগাছ যে যা খুশি হোক'—আর ধৈর্য থাকে না ভীমসেনের—'আমাদের কাজটা উদ্ধার করে দেওয়ার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? তুমি সেই সেবার যাকে দিয়ে—'

'থাক! থাক!' যেন আঁতকে উঠে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভীমসেনকে থামিয়ে দেয় দারুক, 'নামটা আর করবেন না। কে কোথায় শুনে ফেলে!'

'বেশ, নাম করব না,' যেমন বিরক্ত তেমনই একটু হতভম্ব হয়ে বলেন ভীমসেন, 'কিন্তু কাজটা তো তাকে দিয়ে করিয়ে দিতে পারো!'

'আজ্ঞে, তা পারলে আর আপনাকে আঙুল ফুলে কলাগাছের কথা বলি!' দারুক হতাশ মুখে জানায়, 'সে এখন আমাদের নাগালের বাইরে। আমাকে তো পাত্তাই দেয় না।'

'আহা, পাত্তা যাতে দেয় সেই ব্যবস্থাও করবে!' ভীমসেন এবার একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে বলেন, 'আরবারে যা দিয়ে খুশি করেছিলে এবারে তা না হয় একটু বাড়িয়ে দেবে।'

'একটু বাড়িয়ে দেবেন!' দারুক হতাশার হাসি হাসে, 'যা ছিল তা সে কি আর আছে যে একটুতে তার খাঁই মিটবে?'

'একটু কেন, বেশিই না হয় দেওয়া যাবে!' ধৌম্যঠাকুর নিজেই এবার ব্যাকুল হয়ে ওকালতি শুরু করলেন, 'কাজটা না হলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেশে নীতি-ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। যুবরাজ মধ্যম পাণ্ডব কৃপণ নন। সুতরাং কত নিষ্ক লাগবে তা অকাতরে বলে ফেলো। হাজার, দু-হাজার?'

'আজ্ঞে,' বেশ একটু দ্বিধাভরে দারুক বলে এবার, 'ওসব নিষ্ক-টিষ্কতে কিছু হবে না। নেহাতই যদি রাজি করানো যায় তাহলে যা বললেন তার পক্ষে অন্তত দুটি চিরকেলে গোধূমের ভাণ্ডার চাই!'

'গোধূমের ভাণ্ডার!' ধৌম্যঠাকুর বেশ তাজ্জব হলেও নিজেকে সামলে বলেন,

'বেশ তা-ই না হয় দেওয়া যাবে। না দিয়ে উপায় কী? মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিন যুগের মানুষ উপহাস করবে, পুজো-আচ্চা, ক্রিয়া-কর্ম সব লোপ পেয়ে দেবতা-বামুন-গুরু-পুরুত কেউ আর মানবে না, এমন সর্বনাশ তো আমরা চাই না।'

'তাহলে তো,' ধৌম্য ঠাকুরকে ওইখানেই থামিয়ে দিয়ে দারুক বেশ চিন্তিত মুখে বলে, 'দুটো গোধূম ভাণ্ডারে কুলোবে না। তার সঙ্গে অন্তত পুথি ঠাসা দুটো বিরাট পাঠাগার, আর রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের পাহাড়-প্রমাণ একটি আড়ত না হলে নয়।'

'এই সব না হলে নয়!' এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর আর ধৈর্য না ধরতে পেরে ভীমসেনের মুখের রাশ আলগা হয়ে যায়, 'কাজ করবে ওই তো তোমার পুঁচকে ইঁদুরটা, এত বই কাপড় ফসলের কাঁড়ির ঘুষ নিয়ে সে করবে কী?'

'আজ্ঞে, আপনি যা দেখেছিলেন সেই পুঁচকে তিনি কি আর আছেন!' একটু হেসে বলে দারুক, 'এখন তাঁকে দেখলে ভক্তি ভয় দুইই হবে।'

'তার মানে!' দু চোখ কপালে তুলে বলেন ভীমসেন, 'এ গলিতে ঢুকতে প্রায় যার গুঁতো খেয়ে কাত হচ্ছিলাম বন-বরার মতো সেইটিই গণেশ ঠাকুরের ইঁদুর? ঘুষ খেয়ে খেয়ে—'

'আজ্ঞে, ইঁদুর আর বলবেন না!' ভক্তিভরে বলে দারুক, 'তিনি এখন মূষিক মহারাজ আর আমরা তাঁর সামান্য সেবায়েত।'

এর পর দু-পক্ষের রফা হতে আর দেরি হয় না।

যথা সময়ে শান্তিপর্বের তৃতীয় অধ্যায় ঠিক মতোই সংশোধিত হয়ে যায়।

সংশোধন হয়ে দাঁড়াল কী?

দাঁড়াল এই যে যুধিষ্ঠির অভিষেকের জন্য রাজপুরীতে ঢুকে দেবতা বামুনদের যখন খাতির করছেন তখন শিখা দণ্ড আর জপমালা নিয়ে ভিক্ষুর ছদ্মবেশে দুর্যোধনের চার্বাক নামে এক বন্ধু যুধিষ্ঠিরকে যা নয় তাই গালাগাল করে। বামুনরা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে জ্ঞানচক্ষে চার্বাককে চিনতে পেরে ব্রহ্মতেজেই তাকে **তখন** ভস্ম করে ফেলেন।

যা সংশোধনের জন্যে এত কাণ্ড সেই আসল ব্যাপারটা তাহলে কী ছিল?

ছিল চার্বাক নামে সে যুগের বেয়াড়া এক মানুষের ক-টা শুধু প্রশ্ন।

চার্বাক দুর্যোধনের সখাও নন, ছদ্মবেশেও তিনি আসেননি। বামুন পণ্ডিতদের মধ্যেই তিনি ছিলেন, কিন্তু আর সবাই যখন যুধিষ্ঠিরের দরাজ হাতের দক্ষিণা প্রণামী আদায় করতেই ব্যস্ত, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে শুধু দুটি প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'শোনো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তুমি তো শক্ত শক্ত ধাঁধার খুব চটপট উত্তর দিতে পারো শুনি। অজগররূপী স্বয়ং ধর্মরাজের মাথা-ঘোরানো সব প্রশ্নের চটপট জবাব দিয়ে সকলকে নাকি তাক লাগিয়ে দিয়েছ। এখন সিংহাসনে ওঠার আগে আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও দেখি। জবাব না দিয়ে কিন্তু সিংহাসনে উঠতে পারবে না এই কড়ার।'

'যে আজ্ঞা, ভগবন!' হাত জোড় করে বলেছিলেন যুধিষ্ঠির।

কিন্তু তাতেও ধমক খেয়েছিলেন।

'না, না, ওসব ভগবন-টগবন আমি নই!' বলেছিলেন চার্বাক, তোমার কাছে দক্ষিণা প্রণামীর নামে ভিক্ষে চাইতেও আসিনি। অনেক কাঁদুনিটাঁদুনি গেয়েও শেষ পর্যন্ত তুমিও রাজাগিরিই করতে যাচ্ছ, তাই তোমায় শুধু দুটি কথা জিজ্ঞাসা করছি। বলো, তোমার রাজত্ব কত বড়, আর কারা এখন তার পরম শত্রু?'

এই প্রশ্ন! যুধিষ্ঠির মনে মনে একটু হেসেছিলেন কি না জানা নেই। বামুন পণ্ডিত যারা এসেছিল তারা তো গলা ছেড়েই হেসেছিল চার্বাককে টিটকিরি দিয়ে।

যুধিষ্ঠির অবশ্য নম্রভাবেই জবাবটা দিয়েছিলেন। এই ক-দিন আগেই রাজ্যের মাপজোক নিয়ে নকুল সহদেবের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়েছিল। কুরু পঞ্চাল নিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য দৈর্ঘ্যে কত লক্ষ যোজন আর প্রস্থে কত গড়গড় করে বলে দিতে তাঁর কোনও অসুবিধাই হয়নি।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে শত্রু তাঁর আর কেউ নেই। যারা ছিল তারা সব নিপাত হয়ে গেছে।

'যাও, সিংহাসনের দিকে আর পা না বাড়িয়ে সোজা বেরিয়ে যাও।' গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে বাইরের সিংহদ্বারটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন চার্বাক।

হই হই করে উঠেছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। যুধিষ্ঠির বিমূঢ় বিস্ময়ে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার উত্তর কি ভুল হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভুল।' বলেছিলেন চার্বাক, 'তোমার রাজত্ব কত বড় তা জানো?'

'আজ্ঞে যা জানি তাই তো বললাম।' সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, 'দু-এক যোজন এদিকওদিক অবশ্য হতে পারে।'

'দু-এক যোজনের হিসেবে নয়,' এবার একটু যেন হেসেই বলেছিলেন চার্বাক, 'ভুল একেবারে মূলে। নিজেকে কোনও দিন মেপে দেখেছ? দেখো আর না-দেখো, নিজের ওই সাড়ে তিন হাত দেহখানিই তোমার রাজত্ব। তা-ও নিরঙ্কুশ নয়। আর তোমার এখনকার পরম শত্রু কারা, জানো?'

ভিড় করা সব বামুন পণ্ডিত সভাসদদের দেখিয়ে চার্বাক বলেছিলেন, 'এই সব জলৌকাবৃত্তি, মানে জোঁকমার্কা স্তাবকের দল। যদি বা একটু বুঝেসুঝে রাজত্ব চালাতে পারতে, এরা তোমাদের ঘাড়ে চেপে থেকে নির্জলা তোষামোদে সব সুবুদ্ধির গোড়াতেই ঘুণ ধরিয়ে ছাড়বে। কৌরবরা তোমাদের রাজত্ব নিতে চেয়েছিল, আর এরা তোমাদের মনুষ্যত্বই দেবে ঘুচিয়ে।'

দুটো উত্তরই ভুল দিলেও যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন ছেড়ে চলে আসা হয়নি। সভাসুদ্ধ লোকের রাগ দেখে আর হই চই শুনে চার্বাক নিজেই একটু হেসে রাজপুরী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স

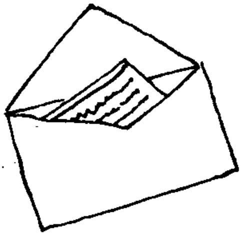

ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স

ঘনাদাদু,

তোমার সাথে আড়ি। তুমি কি সব লেখো, দাদা দিদিরা মজা করে পড়ে। আমায় পড়তে দেয় না। লুকিয়ে পড়ে দেখেছি। ভালো করে বুঝতেই পারিনি। এখন থেকে আমার আর আমার মিনু পুতুলরানীর পড়বার লেখা লিখবে। নইলে আড়ি আড়ি আড়ি।

আমি মানে টুকাই আর আমার পুতুলরানী

হ্যাঁ, ঘনাদার নামে এমন চিঠিও আমাদের এখানে আসে। কেমন করে যে আসে সেইটেই আশ্চর্য। কারণ আঁকাবাঁকা অক্ষরে একটি পোস্টকার্ডে লেখা এ চিঠির ঠিকানা যা দেওয়া ছিল তা এই—

ঘনাদাদু,
৭২ বনমালী লেন
কোলকাতা

বড় পোস্টাফিসের কেউ ঘনাদার নাম দেখে আর নেহাত ছেলেমানুষের হাতের লেখা দেখে মনটা স্নেহে কোমল হওয়ার দরুনই বোধ হয় চিঠিটা ঠিক ঠিকানাতেই পাঠিয়েছে।

টুকাই-এর চেয়ে আর একটু বড় কারওর চিঠিও আসে মাঝে মাঝে। বড় হলেও যুক্তাক্ষরের বেড়া এখনও পার না হওয়া এমন এক পিকলুর—দাদু নয়, ঘনাদাকে লেখা চিঠি—

ঘ না দা,

তুমি ভালো আছো? আমি ভালো আছি। আমার একটা কথা শুনবে? তুমি যা যা সব বলো তা আর একটু সহজ করে লেখা যায় না? তোমার সব কথা যে লেখে সেই বোকা সুধীর না অধীরকে তাই বলো না। আমি আজ তোমাকেও তাই বলছি। এখন থেকে আমার মতো ছোটরা যা বোঝে শুধু সেরকম করে সব বলবে আর লেখাবে। আর কেবল 'এসো পড়ি'—পড়ে-ই তা যেন পড়া যায়। তাতে কোনো দ্বিতীয় ভাগের

জোড়া কথা যেন না থাকে।

আর শোনো। তুমি যেখানে থাকো সে বাড়িতে আর থেকো না। ওই শিশির গোরা শিবুরা তোমায় রোজ রোজ বড় জ্বালাতন করে। তোমায় দিয়ে গল্পো বলাবে বলে ভালো ভালো খাবার আনালে কি হবে, তোমার ভালো লাগা খারাপ লাগার কথা ভাবে না। যখন তখন ওদের আবদার তুমি শুনবে কেন? তার চেয়ে তুমি আমাদের বাড়ি চলে এসো। আমাদের বাড়ির তেতলায় একটা খুব ভালো ঘর আছে। সে ঘরে কেউ থাকে না। তুমি খুব আরামে থাকবে। তুমি যখন যে রকম খাবার চাইবে দামু তোমায় কিনে এনে দেবে। দামু রোজ সকালে আমাকে কে জি টু-তে নিয়ে যায় আবার ছুটি হলে নিয়ে আসে। সে সব ভালো খাবারের দোকান চেনে। দীনু মালির লেংচা, রতন ফেরিওয়ালার আলু-কাবলি আর ফুচকা খেলে তুমি বুঝবে তোমাদের ওই বনমালী লেনের কেউ ওরকম খাবার চোখেও দেখেনি। এসব কেনবার পয়সার কথাও তোমায় ভাবতে হবে না। সব পয়সা আমার বড় দাদু দেবে। বড় দাদু খু-উ-ব ভালো। আমি কিছু চাইলে না করে না। বড় দাদুকে সকালে বিকেলে তুমি ছাদে দেখতে পাবে। তোমাদের ঠিক ভাব হয়ে যাবে, দেখো। বড় দাদুও তোমার নামের সব লেখা পড়ে কিনা? পড়ে মুচকে মুচকে হাসে শুধু। বড় দাদু থাকলে তোমার কথা টুকে রাখারও ভাবনা নেই। ওই তোমার সুধীর যার নাম সে তো ভালো করে তোমার সব কথা বোধ হয় বুঝতেই পারে না। যা লেখে তার চেয়ে অনেক কথা বোধ হয় বাদ-ই পড়ে যায়। বড় দাদু থাকলে সেটি আর হবে না। বড় দাদুর খুব ভালো একটা মজার কল আছে। বানানটা ঠিক লিখতে পারি না বলে মজার কল বললাম। সে কলে তুমি যা বলবে দাদু ঠিক ঠিক তুলে রেখে দেবে। তা ফিরে ফিরতি বাজালে যে কেউ তা থেকে তোমার সব কথা নতুন করে শুনে শুনে লিখে নিতে পারবে।

তাই বলছি তুমি এখনি আমাদের বাড়ি চলে এসো। আমাদের বাড়ির ঠিকানা হল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি তো খুব চালাক! ঠিকানাটা পুরোপুরি তোমায় বলব না। শুধু একটু আধটু ইশারা জানাব। দেখি তা থেকে ঠিকানা বার করে তুমি কেমন আমাদের বাড়ি আসতে পারো।

নদী না খাল?
তাব ওপারে শুরু
লম্বা লাল দেওয়াল।
দেওয়ালের ওখানে কারা?
ওখানে রইল ইশারা।
এখন খুঁজলে বাড়ি
পাবে তাড়াতাড়ি।

ধাঁধার ছড়াটা সব আমি লিখিনি। বড় দাদু লিখে দিয়েছে। এবার দেখি কত তুমি চালাক!

—পিকলু—

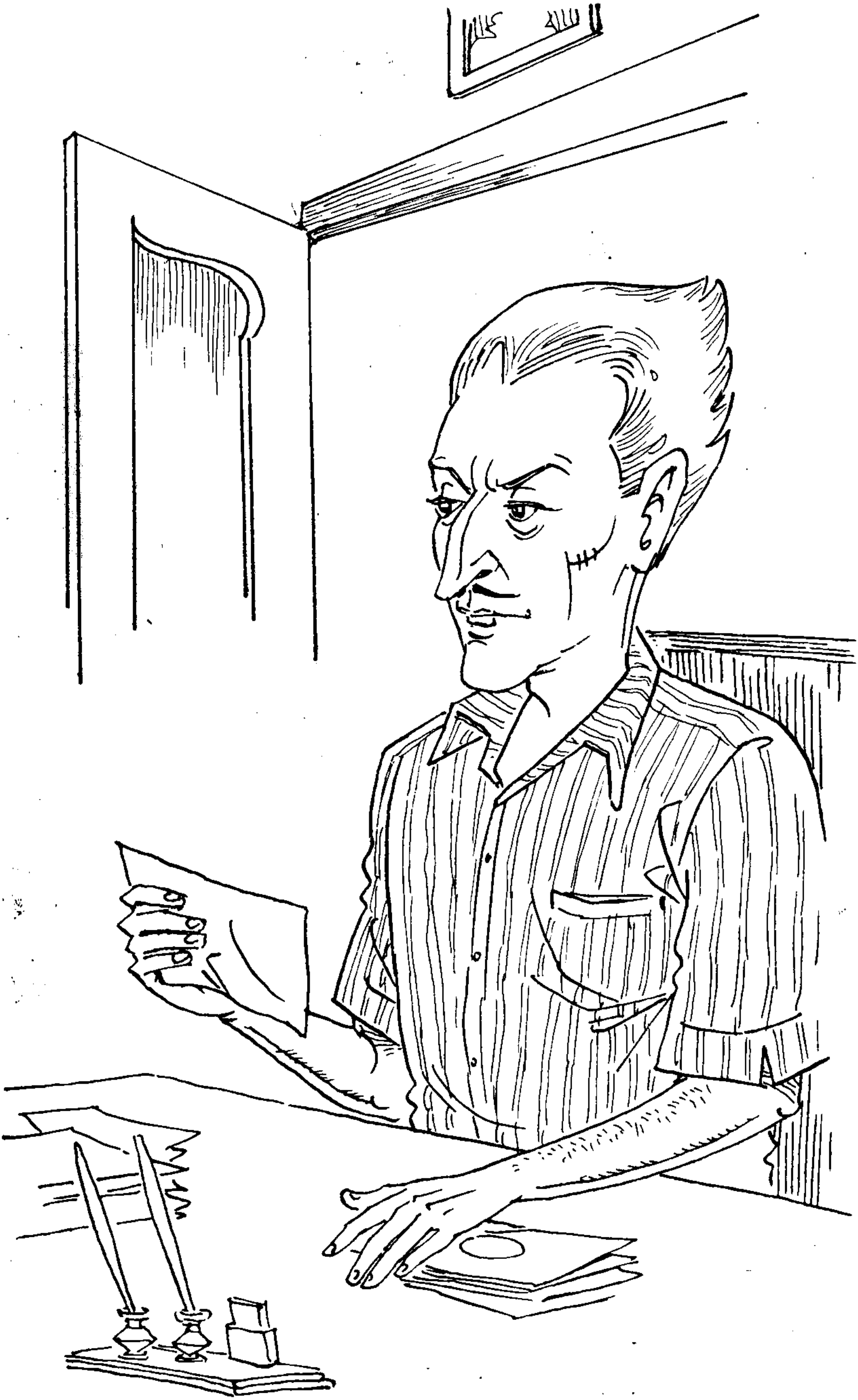

শুধু ধাঁধার ছড়াটাই নয়, পিকলুর চিঠিটাও সাজানো আর লেখার মধ্যে পিকলুর বড় দাদুর বেশ একটু হাত আছে বলে সন্দেহ হয়।

এ তো গেল ছোটদের বা তাদের বলে চালাবার মতো করে লেখা চিঠি।

এ সব ছাড়া অন্যরকম চিঠিও আসে—বেশ চোখ কপালে তোলবার মতো চিঠি।

সেরকম একটি চিঠির ঠিকানা লেখার বুদ্ধিটাই তারিফ করবার। পত্র-লেখক চিঠিটাকে যথাস্থানে পৌঁছনো নিশ্চিত করবার জন্য ওসব বাহাত্তর নম্বর-টম্বরের গোলমালে যাননি। শ্রীঘনশ্যাম দাস বলে ঘনাদার নামটা ওপরে লিখে তারপরে 'প্রযত্নে' ঘনাদার সব লেখার নামী এক প্রকাশকের নাম-ঠিকানা বসিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিটি তারপর ঠিকমতই আমাদের হাতে যে পৌঁছেছে তা বলাই বাহুল্য।

চিঠির ঠিকানা যেমন পড়ে যত মজা পেয়েছি, আসল চিঠিটা পড়ে পেয়েছি তার অনেক বেশি। চিঠিটা পুরোপুরি এখানে তুলেই দিচ্ছি—

শ্রীঘনশ্যাম দাস মাননীয়েষু,

আপনার মেসবাড়ির যে ঠিকানা আপনার গল্পগুলিতে পাই তাহা সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হইতে পারে সন্দেহ করিয়া আপনার এক প্রকাশকের ঠিকানায় এ পত্র পাঠাইতেছি। আশা করি এ পত্র আপনি ঠিক মতোই প্রাপ্ত হইবেন।

বাগ্‌বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে এ চিঠির বক্তব্য জানাইতেছি। আপনাকে প্রতি নিয়ত বহু গল্প বানাইতে হয়। আপনার গল্পের পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে, আপনার উদ্ভাবনী শক্তি তাহাতে ক্রমশ ক্ষীণ হইতে বাধ্য। আপনার মতো লেখকের সাহায্যার্থে 'মৌ-কা-সা-বি-স' বা 'মৌলিক কাহিনী-সার বিপণন সংস্থা' স্থাপিত হইয়াছে। সামান্য ব্যয়ে লেখক-লেখিকাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে মৌলিক কাহিনী-সার এখান হইতে নিয়মিত পাওয়া যায়। গ্রাহক যাঁহারা হন সে সব লেখক-লেখিকার নাম সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বহু খ্যাতিমান লেখক-লেখিকা-ই 'মৌ-কা-সা-বি-স' হইতে তাঁহাদের কাহিনীর সার সংগ্রহ করেন।

আমাদের সংস্থা হইতে কী ধরনের কাজ আশা করিতে পারেন তাহার একটু নমুনা বিনামূল্যে এখানে প্রদত্ত হইল।

ধরুন, জাপানের সমুদ্র উপকূলস্থ কয়েকটি বন্দরে এক মহাসংকট দেখা দিয়াছে। উপকূলস্থ সে সমস্ত বন্দর-নগর মুক্তার চাষের জন্য বিখ্যাত। সমুদ্রের অগভীর তলায় রক্ষিত নির্বাচিত বহু শুক্তির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা প্রজাত করিয়া সেখানে লালন করা হয়। যথা সময়ে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ও বর্ধিত হইলেও এসব মুক্তা সকল দিক দিয়া আসল স্বাভাবিক মুক্তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। এই কৃত্রিম মুক্তার কারবারে কিন্তু দারুণ বিপদ দেখা দিয়াছে। সমুদ্রতল হইতে পরিণত অবস্থায় সংগ্রহ করিবার সময় হইতে না হইতে মুক্তাগুলি কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অনেক পাহারা বসাইয়াও এ মুক্তা বিলোপ বন্ধ করা যাইতেছে না।

এ সমস্যা সমাধানে ঘনশ্যাম দাসের ডাক পড়িল। তিনি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

কেমন করিয়া? মুক্তা-চোরদের হাতেনাতে ধরিয়া।

কাহারা মুক্তা-চোর?

চোর আসলে এক অ্যাকোয়েরিয়াম অর্থাৎ সামুদ্রিক চিড়িয়াখানার মালিক। সে তাহার শিক্ষিত কয়েকটি ডলফিন মানে সাগর-শুশুকদের দিয়া সমুদ্রের তলা থেকে মুক্তাগুলি ঠিক পরিণত হইবার সময় চুরি করিয়া আনে। ডলফিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বৈজ্ঞানিকদের মতে বুদ্ধিতে মানুষের পরেই তাহাদের স্থান। তাহাদের শিক্ষা দেওয়াও খুব কঠিন নয়। সেই অ্যাকোয়েরিয়ামের মালিক এতদিন তাই করিতেছিল। ঘনশ্যাম দাস মানে ঘনাদা-ই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে বিস্তারিত আরও আশ্চর্য সব কাহিনী-সার পাইবেন। ইতি—

মৌ-কা-সা-বি-স

মৌ-কা-সা-বি-স-এর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করবার ইচ্ছা আছে। গৌর এবং আমি এক্ষুনি যোগাযোগটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে চাই। কিন্তু শিশির ও শিবু কিছুদিন অপেক্ষা করাই উচিত মনে করে।

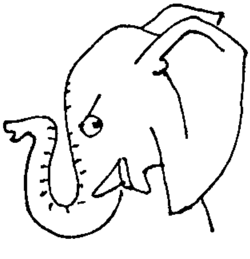

মৌ-কা-সা-বি-স ও ঘনাদা

না, অনুমানে আমাদের ভুল হয়নি।

একটু ধৈর্য ধরে ক-দিন অপেক্ষা করার পরই আমাদের আশা পূর্ণ হল। চিঠির বাকসটা আমিই খুলতে গিয়েছিলাম। বাকস খুলে চিঠি একটাই পেলাম। কিন্তু সেই একটা চিঠির জন্যই আমাদের এ ক-দিনের এমন হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা—

চিঠিটা হাতে পেয়ে খুলে পড়বার আর দরকার হয়নি। ওপরে নামটা যা লেখা আছে সেইটুকুই তখন যথেষ্ট।

সেই নামটুকু দেখে নিয়েই সোজা ওপরে ছুটে গেছি। না, আমাদের আড্ডাঘরে নয়। এই ভরদুপুরবেলা সে জায়গাটা এক রকম নিরাপদ হলেও, সাবধানের-মার-নেই

বলে, সটান গৌর আর শিবুর কামরাতেই বেশ একটু হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে ঢুকেছি। হাঁফানোটা অবশ্য সবটাই সিঁড়ি দিয়ে এক-এক লাফে দুটো করে ধাপ পেরিয়ে আসার জন্য নয়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওটা একটু বাড়তি অভিনয়।

সে অভিনয়টুকুর অবশ্য দরকার ছিল না।

শিবু বাদে গৌর আর শিশির দুজনেই তখন সে ঘরে গৌরের খাটের ওপর বসে দেখা-বিন্তি খেলছে।

আমায় ঢুকতে দেখেই তারা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "এসেছে! এসেছে তাহলে?"

আমার চোখমুখের উত্তেজনা আর বাড়তি হাঁফানিটুকুর জন্য নয়, আমার হাতের লেফাফাটিই তাদের লাফ দিয়ে ওঠানোর পক্ষে যথেষ্ট।

"আরে চুপ! চুপ! টঙের ঘর পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলবে যে!" বলে ওদের থামিয়ে লেফাফাটা এবার সামনের টেবিলে রাখলাম। হ্যাঁ, এ যে আমাদেরই বড় আশার ধন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্রাউন রঙের লম্বাটে অফিসের কাজে যেমন ব্যবহার হয় সেই জাতের খাম। খামটার ওপরে নামঠিকানা টাইপ করার বদলে হাতেই লেখা।

যাঁর উদ্দেশে চিঠিটা পাঠানো হাতে-লেখা তাঁর নামটাই অবশ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। নামটা যে শ্রীঘনশ্যাম দাস তা বোধহয় কারওর বুঝতে এতক্ষণে বাকি নেই।

নামের পরে ঠিকানাটা ছিল এক নামকরা বইয়ের প্রকাশকের দোকানের। ঘনশ্যাম দাস নামটা দেখে সেই দোকান থেকেই সে ঠিকানাটা কেটে এই বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে চিঠিটা রিডাইরেক্ট করে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিটা কোথা থেকে আসছে তাও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, খামের ওপর লেখা 'প্রেরক— মৌ-কা-সা-বি-স' দেখে।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর আগের চিঠিটি ঠিক এইভাবেই এক প্রকাশকের ঠিকানায় এসেছিল। সে প্রকাশক অবশ্য আলাদা। মৌ-কা-সা-বি-স-এর সেই একটি চিঠিই এর আগে আমরা পেয়েছি। কিন্তু সে চিঠি এমন যে, প্রথম আমাদের হাতে পড়বার পর থেকেই এই ক-হপ্তা ধরে আমাদের আর সব চিন্তাভাবনা একরকম ভুলিয়ে দিয়েছে।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর প্রথম চিঠিটার সামান্য বিবরণ যা বেরিয়েছিল যাদের চোখে পড়েনি তাদের জন্য, সংক্ষেপে ব্যাপারটা একটু বলে নেওয়া উচিত মনে হচ্ছে।

মৌ-কা-সা-বি-স যে শব্দগুলির আদ্যক্ষর দিয়ে গাঁথা তা হল 'মৌলিক

কাহিনী-সার বিপণন সংস্থা'। প্রায় মাসখানেক আগে এই সংস্থার যে চিঠিটি এক প্রকাশকের ঠিকানা থেকে আমাদের বাহাত্তর নম্বরের পোস্ট বাকসে এসে পৌঁছয় সেটি ঘনশ্যাম দাসের নামেই পাঠানো হয়েছিল।

ঘনশ্যাম দাসের নাম থাকা সত্ত্বেও সে চিঠি যে আমরা খুলে পড়েছিলাম তার সোজা কারণটা এই বলা যেতে পারে যে চিঠিটায় ঘনশ্যাম দাসের নাম থাকলেও সেটা সোজাসুজি তাঁর বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানায় না পাঠিয়ে কোনও এক প্রকাশকের মারফত পাঠানো।

এরকমভাবে যে বা যারা চিঠি পাঠিয়েছে তারা ঘনাদার জানাশোনা কেউ যে নয় তা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ঘনাদার চিঠি অমন বেপরোয়া খোলার সাহস করার আসল কারণ কিন্তু আলাদা। সে কারণ হল এই যে, ঘনাদার ভাবগতিক যা দেখছি তাতে তিনি তাঁর নামের চিঠি আসাটা যেন পছন্দ করেন না মনে হয়। অপছন্দ করার চেয়ে ভয় করেন বললে যেন তাঁর ধরন-ধারণটা ভাল করে বোঝানো যায়।

শিবুর একটা চিঠির ব্যাপার থেকেই কথাটা আমাদের প্রথম মনে হয়। শিবু সেবার কিছুদিনের জন্য তার এক মামার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল। চিঠিপত্তর লেখা শিবুর বড় একটা ধাতে আসে না। কিন্তু সেবার ঘনাদাকে একটু উপরি খাতির দেখাবার জন্য সে তাঁর নামেই একটা চিঠি পাঠিয়েছিল আমাদের এই বাহাত্তর নম্বরে। ঠিকানায় হাতের লেখাটা শিবুর বলে বুঝে আগ্রার পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেও চিঠিটা আমরা খুলিনি। উৎসাহভরে সেটা ঘনাদার কাছেই পৌঁছে দিতে তাঁর টঙের ঘরে হাজির হয়েছি।

কিন্তু তাঁর নামে চিঠি আছে শুনে খুশি হবার বদলে তিনি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সে অস্থিরতাটা বিরক্তির মেজাজ দেখিয়েই ঢাকা দেবার চেষ্টায় তিনি রুক্ষ গলায় বলেছিলেন, 'চিঠি! আমার নামে চিঠি কোথা থেকে আসবে?' কথাগুলো এমনভাবে তিনি বলেছিলেন যেন তাঁর নামে চিঠি আসাটা সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের হুঁশিয়ারির গাফিলতি। চিঠিটা তারপর তিনি আর নিতেই চাননি। চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরাও বুঝেছি যে কচিৎ কদাচিৎ নেহাত নিজের বিশেষ দরকারে নিজে থেকে দুনিয়ার দু-একজন হেনতেন-র ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসা স্বীকার করলেও তিনি তাঁর ছদ্মনামের অজ্ঞাতবাসে সাধারণ চিঠিপত্রে যোগাযোগের মানুষ নন।

তাঁর নামের চিঠি এলে বিনা দ্বিধাতেই তাই আমরা খুলি। মৌ-কা-সা-বি-স-এর প্রথম চিঠি সেইভাবেই খুলে কিন্তু বেশ একটু মজা পেয়েছিলাম। সে প্রথম চিঠিতে লেখকদের নতুন গল্পের খেই জোগানোই যে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ব্যবসা তা জানিয়ে ঘনাদাকে তাঁর গল্পের পুঁজি বাড়িয়ে সাহায্য করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যোগাযোগ করবার একটা উপায় সে চিঠিতে দেওয়া থাকলেও আমরা মজার ব্যাপারটা আরও গড়াতে দেবার জন্য সে চিঠির উত্তর কিছুদিন দিইনি। এরপরে আবার মৌ-কা-সা-বি-স-এর চিঠি পাবই ভেবে নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম ধৈর্য ধরে।

আমাদের অপেক্ষা করা বিফল হয়নি।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে নতুন করে উৎসাহিত হবার খোরাকও পেলাম।

প্রথম চিঠিতে কী রকম গল্পের তারা জোগান দিতে পারে তার একটু নমুনা দেওয়া ছিল। এবারের চিঠিতে নমুনা-টমুনা দেওয়ার বদলে প্রথম থেকেই যেন আক্রমণ শুরু।

ঘনশ্যাম দাস আর নয়, সোজাসুজি ঘনাদা বলে সম্বোধন করে লেখা—

কী ঘনাদা, আমাদের চিঠি পেয়ে ভড়কে গেলেন নাকি! একবার একটা চিঠি দিয়ে একটু পরখ করে দেখবারও সাহস হল না? শুনুন, শুনুন, আগে থেকেই ভরসা দিয়ে রাখছি, আমাদের আগে থাকতে কিছু দিতে হবে না। আগে দুচারবার কারবার করে দেখুন। তাতে সন্তুষ্ট হলে তখন যা মর্জি হয় দেবেন। আমাদেরও অবশ্য একটা শর্ত আছে।

কাউকে খদ্দের করবার আগে আমরা তাঁকে একটু যাচাই করে নিই। অনেককাল ধরে অনেক সরেস নিরেস গল্পের ছক প্যাঁচালেন। ঘিলুটা তাতে ঘোলাটে হয়ে গেছে কি না একটু পরখ করে নিতে চাই। বেশি কিছু নয়, সামান্য দু-চারটে প্রশ্ন। জবাবগুলো চটপট দিতে পারেন কি না দেখুন। না পারলে জবাবগুলো অবশ্য চিঠিটার ভেতরের পাতাতেই উলটো করে লেখা পাবেন। এমনিতে কথাগুলো যেন আবোলতাবোল, কিন্তু আয়নার সামনে ধরলেই সেখানে সোজা অক্ষরগুলোর সঠিক কথাটা পেয়ে যাবেন। এই যেমন আপনি লেখায় পেলেন,

'ইনে নেখাসে উকে'

কিছু মাথামুণ্ডু নেই মনে হচ্ছে তো? এখন আয়নার সামনে ধরলেই কথাগুলো আর আবোলতাবোল থাকবে না। উত্তরটা অমন করে দেখবার আপনার দরকার হবে না বলেই আশা করছি। এখন ভাবুন:

১। খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে যে পাহাড়ের চূড়ার তুষার গলে না।

২। একশো বছরেরও আগে মিশরের কায়রো শহরে, নানা গরিবানি কাফিখানায় ঘুরে ঘুরে হাজার এক আরব্য রজনীর অপরূপ সব কিস্‌সা তিনি নতুন করে উদ্ধার করেছিলেন। আর সে কীর্তির আগে ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন এক সেনাপতি। সিপাহি বিদ্রোহের বছর ১৮৫৭-তে তিনি ছিলেন কোথায়? আর তার পরের বছর কোথায় কী এমন আবিষ্কার করেছিলেন, যা তুলনাহীন? তাঁর আবিষ্কারের সঙ্গে উজিজি শব্দটা উচ্চারণ করলে পুরনো কোনও ইতিহাসের স্মৃতি ঝলকে ওঠে কি?

৩। উনিশশো চোদ্দ ছাড়িয়ে প্রায় আঠারো পর্যন্ত জার্মান রপ্ত করে আবার তা ভুলে ইংরেজি শিখতে হয়েছিল কোথায়, কাদের?

৪। একসঙ্গে জিরাফ, উটপাখি আর শিম্পাজি খুঁজতে যাব কোথায়?

এ সব প্রশ্নের জবাব মনে মনে দিয়ে ঠিক হয়েছে না বেঠিক হয়েছে, পেছনের

পাতা উলটে দেখে নিন। চারটের মধ্যে তিনটেও যদি ঠিক হয়ে থাকে যে কোনও বড় কাগজের ব্যক্তিগত কলমে এক লাইনে 'প্রস্তুত' বলে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাহলেই আপনার যা এরপর করবার মৌ-কা-সা-বি-স-এর নির্দেশের সেই পরের কিস্তি পেয়ে যাবেন। জিরাফ আর উটপাখি ছোটা তেপান্তরে সোনালি সুমুদ্দুরের মতো বোথা আর স্মাটসদের সোনালি গমের খামার কীভাবে ছড়াচ্ছে তার রহস্য জানাব।

এ চিঠি আদ্যোপান্ত বার-কয়েক পড়বার পর রীতিমত ভাবনাতেই পড়লাম আমরা তিনজন। শিবু তখনও আসেনি। কিন্তু সে এলেও বিশেষ বুদ্ধি বাতলাতে পারত বলে মনে হয় না।

এ চিঠি নিয়ে এখন কী করা যাবে সেইটাই হল সমস্যা। ঘনাদাকে এ চিঠি এখন দিতে যাওয়া যায় না!

"যে-কোনও চিঠি সম্বন্ধে তাঁর পাকা এলার্জি তো আছেই, তার ওপর প্রথম চিঠিটা বেমালুম চেপে গিয়ে দ্বিতীয় চিঠিটা দিতে যাওয়ার কৈফিয়তটা হবে কী?"

"তা হলে এ চিঠিটাও কি বেমালুম হজম করে ফেলব?"

"কিছুতেই না।" জোরালো প্রতিবাদটা কিছুক্ষণ আগে ঢোকা শিবুর। নিজের মতটাকে জোরালো যুক্তির গাঁথুনি দিয়ে সে বললে, "ঘনাদাকে মাপবার এমন একটা মওকা হেলায় হারালে আফশোসের সীমা থাকবে না যে!"

"কিন্তু ঘনাদার হাতে এ চিঠি তুলে দেব কী বলে?" আমাদের ভাবনা।

"তাঁর হাতে তুলে দেব কেন?" শিবুর ব্যাখ্যা—"ও চিঠি নিজেদের কাছেই রেখে এসব প্রশ্নের ধাঁধা তাঁর নাকের সামনে যেন অজান্তে ঘোরাব।"

"কীভাবে?" আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

"কীভাবে তা আমিই কি জানি!" শিবু অকপটে স্বীকার করে জানালে, "কিন্তু সময় মতো কি ঠিকঠাক বুদ্ধিগুলো জোগাবে না! দেখাই যাক না।"

তা মোটমাট আমরা খেলাটা খুব মন্দ খেলিনি। কাঁচা চাল দু একটা দিয়ে ফেলিনি এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি বানচাল হওয়া থেকে নৌকোটা বাঁচিয়েছি।

টঙের ঘরে অভিযানে যাবার আগে অবশ্য রসদের কথা ভুলিনি। আমরা প্রথম তিনজন একটু আগে পরে করে যেন নেহাত আড্ডা দেবার জন্যই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে এসে বসবার পর শিবু একটু ব্যস্তভাবেই ঘরে ঢুকেছে। ঢুকেছে সে একলা নয়, সঙ্গে তার বনোয়ারি আর বনোয়ারির এক হাতে ঢাউস টিফিন কেরিয়ার আর অন্য হাতে বড় ঝোলার মধ্যে ডিশ, প্লেট, বাটি, ইত্যাদি তৈজসপত্র।

দিগ্বিজয়ীর হাসি হেসে ঘনাদার দিকে চেয়ে বলেছে, "না, লোভ সামলাতে আর পারলাম না, ঘনাদা। নিয়েই এলাম এই নতুন অপূর্ব জিনিস।"

"নতুন অপূর্ব জিনিস!" আমরা সন্দিগ্ধভাবে শিবুর দিকে তাকিয়ে বলেছি, "নতুন জিনিস মানে খাবার! এই শহরে পাওয়া যায় অথচ বাহাত্তর নম্বরের অজানা এমন কোনও নতুন খাবার আছে নাকি?"

আমরা থামতেই গৌর খেই ধরে বলেছে, "দেশি বিদেশি চীনে জাপানি ইরানি তুরানি কাশ্মরী না তামিল—"

"থাম থাম!" কথার মাঝখানে গৌরকে থামিয়ে দিয়ে শিবু বলেছে, "আজগুবি বিদেশ বিভুঁইয়ের নয়, এই আমাদের দেশেরই জিনিস, কিন্তু খাসনি কখনও, নামও শুনেছিস কিনা সন্দেহ। শুনেছিস কখনও উত্তাপাম নামটা?"

শিবু যতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছে তার মধ্যে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সর্বপ্রথম ঘনাদার সামনে বনোয়ারি প্লেট, ডিশ সাজিয়ে তার মধ্যে একটা গোলাকার মোটা পরোটার মতো খাদ্য বার করে দিয়ে সঙ্গের ছোট বড় পাত্রগুলোও নাতিতরল বস্তুতে পূর্ণ করে দিয়েছে।

সেইদিকে তাকিয়ে আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে শিবু এবার বলেছে, "এ আহার্য দেখবার ও চাখবার সৌভাগ্য কি কখনও হয়েছে? অথচ এ আমাদের দক্ষিণ ভারতের জিনিস, নাম উত্তাপাম। সঙ্গে ছোট ছোট পাত্রে যা পরিবেশিত হয়েছে সেই নারিকেল মণ্ড চাটনি আর অন্য পাত্রের সম্বর ডালের সঙ্গে সেব্য।"

শিবুর বক্তৃতা শেষ হবার আগেই বনোয়ারি সুনিপুণ হাতে আমাদের সকলের সামনেই প্লেটে বাটি বসিয়ে তাতে অভিনব উত্তাপাম সাজিয়ে দিয়েছে।

ঘনাদার মুখে কোনও মন্তব্য এখনও না শোনা গেলেও শিবুর অভিনব আমদানির দু-চার টুকরো যথাযোগ্য অনুপান সহকারে মুখে তুলতে তিনি ত্রুটি করেননি। তাঁর মুখে অতিরিক্ত আহ্লাদ কিছু ফুটে না উঠলেও বিকৃতিও দেখা যায়নি কিছু।

এর মধ্যে শিশির খেলার প্রথম চাল চেলে বলেছে, "তা নেহাত অখাদ্য কিছু অবশ্যই নয়, কিন্তু—"

"কিন্তুটা কী?" শিবু গরম হয়ে উঠেছে—"এই উত্তাপাম, এর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় পাচ্ছ শুনি?"

খেই পেয়ে গিয়ে আমি এবার একটু মেজাজি গলায় বলেছি, "কিন্তু একটু আছে বইকী! নামটা যেমন হোক, জিনিসটি ওই দোসার রকমফের নয় কি!"

"দোসার রকমফের এই উত্তাপাম?" শিবু যেন চরম অপমানে তোতলা হয়ে গিয়ে বলেছে, "তো-তোমাদের কী করতে হয়, জানো? ইকোয়েটর-এর লাগাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াস-এর মরা জাতভাইয়ের মাথায় বরফের চূড়ায় তুলে দিতে হয়। তখনও হয়তো তোমরা বলবে, এর আর নতুন কী?"

"দাঁড়াও! দাঁড়াও!" আমরা যেন দিশাহারা হয়ে বললাম, "আমাদের না তোমার কার মাথার ঘিলুটা নড়ে গেছে, আগে বুঝি! কী বললে তুমি? ইকোয়েটর-এর লাগাও মানে বিষুবরেখার কাছাকাছি খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াস-এর মানে সেই বিখ্যাত ভলক্যানো-র মরা জাতভাইয়ের বরফ ঢাকা চূড়ায়—"

এই পর্যন্ত বলেই আমরা হাসতে শুরু করলাম, শিবুকে যেন তেলেবেগুনে জ্বালিয়ে।

"হাসছ! তোমরা হাসছ!" শিবু আমাদের দিকে তখন এমন হিংস্রভাবে চাইলে

যেন আমাদের বিকশিত দন্তপাটিগুলো গুঁড়ো না করে তার তৃপ্তি নেই।

"হ্যাঁ, হাসছি!" আমরা নির্বিকারভাবে ঘনাদাকেই সালিশি মেনে বললাম, "ঘনাদাই বলুন না, এরকম প্রলাপ শুনে না হেসে পারা যায়।"

ঘনাদা তখন তাঁর তৃতীয় উত্তাপামটি শেষ করার পর বনোয়ারির টিফিন ক্যারিয়ারের অন্য একটি পাত্র থেকে বড় চামচে বার করে দেওয়া সুগন্ধে ভুরভুর ছানার পোলাও সবে একটু চাখতে শুরু করেছেন।

আমাদের জিজ্ঞাসায় তাঁর মুখে সামান্য যে একটু হাসির আভাস দেখা গেল, সেটা করুণার, না ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের দায় এড়ানো চতুরতার, তা বোঝা শক্ত বলে তাঁকে আবার একটু উসকে দেবার চেষ্টায় বলতে হল, "কী বলল শুনলেন তো! বিষুবরেখার কোথাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াস-এর মরা জাতভাইয়ের—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই বলছি," শিবুই কথাটা যেন আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে গড়গড় করে বলে গেল, "তুষার ঢাকা চূড়োয়—এই তোমাদের আজগুবি মনে হচ্ছে? তা হলে যদি জিজ্ঞাসা করি, সিপাই যুদ্ধের পরের বছরে যিনি আরকী আশ্চর্য অজানা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, তার আগের বছরে তিনি কোথায় ছিলেন? এর পর সেই আশ্চর্য মানুষটি মিশরের কায়রো শহরের কফিখানায় ঘুরে ঘুরে আরব্য উপন্যাসের হাজার রজনীর উপাখ্যান নতুন করে উদ্ধার করেন।"

"থামো, থামো!" আমরা নিজেদের মাথাগুলো দুধারে চেপে ধরে বললাম, "মাথায় একেবারে চরকিপাক লেগে গেছে।"

"তাহলে আরও একটু লাগাই!" বলে শিবু যেন মজা পেয়ে বলে গেল, "এই সঙ্গে যদি উজিজি শব্দটা উচ্চারণ করি তাতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় কি?"

আমি যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার ভান করে রীতিমত বিরক্তির সঙ্গে বললাম, "শোনো শোনো, অত যদি আবোলতাবোল বকবার শখ থাকে তো নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দরজা বন্ধ করে মনের সুখে যা খুশি বলোগে যাও। আমাদের এমন জ্বালাতন করবার অধিকার—"

"অধিকার আমার নেই বলছ? কিন্তু এত জ্বালাতন না হয়ে তোমাদের নিরেট মাথাগুলো একটু নাড়া দিয়ে সচল করার চেষ্টাও তো হতে পারে। তাই বলছি উনিশশো চৌদ্দ থেকে প্রায় আঠারো পর্যন্ত জার্মান শিখতে শিখতে কাদের আবার ইংরেজি শিখতে হয়েছিল। আর জিরাফ, উটপাখি আর শিম্পাঞ্জি যেখানে পাওয়া যায় সেখানে উটপাখি ছোটা তেপান্তরে অঢেল মিঠে জলের মদত পেয়ে বোথা আর স্মাটসদের সোনালি পাকা গমের সব খামার ছাড়াতে ছাড়াতে কালামাটি ধলা করবে আর কতদূর?"

"ভুল! ভুল!!"

সত্যিই আমরা চমকে উঠেছি সবাই। মায় শিবু পর্যন্ত। কথাগুলো জোরালো গলায় প্রতিবাদ নয়। একটু কৌতুক মেশানো টিপ্পনির মতো। কিন্তু গলাটা স্বয়ং ঘনাদার।

তাঁর দিকে ফিরে দেখি প্লেট সাফ করে বনোয়ারির পরিবেশনের মর্যাদা রেখে তিনি রামভুজের আনা স্পেশ্যাল চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু হাসছেন।

প্রথমটা একটু ধাঁধার মধ্যে পড়লেও গৌরই প্রথম গলায় উপরি উৎসাহ ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ভুল তো? শিবু যা বলেছে সবই গুল, মানে ভুল—"

"না, সব নয়।" ওই ঘনাদা তাঁর বাড়িয়ে ধরা ডান তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে গুঁজে দেওয়া শিশিরের সিগারেটটা মুখের কাছে এনে শিশিরের লাইটারের অপেক্ষাতে কথাটা অসমাপ্ত রাখলেন। তারপর শিশির সিগারেটটা ধরিয়ে দেবার পর দুটি সুখটান দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "প্রথমে যা সব বলেছে তার কোনওটাই ফালতু বুকনি নয়।"

"ফালতু বুকনি নয়!" আমাদের এবার আর অবাক হবার ভান করতে হল না। "ওই যে, কী বলছিল, ভিসুভিয়াসের মরা খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে তুষার চূড়ায় পাহাড়—"

"হ্যাঁ, ও সবই সঠিক বর্ণনা," ঘনাদা সস্নেহে আমাদের অজ্ঞতা যেন ক্ষমা করে বললেন, "শিবু যা যা বললে, সবই পৃথিবীর একটি বিশেষ জায়গার নানা রকমারি বিবরণ। বিষুবরেখার লাগাও খাঁ খাঁ রোদের রাজ্যে ভিসুভিয়াস-এর মরা জাতভাই এক তুষার চূড়ার পাহাড় সত্যিই আছে। আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু সে পাহাড়ের নাম কিলিমানজারো। বহু বছরকাল আগে ও-পাহাড়টা সত্যিই ছিল এক আগ্নেয়গিরি। তারপর সে আগ্নেয়গিরি কবে থেকে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ওই কিলিমানজারোর কাছেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ। সাইবিরিয়ার এক বৈকাল হ্রদ ছাড়া যার চেয়ে গভীর হ্রদও দুনিয়ায় নেই।

ভারতবর্ষের সিপাই বিদ্রোহ হয় ১৮৫৭তে। ঠিক তার কিছু আগে এই ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে নীল নদের উৎস আবিষ্কারের আশায় দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। নীল নদের উৎস তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের পরের বছর ১৮৫৮ সালে সে আবিষ্কারের পথে নীল নদের উৎস রহস্যের কয়েকটি অমূল্য সমাধান সূত্রের সন্ধান পান। এগুলির প্রধান হল ওই কিলিমানজারো পাহাড়ের রাজ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ টাঙ্গানাইকা আবিষ্কার।"

উৎসাহভরে শিবু এবার একটু মাতব্বরি মন্তব্যের লোভ ছাড়তে পারেনি। "যা থেকে ও দেশটার নামও টাঙ্গানাইকা।"

"না," ঘনাদা তাকে দমিয়ে দিয়ে বলেছেন, "এখন ওই অঞ্চলের নাম হয়েছে টানজানিয়া। সে যাই হোক টাঙ্গানাইকা হ্রদ যিনি স্পিক নামে আরেক বন্ধুর সঙ্গে আবিষ্কার করেন তাঁর কথাই বলি। নাম তাঁর রিচার্ড বার্টন। নানা গুণে গুণী। একাধারে পণ্ডিত বিদ্বান তার ওপর অস্থির ছটফটে দুঃসাহসী ভবঘুরে মানুষ। সিপাই বিদ্রোহের আগেই ভারত থেকে এক বন্ধু জন স্পিককে নিয়ে নীলনদের উৎস সন্ধানে আফ্রিকায় চলে আসেন। তাঁর সেই অভিযানে টাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার করলেও এ সন্ধান ছেড়ে তিনি আরেক নেশায় মাতেন। তা হল সহস্রাধিক আরব্য রজনীর যে সব আশ্চর্য অপরূপ মুখে-মুখে বলা কাহিনী তখন আরবি ভাষার জগতে নেহাত সাধারণ সরাই আর কফিখানার আড্ডাবাজ খদ্দেরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল সেগুলি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা।

এ কাজের জন্যই তিনি সমস্ত সাহিত্যরসিক দুনিয়ার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। স্যার উপাধিও তিনি এজন্য পেয়েছিলেন।

একটু থেমে আমাদের কিঞ্চিৎ হতভম্ব মুখগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘনাদা তারপরে বলেছেন, "উজিজি আসলে একটা গ্রামের নাম। ওই টাঙ্গানাইকা হ্রদেরই ধারে। আগে গ্রাম ছিল, এখন শহর হয়েছে। রিচার্ড বার্টন আরবদের ক্রীতদাস জোগাড় আর চালানের এ ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। এবং এর পরে বিখ্যাত আফ্রিকা-পর্যটক লিভিংস্টোনকে আরেক আফ্রিকা-পর্যটক স্ট্যানলি ওখানে অসুস্থ অবস্থায় খুঁজে পান।

আগেকার চালু জার্মান ভাষা ছেড়ে ইংরেজি ধরার দায় এই অঞ্চলের বান্টু জাতেদের ওপরই পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও অঞ্চলটা ছিল জার্মানদের অধীনে। জার্মানরা প্রথম যুদ্ধে হেরে যাবার পর অঞ্চলটার আসল অধিকার ইংরেজদের হাতে আসে। শিবু এ পর্যন্ত যা বলেছে তা মোটামুটি ঠিক হলেও ওই শেষের কথাটাই একেবারে ভুল। ও যাদের সোনালি গমের খামার দেখতে দেখতে উটপাখি আর জিরাফ ছোটা তেপান্তরে টাঙ্গানাইকার মিষ্টি জলের অঢেল সেচে ক্রমশ ছড়িয়ে যাবার কথা বলেছে সেই বোথা আর স্মাটসরা আসলে কালা-ধলার আসমান-জমিন ফারাক বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র বংশের লোক। জার্মানদের প্রতাপের সময় তাদের একই মেজাজ মতলবের সুযোগ নিয়ে সেই বর্ণবিদ্বেষী বুয়রদের কিছু কিছু দল ওই সোনালি মাটির দেশে খামার পত্তন করতে শুরু করে। তাদের মতলব ছিল ধীরে ধীরে এ রাজ্যটাও হাতের মুঠোয় নিয়ে এখানে তাদের নিজেদের দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কালা-ধলার ভেদের রাজ্য সৃষ্টি করে।

তারা এখানে এসে নিজেদের মতলব হাসিল করতে প্রথমে সরল কাফ্রিদের অবজ্ঞা আর কুসংস্কারের সুযোগ নেবার জন্য মোটারকম নানা ঘুষ দিয়ে ধড়িবাজ সব ওঝাদের হাত করে। এই ভূতের ওঝা বা উইচ ডক্টরদের সাহায্যে এ অঞ্চলের সরল বান্টুদের তারা ক্রমশ গোলাম বানিয়েই ছাড়ত। কিন্তু তা আর হল কই! একের পর এক তাদের খামারের সব গমের খেত শুকিয়ে ঝলসে যেতে লাগল কী যেন এক অভিশাপে। শেষে এমন হল যে, নিজেদের চাষবাস সব কিছু ছেড়ে আবার সেই দক্ষিণ আফিকায় ফেরা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় রইল না।"

"কিন্তু হঠাৎ তাদের খামারগুলোর অমন অবস্থা হল কেন?" না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না আমরা—" চাষবাসের বিদ্যে তাদের তো ভালই জানা ছিল। অভিশাপ-টভিশাপ গোছের কুসংস্কার কাটাবার মতো ভূতের ওঝারাও ছিল তাদের হাতে।"

"তা ছিল!" ঘনাদা স্বীকার করলেন, "কিন্তু ওঝাদেরও ভিরমি খাওয়ানো বুনো হাতির পিঠে-চড়া কাঁধে ঝোলা-জড়ানো এক নতুন ওঝার জাদুতে খ্যাপা অসুরের মতো ওঝাদেরও আতঙ্ক এসে সব ফসলের খেতে দেখা দেবে, আর তারপর কিছুদিন বাদে কী এক ফসলদানার মতো পোকার ঝাঁকে আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবার পর সমস্ত খেত ঝলসে যাবে, এ তো আর কেউ ভাবেনি।"

"তার মানে?" আমরা একটু বিমূঢ় হয়ে বলেছি, "ওই সেরা নতুন ওঝাই এ কাজ করেছে, কিন্তু বুনো হাতির পালের একটার পিঠে চড়ে যাওয়াও তো চারটিখানি কথা নয়। বুনো হাতি বশ মানাল কী করে?"

"খুব অবাক হবার কিছু আছে কি?" ঘনাদা একটু হাসলেন, "প্রথম হাতি ধরে বশ মানানোর বিদ্যা যিনি শিখিয়েছিলেন, সেই ঋষি পালক্যপ্যের দেশের মানুষের পক্ষে ও কাজ কি অসম্ভব!"

"তার মানে এই আমাদের বাংলা অঞ্চলের কেউ গেছলেন ওখানে, ওঝার সেরা ওঝা হয়ে?" আমাদের চোখগুলো সব বিস্ফারিত—"কিন্তু অভিশাপটা ছিল কী?"

"কী আর," ঘনাদা বলেছেন হেসে, "থলের মধ্যে মাজরা পোকার ডিম। তখন পর্যন্ত ঝলসা রোগের বাহন এ পোকার খবর তো দুনিয়ার কাছে পৌঁছয়নি।"

ঘনাদা চুপ করলেন। আমাদেরও কারও মুখে কিছুক্ষণ আর কথা বার হল না।

এরপর কী করব এই আমাদের ভাবনা। ব্যক্তিগত কলমে 'প্রস্তুত' বলে বিজ্ঞাপন দেব একটা, না এবার চুপ করে বসে থাকব কিছুদিন, এখনও ঠিক ধরতে পারিনি।

মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই

"হ্যাঁ, পৃথিবীর এমন বিপদ তার সৃষ্টির সময় থেকে আগে কখনও আসেনি। সমস্ত পৃথিবীই তার সমস্ত প্রাণিজগৎ নিয়ে ধ্বংস হতে যাচ্ছে। না, না, পারমাণবিক বিস্ফোরণ নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর অপ্রতিরোধ্য কিছুতে। কল্পনাতীত সে সর্বনাশ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে, কিন্তু অমোঘভাবে কোথা থেকে—"

শিবু দম নেবার জন্য থামল। কথাগুলো কিন্তু শিবুর নিজের কিংবা আমাদের কারওর বা স্বয়ং টঙের ঘরের তাঁরও নয়। কথাগুলো সেই তাদেরই, ধৈর্য ধরে বেশ কিছুকাল যাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম।

ধৈর্য না হারিয়ে আমাদের যে লাভই হয়েছে ওপরের উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ। উদ্ধৃতিটি যে সেই অদ্বিতীয় মৌ-কা-সা-বি-স-এর কোনও লেখা থেকে তা অনেকেই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন বোধহয়।

প্রায় তিন মাস ধরে এই রকম কোনও কিছু লেখা একটি চিঠির জন্য হা-পিত্যেশ করে আছি। কতবার লোভ হয়েছে মৌ-কা-সা-বি-স-এর দেওয়া একটি বিশেষ

খবরের কাগজের নম্বর দেওয়া পোস্টবক্সের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েই দেখি, ফল কী হয়।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সে দুর্বলতা জয় করে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করবার পণ করেছি।

তার ফল সত্যি আশাতীতভাবেই ফলেছে বলা যায়। চিঠি যা এসেছে, ওপরের উদ্ধৃতিটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে তা নেহাত মামুলি সাদামাঠা কিছু নয়, রীতিমত তাজা বারুদ-ঠাসা-কিছু, একটু আগুনের ফুলকি লাগলেই যা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাতে পারে।

চিঠিটা আগের ক-বারের মতোই এক প্রকাশকের মারফত এসেছে। তবে এবার প্রাপকের নামটা আমাদের টঙের ঘরের তাঁর নয়, এবার প্রাপক হিসাবে নাম যা দেওয়া হয়েছে তা একজন বিশেষ কারওর না হয়ে একেবারে পুরোপুরি চারজনের। সে চারজন হচ্ছি আমরা অর্থাৎ গৌর শিবু শিশির ও আমি।

নামগুলি সবই পদবিহীন। শুধু আদি অংশটুকুর সারি সেখানে এরকম দাঁড়িয়েছে, গৌর শিবু শিশির ও সুধীর।

যে প্রকাশকের ঠিকানায় এ চিঠিটি পাঠানো হয়েছে তিনি যে বাজে কাগজের ঝুড়িতে না ফেলে এ চিঠি কষ্ট করে আমাদের বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে পাঠিয়েছেন, এ তাঁর অনেক দয়া।

ঘনাদার নামে আর উদ্দেশে অনেক আজে-বাজে আজগুবি আবদারের চিঠিপত্রই তো আসে। তেমনই একটা উটকো ঝামেলা মনে করে তিনি চিঠিটা আমাদের ঠিকানায় পাঠাবার কষ্ট না করলেই আমাদের কত বড় লোকসান যে হয়ে যেত তা শিবুর পড়তে-শুরু-করা চিঠিটার সামান্য নমুনা থেকে বুঝতে পারছিলাম।

আজ শিবুর অবশ্য মস্ত একটা বাহাদুরির দিন। দুপুরবেলা আমাদের কেউ না কেউ রোজই বাইরের লেটার-বক্সটা একবার হাতড়ে আসে। আজ পালাটা ছিল শিবুর।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর প্রথম চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে দুপুরের এই লেটার-বক্স হাতড়াতে যাওয়াটার সঙ্গে একটা উত্তেজনা জড়িয়ে গেছে। কী আসে, কী হয় গোছের একটা আগ্রহের অস্থিরতা কিছুতেই যেন চাপা যায় না।

দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বাইরে একটা নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব দেখালেও শিবু বেশ একটু ধুকধুকুনি না নিয়ে কি নীচের তলার সিঁড়ির পাশের লেটার-বাক্সটা খুলেছে?

খুলে ভেতরে হাত গলিয়ে যা পেয়েছে তাতেই তুড়ি মেরে লাফ দিয়ে ওঠা খুব অন্যায় হত না। না, ইলেকট্রিকের বিল-টিল গোছের কিছু বা আজেবাজে সস্তা সাপ্তাহিক কাগজের পাওনা প্যাকেট নয়, রীতিমত লম্বা খামের মুখ বন্ধ-করা চিঠি।

লেফাফাটা বার করে এনে তার ওপরের নাম চারটে পড়বার পর শিবুর ধীরেসুস্থে জামা খোলার আর তর সয়নি। একটানে লেফাফাটার একটা মাথা ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের চিঠিটা বার করে এক-এক লাফে তিন-তিনটে করে ধাপ ডিঙিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরের বারান্দায় উঠেই, "শোনো, শোনো," বলে চিৎকার করে আড্ডাঘরে

ঢুকেই যা পড়তে শুরু করেছে তা আগেই জানিয়েছি।

দম নিতে একটু থামার পর শিবুর আর শুরু করবার সুযোগ হয়নি। তিনদিক থেকে আমরা তিনজন তার দিকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছি অস্থিরভাবে, "কী—কী—কার চিঠি? সেই মৌ-কা-সা-বি-স—"

আমরাও আমাদের প্রশ্নগুলো শেষ করতে পারিনি। হাত বাড়িয়ে শিবুর কাছ থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্যটা অনায়াসে অনুমান করে আগেই চিঠিটা চটপট আমাদের নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে সে বলেছে, "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এতকাল যদি ধৈর্য ধরতে পেরে থাকো তাহলে আর কয়েক সেকেন্ড সে ক্ষমতার পরিচয় দাও। নইলে তোমাদের টানাটানিতে সমস্ত বর্তমান পৃথিবীর পক্ষে অমূল্য একটি বিপদ সংকেতের বার্তা ছিন্ন হয়ে—"

"আরে, থামো, থামো,"—এবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহটা দমন করেই ধমক দিতে হয়েছে শিবুকে, "বাজে বাক্‌তাল্লা না করে চিঠিটায় কী আছে, পড়ো। আমরা ঠাণ্ডা হয়েই শুনছি।"

শান্ত হয়েই তারপর শিবুকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে দিয়েছি, কিন্তু সে যা শুনিয়েছে তাতে অস্থির না হয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি।

হ্যাঁ, চিঠিটা মৌ-কা-সা-বি-স-এর, কিন্তু তাদের কাছ থেকেও এমন আজগুবি আষাঢ়ে চিঠি পাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। মৌ-কা-সা-বি-স এবার যেন নিজেদের আগের সব বাহাদুরির ওপর টেক্কা দিয়েছে।

চিঠিটা যে টঙের ঘরের তাঁর নামে নয়, আমাদের চারজনের নামে পাঠানো হয়েছে, তা আগেই জানিয়েছি। নাম বদলের কৈফিয়ত দিয়েই চিঠিটা এইভাবে শুরু—

বন্ধুগণ, ইতিপূর্বে আপনাদের মেসের টঙের ঘরের তাঁহার উদ্দেশে বেশ কয়েকটি পত্র প্রেরণ করিয়াও তাহাতে কোনও প্রকার সাড়া না পাইয়া এবার সেই একমেবাদ্বিতীয়ম এবং চার বাহনকে উদ্দেশ করিয়াই এ পত্র পাঠাইলাম। আশা করি এ পত্রে বিবৃত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া আপনাদের সর্বজ্ঞ ঠাকুরের কাছে বিশ্বের মহাসংকটের কীসে পরিত্রাণ তাহা জ্ঞাত হইবেন।

বিশ্বের মহাসংকটের কথা এবার সহজ ভাষায় সংক্ষেপে বললে এইরূপ দাঁড়ায় বলে মৌ-কা-সা-বি-স যা জানিয়েছে তার খানিকটা শিবুর মুখে আগেই শুনেছি। শিবু যেখানে থেমেছিল তার পরের কথাগুলো হল—আপনাদের সর্বজ্ঞ ঠাকুর সে বিষয়ে কিছু জানেন কি? তিনি কি বলতে পারেন পৃথিবীর কোন এক অভিশপ্ত জায়গা থেকে সমস্ত প্রাণিজগতের চরম সর্বনাশ কেমন করে ঘনিয়ে আসছে? জানেন কি যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ক-টি দেশ সম্পূর্ণ খবর না পেলেও সামান্য একটু আঁচ পেয়েই গভীর আতঙ্কে অতি গোপন সব বৈঠকে আরও বিশদ করে ব্যাপারটা জানবার আর সম্ভব হলে তার প্রতিকারের উপায় সন্ধানের চেষ্টা করছেন? তিনি কি জানেন আকারে নেহাত সামান্য পৃথিবীর একটি বিশেষ জায়গা মাত্র কিছুদিন আগে

থেকে মানুষের ভূগোল থেকে একরকম বাদ দিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মত্ত আতঙ্ক ছড়াবার ভয়ে এই নিয়ে হইচই দূরে থাক, কোনও রকম আলোচনাও বাইরে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রধান প্রধান দেশের সবচেয়ে ওপরের মহলে কর্তাদের এই ব্যাপারে দিনেরাত্রে ঘুম নেই। যে জায়গাটুকু নিয়ে এই ভয়ংকর আতঙ্ক তা এখনও মাপে একশো বর্গমাইলের বেশি হবে না, কিন্তু পৃথিবীর বুকের বলতে গেলে ওই এক বিন্দু জায়গা এখন অমন দশ লক্ষ মেগাটন বোমার চেয়ে সর্বনাশা হয়ে উঠেছে। যে চরম ধ্বংসের নিয়তির দিকে তা আমাদের নিয়ে চলেছে তা ঠেকাবার আর উপায় আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতের অনিবার্য সৃষ্টি বিনাশের পরিণাম মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দুটো সাধারণ প্রশ্নই আপনাদের মারফত আপনাদের সেই টঙের ঘরের তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। 'নিভোচি' বলে কারওর কথা কিছু কি তিনি জানেন? আর 'নিউ এরা' শব্দটা শুনলে কিছু তাঁর মনে হয় কি না।

ঠিক তাল-ঠোকা বাহাদুরির সুরে নয়, এবার যেন খানিকটা সরল আগ্রহের সঙ্গে এসব কথা লিখে মৌ-কা-সা-বি-স এ-চিঠির শেষে যথারীতি একটি দৈনিকের একটি নম্বর দেওয়া পোস্টবক্সে আমাদের উত্তরটা তাদের পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

হ্যাঁ, এবার সত্যিই চিঠির শেষে বেশ একটু নরম অনুরোধের সুর। আমরা যেন তাঁদের এ চিঠি অবহেলাভরে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে না ফেলি। আর কিছু না পারি 'নিউ এরা' শব্দটার রহস্যটা যে কী তা একটু জানবার চেষ্টা যেন অতি অবশ্য করি।

তাল-ঠোকা টিটকিরির বদলে বিনীত অনুরোধ ঠিকই। কিন্তু তারই বা আমরা করতে পারি কী?

মৌ-কা-সা-বি-স-এর তাগিদের দরকার ছিল না, নিজেরাই এখন আমরা শুধু 'নিউ এরা' নয়, 'নিভোচি'র রহস্যটা যে কী তা একটু জানবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু জানতে চেষ্টা করার একমাত্র যা উপায় সেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? আর বাঁধবেই বা কীভাবে।

টঙের ঘরের তাঁকে বাগে আনার সবচেয়ে সোজা উপায় তো তাঁর জন্য চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়-র ঢালাও নৈবেদ্য সাজানো। কিন্তু তাতে এখন চিঁড়ে ভিজবে বলে তো আশা হচ্ছে না।

তবু চেষ্টার ক্রটি আমরা করিনি। আমিষের দিকে তাঁর যা পছন্দ সেই চিংড়ির কাটলেট থেকে শুরু করে সাত্ত্বিকের দিকে বাগবাজারের সেরা রসোমালাই পর্যন্ত কিছুই তাঁর জন্য সাজিয়ে রাখতে ক্রটি করিনি।

কিন্তু যাঁর জন্য এত ষোড়শোপচারের নিবেদন তিনি কোথায়? প্রথমত, নীচের আড্ডাঘরের বারান্দায় আমাদের হইচই টঙের ঘরের টনক নড়াবার কথা। তার ওপর বনোয়ারিকে দিয়ে খবরটাও যথাসময়ে পাঠাতে ভুল হয়নি আমাদের।

তবু তেতলা থেকে নামবার ন্যাড়া সিঁড়িতে বিদ্যাসাগরি চটির ফট ফট শব্দ কই? কই বারান্দা থেকে আড্ডাঘরে ঢোকবার আগে সেই পেটেন্ট গলাখাঁকারি।

না, এবার আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। পরপর চারজনই ন্যাড়া সিঁড়ি

বেয়ে খোলা ছাদে উঠে সটান সেই টঙের ঘরে। আমাদের পিছু পিছু ঢাউস দুটি ট্রেতে সব প্লেট সাজিয়ে বনোয়ারিও।

না, ভয় ভাবনা করার মতো কিছুই সেখানে দেখলাম না। ঘনাদা সশরীরে সেখানে উপস্থিত এবং বেশ বহাল তবিয়তেই।

তবে আমাদের আড্ডাঘরের অমন রসালো নিমন্ত্রণে সাড়া না দেবার কারণ কী?

বনোয়ারির সামনে ট্রে থেকে নামিয়ে প্লেটগুলো বড় টেবিলের অভাবে ঘনাদার তক্তপোশেরই এক ধারে সাজিয়ে রাখবার মধ্যে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

"ব্যাপার কী, ঘনাদা? বনোয়ারি আপনাকে ঠিক মতো খবর দেয়নি বুঝি?"

"খবর?" যে খবরের কাগজটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন তা থেকে মুখ তুলে ঘনাদা যেন একটু বিস্মিতভাবে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "কীসের খবর?"

"এই—এই মানে—" আমরাই এবার একটু ফাঁপরে পড়লাম নিজেদের কথাটা অর্ধেক ঢেকে জানাতে। আমতা আমতা করে বললাম, "মানে, ওই আজ হঠাৎ ক-টা স্পেশ্যাল ডিশ আনাবার সুবিধে পেলাম কিনা, তাই এই—"

শিশিরের বাধো বাধো কথাটা গৌরই প্রাঞ্জল করে দিয়ে বললে, "এই যেমন ডাবল সাইজ চিংড়ির কাটলেট, শিক নয়, একেবারে সাচ্চা শিস্-কাবাব।"

"হাঁ," ঘনাদা প্লেটগুলোর ওপর দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে বাধা দিয়ে বললেন, "দেখতে তো পাচ্ছি, প্লেটগুলো। তবে আজ বারটা যে বুধ সেটা তো ভুলতে পারছি না।"

"বারটা যে বুধ! বলছেন কী ঘনাদা? বুধবারের সঙ্গে এই সব উপাদেয় ভোজ্যের কী সম্বন্ধ?'

সেই কথাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হঠাৎ সম্বন্ধের সূত্রটা যে কী তা মনে পড়ে গেল।

দোষটা সম্পূর্ণ শিবুর। আগের বুধবারে বাজারে তেমন ভাল মাছ-টাছ না পেয়ে ফুলকপি, স্কোয়াস কড়াইশুঁটির মতো অসময়ের বেশ ক-টা দুর্লভ সবজি এনে দোষটা কাটাতে চেয়েছিল। তার সেই নিরামিষ বাজারেও খুব একটা অপরাধ হত না। কিন্তু এর ওপর সবাই মিলে টেবিলে খেতে বসবার পর সে যে টিপ্পনিটা কেটেছিল সেইটিই যে মারাত্মক হয়েছে তা এখন বুঝলাম।

নিরামিষ হলেও রামভুজের রান্নার বাহাদুরি যাবে কোথায়? একটার পর একটা পদে থালা চেটেপুটে সাফ করতে করতে ঘনাদা আধা ঠাট্টার সুরে একবার বলেছিলেন, "কী হে, আজ শুধু বোটানিক্যাল গার্ডেনেই ঘুরতে হবে নাকি?"

কথাটায় ঠিক বরাদ্দ মাফিক হাসলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু আহাম্মকের মতো শিবু এ-কথার ওপর বলে বসেছিল, "সেইটেই উচিত নয় কি? হপ্তায় একদিন স্রেফ আমিষের বদলে নিরামিষ তো সব শাস্ত্রের বিধান।"

"ও! তাই বুঝি!" বলে যে ঘনাদা তারপর একটু বেশি রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন অন্য কী-একটা আলোচনার উত্তেজনায় সেটা সেদিন তেমন লক্ষই

করিনি। কিন্তু এখন ফ্যাসাদ যা বেধেছে তা থেকে উদ্ধারের উপায় কী?

কিন্তু কীসে যে কী হয় তা কেউ কি পারে বলতে? যার আহাম্মুকিতে আমাদের এই মহাসংকট, সব মুশকিল আসান হয়ে গেল তারই আর-এক আহাম্মুকিতে।

'বারটা যে বুধ' ঘনাদার এই কথাটায় হঠাৎ যেন দারুণ মজার খোরাক পেয়ে শিবু হাসতে হাসতে বলল, "বারটা যে বুধ! বাঃ, এই সব প্লেট দেখে আপনার বুধবারের কথা মনে হল। আর আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? মাথা নেই মুণ্ডু নেই তবু মনে হচ্ছে কী এক 'নিউ এরা'-র কথা। হঠাৎ খেয়াল হচ্ছে যে 'ইউরেকা'-র মতো 'নিউ এরা' বলে চেঁচিয়ে উঠি। সেই সঙ্গে 'নিভোচি' বলেও চেঁচাতে পারি।"

আমরা তখন প্রায় জমে পাথর হয়ে গেছি। আহাম্মক শিবুটা শেষ পর্যন্ত করল কী! ঘনাদার দিকে চেয়েই বুঝেছি, সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই। মুখটা তাঁর ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটে আসা সাইক্লোনের পূর্বাভাষের মতো থমথমে। যে কোনও মুহূর্তে আকাশটায় ফেটে পড়তে পারে।

""নিউ এরা'! 'নিউ এরা' শব্দটা মনে পড়ে তোমার মজা করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে?"—এ ঘনাদার গলা না দূর আকাশ থেকে ছুটে আসা মেঘের গুমরানি।

আহাম্মক শিবুর তবু কি হুঁশ আছে। ঘনাদার কথায় যেন আরও মজা পেয়ে সে বললে, "চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে না করে পারে? ওরকম অদ্ভুত কথায় গলায় যে সুড়সুড়ি লাগে।"

"সুড়সুড়ি লাগে"—ঘনাদার গলায় এবার যেন পাখোয়াজি গমক, তারপর যেন চাপা গর্জন—"ওই আজগুবি উদ্ভুট্টে শব্দটায় কী বোঝায় তা জানো? জানো, একদিন ওই শব্দটা শুনে দুনিয়ার প্রধান প্রধান দেশের যাঁরা হর্তাকর্তা তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখে গোপনে গোপনে দিনের পর দিন গোপন পরামর্শ-সভা ডাকছিলেন। সে সব একান্ত গোপন সভার কথা দুনিয়ার কোথাও কোনও খবরের কাগজে বার হয়নি। সেখানে ডাক পড়েছে শুধু সেরা সকল বৈজ্ঞানিকের। সে সব বৈজ্ঞানিকদের মুখ কিন্তু একেবারে তালা বন্ধ। তাঁদের অতি আপনজনও ঘুণাক্ষরে এ বিষয়ে কিছু জানতেন না।

কেন দুনিয়ার হর্তাকর্তাদের মহলে এই আতঙ্ক? কেন ঘনঘন এ সব গোপন পরামর্শ সভা? সে সব কিছুর সঙ্গে ওই 'নিউ এরা' শব্দটা কীভাবে জড়ানো তা কল্পনা করতে পারলে ও শব্দটায় গলা সুড়সুড় করবার মতো মজা পেতে না।"

ঘনাদা একটু থামলেন। তা থামুন, আমরা এখন তাঁকে লাইনে পেয়ে গেছি। এখন আর আমাদের পায় কে?

নিজের ভাবনায় যিনি তন্ময় তাঁর অন্যমনস্কতার ভেতরেই চিংড়ির কাটলেটের প্লেটটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে শিবু যেন ভয়ে ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'নিউ এরা' মানে সুপার নিউট্রন বোমা গোছের কিছু নিশ্চয়। বড় বড় চাঁইদের আগে ছোটখাটো কোনও রাজ্য বিজ্ঞানের আচমকা-পাওয়া-কোনও-প্যাঁচে যা আবিষ্কার করে বানিয়ে ফেলেছে বলেই বড় বড় চাঁইদের এত ভয়।"

"সুপার মেগাটন!" অন্যমনস্কভাবে শিবুর এগিয়ে দেওয়া প্লেটের সুপার চিংড়ির

কাটলেট জোড়া প্রায় শেষ করে এনে মৃদু নাসিকা ধ্বনি করে ঘনাদা বললেন, "ও সব সুপার নিউট্রন-এ চোখে অন্ধকার দেখবার পাত্র ওই বড় বড় চাঁইরা নয়—তাদের হার্টফেল করবার অবস্থা যাতে হয়েছে তা এমন কিছু যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।"

ঘনাদা সামান্য কয়েক সেকেন্ড থামতেই পাকা হাতে তাঁর প্লেট বদল করে নিয়ে—চিংড়ির কাটলেটের জায়গায় শিস্-কাবাবের থালি ধরিয়ে—শিবু বললে, "কল্পনার বাইরে মানে আপনিও তখন কল্পনা করতে পারেননি?"

"জানতেও পারেননি!"—আমাদের গলায় সবিস্ময় অবিশ্বাসের সুর—"কোথায় ছিলেন তখন আপনি?"

"আমি!" ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, "যেখানকার হোয়াইট হাউসের গোপন বৈঠকে বড় বড় চাঁই আর বৈজ্ঞানিকদের বৈঠক বসেছে, আমি তখন সেই মার্কিন মুলুকেই ওয়াশিংটন শহরেই আছি। সেখানে অবশ্য গিয়েছি ওই—"

"এফবিআই-কেজিবি-সিআইএ-এর ডাকে নিশ্চয়!", গৌর এবার উচ্ছ্বাসভরে জানিয়ে দিতে দেরি করল না।

"থাক! সে কথা থাক!" বলে স্বীকার-অস্বীকারের মাঝামাঝি ভাব দেখিয়ে ঘনাদা বললেন, "যেই ডাকুক, একটা খুব জরুরি ধান্দাতেই সেখানে যেতে হয়েছিল। মার্কিন মুল্লুকে মাফিয়াদের দাপট তখন একটু বেশি রকম বেড়েছে। ইটালির পায়ের তলায় নেহাত এক পাটি জুতোর শামিল সিসিলি দ্বীপে যারা শ-চারেক কি পাঁচেক বছর ধরে গাঁইয়া শয়তানিতে হাত পাকিয়েছে, সিসিলির সেই সব গুণ্ডা শয়তানের বংশ আমেরিকায় গিয়ে মনের মতো জল-হাওয়ায় ফুলে-ফেঁপে উঠে গোসাপ থেকে একেবারে নোনা গাঙের ধেড়ে মানুষ-খেকো কুমির হয়ে উঠেছে। তাদের নিয়ে তখন নতুন করে যে সমস্যাটা জেগেছে সেটা হল তাদের যেন এক আশ্চর্য গায়েব হয়ে যাওয়া বা গায়েব করে দেওয়ার ক্ষমতা। এ গায়েব হওয়া বা করা মানে একেবারে সাবাড় করে দেওয়া বা হয়ে যাওয়া নয়। যারা এমন নিরুদ্দেশ হয়—নিজেদের দরকার মতো তাদেরকে আবার যথাস্থানে হাজিরও করে—এই মাফিয়ার দল। কিন্তু কেমন করে যে তাদের লোপাট করে রাখে সেই রহস্যেরই কোনও কূল-কিনারা দুনিয়ার অন্য ধুরন্ধরেরা তো বটেই, এফবিআই-কেজিবি-সিআইএ মিলেও করতে পারছে না।

ব্যাপারটা ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন মুলুকে দুটিই মাত্র রাজনৈতিক দল—রিপাবলিক্যান আর ডেমোক্র্যাট। ধরা যাক প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই চলছে। এ লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিরই জেতবার বারো আনা সম্ভাবনা। তিনিই হঠাৎ দেখা গেল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। নিরুদ্দেশ মানে শেষ কিন্তু নয়। কিছু দিন বাদে বাদে তাঁর টাটকা সব ভাষণ নানা বেতার তরঙ্গে শোনা যেতে লাগল। কোথা থেকে বেতার ভাষণ আসছে উপযুক্ত যন্ত্র দিয়ে তা ধরে ফেলে সেখানে যে সন্ধান চালাবে তার উপায় নেই। একদিন যদি নিকারাগুয়ার কোনও অঞ্চল থেকে বেতার ভাষণ আসছে বলে ধরা যায় তার দুদিন বাদে সে ভাষণ আসছে ক্যানাডার টরেন্টো কি কিউবার হাভানা থেকে। তার মানে রেকর্ড করা ভাষণ অমনই করে নানা জায়গা

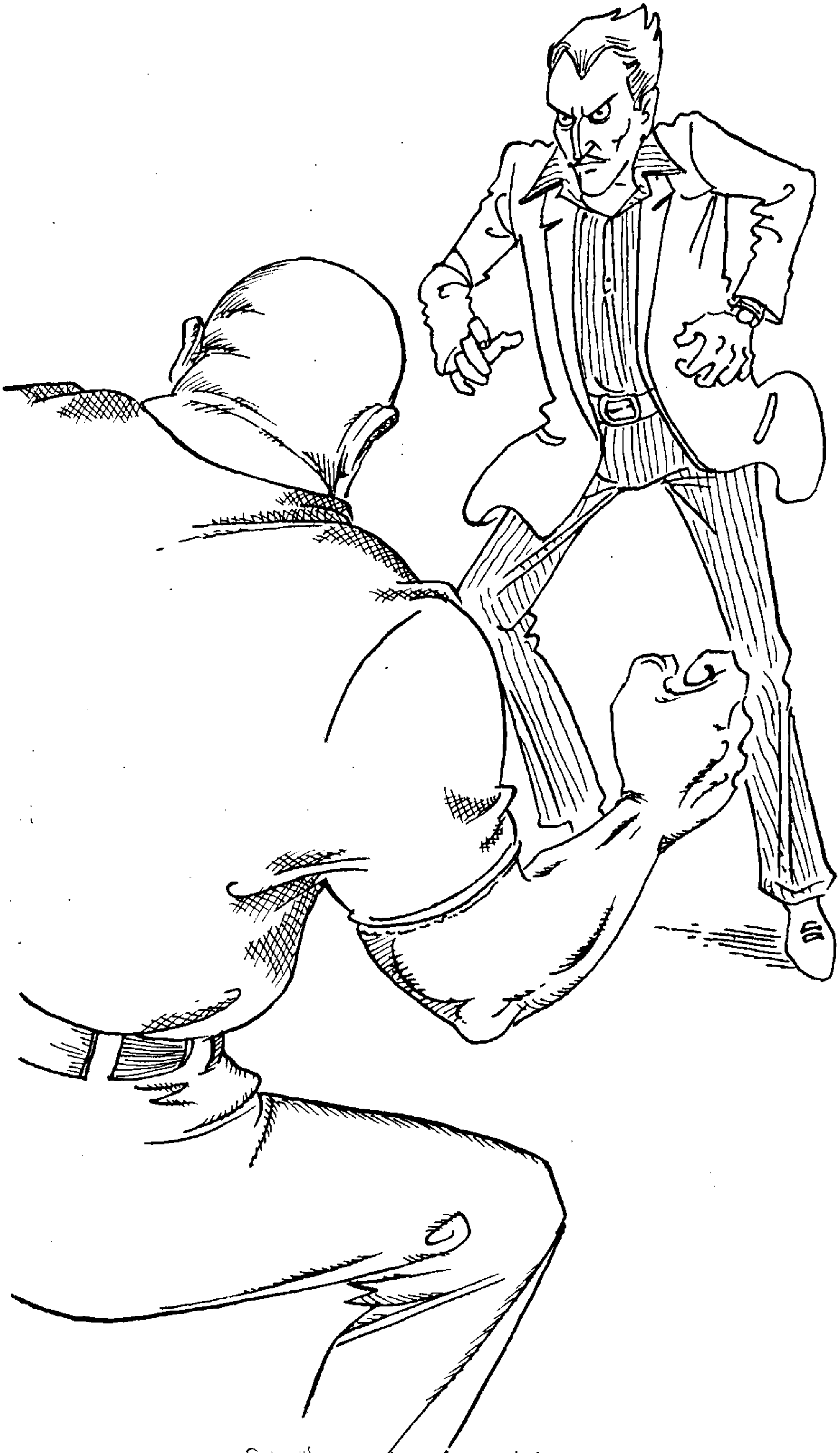

থেকে বেতার তরঙ্গে ছড়াবার ব্যবস্থা আছে।

শুধু এই ধরনের ব্যাপারই নয়, পর পর অনবরত খুনে ডাকাতদের মতো ফাঁসির আসামিরাও জেল থেকে কেমন করে পালিয়ে উধাও হয়ে গেছে। জেল থেকে পালানো—ঘুষ-ঘাস আর চোর-পাহারাদারদের সঙ্গে যোগসাজশে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তারা অমন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে কী করে? তাদের বেলাতেও হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া মানে একেবারে নিকেশ হয়ে যাওয়া যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই রকম দিগ্বিদিক থেকে মাঝে মাঝে ছড়ানো বেতার ঘোষণায়। এদের ঘোষণাগুলো সাধারণত এই রকম যে, 'আছি, আমরা আছি! বহাল তবিয়তে আছি। মোটা করে গ্যাঁটের কড়ি ছাড়ো, তোমাদেরও আমাদের মতো কোনও গারদ আটকে রাখতে পারবে না। ইলেকট্রিক চেয়ারেরও সাধ্য নেই তোমাদের কোলে বসায়। টাকা ছাড়ো, মোটা টাকা!'

এটা মাফিয়াদেরই কাজ এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তাদের কয়েদি পাচারের কায়দাটা যদি বা অনুমান করে ঠেকাবার কড়া ব্যবস্থার চেষ্টা করা যায়, কোথায় পাচার করছে সেইটেই একেবারে অভেদ্য ধাঁধা।

মজার কথা হল এই যে কেঁচো খুঁড়তে গোখরো নয়, গোখরো খুঁজতে একেবারে চন্দ্রচূড়ের খাস কোটরের পাত্তা মিলে যাবে তা কে ভাবতে পেরেছিল।

মাফিয়াদের মানুষ পাচারের ব্যাপারে যা যা করা উচিত সে বিষয়ে যাদের সঙ্গে আলোচনা করবার তা মোটামুটি করে ফেলে ফিরে আসবার আগে দু-একজন ওখানকার বন্ধুর সঙ্গে দেখাশোনা সেরে নিচ্ছিলাম। সেই আলাপি বন্ধুদের প্রধান একজন হচ্ছেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রফেসর নিভোচি। নিজের দেশ ছেড়ে প্রায় ছ-সাত বছর ধরে যিনি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন শহরের ধারে মেরিল্যান্ডে একটি বিরাট ল্যাবরেটরিতে তাঁর গবেষণার কাজ করছেন।

মেরিল্যান্ডে নিভোচির বাড়িটা আমার চেনাই ছিল। সেখানে তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে কিন্তু অবাক। বাসাটা ঠিকই আছে, সেখানে তাঁর থাকার প্রমাণস্বরূপ দরজায় নেমপ্লেটও লাগানো। কিন্তু তিনি সেখানে নেই। অনেকক্ষণ দরজায় বেল টেপবার পর সে ফ্ল্যাটবাড়ির ওপর তলার অন্য এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আমায় হয়রান হয়ে বেল টিপে যেতে দেখে একটু দাঁড়িয়ে বলে গেলেন যে আমি বৃথাই বেল টিপছি। ওই ফ্ল্যাটে কেউ নেই। নেই আজ প্রায় এক বছরেরও বেশি।

এক বছরের বেশি কেউ ফ্ল্যাটে নেই! ফ্ল্যাটটা তবু প্রফেসর নিভোচির নামেই এখনও রাখা! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর এই রকম উধাও হয়ে থাকা নিয়ে কাগজে কোনও লেখালেখি, এমনকী মাফিয়াদের মানুষ পাচার নিয়ে যে সন্ধানী বৈঠক আমাদের সম্প্রতি চলছে তাতেও কোনও উল্লেখ কারওর মুখে শুনিনি!

একটা গভীর কিছু রহস্য যে ব্যাপারটার মধ্যে আছে, প্রফেসর নিভোচির ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বার হবার পর থেকেই তার আভাস পেলাম।

ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই অবাক হয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি আমার সামনের ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়েই হর্ন দিয়ে আমায় ডাকছে।

ট্যাক্সির দরকার আমার ছিল। কিন্তু এমনভাবে রাস্তায় পা দিয়েই সামনে অপেক্ষা করা ট্যাক্সি পাব তা ভাবিনি। বিশেষ করে সদর রাস্তা থেকে বেশ দূরের একটা রীতিমত নির্জন পাড়ায় একেবারে হুজুরে হাজির অবস্থায়।

ট্যাক্সিটা পেয়ে খুশি হয়েই তাকে আমার গন্তব্যস্থানটা জানালাম। ঠিকানাটা আমাদের গোপন বৈঠক যেখানে এখন চলছে সেই আস্তানার। আমেরিকার ট্যাক্সির একটা মস্ত সুবিধে এই যে ট্যাক্সিওয়ালাদের যাবার জায়গার ঠিকানা বোঝাতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় না। ঠিকমত ঠিকানা বলে দিলে তারা নির্ভুলভাবে সেখানে পৌঁছে দেয়। যে শহরে ট্যাক্সি চলে তার সমস্ত রাস্তাঘাট তন্নতন্ন করে জানা যে আছে তার পরীক্ষায় পাশ না করলে কেউ ট্যাক্সি চালাবার লাইসেন্স পায় না। আমার ট্যাক্সিওয়ালা এ নিয়মের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু খানিক বাদেই খেয়াল হতে চমকে উঠলাম। এ ট্যাক্সিওয়ালা চলেছে কোথায়? ওয়াশিংটন আর তার আশপাশের অঞ্চলের সামান্য যেটুকু পরিচয় আমার জানা তাতে ট্যাক্সি তো সম্পূর্ণ উলটো দিকে কোথায় যাচ্ছে।

লোকটাকে প্রথমেই দেখে যেমন একটু হাসিখুশি তেমনই বেশ একটু বুদ্ধিমানই মনে হয়েছিল। দেহটা অবশ্য তার বিপুল, ওভারসাইজ পোশাকেও যেন না কুলিয়ে ফেটে বার হতে চাইছে।

'একী? তুমি যাচ্ছ কোথায়?' বলে ট্যাক্সিওয়ালাকে হুঁশিয়ার করতে চেঁচিয়ে না উঠে পারলাম না এবার। আর সেই সঙ্গে আমার দিকে সেই বিরাট দেহের ওপর যে জালার মতো আকারের মুখটা সে ফেরাল তাতে সরল কৌতুকের বদলে সে কী বীভৎস টিটকিরির হাসি।

'দেখতেই পাচ্ছিস, মর্কট' গাড়িটাকে হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে সে বলল, 'তোকে তোর গোরস্থানে নিয়ে এসেছি।'

দেখতে আমি ভাল করেই তখন পেয়েছি। গোরস্থানেই আমায় লোকটা এনে ফেলেছে ঠিকই। কিন্তু মানুষের সাধারণ কবরখানার চেয়ে এ আরও ভয়ংকর জায়গা। আমেরিকায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এই রকম বিরাট গোরস্থান থাকে। তবে মানুষের নয়, ভাঙা অকেজো যন্ত্রপাতির, বিশেষ করে বাতিল পুরনো মোটর গাড়ির এখানে শেষ সমাধি হয়। সে সমাধি আবার ভীষণ। বিরাট আট-দশতলা উঁচু একটি কি দুটি ক্রেন তাদের ঝোলানো চেনের নীচের প্রকাণ্ড কাঁকড়ার দাঁড়ায় বাতিল মোটরগুলো তুলে নিয়ে একটা বিরাট লোহার পাতে ঘেরা কুণ্ডের মতো জায়গার ভেতর ফেলে দেয়, আর তারপর দানবীয় জাঁতার মতো প্রকাণ্ড লোহার চাকতির চাপে বড় বড় মোটরের দেহগুলো পাকিয়ে গুঁড়িয়ে একটা চ্যাপ্টা ধাতুর দলে যাওয়া ডেলা হয়ে যায়। জায়গাটায় ওই বিরাট ক্রেন আর এদিক ওদিকে বাতিল মোটর আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির স্তূপ ছাড়া মানুষজন নেই বললেই হয়। ক্রেন যে চালায় সে বসে আছে টঙের ওপর। দলা পাকাবার দানবীয় জাঁতা যারা চালাচ্ছে তারাও আছে বহুদূরে তাদের ইঞ্জিন রুমে।

বৃত্রাসুর মার্কা লোকটার মতলব বুঝতে আমার আর তখন বাকি নেই। তবু যেন

অতি সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে আমায় নিয়ে কী করবে তুমি? এখানে তো বাতিল যন্ত্রপাতি মোটরের মতো জিনিস গালিয়ে অন্য কাজে লাগাবার সুবিধে করার জন্য দলা পাকিয়ে রাখা হয়।'

'ঠিকই বুঝেছিস?' সেই বিদঘুটে হাসির সঙ্গে আমার ঘাড়টা এক হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বললে, 'লোহালক্কড়ের দলার সঙ্গে একটু মানুষের হাড়গোড়ের গুঁড়ো থাকলে মিশেলটা হয়তো বেশি কাজের হবে। তাই ওই যে ক্রেনটার প্রকাণ্ড দাঁড়া দেখছিস—তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্য লোহালক্কড়ের সঙ্গে ওর ভেতর তুলে দেব। তারপর ওই ক্রেনের দাঁড়া তোকে শূন্যে তুলে ওই—ওই লোহার কুণ্ডের মধ্যে টুপ করে ফেলে দিলেই তুই উদ্ধার পেয়ে যাবি—'

'কিন্তু আমার কী অপরাধ,' কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, 'যে আমায় এমন করে মেরে ফেলছ?'

'তোর অপরাধ!' লোকটা আমায় যেন ভেংচি কেটে বললে, 'তোর অপরাধ—তোর কৌতূহল আর আস্পর্ধার! মাফিয়াদের পেছনে লাগতে এখানকার টিকটিকিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েও থামিসনি, আবার ওই নিভোচির খোঁজ করতে গেছিস কেন?'

'বাঃ', আমি করুণভাবে কৈফিয়ত দিলাম, 'নিভোচি যে আমার বন্ধু। বন্ধুর খোঁজ নেব না?'

'বেশ, নে! আর তার—তার দামটাও দে।' বলে দানোটা আমার ঘাড়টা ধরে ক্রেনের সেই দাঁড়াগুলোর দিকে টান দিল।

'দাঁড়াও। দাঁড়াও', কাতর হয়ে এবার বললাম, 'সেই যখন মরতেই যাচ্ছি, তার আগে প্রফেসর নিভোচি আর তোমাদের মধ্যে কী সম্বন্ধ আর তার রহস্যটা কী একটু যদি জানিয়ে দাও।'

'বেশ। তাই দিচ্ছি। দু-কথায় শোন', দানোটা আবার দূরের ক্রেনের দাঁড়াটার দিকে আমায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, ' তুই মাফিয়াদের পেছনেই লেগে আছিস, এদিকে সারা দুনিয়ার ভয়ে যে নাড়িছাড়া অবস্থা জানিস না। জানবি আর কী করে, এই ওয়াশিংটনেই নানা মুলুকের মানুষের সব মাথাগুলো বড় বড় বিজ্ঞানীদের নিয়ে জড়ো হয়েছে শুধু একটা সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য! সর্বনাশটা কী? সর্বনাশ হল এই যে ওই যে তোদের ক্লোরোফিল না কী বলে গাছের পাতার সবুজ ভাগটাকে, যা না হলে কোনও গাছপালাই কোথাও থাকত না আর তার দরুন পোকামাকড় থেকে সমস্ত জন্তুজানোয়ারও আর জন্মাতে পারত না, সেই ক্লোরোফিল—তোদের ওই ভাইরাস না কী একটা রোগের জীবাণুর এক ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগে পুরোপুরি তৈরি হতে না পেরে—শুকিয়ে যাচ্ছে। আর অন্য প্রাণীও শেষ পর্যন্ত বাঁচবার মতো খাবার না পেয়ে মারা যাচ্ছে। রোগটা আপাতত অতি সামান্য ছোট্ট একটা জায়গায় আরম্ভ হলেও এমন ভয়ংকর ছোঁয়াচে যে একবার কোনও রকমে সুবিধে পেলেই খড়ের গাদার আগুনের মতো সারা দুনিয়ায় দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়বে। এখন—'

লোকটাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'এই রোগ আর তার সর্বনাশা ফলাফল আবিষ্কার

করেছেন ওই আমার বন্ধুটি প্রফেসার নিভোচি আর সেই জন্য ক্লোরোফিলে ছোঁয়াচে মহামারি না ছড়াতে দেবার জন্য সেখানে বাইরের কারওর যাওয়া বা সেখান থেকে কারওর বাইরে আসার মানা হয়ে গেছে, কেমন!'

'ঠিক, ঠিক!' ঘাড়ে একটা রদ্দা দিয়ে লোকটা বললে, 'তোর যা বুদ্ধি দেখছি, তোকে নিউ এরা-তেই নিভোচির সঙ্গী হতে পাঠালে ভাল হত মনে হচ্ছে! কিন্তু এখন আর সময় নেই।'

'নিউ এরা!' আমি তার কথার মানেই ভাবতে ভাবতে বললাম, 'নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে! প্রশান্ত মহাসাগরের কুক দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট্ট দ্বীপ কি?'

'ঠিক, ঠিক!' লোকটা আমার ঘাড়ে আর একটা রদ্দা দিয়ে তারপর ক্রেনের দাঁড়ার দিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, 'কালা নেংটি হলে কী হয়, তুই তো হাঁ করলেই সব বুঝে ফেলিস দেখি, তবে অত বুদ্ধি থাকাটা ভাল নয়, তাই তোকে—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও—' আমি যেন মিনতি করে তাকে থামিয়ে বললাম, 'পৃথিবীর বক্ষে সর্বনাশা ক্লোরোফিল-এর ছোঁয়াচে রোগ না ছড়াতে দেবার জন্যে নিউ এরা দ্বীপে এখন আর পা দেবার কথা কেউ ভাবে না, আর এই আসল মহলে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে তোমরা এখন ওই ঘাঁটিতে তোমাদের পাচার করা সব আসামি আর রাজনীতির বড় বড় চাঁইদের বিনা ঝামেলায় সেখানে চালান করে রাখবার ব্যবস্থা করেছ।'

'ঠিক! ঠিক!' বলে লোকটা আমায় আর একটা রদ্দা ঝাড়তে যাচ্ছিল। সেটা এড়িয়ে তারিফ করবার সুরে বললাম, 'এ কাজে প্রফেসার নিভোচিই তোমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তাকে চুপিসাড়ে এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওই নিউ এরা দ্বীপে পুরে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তার মতো মস্ত সৎ বিজ্ঞানীকে দিয়ে যা রেডিও তরঙ্গ মারফত রটনা করাচ্ছ, দুনিয়ার ওপর মহলে তাতে কারওর সন্দেহ জাগেনি।'

একটু থেমে—'সাবাস তোমাদের। সত্যি বলিহারি,' বলে লোকটার ঘাড়ে এবার একটা চাপড় দিয়েছি। আচমকা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে লোকটা আগুনের গোলা হয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে। পাশ কাটিয়ে একটু ঠেলা দিতেই সে এবার সটান একেবারে ক্রেনের হাঁ করা নীচের দাঁড়াটার ওপরই গিয়ে পড়েছে।

ওপরের দাঁড়াটা তখন নামতে শুরু করেছে। আতঙ্কে চিৎকার করে সে লাফিয়ে পালিয়ে আসতে গেছে প্রথমে। একটু ঠেলা দিয়ে তাকে আবার দাঁড়াগুলোর মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজেই আবার টেনে বার করে নিয়ে বললাম, 'শোনো চর্বির পাহাড়, ক্রেনের দাঁড়ায় লোহা পেষাইয়ের জাঁতাকলে যাবার যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে ভালয় ভালয় যেখানে বলছি, এখনই নিয়ে চলো। কী? তাই করবে, না ক্রেনের ওই দাঁড়াই তোমার পছন্দ?'

না, আর বেয়াড়াপনার চেষ্টা সে করেনি। সুবোধ বালকের মতো আমায় যথাস্থানে এফবিআই-এর বড় ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়ে গেছে আর প্রফেসর নিভোচিকে অন্য সাধু ও শয়তান ও আরও অনেকের সঙ্গে নিয়ে দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে আনার পর পৃথিবীর সেই সর্বনাশা পরিণামের আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে।"

ঘনাদা তাঁর বলা শেষ করে হঠাৎ নিজের হাতের দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, "তা এ কী!"

তা চমকে অমন কথা তিনি বলতেই পারেন। কারণ চিংড়ির কাটলেট থেকে শিস্‌-কাবাব আর মোরগ তন্দুরা পেরিয়ে তখন তিনি তাঁর হাতে ধরা রসোমালাই-এর প্লেটে এসে পৌঁছেছেন।

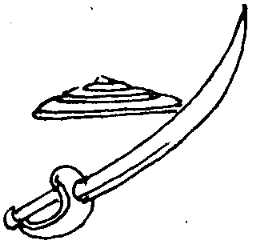

ঘনাদার শল্য সমাচার

কোন ভাগ্যে একটা বেফাঁস বচন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কে জানে!

কিন্তু তাইতেই অমন একেবারে কেল্লা ফতে!

গোলা-গুলি, রকেট, বোমা, টর্পেডোতে যা হয়নি, এ যেন এক গুলিতেই তা হাসিল।

এ ক-দিন কী আর করতে বাকি রেখেছি!

প্রথমে খানা-দানার এলাহি কাণ্ডকারখানা! সেসব খানার খুশবুতে শুধু বাহাত্তর নম্বর কেন, সমস্ত বনমালি নস্কর লেন ছাড়িয়ে গোটা ভোটের তল্লাটটাই ম-ম করে উঠেছে।

আজ হিঙের কচুরি আর চিংড়ির কবরেজি কাটলেট, পরের দিন চিকেন চাওমিন আর সুইট অ্যান্ড সাওয়ার মাছ।

দু-চার দিন এমন রসালো খানাপিনায় মুখ মেরে গিয়ে অরুচি ধরবে, তার উপায় নেই।

এ তো মন মাতানো মেনু তৈরির মামুলি কেতাবি ছক নয়, একেবারে নতুন বৈজ্ঞানিক ফরমুলার ফিরিস্তি।

বেশ ক-দিন খানদানি চর্ব্য-চোষ্যের পর হঠাৎ একদিন যখন যেমন মরসুম, তার মতো ফলমূল সন্দেশ-রসগোল্লা-রাবড়ির সাত্ত্বিক আহার।

পুরো সাত্ত্বিক আহারটা ঘনাদার কাছে অবশ্য ষোলো আনা সই নয়। তাই একদিন মাত্র তা চালিয়েই সটান বিরিয়ানি পোলাও মোরগ মসল্লম আর শিক-কাবাবের প্লেট সাজাতে হয়েছে।

বিরিয়ানি পোলাওয়ের জায়গায় মোগলাই পরোটা, মোরগ মসল্লমের বদলে রগন

জোস আর শিক-কাবাবের জায়গায় চিৎপুরি চাপ বদল করেও ফল সেই একই।

প্লেটগুলো অবশ্য ঠিক সাফ হয়ে যাচ্ছে। শিশিরের সিগারেটের টিনগুলো যথারীতি শিস দিয়ে আবরণ মুক্ত হয়ে যথাসময়ে খালি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘনাদা যেন সেই এক ভিজে বারুদের সলতে, তুবড়িতে আগুন লাগানো দূরের কথা, তা থেকে ভাল করে ক-টা আগুনের ফুলকিও বার করা যাচ্ছে না।

ঘনাদা কি বিরক্ত? গরম মেজাজে আছেন? না, না মোটেই না। ওই চেলাকাঠ-মার্কা মুখে যতটা খোশ-ভাব ফোটা সম্ভব, তা ঠিকই ফুটেছে মনে হচ্ছে।

গলার বোল কিন্তু শুধু 'হুঁ' আর 'হাঁ', আর মুখে সেই ধাঁধা-পেঁচানো মৃদু একটু হাসি, মিশরের কোনও স্ফিংক্স-এর মুখে যা হয়তো খোদাই করা আছে।

ধরাছোঁয়া যায়, প্রতিরক্ষার তেমন দুর্দান্ত ম্যাজিনো লাইনও ভেদ করা যায় অল্পে, কিন্তু শুধু 'হুঁ' 'হাঁ' আর ধাঁধাটে হাসির এই বেয়াড়া বেড়া পার হওয়া যায় কী করে?

চেষ্টার কিছু ত্রুটি অবশ্যই হয়নি। একেবারে মহাভারত ধরেই আরম্ভ করা হয়েছে।

আরম্ভ করেছে গৌর। শিশিরের সঙ্গে তার আগে থাকতেই যেমন মহলা দেওয়া সেইমত দুজনে যেন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কী আলোচনা করতে করতে হঠাৎ গরম হয়ে গর্জে উঠেছে।

বাঁ হাতের ওপর ডান হাতের মুঠোর তুড়ি মেরে গৌর বলেছে, "হ্যাঁ, দুর্যোধন! আলবত দুর্যোধন!"

আমরাও, মানে শিবু আর আমিও ঠিক সিনারিয়ো অর্থাৎ চিত্রনাট্য মাফিক হঠাৎ যেন চমকে উঠে উদ্বেগটা জানিয়েছি, "আরে, আরে! হল কী! হঠাৎ দুর্যোধন নিয়ে এত রাগারাগি কীসের!"

"কীসের?" শিশির যেন অতি কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বলেছে, "গৌর কী বলে, জানো! বলে, সারা মহাভারত হল দুর্যোধনকে ঠকিয়ে সব কিছু থেকে ফাঁকি দেওয়ার গল্প। আর এ ঠগবাজির প্যাঁচালো বুদ্ধি জুগিয়েছে আর কেউ নয়, স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। বলে, তিনি প্যাঁচ না খেলালে দ্রৌপদীর বিয়ে হত ওই দুর্যোধনেরই সঙ্গে।"

"কী!" আমাদের গলাগুলো উদারা থেকে তারায় তুলে দিয়ে বলেছি, "ঠকিয়ে ফাঁকি না দিলে দুর্যোধন তা হলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করবার যা পণ সেই লক্ষ্যভেদও করতে পারত!"

"সে পারুক না পারুক, তাতে কী আসে যায়!" গৌর নিজেই এবার আমাকে মহড়া দিয়েছে, "তার হয়ে লক্ষ্যভেদ করবার জন্য তো স্বয়ং ভীষ্মই ছিলেন। তাঁকে কীভাবে ঠুঁটো করা হয়েছিল তা নতুন করে শুনতে চাও? এই শোনো তা হলে

> পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে
> লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
> তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশ পতি
> ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি।
> এক টানে তুলি ধনু গঙ্গার কুমার
> আকর্ণ পুরিয়া তাতে দিলেন টঙ্কার।

তারপর হাঁকি কন চির ব্রহ্মচারী,
নিজের নিমিত্ত আমি নহি ধনুর্ধারী
লক্ষ্যভেদে কন্যা লভি দিব দুর্যোধনে
এত বলি ধনুর্বাণ ধরেন যতনে।
কিন্তু এ কি! অকস্মাৎ এ কেমন হইল
দু চোখে দুটি ক্ষুদ্র অণু কি প্রবেশিল!
কিছু না দেখেন ভীষ্ম চক্ষু করে জ্বালা
ধনুর্বাণ ফেলে দেন হয়ে ঝালাপালা।
একটু কি হাসি ফোটে শ্রীকৃষ্ণের মুখে?
এ কাহার লীলা তবে বোঝো সকৌতুকে!”

তৈরি হয়েই ছিলাম। গৌর থামতেই প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছি, “শুনলেন আপনি, শুনলেন? গৌরের মহাভারতটা শুনলেন?”

কিন্তু কোথায় কাকে কী বলছি? কলকাতা মামলার আপিল যেন তুলেছি কামসকাটকায়—হাইকোর্টের হাকিম আর্জির মানেই যেন বোঝেন না!

ঘনাদা তাঁর কাটলেটের প্লেটের আসল মাল সাফ করে ফ্রায়েড পোট্যাটো ফিংগারগুলো টোম্যাটো সস মাখিয়ে তারিয়ে শেষ করতে করতে আমাদের দিকে একটু মৃদু হাসি জড়ানো ‘হুঁ’ শব্দ করেছেন। হাসিটি অবোধ্য আর ‘হুঁ’ মানে যা বুঝতে চাও, বোঝো।

ধাঁধার কপাটে মাথা ঠুকেও আমরা কিন্তু হাল ছাড়িনি। আমিই খোদ ব্যাসদেব আর কাশীরাম দাসের তরফে লড়তে উঠেছি। বলেছি, “আস্পর্ধাটা একবার দেখলেন! একেবারে খোদার ওপরই খোদকারি! ধ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদের সভায় ভীষ্মের ওই যে চোখে অণু কী পড়ার ও বর্ণনা কোথায় পেয়েছে, জিজ্ঞাসা করুন তো!”

“ঠিক! ঠিক!” শিবু আমায় মদত দিয়েছে, “কোনও মহাভারতে ও কথা নেই। ব্যাসদেবের মূল মহাভারতেও না, কে না জানে ধনুকে বাণ লাগাতে গিয়ে হঠাৎ শিখণ্ডীকে দেখতে পেয়ে ভীষ্ম তীরধনুক ছেড়ে চলে যান?”

“হ্যাঁ, চলে তো যানই, কিন্তু শিখণ্ডীকে দেখে, না চোখে অণু কী উড়ে পড়ার দরুন, তা কে জানে?” গৌর নিজের কোট ছাড়েনি, “ভীষ্মের ধনুক ছেড়ে চলে যাওয়ার দুটোই কারণ হতে পারে। এক, যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ, তখন ভীষ্মকে তীর ছুঁড়তে না দেওয়ার জন্য শিখণ্ডীকে সামনে আনার সঙ্গে চোখে অণু কী ফেলে দিয়ে মতলব হাসিলটা একেবারে নিশ্চিত করে নিয়েছেন। চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেইটেই কি স্বাভাবিক নয়? কী বলেন ঘনাদা?”

ঘনাদা কিছুই বলেননি। কাটলেটের প্লেট সাফ করে পাশে নামিয়ে রাখার পর হাতের সিগারেটে সুখটানের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় মৌজ হয়ে চুমুক দিতে দিতে একটু রহস্যময় হাসি হেসেছেন।

আমরা কিন্তু ওই যা-বুঝতে-চাও-বোঝো মার্কা হাসির ফুটকি দিয়ে প্রসঙ্গটা শেষ

করতে দিইনি। গৌরের ওপরই আবার চড়াও হয়ে বলেছি, "থাক, থাক, ঘনাদাকে আর সাক্ষী মানতে হবে না। সবই তোমার চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্যাঁচ বলেই মেনে না হয় নিলাম, কিন্তু ভীষ্মদেবের চোখে অণু কী পড়ার ওই ছত্রগুলি কোথায় পেয়েছ, শুনি? কাশীরাম দাস ওরকম কিছু লিখেছেন বলে তো কেউ কানে শুনিনি।"

"শোনোনি?" গৌর তাচ্ছিল্যভরে বলেছে, "তা শুনবে কী করে? কাশীরাম দাস তো ও সব লেখেননি।"

"তবে!" আমরা যেন শেয়ালের গন্ধ পেয়ে শিকারি কুকুর হয়ে উঠেছি।

"তবে আর কিছু নয়," গৌর বাহাদুরির সঙ্গে বলেছে, "ও লাইন ক-টা আমারই লেখা—মুখে মুখে বানিয়ে তোমাদের শোনালাম।"

"মুখে মুখে বানিয়ে আমাদের শোনালে?" আমরা একেবারে স্তম্ভিত। গৌর যেন ধর্মস্থান অপবিত্র করে তারই বড়াই করছে, এমন আঁতকে-ওঠা মুখের ভাব করে ঘনাদার কাছে কড়া গোছের একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত গোছের বিধান চেয়েছি, "শুনুন আপনি, শুনুন! আজে-বাজে কিছু নয়—খোদ মহাভারতের ওপরেই ওর নোংরা হাত চালিয়েছে!"

ঘনাদা একটু তেতেছেন কি?

না, মোটেই না। সেই রহস্যময় হাসির সঙ্গে এবার শুধু একটু কণ্ঠধ্বনি শোনা গেছে। আমাদের সকলকে বাদ দিয়ে ঘনাদা শুধু শিশিরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তা ভালই তো লাগল!"

কী, ভাল লাগল কী? গৌরের মহাভারতের ওপর খোদকারি না শিশিরের দেওয়া সিগারেটের ব্র্যান্ড, তা কিছুই বোঝা গেল না।

মহাভারত দিয়ে আর কিছু হবার নয় বুঝে শিবু এবার অন্য রাস্তা ধরে বিজ্ঞানের শরণ নিলে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত গোপন খবর ফাঁস করবার মতো করে বললে, "নভেম্বরে আমরা আবার দক্ষিণ মেরুতে যাচ্ছি, জানিস তো?"

"আমরা যাচ্ছি মানে!" শিশির যথাবিহিত বিস্ময় প্রকাশ করলে।

"আহা, আমরা মানে আমাদের ভারতের একটা বৈজ্ঞানিক দল, তাও বুঝিস না!" শিবু শিশিরকে লজ্জা দিয়ে চট করে গলাটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু এবার কেন যাচ্ছে তা জানিস?"

এরপর একটা লাগসই রহস্যময় উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেবার কথা ছিল আমার। সেই সঙ্গে ঘনাদাকে উসকে দেবার মতো ঝাঁঝালো কিছুর ফোড়ন দেওয়ার ভারও ছিল আমার ওপর।

কিন্তু বারবার ঘনাদাকে তাতাবার চেষ্টায় হার মেনে মেজাজ তখন আমার বিগড়ে গেছে। শিবুর গোপন খবরটার সব রহস্য আমি ঠাট্টার সুরে নস্যাৎ করে দিয়ে বললাম, "যাচ্ছে কেন আবার? যাচ্ছে স্কেটিং ক্লাব খুলতে?"

"স্কেটিং ক্লাব!" আমার আচমকা বেয়াড়াপনায় বেশ বিরক্ত হলেও শিবুর হতভম্ব গলা দিয়ে আপনা থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, স্কেটিং ক্লাব।" আমি এবার বোঝালাম, "হাজার হাজার মাইল জমা বরফের

মাঠ পড়ে আছে। যেখানে যতদূর খুশি স্কেটিং রিং বসাও। শুধু জাহাজ থেকে উঠে বা প্লেন থেকে নেমে পায়ে স্কেটের জুতো জোড়া পরার অপেক্ষা, আর—"

"থামো!" এক ধমকে আমায় চুপ করিয়ে দিয়ে শিশির রহস্যটাকে নিজের মতো করে পাক দিতে চেয়ে বললে, "ও সব স্কেট-টেট-এর বাজে ফক্কুড়ি নয়। আসলে আমাদের দ্বিতীয় অভিযান যাচ্ছে অ্যান্টার্টিকায় শেয়াল ছাড়তে!"

"শেয়াল ছাড়তে!" বলে যে বিস্ময়টা প্রকাশ করতে যাচ্ছিলাম তা শুরু করেই থামতে হল।

শিশিব তখন সবিস্তারে নিজের বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। রহস্যটা সরল করে বললে, "হ্যাঁ, যাচ্ছে শেয়াল ছাড়তে। ছাড়তে যাচ্ছে কোন শেয়াল? না আমাদের এই হুক্কা-হুয়া-ডাকা শেয়াল নয়। উত্তর মেরুর সেই তুষারধবল রেশমি পশমের খেঁকশেয়াল যার ফার, মানে পশমি চামড়া হিরে মুক্তোর চেয়ে দামি। দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার কোনও প্রাণী তো নেই। উত্তর মেরুর এই শেয়াল সেখানে ছাড়লে তাই দেখতে দেখতে হাজারে হাজারে বেড়ে উঠে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ মানে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ওই যাকে বলে গোপালের দধিভাণ্ড হয়ে উঠবে।"

আমরা যে যাই বলি, আড়চোখে নজরটা ঘনাদার দিকে ঠিকই থাকে। শিশিরের আজগুবি শেয়াল-চাষের পরিকল্পনা শোনার মধ্যেও তাই ছিল। শিশির যা গুলবাজি শুরু করেছিল, ঘনাদা তা থেকে অবলীলাক্রমে একটা ফ্যাকড়া টেনে বার করে পেঁচিয়ে তুলতে পারতেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুতে ওই সাদা শেয়াল চালান থেকে সেখানে পেঙ্গুইনের পোলট্রি বানিয়ে দুনিয়ার খাদ্য সমস্যার সুরাহা করবার পরিকল্পনা কেন হালে পানি পেল না, তার একটা জমজমাট বিজ্ঞান-রহস্যের ফোড়ন দেওয়া গল্প ফাঁদবার এমন সুযোগ পেয়ে তাঁর তো ঝাঁপিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু সেরকম কোনও চিড়িবিড়িনির লক্ষণ না দেখে গৌর আরও কড়া পাঁচন গুলল।

"কী যা তা বকছিস!" বলে শিশিরকে থামিয়ে দিয়ে একেবারে যেন ঘোড়ার মুখের খবর বার করে এনে গৌর বললে, "আমাদের দক্ষিণ মেরু অভিযানে লক্ষ্য কী তা জানিস?" তারপর আমাদের ঠিক মাত্রা মাফিক কয়েক সেকেন্ড উৎকণ্ঠায় রেখে রহস্যটা প্রকাশ করে বললে, "লক্ষ্য হল ফাটল খোঁজা।

"ফাটল খোঁজা?" আমাদের এবার আর হতভম্ব হবার ভান করতে হল না। কারণ গৌর এইমাত্র যা ছাড়লে তা আমাদের রিহার্সেল দেওয়া চিত্রনাট্যের বাইরে। স্ক্রিপ্ট পালটালেও গৌর তার বেলাইনে যাওয়া সার্থক করে তুলে বলল, "হ্যাঁ, ফাটল! কেন ফাটল, কোন ফাটল তাও বুঝতে পারছ না?"

নীরবে মাথা নেড়ে আমাদের অজ্ঞতা স্বীকার করতে হল।

"নারলিকার-এর নাম শুনেছিস?" গৌর যথোচিত মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে এবার জিজ্ঞাসা করলে, "নারলিকার আর হয়েল-এর নাম?"

শোনা থাক আর না থাক, এখন বোকা সেজে মাথা নাড়তে হল। "যাক, শোনোনি যখন, শুনে নাও," গৌর রীতিমত গুরুগিরির চালে বোঝালে, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

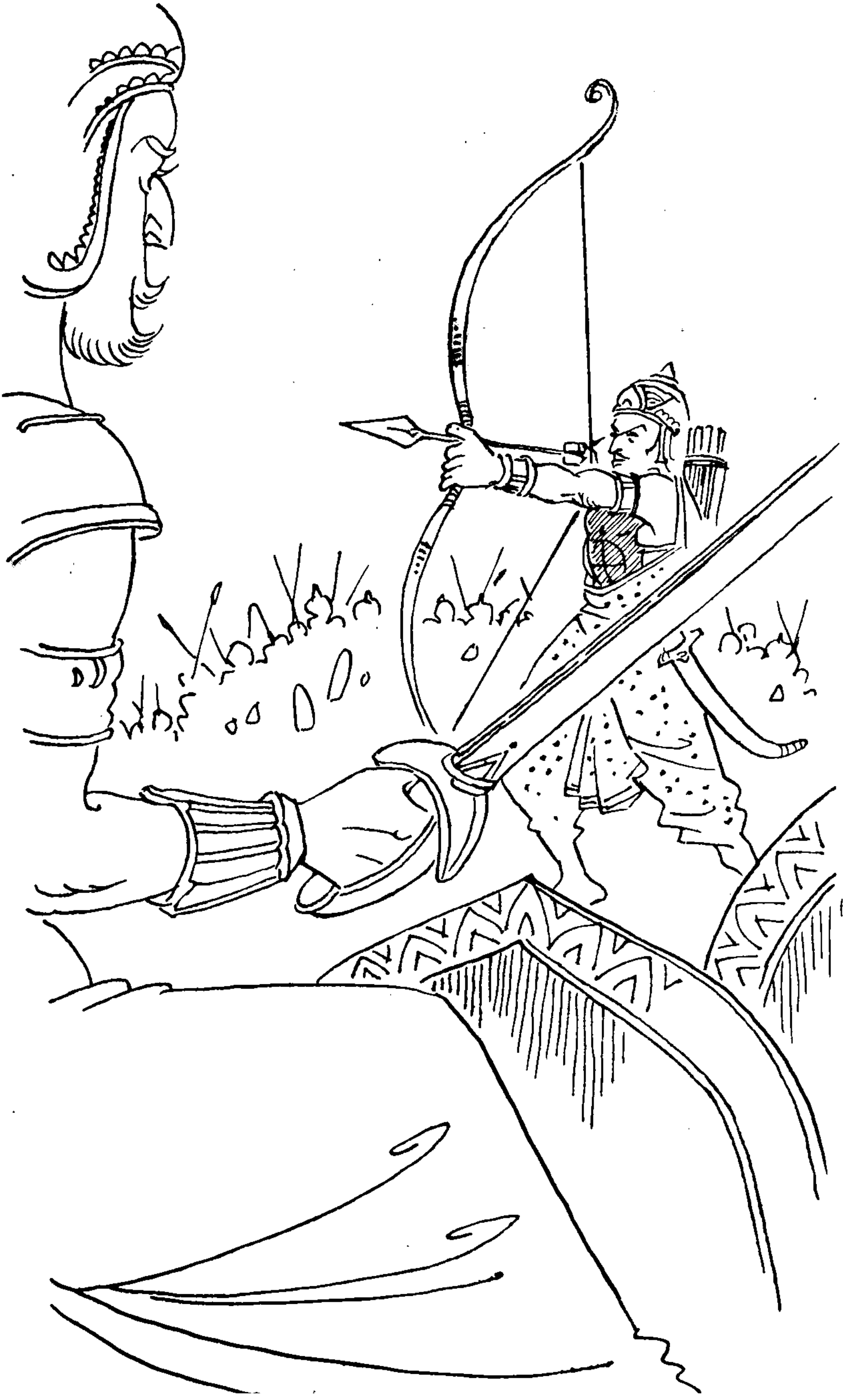

সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ওই দুজনের নাম একেবারে সবার ওপরের সারিতে। এই দুজনের মধ্যে হয়েল হলেন ইংরেজ আর নারলিকার ভারতীয়। এই নারলিকার কী বলছেন, শোনো। বলছেন যে আমাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণই কমে যাচ্ছে, সূর্য থেকে সরে আসতে আসতে তাই ফেঁপেফুলে আরও বড় হতে থাকার মধ্যে তার খোলসে প্রথম ফাটল ধরবে এখানে সেখানে আর তারপর সেইসব ফাটল থেকে ঠেলে বার হতে থাকবে নতুন মহাদেশ হয়ে ওঠবার মতো পৃথিবীর ভেতরকার পাথুরে মালমশলা!"

গৌরকে মনে মনে তারিফ করে ঘনাদার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে আমরা হতভম্ব গলায় কোনওরকমে যেন বললাম, "এমন ভয়ানক কাণ্ড!"

"হ্যাঁ," গৌর গলায় প্রলয়ের হুমকির ভয়-বিহ্বলতা মাখিয়ে বললে, "একেবারে সর্বনাশা ব্যাপার! পৃথিবীতে প্রাণের জগতের শেষ যবনিকা পতন না হোক, সম্পূর্ণ পালাবদল নিশ্চয়ই। এই সৃষ্টি ওলটানো ব্যাপার এখনই শুরু হয়েছে কিনা তা বোঝবার হদিস ওই ফাটল। সে ফাটল প্রথম কোথায় ধরবে?"

গৌর নাটকীয়ভাবে থামল। কিন্তু কোথায় কী? এমন একটা পাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া খেই যাঁর লুফে নেওয়ার কথা, তিনি দেহটাই শুধু আমাদের আড্ডাঘরে রেখে আর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

আশাভরে পাঁচ সেকেন্ড আন্দাজ অপেক্ষা করে গৌরকেই আবার শুরু করতে হল। বললে, "পাকা ফলের বেলা যেমন তেমনই পৃথিবীর প্রথম মাথা আর তলার দিকে অর্থাৎ কিনা দুই মেরুর কোথাও। কিন্তু উত্তর মেরু তো ভাঙা নয়, জমা বরফের রাজ্য। সেখানে হরদম এখানে-সেখানে ফাটল ধরছে আর জোড়া লাগছে। আসল ফাটলের আগে একটুআধটু চিড়ধরা সেখানে বোঝার কোনও উপায় নেই। মোক্ষম ফাটলের আগে তো একটু চিড়ধরা ধরতে পারাই সবচেয়ে বড় কথা, আর তা ধরতে যেতে হবে সেই দক্ষিণ মেরুতে। আর শুধু গেলেই তো হবে না। সেই সৃষ্টিনাশা চিড় চেনবার মতো বৈজ্ঞানিক বিদ্যেবুদ্ধি বিচক্ষণতা তো চাই-ই, সেই সঙ্গে চাই যমের দক্ষিণ দুয়ারের সমান সেই অ্যান্টার্টিকার চিরতুষারের বিপরীত মেরুতে টহল দিয়ে টিকে থাকবার ক্ষমতা।"

"এ মণিকাঞ্চন যোগ তো অসম্ভব বললেই হয়।" শিবু গৌরকে একটু দম নেবার ফুরসত দিয়ে সলতের আগুনটা উসকে দিলে।

"ঠিক তাই!" আড়চোখে একবার যথাস্থানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গৌর আবার শুরু করলে, "বিজ্ঞানের ধুরন্ধর যদি বা মেলে, মেরুবিজয়ী বাহাদুর পাচ্ছে কোথায়? আমাদের দক্ষিণ মেরু অভিযানের কর্মকর্তারা তাই হন্যে হয়ে সারা দুনিয়ায় খোঁজ চালিয়ে হয়রান হচ্ছেন।"

গৌর তাল বুঝে ঠিক সমের মাথায় থামল। ঘরের সবাইও উদগ্রীব আগ্রহে চুপ। এমন একটা মোক্ষম মুহূর্ত কি বিফলে যাবে?

শিশির আর ধৈর্য ধরতে না পেরে সলতেটা ধরিয়ে দিলে। যেন অবাক হয়ে বললে, "কেন? আসল লোকের নামই তাদের মনে পড়ল না? ঘনশ্যাম দাস নামটা তারা শোনেনি?"

আমরা আবার সব চুপ। এবার আর বারুদের সলতে নেতিয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু কোথায় কী?

বারুদের সলতের নয়, আওয়াজ একটা যা পেলাম তা সিগারেট ধরাবার জন্য ঘনাদার দেশলাই জ্বালবার।

এরপর আর নিজেকে সামলে রাখা যায়? মেজাজটা অনেকক্ষণ থেকেই খেঁচড়ে ছিল। এখন একেবারে চিড়বিড়িয়ে টিটকিরি হয়ে বার হল, "কী বললে? ওরা খোঁজ করবে ঘনশ্যাম দাসের? ভীষ্ম দ্রোণ গেল তল শল্য শেনাপতি?"

"হুঁঃ—হুঁঃ—হুঁ—হুঁ—"

না, মেঘের গুড়গুড়ুনি নয়, গলা খাঁকারি এবং গলা খাঁকারি আর কারও নয়, স্বয়ং তাঁর।

হ্যাঁ, ঘনাদাই গলা খাঁকারি দিয়ে এবার সরব হলেন। বেশ একটু ভারী গলাতেই শোনালেন—"ভীষ্ম দ্রোণ গেল তল শল্য সেনাপতি? কেমন?"

ঘনাদার ভারী গলার আবৃত্তিতে কি একটু কান-মলা গোছের মোচড়?

ঠিক বুঝতে না পেরে নীরব হয়েই রইলাম।

ঘনাদাই আবার বললেন, "অর্থাৎ হাতি-ঘোড়া হার মানল, রথ টানবে ছাগল! বচনটা এ রকমও হতে পারে!"

হাওয়াটা ঠিক কোনমুখো, তা বুঝতে না পারলেও শিবু আলাপটা নেহাত চালু রাখবার জন্যই বললে, "হ্যাঁ, তা তো পারেই। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন—তখন সব মহা মহা বীরই খতম হয়ে গেছে, তাই নেহাত নাচার হয়েই তিনি শল্যকে সেনাপতি করেছিলেন তো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল তখন তিনি ভাল করেই বুঝে ফেলেছেন। শল্যের মুরোদ জানতে তো তাঁর বাকি ছিল না।"

"হ্যাঁ," ঘনাদা যেন সায়ই দিলেন শিবুর কথায়—"শল্যের মুরোদ আরেকজনও ভাল করেই বুঝেছিলেন, তাঁর ধারণাটাই শোনা যাক। তিনি বলেছিলেন, 'ও-ই বীর বিপুল বলশালী মহাতেজস্বী বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার মনে হয়, উনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণ-বিশারদ। উঁহার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও লক্ষিত হয় না।'"

ঘনাদা গম্ভীর মুখে ইচ্ছে করেই কিছু যেন উহ্য রেখে থামলেন। নিজেদের মধ্যে বারকয়েক মুখ চাওয়াচাওয়ির পর আমিই সকলের হয়ে মনের সংশয়টা প্রকাশ করলাম স্পষ্ট করেই। বললাম, "শল্য সম্বন্ধে এরকম ধারণা সত্যি কারও ছিল নাকি? তা ধারণাটা কার? আর পেলেন কোথায়?"

"কোথায় পেলাম?" ঘনাদা অজ্ঞতা যেন ক্ষমা করে বললেন, "পেলাম স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখা মূল মহাভারতে।"

"মূল মহাভারতে এ কথা আছে?" আমি অবজ্ঞাভরে বললাম, "তা হলে দুর্যোধনের কোনও মোসাহেব ভাঁড়-টাঁড়ের নিশ্চয়। ব্যাসদেব আবার সে কথা লিখে রেখে গেছেন, এটাই আশ্চর্য।"

"না, ধারণাটা দুর্যোধনের মোসাহেব কোনও ভাঁড়টাঁড়ের নয়।" ঘনাদা গম্ভীর

হয়েই জানালেন, “কিন্তু ধারণাটা যাঁরই হোক, শুনে হাসি পাবার মতো খুব কি উদ্ভট আজগুবি? শল্য কি কুরুক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা নয়?”

আমাদের ধাতস্থ হবার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় দিয়ে ঘনাদা নিজেই আবার আরম্ভ করলেন—“কৌরব পক্ষের ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কি পাণ্ডব পক্ষের অর্জুন তো শুধু ধনুর্ধারী বীর। আর ওদিকে দুর্যোধন আর এদিকে ভীম গদাযুদ্ধে ওস্তাদ। কিন্তু শল্যের কথা ভাবো দেখি। ধনুক বা গদা কি যে অস্ত্র হাতে দাও, তাতেই সমান ওস্তাদ। শুধু তো তাই নয়। কুরুক্ষেত্রের সবার সেরা যোদ্ধারা তো শুধু অস্ত্র চালাতেই পারতেন, কিন্তু শল্য ছাড়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো রথ চালাবার ক্ষমতা ছিল আর কার? দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করায় অন্যেরা যে যাই হাসি তামাশা করুক, পাণ্ডব পক্ষের বিচক্ষণ সমঝদারেরা প্রমাদ গনেছিলেন।”

“তার মানে!” গৌর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, “শল্য সেনাপতি থাকলে দুর্যোধনেরই কুরুক্ষেত্রে জিৎ হবার কথা।”

“তাই তো মনে হয়।” ঘনাদা যেন সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। “না হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অমন চিন্তিত হবেন কেন? যোদ্ধা হিসাবে শল্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার কথা জানিয়েছি তা আর কারও নয়, শ্রীকৃষ্ণেরই।”

তোয়াজ তোষামোদের বদলে প্রথমেই যাতে কাজ হয়েছে, সেই উলটো খোঁচাই আবার একটু লাগানো উচিত মনে হল। ঘনাদার মতই নাসিকাধ্বনি করে বললাম, “হ্যাঁ! শ্রীকৃষ্ণের ধারণা! ওঁর ধারণা, না ধাপ্পা।”

“ধাপ্পা! শ্রীকৃষ্ণের ধারণাকে বলছিস ধাপ্পা!” ঘনাদার হয়ে গৌরই তলোয়ার তুলল।

“হ্যাঁ, রসিকতা করে ধাপ্পা!” রীতিমত গম্ভীর মুখে বললাম, “রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সেদিকে তো গুণের ঘাট নেই। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের পর শল্যকে সেনাপতি হতে দেখে যুধিষ্ঠিরের কাছে তাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছেন।”

“না, ঠাট্টা করেনি!” যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক সেই মতো ঘনাদারই চাপা গর্জন শোনা গেল—“রীতিমত ভাবিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে শল্য সম্বন্ধে নিজের মতটা জানিয়েছেন।”

“তা জানালেই বা হয়েছে কী?”—আমিও পিছু হটবার পাত্র নই, “শ্রীকৃষ্ণ বললেই শল্য মহাবীর হয়ে উঠবে নাকি? যার গাড়োয়ানি করে শল্যের মহাভারতে জায়গা সেই কর্ণ শল্য সম্বন্ধে কী বলতেন জানেন?”

“জানি।” ঘনাদার গলার ঝাঁজটা খুশি করবার মতো—“শল্য কর্ণের সারথি হতে রাজি হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে গোপন বোঝপড়ার দরুন কর্ণকে উঠতে বসতে টিটকিরি দিয়ে জ্বালিয়ে মারতেন। তিতিবিরক্ত হয়ে কর্ণ তাই মাঝে মাঝে তার শোধ তুলতে চাইতেন শল্যকে গালাগাল দিয়ে। কিন্তু সে গালাগাল তো শল্যের জাত তুলে নিন্দে। শল্য তো পাণ্ডব কৌরবদের মতো সিন্ধুনদ পার হয়ে আসা আর্যবংশধর নন। তাঁকে সেকালের বেলুচি বলা যায়। এখন যেখানে বেলুচিস্তান, সেই অঞ্চলেই ছিল তাঁর রাজত্ব। আর্যয়ানার খুঁতখুঁতে গোঁড়ামি তাঁদের ছিল না। তাঁরা

পোশাক-আশাকে কার্পাসের তুলোর ধার ধারতেন না। ভেড়ার উটের লোমের মিহি মোটা কম্বলেই তাঁদের পোশাক তৈরি হত আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সিন্ধু পার হওয়া আর্যদের মতো গোঁড়ামির বাছবিচার তাঁদের ছিল না—গোরু ভেড়া সব মাংসেই তাঁদের ছিল সমান রুচি। এ সব নিয়ে কর্ণের গালাগাল তাই গায়ে লাগেনি শল্যের। এ সব তো তাঁদের জাতের আচারবিচার নিয়ে নিন্দে। তাঁর বীরত্বের বিষয়ে উপহাস কি ধিক্কার তো তাতে নেই।"

"বীরত্ব তো তাঁর ভারী!"—খোঁচা দিতে এখনও ছাড়লাম না। "ভীম অর্জুন, এমনকী নকুল সহদেবও নয়, কুপোকাত হলেন তো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হাতে, ভাল করে ধনুক ধরতেও জানতেন কি না সন্দেহ!"

"হ্যাঁ, মারা গেলেন যুধিষ্ঠিরের হাতে।" ঘনাদার গলা এবার জলদগম্ভীর—"একমাত্র যাঁর হাতে ছাড়া শল্যের আজগুবি হার আর মরণ সম্ভবই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব তাই আর কাউকে নয়, নাছোড়বান্দা হয়ে যুধিষ্ঠিরকেই সেধেছিলেন শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে সংহার করবার জন্য।"

"কেন? কেন?"—এবার অবাক হওয়া প্রশ্নটা আমাদের সকলেরই—"আর কারওর বদলে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই এমন পেড়াপীড়ি কেন?"

"সেইটা ভেবে দেখো না!" এতক্ষণে ঘনাদার মুখে টেক্কা তুরুপের আগের মুহূর্তের হাসি। "ভীম অর্জুন থেকে শুরু করে আরও সব বাঘা বাঘা যোদ্ধা থাকতে শুধু যুধিষ্ঠিরকেই এমন সাধাসাধির কারণ কী? সারা মহাভারতে আর কারও সঙ্গে যোঝবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে একবার একটু ডাক দেওয়ার কথাও কোথাও আছে কি? শুধু শল্যের বেলা যুধিষ্ঠিরকে রাজি না করাতে পারলে শ্রীকৃষ্ণের আর শান্তি নেই। কত ভাবেই না যুধিষ্ঠিরকে তাতাচ্ছেন—"

"কিন্তু কেন?" আমাদের সেই একই প্রশ্ন—"শল্যকে শেষ করবার জন্য শুধু যুধিষ্ঠিরকেই দরকার কেন?"

"দ্রোণাচার্যকে মারবার জন্যও তাঁকে দরকার হয়েছিল—"

"না, তিনি কিছু বলেননি"—ঘনাদা একটু বিশদ হলেন—"তবে সম্মুখ-সমরটা তাঁর সঙ্গে বলেই শল্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করে আনমনা হয়েছিলেন, আর সেই ফাঁকেই যুধিষ্ঠিরের আনাড়ি-হাতের বাণও গিয়ে মর্মভেদ করেছিল শল্যের।"

"শল্যকে আনমনা করার ব্যাপারটা তা হলে কী?" আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

"ব্যাপারটা নকুল সহদেবের ঠিক মওকা বুঝে করুণ আর্তনাদ!"—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন—"শল্যবধের আগে যুদ্ধিষ্ঠিরের ভাবনাগুলো মনে করো,

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে,
দুর্জয় দেখি যে শল্য আজিকার রণে
হারিলে কি গতি হবে, পাব মহালাজ
এই মত ভাবি তবে কহে ধর্মরাজ!
চক্রব্যূহ করি মোরে দোঁহে বল রাখো।
সহদেব ও নকুল মম বামে থাকো।

বামে নয়, নকুল ও সহদেব ছিলেন যুধিষ্ঠিরের দু-পাশে, একা শল্য যখন বাঁ হাতে যুধিষ্ঠিরকে ঠেকিয়ে ডান হাতে পাণ্ডবসেনা ছারখার করছে তখন একবার নকুল আর তারপরে সহদেব, যেন হঠাৎ শল্যের বাণে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে, এমনভাবে কাতর ডাক ছেড়েছে—'মামা! মামা গো!'

শল্য যুধিষ্ঠির নিয়ে সব পাণ্ডবেরই মামা, কিন্তু হাজার হলেও নকুল সহদেব হল তাঁর নিজের মায়ের পেটের বোন মাদ্রীর ছেলে, তাই টানটা যদি তাদের ওপর একটু বেশি হয়, সেটা অন্যায় নয়। নকুল সহদেবের আর্তনাদে তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেছেন শল্য আর সেই ফাঁকে যুধিষ্ঠিরের তীর গিয়ে বিঁধেছে তাঁর বুকে। যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারও সঙ্গে যুদ্ধ হলে নকুল সহদেবের ওই নকল আর্তনাদকে শল্য কখনও সত্যি বলে ভেবে অন্যমনস্ক হতেন না। শল্যকে এই ভুল করাবার জন্যই যুধিষ্ঠিরকে এ যুদ্ধে নামাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অত পীড়াপীড়ি। নকুল সহদেবের আর্তনাদও অবশ্য তাঁরই শেখানো, আর সেটা যুধিষ্ঠিরের অজান্তে।"

"কিন্তু—কিন্তু—" আমাদের দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করতে হল—"মূল মহাভারতে এ সব কথা কোথাও আছে কি?"

"থাকা তো উচিত," ঘনাদা উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন, "তবে সব মূল পুঁথি তো পণ্ডিতদের হাতে এখনও পৌঁছয়নি!"

ঘনাদা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পাশের টিপয়টার ওপরে শিশিরের সিগারেটের টিনটাও অবশ্য নাই।

মৌ-কা-সা-বি-স—একবচন, না বহুবচন

হ্যাঁ, সবুরে মেওয়া সত্যিসত্যিই ফলে।

বারেবারে না হোক দু-চারবার তো বটেই।

আমাদের বেলা কথাটা ভালভাবে প্রমাণ হল প্রায় প্রতিটি বার।

প্রমাণ হল মৌ-কা-সা-বি-স-এর চিঠির ব্যাপারে।

এ চিঠির ব্যাপারে এবারে আমিই একটু বেশি অস্থির হয়েছিলাম। মৌ-কা-সা-বি-স-এর শেষ চিঠি এসেছিল সেই মাস ছয়েক আগে। ঘনাদাকে তাতাবার ব্যাপারে সোজাসুজি লক্ষ্যভেদ না করলেও তেরছাভাবে সেই চিঠি

যথাস্থানে খোঁচা দিয়ে ঘনাদাকে দিয়ে মহাভারতের শল্য চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা বার করিয়ে ছেড়েছিল।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর কাছে এইটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের একবারের জন্য, অন্তত একটু খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করা কি উচিত ছিল না?

কিন্তু গৌর শিশিরের তাতে ঘোরতর আপত্তি।

"না, না, কখ্খনও না!" গৌরের শাসানি। "আমাদের একটু নরম দেখলেই ওরা লেজে খেলতে শুরু করবে।"

কিন্তু আমি একটু প্রতিবাদ না জানিয়ে পারলাম না—"আমাদের দিক দিয়ে একটু সাড়া দেওয়া কি উচিত নয়! শেষে আমাদের গা নেই মনে করে ওরাও যদি কারবার বন্ধ করে দেয়। একেবারে ফুটো ঢাক তো নয়। টঙের ঘরে ওঁকে একটু আধটু নাড়াচাড়া দেবার মতো দু একটা প্যাঁচ বাতলাবার চেষ্টা তো করেছে।"

"করেছে যেমন, তেমনই আবার করবে," শিশির আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "আমরা সাড়া দিই বা না দিই, নাম যাদের মৌ-কা-সা-বি-স, আমাদের মতো মক্কেল হাতে রাখবার গরজ তাদের খুব বেশি। সুতরাং অধীর না হয়ে শুধু লেটার-বক্সটি দিনের পর দিন হাতড়ে যাও, এই তো তোমাদের বিধান।"

শিবু তর্কটাকে আর বাড়তে না দিয়ে মিটমাটের রাস্তায় গিয়ে বললে, "বেশ তা-ই মেনে নিলাম। কিন্তু মৌ-কা-সা-বি-স হঠাৎ 'ওরা' হয়ে বহুবচনের গৌরব কেমন করে পেল, একটু যদি বুঝিয়ে বলো।"

"আরে তাই তো!" আমার মতো সবাই বোধ হয় একটু চমকে উঠে ব্যাপারটা খেয়াল করল। ব্যাখ্যা কিন্তু কারও কাছে পাওয়া গেল না। এইটুকুই শুধু স্থির হল যে, এক বা অনেক যাই হোক, মৌ-কা-সা-বি-স-এর গরজ আমাদের চেয়ে বেশি বই কম নয় ধরে নিয়েই আমরা ধৈর্য ধরে থাকব, আর তার ফল ফলবেই।

সত্যিই তাই ফলল। হপ্তাখানেক যেতে না যেতেই শিবু সিঁড়ির নীচের লেটার-বক্স খুলতে গিয়ে হঠাৎ যে উল্লসিত চিৎকারটা ছাড়ল নেহাত বিকেলবেলা তাঁর নিত্য নিয়মিত সরোবর সভার টানে বেরিয়ে না পড়ে থাকলে টঙের ঘর থেকে তিনি নিশ্চয়ই শশব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগরি চটি পায়ে এক দুর্ঘটনা ঘটাতেন। শিবুর উল্লাসধ্বনিটায় অবশ্য আমরা ওপরের দালান থেকেই ঠিকই বুঝলাম যে আমাদের ধৈর্য নিষ্ফল হয়নি। আমাদের নীরবতায় অস্থির হয়ে মৌ-কা-সা-বি-স-ই নিজে থেকে প্রথমে পত্রাঘাত করেছে। চিঠি অবশ্য লম্বা কিছু নয়। দু-চার ছত্রের মাত্র। তার ওপর বিদ্রূপের খোঁচাটাই প্রধান।

কী হে বাহাত্তর নম্বরের বালখিল্যেরা!

চিঠির প্রথমেই টিটকারি দেওয়া সম্ভাষণ। সেই সুরেই লেখা—

সবাই একেবারে ভোক্কাটা হয়ে গেছ মনে হচ্ছে! টঙের ঘরের তাঁর লেঙ্গিতে বুঝি

সবাই কাত। তা সুবুদ্ধি না নিলে কাত তো হবেই। সেই মৌ-কা-সা-বি-স-এর কাছে হাত পাততে এখনও মান যায় বলে আর একটা ফাঁদ নিজে থেকেই বাতলে দিচ্ছি। দিচ্ছি মিনি মাগনা। এ ফাঁদের ফাঁস ঠিক মতো টানতে পারলেই ষোলো আনা বাজিমাত। সুড়সুড় করে নিজের গরজে এসেই ধরা দেবে। দুনিয়ার সবাইকার হাহাকার কী নিয়ে? হাইড্রোকার্বন। অতলে পাতালে নয়, সেই সাত সমুদ্রে সাত হাজার রাজার রাজ্যের ধন নদী-নালা-পুকুর-ডোবার কচুরিপানার মতো জোলো ডাঙার আগাছায়। নাম ধরো কচুরিপানার ভাই কচলি ঝাঁটি। শুধু কচলিই বলো না।

জলাবাদার বুনো আগাছা তো নয়, তার মধ্যে কুবেরের দৌলতখানা। কিন্তু সিন্দুকে কুলুপ দেওয়া। সে কুলুপ কে খুলবে? খোলার আঁক যে কষে ফেলেছে গেঁয়ো যুগী বলে সে ভিখ পায় না।

ওদিকে রাক্ষস-খোক্ষসদের দেশের দুশমনরা লোভে লোভে ঠিক এসে পড়েছে কচলির মুল্লুকে।

কচলি-কুলুপ খোলার মন্তর সমেত খোদ গুণী কারিগরকেই যারা এ মুলুক থেকেই পাচার করবার প্যাঁচ করেছে, তার কিছু জানেন কি আমাদের টঙের ঘরের তিনি। একটু খুঁচিয়েই দেখুন না!

ব্যস, চিঠি ওইখানেই শেষ।

মৌ-কা-সা-বি-স-এর নামে এ চিঠি কে পাঠিয়েছে? কে, না কারা? এ চিঠি নিয়ে কী করব আমরা এখন?

আমরাও ভাবনায় পড়েছি। কিন্তু ঘনাদাকে খোঁচা দেবার মতো কোনও ফিকির এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ঘনাদাকে কীভাবে খুঁচিয়ে তাঁকে দিয়ে যা বলাতে চাই তা বলাব তাই ভেবে বার করতে তিন দিন তিন রাত্রি আমাদের ঘুম নেই। এক-আধটা নয়, চার মূর্তিমান আমরা চার পাঁচে অমন কুড়িটা ফন্দি এঁটে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। কিন্তু কারওর কোনও ফন্দিই শেষ পর্যন্ত যাকে বলে পুরোপুরি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেল না।

গোড়াতেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে একেবারে সর্বসম্মতিক্রমে না হলে কোনও ফন্দিই মঞ্জুর বলে গ্রাহ্য হবে না।

মুশকিল হল সেখানেই।

দুজনে যেখানে একমত হয়ে একটা প্রস্তাব তোলে বাকি দুজন সেখানে ঘাড় হেলাতেই চায় না।

বিশেষ করে আমার বেলা দেখলাম মেজরিটি সবসময়ে আমার বিরুদ্ধে।

অথচ কী ভালভাবে একটা প্যাঁচই না মাথা থেকে বার করেছিলাম।

আমাদের লোকসভায় সেটার একটা ইশারা দিতে না দিতে সবাই যেখানে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ধন্যিধন্যি করবার কথা সেখানে কিনা সকলের একসঙ্গে গা-জ্বালানো হাসি আর টিটকিরির ধুম!

আচ্ছা, আমি বিচক্ষণজনেদের কাছে আমার প্রস্তাবটা পেশ করছি সুবিচারের

জন্য। তাঁরাই বলুন, আমার ভেবে বার করা ফন্দিটা কি হেসে উড়িয়ে দেবার মতো কিছু! আমি বলেছিলাম কি যে বিকেলের আড্ডার ঘরে সবাই আমরা একটা করে ছোট থলিতে মাঠেঘাটে পার্কে-পার্কে ময়দানে ঘুরে জোগাড় করা আগাছা নিয়ে গিয়ে হাজির হব একদিন। সব টিপয় আর টেবিলের ওপর আগাছা থাকবে ছড়ানো, দেওয়ালেও টাঙানো থাকবে কিছু কিছু। আর সেখানে প্ল্যাকার্ড ঝুলবে বড় বড় হরফে, 'আগাছা দিবস' লেখা।

এরপরে আর যা যা করবার বুঝিয়ে বলবার আর অবসর মেলেনি।

"আগাছা দিবস!" সবাই একেবারে হেসে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় আর কী?

যত আমি তাদের থামিয়ে নিজের প্ল্যানটা বিশদভাবে জানাতে চাই ততই তারা এক-একবার করে "আগাছা দিবস" বলে হেসে লুটোপুটি খায়।

"ঠিক! ঠিক!" শিবু আবার গম্ভীর হবার চেষ্টা করে ডবল খোঁচা দিয়ে বলে, "কত রকম দিবসের কথাই না শোনা গেছে এতদিন—বিদ্যুৎ-দিবস, শিক্ষা দিবস, কলের জল দিবস, ডালমুট—"

শিবুকেও আর এগোতে হয়নি।

গৌর শিশিরই তাকে বাধা দিয়ে বলেছে, "ডালমুট দিবস আবার কী!"

"কী আবার?" শিবু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে, "ডালমুট আর আগের মতো মুচমুচ করছে না, সেই নালিশ জানাবার দিবস।"

"ঠিক! ঠিক!" শিশির গৌর শিবুকে সমর্থন করার জন্যই বলতে শুরু করেছে, "ডালমুট দিবসের মতো ফুচকা দিবস, ডালপুরি দিবস, চুল ছাঁটা দিবস—"

এবার বাধা দিয়েছে শিবুই, "চুল ছাঁটা দিবস মানে? সে আবার কী?"

"সে আবার কী, জানো না?" গৌর বুঝিয়ে দিয়েছে! "মানে লম্বা চুল রাখার নতুন হুজুগে সেলুন আর প্রাইভেট নাপিতদের দিন খারাপ গেলেও আমাদের মাঝে মাঝে ক্ষৌরির পয়সা বাঁচছিল। ফের ধীরে ধীরে চুল ছাঁটার রেওয়াজ চালু হচ্ছে বলে আমাদের পকেটে টান পড়তে শুরু করেছে। চুল ছাঁটা দিবস মানে তাই আবার লম্বা চুলের রেওয়াজ চালু করার আন্দোলন—বুঝলে!"

এমনই সব 'দিবস' খুঁজে বার করার হুজুগে আমাকে ছেড়ে দিলেও আসল কাজ আমাদের এগোয়নি। টঙের ঘরের তাঁকে গরম করে তোলবার মতো খোঁচা ভেবে বার করবার কথাটা ভুলেই গেছি সবাই। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাতে ক্ষতি হয়নি কিছু।

অর্থাৎ ঘনাদাকে খোঁচা দেবার দরকারই হয়নি মোটে।

হ্যাঁ, ঘনাদা কখনও কখনও অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠে কল্পতরু বনে যান। তখন তাঁকে আর খুঁচিয়ে জাগাতে হয় না। 'হ্যাঁ' 'না' করতেই তিনি যেন মনের কথা আঁচ করে ফেলে আশা মিটিয়ে ঝুলি ভরে দেন।

আমাদের বেলাও তাই হল এক রকম অযাচিতভাবে।

এবারে বৃষ্টিটা দেরি করে এসে আর যেতেই যেন চাইছে না।

আকাশ বেশ পরিষ্কার আর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস 'দিনটা আজ শুকনোই

যাবে' শুনে ছাতা না নিয়ে বেরিয়ে হঠাৎ-এসে হঠাৎ-চলে-যাওয়া বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে স্নান করে ফিরতে হবে।

ছুটির দিন হলেও ঘনাদাকে বাগ মানাবার উৎসাহে আমরা কেউ বাইরে কোথাও যাইনি।

কিন্তু ঘনাদা তাঁর বিকেলের সরোবরসভার টানে যথাসময়ে বেরিয়ে হঠাৎ-নামা জোরালো বৃষ্টির পশলাটার মধ্যে আর ফিরতেই পারেননি।

এ বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে দাঁড়কাকটি হয়ে আসবেন বুঝে আমরা তার উপযুক্ত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করতেও ভুলিনি।

দিনটা অবশ্য খুবই গরম হবার হুমকি দিয়েই শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ সকালের আবহাওয়া সংবাদে আগের দিনের তাপমাত্রা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে জানিয়ে গরমটা আজ বাড়বার আশঙ্কাটাই ব্যক্ত করেছিল। এই খাঁ খাঁ রোদের দিনের গরমে হাঁসফাঁস করা বিকেলে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই জলযোগের ব্যবস্থাই করেছিলাম প্রথমে। ফ্রিজে জমিয়ে তরমুজের ফালি, গাছপাকা পেঁপের টুকরো, মজঃফরপুরের সেরা সরেস লিচু, আমের মরসুম পার হয়ে গেলেও অনেক খুঁজে পেতে আসলি চৌষা আম, গেলাস ভর্তি মৌসম্বির রস আর সেই সঙ্গে চর্ব্যচোষ্য হিসেবে নাটোরের জাত ময়রার কাঁচাগোল্লা, বাগবাজারের রসোমালাই আর লেডিকেনি।

এ সবের সঙ্গে নোনতা হিসেবে আর কী দেওয়া যায় যখন ভাবছি তখনই শুরু হল এই এক নাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি তো নয়, আকাশ যেন একেবারে ভেঙে পড়ল শহরের ওপর আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যারোমিটারের পারা কিছু না হোক ন-দশ ডিগ্রি দিলে নামিয়ে।

ঘনাদা তাঁর সরোবরসভা থেকে সময়মত যদি সরে পড়তে পেরেও থাকেন তবু এই বৃষ্টিতে কী মন মেজাজ নিয়ে তিনি যে ফিরবেন তা অনুমান করে তখুনি মেনু পালটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাতিল হয়ে গেছে তরমুজ আর পেঁপে, খরমুজা আর কাঁচাগোল্লা, রসোমালাই। তার জায়গায় তাড়াতাড়িতে যতদূর পারা যায় সেইমত কবিরাজি কাটলেট, শামিকাবাব, মোগলাই পরোটা আর কাশ্মীরি কোপ্তার ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু এ সব কিছুরই যে দরকার ছিল না তা তখন আর কেমন করে বুঝব!

প্রথমত আমাদের সকলকে অবাক করে ঘনাদা এলেন ভিজে দাঁড়কাকটি হয়ে নয়, রেনকোটে আপাদমস্তক ঢেকে একেবারে শুকনো খটখটে অবস্থায়। আর এসেই কথায় বার্তায় মেজাজে বুঝিয়ে দিলেন যে আজ তিনি একেবারে কল্পতরু হয়েই ফিরেছেন।

নীচে থেকে দোতলায় এসে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ি দিয়ে সোজা তিনি তাঁর টঙের ঘরেই চলে যাবেন ভেবেছিলাম। তার বদলে তিনি রেনকোট গায়ে দিয়ে সোজা আমাদের আড্ডাঘরেই এসে ঢুকলেন আর তারপর বর্ষাতিটা গায়ে দিয়েই তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারাটায় বসে বললেন, "কই হে, এমন বর্ষার বিকেল আর

তোমাদের সঙ্গত নেই কেন?”

‘সঙ্গত মানে?’ প্রশ্নটা আমাদের করবার দরকারও হয়নি। তার আগে নিজেই উৎসাহভরে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “এমন বাদলা বিকেলের সঙ্গত হল মুচমুচে মুড়ি বুঝেছ! ওই তোমাদের যেমন তেমন চালে নুন মাখিয়ে ভেজে কুলোনো চটের বস্তার মুড়ি নয়, রীতিমত আসল মুড়ির চাল থেকে তৈরি করে শুকোনো আর তারপর পাকা হাতের ঝাঁটা খুন্তিতে বালির কড়াইয়ে ভেজে তোলা শিউলির মতো সাদা আর হালকা মুড়ি। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। মুখে দিলে মিলিয়ে যায়।”

“আজ্ঞে, মুড়ি মানে”—আমরা অপরাধীর মতো নিজেদের গলতির কৈফিয়তটা দেবার চেষ্টা করেছি—“আমরা বাদলার দিন বলে কবিরাজি কাটলেট আর শামিকাবাব—”

“বেশ করেছ! সে বেশ করেছ!” আমাদের কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনাদা বলেছেন, “ও সবই ভাল। কিন্তু মুড়ির কাছে কিছু নয়। মুড়ি আর ফুলুরি। গরমগরম ফুলুরি। ওই যে আসবার পথে গলির মোড়ে ভাজতে দেখে এলাম।”

ঘনাদা মুড়ি আর ফুলুরির গুণগান চালাবার মধ্যে বনোয়ারিকে পাড়ার তেলেভাজার দোকানে পাঠিয়ে দিতে হল।

বনোয়ারি দোকান থেকে ফিরে আসার পর বড় জামবাটি ভর্তি সে মুড়িফুলুরি তো বটে, সেই সঙ্গে আগের আনানো কাটলেট কাবাব ইত্যাদিও পর পর পরিষ্কার করার মধ্যে ঘনাদার এই বিরল বদান্য মেজাজের কী করে সুযোগ নেওয়া যায় সবাই মিলে তাই তখন ভাবছি।

এখন কি হঠাৎ যেন সুন্দরবনে বেড়াতে যাওয়ার শখ হয়েছে বলে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু করব!

না, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গাছ-গাছড়া নয়, স্রেফ আগাছাদের একটা বিশ্বকোষ কোথাও আছে কি না খোঁজ করার উৎসাহ দেখাব।

কিছুই এসব করতে হল না।

ভাগ্য যেন আমাদের ওপর সদয় হবার জন্য ঘুমিয়েই ছিল। ক্যারমবোর্ডে স্ট্রাইকারের এলোপাতাড়ি মার-এ ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে ঠোকাঠুকি হতে হতে লাল ঘুঁটিটাই পড়ল গিয়ে এক পকেটে।

কোনও মতলব-টতলব নিয়ে নয়, বনোয়ারির আনা মুড়িফুলুরির, বিশেষ করে মুড়ির, আজগুবি দাম শুনে গৌর বুঝি অবাক হয়ে বনোয়ারিকে বলেছিল, “আরে, বলছে কী! মুড়িমিছরির একদর ছিল একটা ঠাট্টা! এখন তাও যে মিথ্যে হতে চলেছে। মুড়ির দাম মিছরিকেও যাচ্ছে ছাড়িয়ে।”

“আর যাবে না!”

অবাক হয়ে ঘনাদার দিকে চাইতে হল।

আমাদের এই তুচ্ছ কথাবার্তায় ঘনাদা টিপ্পনি কাটছেন! আর কী সে টিপ্পনি? তার মানেটাই বা কী?

“আর যাবে না মানে?” জিজ্ঞাসা করতেই হল ঘনাদাকে।

"মানে, ওসব চড়া-টড়ার পালা এবার শেষ। এবার নামবে। দেশের সুদিন এবার ফিরছে।"

"সুদিন ফিরছে বলছেন দেশের?" ধরবার হাতলটা পেয়ে গিয়ে আমরা আর ছাড়ি না।

"দেশ বলতে যদি আমাদের এই বাংলা বলেন"—শিশির আলাপটাকে যেদিকে দরকার সেই দিকেই মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়—"তাহলে বলব এমন পোড়া কপাল আর কারওর আছে!"

"পোড়া কপাল বলব আমাদের এই বাংলার?"—ঘনাদার অপেক্ষায় না থেকে আমরাই ধুনিটায় হাওয়া দিয়ে যাই।

"পোড়া কপাল নয়!" গৌর শিশিরের হয়ে ব্যাখ্যাটা শোনায়—"এই যে দেশের সব বড় বড় নদী—সব নদীর মোহনা থেকেই শুনছি—তেল ওঠবার প্রচুর আশা দেখা যাচ্ছে। যাকে বোম্বে হাই বলি সেখানে উঠছেই, তা ছাড়া ওই কৃষ্ণা গোদাবরী নর্মদা সব নদীর মোহনায় নাকি একবার ঠিক মতো নল নামাতে পারলেই কলকল করে তেল উঠবে।"

"আর আমাদের এই পোড়া বাংলার?" আমি খেইটা ধরে নিয়ে চালিয়ে যাই—"এমন গঙ্গাভাগীরথীর মোহনা থেকে কোনও সুখবর এখন পর্যন্ত এসেছে? পাবার মধ্যে পেয়েছি একটা খুদে দ্বীপ, দ্বীপ না বলে তাকে একটা চড়া বললেই মানায়। ভাল করে ডাঙার ঘাসও সেখানে এখনও জন্মায়নি, তেলের জন্য খোঁড়াখুঁড়ির কোনও কথাই সেখানে ওঠেনি।"

"না ওঠবার কারণ আছে যে!"—শিবু আমার একটু সংশোধন করে—"আমাদের গঙ্গাভাগীরথীর মোহনার দুঃখটা কী তা জানো তো! বে অফ বেঙ্গলের কালাপানিতে যেখানে এসে আমাদের মা-জননী পড়েছেন সেখানে এমন অতল-পাতাল-দেখা গভীর এক গাড্ডা—যা যুগযুগান্তের নদীর জলে বয়ে আনা পলিতেও ভরাট হতে কত যুগ যে যাবে এখনও তার ঠিকঠিকানা নেই। তাই তেলের জন্য খোঁড়ার কোনও কথাই ওঠে না। খুঁড়বেই বা কোথায়?"

"দরকার হবে না খোঁড়ার!"

আমাদের সকলের চমকে-ওঠা বিস্মিত দৃষ্টি এক জায়গায় গিয়েই স্থির হয়েছে।

না, কোনও ভুল নেই! এতক্ষণ ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকার পর ঘনাদাই এবার মুখ খুলেছেন। আর সে মুখ খোলার মহিমাটি কী? সমস্ত আড্ডাঘরটা যেন এক মুহূর্তে সম্মোহিত হয়ে গেছে। দেওয়ালেতে টিকটিকিটা ভেন্টিলেটরের ধারে বসা পোকাটাকে তাক করে গুটিগুটি পা চালাতে চালাতে থেমে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নট-নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে গেল।

"খোঁড়বার দরকার নেই, মানে?" আমরা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছি, "মানে খুঁড়ে কোনও লাভ নেই বলছেন!"

"না, বলছি, লাভ যা পাবার তা না খুঁড়েই আমরা পাব," ঘনাদা আমাদের বরাভয় দিয়ে বলেন, "অন্যেরা খুঁড়ে মরুক, আমরা শুধু কুড়োব।"

"শুধু কুড়োব!" ঘনাদা যে আমাদেরই সিনেরিয়ো মাফিক সংলাপ বলছেন তা যেন বিশ্বাস করতে না পেরে একটু বোকা সেজে বলেছি, "কী কুড়োব কী? রাস্তার নুড়িপাথর?"

"নুড়িপাথর কেন কুড়োবে?" ঘনাদা পুরোপুরি বিশদ না করে বলছেন, "যার মধ্যে সাত রাজার ধনমানিক হেলায় লুকিয়ে আছে কুড়োবে সেই অমূল্য জিনিস।"

"হেলায় লুকিয়ে আছে অমূল্য সাত রাজার ধনমানিক! সে কোন জিনিস?" আমরা যেন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "সে জিনিস আবার শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায় আমাদের এখানে এই মুল্লুকে ছড়িয়ে আছে?"

"আছে! আছে!" ঘনাদা গাঢ় গম্ভীর স্বরে ভরসা দিয়ে বলেন, "আর যাতে তা থাকে, যাতে কারও লোভী থাবা বাড়িয়ে কেউ সহজে তার নাগাল না পায় তার ব্যবস্থাই করে এলাম।"

"সেই ব্যবস্থাই করে এলেন?"

এবার আমাদের তাজ্জব হওয়াটা সিনেরিয়ো ছাড়ানো।

ঘনাদা ব্যবস্থা করে এলেন বলছেন! কী ব্যবস্থা! কীসের? ঘনাদা ওই ইশারাটুকু দিয়েই চুপ হয়ে যাবেন নাকি? 'ব্যবস্থা করে এলাম' বলে যে-নাটকের আভাসটুকু দিয়ে আমাদের ছটফটানি শুরু করিয়ে দিয়েছেন সে-নাটকের যবনিকা আর তুলবেন না নাকি! তা তোলাতে কী নজরানা তাঁকে দিতে হবে!

দিতে হল না কিছুই। ঘনাদা আজ সত্যি কল্পতরু হয়ে শিশিরের বাড়িয়ে দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে যেন নিজের গরজে বলতে শুরু করেন—"কেউ লক্ষ করেছ কিনা জানি না, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার খানিক পরেই বিকেলের অনেক আগে থেকে আমাকে আর বাহাত্তর নম্বরে দেখা যাচ্ছে না। কী! কেউ তোমরা দেখেছ তখন আমাকে—"

"না, না।" সবেগে মাথা নেড়ে চক্ষুকর্ণের সব সাক্ষ্য অস্বীকার করে ডাহা মিথ্যাটায় সায় দিতে হয়।

"দেখবে কেমন করে!" ঘনাদা প্রসন্ন হয়ে আবার শুরু করেন—"আমি তো তখন বাহাত্তর নম্বরের ধারে কাছে নেই।"

এতটু থেমে নিজের কথাগুলোর গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে ঘনাদা আবার বলেন, "তা বলে আমায় আমাদের সরোবরসভাতে দেখা গেছে যেন কেউ ভেবো না। তার বদলে আধময়লা ছেঁড়াছেঁড়া বেঢপ কোট প্যান্টালুন পরা, সুতো দিয়ে ভাঙা-ডাঁটি-বাঁধা নাকের ওপর ঝুলে-পড়া একটা নিকেলের চশমা চোখে দেওয়া এক বুড়োটে ভিখিরি গোছের মানুষ, পায়ে তালি দেওয়া ক্যাম্বিশের জুতো আর তারই সঙ্গে তাল রাখা ছেঁড়া ক্যাম্বিশের একটা ব্যাগ নিয়ে ডায়মন্ডহারবারের গঙ্গার ধারের নোঙর ফেলা একটা ছোট্ট লঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

লঞ্চটা তো গাঙের ধারে এক আঘাটায় বাঁধা। সেখানে ওই শুঁটকো টেট্যাঁস গোছের চেহারার বুড়োটে লোকটা করছে কী।

আর কিছু নয়, কাকুতিমিনতি করে কথা বলছে লঞ্চের ওপরে দাঁড়ানো এক

খালাসির সঙ্গে।

খালাসি যাকে বলছি যেমন তেমন সাধারণ খালাসি সে কিন্তু নয়। আঁটসাঁট টি-শার্ট, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গুটোনো লম্বা খাকি ট্রাউজারে তাকে খালাসির মতো দেখালেও সে বোধহয় তার চেয়ে বেশি কিছু।

প্রথমত, এদেশের মানুষই সে নয়। রোদে জলে তামাটে হয়ে এলেও সে যে আদতে সাদা চামড়ার দেশের লোক তা দেখলেই বোঝা যায়। আর সেই সাদা চামড়ায় সে এক দৈত্যবিশেষ।

যেমন তার চেহারা, মেজাজও তেমনই বিদঘুটে। চেহারায় সাদা গোরিলা আর মেজাজে একটা খ্যাপা নেকড়ে বললে কিছুটা তাকে বোঝানো যায়।

শুঁটকো বুড়োটে মানুষটা যত তাকে কাকুতিমিনতি করে বলছে, 'শুনুন, শুনুন, আমার নাম আর্কি—আর্কি ট্রেগার—'

'কী বললি! ডার্টি বেগার! শোন, ডার্টি বেগার—'

'না, না, ডার্টি নয়, আর্কি, আর বেগার নয়—'

আর্কি নামে বুড়োটে মানুষটার আর কথা শেষ করা হয় না। তাকে কথার মাঝখানেই ধমকে থামিয়ে দিয়ে সাদা গোরিলাটা বলে, 'তুই আর্কি নয়, ডার্টি বেগার। শোন হতভাগা ডার্টি বেগার, এখানে দাঁড়িয়ে আর যদি বেশি জ্বালাতন করিস তো টুঁটি ধরে তুলে এনে এই ডেকের ওপর আছড়ে গাঙের জলেই ফেলে দেব। এখনও তুই, ভালয় ভালয় বলছি, দূর হ এখান থেকে।'

উটকো বুড়োটে আর্কি তবু নাছোড়বান্দা। কাতরভাবে বলে যায়—'কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন? আপনার কর্তাকে একবারটি শুধু খবর দিন এই বলে যে আর্কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আপনার কর্তার সঙ্গে আমার এই গাঙের পারের রাস্তাতেই দেখা হয়েছে। তিনি যা চান আমি সেই এ মুলুকের চাষাভুষো মাঝিমাল্লার গানের নমুনা জোগাড় করে তাঁকে শোনাতে এসেছি। একবারটি শুধু দয়া করে—'

ধলা অসুরটা আর্কির কথা শুনতে শুনতে যেভাবে দাঁতে দাঁতে ঘসতে ঘসতে হাতদুটো মুঠো করছিল তাতে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই সে এবার সেই শুঁটকো আর্কিকে টুঁটি টিপে লঞ্চের ওপর তুলে আছাড় মারবে! কিন্তু তার সুযোগ মিলল না। সে কিছু করার আগেই লঞ্চের মালিক নিজে থেকেই ভেতরের কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের দুজনকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে ওখানে? কার সঙ্গে কথা বলছ, ড্যানি?'

দানো শব্দটারই যেন মোচড়ানো রূপ। ড্যানিই তাহলে লঞ্চের খালাসি দৈত্যটার নাম! ড্যানি কিন্তু কিছু জবাব দেবার আগেই বুড়োটে শুঁটকো আর্কি কাতরভাবে চেঁচিয়ে জানায়, 'আজ্ঞে, আমি আর্কি, আর্কি ট্রেগার। আপনাকে সেদিন রাস্তায়—'

আর্কিকে আর কিছু বলতে হয় না। লঞ্চের মালিকও কমবয়সী জোয়ান নন। পোশাকে-আশাকে না হোক, চেহারায় তো দুজনের মধ্যে কোথায় একটা মিল আছে। আর্কির মতো খেতে না-পাওয়া চেহারা না হলেও তিনিও বুড়োটে এবং শীর্ণ। আর্কির মতো চোখেও কম দেখেন।

আর্কির কথার মধ্যে তিনি সামনে এগিয়ে এসে তাকে দেখে চিনতে পারেন আর সেই সঙ্গে আর্কির আর্জি মঞ্জুর হয়ে যায়।

'আরে তুমি,' বলে লঞ্চের মালিক নিজে থেকেই তাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'তুমি সত্যি এসেছ? আরে এসো এসো, ওপরে এসো।'

এরপর ড্যানির দিকে ফিরে তিনি আর্কির চলে আসার সুবিধের জন্য লঞ্চটাকে আর একটু এগিয়ে একেবারে তীরের গা ঘেঁসে লাগাতে বলেন।

এবার তাই করতে হয় ড্যানিকে। কিন্তু মুখটা তখন তার দেখবার মতো। চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

সে জ্বলুনির একটা শোধ না নিয়ে ছাড়ে না।

লঞ্চের মালিক আর্কিকে ওপরে আসার সুবিধে করে দিতে ড্যানিকে হুকুম দিয়ে আবার ভেতরের কেবিনে গিয়ে ঢুকেছিলেন। লঞ্চে উঠে ভেতরের সেই কামরার দিকে যেতে গিয়ে আর্কি সচাপ্টে ডেকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

পা পিছলে-টিছলে নয়, পড়ে যায় আর্কির যাবার পথে ড্যানি হঠাৎ পা বাড়িয়ে তাকে লেঙ্গি মারায়।

ডেকের ওপর বেশ জোরেই আর্কি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। চট করে ওঠা তার হয় না। বেশ খানিক বাদে গা-হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে সে কিন্তু ড্যানির দিকে একবার ফিরে চেয়েও দেখে না। ক্ষোভও জানায় না কিছু। মুখ বুজে মাথা নিচু করে সে এরপর লঞ্চের কেবিনে গিয়ে ঢোকে।

কেবিনে ঢুকে আর্কি কি কোনও নালিশ জানায় লঞ্চের মালিকের কাছে?

মোটেই না।

তার বদলে খানিকবাদে তাকে সত্যিই তার তালি-মারা ক্যাম্বিশের ব্যাগ থেকে একটা টেপ-রেকর্ডার বার করে তা থেকে কয়েকরকম লোকসঙ্গীত বাজিয়ে মালিককে শোনাতে দেখা যায়।

মালিক খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'খুব ভাল। এ রকম যত গান আমায় সংগ্রহ করে দিতে পারবে আমি তোমায় প্রত্যেকটির জন্য মোটা বকশিস দেব।'

আর্কি যেন এ কথায় কৃতার্থ হয়ে গদগদ স্বরে বলে, 'আজ্ঞে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে আমি ধন্য। আপনি আমাদের এ সুন্দরবনের বনে-বাদাড়ে আঁছাড়ে-পাঁছাড়ে এত কষ্ট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর আপনাকে খুশি করব না। বাঃ! আরও শুনুন তাহলে।'

আর্কি আবার তার টেপ-রেকর্ডটা চালিয়ে দেয়।

কিন্তু এ কী বার হচ্ছে ভেতর থেকে?

লঞ্চের মালিক প্রথমে চমকে যান, তারপর কেমন একটু অস্বস্তিতে যেন বেশ অস্থির হয়ে পড়েন।

টেপ-রেকর্ডারে তখন আর এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বাজছে না। তার বদলে লঞ্চের মালিকের নিজের দেশের ভাষাতেই শোনা যাচ্ছে, 'কোনও ভাবনা নেই, মি. হার্টন! লোকসঙ্গীত খোঁজার নামে সত্যিসত্যি যা আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারই সন্ধান

আমার কাছে আপনি পাবেন। আপনার লোভ তো ওই এখানকার যেখানে সেখানে জন্মানো আগাছাতে। যাকে বৈজ্ঞানিক নামটার বদলে আমরা শুধু কচালিই বলতে পারি।

কিন্তু এই কচালির জন্য কেন আপনার এমন লালসা তাই একটু আপনার কাছে আগে জানতে ইচ্ছে করে। এ আগাছা যে এখন পৃথিবীর সাত রাজার ধনমানিক সেই হাইড্রোকার্বনে ভর্তি তা আপনি জানেন বুঝলাম। কিন্তু এ অমূল্য আগাছা তো আপনাদের অত বড় দেশের কোথাও পাওয়া যায় না। আপনাদের দেশ কেন, পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই এই কচালির কিছুকিছু পাওয়া যায়। যাও বা পাওয়া যায় তা আমাদের এই এখানকার মতো অজস্র নয়। তাহলে এই আগাছায় আপনাদের এত লোভ কেন! এখান থেকে এ কচালি তুলে নিয়ে চাষ করবেন নিজের দেশে? সে তো ন-মাস ছ-মাসের নয়, কিছু না হোক দশ-বিশ বছরের ব্যাপার—'

'থামাও! থামাও তোমার রেকর্ডার।' লঞ্চের মালিক এতক্ষণে আর ধৈর্য ধরতে না পেরে গর্জন করে ওঠেন, 'কী শোনাচ্ছ এসব আমাকে?'

লঞ্চের মালিকের ধমকের সঙ্গে সঙ্গে আর্কি তার রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার যেন ভয়ে ভয়ে মিনতি করে বলে, 'আপনার ভাল লাগছে না বুঝি! আর একটু শুনুন তাহলে, ভাল লাগবে। না লেগে পারে না।'

আর্কি রেকর্ডার আবার চালু করে দিয়ে বলে, 'দামি কথা এইবারটা পাবেন।'

রেকর্ডারে তখন শোনা যায়—'দশ-বিশ বৎসরই না হয় আপনারা অপেক্ষা করতে রাজি বুঝলাম। কিন্তু শুধু এই কচালি জন্মালেই তো হল না। এ কচালি নিংড়োলে যা বেরুবে সে তো আর আসলি মাল নয়—'

'থামাও, থামাও, তোমার রেকর্ডার! আমি শুনতে চাই না,' বলে এবার চিৎকার করে ওঠেন লঞ্চের মালিক। 'কাকে তুমি কী শোনাতে এসেছ!'

লঞ্চের মালিক 'থামাও' বলে চিৎকার করে উঠতে আর্কি তার যন্তরটা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর ধৈর্য ধরে মালিকের কথা শুনে যেন অবোধকে বোঝাচ্ছে এমনই মিষ্টি করে বলে, 'আচ্ছা! আচ্ছা, ও টেপ রেকর্ডারে শুনতে হবে না। যা বলবার আমি মুখেই বলছি, শুনুন। ওই কচালিতে প্রচুর হাইড্রো-কার্বন আছে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা হল মোটা মাল, তাতে দু শিকলি গ্রন্থিতে ১৪টা করে কার্বন অ্যাটম, ২৪টা করে হাইড্রোজেন অ্যাটমের সরু জোড়া। কোনও ইঞ্জিন চালাবার পক্ষে তা অচল—'

আর্কির কথা বলার মধ্যেই লঞ্চের সেই সাদা অসুর খালাসি কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

লঞ্চের মালিক রাগে মুখ রাঙা করে তার দিকে তাকিয়ে হুকুম দেন, 'এই মর্কট আর ওর যন্তরটাকে গাঙের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো তো ড্যানি—এখুনি দাও গিয়ে।'

এর চেয়ে পছন্দসই কাজ ড্যানির কাছে আর কিছু হতে পারে না। শুধু ছুঁড়ে ফেলা নয়, সেই সঙ্গে মর্কটটার একটা হাত কাঁধ থেকে মুচড়ে খুলে নেবার সাধু ইচ্ছে নিয়ে ড্যানি আর্কির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! অত ব্যস্ত কেন?' ঝাঁপিয়ে পড়া ড্যানি তখন যেখানে সচাপ্টে মেঝের ওপর আছড়ে পড়েছে সেদিকে এবার করুণার দৃষ্টি ফেলে আর্কি বলে যায়, 'আমার শেষ ক-টা কথা শুধু বলে যাই। তাতে সময় আর কতটুকু লাগবে! ওই যে অচল হাইড্রো-কার্বনের কথা বললাম তাকে যাকে বলে খুচরো চোলাই, অর্থাৎ ফ্র্যাকশন্যাল ডিস্টিলেশন, করে সরল সচল করা এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। ঠিক মতো একটা ক্যাটালিস্ট খুঁজে বার করা এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। ঠিক মতো একটা ক্যাটালিস্ট খুঁজে বার করতে পারলেই হল। আরে, এই দেখো! ধীরে সুস্থে কথাটা শেষ করতে দিলে না—'

আর্কির কথার মধ্যে ধলা গোরিলাটা মেঝে থেকে উঠে তখন আর্কির ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু ওই ঝাঁপিয়ে পড়াই সার। আর্কিকে জাপটে ধরার বদলে পরমুহূর্তে নিজেই সে বাইরের ডেকে ধরাশায়ী।

সেদিকে চেয়ে বেশ একটু সহানুভূতির সঙ্গে আর্কি বলে, 'হাড়গোড় আবার না ভেঙে থাকে বেচারার। সারারাত এখন আবার লঞ্চ চালাতে হবে তো।'

ড্যানির দিক থেকে লঞ্চের মালিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে আর্কি এবার বলে, 'হ্যাঁ, আপনাদের আবার হাতে বেশি সময়ও নেই। তাই যা বলছিলাম তাড়াতাড়ি সারছি। ওই ক্যাটালিস্ট মানে—যে শুধু দু-হাত এক করার ব্যবস্থা করে নিজে বাইরে থাকে। তেমনই গোছের হাইড্রো-কার্বনকে মিহি করবার ঘটক আবিষ্কার করার পথে প্রায় বুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছেন তার নাগাল পেলেই আপনার সুবিধে হত খুব বেশি। লোকসঙ্গীত খোঁজার নামে তার খোঁজও খুব বেশি করে করেছিলেন। কিন্তু সে খোঁজা সার্থক আর হল না। যাকে খুঁজছিলেন তিনি জানতেও পারলেন না, পারলে তাকে চুরি করে নিজেদের মুলুকে পাচার করবার মতলব নিয়ে এক দুশমনের জুড়ি এই এত কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাক, আর দেরি করব না। আপনার ড্যানি ডেকের ধার থেকে একটা লোহার হাতুড়ি জোগাড় করেছে দেখছি। সেই হাতুড়ি আমার মাথায় ভাঙবার সদিচ্ছা নিয়ে আমার দিকে আসছে। তবে এবার আর বুনো মোষ-টোষের মতো নয়। যত নিরেটই হোক, মানুষ ঠেকে শেখে। ও তাই এবার হুঁশিয়ার হয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আমার এ সব মারামারি-টারামারি ভাল লাগে না। তবু বাধ্য হয়ে আর একবার এই কেবিনের ওই কোণের টেবিলটার ধারে ওর ঘাড়মুখ গুঁজে পড়া দেখে যেতে হবে। তবে বেশি জোরে পড়বে না। হাড়গোড় আস্ত না থাকলে এখন থেকে সারারাত লঞ্চ চালিয়ে সকালের আগেই সাগর দ্বীপে পৌঁছবে কী করে!—হ্যাঁ, এই দেখুন তেমন বেশি জখম হয়নি। দরকার হলে মুখেচোখে একটু লোনাজলের ছিটে দিলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আর তখুনি লঞ্চ চালু করে সাগর দ্বীপের দিকে রওনা হবেন। সেখানে পৌঁছবার পর কী করতে হবে তা আর আপনাকে বলে দিতে হবে না নিশ্চয়। আগের ব্যবস্থামতো হেলিকপ্টারটা যদি আসে তাহলে কোনও ভাবনাই নেই। হেলিকপ্টারে চড়বার আগে লঞ্চটা ওই দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে যাবেন। ওরকম একটা লঞ্চের লোকসান গ্রাহ্য না করার ক্ষমতা আপনাদের আছে। আর যদি নেহাত কোনও কারণে হেলিকপ্টার সময়মতো না এসে পৌঁছয় তাহলে লঞ্চে করে সামান্য

একটা পাড়ি দিলেই আপনারা নিরাপদ। তবে এসব কথা মিছে মিছে বকে মরছি। আমি জানি আজ আর একটু রাত হবার পর আপনাদের চুলের টিকি আর এ তল্লাটে দেখা যাবে না। কারণ আপনি জানেন যে রাত পোহাবার আগেই এ মুলুক থেকে একেবারে হাওয়া না হয়ে গেলে ধরা পড়ে যে-কেলেঙ্কারিটা হবে তাতে আপনাদের নিজেদেরই গোয়েন্দা দপ্তর আনাড়িপনার জন্য কী দারুণ শাস্তি আপনাদের দেবে। সুতরাং গুডনাইট আর গুডবাই জানিয়ে চলে যাচ্ছি। আপনার ড্যানি একটু যেরকম নড়ছে তার মুখে এক জগ জল ঢাললেই উঠে বসবে। আচ্ছা! গুডলাক পরের বার।'

এই বলে আর্কি লঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে তীরে নেমে যায়। লঞ্চটাকেও আর বেশিক্ষণ সেখানে দেখা যায়নি। সন্ধে হবার আগেই সে সাগর দ্বীপের পথে মাঝ দরিয়ায়।"

ঘনাদা তাঁর কাহিনী শেষ করে যথারীতি শিশিরের সিগারেটের কৌটোটা পকেটে রেখে তাঁর টঙের ঘরের দিকে রওনা হচ্ছিলেন। একটা বাধা দিয়ে ন্যাকা সেজে বললাম, "আচ্ছা আর্কিকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে।"

"তাই নাকি?" ঘনাদা যেতে যেতে বলে গেলেন, "তা—সে আর আশ্চর্য কী? আর্কির মতো মানুষের তো পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি।"

এ জবাব পাবার পর কারও মুখে আর কোনও কথা ফোটে!

আমরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে একেবারে চুপ।

শিবুই প্রথম যেন জিভের সাড় ফিরে পেয়ে জানতে চাইল, "কী, মৌ-কা-সা-বি-স-এর হদিস কিছু মিলল! কী বুঝছ! এক, না বহুবচন?"

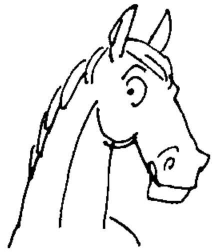

পরাশরে ঘনাদায়

পরাশর বনাম ঘনাদাও বলা যায়।

বলা যায় ঠিকই, কিন্তু মেলানো যায় কি?

না। গাছে মাছে যদি বা মেলানো যায়, পরাশর আর ঘনাদাকে মিলিয়ে দেওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়। এ যেন গাওয়া ঘির সঙ্গে তক্তপোশ কিংবা তবলার সঙ্গে তেলাপোকা। মিল ওই শুধু ত আর ল-এ। কিন্তু সে তো মাথার গোলের মিল যেন লঙ্কা-ফোড়নের—হাঁচি শুনে হেঁশেলের চালে চামচিকের বাসা খোঁজা।

যে দুজনকে মেলাতে চাচ্ছি তাদের ঠিকানা নিয়েই তো গণ্ডগোল। আমাদের ইনি তো থাকেন বনমালি নস্করের বাহাত্তর নম্বরে, আর অন্যজন শুনেছি কোথায় সেই খিদিরপুরে।

খিদিরপুরের কোথায় কোন পাড়ার কোন গলি বা মহল্লায় তার কিছুই জানা নেই। জানবার উপায়ই বা কী?

না, না—হঠাৎ খেয়াল হয়েছে যে উপায় একটা আছে। এ ভরসাটা আর কেউ নয়, শিবুই দিয়েছে।

"উপায়টা কী?" জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

"খুব সোজা উপায়।" শিবু ভনিতা করেছে, "পরাশরের সব বৃত্তান্ত যাঁর মারফত জেনেছি সেই তাঁকেই গিয়ে ধরা।"

"তাঁকেই গিয়ে ধরা!" শিশির আর গৌর সন্দেহ প্রকাশ করেছে, "পরাশর বৃত্তান্তের বর্ণনাকার কৃত্তিবাস ভদ্র না কে, তাঁর কথা বলছ তো?"

"হ্যাঁ, তাঁর ছাড়া আর কার কথা বলব?" শিবু একটু ঝাঁঝিয়ে বলেছে, "মহাভারত রচনাকারের কথা বলতে বেদব্যাস ছাড়া নাম করব আর কার?"

"বেদব্যাস," আমি ঘনাদার ধরনে ধ্বনি করবার চেষ্টা করে অবজ্ঞাভরে অন্য তর্ক তুলে বলেছি, "একটু বুঝে-সুঝে কথা বলো। কাকে বেদব্যাস বলছ? তেলাপোকাকে বলছ পাখি। তোমাদের ভদ্র না অভদ্র ওই কৃত্তিবাস পরাশর বৃত্তান্তের সঞ্জয়ও নয়।"

"সঞ্জয়ও নয়!"—শিবু যেন একটু বেশি তেতে উঠল—"অত হেনস্থা যাকে করছিস তার কেরামতি যে কতখানি তা বুঝিস! পরাশর বর্মার কি শার্লক হোমস-এর ওই কৃত্তিবাস-ওয়াটসনরা না থাকলে তাদের সব বাহাদুরির অর্ধেক জেল্লাই যে মাটি হয়ে যেত তা জানিস! এই কৃত্তিবাস আর ওয়াটসন নিজেরা বোকা বোকা আহম্মুকে সেজে এমন কায়দা করে তাদের বন্ধুদের বৃত্তান্ত লেখেন যে সেখানে উইঢিবিকে মনে হয় যেন পাহাড় আর খিড়কি পুকুরকে যেন অকূল দরিয়া। 'সঞ্জয়ও নয়' বলে নিজের বুদ্ধির বহরটা তাই জানিয়ে ফেলিস না!"

শিবুর কথাগুলো নেহাত ফাঁকা গলাবাজি নয়। তার যুক্তিগুলোর ঠোক্করে একটু কাবু হলেও জবাব যাহোক একটা দিতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু শিশির গৌরের বকুনিতে নিজেকে রুখতে হল।

"কী সব বেতালা বাজাচ্ছিস!" ধমক দিয়েছে গৌর আর শিশির—শিবুর কথায় সায় দিয়ে বলেছে, "সঞ্জয় হোক বা বেদব্যাসই হোক, আমরা যা চাইছি সেটুকু তাঁকে দিয়ে হলেই হল। আমরা তো তাঁর কাছে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত চাইছি না, চাইছি শুধু ওই যাকে বলা যায় কুরুক্ষেত্রের ঠিকানাটুকু। সেইটুকু তাঁর কাছে পেলেই হল।"

গৌর শিশিরের মীমাংসাই মেনে নিয়ে তারপর পরাশর-কথাকার কৃত্তিবাস ভদ্রের পত্রিকার অফিসে খোঁজ করতে গিয়েছি।

কিন্তু কোথায় পত্রিকা?

পত্রিকার অফিসের পাশেই কৃত্তিবাস ভদ্র নিজেও থাকেন বলে শুনেছিলাম।

কিন্তু সেখানে গিয়ে জানলাম, সে খবর নাকি এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। জায়গাটা

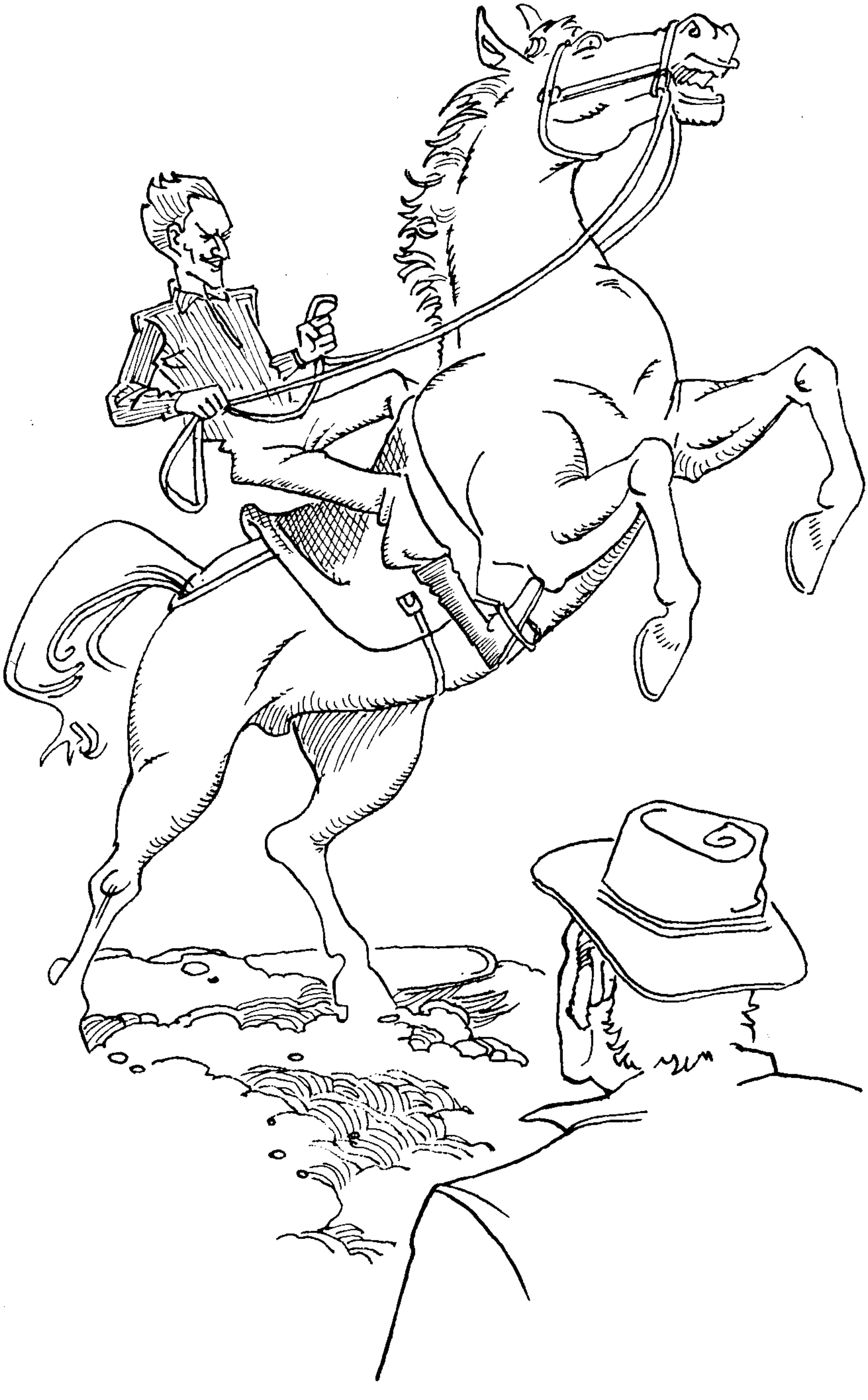

মৌলালি অঞ্চল। ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে আমাদের ভুল হয়নি। কৃত্তিবাস ভদ্রের সম্পাদনায় যে পত্রিকা সেখান থেকে বার হত সেটা বেশ কয়েক বছর অন্য কোনও ঠিকানায় উঠে গেছে।

বাড়িটার এখন যা অবস্থা তাতে তার সঙ্গে সাহিত্যের কি সাংবাদিকতার জগতের কোনও সম্পর্কের কথা ভাবাই শক্ত।

বাড়ির নীচের তলাটা একটা গো-ডাউন গোছের। সেখানে গেলেই একটা অদ্ভুত গন্ধে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করতে হয়। গন্ধটা উৎকট বিশ্রী কিছু নয়, শুধু কেমন একটু চেনাচেনা কিছুরই যেন কড়া ছোঁয়া লাগানো।

ভনিতাটা না বাড়িয়ে সোজা কথাতেই বলি, গন্ধটা বিড়ির পাতার আর তামাকের। গো-ডাউনটা ওই দুটো জিনিসেরই।

গো-ডাউনের দেওয়ালের গায়ে লাগানো দু-চারটে কাঠের খুপরি থেকেই অবশ্য ব্যাপারটা আঁচ করা উচিত ছিল। সেসব খুপরির নীচে ও ওপরের কাঠের তক্তায় বসে সবসুদ্ধ মিলে প্রায় জন-কুড়িক কারিগর নিপুণ হাতে বিড়ি বাঁধছে।

প্রথমেই জায়গাটার অপ্রত্যাশিত গন্ধে একটু ভড়কে গেলেও ওই বিড়ি তৈরির একটি খুপরিতেই গিয়ে ওপরের কাগজের অফিসের খোঁজ করি। "কা-গজ!" বড় কুলোর ওপর থেকে মশলা আর পাতা নিয়ে কলের মতো হাত চালিয়ে দেখতে না দেখতে একটার পর একটা নিখুঁত বিড়ি বাঁধার কাজ একটুও না থামিয়ে কারিগর আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যভাবে চেয়ে বলে, "কাগজ কাঁহা! হিঁয়া পত্তি মিলবে! বিড়ি বনানে কা পত্তি!"

"না, না!"—আমাদের যতদূর হিন্দির দৌড় তাই দিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছে—"কাগ্‌গজ, মানে ওই কী বলে—পত্রিকা।"

"পৎরিকা! আরে পৎরিকা কাঁহা," কারিগর এক রাশ বিড়ি গুছিয়ে নিয়ে একটি বান্ডিলে বেঁধে ফেলতে ফেলতে ধৈর্য ধরেই বলে, "পৎরি নেঁহি, পত্তি, পৎতি! আভি সমঝমে আয়া?"

"হাঁ হাঁ, আয়া আয়া"—তাড়াতাড়ি নিজেদের সংশোধন করে বলতে হয়—"উও কাগজ না। ওই যিসকো বোলতা জাহাঙ্গির না হুমায়ুন!"

"হুমায়ুন!" বলে কারিগর আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহসূচক উচ্চারণটা করতেই আসল শব্দটা আমাদের মনে পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে নিজেদের শুধরে বলেছি, "নেহি, নেহি—হুমায়ুন-জাহাঙ্গির নেই—আকবর! আকবর!"

"আকবর?" আমাদের উচ্চারণের গুণেই বোধহয় কারিগরকে ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকাতে হয়েছে।

আমরা ব্যস্ত হয়েছে উঠেছি এবার আমাদের বক্তব্যটা আরও ভাল করে বোঝাতে, "হাঁ, হাঁ—আকবর! তবে ওই দিন দিন যে আকবর নিকলতা—ও নেহি, হপ্তা হপ্তা মানে সাত-সাত দিনমে যো আকবর পয়দা হোতা ওইসা কুছ—"

"ঠিক হ্যায়! ঠিক হ্যায়!" এবার একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে কারিগরের

মুখে। সেই হাসি নিয়েই, আমাদের আজব হিন্দির বোধ দিয়ে, সে তার নিজস্ব বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে হপ্তায় হপ্তায় যে কাগজটা এখান থেকে বার হত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। তবে ওপরে কাগজের অফিস যেখানে ছিল সেখানে মাঝে মাঝে দু-একজনকে সে যেতে-আসতে দেখেছে। সুতরাং সেখানে আমরা খোঁজ করে দেখতে পারি।

কাগজ বন্ধ শুনে হতাশ হবার কথা। তবু অফিসটা একেবারে বন্ধ না হওয়ার যে খবরটুকু কারিগরের কাছে পাওয়া গেল তারই ওপর ভরসা করে ওপরের তলায় একবার টুঁ না মেরে পারলাম না।

ওপরে ওঠবার সিঁড়ি, তারপর কোল্যাপসিবল লোহার দরজা ও তারপরে বেশ লম্বা-চওড়া অফিস ঘরটা। নতুন করে বর্ণনা দেবার কিছু নেই। পরাশর বৃত্তান্তে তাঁর বন্ধু ও কীর্তিগাথাকার প্রতি কাহিনীতে যেরকম বর্ণনা দেন, জায়গাটা ঠিক তাই। সেই চওড়া সব বেমানান সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোল্যাপসিবল গেট আর তা পেরিয়ে বেশ প্রশস্ত হলেও বেঢপ অফিস ঘরটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক কেতাবি বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল। মিলে গেল সেকেলে বিরাট একটু-আধটু পালিশ-ওঠা রং-চটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পর্যন্ত।

কিন্তু টেবিলের ওধারে বসে একটা বই হাতে নিয়ে যিনি তাঁর ঘূর্ণি চেয়ার একটু ঘুরিয়ে তাতে হেলান দিয়ে পড়ছেন, তাঁর সঙ্গে বই থেকে পাওয়া বর্ণনা মিলছে না একেবারেই।

কোল্যাপসিবল দরজাটা বেশ ফাঁক করে খোলা থাকায় দ্বিধাভরে হলেও আমরা চারজনেই তখন অফিস ঘরটায় ঢুকে পড়েছি। পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কে প্রথম দরকারি প্রশ্নটা করবে তা ঠিক করবার চেষ্টা করছি তার মধ্যেই মুখ থেকে হাতের বইটা না নামিয়েই সেক্রেটারিয়েটের ওধারে আসীন মানুষটি বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন, বসুন।"

একটু চমকে উঠে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম—মানুষটার কি এক্স-রে দৃষ্টি নাকি যে চোখের সামনে বই ঢাকা থাকলেও তার ভেতর দিয়ে দেখতে পায়!

আমরা তাঁর টেবিলের কাছে পৌঁছবার পর তিনি অবশ্য বইটা নামিয়ে বললেন, "বসুন।"

আমরা কিন্তু বসতে পারলাম না। একটু ইতস্তত করে কোনওরকমে আসার উদ্দেশ্যটা জানালাম, "দেখুন আমরা—কী বলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর খোঁজেই এখানে এসেছি।"

"বলুন, কার সঙ্গে দেখা করতে চান!" সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসা মানুষটির গলায় আপ্যায়ন না থাকলেও বিরূপতা নেই। ভাবটা এই যে আমাদের কথা শুনতে ব্যগ্র না হলেও তাতে তাঁর আপত্তি নেই।

"আমরা মানে—" ওইটুকু অনুমতি পেয়েই আমরা এবার এক নিঃশ্বাসে জানালাম—"কৃত্তিবাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর একটা পত্রিকা এখান থেকে বার হত। সেই ঠিকানা থেকেই এখানে খোঁজ করতে এসেছি।"

মানুষটির মুখে একটু যেন হাসির রেখা ফুটে উঠেছে কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না। গলাটা কিন্তু বেশ একটু গম্ভীর রেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি কাগজে কিছু লেখা দেবার জন্য এসেছেন?"

"না, না,"—আমরা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানালাম—"লেখা-টেখা নয়, পত্রিকার ব্যাপারও কিছু নয়, আমরা তাঁর সঙ্গে একটু অন্য ব্যাপারে দেখা করতে চাই।"

"বেশ," এবারে মুখের ভাবে আর সেই সঙ্গে গলার স্বরে প্রসন্ন আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বললেন, "যা বলবার আমার কাছেই তা হলে বলতে পারেন। আমি-ই কৃত্তিবাস ভদ্র।"

"আপনিই কৃত্তিবাস ভদ্র!" কথাটা আমাদের চারজনের মুখ দিয়েই আপনা থেকে বেরিয়ে এল।

নিজেকে কৃত্তিবাস ভদ্র বলে যিনি ঘোষণা করেছেন আমাদের অবাক হবার কারণটা তিনি অনুমান করে নিয়ে নিজেই ব্যাখ্যাটা দিলেন এবার—"হাঁ, আমিই কৃত্তিবাস ভদ্র। কথাটা ঠিক বিশ্বাস যে হচ্ছে না, তাতে বোঝা যাচ্ছে পরাশরকে নিয়ে লেখা আমার বইগুলো কিছু কিছু আপনারা পড়েছেন আর তাতে আমাদের চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছেন তাই থেকেই আমাকে কৃত্তিবাস ভাবতে বাধছে, কেমন?"

হ্যাঁ-না কিছুই বলতে না পেরে আমরা তখন একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাস নিজের বক্তব্যটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "বইগুলোতে দুজনের চেহারা বদলাবদলি করে বর্ণনা দিয়েছি।"

"কেন?" চারজনের মুখে একই প্রশ্ন শোনা গেছে।

"কেন? আমাদের বিশেষ করে পরস্পরকে চেনা কঠিন করবার জন্য," বলে স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাস একটু হেসে আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, "আমাকে কেন খুঁজছেন তা এখনও বললেন না!"

"আমরা মানে," দুবার ঢোঁক গিলে আমাদের সকলের হয়ে গৌরই কথাটা এবার বলেই ফেলেছে, "আমরা আপনার পরাশর বর্মার ঠিকানাটা জানবার জন্যই—আপনার খোঁজে এখানে এসেছি।"

"পরাশরের ঠিকানা জানবার জন্য খোঁজ করে আমার কাছে এসেছেন—" স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাসের মুখ যেন একটু গম্ভীর দেখিয়েছে।

তাঁর জন্য নয়, পরাশরের খোঁজে তাঁর কাছে এসেছি শুনে এরকম একটু ক্ষোভ অবশ্য হতেই পারে। তিনি অবশ্য চটপট সেটা কাটিয়ে উঠে আবার বলেছেন, "পরাশরের ঠিকানা চাইতে এসেছেন। কিন্তু তার ঠিকানা কাউকে দেবার অনুমতি যে আমার নেই।"

"অনুমতি নেই!"—আমরা বেশ হতাশ।

"হ্যাঁ, অনুমতি নেই"—স্বঘোষিত কৃত্তিবাস আমাদের প্রতি সহানুভূতিই দেখিয়ে জানিয়েছেন—"তা তবে আপনারা কী জন্য তাঁকে খুঁজছেন যদি বলেন তা হলে তাঁকে একটা খবর আমি দিতে পারি।"

"খবর দিতে পারেন!"—আমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি আশায়—"একটা কথা তা

হলে তাঁকে যদি জানান!"

"কী কথা?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাস।

"এই মানে"—আমি কথাটা শুরু করতে গিয়ে জিভে যেন জট পাকিয়ে ফেলেছি—"ওই কী বলে বাহাত্তর নম্বর—মানে—"

স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাসের মুখের চাপা একটু কৌতুকের ভাবটা আরও ভড়কে দিয়েছে আমাকে।

সবকিছু গুলিয়ে গোলমাল করে ফেলে আমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে তা হল—"হ্যাঁ, মানে ওই বাহাত্তর নম্বর মানে গলির ওই বাড়িটা বুঝেছেন কিনা—"

"কী বুঝবেন উনি তোমার ওই পাগলের প্রলাপে?" শিবু আর গৌর দুজনেই ঝংকার দিয়ে উঠে এবার আমায় একেবারে অপ্রস্তুত করে থামাল।

কিন্তু আমার লজ্জা নিবারণ করলেন স্বয়ং স্ব-ঘোষিত কৃত্তিবাস ভদ্র। একটু হেসে শিবু আর গৌরকে থামিয়ে তিনি বললেন, "না, না—আপনারা মিছিমিছি উত্তেজিত হবেন না। যা বলবার উনি ঠিকই বলেছেন।"

"ঠিকই বলেছে!" শিবু আর গৌরের সঙ্গে এবার শিশিরও যোগ দিয়েছে আমার বিরুদ্ধে—"ও যা বলেছে তাতে তার এক বর্ণও আপনি কিছু বুঝেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—বুঝেছি বইকী! ঠিকই বুঝেছি," আমাদের নতুন চেনা কৃত্তিবাস ভদ্র সকলকে একসঙ্গে আশ্বস্ত আর হতভম্ব করে বলেছেন, "আপনাদের ওই ঠিকানায় পরাশর বর্মা একদিন যাতে যান তাই আপনারা চান তো? বেশ তো ব্যবস্থা করা যাবে।"

"সে ব্যবস্থা করা যাবে!" নিজেদের কানগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আমিই সবার আগে বলেছি, "তা হলে বিকেলে চারটা নাগাদ আমরাই ট্যাকসি নিয়ে এখানে আসতে চাই। অবশ্য পরাশরবাবুর নিজের কোনও অসুবিধে যদি না থাকে।"

"না, না", কৃত্তিবাস আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, "পরাশরের কোনও অসুবিধা হবে না। তবে ট্যাকসি নিয়ে আপনাদের আসবার কোনও দরকার নেই। পরাশর নিজেই ঠিক চারটের সময়—আপনাদের বাহাত্তর নম্বরে গিয়ে পৌঁছবেন।"

"তিনি নিজেই গিয়ে পৌঁছবেন!" আমরা এবার বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলেছি, "কিন্তু তার চেয়ে আমাদের গাড়ি নিয়ে এলে কি ভাল হত না? মানে—আমাদের গলিটা ওই কী বলে—একটু গোলমেলে কিনা—খুঁজে পেতে যদি—"

"দেখাই যাক না তা হলে পরাশরের দৌড়টা!" আমাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কৃত্তিবাস ভদ্র বলেছেন, "দারুণ দারুণ রহস্যভেদের বড়াই যে করে এই গলি খোঁজার ব্যাপারেই তার পরীক্ষা হয়ে যাক না।" একটু থেমে আমাদের আবার আশ্বাস দিয়েছেন, "আপনাদের কোনও ভাবনা নেই। কাল ঠিক চারটের সময় আপনাদের বাহাত্তর নম্বরের দরজায় পরাশর বর্মাকে হাজির দেখবেন বলেই আমার বিশ্বাস।"

এরপর আর কিছু বলা যায় না বলে মনের কথা মনেই চেপে রেখে বাধ্য হয়েই বিদায় নিয়ে এসেছি।

কে জানে পরাশর বর্মা সত্যিই বাহাত্তর নম্বরের দরজায় ঠিক চারটের সময় হাজির হতে পারবেন কিনা?

না পারলে আমাদের অনেকগুলো ভাল ভাল সাজানো চাল কিন্তু সত্যিই মাটি হয়ে যাবে।

কত কায়দা করেই না সমস্ত দৃশ্যটা ছকে রেখেছি।

পরাশর বর্মাকে নীচে থেকে অভ্যর্থনা করে আমরা তাঁকে নিয়ে ওপরের আড্ডাঘরে গিয়ে ঢুকব। ঘনাদাকে তার আগেই রামভুজের হাঁড়িয়া কাবাবের নমুনা চাখাবার জন্য তাঁর মৌরসি কেদারায় বসিয়ে হাতে একটা প্লেট ভর্তি কাবাব আর চামচ ধরিয়ে দেওয়া থাকবে।

বারান্দা থেকে আড্ডাঘরে ঢুকে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলব, 'দেখুন, ঘনাদা, কাকে আজ ধরে এনেছি, দেখুন।'

আমাদের উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে ঘনাদার মেজাজটা খুব খোশ তখন নিশ্চয়ই নেই। তিনি ভুরু কুঁচকে অকিঞ্চিৎকর কিছু দেখার ভঙ্গিতে একবার একটু ঘাড় ফিরিয়েই আবার তা ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁড়িয়া কাবাব চাখায় মনোনিবেশ করবেন।

আমরা ততক্ষণে পরাশর বর্মাকে ঘরের মধ্যে তাঁর কাছাকাছি এনে ফেলেছি। একসঙ্গে দু-তিনজনের গলায় তখন কলধ্বনি উঠবে—'কাকে এনেছি জানেন? স্বয়ং পরাশর বর্মা আজ আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।'

এবার যা হবে সেইটেই দেখবার মতো।

ঘনাদা হাঁড়িয়া কাবাবের প্লেট থেকে যেন একটু করুণা করে চোখ তুলে পরাশর বর্মার দিকে তাকাবেন। তারপর আবার প্লেটের দিকেই চোখ ফেরাতে ফেরাতে বলবেন, 'বেশ! বেশ! পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন ওঁকে বসতে বলো। তা উনি করেন কী?'

'উনি করেন কী? ওঁকে আপনি চেনেন না? উনি হলেন অদ্বিতীয় গোয়েন্দা পরাশর বর্মা।'

'ভাল! ভাল। এ সব লোকের সঙ্গে আলাপ থাকা ভাল। বসুন, গোয়েন্দা মশাই, আরাম করে বসুন।'

যাঁকে এমন করে হেনস্থা করার চেষ্টা সেই পরাশর বর্মা কি নীরবে এই অপমান সয়ে যাবেন?

পালটা কোনও জুতসই মার কি তাঁর ভাঁড়ারে নেই। তা থাকবে বই কী?

ঘনাদার ব্যঙ্গ অনুরোধের আগেই আমরা অবশ্য এই দিনটির জন্যই আনানো ঘনাদার কেদারার দোসর একটিতে পরাশর বর্মাকে পরম সমাদরে বসিয়ে দিয়েছি।

তিনি কিন্তু ঘনাদার মতো ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুরে নয়, বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় আমাদের শুধু জিজ্ঞাসা করবেন এবার—'আচ্ছা, আপনারা আমার পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু উনি কে তা তো জানতে পারলাম না।'

'উনি! উনি!'—আমাদের এবার আবার একবার গদগদ হবার পালা—'উনি হলেন ঘনাদা—'

'ভনাদা?'—পরাশর বর্মার মুখের ভাবে আর গলার স্বরে যেন অকৃত্রিম সারল্য, কিন্তু মার হিসেবে ঘনাদাকে ভনাদা শোনা বুঝি একেবারে মোক্ষম!

এরপরে যা হবে তা বুঝি আমাদের বানিয়ে ভাববারও ক্ষমতা নেই। সেই দুই মহারথীর তিরন্দাজি বাহাদুরির জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্যটুকু শুধু চাই।

সেই ধৈর্য ধরতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু আসর যাঁরা মাত করবেন সেই দুই তালেবরের ঠিক মতো মোলাকাত তো চাই।

পরাশর বর্মাকে নিজেরা গাড়ি নিয়ে গিয়ে আনবার জন্য তাই অত ব্যস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সে ইচ্ছে যখন পূরণ হবার নয় তখন তাঁর প্রতিনিধি কৃত্তিবাস ভদ্রের কথায় বিশ্বাস করে তাঁর জন্য বাহাত্তর নম্বরের গেটেই অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী?

অপেক্ষা করার দিক দিয়ে অবশ্য কোনও ত্রুটি রাখিনি। পরাশর বিকেল ঠিক চারটের সময় বাহাত্তর নম্বরের দরজায় হাজির হবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধি কৃত্তিবাস। আমরা কোনও দিকে কোনও ভুলচুকের ফাঁক না রাখবার জন্য একেবারে বেলা তিনটে থেকেই দরজার বাইরের রাস্তায় খাড়া। খাড়া একলা কেউ নয়—চারজনই এক সঙ্গে। ঘড়ি আমাদের সকলেরই হাতে আর তা রেডিয়োর সঙ্গে দফায় দফায় মেলানো।

কিন্তু তিনটে থেকে সওয়া তিনটে, সাড়ে তিনটে, পৌনে চারটে প্রায় বাজতে চলল। পরাশর বর্মার এখনও দেখা নেই।

আমরা একবার নিজেদের ঘড়ির দিকে আর তারপর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি। রাস্তাটা—আমাদের গলিটা যাতে গিয়ে পড়েছে সেই সদর রাস্তা। সেদিকে ব্যাকুল হয়ে তাকাবার সঙ্গে কানটাও খাড়া রাখতে ভুলিনি। ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ি যাতেই পরাশর বর্মা আসুন আগে থাকতে তার আওয়াজটা পাবই।

কিন্তু তিনটে সাতান্ন আটান্ন ঊনষাট হয়ে কাঁটা দুটো চারটের দাগ ছুঁই ছুঁই করতে চলেছে। পরাশর বর্মার কি সময়জ্ঞান বা কথা রাখার কোনও বালাই নেই। তাঁর হয়ে কৃত্তিবাস ভদ্র কথা দিয়েছেন যে ঠিক চারটের সময় তিনি বাহাত্তর নম্বরের দরজায় হাজির হবেন। চারটের সময় বলে তিনি পাঁচটা-ছ-টা করবেন নাকি? না, একেবারেই আসবেন না?

তা হলে আমাদের সব আশায় ছাই।

কোনও লাভ নেই জেনেও সামনের বড় রাস্তার দিকে একটু এগিয়ে দেখব কি না ভাবছি, এমন সময়—"এই যে!" শুনে চমকে একটু পেছনে ফিরে তাকিয়ে একেবারে যেমন হতভম্ব তেমনই একটু অপ্রস্তুত।

সেখানে স্বয়ং পরাশর বর্মা না হলেও তাঁর প্রতিনিধি কৃত্তিবাস ভদ্র হাসি মুখে বলছেন, "এইটেই তো আপনাদের বাহাত্তর নম্বর!"

নিজেদের ঘড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সেখানে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটে! হতভম্ব বেশ একটু হলেও যতটা অপ্রস্তুত হবার কথা ততটা যে হইনি তার যথেষ্ট কারণ অবশ্য আছে। সোজা সামনের রাস্তা ছেড়ে আমাদের বনমালি নস্কর লেনটা

পেছনে যেসব সরু সরু জঘন্য গলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে—আর যেসব গলি ব্যবহার করা দূরে থাক, ভাল করে চিনি-ই না—সেই পথেই তিনি আসবেন তা ভাবব কী করে!

তা ছাড়া যিনি এসেছেন তিনি তো পরাশর বর্মা নন, তাঁর প্রতিনিধি কৃত্তিবাস ভদ্র। আসার কথা থাকলেও পরাশর নিজে এলেন না কেন?

আমাদের মনের প্রশ্নটা মুখে ফোটবার আগেই কৃত্তিবাস নিজে থেকেই জবাবটা দিয়ে জানালেন, বিশেষ একটা কাজেই আটকা পড়ার দরুন তাঁর হয়ে কৃত্তিবাসকেই আসতে হয়েছে। কৃত্তিবাসের কাছে ব্যাপারটা শুনে প্রয়োজন হলে পরাশর নিজে আসবেন।

দুধের সাধ ঘোলে মেটে না জেনেও এত কষ্টে সাজানো ব্যাপারটা পুরোপুরি পণ্ড না হতে দেবার জন্য কৃত্তিবাসকে নিয়েই বাহাত্তর নম্বরে ঢুকতে হল।

সিঁড়ি দিয়ে কৃত্তিবাসকে নিয়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাজানো প্রোগ্রামের আর-এক চালের ভুলের নমুনা পেলাম।

ব্যবস্থা ছিল এই যে আমরা পরস্পরকে নিয়ে যখন ওপরে উঠে আসব তখন ঘনাদা আড্ডাঘরে তাঁর মৌরসি কেদারায় প্লেটে করে হাঁড়িয়া কাবাবের নমুনা চাখতে ব্যস্ত থাকবেন। ঠিক তখনই আমরা পরাশর বর্মাকে তাঁর কাছে হাজির করব এইটেই প্রোগ্রামের একটা ছকা চাল।

পরাশর না হয়ে কৃত্তিবাস হলেও আড্ডাঘরে ঢোকার পর ঘনাদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে যৎকিঞ্চিৎ একটা পালা হয়তো জমানো যেতে পারত।

কিন্তু কেমন করে যেন ঘনাদার সঙ্গে বেঢপ্পা বারান্দার ওপরই দেখা হয়ে গেল। দেখা হয়ে যাবার পর আমাদের পাকা চালগুলো কেঁচে গিয়ে এত তোড়জোড় আর হয়রানির যৎসামান্য একটু উসুল করবার মতো কিছু পাওয়া যাবে কি?

তা অবশ্য গেল।

আর যা গেল তা আমাদের সব হিসেবের বাইরে।

ন্যাড়া সিঁড়ির নীচের ধাপ থেকে বারান্দার অন্য প্রান্তে কৃত্তিবাসের সঙ্গে আমাদের দেখে ঘনাদা অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন কে ভাবতে পেরেছিল?

উচ্ছ্বসিত অবস্থাতেই বিদ্যাসাগরি চটি ফটফটিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে তিনি বললেন, "আরে পরাশর যে! এসো, এসো! তুমি হঠাৎ আসবে এ যে ভাবতেই পারিনি।"

ঘনাদা আমাদের দেখে এমন উচ্ছ্বসিত হবেন তাও ভাবতে পারিনি আমরা। একটু হতভম্ব অবস্থাতেই ঘনাদার ভুলটা সংশোধনের জন্য তবু ব্যস্ত হতে হল।

"ইনি পরাশর নন, ঘনাদা—মানে ইনি তাঁরই বন্ধু আর প্রতিনিধি কৃত্তিবাস ভদ্র, মানে—"

ওইখানেই আমাদের এক ধমকে থামিয়ে ঘনাদা বললেন, "বটে! উনি পরাশর নন, কৃত্তিবাস? জাত জেলেকে কই দেখিয়ে তেলাপিয়া বোঝাচ্ছ? পাকা মালিকে বাগানে লিচু দেখিয়ে বলছ আঁশফল? ও যদি পরাশর না হয় তা হলে আমি—"

"না, না ওঁদের কোনও দোষ নেই—" আমাদের অবস্থা দেখেই বোধহয় কৃত্তিবাস এবার দয়া করে গোলমালের জটটা ছাড়ালেন।

কিন্তু তিনি যা বললেন তাতে আমরা আবার থ।

আমাদের কৃত্তিবাস নাকি সত্যিই কৃত্তিবাস নন, তিনিই আদি ও অকৃত্রিম পরাশর বর্মা। কৃত্তিবাস ভদ্র কিছুদিনের জন্য কোনও এক সাংবাদিক সম্মিলনীতে দূরে কোথাও গেছেন বলে পরাশর তাঁর বাড়িতেই ক-দিনের জন্য অজ্ঞাতবাসে আছেন। সেই অবস্থায় আমরা সেখানে তাঁকে দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হই বলেই তার সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেকে কৃত্তিবাস বলে চালিয়েছেন। ছদ্মনামে এখানে এলেও তাঁর সত্যকার উদ্দেশ্যটা এবার তিনি সরবে ঘনাদাকেই উদ্দেশ করে বললেন, "মিথ্যে নাম দিয়ে এখানে আসার সত্যিকার উদ্দেশ্য হল আপনাকে দেখে আপনার পায়ের ধুলো নেবার সুযোগ নেওয়া।"

কথাগুলো বলতে বলতে আমাদের কৃত্তিবাস থুড়ি পরাশর বর্মাকে সত্যিসত্যি নিচু হয়ে ঘনাদার পায়ের ধুলো নিতে দেখে আমরা তো থ।

আমাদের সাজানো নাটক আসল অভিনয়ে এ রকম দাঁড়াবে আমরা কি ভাবতে পেরেছি!

এরপর বিস্ফারিত চোখে যা যা দেখলাম সে সবই আমাদের হিসেবের বাইরে।

বিবরণটা পরপর শুধু দিয়ে যাই।

কৃত্তিবাস থুড়ি আসলে পরাশর পায়ের ধুলো নিতে নিচু হতেই—"আরে, করো কী করো কী" বলে ঘনাদা যে আলতো বাধা দিলেন তাতে কৃত্তিবাস থুড়ি পরাশর বর্মার ধুলো না মিলুক, পা ছুঁতে কোনও অসুবিধা হয় না।

ঘনাদা এবার পরম সমাদরে কৃত্তিবাস থুড়ি পরাশরকে তুলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডাঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম অবশ্য আমরাও।

এ দুই ক্ষণজন্মার মিলনের জন্য ঘনাদার মৌরসি কেদারার জুড়ি আর একটি কেদারা আগে থাকতে আমরাই পাতিয়ে রেখেছিলাম।

সে দুই কেদারাতেই বসে দুজনের আলাপ যেটা শুরু হল সেইটেই আমাদের চিত্রনাট্যের একেবারে উলটো।

দুজনের দেখা হবার পর কাছাকাছি বসার সঙ্গে সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে আগুনের ফুলকি ছোটাবার কথা, তার বদলে মধু ঝরে পড়তে লাগল যেন দুজনের জিহ্বা দিয়ে।

নিজেদের কানে শুনতে হল ঘনাদা বলছেন, "কতবার ভেবেছি এদের কাউকে দিয়ে তোমায় একবার বাহাত্তর নম্বরে ডাকিয়ে আনি। কিন্তু তুমি ব্যস্ত মানুষ, তার ওপর তোমার এত নাম-ডাক। সত্যিই আসবে কি না বুঝতে না পেরে—"

"না, না, কী বলছেন, কী!" ঘনাদাকে থামিয়ে পরাশর—হ্যাঁ, সত্যিই পরাশর আবার মধু বর্ষণ শুরু করেন, "আমারই কতদিন ধরে আসবার ইচ্ছে। শুধু আপনি পাছে বিরক্ত হন এই ভয়ে—"

"না, না বিরক্ত হব কী—" বলে ঘনাদা মহানুভবতার পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। তার আর অবসর না দিয়ে পরাশর তৎক্ষণাৎ আবার সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন, "তবে

চোখে না দেখলেও যেখানে গেছি সেখানেই আশ্চর্য সব কাণ্ডের মধ্যে আপনার হাতের ছাপ ঠিক ধরতে পেরে ধন্য ধন্য করেছি মনে মনে। এই তো সেদিন টেকসাসে—না, না অ্যারিজোনায় সেই ক্রুগার-এর আজব ভুট্টার খামারে। কোন ক্রুগার-এর কথা বলছি আপনি তো বুঝতেই পারছেন।”

ঘনাদাকে একটু কি অপ্রস্তুত দেখিয়েছে! দেখালেও তা সেকেন্ড দু-একের জন্য। তাতেই সামলে তিনি বলেছেন, “সেই ওটিস ক্রুগার-এর কথা বলছ তো।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ওটিস ক্রুগার!” ঘনাদার স্মরণশক্তিতে যেন অবাক হয়ে বলেন পরাশর, “সে তো আসলে গুপ্ত এক নাৎসি শয়তান হিটলারের জার্মানিতে একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালাত। তারপর যুদ্ধে জার্মানির হার হবার পর লুকিয়ে বারবার নাম ভাঁড়িয়ে অনেক ছলচাতুরি করে আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, সেখান থেকে কানাডা হয়ে আমেরিকার দক্ষিণে পালিয়ে আসে। সে যে সেখানে এসেও কী সর্বনাশা শয়তানি চক্রান্ত আঁটছিল সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা জার্মানির বিপক্ষে ছিল সেই সমস্ত দেশের মানুষের মধ্যে কে যে প্রথম ধরে ফেলেন আর তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তা আমেরিকার অ্যারিজোনা থেকে এক মি. কেগান-এর জরুরি ডাক পেয়ে সেই কেগান-এর বিরাট র‍্যাঞ্চ-এ যাবার পর বুঝলাম।

কেগান-এর র‍্যাঞ্চ একটা দেখার মতো জায়গা। মাইলের পর মাইল কোথাও যেন সীমা-নেই ঢেউ-খেলানো আধা-বুনো ঘোড়ার পাল চরিয়ে বড় করবার প্রান্তর। কোথাও বা তেমনই বিশাল ভুট্টার খেত। সে এমন যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

দেবতাদের কাছেও লোভনীয় এইসব তুলনাহীন র‍্যাঞ্চ-এর এক দারুণ দুশমনকে ধরে এনে কেগান-এর হাতে তুলে দেবার জন্য আমার সেখানে ডাক পড়েছিল।

কেগান-এর সঙ্গে আমার যেখানে দেখা হল সেটা ওই র‍্যাঞ্চ-এর মধ্যেই তার একটা ছোট ল্যাবরেটরি।

কিন্তু সে ল্যাবরেটরির চেহারা দেখে মনে হল দুটো খ্যাপা মোষ যেন তার মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অবস্থা তাতে যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভাঙচুর জিনিসের আবর্জনার স্তূপে চালান করা ছাড়া কোনও গবেষণার কাজ আর তা দিয়ে যে চালাবার নয় তা বুঝতে দেরি হয় না।

ল্যাবরেটরির অবস্থা স্বচক্ষে আমি যাতে দেখি সেই জন্যই নিশ্চয় কেগান সেখানে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। ল্যাবরেটরির মতো তার মালিকের অবস্থাও অবশ্য শোচনীয়। তাঁর মাথায় একটা চওড়া ব্যান্ডেজ বাঁধা, বাঁ হাতটাও কাঁধ থেকে একটা স্লিং-এ ঝোলানো।

কেগান কম কথার মানুষ। চুরমার হওয়া ল্যাবরেটরি আর নিজের জখমি চেহারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি বললে, ‘দেখুন, মিস্টার ভর্মা, এখানে যা দেখবার, দেখেছেন। এ ছাড়া আমার সমস্ত র‍্যাঞ্চটা

আপনাকে ভাল করে দেখাবার ব্যবস্থা আমি করছি। এ সব দেখে এই ল্যাবরেটরি নিয়ে আমার এই র্যাঞ্চ-এর সব দিক দিয়ে চরম সর্বনাশ যে করেছে তাকে যে কোনও উপায়ে হোক ধরে আমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। এ ব্যাপারে কাগজে কাগজে জানাজানি আর পুলিশের ঘাঁটাঘাঁটি আমি চাই না। তাই সম্পূর্ণ নিঃশব্দে গোপনে কাজটা হাসিল করার ভার আপনার ওপর দিতে চাই। ওই সঙ্গে এ কথাটাও জানিয়ে দিচ্ছি যে খরচার ব্যাপার আপনি যা দরকার মনে করেন, করতে পারবেন। এখন আমার এক কর্মচারীকে দিয়ে আপনাকে র্যাঞ্চটা দেখাবার ব্যবস্থা করি।'

কেগান তার একজন কর্মচারীকে ডাকতে যাচ্ছিল। আমি যে এখানে আসার পরে—কেগান-এর সঙ্গে বিকেলে দেখা হওয়ার আগেই—র্যাঞ্চ-এর যা যা বিশেষ দেখবার তা দেখা সেরে ফেলেছি সে কথা জানিয়ে কেগানকে বাধা দিয়ে বললাম, 'শুনুন, দরকার হলে যা দেখবার সময়মত দেখা যাবে। তার আগে যে মানুষটিকে ধরে এনে আপনার হাতে তুলে দিতে বলছেন তার একটু বিবরণ আর পরিচয় আমার জানা দরকার নয় কি? মানুষটা কে, কোথা থেকে এল, কী কাজে তাকে লাগিয়েছিলেন, সবই আমি জানতে চাই।'

'দেখুন,' তার দুশমনির কথা মনে করতে গিয়েই রাগে আক্রোশে মুখটা বিকৃত করে কেগান বললেন, 'সত্যি কথা বলতে গেলে লোকটা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

'কিছু না জেনে তাকে আপনার র্যাঞ্চ-এ কাজ দিয়েছিলেন?' আমি একটু সন্দিগ্ধ মুখেই জিজ্ঞাসা করে বললাম, 'এরকম দস্তুর তো আপনাদের নয়।'

'না, তা নয়,' কেগান অত্যন্ত আফশোসের সঙ্গে স্বীকার করলে, 'কিন্তু এরকম আহাম্মুকি করার তখন একটা কারণ ছিল। র্যাঞ্চ-এ কাজ নেবার জন্য ভবঘুরে হাঘরে গোছের উটকো লোকই আসে। দেখামাত্র তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেদিন একটা শুটকো কালা মর্কট গোছের চেহারার হাঘরে এসেছিল অমনই কাজের খোঁজে। তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তার মাঝে সে হঠাৎ মেজাজ দেখিয়ে বলল—আমাকে দেখেই তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? একটা যা হোক কাজ দিয়ে দেখুন না। না পারলে দূর করে দেবেন।

লোকটাকে দেখেই আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। ও ধরনের চেহারা আমাদের এ অঞ্চলে চোখেই পড়ে না। এখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান নয়, কাফ্রি-টাফ্রি তো নয়ই। শুঁটকো পাকানো, খেতে-না-পাওয়া কেলে চেহারা দক্ষিণের মেক্সিকোর কোনও পাহাড়ি আদিবাসী-টাসী হবে ভেবেছিলাম। আমার র্যাঞ্চ-এর বুনো ঘোড়ার পাল আপনার এখনও হয়তো চোখে পড়েনি। সে পাল দেখলে বুঝবেন আমেরিকার এই দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোনও র্যাঞ্চ-এ এমন দুর্দান্ত বুনো ঘোড়ার পাল নেই, এদের মধ্যেও আবার কালাদানো বলে এমন একটা দারুণ তেজি বুনো ঘোড়া আছে, কোনও রাখাল এখনও যার গলায় ল্যাসো-র ফাঁস লাগাতে পারেনি। আমার ঘোড়ার রাখালরা অন্য ঘোড়া-টোড়া যা দরকার মতো

ধরা-বাঁধা করুক, ও কালাদানোর কাছেও ঘেঁসে না। বুনো ঘোড়াদের ভেতরও দৈত্যের মতো তাদের রাজার মতো এই কালাদানো নিজের খুশিতে ঘুরে বেড়ায়। একজন অতি সাহসী তাকে বাগে আনবার আহাম্মুকি করতে গিয়ে হাত-পা তো বটেই, প্রাণটা পর্যন্ত গুনাগার দিয়েছে।

শুঁটকো মর্কটটার জাঁক শুনে তাকে একটু উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ঠাট্টা করে বলেছিলাম—হ্যাঁ, কাজ তুই পাবি কালা নেংটি! তার জন্য কী করতে হবে জানিস?

আজ্ঞে, বলুন কী করতে হবে!—কালা নেংটিটা বিনয়ে যেন গলে যাচ্ছে।

বললাম—আমার র‍্যাঞ্চ-এ ঘোড়ার পালটা দেখেছিস?

পাল আর কী দেখব, হুজুর—নেংটিটা তার বিনয়ে গদগদ গলাতেই একটু তাচ্ছিল ফুটিয়ে বলেছিল—দেখেছি আপনার কালাদানোকে! হ্যাঁ, ঘোড়ার মতো ঘোড়া বটে একটা!

বটে!—লোকটার মুখে কালাদানোর এই প্রশংসাতেও জ্বলে উঠে বলেছিলাম—তা হলে কালাদানোকেই বাগ মানিয়ে ধরে নিয়ে আয়, তা হলেই এখানে চাকরি তোর পাকা।

কিন্তু—বলে লোকটা এবার একটু সুর টানতেই তার জারিজুরি খতম হয়েছে বুঝে বলেছিলাম—কিন্তু আবার কী? সে মুরোদ তোর নেই, এই তো?

আজ্ঞে না, হুজুর?—লোকটা বলেছিল—আমি শুধু বলছি যে কালাদানোকে ধরা ভাল হবে না। সেটা উচিত নয়।

কেন উচিত নয়?—খিঁচিয়ে উঠেছিলাম লোকটার ওপর—তোর মতো কালা নেংটি-র কালাদানোকে ধরবার ক্ষমতা নেই তাই বল।

ক্ষমতা আছে কি না তা তো দেখতেই পাবেন, হুজুর—নেংটিটা তবু যেন ধাপ্পা দিয়ে মান বাঁচাবার চেষ্টা করে বলেছিল—কিন্তু ওরকম তেজি স্বাধীন রাজা-ঘোড়া একবার হার মেনে ধরা পড়তে বাধ্য হলে সে অপমান হজম করে আর বাঁচবে কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

থাম! থাম!—এবার সত্যিই জ্বলে উঠে আমার হান্টারটা দেখিয়ে বলেছিলাম—তোর বাহাদুরি সব বোঝা গেছে, এক কালাদানোকে ধরে আনতে পারিস তো আন, নইলে হান্টার দিয়ে চাবকে এ মুল্লুক ছাড়া করব।

আপনার যা মর্জি—বলে লোকটা চলে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম নেংটিটা আর এ মুখো হবার সাহসই করবে না।

দুদিন তার দেখাও পাইনি সত্যিই। কিন্তু তার পরে তিন দিনের দিন সকালে ঘুমভাঙার পর আমার শোবার ঘরের বাইরে লোকজনের হইচই হাঁকডাক শুনে বাইরে এসে একেবারে তাজ্জব।

সেই কালা নেংটিটা ফিরে এসেছে।

আর ফিরে এসেছে একা নয়, সেই আমার র‍্যাঞ্চ-এ জীবন্ত তুফানের মতো দুর্দান্ত বুনোঘোড়া কালাদানোর ওপর সওয়ার হয়ে।

কথার খেলাপ না করে নেংটিটাকে কাজ দিলাম। কী কাজ করবি তুই? প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অবশ্য। সে বলেছিল—আজ্ঞে, যে কাজ দেন তাই করব। তবে র‍্যাঞ্চটা তদারকি করতে দিলেই ভাল হয়।

ভাল হয়?—নেংটিটাকে ক-দিন খাটিয়ে তার হাড় কালি করার ব্যবস্থা করে বিদায় করব ঠিক করে নিয়ে বলেছিলাম—বেশ, তাই কর।

সেই বলাই যে আমার কাল হবে তা তখন ভাবতে পারিনি। ক-দিন বাদে লোকটাকে আমার ভুট্টাখেতের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম—তোকে এ খেতের বেড়া মেরামত করতে বলেছিলাম। খেতের ভেতর তুই করছিস কী?

সে এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে বলেছিল—খেতের ভেতর সর্বনাশা পোকা হয়েছে, তাই তাদের মারবার ব্যবস্থা করছিলাম।

পোকা হয়েছে? আমার খেতে? খেপে উঠে বলেছিলাম—আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে? কী পোকা হয়েছে, তাই বল?

না, আজ্ঞে, সে পোকা আপনি চিনবেন না—নেংটিটা সোজা আমার মুখের ওপর বলেছিল—তবে সে পোকা আজ রাত্রে আপনাকে দেখিয়ে দেব।

রাত্রে আমার খেতের বাইরের সীমানার ওপর নানা জায়গায় আগুন জ্বেলে সে সত্যিই আলোর টানে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া রাশি রাশি পোকা আমায় দেখিয়ে বলেছিল—এর নাম মাজরা পোকা। এ আপনার দেশের পোকা নয়।

আমার দেশের পোকা নয়, এখানে এল কী করে?—রেগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে।

দরকারে কোথাকার পোকা কোথায় আসে কেউ জানে?—বলে নেংটিটা আমার হাতের একটা রাম-রদ্দা খাবার ভয়েই বোধহয় সরে পড়েছিল। কিন্তু পরের দিন সকালেই আমার ল্যাবরেটরিতে তাকে একটা টেবিলে বসে যন্ত্রপাতি টিউব ইত্যাদি মন দিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে একেবারে আগুন হয়ে উঠে বলেছিলাম—তুই এখানে? আমার ল্যাবরেটরিতে? কার হুকুমে এখানে ঢুকেছিস?

হুকুম আবার কার!—সে নেংটিটা বেপরোয়া গলায় জবাব দিয়েছিল—সমস্ত র‍্যাঞ্চ তদারকি করা আমার কাজ! তাই ল্যাবরেটরিতে কী হচ্ছে তাই দেখছি।

তাই দেখছিস! তোর ওই দেখার চোখ দুটোই উপড়ে ফেলে দেব!—বলে তার ঘাড়টা মটকাবার জন্য ধরতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কী যে হল। নেংটিটা কী এমন শয়তানি প্যাঁচ লাগাল যে ঘাড়মাথাটা দেয়ালে ঠুকে একেবারে সচাপ্টে ছিটকে গিয়ে পড়লাম। তখন আর ওঠবার ক্ষমতা নেই। সেই অবস্থাতেই দেখলাম ওই ঘরেরই একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সে সমস্ত ল্যাবরেটরি চুরমার করে দিয়ে আমার লক্ষ লক্ষ ডলারের সব গবেষণা নষ্ট করে দিচ্ছে। ল্যাবরেটরি ধ্বংস করার পর সে পালিয়েছে, কিন্তু আমেরিকা ছেড়ে এখনও যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আমার এমন বন্ধুবান্ধব কিছু আছে যারা তা হলে আমায় ঠিক খবর দিত। এখন

আপনাকে যেমন করে হোক এই কালা নেংটিটাকে ধরে আমায় হাতে তুলে দিতে হবে। আমি একটা একটা করে তার প্রত্যেকটা অঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার সামনে ঝোলাব—'

'খুব সাধু সংকল্প আপনার!' কেগানকে তার হিংস্র উল্লাসের মাঝখানে থামিয়ে বললাম, 'কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকটা তথ্য শোনাই। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে দুনিয়ায় প্রায় দু-লক্ষ আগাছা আছে, তার মধ্যে অধিকাংশ আগাছাই মানুষের খেত-খামার থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু কিছু এমন কড়া আগাছা আছে যারা কোনও মতে হার মানে না। তাদের কারও বীজ মাটির তলায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর অনায়াসে ঘুমিয়ে থেকে আবার সুযোগ পেলেই—'

আমি এ সব কথা বলতে বলতে লক্ষ করছিলাম, কেগানের মুখ এ সব শুনতে শুনতে প্রথমে কেমন হতভম্ব, পরে একেবারে রাগে লাল হয়ে উঠছে। সে তারই মধ্যে গনগনে গলায় আমায় বললে, 'এ সব কী প্রলাপ বকছেন আপনি?'

'ও, প্রলাপ মনে হচ্ছে?' আমি যেন দুঃখিত হয়ে বললাম, 'তা হলে প্রলাপ না মনে হয় এমন কথা বলছি শুনুন—ব্র্যাসিকা নায়গরা নামটা শুনলে আপনি হয়তো খুশি হবেন। ওর একটা আটপৌরে নামও আছে—' "

"—ব্ল্যাক মাস্টার।"

কে? কে বললেন কথাটা! না, পরাশর বর্মা কি তাঁর মুখ দিয়ে শোনা কেগান-এর কথা নয়।

এ উচ্চারণটি স্বয়ং ঘনাদার।

পরাশর বর্মা হাত তুলে সেলামের ভঙ্গি করে বললেন, "ঠিক বলেছেন। ব্ল্যাক মাস্টার—নামটা শুনিয়ে তারপর আবার কেগানকে বললাম, 'অনেক এমন নামগান আপনাকে শোনাতে পারি। এদের মধ্যে কোনওকোনওটি যে জমিতে জন্মায় সেখানকার ফসল শুধু ধ্বংস করার নয়, তা বিষিয়ে দেবার ক্ষমতাও আছে। ধরুন—অ্যানেস্থেরা বিয়েন্নিশ—নামটা একটু বাঁকাচোরা করেই বললাম, তবে ওর আটপৌরে নাম ইভনিং প্রিমরোজ নামটায় কোনও গোলমাল নেই। ওইরকম নামের দু-চারটে আগাছাকে চেষ্টা করে সর্বনাশা করে তোলা যায় নাকি, যাতে মানুষের এত যুগের চাষবাসের নাভিশ্বাস উঠতে পারে—'

'এ সব কথা আমায় শোনাবার মানে?'

অনেক আগেই লক্ষ করেছি কেগান-এর বাঁ হাতটা স্লিং-এ ঝোলানো থাকলেও সে ডান হাতে একটা পিস্তল ধরে আছে। এবার সেটা আমার দিকে তুলে সে আবার বলল, 'এ সব কথা আমায় শোনাবার মানে কী?'

'মানে তো আপনার হাতের ওই পিস্তলই বলে দিচ্ছে।' একটু হেসে পিস্তলের মুখটা একটু সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'শুনুন, আপনার র‍্যাঞ্চ-এর চাষ লোক দেখানো ভুট্টার হলেও আসলে তা আগাছার—আর এমন আগাছার যা মানুষের এতকালের চাষ, তার কৃষিবিদ্যাকে ধ্বংস করার সর্বনাশা আয়োজন করতে পারে। কিন্তু সমস্ত সভ্য মানুষের এমন শত্রুতা আপনি করছেন কেন? করছেন এই জন্য যে আপনার

আসল নাম কেগান নয়, ক্রুগার, হ্যাঁ, হের ক্রুগার—এই নামটা বদলে আপনার আগেকার নাৎসি স্বরূপটা চাপা দিতে চেয়েছেন। সফলও হয়েছিলেন। জার্মানির তখনকার শত্রু সমস্ত দেশের সর্বনাশের জন্য এই আমেরিকায় লুকিয়ে আপনি এক ভয়ংকর শয়তানি চক্রান্ত করেন। সে চক্রান্ত হল এই র‍্যাঞ্চ চালিয়ে তার মধ্যে এমন একটি আগাছার সৃষ্টি করা যার গ্রাসে আমেরিকার—তার পরে তখনকার মিত্রশক্তির সব দেশের—কৃষির সর্বনাশ করে দেবে।

আপনার সে চক্রান্ত কিন্তু সফল হল না।আপনার এ ভয়ংকর শয়তানি চক্রান্ত ধরে ফেলে যিনি আপনার কাছে কাজ নিয়েছিলেন সেই কালা নেংটিটা আপনার ল্যাবরেটরিই শুধু চুরমার করে যাননি, আপনার ভুট্টার খেতে যে সর্বনাশা আগাছা আপনি লালন করছিলেন, উপযুক্ত বীজাণুঘটিত রোগ ধরিয়ে, তা ধ্বংসের ব্যবস্থাও পাকা করে গেছেন। আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার আগেই আমি নিজে আপনার চাষের খেত দেখে ও আপনার লোকজনের কাছে খেতের অবস্থা শুনে তা বুঝে নিয়েছি।

আমাকে পিস্তল ছুঁড়ে মেরেও আপনার কোনও লাভ হবে না, মি. ক্রুগার। কারণ এতক্ষণ সকালে র‍্যাঞ্চ ঘুরে দেখে আপনার আসল পরিচয়টা জানার দরুন আমি বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আর একটা কথা মনে রাখবেন, যে নেংটিটা আপনার এই দশা করেছে আমি তাঁরই দেশের লোক। আমার বুকের বদলে মাথার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করতে গেলে আপনার পিস্তল সমেত গোটা ডান হাতটাই হয়তো ভেঙে আসতে পারে। সুতরাং সে চেষ্টা না করে কালা নেংটিটার কাছে এফবিআই সব খবর পেয়ে আপনার এখানে নিশ্চিত আসছে জেনে যেটুকু অবসর পেয়েছেন তাতে পালাতে পারেন কি না দেখুন।'

কেগান মানে ক্রুগার তা-ই করেছিল, আর আমি তার কালা নেংটিটাকে মনে মনে অজস্র প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।"

পরাশর বর্মা থামলেন এবং তারপর যা যা হবার ঠিকই হল। রামভুজের হাঁড়িয়া কাবাবের সদ্ব্যবহার তো হয়েছেই, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছুর। আর এ সবের মধ্যে ঘনাদা পরাশর বর্মা সম্বন্ধে যা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন পরাশর বর্মা হয়েছেন তার দুগুণ।

অবশেষে যাবার সময় হলে ঘনাদা আমাদের ডেকে ট্যাক্সি আনিয়ে পরাশরকে সমাদরে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছেন তাঁর ডেরায়।

তাই দিতে গিয়ে আমরা ভেবেছি ট্যাক্সিতে ওঠবার পরই শুনব—'কী রকম বাঁশ দিয়ে তুললাম আপনাদের ন্যাড়া ছাদের গুলবাজকে, দেখলেন তো!'

কিন্তু পরাশর বর্মা সে রকম একটি কথাও বলেননি। তার বদলে বলেছেন, "যথার্থ মানীর মান রাখতে পেরেছি এই আমার আনন্দ।"

আর ঘনাদা? ভেবেছিলাম, পরাশর বর্মাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার পর তাঁর কাছে গিয়ে শুনব—'মুখ্খু, মুখ্খু, একেবারে রাম মুখ্খু। শুধু বরাতে করে খাচ্ছে

গোয়েন্দা হয়ে।'

তার বদলে তিনি বলেছেন, "দেখলে তো হে, সেই পুরনো কথার দাম! বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্! পেটে সত্যিকার বিদ্যে আছে তাই ওই বিনয়।"

আমরা বুঝেছি যে ঘনাদা ও পরাশর বর্মা দুজনের কাছে আমরাই কিছু শিক্ষা পেলাম।

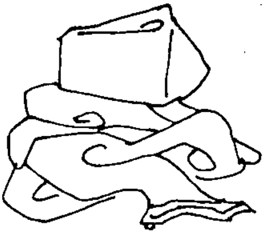

ঘনাদা ফিরলেন

ফিরে এলেন ঘনাদা?

তা ফিরতে গেলে তো যেতে হয় আগে। তিনি গেলেন কখন যে ফিরে আসবেন?

যাবার মধ্যে বাহাত্তর নম্বরে এসে অধিষ্ঠিত হবার পর একবারই এ আস্তানা ছেড়েছিলেন!

সেই বাপি দত্তের সময়ে।

বাপি দত্ত মানে যে বিগড়ি হাঁসে অরুচি ধরানো সেই বুনো বাপি দত্ত, তা নিশ্চয় আর বলতে হবে না। কোটি কুবেরের ধনের সমান এক আশ্চর্য ভারী জলের হ্রদের ভৌগোলিক ঠিকানা লেখা চিরকুট যার মধ্যে ভরা, ঘনাদার সেই নস্যির কৌটো উদ্ধার করে দুনিয়ার সব আমিরের ওপর টেক্কা দেবার আশায় যখন সে দিনের পর দিন একরকম বিগড়ি হাঁসযজ্ঞ চালিয়ে যাবে তখন একদিন হঠাৎ সত্যিই এক বিগড়ি হাঁসের পেটে এক খুদে কৌটো পেয়ে সমস্ত বাহাত্তর নম্বর প্রথমে একেবারে থ; তারপর আনন্দে আটখানা হয়ে ঘটা করে কৌটো খোলবার অনুষ্ঠান দেখাবার জন্য ঘনাদাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে ডেকে এনেছিল বাপি দত্ত নিজে।

সে কৌটো খোলার পর বাপি দত্তের অবস্থা দেখবার জন্য ঘনাদা আর দাঁড়াননি। কৌটো খুলে ভেতরকার চিরকুটটা বার করে গৌর না শিশির কে একজন তা পড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনাদাকে সেখানে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি বাহাত্তর নম্বরেই আর দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস।

বাপি দত্তও সেইদিন বিকাল থেকেই সেই যে বাহাত্তর ছেড়ে দিল আর আসেনি।

কী ছিল এমন মোক্ষম মারাত্মক ওই নস্যির কৌটোয় ভরা চিরকুটে?

লেখা ছিল দুটি মাত্র শব্দ—'ঘনাদার গুল'।

ঘাপি দত্ত না ফিরলেও ঘনাদা একদিন আবার ফিরেছিলেন আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে।

ফিরেছিলেন সমস্ত ঘনাদা বৃত্তান্তের মধ্যে মাত্র একবারের জন্য দেখা দেওয়া সেই 'দাদা' উপাখ্যানে। তাঁকে নিয়ে দাদার উপহাসের গল্পের যেন জীবন্ত জবাব হয়ে।

ফিরে আসাটা যেমন নাটকীয়, আগের বারের যাওয়ার মতো সামান্যই হোক, তেমনই একটু হুঁশিয়ারির ভূমিকা ছিল।

বিগড়ি হাঁসের পেটে নস্যির কৌটোয় কুবেরের তোশাখানার হদিস পাওয়ার আশা নেহাত আজগুবি কল্পনার ফাঁপা ফানুস হলেও তা কখন ফাটে বলে মনের মধ্যে কৌতূহলের একটু সুড়সুড়ি অন্তত ছিল।

এবার কিন্তু একেবারে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

ছুটির দিন দুপুরবেলায় একটু এলাহি খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যায় জমাটি আড্ডার জন্য তৈরি হতে যে যার ঘরে একটু বিশ্রাম করে নীচে যাবার আগে দু-দশ মিনিটের চুটকি আলাপের ফাঁকে ষোলো আনা খোশমেজাজে হাজির দেখে গেছি, দোতলার বারান্দা থেকে ন্যাড়া ছাদের তাঁর টঙের ঘরে যাবার একানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার আগে যিনি রাত্রের মেনুটা শিশিরের কাছে জেনে নিয়ে প্রুফ দেখার মতো করে তাতে ক-টা কমা-সেমিকোলন বদল করেছেন মাত্র সেই বাহাত্তর নম্বরের একমেবাদ্বিতীয়ম্ তিনি হঠাৎ সন্ধ্যা হতে না হতেই একেবারে নিরুদ্দেশ!

আর সে খবর আমাদের জানতে হল ঘনাদার নতুন শখ বা নেশা করা, জরদা-তবক-জড়ানো বেনারসি খিলি সাজিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সারা চৌরাস্তা যার খোশবুতে ভুরভুর করে, মোড়ের সেই হিন্দি বাংলা ইংরেজিতে সাইনবোর্ড মারা পানের দোকানে অপেক্ষা করতে করতে দোকানেরই রেডিয়োয় ঘোষণা শুনে?

এমনিতে রাস্তাঘাটের বেতারের পরিবেশন আর পাঁচটা শহুরে হই-হট্টগোলের থেকে আলাদা হয়ে কানে বড় একটা যায় না।

এ বেতার-ঘোষণাটা কিন্তু গেল! এবং গেল কর্ণকুহর যেন বিদীর্ণ করে একেবারে মরমে।

বেতার-ঘোষণাটা হচ্ছিল নিরুদ্দিষ্টের সংবাদের। এবং ভাষাটা ছিল ইংরাজি।

সেই ইংরাজি ঘোষণায় হঠাৎ বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন শুনেই চমকে উঠেছিলাম। তার পরে যা শুনলাম তাতে শুধু হতভম্ব নয়, সমস্ত শরীর যেন হঠাৎ জমে ঠাণ্ডা পাথর।

যা শুনেছি তাতে নিজেদের কানগুলোকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কী বলছে কী বেতার-বিজ্ঞপ্তি? গতকাল বিকাল থেকে বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন থেকে নবীন ও প্রবীণ প্রাজ্ঞ মহলে সুপরিচিত শ্রীঘনশ্যাম দাস মহাশয় নাকি

নিরুদ্দেশ।

নিরুদ্দেশ? ঘনশ্যাম দাস মানে ঘনাদা?

কী বলছে কী বেতারের প্রলাপ? বলে নিজেদের যখন প্রশ্ন করছি তখন নিরুদ্দিষ্টের সন্ধান পেলে খবর জানাবার ঠিকানা হিসাবে বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের ঠিকানাটাই আবার উচ্চারিত হয়ে ঘোষণাটি শেষ হল।

না, গভীর নিদ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন কিছু দেখছি না আমরা। বড় রাস্তার মোড়ে সুবিখ্যাত বেনারসি পানের দোকানের সামনে বহাল তবিয়তে যথার্থই উপস্থিত আছি।

রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস লরি গাড়ি রিকশ ও পদাতিকের ভিড় যথারীতি প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ—অথচ—বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন থেকে নবীন প্রবীণ দুই মহলে ঘনাদা আর ঘনশ্যাম দাস নামে এক ডাকে সবাই যাঁকে চেনে সেই তিনিই নাকি নিরুদ্দেশ!

সে নিরুদ্দেশ হবার খবরটা আমাদের জানতে হল আবার বেতার-ঘোষণা মারফত!

বাহাত্তর নম্বরের দিকে সবাই মিলে ছুটে যেতে যেতে শেষ কখন ঘনাদাকে কোথায় কীভাবে দেখেছি তা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করবার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ, টঙের ঘরের তাঁর সঙ্গে অদর্শনটা একটু বেশিক্ষণের জন্য হয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! ব্যাপারটা সত্যিই একটু অস্বাভাবিক। সকালে তাঁর সঙ্গে সবদিন অবশ্য দেখা হয় না। কিন্তু সকালে না হলেও বিকেলে আড্ডাঘরে দেখা যে হবেই তা একরকম ধরেই নেওয়া যেতে পারে। সকালবিকেল দুবেলাই তাঁর দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি এমন ব্যাপার তো আঙুলে গোনা যায়।

এবারে যা ঘটে গেছে তা কিন্তু আরও একটু বেশি কিছু।

শুধু গতকালের সকালবিকেল আর আজকের দিনের সকাল নয়, নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝতে পারলাম, গতকালের আগে পরশু বিকেলটা দিব্যেন্দু বড়ুয়ার এক নতুন জুড়ি আমদানির হুজুগে মেতে এক দাবা প্রতিযোগিতার খেলা দেখতে গিয়ে আমাদের আড্ডাঘরে হাজিরা দেওয়াটা ফসকে গেছে।

কিন্তু চার না হোক, আমাদের এই পাঁচ বেলার অন্যমনস্কতাতেই ঘনাদা বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে একেবারে নিরুদ্দেশ?

দেখাই শুধু হয়নি, নইলে ঘনাদার মেজাজে চিড় ধরাবার মতো এমন কিছু বেয়াদবিও তো করিনি আমরা কেউ!

আজকের দিন সকাল থেকে যে তাঁকে দেখা দিইনি সেও তো রাত্রের ভোজে তাঁকে একেবারে আহ্লাদে আটখানা করবার জন্য। তাঁর যা-যা বাদশাপসন্দ খানা, তা তো আছেই, তার ওপর একেবারে কিস্তিমাত-এর জন্য ব্যবস্থা আছে, 'স্মোকড হিলশা' অর্থাৎ খই-এর ধোঁয়ায় পাকানো নিষ্কণ্টক মানে কাঁটা-ছাড়া খোশবু সমেত আসল গঙ্গার ইলিশ মাছের লম্বালম্বা কালি। শহরের এক পয়লা নম্বর হোটেলের

পুরনো রসুইকরকে ভাড়া করে এনে ভোজের এই পদটি বিশেষ করে বানানো হয়েছে। যেমন ভোজ তার তেমনই তো মুখশুদ্ধির জন্য মোড়ের পানের দোকানের সেরা এই বেনারসি খিলির ব্যবস্থা।

এসব কিছু তা হলে বরবাদ মানে জলাঞ্জলি?

তার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার হল এই যে ঘনাদা এরই মধ্যে নিরুদ্দেশ। কেন? কোথায় বা তিনি গেলেন? সে খবর বেতারে ঘোষিত হবার ব্যবস্থাই বা হল কী করে।

বাহাত্তর নম্বরে ফিরে রামভুজ আর বনোয়ারিকেও ডেকে আলোচনা করে এ রহস্যের কোনও কিনারাই হল না। এইটুকু শুধু জানা গেল যে আমাদের সঙ্গে দেখা না হলেও আজ সকাল পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আমাদের এই বাহাত্তর নম্বরেই ছিলেন।

ছিলেন বটে, তবে কেমন একটু অস্থির-অস্থির ভাব যে ছিল তা চা দিতে গিয়ে আমাদের বনোয়ারিরও নজরে পড়েছে। কী এমন একটা তাড়াহুড়ো ভাবে যাতে তাঁর অতি পেয়ারের ফ্রেঞ্চ টোস্টও তিনি দুটোর জায়গায় দেড়খানা খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা খালি না করেই চলে গেছেন।

সকালের চা-টোস্টের প্রতি এই অবহেলা বনোয়ারি অবশ্য সকালের খাবারের ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেই লক্ষ করেছে। ঘনাদা তখন ঘরে নেই। তাঁকে এর পর সে আর দেখেনি। দেখেনি রামভুজ বা বাহাত্তর নম্বরের আর কেউ।

কিন্তু সেই সকালে বেরিয়ে ঘনাদা গেলেন কোথায়? তাঁর এই যাওয়াটা যে নিরুদ্দেশ হওয়া এমন খবরই বা বেতারে কে বা কারা পৌঁছে দিল আজকের দিনের মধ্যেই।

বাহাত্তর নম্বরের আড্ডাঘরে বসে যত আলোচনা করি তত আরও দিশাহারা হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত এ বাড়ির নতুন সহায়ের পরামর্শ নিতে তাঁর খিদিরপুরের বাসাতেই গেছি।

খিদিরপুরের বাসা যে পরাশর বর্মার তা বলাই বাহুল্য। ঘনাদার সঙ্গে তাঁকে লাগিয়ে দিয়ে একটু মজা পাবার লোভে একদিন তাঁকে মিথ্যে ছুতোয় ডাকিয়ে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম দুই মহামল্লের তাল ঠোকাঠুকিতে আগুনের ফুলকি ছিটোনো যে আতস বাজি হবে মজা করে তা দেখব।

কিন্তু কোথায় ঠোকাঠুকি! দেখা হওয়ার পর দুজনে যেন আমে দুধে মিশে গিয়েছিল। সেই গলাগলি সেই থেকে এমন চলছে যে বাহাত্তর নম্বরের একটা ঘটিবাটি হারালেও ঘনাদা আমাদের রহস্যভেদের জন্য পরাশর বর্মার কাছে পাঠান।

সুতরাং তাঁর কাছে তখনই যাব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু যাবার জন্য নীচে যাবার সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগেই বাধা।

বনোয়ারি এসে খবর দিলে বড়বাবু মানে আমাদের টঙের ঘরের তাঁর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

"দেখা করতে এসেছে তো হয়েছে কী?" বনোয়ারিকে ধমক দিয়েই বললাম, "বড়বাবু যে বাড়ি নেই তা বলতে পারোনি, হাঁদারাম?"

হাঁদারাম করুণভাবে জানাল যে সেই কথাটা সে বলেছে, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বনোয়ারির বড়বাবু আর আমাদের টঙের ঘরের তাঁর জন্যে যিনি এসেছেন তিনি নাকি সে সংবাদে কোনও গুরুত্ব না দিয়েই বলেছেন, "এখন নেই তো কী হয়েছে! কোই বাত নেহি—আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করব।"

বনোয়ারির এই বিবরণটুকু দেওয়ার মধ্যেই সিঁড়ির নীচে আগন্তুকদের দেখা গেল। হ্যাঁ, আর একজন নয়, দুজন। প্রথম জন কাশ্মিরি শালওয়ালা আর দ্বিতীয়জন তাঁর বেচতে-আনা শাল-দোশালার বোঝার বাহন।

ঘনাদার খোঁজে কাশ্মিরি শালওয়ালা আসার মানে?

মানেটা শালওয়ালার সঙ্গে একটু আলাপ করে জানা গেল, শালওয়ালা রশিদ খাঁ সাম্প্রতিক ঘনাদা-মোহিতদের একজন। শীতের আগে এই কলকাতায় খানদানিদের মহলে প্রতি বছর সে কাশ্মিরি শাল-দোশালা বেচতে আসে। তার বাহককে নিয়ে কোনও খরিদ্দারের কাছে যাবার পথে ঘনাদার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, আর সেই পথের দেখাতেই সামান্য কিছু বোলচালেই ঘনাদার কাশ্মিরি শাল-দোশালার কারবার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখে সে অবাক আর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তার সেরা এমন কিছু সওদা দেখাতে এসেছে যার কদর 'তাঁর মতো জহুরি'ই শুধু বুঝবে। রশিদ খাঁ তারপর মামুলি পাহাড়ি ভেড়ার লোমে তৈরি মাল আর পাঁচ হাজার ফুটের নীচে যারা নামে না সেই ভেড়ার জাতের পশমে বোনা পশমিনার তফাত বোঝার মতো ওস্তাদের যে স্তবগান শুরু করেছে তা নেহাত ঘনাদার নিরুদ্দেশ-রহস্য-ভেদের দায়েই সবিস্তারে শোনার লোভ সংবরণ করে তাকে কোনও রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—দিন কয়েক বাদে এলেই দেখা হবার আশ্বাস দিয়ে—বিদায় করতে হয়েছে।

অত্যন্ত ব্যথিত আর হতাশভাবে বিদায় নেবার আগে রশিদ খাঁ কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে একটি দামি মলিদা ঘনাদার জন্য রেখে গেছে। আমাদের ওজর আপত্তি কিছুই সে শোনেনি। দামের কথা তো মুখে আনতেও দেয়নি। ঘনাদা আর আমাদের সাধ্যের কথা ভেবে আমাদের সমস্ত আপত্তি এক কথায় খন্ডন করে বলে গেছে যে দামের জন্য কোনও পরোয়াই নেই। একজন যথার্থ পয়লা নম্বর সমঝদার জহুরির জন্য যে রেখে যেতে পারছে এই তার গর্ব।

শেষ পর্যন্ত রশিদ খাঁ-কে বিদায় দিয়ে পরাশর বর্মার খিদিরপুরের বাসায় যেতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে। রাত তখন প্রায় দশটা। অসময়ে তাঁকে বিরক্ত করতে যাওয়া ঠিক হবে কি না ভেবে মনে যা একটু দ্বিধা ছিল বাসায় পৌঁছেই তা দূর হয়ে গেছে। পরাশর বর্মার বাইরের ঘর শুধু খোলা না, সেখানে তখন তিনি বন্ধু কৃত্তিবাস ভদ্রের সঙ্গে কাব্যচর্চায় মশগুল।

আমাদের দেখে, হেসে ও মাথা নেড়ে, পরাশর সাদর অভ্যর্থনাই জানালেন ঠিক, কিন্তু পরের পর যেরকম ছড়া আর কবিতা তখন পড়ে যাচ্ছেন খাতা থেকে

তাতে আমাদের কোনও কথা ধৈর্য ধরে শোনার অবসর আছে বলে মনে হল না। তবু গরজ বড় বালাই।

তাই তাঁর কবিতা আর ছড়া পাঠের মধ্যে একটু-আধটু যা ফাঁক পেলাম তাতেই আমাদের সমস্যা যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, কাতরভাবে তাঁকে জানিয়ে তিনি কী বলেন তো শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

অপেক্ষা যে বৃথা—মনে মনে তখন হতাশভাবেই মেনে নিয়ে—নেহাত নিরুপায় হয়েই বসে বসে এ কাব্য-যন্ত্রণা কখন শেষ হবে তাই ভাবছি।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! অপেক্ষা করতে হলই না বলা যায়। একটা কী ছড়া শোনাতে শোনাতেই মাঝপথে থেমে পরাশর আমাদের দিকে ফিরে যা বললেন তাতে আমরা একেবারে তাজ্জব!

"আরে তোমরা আর কতক্ষণ বসে থাকবে!" বলে একটু থেমে হঠাৎ বললেন, "শোনো শোনো, এই ছড়াটা একটু ভাল করে শুনে নাও!"

"ছড়া শুনব?" আমাদের মুখগুলো সব হাঁ।

"হ্যাঁ, শোনো!" পরাশর নির্বিকারভাবে বলে চলেন, "ইচ্ছে করলে টুকেও নিতে পারো! হ্যাঁ, টুকে নেওয়াই বোধ হয় ভাল।"

আমাদের দিকে কাছে-রাখা একটা প্যাড আর পেনসিল ছুঁড়ে দিয়ে পরাশর যে ছড়াটা আউড়ে গেলেন তা এই—

"যে দিকে চাও সে দিকেতেই ধাঁধা
তবুও জানি, সঠিক
কারণ বিনা হয় না কার্য—
দুই-এ যেন শিকল দিয়ে বাঁধা।
সেই শিকলের একটা শুধু
আংটা যদি পাই।
হয়তো টেনে তুলতে পারি
আমূল ধাঁধাটাই।"

এতদূর পর্যন্ত শুনিয়ে পরাশর আবার একটু থামলেন। তারপর আচমকা কী যেন একটা ঝিলিক মনের মধ্যে পেয়ে গিয়ে একটানা বলে গেলেন—

"কেউ কি জানে, কোথায় কী হয়,
কেনই বা হয়, কীসে?
শাল-দোশালার ধরলে জ্বালা
সারতে পারে হয়তো নিরামিষে।
যা করো আর যাই বা ভাবো
এইটি জেনো সার,

বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা
কোথ্‌থাও নয় আর।
বাঘটা কেমন না থাক জানা
ভাবনা করা মিছে,
এই জেনো ঠিক, কুলুপ খোলার
চাবি ফিরছে তারই পিছে পিছে।"

পরাশর বর্মা যেভাবে তাঁর ছড়া আওড়ানো শেষ করে আবার নিজেদের সামনে রাখা খাতাটা খুলে বন্ধু কৃত্তিবাসের দিকে ফিরলেন তাতে সেটা স্পষ্টই আমাদের বিদায় দেওয়া বলে বোঝা গেল।

সে অবস্থায় জোর করে সেখানে বসে থাকা যায় না। নিরুপায় হয়েই হতভম্ব মুখে আমাদের সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

কিন্তু এখন আমরা করব কী? পরাশর বর্মার বাড়ির গলি থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে একটা বাস-স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে সেই প্রশ্ন নিয়েই আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম।

"এ আবোল-তাবোল ছড়া আমাদের শোনাবার মানে?" গৌর বেশ একটু তেতো গলাতেই তার ক্ষুব্ধ বিস্ময়টা প্রকাশ করলে।

"আমরা কী জানতে ওঁর কাছে এলাম, আর উনি আমাদের সঙ্গে কী রসিকতা করলেন!" শিশিরের ঝাঁঝালো মন্তব্য।

একটা ট্রাম এসে যাওয়ায় তাতে এরপর সবাই চড়ে বসলাম। এত রাত্রে এসপ্ল্যানেডে যাওয়ার ট্রামটা প্রায় খালি। পেছনের দিকে চারজনে সেই একই ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত আলোচনায় মত্ত হয়ে রইলাম।

আমাদের সঙ্গে পরাশর বর্মার এ ব্যবহারটা কি অপমান বলে ধরব, না শুধু একটু উপহাস?

উপহাসই যদি হয় তা উনি আমাদের করেন কী অধিকারে? আমাদের কি উনি অবোধ শিশু পেয়েছেন!

"দাঁড়াও! দাঁড়াও!" আমাদের মধ্যে শিবুই মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রেখেছিল এতক্ষণ। সে এবার হঠাৎ গম্ভীরভাবেই আমাদের থামিয়ে আলোচনাটার মোড় একটু ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ছড়া শোনাবার আগে, বন্ধু কৃত্তিবাসকে কবিতা শোনাবার ফাঁকে ফাঁকে উনি দু-একটা কী সব জিজ্ঞাসা করছিলেন না?"

"হ্যাঁ, করছিলেন।" শিশির গরম মেজাজেই বললে, "উনি আমাদের কারওর ওপর বা বাহাত্তর নম্বরের সম্বন্ধে কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন কি না এমন কী দু-একটা আজেবাজে প্রশ্ন!"

"আমরা ওঁকে তো জানিয়েইছিলাম তখন," গৌর শিশিরের কথাতেই সায় দিয়ে জানালে, "সেরকম কোনও কিছুই হয়নি। পাড়ার মধ্যে নতুন একটা হোটেল খোলায় পাড়াটার জাত গেল বলে দু-চারবার একটু গজগজ করেছিলেন বটে,

কিন্তু সেটা আমাদের সঙ্গ ছাড়বার মতো রাগ বা বিরক্তি কিছুই নয়।"

"বরং তাঁর মেজাজ যে হালে রীতিমত খোশ ছিল তার প্রমাণ হিসেবে কাশ্মিরি শালওয়ালার কথাটা আমি বলেছিলাম," বললে শিশির। "মেজাজ খোশ না থাকলে শালওয়ালাকে তার কারবারের বিষয়েই জ্ঞান দিয়ে অমন মোহিত করবার মর্জি তাঁর হয়?"

এসপ্ল্যানেডে ট্রাম গিয়ে পৌঁছনো পর্যন্ত এ আলোচনা আমাদের চললেও কোনও মীমাংসায় পৌঁছনো যায়নি।

মীমাংসা হয়নি তারপর পাঁচ-পাঁচটা দিন কাটাবার পরও। এ পাঁচ দিন ঘনাদার কোনও হদিস মেলেনি তা বলা বাহুল্য। দিশাহারা হয়ে আর-একবার নিজেদের মান খুইয়ে পরাশর বর্মার কাছেই যাব, না পুলিশে খবর দেব—যখন সব ঠিক করবার জন্য সাতসকালেই আড্ডাঘরে সবাই জড়ো হয়েছি তখন শিবুর হঠাৎ মাথায় যেন কীসের ঝিলিক খেলে গেল। হাতের চায়ের পেয়ালাটা বেসামাল হয়ে ফেলে দিতে গিয়ে সামলে সে উত্তেজিত স্বরে বললে, "আচ্ছা, পরাশর বর্মার ধাঁধার ছড়াটা কোথায়? কার কাছে?"

কাগজে টোকা ছড়াটা আমার কাছে ছিল। সেটা পকেট থেকে বার করে শিবুর হাতে দিয়ে ঠাট্টার সুরে বললাম, "এ ছড়ার মধ্যেই ঘনাদার অন্তর্ধান রহস্যের হদিস আছে নাকি!"

"থাকতেও পারে," বলে গম্ভীর মুখে শিবু আমাদের সকলকে অবাক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলবেলা ফিরে এল আমাদের তেমনই অবাক শুধু নয়, একেবারে হতভম্ব করে। সে একা ফেরেনি। সঙ্গে তার স্বয়ং ঘনাদা।

হ্যাঁ, ঘনাদা ফিরলেন!

কিন্তু এ তাঁর কী রকম ফেরা!

সেই মার্কামারা ধুতি শার্ট আর পায়ে অ্যালবার্ট শু পরা ঘনশ্যাম দাস নয়, পায়ে বিদ্যাসাগরি হলদে চটি, পরনে ধুতি পাঞ্জাবিগুলো সাদা হলেও তার ওপর কাঁধে ঝোলানো গেরুয়া চাদর আর মাথায় গেরুয়া রঙের গান্ধীটুপি।

এ বেশে তিনি কোথা থেকে এলেন? ছিলেনই বা কোথায়?

কোথায় যে ছিলেন, তা তাঁকে সমাদরে তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারায় বসিয়ে শিবুর পাড়া-কাঁপানো হাঁকে নীচের রামভুজকে ফরমাশ দেওয়া থেকেই বুঝি বোঝা গেল। মুরগি-মটন-মছলি-আন্ডার যাবতীয় জানা অজানা খানার সে কী লম্বা ফর্দ! সাতদিন উপোস করা বা প্রাণের দায়ে শাকপাতা চিবানো কেঁদো বাঘের সে যেন প্রথম নিয়মভঙ্গের খাওয়ার ফিরিস্তি।

কিন্তু পাঁচ-পাঁচ দিনের উপোস-ভাঙা এমন রাক্ষুসে খিদে ঘনাদার হল কেন? মাছ-মাংসের মুখ না দেখে কোথায় ছিলেন তিনি এ ক-দিন?

কোথায় আর?

'পাড়ার জাত গেল' বলে যার সম্বন্ধে বাঁকা টিপ্পনি করেছিলেন একদিন, দেশি-বিদেশি, আর দেশির চেয়ে বিদেশিই বেশি, নবীন সাধুদের নতুন গড়ে ওঠা আমাদের পাড়ার সেই পবিত্র হোটেলে, মাছ-মাংসের নয়, পেঁয়াজের গন্ধও যার ত্রিসীমানায় কেউ পায় না, সেখানেই।

দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ঘনাদা ওখানে যাবেন কোন দুঃখে?

নিজেদের মধ্যেই আলাপের ধরনে কথাটা বললেও, প্রশ্নটা যাঁর উদ্দেশে করা, তিনি উত্তর দিলেন আমাদের চমকে।

"গেছলাম আর কেন? ওই রশিদ খাঁকে এড়াতে!"

আমাদের মনের সন্দেহটা আমাদের মুখের ওপর ঘনাদা অমন করে ছুঁড়ে মারবেন, ভাবিনি।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে তাই যতটা পারি, সামলাবার চেষ্টা বললাম, "না, না, সে কী বলছেন!"

"রশিদ খাঁ, মানে ওই শালওয়ালা আপনার কত বড় ভক্ত তা তো নিজেদের চোখেই দেখলাম।"

"খাঁটি ভক্ত না হলে কেউ অমন দামি মলিদাটা আপনার জন্য জোর করে গচ্ছিত রেখে যায়!"

"না, না, আসল কথাটা লুকোবেন না!"

শেষের কাতর অনুরোধটা বিফলে গেল না!

তিনি যে একটু গলেছেন, গলার স্বরেই তা বুঝতে দিয়ে যেন একটু দ্বিধাভরে বললেন, "নেহাত শুনবে তা হলে?"

"শুনব না মানে!" শিশির তার সিগারেটের টিনটা খুলে সামনে ধরে তার লাইটারটা জ্বালতে জ্বালতে বললে, "পাঁচ-পাঁচ দিন আপনি নিরুদ্দেশ। তারপর দেখা যখন পেলাম তখন এই আপনার বেশ! সত্যি কোথায় ছিলেন সেইটেই না জানলে, উদ্বেগে দুর্ভাবনায় গ্যাসট্রিক আলসার হয়ে মারা যাব।"

"তা হবে না!" শিবুই এবার ফোড়ন কাটল, "উনি ছিলেন আমাদের পাড়ায় ওই নতুন গড়ে ওঠা ওই 'হোলি ইন' মানে পবিত্র সরাইখানায়।"

"সত্যি, ওই হোলি, মানে ওই—ওই নতুন হিপি হোটেলটায়?"

এবার বিমূঢ় বিস্ময়টা আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিক। জিজ্ঞাসাগুলোও তাই।

"ওখানে থাকবার জন্য এই সাজ নিয়েছিলেন!"

"পাঁচ-পাঁচটা দিন ওখানে কাটালেন ওই হিপি-মার্কা সাধুদের সঙ্গে স্রেফ নিরামিষ খেয়ে?"

"কিন্তু কেন?"

"কেন?"—ঘনাদা এই শেষ প্রশ্নটার জবাব দিলেন গাঢ় গম্ভীর স্বরে—"শুধু একটা বাক্সের জন্য। নেহাত খুদে একটা বাক্স, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চিটাক

চওড়া।”

“ওই বাক্সটার মধ্যে—কী আছে ও বাক্সে? হিরে মানিক?”

“না।” ঘনাদা আমাদের মূর্খতায় ধৈর্য ধরে বললেন, “আছে অতি সূক্ষ্ম, মানে চুলের চেয়েও অনেক সরু স্ফটিকের সুতোয় বাঁধা একটি ছোট্ট চুম্বক।”

“এই!” আমাদের হতাশাটা গলায় লুকোনো রইল না।

“হ্যাঁ, ওই,” ঘনাদা তেমনই ধৈর্যের অবতার হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, “সমস্ত মানুষ জাতটাই নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতো যে সর্বনাশা পরিণাম আমাদের মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে, তার কথা আগে থাকতে জানিয়ে দেবার একমাত্র খেলনা বলতে পারো, যা চালাতে বিন্দুমাত্র কোনও শক্তির দরকার হয় না, অমন পঞ্চাশ ষাট একশো বছর পর যা আপনা থেকেই শূন্যাঙ্কের আশি ডিগ্রি নীচে অতি নিম্নতাপেও কাজ করে যেতে পারে। আর সে কাজটা কী জানো?”

নির্বোধ বিস্ময় দেখাবার জন্য অভিনয় করবার দরকার হল না এবার।

মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা বোধহয় খুশি হয়েই বললেন, “মানুষ জাতের প্রাণভোমরা আমাদের দুনিয়ার যেসব কাণ্ডকারখানার কাটাকুটির ওপর ভাগ্যের জোরে টিকে আছে তারই মাপজোখ কষা, মাপ করা হল ওই খেলনার বাক্সের কাজ। ওর নাম হল ম্যাগনেটো মিটার, আমাদের প্রাণভোমরার একরকম ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম বলতে পারো। কিন্তু এ যন্ত্রের দরকার কী?”

আমরা এবার নীরব নিস্পন্দ।

ঘনাদা-ই বলে চললেন, “আমরা যে কী ভয়ংকর অবস্থায় পৃথিবীতে টিকে আছি তা ক-জনই বা জানে? এই পৃথিবীর ওপরে আশি থেকে পাঁচশো কিলোমিটার উচ্চতায় আছে মশারির ঢাকনার মতো একটা চৌম্বকমণ্ডল আর একটা আয়নমণ্ডল। এই দুই ঢাকনা না থাকলে কবে পৃথিবীতে আমাদের মতো প্রাণীরা শেষ হয়ে যেত—যেমন গেছল এককালে সেই ডাইনোসরদের বংশ। কেন শেষ হয়ে যেত সেটাই জানা দরকার। আমাদের সৌরজগতের অধীশ্বর হলেন সূর্য। তিনিই প্রাণদাতা, আবার তিনিই মৃত্যুবিধাতা। থেকে থেকে সূর্যের ভেতরে যে সৌরঝটিকা হয় তার কথা নিশ্চয় শুনেছ। সেই সৌরঝটিকায় কল্পনাতীত দ্রুতবেগে উৎসারিত হয় এমন সব তড়িৎকণার প্রবাহ, যার অধিকাংশই আমাদের চৌম্বকমণ্ডলে আর আয়নমণ্ডলে আটকে না গেলে সবংশে আমাদের ধ্বংস করে দিত।

এই আয়নমণ্ডল আর চৌম্বকমণ্ডলের পরিচয় আমাদের জানা। কিন্তু তাদের অবস্থার হদিস পাবার কোনও উপায় ছিল না। সেই উপায়ই উদ্ভাবিত হয়েছে এই খেলনার বাক্সের মতো যন্ত্রটিতে!

ইজমেরন-এর নাম বোধহয় শোনোনি। এটি রাশিয়ার আয়ন আর চৌম্বক মণ্ডল নিয়ে গবেষণা করবার একটি কেন্দ্র। সেই ইজমেরন-এর উদ্ভাবিত এই যন্ত্রে বড় ভয়ানক এক ব্যাপার কিছুকাল আগে ধরা পড়েছে। আমাদের আয়নমণ্ডলের কী সব পরিবর্তন হয়ে চৌম্বক-মেরুই সরে যাচ্ছে। খেলনার বাক্সের মতো ম্যাগনেটো

মিটার যন্ত্রটা তাই বৈজ্ঞানিকদের কাছে অমূল্য। সেই যন্ত্রই কিছু দিন আগে চুরি গেছে বলে জানা গেল। পৃথিবীর সব দেশে বড় বড় রাজ্যের গোয়েন্দারা যে কীরকম হন্যে হয়ে সেই যন্ত্র আর চোরকে খুঁজছে তা বুঝতেই পারো। আমার ভাগ্য, সন্ধানটা আমিই পেয়ে গেলাম সর্বপ্রথম। চোর শিরোমণি বুদ্ধিটা ভাল খাটিয়েছিল। এদেশে ওদেশে পাঁচ-তারা সাত-তারা হোটেল নয়, হিপি সাধু সেজে এক নিরামিষ সরাইতে সে গেরুয়া পরা আধা-সাধু হয়ে জায়গা নিয়েছে। মতলব ছিল, গোলমাল একটু থামলেই আসল জিনিস নিয়ে নিজের মুলুকে পাড়ি দেবে। কিন্তু তা আর বাছাধনের হল না।"

"তার মানে আপনি তাকে ধরে ফেলেছেন!" আমাদের উত্তেজিত জিজ্ঞাসা। "এবার ধরে কী করলেন? পুলিশে দিয়েছেন?"

"পাগল!" ঘনাদা আমাদের সরল নির্বুদ্ধিতায় হাসলেন। "অমন একটা ঝানু আন্তর্জাতিক দুশমনকে চিনে গোপনে চোখে চোখে রাখবার সুবিধে হেলায় নষ্ট করে তাকে পুলিশে দিতে পারি! সে বহাল তবিয়তেই ওই পবিত্র সরাইতেই আছে—একটু অবশ্য ভ্যাবাচাকা হয়ে।"

"তার যন্ত্রটা তা হলে নিয়ে এসেছেন বুঝি?" আমরা উত্তেজিতভাবে জানতে চাই।

"নিয়ে আসব কী!" ঘনাদা আবার আমাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসলেন। "শুধু ফাঁক পেয়ে যন্ত্রটা ভেঙে দিয়ে এসেছি।"

"ভেঙে দিয়ে এলেন? ওই অমূল্য আশ্চর্য যন্ত্র?" আমরা ব্যথিত, স্তম্ভিত।

"ভেঙেছি তো কী হয়েছে"—ঘনাদা নির্বিকার—"ইজমেরন ওরকম বা ওর চেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র ক-দিনেই বানিয়ে ফেলবে। অন্য কারও হাতে ও যন্ত্র যাতে না পড়ে, তাই জন্য ভেঙে দিয়ে আসা।"

"কিন্তু—"

যেসব প্রশ্ন এরপর জিজ্ঞাসা করবার ছিল তা আর করা হল না। শিবুর অর্ডার দেওয়া যোড়শোপচার আমিষ খানা প্লেটের পর প্লেট এখন আসতে শুরু করেছে। ঘনাদাকে এখন মাইক দিয়েও কোনও কিছু শোনানো যাবে না।

শিবুর বদলে রামভুজ সিংকেই ঘনাদাকে তোয়াজ করে খাওয়াবার ভার দিয়ে শিবু আর শিশিরকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

বারান্দায় বেরিয়েই তাকে প্রথম প্রশ্ন—"আচ্ছা, পরাশর বর্মার ওই ছড়াতেই ঘনাদার সব হদিস পেলি?"

"হ্যাঁ, তাই পেলাম।" শিবু গর্বভরেই ব্যাখ্যা করলে, "পরাশর বর্মার বিচারে হয়তো ভুল হতে পারে। কিন্তু শাল-দোশালার জ্বালা নিরামিষে সারবে থেকেই হিপি সাধুদের পবিত্র সরাইটার স্পষ্ট ইশারা পেলাম। তার পর 'কুলুপ খোলার চাবি ফিরছে তারই পিছে পিছে' থেকে বুঝলাম, ঘনাদা নিজেই প্রকাশ হবার জন্য ছটফট করছেন। ব্যাপারটা হলও তাই। ওই 'হোলি ইন' বা পবিত্র সরাইয়ের কাছ দিয়ে যেতে গিয়ে প্রথমেই দেখা পেলাম ঘনাদার। উনি যেন আমার অপেক্ষাতেই

দাঁড়িয়ে আছেন। এমনিতে হাসিখুশিই বলা যায়, কিন্তু পাঁচ-পাঁচ দিন আমিষের স্বাদ না পেয়ে বেশ একটু কাহিল মনে হল!"

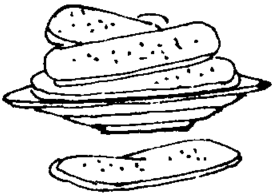

আঠারো নয়, উনিশ

হ্যাঁ-কে না করা যায়?

এক-কে দুই, কি আঠারো-কে উনিশ?

আর কিছু পারা যাক বা না যাক আঠারো-কে যে উনিশ করা যায় হলফ করে তার সাক্ষ্য দিতে পারি! কারণ সেটা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

আর এ ভানুমতীর খেল কে যে দেখাতে পারেন তা নিশ্চয় আর বিশদ করে বলতে হবে না।

হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। আমাদের বাহাত্তর নম্বরের ন্যাড়াছাদের টঙের ঘরের তিনি।

বিশেষ করে মেজাজ একটু বিগড়ে গেলে তো কথাই নেই।

যেমন বিকেলের আড্ডাঘরে এসে যদি দেখেন চায়ের সঙ্গে তাঁর মনের মতো টা-টা, যা দু-এক দিন আগে ঠারে-ঠোরে জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, গরহাজির। শুধু গরহাজির নয়, সেখানে যা হাজির তা কিছুদিন থেকে একরকম তাঁর দু-চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলে সবকিছুই হতে পারে।

এবারের জিনিসটা হল নিজেদের হেঁশেলেই তৈরি ভেজিটেবল স্যান্ডুইচ।

আমাদের রামভুজ ঠাকুরের রান্নার কেরামতি যতই থাক, টোস্ট করা দু-টুকরো পাঁউরুটির মধ্যে নানা কায়দায় বদলানো নিরামিষ পুর দিয়ে কে পরপর ক-দিন জিভে-জল-আনা আহামরি কিছু আমাদের বিকেলের চায়ের আসরে হাজির করতে পারে?

কিন্তু তাই তাকে করতে হচ্ছে।

হচ্ছে আমাদের গৌর মহাপ্রভুর কথায়। অর্থাৎ বাহাত্তর নম্বরের যেমন দস্তুর সেই অনুসারে এ মাসের বিকেলের জলখাবারের তদারকির ভার পড়েছে গৌরের ওপর। সে ভার পেয়ে গৌর যে এমন গবেষণামূলক খাদ্যপরীক্ষা চালাবে তা কে জানত?

খাবার সে যে কিছু আজেবাজে সস্তা খাওয়াচ্ছে তা নয়। কিন্তু জলখাবার বিষয়ে সে তার নিজস্ব মৌলিক থিয়োরি খাটিয়েই যত গোলমাল বাধিয়েছে।

তার থিয়োরি হল নিত্য নিত্য বদল করলে অতি বড় উপাদেয় সবকিছুরও ধার ভোঁতা হয়ে যায়। সেরা সেরা সব খানাদানার মানও তাতে রাখা হয় না। সে তাই ব্যবস্থা করেছে যে আমাদের দুপুরের কি রাত্রের খাবারে যেমন চলছে তাই চলতে দিলেও বিকেলের জলখাবারে এক-এক ধারার অন্তত এক হপ্তায় আর বদল হবে না।

তার সেই ব্যবস্থাতেই গত চারদিন ধরে আমাদের নিরামিষ স্যান্ডুইচের পালা চলছে। নিরামিষ পুরের অবশ্য রকম ফের আছে, যেমন একদিন আলু-কপির মণ্ডের সঙ্গে বিট-এর গুঁড়ো, তার পরের দিন কড়াইশুঁটি বাটার সঙ্গে হিং-ফোড়ন বাঁধাকপি ভাজি, এইরকম আর কী? কিন্তু সে বৈচিত্র্যে আর যে-ই কেন, খুশি না হলেও, অন্তত মুখ বুজে থাকুক, টঙের ঘরের তিনি সে পাত্র নয়।

দু-দিনের পর তিনদিনের দিনেই তিনি স্যান্ডুইচের প্লেটগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূকুটিভরে বলেছেন, "কী ব্যাপার হে? আমাদের যেন ভদ্রলোকের-এক-কথা চলছে বলে মনে হচ্ছে?" চোখে ভ্রূকুটি থাকলেও মুখটা প্রসন্ন রেখেই তিনি তারপর বলেছেন, "তা, ওই কী বলে আমাদের আজও তো নিছক বোট্যানিক্যাল গার্ডেনস মনে হচ্ছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," গৌর গম্ভীরভাবে জানিয়েছে, "আজ স্কোয়াশ-এর সঙ্গে সয়াবিনস-এর একটা মিক্সচার মার্স্টার্ড দিয়ে কী রকম জমেছে দেখুন না।"

"তা তো দেখতেই হবে," ঘনাদা একটা স্যান্ডুইচ যেন বেশ সন্দিগ্ধভাবে তুলে নিয়ে বলেছেন, "এক্সপেরিমেন্ট বেশ ভালই করছ। কিন্তু ওই কী বলে স্যান্ডুইচ যদি হয় তো সেই চিকেন হ্যাম-ট্যাম বা সসেজ-টসেজও তো চালানো যায়?"

"আজ্ঞে না," গৌর সশ্রদ্ধ অথচ গম্ভীরভাবেই জানিয়েছে, "এই হপ্তায় তা আর হবে না।"

"এই হপ্তায় আর হবে না?" ঘনাদার চমকিত চোখমুখের বিস্মিত প্রশ্নটা আমাদের একজনের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে, "তার মানে?"

"তার মানে," গৌর ধৈর্য ধরে শান্তভাবে তার বক্তব্যটা বিশদ করেছে, "এক-এক হপ্তায় এক-এক রকম ধারা চলবে। যেমন এ হপ্তায় নিরামিষ স্যান্ডুইচ, এবং পরের হপ্তায় হল আমিষ কাবাব কোপ্তা কাটলেটের।"

"ওঃ!"—ঘনাদা যে রকম সুবোধ বালকের মতো ব্যবস্থাটা মেনে নিয়ে হাতে নেওয়া স্যান্ডুইচটি শেষ পর্যন্ত সদ্ব্যবহার করে উঠে গেছেন তাতে ফাঁড়াটা এবারের মতো কেটে গেছে ভেবেই আমরা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি।

কিন্তু তার পরদিন যা হয়েছে তাতে বুঝেছি ঘনাদাকে আমরা থোড়াই চিনি।

বিকেলের আসর তখন আমাদের বসে গেছে। গৌরের নব ব্যবস্থাপনায় টেবিলের ওপরে যথারীতি থাক-থাক স্যান্ডুইচ সাজানো। সেই নিরামিষই বটে, তবে রাজমা বাটার সঙ্গে চিজ আর অন্য মশলায় জিনিসটা অখাদ্যের বদলে যে

বেশ উপাদেয়ই হয়েছে আমাদের জমে-ওঠা আলোচনাটাই তার প্রমাণ!

আলোচনাটা বসেছে এক-এক যুদ্ধে মহাযুদ্ধে কত মানুষ মরে তাই নিয়ে। পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে মহামারী আর যুদ্ধ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করে আসছে তার বিষয় বলতে বলতে গৌর তখন একেবারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু এমন জমাটি সময় টঙের ঘরের তিনি কোথায়? আমরা উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে কানটা ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িটার দিকেই পেতে রেখেছি।

নিরামিষ স্যান্ডুইচের প্রতিবাদে ঘনাদা এ বিকেলের আসরই ত্যাগ করলেন নাকি শেষ পর্যন্ত? না, তা তিনি করেননি।

এলেন তিনি ঠিকই, তবে একটু দেরি করে। নিরামিষ স্যান্ডুইচ মুখে দেবার দায়টা যেন এড়াবার জন্যই।

আমাদের আলোচনাটাও তখন উত্তেজনার তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছে বলা যায়। "প্রতিদিন সে যুদ্ধে"—গৌর চড়া গলায় আমাদের শোনাচ্ছে—"এক অক্ষৌহিণী করে সৈন্য মারা পড়েছে তা জানো? এক অক্ষৌহিণী মানে—"

"না।"

গৌরকে তার কথা আর শেষ করতে হয়নি। বারান্দার দরজা দিয়ে আড্ডাঘরে ঢুকে তাঁর মৌরসি আরাম-কেদারার দিকে আসতে আসতেই গৌরের বক্তব্যটা শুনে ঘনাদা বজ্র গম্ভীর স্বরে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারপর আরাম-কেদারায় বসতে বসতে বলেছেন, "এক অক্ষৌহিণী নয়, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রতিদিন মারা গেছে নয় অনিকিনি, এক চমূ, এক পৃতনা, দুই গণ, এক সোনামুখ আর দশমিক নয়-চার-সাত-তিন-ছয়-জন সেনা।"

কয়েক সেকেন্ড ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর গৌর বাদে আমাদের সকলের গলায় একই জিজ্ঞাসা উথলে উঠল—"কী? কী বললেন—?"

"বললাম," ঘনাদা ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্যটা আবার বলতে শুরু করলেন, "এক অক্ষৌহিণী করে নয়, প্রতিদিন কুরুক্ষেত্রে মারা গেছে নয় অনিকিনি, এক চমূ, এক পৃতনা—"

"কী বলছেন, কী?"—ঘনাদার কথা শেষ হবার আগেই তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল এবার—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত সৈন্য প্রতিদিন মারা গেছে তারা সোজা হিসেব আপনি উলটে দিতে চান?"

"উলটে দিতে নয়"—ঘনাদার অনুকম্পা মেশানো উক্তি—"ভুলটা শুধরে দিতে চাই শুধু।"

"ভুল!"—গৌর রীতিমত উত্তেজিত—"কুরুক্ষেত্রে প্রতিদিন এক অক্ষৌহিণী করে সেনা মারা গেছে এটা আমাদের হিসেবের ভুল বলছেন আপনি? পাটিগণিতের সোজা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগও আমরা কি ভুলে গেছি?"

ঘনাদা কি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ? না, তিনি নির্বিকারভাবে ঠাণ্ডা অথচ গায়ে-জ্বালা-ধরানো গলায় বলেছেন, "গুণ-ভাগে না হোক, কিছুতে একটা ভুল করেছ বলেই মনে

হচ্ছে!"

"ভুল করেছি মনে হচ্ছে?" গৌর যেন অতি কষ্টে গলাটা উদারায় নামিয়ে রেখে হিসেবটা বোঝাতে চেয়েছে, "মোট কত সেনা ছিল পাণ্ডবদের? সাত অক্ষৌহিণী! আর কৌরবদের ছিল এগারো। এগারো আর সাতে হল সবসুদ্ধ আঠারো অক্ষৌহিণী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ জীবিত ছিল মাত্র দশজন! কৌরবদের তিন আর পাণ্ডবদের সাত। এই দশজনকে ধর্তব্য না করলে মোট আঠারো অক্ষৌহিণী সেনা যদি আঠারো দিনে সব শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে প্রতিদিন এক অক্ষৌহিণী করে মারা যায় কি না!"

"তাই যাবার কথা"—ঘনাদা যেন সায় দিতে গিয়েও সামান্য একটু ফ্যাকড়া তুলেছেন—"যদি যুদ্ধটা আঠারো দিনের হয়?"

"আঠারো দিনের হয় মানে!" গৌরের সঙ্গে আমরাও এবার অবাক!

গৌর ঝাঁঝালো গলায় বলেছে, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে মোট আঠারো দিনে শেষ হয়েছিল এ কথা তো পাঁচ বছরের ছেলেও জানে! সঞ্জয়ের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে কারও তা জানার বাকি থাকে না।"

"ও, সঞ্জয়ের যুদ্ধ বৃত্তান্ত!" ঘনাদার গলায় যেন চাপা টিটকিরি—"সঞ্জয় বুঝি আঠারো দিনেরই কথা বলেছে?"

"হ্যাঁ, বলেছেই তো!"—গৌর যেন ঘনাদার অজ্ঞতাকে লজ্জা দেবার সুরে জানাল—"তাও জানেন না?"

"হ্যাঁ, জানি একরকম!" ঘনাদা বিদ্রূপের সুরটা একটু চড়িয়েই এবার বললেন, "সঞ্জয় যা বলেছে তার ওপর আর কথা নেই।"

"নেই তো! স্বয়ং ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কী বলে সঞ্জয়কে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, জানেন!"—গৌর যেন কিস্তিমাত-এর চাল চেলে ঘনাদাকে তার কণ্ঠস্থ ছত্রগুলো শুনিয়ে দিলে—

"ক্ষণেক চিন্তিয়া তিনি কহেন বিধান।
তব প্রিয় সঞ্জয় তো মহা বিচক্ষণ ॥
দিব্যচক্ষু বর আমি দিতেছি উহারে।
সকল যুদ্ধের কথা কহিবে তোমারে ॥
বর দিয়ে সঞ্জয়েরে করি নিয়োজিত।
অন্তর্ধান হইয়া ব্যাস গেলেন ত্বরিত ॥"

ছত্রগুলো শুনিয়ে যেন মনে ভাল করে দাগ কাটবার একটু সময় দিয়ে গৌর আবার বললে, "স্বয়ং ব্যাসদেব যাকে ভারতযুদ্ধের বর্ণনা দেবার জন্যে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন তার ওপর কথা বলার কেউ আর থাকতে পারে?"

"পারে না বলছ? বেশ! বেশ!"—ঘনাদার গলার সুরটা কেমন একটু বাঁকা মনে হল—"কিন্তু ব্যাসদেব এই দিব্যচক্ষু দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাজে সঞ্জয়কে

লাগিয়েছিলেন কবে থেকে?”

“কবে থেকে আবার? যুদ্ধের গোড়া থেকে!” গৌরের চটপট জবাব।

“ওঃ, যুদ্ধের গোড়া থেকে?” ঘনাদা একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “কিন্তু যুদ্ধের গোড়া বলতে কী বুঝব সেইটে একটু পরিষ্কার হলে হত না?”

“পরিষ্কার আবার কী হবে?”—গৌরের স্বরে তাচ্ছিল্য—“গোড়া মানে যুদ্ধ যেদিন আরম্ভ হয় সেদিন। অর্থাৎ ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কুরুরা আর ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতিত্বে পাণ্ডবেরা যেদিন লড়াই শুরু করল।”

“যেদিন যুদ্ধ শুরু করল? ভাল! ভাল!” ঘনাদা যেন সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা শুরুটা করলেন কোথায়?”

“কোথায় আবার?” ঘনাদার মূর্খতাকে লজ্জা দেওয়া সুরে গৌর বললে, “কুরুক্ষেত্রে।”

“ও, কুরুক্ষেত্রে?”—ঘনাদার সুরটা এবার কেমন গোলমেলে—“তা কুরুক্ষেত্রটা ওদের পায়ের তলাতে ছিল, না যেতে হয়েছিল সেখানে?”

“পায়ের তলায় থাকবে কেন?”—গৌর আমাদেরই মত এবার ঘনাদার কথায় কোথায় যেন একটা প্যাঁচ আছে মনে করে একটু সন্দিগ্ধ—“সেখানে যেতে হয়েছিল।”

“যেতে হয়েছিল!”—ঘনাদার গলা এবারে ধাপে ধাপে চড়ছে—“আর সে যাওয়াটার মানে বোঝো? দু-দশ হাজার নয়, পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী আর কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণী বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে নিশ্চয়?”

ঘনাদার প্রশ্নটা গৌরকে ছাড়িয়ে এবার আমাদের দিকেও ছুঁড়ে দেওয়া।

“হ্যাঁ, জানা মানে”—গৌর তখন আমতা আমতা করতে শুরু করেছে। আমরা তাকে সাহায্য করতে পারছি না।

“থাক, থাক! আর মাথায় ডুবুরি নামাতে হবে না।” ঘনাদা আমাদের যথাস্থানে নামিয়ে বসিয়ে বললেন, “এক অক্ষৌহিণী হল পঁইষট্টি হাজার ছ-শো দশ ঘোড়া, একুশ হাজার আটশো সত্তর হাতি, রথও ওই অত, আর পদাতিক সেনা হল এক লক্ষ নয় হাজার তিনশো পাঁচ। এই রকম আঠারো অক্ষৌহিণীর ওই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে ঘাঁটি গাড়াটা কীরকম তা একটু বোঝার চেষ্টা ওই কাশীরাম দাস থেকেই করা যেতে পারে। দুপক্ষের মধ্যে কারা প্রথম কুরুক্ষেত্রে গিয়ে চড়াও হয়? হয় পাণ্ডবেরা।”

একটু চুপ করে যেন ভাল করে দম নিয়ে ঘনাদা গৌরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শুরু করলেন,

“এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥

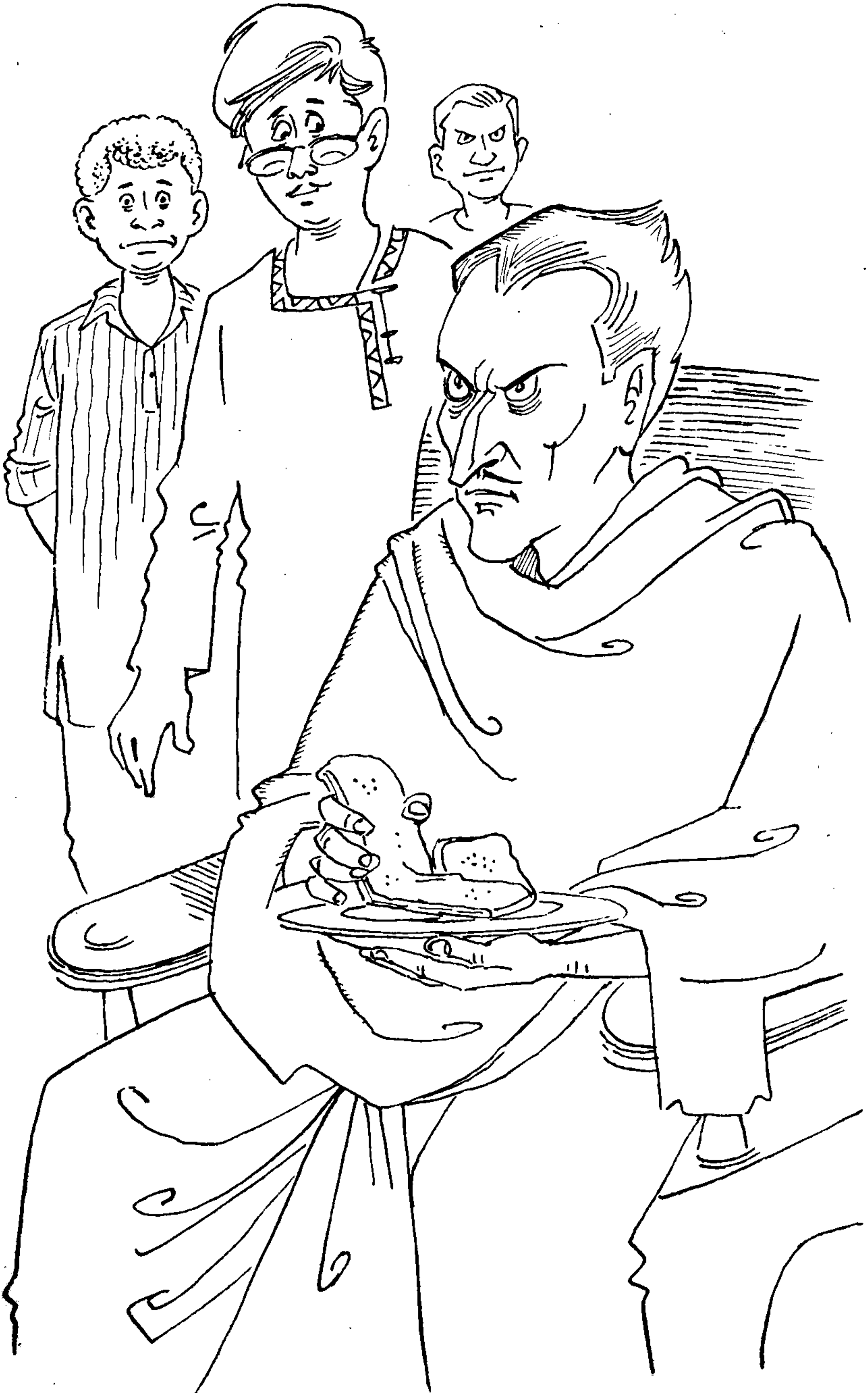

পঞ্চকোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার।
দুকোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দলে সৈন্য সাজে অগণন।
এই মতো পাণ্ডু সৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডব বাহিনী ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তরে করি সিংহের গর্জন ॥ ”

ঘনাদা একটু থেমে বললেন, “এ তো গেল পাণ্ডবদের কথা। কৌরবরাও কুরুক্ষেত্র দখলে কিছু কম যায় না। তাদের সৈন্য আর সাত নয়, এগারো অক্ষৌহিণী।

অসংখ্য সাজিল রথ লিখিতে না পারি।
অর্বুদ অর্বুদ কত সাজিল প্রহরী ॥
গজ অশ্ব পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র প্রমাণ সৈন্য সাজে কুরুগণ ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকী সৈন্যের ভারে পায় বড় ত্রাস ॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
একশত ক্রোশ জুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥”

একটু থেমে আমাদের মুখের ওপর সদর্পে চোখ বুলিয়ে ঘনাদা আবার বললেন, “কুরুক্ষেত্রে এমনই করে যুদ্ধের জায়গা দখল কি যুদ্ধেরই একটা পালা নয়? সত্যি কথা বলতে গেলে, যুদ্ধের আসল মার পাণ্ডবেরা তো ওইখানেই মেরেছে। মাত্র সাত অক্ষৌহিণী তাদের সেনা, লড়তে হবে প্রায় দুগুণ—এগারো অক্ষৌহিণীর সঙ্গে। বুদ্ধি করে সাহসভরে আগেই তারা গিয়ে কুরুক্ষেত্রের উত্তরের পাথুরে এবড়ো খেবড়ো চড়াইয়ের দিকটাই দখল করেছে। আহাম্মক দুর্যোধন নিজেদের ক্ষমতার গর্বে-- তারপর পশ্চিমে সুন্দর সবুজ সমতল দিকটায় গিয়ে উঠে ভেবেছে—কী বাহাদুরিই না করেছে! যুদ্ধের পয়লা চালেই ভুল করে তারা যে তাইতে শেষ সর্বনাশ ডেকে

এনেছে হামবড়া আহাম্মকদের তা মাথাতেই আসেনি। তা, সে যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু গোড়াতে ওই! জায়গা দখলের দৌড় দিয়েই যে যুদ্ধের প্রথমদিন শুরু তাতে কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে। হ্যাঁ, দিনটা সঞ্জয়ের হিসেবে না আসতে পারে। আসবেই বা কেমন করে? কুরুক্ষেত্র দখলের দৌড় যখন চলছে তখন সে ছিল কোথায়? কুরুক্ষেত্রের ধারেকাছে অন্তত নয়। এর পরের দিন ভীষ্ম যেমন কৌরবদের সেনাপতি হয়েছেন তেমনই ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের। সেইদিনই ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের স্বচক্ষে যুদ্ধ না দেখার দুঃখ ঘোচাবার জন্য দিব্যচক্ষু দিয়ে সঞ্জয়কে তাঁর কাছে ভিড়িয়ে দেন। সঞ্জয়ের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তাই সেদিন থেকেই শুরু আর তাঁর গুনতিতে মোট আঠারো দিনেই শেষ। আসলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে হয়েছিল—কিন্তু পুরো উনিশটি দিন—তা আরও বুঝিয়ে বলতে হবে?"

ঘনাদার রণংদেহি চাউনিটা সোজা এবার গৌরের দিকে! গৌর কি কোনও জবাব দেবে?

সে মুখ খোলার সুযোগ পাওয়ার আগেই আমরা সমস্বরে ঘনাদাকে সমর্থন করে বললাম, "না, না। যা বললেন তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক-দিনে শেষ কেউ প্রশ্ন করে দেখুক দিকি?"

হারের খেসারত হিসেবে গৌর প্রস্তাব যা করল তাতে আমরা তো বটেই, ঘনাদাও বুঝি একটু তাজ্জব।

গৌর বেশ একটু যেন মুগ্ধস্বরেই বলল, "ভাবছি কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে এমন একটা যুগান্তকারী গণনার সম্মানে সত্যিকার স্পেশাল কিছু আজ করা দরকার। এই যেমন বড় রাস্তা মোড়ের দোকানের চিকেন প্যাটিস আর ফিশরোল হলে কেমন হয়?"

এ প্রস্তাব স্বয়ং গৌরের! আমাদের কারও মুখে খানিকক্ষণ আর কথা নেই। ঘনাদারও না।

ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত

ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত

১

"হয়তো!" হ্যাঁ, বাক্যটা ঘনাদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হল। কিন্তু কেমন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ওই শব্দটুকু মুখ দিয়ে বার করেই গুম হয়ে গেলেন ঘনাদা।

কী হয়তো? কেন হয়তো? এমন অনেক প্রশ্নই তখন মনের মধ্যে তো বটেই, জিহ্বাগ্রেও যে এসেছিল, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু ঘনাদার মুখ-চোখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে তা উচ্চারণ করতে আর সাহস করিনি।

ঘনাদার মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝব, এত বড় ধুরন্ধর আমরা কেউ নই, তবু মনে হচ্ছিল একটা কী বিষয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনঃস্থির করতে পারছিলেন না।

তাঁর মনে যে অস্থিরতাটা, সেটা এক হিসেবে 'না' আর 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বও হতে পারে।

'হয়তো' বলে তিনি যে একটা সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবেন কি না, এই নিয়েই তাঁর মনে বেশ প্রবল দ্বিধা ছিল বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এ-দ্বিধার মীমাংসায় 'না'-এর উপরে 'হ্যাঁ'-ই যে জয়ী হল, এ আমাদের ভাগ্য।

"হ্যাঁ"। মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘনাদা তাঁর 'হয়তো'কে বিস্তারিত করে বললেন, "হয়তো সে ঠিক খবরই পাঠিয়েছিল। কিন্তু—"

'কিন্তু'র পর যে দীর্ঘ নীরবতা, সেটা প্রায় যন্ত্রণায় পৌঁছে দিয়ে ঘনাদা তাঁর বক্তব্যটা পেশ করলেন। বললেন, "কিন্তু 'কানুড়ি' থেকে 'ফাং'-এ অনুবাদ করাতেই হয়তো ভুল হয়েছে। আর, তারপর 'হাউসা'য় তার 'কান'গুলো 'ধান' হয়ে সব এমন বরবাদ করে দিয়েছে যে, আমি সোজার বদলে উলটো খবরই পেয়েছি।"

মুখটা তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব করুণ করে ঘনাদা চুপ করলেন।

কিন্তু আমরা যে তখন একেবারে অকূল পাথারে! ঘনাদার প্রথম 'হয়তো'র পরেই যেটুকু ফাঁপরে পড়েছিলাম, 'ফাং' 'হাউসা' 'কানুড়ি'র জালে জড়িয়ে তা যে একেবারে গোলক-ধাঁধার ফাঁদ হয়ে উঠল।

কী বলছেন ঘনাদা? মানে, বলতে চাইছেন কী?

সোজাসুজি সে-কথা যে জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। কারণ অমন

বেয়াদপিতে উত্তর যা মিলবে, তাতে নখ কাটাতে গিয়ে আঙুল কাটিয়ে ফেলার ঝক্কি নেওয়া হবে।

তার চেয়ে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করাই ভাল । নিজের পাকানো জট ঘনাদা সময়মত নিজেই কি আর খুলবেন না?

সেই ধৈর্য ধরেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবুঝ গৌরটার জন্য তা থাকা আর হল কই?

"কী হাং-ফাং করছেন?" ঘনাদাকে সে একটু গরম গলাতেই জিজ্ঞেস করে বসল, "হিং টিং ছটের মতো মন্তর-টন্তর নাকি?"

"না, মন্তর-টন্তর নয়?" ঘনাদার গলার ঝাঁঝটুকু আর লুকনো নেই এবার, "কিন্তু ওগুলো কী, বোঝাতে গেলে একটু ভূগোলের পরীক্ষা আগে নিতে হবে।"

"ভূগোলের পরীক্ষা?" সভয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, "কী পরীক্ষা, ঘনাদা?"

"না, এমন কিছু পরীক্ষা নয়," ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "শুধু ক-টা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব। যেমন, কোন দেশে একসঙ্গে আবলুস, সেগুন, মেহগনির সঙ্গে প্রচুর তাল-তমাল যেমন পাওয়া যায়, তেমনই প্রচুর পাওয়া যায় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, বক্সাইড থেকে হিরে আর সোনা?"

একটু থেমে আমাদের মুখের ভাবটা লক্ষ করে ঘনাদা এবার বললেন, "এ সব যদি একটু কঠিন প্রশ্ন মনে হয় তা হলে একটা মাত্র অতি সোজা প্রশ্ন করছি। যার উত্তর জানলে দেশটার নাম বলতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। প্রশ্ন হল এই, কোন দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৯ আর ১৯২২-এ দু-দুবার এক আগ্নেয়গিরি থেকে দারুণ অগ্ন্যুদগার হয়েছে?"

কী জবাব দেব এ সব প্রশ্নের?

ভ্যাবাচাকা ভাবটা কোনওরকমে লুকোবার চেষ্টা করে মাথা চুলকোবার অভিনয়ই করছিলাম, তারই মধ্যে "শুনুন, ঘনাদা" বলে গৌর হঠাৎ মুখ খোলায় সত্যিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ঘনাদা এমনিতেই খুব ভাল মেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর বেয়াড়া কিছু বলে গৌর যদি তাঁকে গরম করে দেয় তা হলে অন্তত আজকের দিনের মতো আমাদের বাহাত্তর নম্বরের মজলিশ একেবারে মাটি।

কিন্তু ভয় যা করছিলাম, উলটোটাই তার হল।

জাতে পাগল হলেও গৌর যে তালে ঠিক তা বোঝা গেল তার পরের কথায়!

বেয়াড়া কিছুর বদলে, গরম হওয়ার বদলে ঘনাদা তাতে গলে একেবারে জল।

কী এমন বললে গৌর, যাতে খোঁচানো সাপও ফণা তুলতে ভুলে যায়? কী সে মন্তর?

না, হাত কচলানো খোশামুদি গোছের কিছু নয়। বরং তাতে ফোঁস করার ঝাঁঝই একটু আছে বলা যায়। কিন্তু কাজ হল ওই ফোঁসানির সুরেই।

মিষ্টি সুরে-টুরে নয়, গৌর ঘনাদার ওপর অভিমানেই নালিশ জানিয়ে বললে,

"অত ভূগোলের পরীক্ষা যদি দিতে হয়, তা হলে পি. আর. এস., পিএইচ. ডি ডিগ্রির পিছনেই তো ছুটলে পারি! তার বদলে এই বাহাত্তর নম্বরে আপনার মুখ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব কেন? মোড়ের দোকানে এক চেঙারি হিঙের কচুরির অর্ডার দিয়ে এসেছি। বনোয়ারি তা নিয়ে নীচের গেটের মুখেই বোধহয় পৌঁছে গেছে। রামভুজের সেগুলো প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে পাঠাতে যা দেরি। কিন্তু এখন আর কী হবে তাতে, সব ঘাস লাগবে মুখে—হ্যাঁ, ঘাস।"

গৌর চুপ করল এমন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে আমাদেরই দুচোখের পাতাগুলো কেমন যেন একটু ভিজে-ভিজে হয়েছে মনে হল।

ঘনাদারও তা-ই হল কি না জানি না। কিন্তু তাঁর গলায় এবার যে সুরটা শোনা গেল, সেটা স্পষ্টই সান্ত্বনার।

"আহা! হিঙের কচুরি ঘাস হতে যাবে কেন?" তিনি আশ্বাস দিলেন, "এই আমাদের মোড়ের জহর হালুইকরের হিঙের কচুরি তো? ও আজ বিকেলে আনিয়ে কাল সকালে মুখে দিলেও মুচমুচে থাকে। তবে—"

ঘনাদার হিঙের কচুরির কৌলীন্য-বিচার আর হল না। বিরাট ট্রে-র ওপর কচুরি-সাজানো প্লেট নিয়ে বনোয়ারি তখন আড্ডাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঢোকার আগেই তার ট্রের ওপরকার প্লেটে সাজানো কচুরির গন্ধেই অবশ্য আড্ডাঘর মাত হয়ে গেছে।

২

বনোয়ারি তাঁর হাতেই প্রথম যে-প্লেটটা তুলে দিল, তার ডবল সাইজের কচুরির তাক যে প্লেটের ওপর প্যাগোডার মতো, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

সেদিকে চেয়ে অন্তরের খুশিটা অকপট উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেই ঘনাদা বললেন, "হিঙের কচুরি কী হে, এ তো রাধাচুরি! মানে রাধাবল্লভী আর কচুরির দ্বন্দ্বসমাস। তা বড় বেশি দিলে যে! এত কি আর এ বয়সে শেষ করতে পারব?"

"খুব পারবেন, খুব পারবেন," সবাই আমরা জোর গলায় আশ্বাস দিলাম, "বয়স আপনার আর কী, চল্লিশই তো পার হয়নি।"

"চল্লিশ—! বলো কী হে!" ঘনাদা বিষম খাওয়াটা কোনওরকমে সামলে বললেন, "আমার চল্লিশ—"

"মানে!" চটপট বাধা দিয়ে বললাম, "চল্লিশে পৌঁছে ঠেকে গেছে আর কী! পার হতে তো পারছে না! তাই বলছি—"

তাই আর কিছু বলতে হল না। যে কারণেই হোক, ঘনাদা একটু বেশিরকম খুশি হয়ে তাঁর প্লেটের রাধাচুরি প্যাগোডার ওপর চুড়ো হিসেবে আরও দুটো শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় ক-টা সুখটান দিয়ে যেন ধাতস্থ হয়ে, প্রায় মেজাজের অসীম প্রসন্নতার পরিচয় দিয়ে নিজে থেকেই গোড়ায় ধরা প্রসঙ্গটা স্মরণ করে বললেন, "হ্যাঁ, ভূগোল শেখায় তোমাদের

আপত্তি জানাচ্ছিলে, না? কিন্তু ভূগোলের প্রশ্ন কেন তুলেছিলাম জানো? তুলেছিলাম, যা বলতে যাচ্ছি, ভূগোল কিছুটা না-জানা থাকলে তার রহস্যটাই ঠিক বোঝানো যাবে না। ভূগোলের ক-টা সোজা প্রশ্ন মাত্র তোমাদের করেছি। প্রশ্ন আর-দুটো বেশি করলে হয়তো উত্তরটার আভাস তোমরাও পেতে। এই যেমন ক-টা প্রশ্ন করেছি তার ওপর যদি জানতে চাইতাম, কোন দেশে কোথায় গোরিলাও যেমন, সিংহও তেমনই পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা চটপট উত্তর দিতে—আফ্রিকা। কিন্তু আফ্রিকা তো একটা বিরাট মহাদেশ। শুধু আফ্রিকা বললেই তো হবে না, আফ্রিকার কোথায় বোঝানো যাবে না। সুতরাং শুধু আফ্রিকা বললেই হবে না, আফ্রিকার কোথায়, সেটা সঠিক জানা চাই।

সঠিক জায়গাটা এখনও হয়তো ধরতে পারোনি বলেই বলে দিচ্ছি জায়গাটা। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা অঞ্চল, যার বর্ণনা দেওয়া খুবই শক্ত। গাছপালা আর ধাতু-সম্পদের কথা আগে আমার প্রশ্নে যা বলেছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, জায়গাটার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। দেড়শো থেকে দুশো ফুট উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল যেমন আছে, তেমনই আছে শুধু কাঁটাঝোপের বিস্তীর্ণ আধা-মরু অঞ্চল। একদিকে গোরিলা শিম্পাঞ্জিদের যেমন দেখা মেলে, তেমনই দেখা যায় উটপাখির পাল।

আর বেশি বর্ণনা দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। তাই জায়গাটার নামটা বলেই ফেলি। নাম হল ক্যামেরুনস। বর্ণনা আগে যেটুকু দিয়েছি, তার ওপরে বলতে পারি যে, যেমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেমনই ইতিহাসের চমক দেওয়া কিছু ঘটনার বিশেষত্বে আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডটির একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

ক্যামেরুনসের উত্তর-পশ্চিমে পোর্তুগিজরা প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্র-কূলে যেখানে নামে, সেখানকার একটি নদীকে তারা চিংড়ির নদী নাম দিয়েছিল। ১৯১৯-এর এক শীতের মরসুমে একদিন সেখানে এক বুনো চেহারার সাহেবকে নিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হয় । সাহেবের চেহারাটা বুনো হলেও পোশাক-আশাক চাল-চলন সব একেবারে বাদশাহি মেজাজের। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের একটা বোঝা, আর মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জঙ্গল বাদে মানুষটার সবকিছুই ভদ্র, ফিটফাট আর মানানসই। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল আর মাথায় জট পাকানো চুলের ঝোপ। সেটা তাঁর মুখের কোনও কাটা ঘায়ের দাগ-টাগ ঢাকা দেওয়ার ফিকির হতে পারে।

মানুষটা চিংড়ি নদীর ধারে একটা বড় গঞ্জের পাশে একটা মস্ত বাহারি তাঁবু পেতে সেখানে ডেরা বেঁধেছেন। এর মধ্যে ওখানকার কাফরি গাঁয়ের সর্দারকে নিজের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনায় আপ্যায়িত করেছেন বারকয়েক।

তাঁর মতলবও কিছু লুকোবার নেই। এখানে এসে ডেরা বাঁধবার পরেই তিনি এ-তল্লাটের যে দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো দৈত্যাকার বান্টুকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন, তারাই সাহেবের পরিচয় দিয়ে শতমুখে তাঁর প্রশংসা করে তাঁর এ মুলুকে আসার উদ্দেশ্য সকলকে জানিয়েছে।

তাদের কাছে জানা গিয়েছে, সাহেবের নিজের দেশ হল বিলেত। নাম তাঁর ড. লক। অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে সেখানকার অজানা সব রহস্য খুঁজে বার করে তার যতটা সম্ভব খবরাখবর বার করাই তাঁর কাজ। এ কাজে ড. লক দুনিয়ার অনেক জায়গায় বহু বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ও মুখের বুনো চেহারার আসল কারণ এমনই এক দারুণ আচমকা বিপদে পড়া। সে বিপদে তাঁর মুখের ও মাথার চামড়া অনেকখানি পুড়ে সাদা হয়ে যায়। কোনওরকমে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও বীভৎস চেহারার লজ্জায় তিনি আর পোড়া মুখ কাউকে না দেখাবার জন্য মুখে ও মাথায় অমন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছেন।

এখন এই চিংড়ি নদীর মোহানায় তাঁর আস্তানা পাতবার কারণ কিন্তু তাঁর সেই অজানা দেশের রহস্য জানবার নেশা। এই ক্যামেরুনসের ভেতরে এক জায়গায় যে এক দারুণ আগ্নেয়গিরি আছে, তা সবাই জানে! মাঝে মাঝে বহু বছর অন্তর সেই আগ্নেয়গিরি খেপে উঠে আগুন উগরে তুলে ছড়ালেও তার সঠিক হদিস সভ্য জগতের কেউ এখনও জানে না। ড. লক সেই রহস্য সন্ধানের অভিযানে যাবার জন্য পথের দিশারি হবার মতো একজন ও অঞ্চলের সেথো চান। তাঁর দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো পাহারাদারকে তিনি সেই খোঁজেই লাগিয়ে রেখেছেন। এই যমজ দানবকে পাহারাদারের কাজে নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। ড. লকের কে একজন নাকি পরম শত্রু তাঁর সুনামের হিংসায় বহুকাল থেকে তাঁর পেছনে লুকিয়ে লেগে থেকে হয় তাঁর আবিষ্কারের গৌরব চুরি করে নিজের বলে প্রচার করতে, নয় সেটা সম্ভব না হলে তাঁর বড় রকমের কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেবার জন্যই ড. লক এবার একজন নয়, গোধা আর লোধা নামে দুই যমজ ঘটোৎকচ ভাইকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

গোধা আর লোধা শুধু শরীরের ক্ষমতাতেই দুর্দান্ত দানব নয়, তারা কাজের লোকও বটে।

লকসাহেব চিংড়ি নদীর ধারে দিন-পাঁচেক তাঁবু ফেলবার পরেই তারা একজনকে জোগাড় করে আনে গঞ্জের এক বাজার থেকে।

তাকে দেখে ড. লক হেসেই খুন।

'আরে এ কাকে এনেছিস?' হাসতে হাসতে ড. লক জিজ্ঞেস করেন গোধা-লোধাদের, 'এ চিমসে শুঁটকোটা তো তোদের চিংড়ি নদীর সত্যিকারের একটা কুচোচিংড়ি।'

ড. লকের কথায় লজ্জা পেলেও লোধা-গোধা নিজেদের একটু কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে বলে, 'আজ্ঞে, আপনি মিছে ঠাট্টা করছেন কেন? ও চিমসে চিংড়ি হলে আমাদের লোকসানটা কী? ওকে তো আর কুস্তি লড়তে হবে না। শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবে।'

লোধা-গোধার যুক্তিটা যে ঠিক, ড. লককে এবার তা স্বীকার করতে হয়। তিনি তাই হাসি থামিয়ে একটু ভাবনার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু ওকে যা ঠাট্টা-অপমান করলাম, এর জন্য ও আর আমার কাজ করতে চাইবে কি?'

'খুব চাইবে, খুব চাইবে।' আশ্বাস দিয়ে বলে লোধা-গোধা, 'দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন অবাক হয়ে হাঁ করে তাঁবুর সব জিনিসপত্র দেখছে? ও আমাদের কথা কিছু বুঝেছে কি যে, ঠাট্টা অপমানে রাগ করবে?'

'কিছু বোঝেনি মানে?' ড. লক বেশ ভয় পেয়েই জানতে চান, 'ও কি বদ্ধ কালা-টালা নাকি? তা হলে—'

'না, না, কালা হবে কেন?' লোধা-গোধা এবার বুঝিয়ে দেয় ড. লককে, 'আমরা তো বান্টুতে কথা বলেছি, ও তার কী বুঝবে?'

'বুঝবে না কী রকম?' ড. লককে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'ও কি বান্টু জানে না?'

'এক বর্ণও না,' লোধা-গোধা জানায়, 'বান্টু কেন, ওর নিজের ভাষা কানুড়ি ছাড়া হাউসা, ফুলানি, ফাং—কিছুই জানে না।'

'ঠিক, ঠিক', ড. লক খুশি-মুখে এবার বলেন, 'নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না, এমন লোকই আমাদের সবচেয়ে দরকার। আজই ওকে কাজে নাও।'

তাই নেওয়া হল সেই দিনই। কাজে নেবার সময় নামটা নিয়ে শুধু একটু গোল বেধেছিল।

খাতায় লেখার জন্য তো বটেই, তাকে ডাকবার জন্যও একটা নাম তো দরকার। কিন্তু নিজের কোনও নামই সে বলতে পারে না। সে যেখানে থাকে সেখানে গোনাগুনতি ক-টা তার মতো জংলির মধ্যে ডাকাডাকির কোনও দরকারই নাকি হয় না। হলেও তারা 'এই' 'ওই' বলে ডেকেই তাদের কাজ সারে।

কিন্তু সেখানকার নিয়ম এখানে চলে না। নাম তো একটা দরকার। শেষে জংলিটা নিজেই বললে, এই কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানাতেই যখন সে প্রথম কাজ পেয়েছে তখন তার নাম চিংড়িই রাখা হোক।

ড. লক খুশি হয়ে বলেছেন, 'ঠিক ঠিক। ওর যা চিমসে কুচোচিংড়ির মতো চেহারা, তাতে ওই নামই ওর ভাল।' মানুষটা জংলি হলেও তার মাথাটা একেবারে নিরেট নয় দেখেও তিনি খুশি হয়েছেন।

চিংড়িটাকে প্রথমে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একটু শক্ত হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিরেট না হলেও লোকটা একেবারে জংলি। সাহেবসুবো তো দূরের কথা, সাধারণ একটু ভাল অবস্থার গৃহস্থ বান্টু কি হাউসাদের ঘরদোরের খবরও জানে না।

ড. লকের তাঁবুতে বেশি কিছু দামি ও বিদেশি আসবাব না থাকলেও, তাঁর কাজের জন্য যা দরকার সেরকম কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ছিল। তাঁর তাঁবু ঝাড়পোঁছ করবার সময় ড. লক সেগুলো সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন তাঁর খাস-পাহারাদার লোধা আর গোধাকে। তাই দিতে গিয়ে প্রায় কেলেঙ্কারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

জরিপ-টরিপের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া ড. লক তাঁর কাজের সুবিধের জন্য একটা টেপরেকর্ডার তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি যে-ধরনের অভিযানে এসেছেন, তার প্রাত্যহিক বিবরণ রাখা একান্ত দরকার। একালে সে-বিবরণ হাতে লেখার তো

কথাই আসে না। টাইপ করার জন্য সঙ্গে টাইপরাইটার রাখাও একটা বাড়তি বেয়াড়া বোঝা বওয়া। ড. লক তাই একটা ছোট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অভিযানের প্রতিদিনের বিবরণ তিনি মুখে বলে টেপ-এ ধরে রাখতেন।

সেই যন্ত্রটা নিয়েই গণ্ডগোল বেধেছিল প্রথমে। সাফসুফ করার সময় ও যন্ত্রে হাত না দিতে বলার জন্য রেকর্ডারটা একটু চালিয়ে দেখাতে যেতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে পড়ি কি মরি অবস্থায় চিংড়ি তো তাঁবুর বাইরে দে ছুট। সে তখন এই ভুতুড়ে তাঁবুর কাজ ছেড়ে দিতে চায়। লোধা-গোধাকে তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে ফেরাতে হয়েছে।

এরপর আর বিশেষ গোলমাল-টোলমাল হয়নি। যে-কাজের জন্য তাকে নেওয়া, সে-কাজে চিংড়ি বাহাদুরিই দেখিয়েছে দিন কয়েকের মধ্যে। ক্যামেরুনসের এই অঞ্চল প্রায় অজানা জঙ্গল-পাহাড়, আবার আধা-মরুর দেশ। বুনো মোষ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ থেকে হিংস্র জংলি আদিবাসীদের এড়িয়ে সেখানে প্রতি পদে প্রাণ হাতে নিয়ে টহল দিতে হয়। এ-কাজে চিংড়ি কিন্তু দারুণ বাহাদুর। ড. লক ক্যামেরুনসের ভিতরের দিকে চাড হ্রদের কাছে এক আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি অঞ্চলেই যেতে চান। প্রায় চোদ্দো হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি নয়, তার কাছাকাছি নিশ নামে এক হ্রদই তাঁর লক্ষ্য।

পদে পদে যেখানে বিপদ, সেই সম্পূর্ণ অজানা, অতি দুর্গম দেশে চিংড়ি কিন্তু কোনও অদ্ভুত ক্ষমতায় যে সবচেয়ে নিরাপদে আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছচ্ছে, বোঝা গেল।

এদিক দিয়ে পুরোপুরি খুশি হবার কারণ থাকলেও, লক তখন কিন্তু দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর যে দুশমনের ভয়ে লোধা-গোধার মতো দুই যমজ ঘটোৎকচকে তিনি পাহারায় নিয়েছেন, তার হাত থেকে তিনি যে রেহাই পাননি, তা তিনি এই অভিযানে চিংড়ি নদীর মোহানা থেকে রওনা হবার ক-দিন পরেই টের পেলেন।

সে দুশমন যে তাঁর সঙ্গেই আছে তার প্রথম প্রমাণ যা পাওয়া গেল তা খানিকটা যেন ঠাট্টার মতো ব্যাপার। অভিযানের বিবরণ টেপরেকর্ডারে তুলে রাখলেও পথের হদিস ধরে রাখবার জন্য ড. লক খুব সংক্ষেপে একটা মানচিত্রের খসড়া লিখে আর এঁকে রাখতেন। সেই খসড়া ম্যাপের উপর একদিন হঠাৎ কিছু হিজিবিজি কাটা দেখা গেল।

সেই হিজিবিজি কাটাকুটিতে ভাবনার খুব বেশি কিছু ছিল না। চিংড়ি হয়তো তাঁবুর ঝাড়পোঁছ করবার সময় অসাবধানে বা জংলি খেয়ালে তাতে অমন দাগ কেটে থাকতে পারে, কিন্তু সেই হিজিবিজির পাশে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা, সেটাই তো অবিশ্বাস্য একটা রহস্য।

হিজিবিজির আশেপাশে গোটা-গোটা হরফে স্প্যানিশে লেখা—'ট কোয়ে তাল আমিগো?'

ড. লক স্প্যানিশ না জানলেও ও ক-টা কথার মানে জানেন। ও কথাগুলোর মানে

হল, 'কেমন আছ বন্ধু?'

এই অজানা বিদেশে এক গোপন অভিযানে এতদূর আসবার পরে তাঁর দুই যমজ দানব আর এক জংলি নফরের পাহারা দেওয়া তাঁবুতে ঢুকে এ-কাজ কার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

সম্পূর্ণ ভৌতিক ছাড়া ব্যাপারটার তো আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

অত্যন্ত অস্থির হলেও ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে ড. লক রহস্যটা বুঝবার জন্য কিছুদিন নিঃশব্দে সজাগ থাকবেন বলে ঠিক করলেন।

কিন্তু তার ফল যা হল, তাতেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।"

৩

গল্প বলতে বলতে চুপ করে গেলেন ঘনাদা। কী হল? কেন আর তিনি মুখ খুলছেন না? কেন যে খুলছেন না, শেষ পর্যন্ত শিশিরই সেটা বুঝতে পেরে এগিয়ে দিল তার সিগারেটের টিন। ঘনাদা তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প।

"যেমন তাঁর নিয়ম, তেমনই সেদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ড. লক তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে তাঁর অভিযানের আগের দিনের বিবরণ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করছিলেন।

কিন্তু যন্ত্রটা দেখেই তো তাঁর চক্ষুস্থির।

তাঁর আগে কেউ যে সেটা ব্যবহার করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়েছে।

সেটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। যেখানে যন্ত্রটা থাকে, তার বদলে টেবিলের অন্য একধারে অগোছালো কাগজপত্রের মধ্যে এমনভাবে সেটা ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ওখানে যে অন্য কারও হাত পড়েছে, তা বুঝতে কোনও কষ্ট না হয়।

এরপর যন্ত্রটা চালাতে যা শোনা গেল, তাতে ভাবনায়, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। স্পষ্ট জার্মান ভাষায় সেখান থেকে তখন শোনা যাচ্ছে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি, ড. লক। আর লক, তোমার আসল নাম যে ব্রুল, তা আমার জানা!'

টেপরেকর্ডারের কথা ওইটুকুতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ওখানে আছে তাই শুনেই ড. লক তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বলা চলে। প্রথমত, নিজের ঠিক মতো হুঁশ আছে কি না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সত্যিই, নেহাত স্বপ্নে ছাড়া এরকম ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব? মনের সংশয় কাটাবার জন্য টেপরেকর্ডারটা একবারের জায়গায় ড. লক বারবার, অন্তত দশবার, চালিয়ে দেখলেন।

না, তাঁর মনের ভুল নয়। সত্যিই কে একজন স্পষ্ট চলিত জার্মান ভাষায় ওই ক-টা কথা সেখানে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে।

কিন্তু কার দ্বারা, কেমন করে তা সম্ভব? এ কাজ যে করেছে, তার তো এই অভিযানের সঙ্গেই থাকা দরকার। যে দুর্গম অজানা সব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চিংড়ি

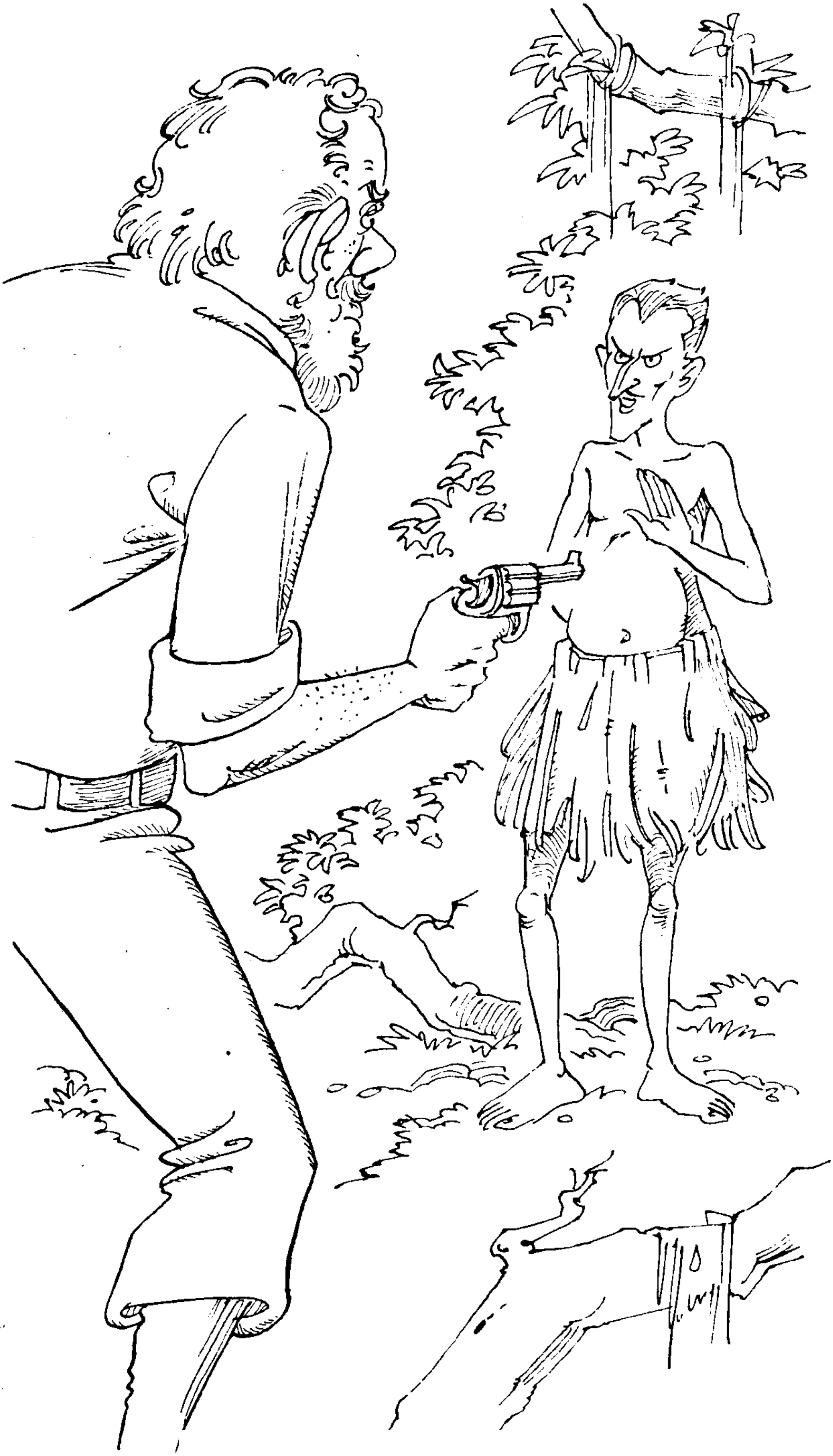

তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারওর পক্ষে অজান্তে তাঁর দলের রাস্তা ধরেই লুকিয়ে সঙ্গে থাকা প্রায় অসম্ভব।

আর তা-ও যদি সম্ভব হয়, তা হলেও তাঁবুর ভেতর কখন কীভাবে ঢুকে সে এ কাজ করবে? তাঁবুর মধ্যে তিনি নিজে অধিকাংশ সময় থাকেনই। আর তা ছাড়া লোধা-গোধা দুজনেই সারাক্ষণ থাকে কড়া পাহারায়। চিংড়ির কথা ধরবারই নয়। তবু তাকেও বাদ না দিয়ে ড. লক লোধা-গোধার সঙ্গে তাকে ডেকে অত্যন্ত কড়া ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

লোধা-গোধা দুজনেই তো ড. লকের জেরা শুনে একেবারে হতভম্ব। এই সফরে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে আসা কেমন করে সম্ভব?

আর যদিও লুকিয়ে-চুরিয়ে কেউ তাদের কাছাকাছি আসতে পেরে থাকে, এ তাঁবুর ভিতরে ঢুকে সাহেবের যন্ত্রপাতি ছোঁবার সময়-সুযোগ সে পাবে কী করে?

লোধা-গোধার কাছে এর চেয়ে এ রহস্যের হদিস পাবার মতো উত্তর ড. লক আশা করেননি। তবু তাদের তিনি হয়রান করে মেরেছেন। সম্ভব-অসম্ভব হাজার রকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে তাদের।

লোধা-গোধার পর এ ব্যাপারে হদিস পেতে জংলি চিংড়িকে ডাকার কোনও মানে হয় না।

তবু কোনও দিকে ক্রটি রাখবেন না বলে ড. লক লোধা-গোধাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে চিংড়ির ভাষা কানুড়িতে তাকে জেরার ব্যবস্থা করেছেন। সে-জেরায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে চিংড়ির কথা শুনে কিন্তু তিনি থ। লকের হুকুমে লোধা-গোধা চিংড়িকে কানুড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এ তাঁবুতে কাজ করবার সময় আর কাউকে কখনও দেখেছে কি না।

চিংড়ি তাতে যা উত্তর দিয়েছে তা শুনে একেবারে থ হয়ে লোধা-গোধা সেটা অনুবাদ করে লক সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেই গেছে ভুলে।

লক তাদের হতভম্ব ভাব দেখে ধমক দিয়ে ওঠার পর তারা থতমত খেয়ে চিংড়ি যা বলেছে তা জানিয়েছে।

চিংড়ি যা জানিয়েছে তাতে তাদের হতভম্ব হবারই কথা অবশ্য। চিংড়ি বলেছে, সে নাকি তাঁবুতে রোজই আর-একজনকে দ্যাখে।

'রোজই আর-একজনকে দ্যাখে? কখন?' লক লোধা-গোধাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছেন।

'কখন আবার?' চিংড়ি জানিয়েছে, যতক্ষণ সে এ তাঁবুতে থাকে, সারাক্ষণই।

'সারাক্ষণই?' লোধা-গোধার মারফত কথাটা শুনে কী মনে করবেন ভেবে না পেয়ে লক রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কোথায়? এ তাঁবুর কোথায়, কোনখানে?'

লোধা-গোধার কাছে প্রশ্নটা শুনে নির্বিকারভাবে চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে হাসবেন, না জ্বলে উঠবেন ড. লক তা ঠিক করতে পারেননি।

চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা তাঁবুর এক ধারে লকের চুল আঁচড়ানো, দাড়ি

কামানোর সরঞ্জাম রাখার জন্য টেবিলের ওপর ঝোলানো একটা আয়না।

জংলিটাকে তখনকার মতো হাসতে হাসতে তাঁবু থেকে দূর করে দিলেও ব্যাপারটা নিয়ে লকের দুর্ভাবনা ক্রমশ চরমে উঠেছে।

চিংড়ির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে তখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন।

কাঁটাঝোপের আধা-মরু পাথুরে ডাঙা পার হয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ছোটখাটো হ্রদ আর শুকনো গভীর খাদ তাঁদের পথে পড়েছে। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া যে পাহাড়ের চূড়া তাঁদের চোখে পড়েছে, সেটা ক্যামেরুন আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বুঝেছেন লক।

কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু হয়েছে যাতে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখাই শক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপার যা ঘটেছে তা লকের টেপরেকর্ডারটা সম্পর্কেই।

প্রথম সেখানে অজানা ভুতুড়ে কণ্ঠ শোনার পর বেশ কিছুদিন আর কিছু হয়নি। ক্যামেরুন আগ্নেয়গিরি দেখার পরই একদিন সকালে টেপরেকর্ডারে আবার সেই ভুতুড়ে গলা হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, 'শোনো, শোনো ব্রুল', টেপরকের্ডার থেকে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় শোনা গেছে, 'যেখানে তুমি চেয়েছিলে সেখানে তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ বললেই হয়। আর একদিন কি একবেলা গেলেই নিয়ল হ্রদের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিয়ল হ্রদ কি ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরি তো সত্যিই তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার আসল লক্ষ্য, এই অঞ্চলের অসংখ্য সব অজানা গুহা-গহ্বর। এমন অদ্ভুত সন্ধানে কেন তুমি এসেছ, তা যে আমি জানি, তা বুঝতে পেরেছ কি? না পেরে থাকলে দুনিয়ার সবাই যা জানে সেই পুরনো ইতিহাস তোমায় একটু স্মরণ করিয়ে দেব। একটা দিন শুধু ধৈর্য ধরো।'

টেপরেকর্ডার ওইখানেই চুপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ধরবেন কী—রাগে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ড. লক। টেপরেকর্ডারের কথায় যাঁর আসল নাম লক নয়, ব্রুল!

ভেতরে ভেতরে খেপে গেলেও ব্রুল এবার চেঁচামেচি করে লোধা-গোধা কি চিংড়িকে ডাকাডাকি করেননি। তার বদলে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে টেপরেকর্ডারের সঙ্গে এমন ক-টা বৈদ্যুতিক তার লাগানো কলের ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, রেকর্ডারে কেউ হাত দিলেই একটা হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া আলোয় গুপ্ত একটা ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে।

ছবি ঠিকই উঠল। তবে তা ব্রুলের নিজেরই ছবি। রেকর্ডারের সঙ্গে ক্যামেরার গুপ্ত সংযোগের কৌশলটা করে রেখে ব্রুল সেদিন কাছাকাছি অঞ্চলের একটু ভাসা-ভাসা জরিপের কাজ করেছেন, সেখানকার গুহা-গহ্বর, ছোটখাটো পাহাড়-টিবি-হ্রদ ছকে রাখবার জন্য। এ কাজে লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুর পাহারা ঠিকই রেখেছে, আর তাঁকে তাঁর দরকারমত সাহায্য করেছে।

সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই টেপরেকর্ডারের দিকে গিয়ে তাঁর ক্যামেরার ফাঁদ কী রকম কাজ করেছে দেখার ইচ্ছে হলেও তিনি নিজের ওপর রাশ টেনে রেখেছেন।

তারপর লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুতে তাদের কাজ সেরে চলে যাবার পর অতি সাবধানে রেকর্ডারের কাছে গিয়ে সেটা চালাবার সুইচ টিপতেই আচমকা সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

তাঁর নিজের পাতা ক্যামেরার ফাঁদে হঠাৎ আলোর ঝিলিকে তাঁর নিজেরই ফ্ল্যাশ ছবি উঠে গেছে।

আর সেইসঙ্গে চালু হওয়া টেপরেকর্ডারের অজানা ভুতুড়ে গলায় শোনা গেছে, 'বড় দুঃখিত ব্রুল, তোমার পাতা ফাঁদে তোমাকেই কাবু হতে হল। কিন্তু এখন বাজে কাজে আর কথায় নষ্ট করবার সময় নেই। আসল কথা যা তোমায় বলতে চাই, তার জন্য দুনিয়ার সকলের যা জানা নেই, সেই পুরনো ইতিহাসটা তোমায় নতুন করে একটু আগে শুনিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই অঞ্চলটা জার্মানদের অধিকারে ছিল। এখনকার জার্মানি নয়, আগেকার জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ হবার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীন জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক কিছুর মধ্যে এইসব জায়গার অধিকারও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের হাতে চলে গেছে।

পৃথিবীর নানা দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজরাই ছিল ইউরোপের আর-সব দেশের চেয়ে এগিয়ে। তখনও উড়োজাহাজের দিন শুরু হয়নি। পৃথিবীর সমুদ্রে সমুদ্রে যার যত বেশি রণতরীর প্রাধান্য, তার সাম্রাজ্যও তত বিরাট। সেদিক দিয়ে ইংল্যান্ডের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেত না বলে ছিল ইংরেজদের গর্ব।

ইংরেজদের পরে এ বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসাম্রাজ্য ছিল ফরাসিদের। এই দুই জাতের পরে এদিকে দৃষ্টি দেয় বলে জার্মানির সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোট। কিন্তু পৃথিবীর যেটুকু জায়গা তারা অধিকার করেছিল, নানা দিকে তার উন্নতি বিধানের চেয়ে সেগুলি থেকে যতখানি সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তারা ছিল বুঝি সব দেশের চেয়ে অগ্রসর। এই অঞ্চলটাতেও তারা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু বড় কাজ শুরু করেছিল। মহাযুদ্ধে হারের দুঃখ যেমন, তেমনই এইসব অধিকার হারাবার অপমান আর জ্বালা জার্মানদের অনেকেই ভুলতে পারেনি। আগের জার্মান সাম্রাজ্য লোপ পেলেও আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন শুধু নয়, সে স্বপ্ন সফল করার সাধ্য-সাধনের জন্য যারা গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছে, তাদের নেতার নাম অ্যাডল্ফ হিটলার। হিটলার এখনও একটা জঙ্গি দলের সর্দার মাত্র। দেশপ্রেমের নামে পৃথিবীর আর সব দেশকে পায়ের তলায় চেপে শুধু হিংসা-ঘৃণা-স্বার্থপরতাই যেখানে মানুষের ধর্ম, বিশ্বের সঙ্গে শুধু প্রভু আর ক্রীতদাসের সম্বন্ধে বাঁধা এমন এক দানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই গড়ে তুলতে চাইছে সে।

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানি যে বিজ্ঞানে কিছুটা বেশি অগ্রসর, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশযান হিসেবে তার জেপেলিন তৈরি, সুদূর জার্মানি থেকে প্যারিসে গোলাবর্ষণ ইত্যাদির মতো ব্যাপারেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও সেই বিজ্ঞান-উদ্ভাবন দিয়েই

হিটলারের দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে তা জিতবার স্বপ্ন দেখছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে-নামা ইউরোপের সব দেশই পয়জন গ্যাস অর্থাৎ বিষবাষ্প ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। নানারকম বিষবাষ্প উৎপাদন করে তা জমা করে একটু-একটু ব্যবহারের পর বিষবাষ্প যে আর ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবার ভয়। তখন যারা বিষবাষ্প তৈরি করেছিল, সেসব দেশই তারপর সে সব গ্যাস সাবধানে নানা জায়গায় জমা করে লুকিয়ে রাখে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাজে না লাগালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যে ব্যবহার হবে না, সেকথা কে বলতে পারে! হিটলারের জার্মানি তাই অস্ত্র হিসেবে বিষবাষ্প জমা করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে তার হাত-পা অনেক দিক দিয়ে বাঁধা। পয়জন গ্যাস বানাতে গেলে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরা পড়বারই কথা। পড়লে সব মতলব ভেস্তে যাবে। এ সংকট কাটাবার উপায় বার করবার জন্যই ড. লক নাম নিয়ে তোমার মতো গুপ্ত নাৎসির আসরে নামা। জার্মানি বিষবাষ্প খোলাখুলি, এমনকী লুকিয়েও, তৈরি করতে গেলে বিপদ আছে। তা থাক, বিষবাষ্প উৎপাদনের বদলে কোনও অজানা জায়গায় মজুত গ্যাস জোগাড় করবার ব্যবস্থা করলে তো সেভাবে ধরা পড়বার ভয় নেই।

কোথায় কোন অজানা জায়গায় সেরকম মজুত লুকনো গ্যাসের সঞ্চয় আছে? কোথায় আছে, তা আর কেউ না জানুক, জানে ব্রুল নামে এক জার্মান ভবঘুরে আধা-বৈজ্ঞানিক। দুর্গম অজানা সব দেশে টহল দিয়ে নানারকম অদ্ভুত খবর সংগ্রহই যার নেশা।

সেই ব্রুল প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হার হওয়ার পর যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপরাধে মিত্রশক্তির গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে নানা জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

জার্মানিতে হিটলারের অধীনে নতুন নাৎসি দল গড়ে ওঠে, আবার জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হবার পর। আগের যুদ্ধের মজুত করা পয়জন-গ্যাস কাজে লাগতে পারে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুলের মনে পড়ে আগেকার এক আবিষ্কারের কথা। সে নতুন করে তা খুঁজে বার করবার কথা ভাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তার ভবঘুরে টহলদারির সময় সে ক্যামেরুন আগ্নেয়গিরির চারধারে ছোট ছোট হ্রদ অঞ্চলে অনেক অনেক গুপ্ত হ্রদের গহ্বর দেখেছিল, যার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে বিষবাষ্প বেরিয়ে আশপাশের জংলিদের বসতিতে মড়ক লাগাত। সে তখনই বুঝেছিল যে এইসব গুপ্ত হ্রদের গহ্বরের তলায় এমন প্রচুর বিষবাষ্পের সঞ্চয় আছে যা বাইরে ছাড়া পেলে সারা দেশে মড়ক বাধিয়ে দিতে পারে। জার্মানির হারের পর সেখানকার অনেক পুরনো পাপী নাম ভাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চেহারা পালটে ভিন দেশে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টায় সফল তারা সবাই হয়নি। আসল পাপীরা অধিকাংশই ধরা পড়ে। তাদের উচিত-শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু পাকা শয়তানদের তালিকা দেওয়া খাতায় তোমার নাম ছিল না বলে নয়, জার্মানির ভাগ্যের আকাশ যে অন্ধকার হয়ে আসছে, তা একটু আগে

থাকতে বুঝে ইউরোপ ছেড়ে এই আফ্রিকায় এসে লুকোবার জন্যও তুমি এ যাত্রায় বেঁচে গেছ।

এই জংলা প্রবাসে কখনও খেয়ালি ভবঘুরে, কখনও টহলদার খ্রিস্টান সাধু সেজে তুমি ক্যামেরুন আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নিয়ল হ্রদের আশেপাশে গুপ্ত সব বিষবাষ্পের যেমন সন্ধান পেয়েছ, তেমনই জার্মানিতে কে এক অ্যাডলফ হিটলারের অধীনে জার্মানিকে আবার বিশ্বজয়ী করে তুলবার জন্য এক নাৎসি দলের অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছ।

এরপর লুকিয়ে বার-কয়েক ইউরোপ গিয়ে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তোমার আবিষ্কার করা পয়জন-গ্যাসের সঞ্চয়ের কথা জানিয়ে তার সঠিক-হদিস-জরিপ-করে-দেওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে রাখবার জন্য আবার এই ক্যামেরুনসে রিও দে কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানায় এসে নিয়ল হ্রদের অঞ্চলে যাবার সবচেয়ে সোজা আর নিরাপদ রাস্তা দেখাতে এই জংলি চিংড়িকে কাজে লাগিয়েছ।'"

ঘনাদা যে ফের মুখ বন্ধ করেছেন, তার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, ইতিমধ্যে আর-এক প্রস্ত চা এসে গিয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, শিশিরের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে, তিনি আবার গল্পের খেই ধরলেন।

"দাঁতে দাঁত চেপে টেপরেকর্ডারের কথা শুনতে শুনতে ব্রুল হঠাৎ চমকে উঠে টের পায়, যে-কথাগুলো সে শুনেছে, সেগুলো টেপরেকর্ডার থেকে নয়, তাঁবুর মধ্যে এইমাত্র ঢোকা সেই জংলি চিংড়িটার মুখ দিয়েই বার হচ্ছে।

জংলিটা কয়েক সেকেন্ড আগে যেরকম বেপরোয়াভাবে তাঁবুর ভেতর এসে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করেছিল তাতে হতভম্ব বিহ্বল হয়ে ব্রুল তো তখন প্রায় তোতলা।

'তু-তু-তু, মানে আপ-আপ-আপ, মানে আপনি,' বলে আড়ষ্ট জিভটায় সাড় ফেরাবার চেষ্টায় তার মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

'থাক, থাক!' বলে বেশ একটু ঠাণ্ডা গলায় তাকে থামিয়ে চিংড়ি বললে, 'আমার মতো জংলির মুখে সামান্য একটু জার্মান শুনে তুই থেকে অমন আপনি-তে উঠতে হবে না। তার বদলে শির-ছেঁড়া সন্ন্যাস-রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোনো।'

কিন্তু ব্রুল তখন রাগে অপমানে একেবারে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। 'তুই, তুই', বলে মুখ দিয়ে যেন লাভা ওগরাতে ওগরাতে তাঁবুর ভেতর হঠাৎ যমজ ঘটোৎকচের এক ভাই গোধাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললে, 'কী করিস তোরা? কী জন্যে এত টাকা দিয়ে তোদের পাহারায় রেখেছি? কী বলে ওই চিংড়িটার মতো শয়তানকে আমাদের কাজে নিয়েছিস? আমি তোদের সকলকে গুলি করে মারব। হ্যাঁ, গুলি করে—। তার আগে এই চিমসে চিংড়ি চামচিকেটাকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে—বার করে নিয়ে, হ্যাঁ, ওই নিয়ল হ্রদের ধারে একটা বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে, হ্যাঁ, ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গহ্বরেই ফেলে দিয়ে আয়।'

ব্রুল সাহেবের এ-মূর্তি গোধা কখনও দ্যাখেনি। সে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'গর্তে ফেলে দেব? ওই বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ফেলবি', ব্রুল গর্জন করে উঠল, 'ছোটখাটো নয়, সবচেয়ে গভীর যে গহ্বর, সেইটাতে। কী করেছে এই চিমসে চিংড়িটা তা জানিস? জানিস ও কে—?'

কিন্তু সে সব কথা শোনার জন্য গোধা আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চিংড়িকে দু হাতে শূন্যে তুলে ধরে সে তখন তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

তারপর কতক্ষণ বা আর—পাঁচ, বড়জোর সাত মিনিট—কী করবে ঠিক করতে না পেরে ব্রুল তখন তার তাঁবুর ভেতর খাঁচায় ভরা বাঘের মতো এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে।

'সেলাম সাহেব!' তার অস্থির পায়চারির মধ্যে ডাকটা শুনে ব্রুল চমকে ফিরে তাকিয়ে অবাক।

তাকে তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে ডাকছে লোধা কি গোধা নয়, ডাকছে চিমসে চিংড়িটা।

'অ্যাঁ, তুই!' ব্রুলের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ একটু ভয় মেশানো—'গোধা কোথায় গেল?'

'কোথাও যায়নি', চিংড়ি যেন আশ্বাস দিয়ে বোঝাল, 'তবে একটু ভাল ব্যান্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আপাতত একটু টিংচার আয়োডিন।'

'টিংচার আয়োডিন?' ব্রুল যেন রাগে দুঃখে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার? লোধা, লোধা, লোধা কোথায়?'

'না, না, তার তেমন কিছু হয়নি', চিংড়ি আশ্বাস দিলে, 'সে-ই তো দাদা গোধাকে বয়ে আনছে। তেমন জখম হলে কি পারত?'

'জখম হয়েও সে-ই দাদাকে বয়ে নিয়ে আসছে?' ব্রুলের গলায় যেন রাগ-দুঃখ-মেশানো আর্তনাদ ঠেলে উঠছে, 'এখন আমি কী করব বলতে পারো কেউ?'

'আমি পারি', চিংড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে। তাতে ব্রুল আবার জ্বলে উঠল। হঠাৎ একটা ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বার করে চিংড়ির দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে সে গর্জন করে বললে, 'তোকে আমি গুলি করে মারব। যা তোর নাম, সে-ই চিংড়ি কি ইঁদুরের মতো।'

রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েও চিংড়ি কি নির্বিকার? না। রীতিমত যেন ভয় পেয়ে সে বললে, 'থামো, থামো, ব্রুল, হুট করে এমন যা-তা করে ফেলো না। ও রিভলভারে আমাকে মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ? আমায় গুলি করে মারা মানে তোমার কী ভয়ানক বিপদ?'

'তোকে মারলে আমার বিপদ?' ব্রুল জ্বলে উঠে বললে, 'তোর মতো একটা ছুঁচোকে মারলে—'

'থামো, থামো।' চিংড়ি যেন কাতর মিনতি করে বললে, 'নেহাত যদি মারতেই চাও তো আমার পরিচয়টা তার আগে একবার ঠিক করে জেনে যাও। আমায় একবার বলছ ইঁদুর, তারপরে আবার চিংড়ি, তারপর আবার বললে ছুঁচো। আমি তোমার চোখে ঠিক কোনটা সেইটা মরার আগে-আগে জেনে যেতে চাই। সেই সঙ্গে এটুকু শুধু নিবেদন করতে চাই যে, চিংড়ি, ইঁদুর ছুঁচোকে কেউ গুলি করে মারে না। তাদের—'

'তু-তুই—', রাগে প্রায় তোতলা হয়ে ব্রুল গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলে, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস? এত বড় তোর সাহস? ভাবছিস, তোকে আমি গুলি করে মারতে পারি না? তোর মতো একটা ছুঁচো, একটা চামচিকে—'

'থামো, থামো', চিংড়ি এবার ঠাণ্ডা গলায় ব্রুলকে যেন শান্ত করতে চাইলে, 'ছুঁচো, চামচিকে, ইঁদুর, চিংড়ি—যা-ই আমি হই না কেন, আমায় গুলি করে নিশ্চয়ই তুমি মারতে পারো, কিন্তু মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ?'

'কী ভেবে দেখব?' ব্রুল চিৎকার করে বললে, 'তোকে মারলে কোন আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব।'

'হ্যাঁ, তা দিতে পারো,' চিংড়ি যেন তা স্বীকার করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর মানে?' ব্রুল দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'তারপর আবার কী?'

'তারপরেই যত গণ্ডগোল', যেন দুঃখের সঙ্গে জানালে চিংড়ি।

'তারপরে গণ্ডগোল? তোর মতো একটা—তোর মতো একটা—'

ব্রুলকে তার তোতলামির মধ্যে থামিয়ে দিয়ে চিংড়ি বললে, 'হ্যাঁ, আমার মতো ছুঁচো, ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি, যা-ই বলো, তাকে মারার পর কত গণ্ডগোল শুরু, তা বুঝতে পারছ না? শোনো, বুঝিয়ে বলি। আমার মতো একটা ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বলো, তাকে তোমার রিভলভারে ঝাঁঝরা করে একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় না হয় ফেলে দিলে। কিন্তু তারপর তুমি নিজেই যে একেবারে অথই গাড্ডায় পড়বে, তা বুঝতে পারছ কি?'

'তোকে পাতাল-গুহায় ফেলে আমি অথই গাড্ডায় পড়ব?' কথাগুলো রাগে গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলেও ব্রুল তার হতভম্ব ভাবটা ঠিক লুকোতে তখন পারছে না। সে-ভাবটা যথাসাধ্য চাপা দিয়ে তবু দাঁত খিঁচিয়েই বললে,'কেন? তুই ভূত হয়ে আমায় গাড্ডায় ঠেলে দিবি?'

'না না, ভূত হতে হবে কেন আমাকে?' চিংড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'আমি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনও পাতাল-গুহায় তলিয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে তা একটুও বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না যে, আমি না থাকলে তুমি তোমার ওই লোধা-গোধাকে নিয়েও কী অসহায়! ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই অজানা মরু-পাহাড়-জঙ্গলের দেশে আমি পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে এসেছি। আমি না থাকলে সারা জীবন খুঁজে-খুঁজেও এখান থেকে উদ্ধার পাবার পথের হদিস পাবে না। সুতরাং আমার লাশ যদি বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় পড়ে থাকে, তা হলে তোমার

লাশও এখানকার মরু-পাহাড়-জঙ্গলে কোথাও রোদে-বৃষ্টিতে শুকোবে কি পচবে, কিংবা এখানকার সিংহ-চিতা-নেকড়ের মতো হিংস্র প্রাণীদের পেটেও যেতে পারবে। তাই বলছি, আমায় মারার মতো অমন ভুল করার চেষ্টাও কোরো না।'

একটু থেমে চিংড়ি আবার বললে, 'গুলি করেও কোনও লাভ নেই অবশ্য। তোমার ওই রিভলভার আমি আগে দেখিনি মনে করেছ? এর মধ্যে আমায় মারবার মতো একটি গুলিও আমি রেখেছি? সুতরাং শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। শোনো, দেশকে ভালবাসো বলে নাৎসিদের দলে একসময় ভিড়েছিলে বটে, কিন্তু নীচ নোংরা কাজ কখনও করোনি। তা ছাড়া এককালে খ্রিস্টান সাধু হয়ে আফ্রিকার এই ক্যামেরুনস অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের সেবায় জীবন কাটিয়ে তাদের উন্নতির জন্য যা দরকার, তা করবার ইচ্ছে তোমার ছিল। আজ আবার সেই সুযোগই তোমার এসেছে। এই আগ্নেয়গিরির অজানা অঞ্চলে অসংখ্য বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহা আছে। সেই সব গোপন গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মাঝে মাঝে বেরিয়ে আদিবাসীদের সব বসতি ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। তাদের রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে তুমি এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একটি মঠ গড়ে তুলতে পারো। সেই মঠ ধর্মের জন্যও যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণাতেও তেমনই তন্ময় হয়ে থাকবে। অন্য সব কাজের মধ্যে এখানকার বিষবাষ্প জমানো গুপ্ত গুহার খবর রাখাই হবে তোমার মঠের প্রধান দায়িত্ব। এখানে সেরকম কিছু বেয়াড়া ব্যাপারের আভাস পেলেই তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জংলি আদিবাসী ভক্তদের দিয়েই রাজধানীতে না পারো অন্য কোনও ব্যবসার ঘাঁটিতে খবর পাঠাবে। সময়ে খবর পেলে এ বিষবাষ্পের সর্বনাশা ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে।'

চিংড়ির কথা শুনে ব্রুল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই নিয়ল হ্রদের কাছেই তার মঠ স্থাপনা করেছিল। অন্তত করেছিল বলেই আমার ধারণা। গুপ্ত সব গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যে ভয়ংকর সর্বনাশ এবার হয়ে গেল, তার আভাস পেয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রুল তা জানাবার জন্য তার আদিবাসী দূতকে নানা জায়গায় পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই ফাং থেকে ফুলানি থেকে হাউসায় কথা চালাচালি করায় কোথাও-না-কোথাও ভুল হওয়ার জন্যই সে-খবর আমাদের সভ্য জগতে পৌঁছয়নি। কিংবা—"

"কিংবা কী ঘনাদা", আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কিংবা—" ঘনাদা একটু ধীরে ধীরে বললেন, "সেই চিংড়ির সঠিক পরিচয় জানার কৌতূহলটা তার কাছে এত বড় হয়েছে যে, সেই সন্ধানে বেরিয়ে আর তার আফ্রিকায় ফিরে মঠ গড়া হয়নি।"

'সত্যিই দুঃখের কথা," সহানুভূতি জানিয়ে আমরা বললাম, "কিন্তু ওই চিংড়ি সত্যিই কে বলুন তো, ঘনাদা?'

বনোয়ারির হাতে খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে তখন এসে পড়েছে। ঘনাদার কাছে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

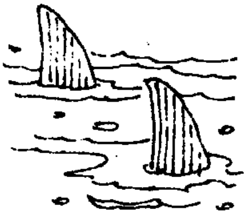

ভেলা

অবিশ্বাস্য! অভূতপূর্ব! কল্পনাতীত!

ঠিকানা—বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন।

স্থান—দোতলার আড্ডাঘর।

সময়—শুক্রবার সন্ধ্যা ছ-টা।

কুশীলব—শিবু শিশির গৌর আমি রামভুজ।

না, হল না। ঘনাদার নামটাই বাদ নাকি? তাঁর নাম তা হলে যাবে কোথায়? শেষে?

হ্যাঁ, পুজো সংখ্যার বিজ্ঞাপনে নামকরা কোনও কোনও লেখককে মাথার ওপরে না তুলে আরও খাতির বাড়াতে একটি 'এবং'-এর নকিবের পেছনে যেমন সকলের শেষেই আলাদা করে রাখা হয়, ঘনাদার নামটাও তেমনই আমাদের ক-জন 'গার্ড অফ অনার'-এর পেছনে ভিন্ন সারিতে একেশ্বর হয়েই থাক।

কিন্তু এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে অনেকের ভুরুই কুঁচকে উঠেছে বুঝতে পারছি। বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের দোতলার আড্ডাঘরে শুক্রবার ছ-টায় ঘনাদার সঙ্গে আমরা চারজন উপস্থিত থাকব এ তো নেহাত মামুলি রুটিন মাফিক ব্যাপার। অদ্ভুত কিছু তো নয়!

কিন্তু রামভুজ সেইসঙ্গে কেন?

হিঙের কচুরির ঝুড়ি কি ট্রে-তে করে মাংসের শিঙাড়ার প্লেট নিয়ে নিশ্চয়।

না, হল না।

কচুরির ঝুড়ি মাংসের শিঙাড়া আনবার জন্য বনোয়ারি থাকতে রামভুজ আসবে কেন?

ঘটনাটা তা হলে কী?

ঘটনাটা একেবারে অবিশ্বাস্য! অভূতপূর্ব! কল্পনাতীত!

রামভুজকে নিয়ে আমাদের পাঁচজোড়া চোখ বিস্ফারিত বিস্ময়ে ঘনাদার কোলের ওপর রাখা দক্ষিণ হস্ত আর সে হাতের একটি কাগজের দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

কেন? কীসের কাগজ সেটা? সিমলা প্যাক্টের খসড়া? নিকসন-চৌ-এন-লাই-এর গোপন চুক্তির দলিল?

না, সে সব কিছু নয়।

ঘনাদার হাতে একটি নতুন ঝকঝকে মেটে সিঁদুরের রঙের কুড়ি টাকার নোট!

তা কুড়ি টাকার নোট ঘনাদার হাতে একটা থাকতে পারে না? নতুন কী রকম নোট বেরিয়েছে দেখাবার জন্য শিশিরই হয়তো সেটা তাঁর হাতে দিয়েছে।

না। এবারও হল না।

ঘনাদা নিজের পকেট থেকেই নোটটা বার করেছেন আর বার করে রামভুজকেই ডেকে পাঠিয়ে তাকে হুকুম দিচ্ছেন।

কী হুকুম?

অতি সাদাসিধে ক-টা ফরমাশ। বলছেন, "তুমি বিরিয়ানি পোলাওই বানাও রামভুজ, আর চিংড়ির মালাইকারি, নিউমার্কেটে গেলে এই বিকেলেই একেবারে পয়লা নম্বর গলদা চিংড়ি পাবে। দামের পরোয়া কোরো না। এ কুড়ি টাকায় না হয় আরও যা লাগে নিয়ে যাও—"

ঘনাদা পকেট থেকে অকাতরে আর-একটা কুড়িটাকার নোট বার করে আগেরটার সঙ্গে রামভুজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়। না হয় আসবার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়েই এস। ট্রাম-বাসের যা অবস্থা।"

যেন দম দেওয়া পুতুলের মতো হাঁ করা মুখে ঘনাদার হাত থেকে টাকা নিয়ে চলে যেতে গিয়ে রামভুজকে আবার দাঁড়াতে হল।

ঘনাদা ডেকেছেন।

"হ্যাঁ, শোনো, রামভুজ। সোনাই যখন হল তখন সোহাগাটা বাকি থাকে কেন? সেমুই পায়েসের ব্যবস্থাও কোরো। কিসমিস বাদাম পেস্তা—কিছুর যেন খামতি না হয়। পেস্তার আজকাল আবার সোনার চেয়ে পায়া ভারী। বাজারে সরেস পেস্তা পাওয়াই ভার। যা দাম চায় দিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝেছ?"

"হাঁ, হুজুর" বলে যেরকম চেহারা করে রামভুজ বেরিয়ে গেল তাতে 'সরিষার বেল দুটো পাকা তেল' নিয়ে ফিরলে খুব আশ্চর্য হব না।

বিবরণ যা দিলাম তা কি স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে?

না, স্বপ্ন নয়, একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে সত্যিই পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেছে। ঘনাদা নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে ভুরিভোজের বাজার করতে পাঠিয়েছেন আর তারপর যা করেছেন তা মাথায় চরকি-পাক লাগাবার মতো।

টাকার পকেট নয়, অন্য পকেট থেকে সিগারেটের একটা আস্ত টিন বার করে এয়ারটাইট ঢাকনা খুলতে খুলতে বলেছেন, "হিস্-টা শুনতে পেলে?"

গোড়াতেই যে বিশেষণগুলো দিয়ে এ গল্প শুরু এবার সেগুলো লাগসই মনে হচ্ছে কি না?

কার চোখ কতখানি ছানাবড়া হতে পারে তার নমুনা দেখিয়ে আমরা এবার একেবারে বোবা বনে গেছি।

শিশিরই সকলের মহড়া নিয়ে ঘনাদার বেপরোয়া বদান্যতায় তাঁর ওপর প্রথম দরদ দেখালে।

"দমকা এত বাজে খরচ কিন্তু না করলেও পারতেন। সব ভূত-ভোজন বই তো কিছু নয়।"

ভূতেরাও শিশিরের সঙ্গে জুড়ি গাইতে দেরি করলে না।

“ঠিক, ঠিক,” শিবু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, “বিরিয়ানি হচ্ছিল হচ্ছিল, তার ওপর ওই সেমুই পায়েসের কী দরকার ছিল?”

“আর পায়েসই না হয় হল, তাতে আবার পেস্তা কেন?” গৌর তার চরম আপত্তির কারণ জানালে, “কাজু কুচি কুচি করে দিলে সোয়াদ কিছু কম হত?”

“ঘনাদার ওই তো দোষ!” আমি ঘনাদার আখের ভেবে চিন্তিত হয়ে উঠলাম, “পয়সার মায়া করতে কোনওদিন শিখলেন না। দু হাতে এমন করে খরচ করলে কুবেরের ভাঁড়ারেও যে টান পড়ে। না,” হঠাৎ যেন সংকল্প স্থির করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলাম, “রামভুজ এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি বোধহয়। তাকে ফিরিয়েই আনি।”

“থাক, থাক।” শিবু, শিশির, গৌর—তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আমাকে থামালে, “ঘনাদাকে মিছি মিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কী? ওঁর চিরকেলে খরচের হাত আমরা একদিন সামলে আর কত বাঁচাব!”

“বেশ, তোমরা বলছ যখন তখন বসছি।”—আমি যেন নেহাত অনিচ্ছাভরে আবার বসলাম—“কিন্তু উনি দিলদরিয়া বলে ওঁর মাথায় এমন করে হাত বুলিয়ে এতগুলো টাকা খসানো কি উচিত হল? আজই বোধহয় ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছেন।”

ব্যাঙ্ক শুনে একটু কাশির ছোঁয়াচ লাগবার উপক্রম হয়েছিল। ঘনাদার মৃদু হাসির সঙ্গে মাথা নাড়াতেই তা থেমে গেল।

“না, ব্যাঙ্ক থেকে তোলবার দরকার হয়নি।”—ঘনাদা হেসে আমাদের আশ্বস্ত করলেন—“ওই তোমাদের উর্তাদো কার্লসের চিঠিটা আজ এল কিনা!”

“হুর্তাদো কার্লসের চিঠি!”—একটু অবাক হবার পরই আমাদের স্মরণশক্তি আবার যেন ফিরে পেয়েছি—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ কী একটা চিঠি যেন সকালে এসেছিল বটে।”

“ব্রেজিলের কনসালেট থেকে পিয়ন বই-এ পাঠিয়েছিল, না?”—শিশির আমাদের সমর্থন চাইলে।

“ডাকে এলে তবু স্ট্যাম্পগুলো পেতাম। আমরা আবার বলাবলি করলাম।”—গৌর ঘটনাটা সঠিক ভাবে স্মরণ করল।

“তা সেটা বুঝি এই উদো বুধো কী নাম বললেন, হুর্তাদো না কী, তারই চিঠি? সে-ই ব্রেজিল থেকে লিখেছে?” উত্তরটা ঘনাদার কাছেই চাইলাম—“কিন্তু ব্রেজিল থেকে লেখা চিঠি সোজা ডাকে না এসে কনসালেটের মারফত এল কেন?”

“কেন এল তা বুঝিস না?” শিবু আমায় ধমকালে, “ঘনাদার কাছে কি ‘কেমন আছো, ভাল আছি’ গোছের চিঠি আসে? আসে সব অত্যন্ত গোপন জরুরি চিঠি! ডাকে মারা কি চুরি যাবার ভয়েই সেগুলো সরকারি জিম্মায় পাঠানো হয়। বুঝলি?”

বুঝতেই হল সসম্ভ্রমে। জিজ্ঞেস করতেও হল ঘনাদাকে—“সেইরকম দামি চিঠি বুঝি? খুব গোলমেলে আন্তর্জাতিক ফ্যাসাদ-ট্যাসাদ বোধহয়?”

“না।” ঘনাদা যেন আমাদের হতাশ করতে পেরে খুশি—“দামি চিঠি হলেও

কোনও ফ্যাসাদ-ট্যাসাদের ব্যাপারে লেখা নয়। বরং ফ্যাসাদ কেটে যাবার তারিখটা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানাবার।"

"ওঃ! কৃতজ্ঞতা জানাবার চিঠি!"—গৌরের গলায় একটু যেন সংশয়ের খোঁচা—"সে চিঠিও এমব্যাসি মারফত পাঠিয়েছে পাছে মারা যায় বলে!"

"না, মারা যাবার ভয়ে নয়।"—ঘনাদা আমাদের সংশোধন করলেন—"আমার টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য।"

"টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা!"—আমরা যতখানি সম্ভব হাঁদা সেজে হাঁ করে করে রইলাম ঘনাদার দিকে তাকিয়ে।

ঘনাদা ব্যাখ্যা দিয়ে সে হাঁ বোজাবার ব্যবস্থা করলেন—"এ তারিখটায় একটু উৎসব করবার জন্য উর্তাদো কিছু টাকা পাঠিয়েছে কিনা! ব্রেজিলের কারেন্সি ভাঙাতে পাছে অসুবিধা হয় তাই এখানকার এমব্যাসিকেই ভারতীয় মুদ্রায় বদল করে সে টাকা আমার কাছে তার চিঠিটার সঙ্গে পৌঁছে দিতে লিখেছে।"

"খুব বুঝদার বন্ধু তো আপনার ওই হুর্তাদো!"—আমরা তারিফ করে তারপর আমাদের আশাটা জানিয়েছি—"সব দিক ভেবে তার মুশকিল আসানের তারিখ স্মরণ করে উৎসব করতে মোটা কিছু আপনাকে পাঠিয়েছে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা তো দেখছি," বলেছেন ঘনাদা খুশি মুখে বেশ একটু গর্বভরেই।

"পঞ্চাশ টাকা?"—ছি-ছি-ছি-টা স্পষ্ট না উচ্চারণ করলেও আমার গলার স্বরে আর মুখের চেহারায় গোপন থাকেনি।

"পঞ্চাশ?"—শিবুর যেন অপমানে গলাটা বুজে এসেছে!

"মাত্র পাঁচ দশে পঞ্চাশ সেই ব্রেজিল থেকে?"—শিশিরের গলায় ধিক্কার।

"ওই টাকা ভাঙাবার হ্যাঙ্গামা বাঁচাতে আবার এমব্যাসির মারফত পাঠানো?"—আর গৌরের গলায় বিদ্রূপ।

ঘনাদাকে একটু দিশাহারা করা গেছে কি? আহ্লাদে গদগদ মুখটা একটু চুন?

না, তা আর পারা গেল কই!

ঘনাদার মুখে তখন একটু ক্ষমা আর প্রশ্রয়ের হাসি।

আমাদের সব আক্রমণের বাণ ভোঁতা করে দিয়ে করুণাভরে বললেন, "পঞ্চাশ টাকার বেশি পাঠাবে উর্তাদো! ওই পঞ্চাশই যে পাঠিয়েছে, তাই বলতে গেলে তার পাঁজরার ক-টা হাড় খুলে দিয়ে। মানুষটা ভাল হলে কী হয়, হাড়কঞ্জুস যে।

নিজেই সে কথা সে জানে। ঠিক এই তারিখে সে রাত্রে আমার কাছে নিজের এই মজ্জাগত দোষ নিয়ে কী তার আফশোস!

'কেন আমি ক-টা টাকা বাঁচাতে একটা মোটর বোট ভাড়া করলাম না, দাস!' সে তখন ডুকরে উঠে বলছে, 'কাজ হাসিলের আশা তো ছেড়েই দিলাম, তার আগে প্রাণগুলোই নির্ঘাত যে দিতে হবে বেঘোরে!'

তা অবস্থাটা উর্তাদো কিছু বাড়িয়ে বলেনি।

ঝড়ের রাতে দক্ষিণ আটলান্টিকের অকূল সমুদ্রে একটা ওলটানো ভেলা ধরে কোনওরকমে আমি আর উর্তাদো তখনও ভেসে আছি। এক-একটা পাহাড়-প্রমাণ

ঢেউ যেন একেবারে পাতালে পৌঁছে দেবার জন্য থেকে থেকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে আসছে। কী ভাগ্যি যে শনগাদা মানে যে ভেলা আমরা আঁকড়ে ধরে আছি তা কখনও ডোবে না। কিন্তু ঢেউয়ের প্রচণ্ড ঘায়ে সে ভেলার শোলার মতো হালকা কাঠগুলোর, কাঠের গজাল-ঠোকা বাঁধন আলগা যদি না-ও হয়ে যায়, আমাদের হাতই তো অবশ অসাড় হয়ে খুলে আসতে পারে।

এক-একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাবার ফাঁকে ফাঁকে সামান্য দু-একটা কথা ওই ভাবে আমাদের হচ্ছিল। তাও দুজনেই ভেলার একদিকে একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে ভাসছিলাম বলেই ঝড়ের গর্জন আর ঢেউয়ের কল্লোল ছাপিয়ে কথাগুলো কিছুটা কানে যাচ্ছিল।

একটু ফাঁক পেলেউ উর্তাদো তখন ওইরকম নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আর্তনাদ করছে।

কয়েকবার শোনবার পর ধমক দিয়ে বললাম, 'একটু চুপ করে দমটা বাঁচাও তো! তুমি কঞ্জুস ঠিকই, কিন্তু মোটর বোট-এর বদলে শনগাদা নিয়ে পাড়ি আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি। শক্ত করে যদি শেষ পর্যন্ত ধরে থাকতে পারো তা হলে এই শনগাদাই বাঁচাবে, এটুকু বলতে পারি।'

একদমে এতগুলো কথা অবশ্য বলিনি। বার চারেক বড় ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভাগ-ভাগ করে উর্তাদোকে এ আশ্বাস দিতে হয়েছে।

আশ্বাস পাক-না-পাক উর্তাদো চুপ হয়ে গেছে তারপর। পুবের আকাশ লাল হয়ে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গিয়ে ঢেউগুলো শান্ত হয়ে এসেছে।

ঝড় থেকে বাঁচলেও উর্তাদোর তখন আর-এক কাঁদুনি শুরু।

সভয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে বলেছে, 'আমাদের অবস্থাটা এখন কী তা বুঝতে পারছ, দাস?'

'খুব বুঝতে পারছি।' মাথার এনামেল করা টুপিটা এক হাতে খুলে তা থেকে একটা বড়ি বার করে উর্তাদোর মুখে একরকম জোর করেই পুরে দিয়ে বলেছি, 'যে দিকে চাই, কূল নেই কোথাও। একটা ওলটানো শনগাদা ধরে ভাসছি। মাথায় একটা টুপিই শুধু ভরসা।'

'এখনও তুমি ঠাট্টা করতে পারছ!' উর্তাদো প্রায় ককিয়ে উঠল।

'ঠাট্টা নয়, উর্তাদো!' গম্ভীর হয়েই তাকে বললাম এবার, 'সত্যিই, মাথার এই টুপি আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। যা ধরে এখনও টিকে আছি সেই শনগাদা নিয়ে ব্রেজিলের এই উত্তর-পুবের রাক্ষুসে সমুদ্রের সঙ্গে মাছের জন্য যারা লড়ে সেই দুর্ধর্ষ শনগাদেইরোদের শেষ সহায় এই টুপি। কোমরে বাঁধা ছোরা আর মাথার এই টুপির জোরে তারা শনগাদার এই খুদে ভেলায় সমুদ্রের যে কোনও ভ্রূকুটিকে তুড়ি দিয়ে অগ্রাহ্য করে।'

'কিন্তু টুপি থেকে তুমি আমার মুখে দিলে কী?' উর্তাদো সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

'দিলাম একটা ভয়-ভাবনা কাটাবার বড়ি।'

আমার কথাটা শেষ না হতেই উর্তাদো আবার কাতরে উঠল—'তোমার ওটা জাদুর টুপি বুঝলাম। সব ও থেকে তুমি বার করতে পারো, কিন্তু ওষুধের বড়িতে কি সত্যকার ভয় কাটবে? চারিদিকে একবার চেয়ে দেখো। সমুদ্র ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু তেকোনা ফলার মতো হাঙরের ডানাগুলো দেখতে পাচ্ছ? জল কেটে আমাদের দিকেই পাক দিতে দিতে ক্রমশ এগোচ্ছে।'

উর্তাদো ভুল কিছু বলেনি। ডানা দেখেই বোঝা যায়, সত্যিই দুটো বাঘ-হাঙর তখন আমাদেরই তাক করে কাছাকাছি চক্কর দিচ্ছে।

কিন্তু হাঙরের ডানা শুধু নয়, আরও কিছু আমি তখন দেখেছি। উর্তাদোকে সেই কথাই জানালাম। বললাম, 'তোমার ভয় নেই, উর্তাদো। ভেলা উলটে তুফানের সমুদ্র থেকে বেঁচেছ, এ বিপদ থেকেও বাঁচবে। হাঙরেরা অন্তত তোমায় আমায় ছুঁতেও পারবে না।'

'ছুঁতেও পারবে না?' উর্তাদো ভয়ে হতাশায় খিঁচিয়ে উঠল আমাকে, 'হাঙর দুটো আমাদের পাক দিতে দিতে কত কাছে এসে পড়েছে, দেখেছ?'

'দেখেছি!' তাকে সাহস দিয়ে বললাম, 'সেই সঙ্গে সমুদ্রের শুশুক ওই পরপয়সগুলোকে দেখেছ কি! সমুদ্রের ওই সেপাইরা যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই। সমুদ্রের প্রাণী হয়ে মানুষের ওপর কেন যে ওদের এত দরদ সেটা একটা রহস্য, কিন্তু ওরা কাছে থাকলে কোনও হাঙরের সাধ্যও হবে না আমাদের ছুঁতে।'

যা বলেছি বেদবাক্যের মতো চোখের সামনে তা ফলতে দেখা গেল এবার। কোথা থেকে একটা শুশুক এসে গুঁতো দিলে একটা হাঙরের পেটে। তারপরেই আরেকটা। অন্য হাঙরটারও শুশুকদের গুঁতোয় সেই দুরবস্থা। একটা দুটো নয়, এক পাল পরপয়স তখন এসে হাঙর তাড়াবার দায় নিয়েছে। দেখতে দেখতে নাস্তানাবুদ হয়ে হাঙর দুটো চম্পট দিলে। শুশুকের পাল আমাদের সঙ্গেই রইল যেন পাহারা দিতে।

মাথামোটা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পুবের প্রায় সবটা জুড়ে ব্রেজিল। ব্রেজিলের উত্তর-পুবে আটলান্টিক সাগর। সাধারণ মানচিত্রে দেখলে সে সমুদ্রে আফ্রিকার কূল পর্যন্ত গোনাগুনতি ক-টা দ্বীপের ফুটকি ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। ম্যাপে দাগ ফেলবার যোগ্য না হলেও ছোট ছোট দ্বীপও সমুদ্রে কিছু আছে। ব্রেজিলেরই একটি নেহাত নগণ্য বন্দর কাবেদেলা থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরের অমনই একটি অতি ছোট দ্বীপের সেদিন যেন কপাল ফিরে গেছে।

সাধারণত যে দ্বীপে বছরের পর বছর ছাগল ভেড়া আর তাদের ক-জন রাখাল ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না সে দ্বীপের মাঝখানে সে দিন সরকারি তাঁবু পড়েছে। সিয়ারার জেলা সদর থেকে বহু অফিসার এসেছে নিলাম ডাকতে। সাত বছর বাদে বাদে এ সব দ্বীপ আগের মালিক এসে আবার না চাইলে নিলাম ডেকে ইজারা দেওয়া হয়।

সেই নিলাম ডাকার দিন সকালেই আমি ঘুরতে ঘুরতে ভুল করেই যেন সরকারি তাঁবুর সামনে এসে পড়েছি।

প্রথমেই সেখানে দেখা হয়েছে উর্তাদোরই এক জ্ঞাতিভাই দে দিয়স-এর সঙ্গে।

দে দিয়স আমায় দেখে হয়তো অবাক। কিন্তু বাইরে তা বুঝতে দিলে না, এবং টিটকিরি দিয়ে বললে, 'কী দাস, তোমায় একলা দেখছি যে? লেজুড়টি মানে আমার ভাই উর্তাদোকে কোথায় রেখে এলে?'

'যেখানে রাখলে সুবিধে হয় সেখানে!' যেন নিজের রসিকতায় এক গাল হেসে বললাম, 'এ সব কাজে সঙ্গী না রাখাই ভাল নয় কি? তুমিও তো একলা এসেছ দেখছি।'

'তা না এসে কী করি, বলো?' দে দিয়স আগের সুরটা পালটে যেন আন্তরিকতার সঙ্গে বললে, 'হাজার হলেও আমাদের পরিবারের সম্পত্তি তো ছিল। উর্তাদোর যখন গরজ নেই তখন আমাকেই ডেকে নিতে হয়।'

'তোমার এ দ্বীপটার ওপর লোভ কিন্তু আগেও যেন ছিল দিয়স!' সন্দেহটা মুখে ফুটতে দিয়েই বললাম, 'উর্তাদো একবার আমায় বলেছিল মনে হচ্ছে।'

'বলেছিল?' দে দিয়সের চোখদুটো যেন ছুরির ফলা হয়ে উঠল, 'তা লোভ থাকলে হয়েছেটা কী? লোভ আছে বলেই তো ডেকে নেব আজ!'

'ও! তাই তুমি এখানে!' আমি যেন অনেক দেরিতে বুঝে আমার ভুলটা স্বীকার করলাম, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার ভায়ের হয়েই বুঝি আবার দ্বীপটার ইজারা চেয়ে নিতে এসেছ!' একটু থেমে তারপর বললাম, 'কিন্তু ধরো, উর্তাদো যদি নিলামের ডাকের আগে এসে পড়ে?'

'এসে পড়বে উর্তাদো?' দে দিয়স একেবারে খোলাখুলিই মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'এলে তার ভূতটাই আসবে, তাকে জ্যান্ত আর আসতে হবে না।'

'হ্যাঁ, আসা শক্ত বটে!' আমি মুখটা হতাশ করে স্বীকার করলাম, 'দ্বীপটার চারিধারে তোমার দু-দুটো মেশিনগান-বসানো-লঞ্চ পাহারা দিয়ে ঘুরছে দেখে এলাম বটে। এ দ্বীপে যে বোট আসবে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে ডুবিয়ে দেবে।'

আমার কথা শুনতে শুনতে দে দিয়সের চোখদুটো হঠাৎ ছোট হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মুখটাও ছোটলোকের মতো। আমাকে যেন চোখের সড়কিতে ফুটো করার চেষ্টায় বললে, 'তুই! তুই কী করে এলি এখানে?'

'ভূত হয়ে ছাড়া আর কী করে আসব বলো!' তার দিকে চেয়ে একটু ভুতুড়ে হাসি হাসলাম।

'ভূতই তোকে বানিয়ে ছাড়ব!' আমার গলাটা এক হাতে টিপে ধরে বিড়ালছানার মতো শূন্যে ঝুলিয়ে ধরে দে দিয়স বললে, 'সত্যি করে বল, কেমন করে এসেছিস।'

'বলব কেন শুধু!' ঝোলানো অবস্থাতেই মাথার শনগাদেইরো টুপিটা খুলে তা থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে দে দিয়সের হাতে দিয়ে বললাম, 'সব তো লিখে এনেছি। তুমি চোরাচালানের একটা বড় ঘাঁটি বানাবার জন্য এ দ্বীপটার ইজারা চাও, আর উর্তাদো চায় পশুপালনের একটা গবেষণা-কেন্দ্র বসাতে। তার উদ্দেশ্যটাই ভাল মনে হল বলে তাকে সঙ্গে করে আনলাম।'

'তুই নিজে শুধু আসিসনি, উর্তাদোকেও সঙ্গে করে এনেছিস?' দে দিয়স রাগে

আমার গলাটা যেন নিংড়োবার মতো করে প্রাণপণে চেপে ধরল।

'কাতুকুতু লাগছে। ছাড়ো!' বলে এবার তার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে মাটিতে নেমে বললাম, 'তোমার যা এখন অবস্থা কাগজের লেখা মগজেই ঢুকবে না। কীসে কেমন করে উর্তাদোকে নিয়ে এলাম চলো দেখিয়ে দিই।'

চুলের মুঠিটা একটু আলতো করে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাই দেখালাম। দেখাতে দেখাতে বুঝিয়েও দিলাম সব। যা বোঝালাম তার মোদ্দা কথাটা হল এই—

শনগাদা নামে ওই ভেলা পোর্তুগিজরা কলম্বাসের পর প্রথম ব্রেজিলে এসে ডাঙায় নামবার সময় দেখেছিল। মাঝারি একটা টেবিলের মাপের ক-টা হালকা গুঁড়ি-জোড়া-দেওয়া একটা ভেলায় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো অতি মিহি কাপড়ের ঢাউস পাল খাটিয়ে ওদেশের জেলেদের বারদরিয়ায় পাড়ি দেওয়ার সাহস দেখে তারা অবাক।

পুরুষানুক্রমে সে বিদ্যা আর সাহস এখনও এ অঞ্চলের জেলেদের আছে। তারা এই যন্ত্রের যুগেও মাছ ধরার জন্য ওই বিপজ্জনক ভেলাই পছন্দ করে।

উর্তাদোকে নিলামের ডাকের দিন তার দ্বীপে নামতেই না দিয়ে তার মালিকানা ফাঁকি দিয়ে নেবার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝে মোটর লঞ্চ স্টিমারের বদলে ওই ভেলাই আমি বাহন হিসেবে ঠিক করি। ভেলায় আসার জন্যই দে দিয়সের পাহারাদার বোট দুটো আমাদের হদিস পায়নি।

দে দিয়সের সব শয়তানি ফন্দিও ব্যর্থ হয়েছে তাইতে। যে তারিখে দ্বীপটার ইজারা আবার পেয়েছিল তারই মান রাখতে উৎসব করবার জন্য উর্তাদোর টাকা পাঠানো। কম হোক বেশি হোক, ভালবেসে যখন পাঠিয়েছে তখন খরচ করো প্রাণ খুলে!"

ঘনাদা গোটা সিগারেটের টিনটা শিশিরের হাতেই তুলে দিলেন।

"কিন্তু ওই আপনার হুয়ার্তো—" শিবু যা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হল না।

"বানানে এইচ থাকলেও উচ্চারণটা হুর্তাদো নয়, উর্তাদো!" বলে শিবুকে থামিয়ে ঘনাদা টিনটা ভুলেই যেন ফেলে উঠে পড়লেন।

তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আর একবার পিছু ফিরে শেষ রাত্রের মারটি ছেড়ে গেলেন।

"ও, উর্তাদো নামটা আবার ব্রেজিলেরও নয় পেরুর। মিউনিখ অলিম্পিকের কুস্তি লড়নেওয়ালাদের তালিকা খুঁজলেই দেখতে পেতে।"

ঘনাদা সামনে থাকলে আমরা অধোবদনই হতাম। তার বদলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম একটু অপ্রস্তুতের মতো হেসে।

কিন্তু অপ্রস্তুত বা কেন? অত ফন্দি-ফিকির, অত মুসাবিদা, শিশিরের ওই পঞ্চাশটা টাকা নেহাত ভেস্মে ঘি ঢালা হয়েছে কি?

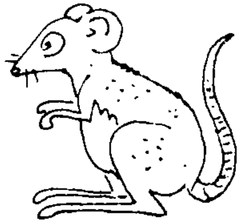

ঘনাদা এলেন

হ্যাঁ, ঘনাদা একদিন এসেছিলেন!

নিশ্চয়ই একদিন এসেছিলেন আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনে।

কিন্তু কবে কখন কেমন করে তিনি প্রথম এলেন সে কথা মনে করতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়তে হচ্ছে।

ঘনাদা নামে কোনও একজনের সঙ্গে এই বাহাত্তর নম্বরে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি বলতে মনে যা আসছে তা স্রেফ একটি ব্যাগ।

হ্যাঁ, মাঝারি সাইজের ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ।

না, মানুষ জন কেউ নয় শুধু একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ—ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো না হলেও বেশ একটু জীর্ণ গোছের।

বাহাত্তর নম্বরের প্রথম পত্তনের সময়ে, সবকিছু তখন তো এলোমেলো অগোছালো। সুবিধামত একটা বাড়ি পেয়ে যে ক-জনে মিলে সেখানে একটা শহুরে আস্তানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিল, এখন বাহাত্তর নম্বর বলতে যাদের নামগুলো আপনা থেকেই মনে আসে, সেই চারজনই তাদের মধ্যে তখন ছিল প্রধান।

অর্থাৎ বাহাত্তর নম্বর বলতে এখন যেমন তখনও সেই চার মূর্তিমান—শিশির, শিবু, গৌর এবং আমি।

বাড়িটা পুরনো হলেও খুব ভাঙাচোরা নয়। সামান্য একটু-আধটু মেরামতের পর চুনকাম করিয়ে আমরা তার কয়েকটা ঘরে তখনই বিছানাপত্র পেতে ঢুকে পড়েছি। এখন যেটা আমাদের আড্ডাঘর সেইটেই তখন কিছু-জমা-করা আসবাবপত্র নিয়ে খালি পড়ে আছে। ঠিক করা আছে যে দুদিন বাদে একটু হাতখালি হলেই আসবাবপত্র গুছিয়ে সেটাকে বসবার ঘর বানানো হবে। সকালে বিকালে ওদিকে যেতে আসতে এরই মধ্যে সেখানে একদিন ঘরের মাঝে জমা করা আসবাবপত্রের মধ্যে একটা গোলটেবিলের ওপর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা চোখে পড়েছে।

একদিন দুদিন বাদেও টেবিলের ওপর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা সমানে বসানো আছে দেখে ব্যাগটা কার তার সন্ধান নিতে হয়েছে।

ব্যাগটার বর্ণনা আগেই করেছি। ওরকম ব্যাগ আমাদের কারওর যে নয় তা বুঝেই সেটার উপস্থিতি একটু অবাক করেছে।

পরস্পরকে জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করেও রহস্যটার খুব স্পষ্ট একটা মীমাংসা কিন্তু পাওয়া যায়নি! শিবুই একটু ভেবে ভেবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে, "হ্যাঁ, ওই একজন, মানে আমাদের চেনা কেউ নন, মানে বিপদে পড়ে—"

"বিপদে পড়ে কী?" গৌর শিবুকে তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় জেরা করেছে, "বিপদে পড়ে তিনি এখানে আমাদের সঙ্গে বাসা বাঁধবেন নাকি?"

"না, না, তা নয়!" শিবু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে জানিয়েছে, "বরাবরের জন্য না, মাত্র ক-দিনের জন্য বাধ্য হয়ে এখানে আছেন। খুব কি একটা দরকারি ব্যাপারে কার জন্যে যেন—"

"হয়েছে! হয়েছে!" শিশির শিবুকে একরকম ধমক দিয়েই থামিয়ে দিয়ে বলেছে, "কে, কী, কেন কিছুই না জেনে কোনও একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছ আমাদের এখানে! এখন তিনি তাঁর এই ব্যাগ নিয়ে—"

"না, না, কোনও অসুবিধে আপনাদের করব না।" শিশিরের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বারান্দার দরজা দিয়ে যিনি এবার ঘরে ঢুকেছেন তাঁর চেহারার বর্ণনা দেবার বোধহয় দরকার নেই। হ্যাঁ, সেই শুকনো পাকানো ত্রিশ থেকে ষাট যে কোনও বয়সের ধারালো কুড়ুল মার্কা মাঝারি মাপের চেহারা। গলাটি শুধু চেহারার তুলনায় রীতিমত ভারিক্কি।

ঘরের ভেতর ঢুকে এসে দু-হাত তুলে সকলকে নীরব নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক বলেছেন, "মাত্র দুদিনের ব্যাপার। আপনাদের তেতলায় ন্যাড়া ছাদে একটা ঘর দেখে এলাম—"

"তেতলায় ন্যাড়া ছাদের ঘর?" আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছি, "সেটা আবার ঘর কোথায়? যতসব ফালতু ভাঙাচোরা আসবাবপত্রে ভরা চোর-কুঠুরি বললেই হয়।"

"তা হোক," ভদ্রলোক আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, "ওখানে একটা ভাঙা তক্তপোশ রয়েছে দেখলাম। ঘরটা একটু পরিষ্কার করে আমার ব্যাগটা নিয়ে দুদিন বেশ কাটিয়ে দিতে পারব। ব্যাগটা তাই এখন নিতে এসেছি।"

ঘরের টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস রাখা বড় গোলটেবিলটার ওপর থেকে তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়ে যেন আমাদের আশ্বস্ত করবার জন্যই বলেছেন, "ওই জার-বোয়া জবাবের জন্যেই তো অপেক্ষা। তা হয়তো অন্তত কালই পেয়ে যাব—পাওয়া তো উচিত।"

"কী বললেন? কীসের জবাব?" আমাদের সকলের প্রশ্নটা গৌরের মুখেই এবার শোনা গেছে।

"জবাবটা জার-বোয়া ছাপের। মানে জার-বোয়া ছাপের ইশারায়"—ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু বিশদ হয়েছেন—"কাগজে ও ছাপ দেখেই আমি আর কোনও ভুল করিনি। যেমন কথা ছিল তেমনই, যেখানে ও ছাপ দেখেছি সেখানেই, তখনই যেমন জুটেছে তেমনই আস্তানা জোগাড় করে যথাস্থানে ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু জবাবটা আসার অপেক্ষা। জার-বোয়ার ছাপ, কাগজে যে ছাপিয়েছে, গরজটা নিশ্চয়ই তার এমন যে জবাব দিতে এক লহমা সে দেরি করবে না। চাই কী, আপনাদের এই বনমালি নস্কর লেনে স্বয়ং সেই বব কেনেথই—"

ওই পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে, "না, না, এসব কী

বলছি। মাপ করবেন আপনারা," বলে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বারান্দার দরজার দিকে এগিয়েছেন।

কিন্তু দু পা-র বেশি বাড়াতে তিনি পারেননি। আমাদের সকলের হয়ে শিশিরই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাধা দিয়ে বলেছে, "আহা, যাবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার সেই চার পোয়া ছাপ যে ছেপেছে—"

"চারপোয়া নয়, জার-বোয়া!" শিশিরকে বেশ একটু করুণার সঙ্গেই সংশোধন করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছেন, "জার-বোয়া কী তা তো নিশ্চয় জানেন?"

"না।" অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে নিজেদের মূর্খতা স্বীকার করে বলেছি, "জার-বোয়া বল্লম টল্লমের মতো কোনও অস্ত্রশস্ত্র, না কোনও রকম বাদশাহি পোশাকটোশাক?"

"না, সে সব কিছু নয়," অনুকম্পাভরে ভদ্রলোক জানিয়েছেন, "জার-বোয়া হল সাহারার মরু অঞ্চলের এক রকম ইঁদুর। ইঁদুরের বদলে—"

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলতেই শিশির, শিবু দুজনেই এক সঙ্গে উঠে পড়ে তাঁর হাত থেকে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা টেনে নিয়ে তাঁকে ধরে একটা খালি চেয়ারে বসাতে বসাতে বলেছে, "আহা, আপনি যাবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার সেই জার-বোয়া ছাপের মক্কেল তো আর দোতলা বাদ দিয়ে আপনার তেতলায় পৌঁছতে পারবে না। আপনি এখানেই বসুন না। তারপর ওই মরু অঞ্চলের ইঁদুর জার-বোয়া নিয়ে কী যেন বলছিলেন?"

"ওই জার-বোয়া নিয়ে?" ভদ্রলোক বেশ যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে বলেছেন, "হ্যাঁ, বলছিলাম যে ইঁদুরের বদলে ওকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির খুদে ক্যাঙ্গারু বললেই যেন ঠিক হয়। ক্যাঙ্গারুদের মতো সামনের পা দুটি খুদে খুদে আর পেছনের পাগুলো সামনের চেয়ে প্রায় ছ-গুণ লম্বা। ইঁদুরগুলো তাই তাদের আকারের তুলনায় ক্যাঙ্গারুদের চেয়ে লম্বা লাফ দিতে পারে।"

"তা পারে তো পারে!" আমিই প্রথম একটু ঠাট্টার সুর লাগিয়ে বলেছি, "উত্তর আফ্রিকার এক ক্যাঙ্গারু-মার্কা ইঁদুরের এত কী খাতির যে তার ছবি কোথাও ছাপা দেখলেই একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে, আর ওই ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের ছবি ছাপাও বা হয়েছে কোথায়? এখানকার কোনও কাগজে তো দেখিনি।"

"এখানকার কোনও কাগজে দেখেননি!" ভদ্রলোকের গলায় এবার যেন অবোধের প্রতি অনুকম্পা—"তা দেখবেন কী করে? এখানকার কোনও কাগজে তো নেই, ও ছাপ বেরিয়েছে খাস লন্ডন টইমসে।"

"লন্ডন টাইমসে বেরিয়েছে আর আপনি—?"

আমার কথাটা আর শেষ করতে হয়নি। ভদ্রলোক নিজেই বাক্যটা সম্পূর্ণ করে বলেছেন, "আর আমি এখানকার ইমপিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে সেটা দেখে এসেছি। যেখানে যখন যাই আর থাকি ওই লন্ডন টাইমসটার ওপর আগাগোড়া চোখ বোলানো আমার সাত বছরের নিত্য কর্ম।"

"সাত বছর!" আমাদের সকলের হয়ে গৌর দূ-চোখ প্রায় কপালে তুলে বলেছে, "আপনি সাত বছর ধরে লন্ডন টাইমস-এর ওপর চোখ বুলিয়ে আসছেন?"

"হ্যাঁ প্রায়—সাত বছরই তো হল।" ভদ্রলোক একটু যেন দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন।

"কিন্তু কেন? সাত বছর ধরে রোজ রোজ নিয়ম করে একটা বিশেষ বিদেশি কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে!" শিশির আমাদের সকলের মনের কথাটাই প্রকাশ করেছে।

"তা কারণ আছে বইকী। নিশ্চয় একটা কারণ আছে।" ভদ্রলোক এখনও যেন কথাটা খোলসা করে বলতে চান না।

কিন্তু আমরা ছাড়বার পাত্র নয়। সোজাসুজি তাঁকে চেপে ধরেছি—"তা সেই কারণটা একটু খুলে বলুন না!"

"খুলে বলব?" ভদ্রলোক এখনও যেন দ্বিধা করে তারপর বলেছেন, "তাহলে যেতে হবে কিন্তু উগাণ্ডায়!"

"উগাণ্ডায়?" আমরা বিমূঢ়। গৌরই প্রথম নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করেছে, "উগাণ্ডা মানে আফ্রিকার উগাণ্ডায়?"

"হ্যাঁ, সেখানকার রিজার্ভড ফরেস্ট মানে অভয়ারণ্যে।" ভদ্রলোক যেন বাধ্য হয়ে জানিয়েছেন।

"কিন্তু সেখানে এখন যাব কী করে?" জিজ্ঞাসা করে আর যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হয়নি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমাদের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছেন, "না না, এখন নয়, যাবার কথা বলছিলাম সাত সাড়ে সাত বছর আগেকার উগাণ্ডার সংরক্ষিত অরণ্যে। মানে সমস্ত ব্যাপারটার সেখানেই শুরু কিনা। শুরু টাইকুন ট্যানার-এর সেই আফ্রিকা-চমকানো শাহানশাহি-সফরি-তে!"

একটু থেমে আমাদের অবস্থাটা অনুমান করেই বোধহয় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নিজের কথার ব্যাখ্যায় বিশদ হয়ে বললেন, "সফরি মানে যে কী তা নিশ্চয় আপনারা জানেন, তবে টাইকুন ট্যানার-এর সফরির সঙ্গে এখনকার গোনাগুনতি খরচে ভাড়া-করা সফরির আকাশ-পাতাল তফাত—জঙ্গলে বারশিঙা শিকার আর বাজার থেকে কাটা-পাঁঠার মাংস কেনার চেয়ে অনেক বেশি। টাইকুন ট্যানার-এর সফরি মানে একটা রাজসূয় ব্যাপার। বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যত খুশি যে কোনও প্রাণীশিকার আইন করে তখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু নামের আগে সিংহের ঘাড়ের কেশরের মতো টাইকুন শব্দটা যার জোড়া হয়ে গেছে, কোটিপতি ধনকুবেরদেরও যে শাহানশাহ, টেকসাস-এর সেই জীবন্ত ট্যাঁকশালা টাইকুন ট্যানার কি আইনের পরোয়া করে! সফরি-তে গোনাগুনতি শিকার করবার সরকারি পারমিট মানে হুকুমনামা সে তো উগাণ্ডার অরণ্য-দপ্তরের বড়কর্তার কাছ থেকে নিজে নিয়ে নিয়েছে। টাইকুন ট্যানার-এর নাম জানতে কারও বাকি নেই। সেই টাইকুন ট্যানার নিজে সশরীরে অফিসে এসেছে। বন-বিভাগের বড়কর্তা তাকে খাতির করে কোথায় বসাবেন ভেবে পাননি। টাইকুন ট্যানার-এর চেহারাটা তার ঐশ্বর্যের মাপে এমন দশাসই যে একটা প্রমাণ মাপের কোচ-এ তাঁকে আঁটানো যায় না। টাইকুন ট্যানার অবশ্য কোথাও

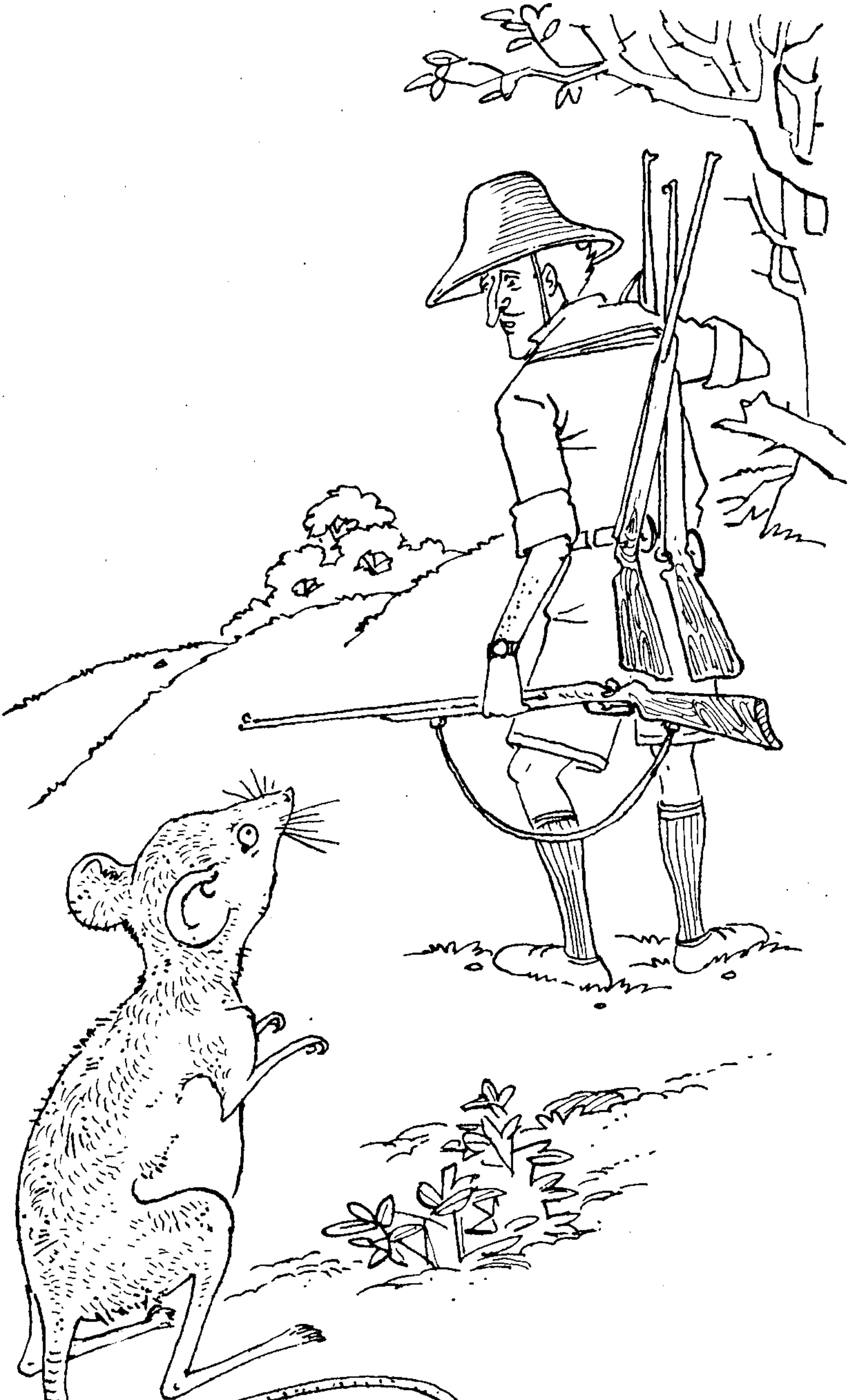

বসার বদলে আগাগোড়া দাঁড়িয়েই বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে তাঁর কথা সেরেছেন। শিকারের পারমিটটা সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি পড়ে দেখেছেন যে অন্যসব সাধারণ জানোয়ারের বেলা তেমন কড়াকড়ি না থাকলেও হাতি গণ্ডার সিংহের মতো বড় বড় জানোয়ারের বেলা শিকারের অনুমতি দারুণ কড়া। এ হুকুমনামা পড়েও অন্য অনেকের মতো বিন্দুমাত্র অনুযোগ-আপত্তি না জানিয়ে টাইকুন ট্যানার যেন খুশি মনে বন-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে করমর্দন করে চলে আসবার সময় শুধু জিজ্ঞাসা করেছে, 'শিকার যতই গোনাগুনতি করে রাখা হোক, সফরির লোকলস্কর লটবহরের বেলা সেরকম কোনও বিধিনিষেধ নেই তো?'

'না, তা নেই।' বন-বিভাগের বড়কর্তা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কিন্তু অত বড় বিরাট বাহিনী আপনি সঙ্গে নিচ্ছেনই বা কেন? ওর অনেক ঝামেলা।'

'ওই ঝামেলা পোহানোতেই আমার সুখ,' বলেছে টাইকুন ট্যানার, 'তাছাড়া বিরাট আর কোথায় দেখলেন! শিকারি আমার একজন, ওই বব কেনেথ!'

'হ্যাঁ, ও তো একাই একশো।' হেসে বলেছেন অফিসার, 'ওর চেয়ে বড় শিকারি এখন সারা আফ্রিকায় আর কেউ আছে বলে জানি না।'

'হ্যাঁ, তাই শুনেছি বলেই ওকে নেওয়া। দেখা যাক, যত হাঁক ডাক তত এলেম সত্যি আছে কি না!' হেসে বলেছে টাইকুন ট্যানার।

'এর ওপর আপনি শিকারের বন্দুকও গণ্ডা গণ্ডা নিয়েছেন—দেখলাম আমাদের অফিসে পাঠানো আপনার লটবহরের তালিকা থেকে। অত বন্দুক আপনার মিছিমিছি বওয়াই সার। কী কাজে লাগবে আপনার অত বন্দুক?' হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করেছেন বন-বিভাগের ওপরওয়ালা অফিসার।

'মনে করুন, ও শুধু নিজের অহংকারকে একটু তোয়াজ,' বলেছে টাইকুন ট্যানার, 'ওগুলো যে সঙ্গে আছে তাই দেখার সুখ। আর শুধু, এখন দুনিয়ার সেরা যা শিকারের বন্দুক আছে তা সব তো ওর মধ্যে আছেই, সেই সঙ্গে সেরা একজন বন্দুকের ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়েছি।'

'বন্দুকের ডাক্তার?' রীতিমতো অবাকই হয়েছেন বন-বিভাগের বড়কর্তা—'সে আবার কী?'

'কী তা বুঝলেন না!' টাইকুন ট্যানার বলেছে, 'ডাক্তার মানে হালের বন্দুকের কারিগরির সেরা মিস্ত্রি। ম্যাচলককে যে রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে পারে।'

'তা ভালো! তা ভালো!' মনে মনে এই দাম্ভিক টাকার কুমিরটার ওপর যতই খাপ্পা হয়ে উঠুন, মুখে হাসি টেনে বন-বিভাগের বড়কর্তা বলেছেন, 'আইনকানুন সব মেনে আপনার এত সাধের সফরি সার্থক হয়ে ফিরে আসুক এই শুভকামনাই জানাই।'

'ও, আপনাদের আইনের কথা বলছেন? কিচ্ছু ভাববেন না, ফিরে আসার পর তার গায়ে আঁচড়ও দেখতে পাবেন না। এ শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ,' বলে টাইকুন ট্যানার বন-বিভাগের বড়কর্তার এমন করমর্দন করে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে যে জখম হাত নিয়ে বনের বড়কর্তাকে ককিয়ে ওঠা চাপতে হয়েছে অনেক কষ্টে।

টাইকুন ট্যানার-এর যাদের নিয়ে অত হম্বিতম্বি তার সফরিতে গোল বাধল কিন্তু

তাদের নিয়েই—সেই কে না কে বন্দুকের ডাক্তার আর আফ্রিকার সেরা শিকারি বব কেনেথ।

টাইকুন ট্যানার-এর সফরি তখন জানা-অজানা অনেক বন জঙ্গল পার হয়ে এক নতুন জায়গায় আস্তানা গেড়েছে। এ পর্যন্ত যা শিকার হয়েছে তা সাধারণ তিনটে দলের সফরির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ট্যানারের তাতে মন ভরেনি। এ সফরি থেকে সে এমন কিছু মেরে নিয়ে যেতে চায়, দুনিয়ার শিকারিমহলের চোখ যাতে ছানাবড়া হয়ে যাবে।

এই নতুন আস্তানায় সেই ভাগ্যই যেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আস্তানা পাতবার পরের দিনই সকালে নিজের বাদশাহি তাঁবু থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলটা একটু ঘুরে আসতে গিয়ে সে এক জায়গায় এসে দাঁড়াবার পরই আতঙ্কে যেমন কেঁপে উঠল তেমনই হয়ে গেল মোহিত।"

ভদ্রলোক এই মোক্ষম জায়গায় এসে, হঠাৎ থেমে গিয়ে, নিজের গায়ের কোটটার দুদিকের পকেট দুটো দুবার চাপড়ে, মুখটায় কেমন যেন বিরক্তি ফুটিয়ে চুপ করে গেলেন।

কী হল কী তাঁর হঠাৎ ভেবে যখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি শিশির তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ফেলে তার হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "সিগারেট খুঁজছেন? এই নিন না।"

"নেব?" ভদ্রলোক যেভাবে শিশিরের দিকে চেয়ে যে-গলায় 'নেব' বললেন, তাতে প্রথমে মনে হল বুঝি শিশিরের তাঁকে সিগারেট দিতে চাওয়াটা অপমান জ্ঞান করে তিনি আসর ছেড়ে চলেই যাবেন উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হল ভদ্রতার খাতিরেই শিশিরের স্পর্ধা সহ্য করে তিনি নরম হয়ে শিশিরের বাড়িয়ে দেওয়া টিনের উঁচিয়ে থাকা সিগারেটটা তুলে নিয়ে নিজের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "হ্যাঁ, প্যাকেটটা কোথায় যে ফেলে এসেছি কে জানে! হ্যাঁ, একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি, কিছু মনে করবেন না। সিগারেট আমি কারও কাছে দান নিই না। সুতরাং এ সিগারেট আপনার কাছে ধার হিসেবেই নিলাম। মনে রাখবেন, আপনার কাছে একটি সিগারেট ধার রইল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে রাখব", বলে শিশির তখন তাঁর সিগারেটটার জন্য তার লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরেছে।

সে লাইটারের আগুনে সিগারেটটা ধরিয়ে তাতে দুটো রাম-টান দেবার পর প্রায় এক জালা ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বলেছেন, "কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, ওই টাইকুন ট্যানার-এর আতঙ্ক আর উল্লাসের কথা।

ঠিক! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাইকুন ট্যানার তখন খুশিতে ডগমগ।

এই তো! টাইকুন ট্যানার-এর প্রাসাদের সিংহদরজার মান বাড়াবার জন্য এইটিরই দরকার ছিল। কম-বেশি প্রায় আশি কিলো ওজনের গজদন্ত নিয়ে কিছুদূরে স্বয়ং হাতিদের সম্রাট ঐরাবতই যেন তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বনভ্রমণে বেরিয়েছে।

ট্যানার-এর হাতে বন্দুক ছিল না। আর থাকলেই বা সে করত কী? একবার তার দিকে ফিরে তাকে দেখতে পেলে গজরাজ কী করতে পারেন তাই ভেবে কাঁপতে কাঁপতে ট্যানার-এর গায়ে তখন যেমন ঘাম ছুটছে তেমনই আবার আশায় বুকও দুলছে যদি কোনওমতে হাতির পাল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায় আর যদি তারপর কোনওমতে তাঁবুতে ফিরে সে দরকার মতো সকলকে ডাক দিয়ে এই হাতির পালের পিছু নিয়ে কেনেথকে দিয়ে আসল গজরাজকেই শিকার করতে পারে।

ট্যানার-এর ভাগ্য তখন ভাল। হাতির পাল নিয়ে গজরাজ নিজের খেয়ালে অন্য দিকে চলে যেতেই সে নিজের তাঁবুতে এসে সবার আগে বব কেনেথ আর সমস্ত বন্দুক পিস্তলের খোদ খবরদারির ভার যার ওপর সেই বড় মিস্ত্রিকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালে। ভাগ্যের জোরে আপনা থেকে যা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে তার দেখা গজরাজের সেই দাঁতাল মুণ্ডটা যে তার চাই-ই, সক্কলকে সেটা সে জোর দিয়ে জানিয়েছে।

কিন্তু কই! এত বড় একটা খবরে কারওর কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? তার সামনে দুই মূর্তি যেন জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে।

'কী? কী হল কী তোমাদের?' টাইকুন ট্যানার এবার গর্জে উঠল, 'সব কালা বোবা হয়ে গেছ নাকি?'

'মানে?'—আমতা আমতা করে এবার মুখ খুলল বব কেনেথ—'বড় শিকার আর আমরা কি করতে পারি? আমাদের—'

'আমাদের?' ধমক দিয়ে কেনেথকে থামিয়ে দিয়ে টাইকুন ট্যানার আবার গর্জন করে উঠল, 'কী হয়েছে আমাদের? হাত ঠুঁটো হয়ে গেছে, না বন্দুকের সব বারুদ ভিজে গেছে? শিকার করতে পারব না কেন?'

'পারব না।' বন্দুকের বড় মিস্ত্রি বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আমাদের পারমিটে আর বড় শিকারের অনুমতি নেই বলে। হুকুমনামায় যে ক-টা বড় শিকার আমাদের মারবার অনুমতি দেওয়া ছিল সব ক-টাই আমরা মেরেছি। দু-একটা ছোট শিকারের বন্দুক ছাড়া সব বন্দুক আমি তাই বাক্সবন্দি করে দিয়েছি।'

'কী করেছ, চিমসে চামচিকে?' বলে ঘাড় ধরে বন্দুকের মিস্ত্রিকে শূন্যে তুলে টাইকুন ট্যানার বললে, 'বড় বন্দুক সব বাক্সবন্দী করে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' ট্যানারের হাতে ঘাড়-টিপে-ধরা অবস্থাতেই বন্দুকের মিস্ত্রি যেন সুখবর দেবার মতো গলায় বললে, 'শুধু বাক্সবন্দীই করিনি, তার আগে বন্দুকগুলোর কলকব্জা খুলেও দিয়েছি।'

'কলকব্জা খুলে দিয়েছিস!' চিড়বিড়িয়ে উঠে টাইকুন ট্যানার বন্দুকের মিস্ত্রিকে আছড়ে মারবার মতো করে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'তোকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে মারব।'

একটা ডিগবাজি খেয়ে বন্দুকের চিমসে মিস্ত্রি তখন কিছুদূরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবুঝকে বোঝাবার মতো গলায় সে বললে, 'আমায় পুঁতে ফেলতে চান? তা অবশ্য আপনি পারেন। কিন্তু তাহলে আপনার ওই অত সাধের বন্দুকগুলোর মায়া

যে ছাড়তে হবে। ওগুলোর কলকব্জা এখন খোলা। সেসব আবার জোড়া লাগাবার বিদ্যে অমন দু-পাঁচ হাজার মাইলের মধ্যে সারা উগাণ্ডায় আর কারওর নেই। আমি মাটির নীচে পোঁতা থাকলে ওসব বন্দুকের প্যাঁচ জানা মিস্ত্রির খোঁজে কাকে কোথায় পাঠাবেন? যাকে পাঠাবেন সে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে কি! পৌঁছলেও কতদিনে সে ওস্তাদ মিস্ত্রি নিয়ে এখানে ফিরবে? আর যতদিনে ফিরবে ততদিন আপনি এখানে টিকে থাকতে পারবেন কি?'

বন্দুকের মিস্ত্রি যতক্ষণ তার কথা শোনাচ্ছিল ততক্ষণ টাইকুন ট্যানার-এর মুখটা ছিল যেন বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়বৃষ্টির ছবি ফোটানো ছায়াছবির পর্দার মতো। এই মনে হচ্ছিল রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে হিংস্র হায়নার মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়বে বন্দুকের মিস্ত্রির ওপর আবার মিস্ত্রির কথা শুনতে শুনতে নিজের অবস্থাটা বুঝে সে দমকা ঝড় হঠাৎ থেমে যাওয়ার মতো সামলাবার চেষ্টা করছিল নিজেকে। শেষ পর্যন্ত তার প্যাঁচালো বুদ্ধিরই জয় হয়েছে।

বেয়াড়া গরম মেজাজের জন্য নিজেই যেন নিজের কান মলে ট্যানার এবার যা বলেছে তার মর্ম হল এই যে বন্দুকের মিস্ত্রির ওপর রাগারাগি করা তার অন্যায় হয়েছে। মিস্ত্রির সঙ্গে সে মিটমাটই চায়। মিস্ত্রি যদি তার সব বন্দুকের কলকব্জা ঠিক করে সেগুলো চালু করে দেয় তাহলে সে, যা তার পাওনা, তার ওপর মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে যাবে।

বন্দুকের মিস্ত্রি একটু ভেবে নিয়ে প্রস্তাবটায় রাজি হয়েছে। আর ঘণ্টাকানেক বাদে বাক্সবন্দী সব বন্দুক খুলে চালু করে দিয়ে তার পাওনা আর বকশিশ চেয়েছে।

বন্দুকগুলো সব হাতে পাওয়ার পর নিজমূর্তি ধরেছে ট্যানার। 'পাওনা আর বকশিশ চাও?' সে যেন কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছে, 'দুই-ই পাবে এখনই।'

পাওনাটা সে তখনই মিটিয়ে দিয়েছে, তার নিজের ক-জন দৈত্যাকার কাফ্রি সেপাই দিয়ে বন্দুকের মিস্ত্রিকে ধরে বেঁধে শিকার-করা জানোয়ারদের ছাড়ানো চামড়া জমা-করা একটা তাঁবুতে বন্দি করে ফেলে রেখে। আর ফেলে চলে যাবার সময় আশা দিয়ে গেছে যে বকশিশটা দিয়ে যাবে দাঁতাল গজরাজকে মেরে তার গজদন্ত নিয়ে এখানকার আস্তানা তুলে চলে যাবার সময়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই এই জঙ্গলে ফেলে রেখে দিয়ে।

বন্দুকের মিস্ত্রিকে হাত পা বেঁধে বন্দি করে চলে যাবার পর টাইকুন ট্যানার নিজেই কিন্তু পড়েছে মহা মুশকিলে। হাতি মারবার চালু বন্দুক তো সে হাতে পেয়েছে, কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়বে কে? বন্দুক উদ্ধারের পর খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে শিকারি বব কেনেথকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজির মধ্যে তার তাঁবুতে তার লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। বব কেনেথ তাতে লিখে গেছে যে হুকুমনামায় যা লেখা আছে তা অগ্রাহ্য করে বাড়তি দাঁতালো হাতি তো নয়ই, অন্য কোনও কিছু শিকার করে সে সারা আফ্রিকায় অচ্ছুৎ শিকারি হিসেবে দাগী হয়ে নিজের সব রুজি-রোজগার আর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না। সেই জন্যই টাইকুন ট্যানার-এর জবরদস্তি এড়াতে নিজের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা না নিয়েই তাকে পালাতে হচ্ছে।

'পালাতে হচ্ছে, কিন্তু পালিয়ে যাবি কোথায়?' কেনেথের লেখা চিরকুট পড়তে পড়তে রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেছে টাইকুন ট্যানার, 'আমার সমস্ত লোকলস্কর লাগিয়ে সারা উগাণ্ডা চষে তোকে খুঁজে বার করব-ই।'

যে কথা সেই কাজ। ট্যানার গজরাজের সন্ধান ছেড়ে কেনেথকে খুঁজতেই তার সফরির সকলকে লাগিয়েছে তখুনি। এমন বেড়াজালে জঙ্গল ঘিরে তল্লাশি চালিয়েছে যাতে একটা খরগোশও না গলে পালাতে পারে।

কিন্তু এই বেড়াজালে ঘেরা তল্লাশির ভেতর দিয়ে শিকারি কেনেথ গলে এসেছে। এসেছে রাতের অন্ধকারে টাইকুন ট্যানার-এর সফরির তাঁবু মহল্লায়। সেখানে নিঃশব্দে বন্দুকের মিস্ত্রিকে বন্দি করা শিকারে মারা জানোয়ারদের চামড়া রাখা তাঁবুতে ঢুকে সে কিন্তু অবাক। হাতে একটা ছোরা নিয়ে সে যতটা নিঃশব্দে সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছিল বড় মিস্ত্রির বাঁধন কেটে তাকে মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু হাত-পা-র বাঁধন কেটে সে মুক্তি দেবে কী, বড় মিস্ত্রি নিজেই আগে থাকতে বাঁধনটাধন খুলে সেখানে বসে আছে। কেনেথ খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে যাবার পর হঠাৎ চমকে উঠে শুনেছিল—কে তাকে ফিসফিস করে বলেছে, 'আর না, ছোরাটা খাপে গুঁজে এবার উঠে বোসো।'

গলাটা যে বড় মিস্ত্রিরই তা বুঝে একেবারে হতভম্ব হয়ে উঠে বসে কেনেথ দেখেছিল, বন্দুকের মিস্ত্রি হাত-পা খোলা অবস্থায় তার সামনে বসে একটা চামড়ার টুকরোয় কী যেন করছে।

কেনেথকে উঠে বসতে দেখে সেকাজ থামিয়ে মিস্ত্রি বলেছে, 'পালিয়ে গিয়েও তুমি যে ফিরে এলে?'

'এলাম আপনারই বাঁধন কেটে আপনাকে মুক্ত করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে। কিন্তু আপনি নিজেই যে বাঁধন খুলে বসে আছেন। কী করে খুললেন ওই জংলি কাফ্রি দৈত্যগুলোর অমন শক্ত বাঁধন?'

'কী করে খুললাম?' বন্দুকের মিস্ত্রি একটু যেন হেসে বলেছে, 'সময় পেলে তোমায় শিখিয়ে দেব, কিন্তু এখন তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না। এখুনি পালাও আর যাও উত্তর দিকে!'

'উত্তর দক্ষিণ কোনও দিকেই আর আমি যেতে চাই না,' বেশ হতাশভাবে এবার বলেছে শিকারি কেনেথ, 'আমার হাতের এই ছোরাটা আর কোমরবন্ধের এই পিস্তলটা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। এই নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা যাদের কাছে রাইফেল আর বন্দুক আর কমপক্ষে ষাট-সত্তর জন জঙ্গল ঠেঙিয়ে খোঁজবার লোক-লস্কর তাদের বিরুদ্ধে আমি কী করব আর কোথায় পালাব? পালাতে হলে আপনি নিজে পালাননি কেন?'

'আমি?' বন্দুকের মিস্ত্রি একটু যেন অবাক হয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমি পালাইনি বটে, তবে এই কাজটা করতে এমন তন্ময় হয়ে গেছলাম যে সময়টা কত কেটেছে ঠিক খেয়াল করিনি।'

'এমন অবস্থাতেও সময়ের খেয়াল যার জন্যে করেননি সেটা কী এমন কাজ?'

শিকারি কেনেথ রীতিমতো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

'কাজটা কিছু নয়, এই চামড়ার টুকরোর ওপর একটা পেরেক দিয়ে আঁচড়কাটা একটা ছবি!' বলে বড়মিস্ত্রি চামড়ার টুকরোটা কেনেথের হাতেই তুলে দিয়ে বলেছে, 'এটা তুমিই রাখো। তোমার কাজে লাগবে।'

'আমি কাছে রাখব এই চামড়ার আঁচড়-কাটা টুকরো? এটা আমার কাজে লাগবে? কী বলছেন কী আপনি!' বন্দুকের মিস্ত্রির মাথাটা ঠিক আছে কি না সে বিষয়েই সন্দেহ ফুটে উঠেছে এবার কেনেথের কথায়।

'যা বলছি আজগুবি শোনাচ্ছে, না?' হেসে জিজ্ঞাসা করেছে বড় মিস্ত্রি, 'কিন্তু হাতে-হাতে ফল পেলেই বুঝবে আবোলতাবোল কিছু বলিনি। তোমার হাতে যে চামড়ার টুকরোটা দিয়েছি তাতে আঁচড়-কাটা কীসের ছবি তা জানো? জানবার কথাও নয়। ওটা আঁচড় কেটে যা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে সেটা একটা জার-বোয়া। আফ্রিকার ঝানু শিকারি হলেও জার-বোয়া কাকে বলে হয়তো জানো না। জার-বোয়া হল একরকম মরু অঞ্চলের অদ্ভুত ইঁদুর। ইঁদুর না বলে খুদে ক্যাঙ্গারুও বলা চলে। সামনের পা দুটি ছোট ছোট আর পেছনেরগুলি ক্যাঙ্গারুর মতো লম্বা বলে শরীরের তুলনায় অনেকদূর পর্যন্ত লাফ দিতে পারে। তোমায় এখান থেকে পালিয়ে উত্তরদিকে যেতে বলেছি, এই উত্তরে চাড্ থেকে শুরু করে সাহারার মরুভূমিতে এই খুদে ক্যাঙ্গারু জার-বোয়াদের পাওয়া যায়। এই জার-বোয়ার ছাপমারা তাবিজ-পরা আফ্রিকায় এক গুপ্তসমিতি আছে। তারা আফ্রিকাকে ইউরোপের সাদা চামড়ার লোকেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জন্য গোপনে বিরাট আয়োজন করে যাচ্ছে। তারা তোমার হাতের ওই জার-বোয়ার আঁচড়-কাটা চামড়ার টুকরোটা দেখলেই তোমায় নিরাপদে সাহারা পেরিয়ে মিশরের কায়রো পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। এখন তুমি শুধু উত্তরমুখো গিয়ে উগাণ্ডাটা পার হয়ে যাও।

'কিন্তু পার হবে কী করে?' কেনেথ হতাশভাবে বলেছে, 'বললাম-না, আমার কাছে শুধু একটা পিস্তল আর একটা ছোরা। পার হবার আগেই ওদের গণ্ডা গণ্ডা বন্দুকে আমি তো ঝাঁজরা হয়ে যাব।'

'কিছু হবে না!' বন্দুকের মিস্ত্রি জোর দিয়ে বলেছে, 'প্রথমত তুমি আফ্রিকার শিকারি, জঙ্গলে কি করে নিঃসাড়ে গাছপালার সঙ্গে মিশে গিয়ে চলাফেরা করতে হয় তা তুমি ওদের সাতজন্ম শেখাতো পারো। সুতরাং ওরা এমনিতে তোমার হদিসই পাবে না। আর যদি বা পায়, ওদের কোনও বন্দুকের গুলি তোমার ডাইনে বাঁয়ে দু-গজের মধ্যে পৌঁছবে না।'

'দু-গজের মধ্যে পৌঁছবে না?' ঘোর অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছে কেনেথ, 'এ কী ঝাড়ফুঁক মন্ত্র নাকি?'

'না, মন্ত্র নয়, যন্ত্র—যন্ত্রের কেরামতি,' বলেছে বড় মিস্ত্রি, 'তুমি তাতে বিশ্বাস করে নির্ভয়ে চলে যাও। আর দেরি না করাই ভাল!'

'কিন্তু আপনি!' যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সত্যিকার উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে কেনেথ, 'আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে?'

'না,' বলে একটু থেমে বন্দুকের মিস্ত্রি কিছুটা কৌতুকের স্বরেই বলেছে, 'সত্যিকথা বলতে গেলে আমার এখন পোয়াবারো যাকে বলে তাই। যাকে সে হাত-পা বেঁধে কাঁচা চামড়ার গুদামের তাঁবুতে বন্দি করে ফেলে দিয়েছিল সকাল না হতেই টাইকুন ট্যানার তার কাছে ছুটে এল বলে! তারপর আমার আঙুল নাড়ায় টাইকুন ট্যানারকে ওঠবোস করাতে পারব। সোজা কথা নয়, দুনিয়ার সেরা সফরির সর্দার, তার গণ্ডা গণ্ডা সব বন্দুকে নিশানার চারধারে দু-গজের মধ্যে গুলি পৌঁছোচ্ছে না কেন, এ ধাঁধার উত্তরের জন্য তাকে বাঁদরনাচ করাতে করাতে আমি একদিন তাকে রাজধানী কাম্পালাতে বন-বিভাগের বড়কর্তাদের হাতেই তুলে দেব। সুতরাং আমার জন্য তোমার ভাবনা করবার কিছু নেই। আর হ্যাঁ, তুমি নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্য যে এখানে এমন করে এসেছ, এ ঋণ আমি কোনওদিন ভুলব না। কখনও কোথাও যদি দারুণ বিপদে পড় তাহলে, তোমার হাতে যা দিয়েছি, ওই জার-বোয়ার ছাপ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন বিলেতের লন্ডন টাইমসে ছাপাবার ব্যবস্থা কোরো। আমি যেখানেই থাকি সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে তোমায় আমার তখনকার ঠিকানা জানাবই। তারপর তুমি আমার ঠিকানায় চিঠি লিখে তোমার বিপদ আর ঠিকানা জানালেই—আমি বেঁচে থাকলে—তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবই, এটা নিশ্চিত জেনো।'"

ক্যাম্বিস ব্যাগের ভদ্রলোক দম নেবার জন্যই একটু থেমে বললেন, "ক-দিনের জন্য আপনাদের এই শহরটা ছুঁয়ে যাবার সময়ই লন্ডন টাইমসের বিজ্ঞাপনটা দেখে হাতের কাছে পেয়ে আপনাদের এই বাহাত্তর নম্বরের ঠিকানাটাই জানিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি বলে একটা উত্তর না আসা পর্যন্ত আর নড়তে পারছি না। আপনাদের তাই বাধ্য হয়ে একটু কষ্ট দিচ্ছি।"

"না, না, কষ্ট কীসের?" আমরা প্রায় সমস্বরে বলেছি, "যতদিন লন্ডন টাইমসের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও চিঠি না পান ততদিন আপনি থাকুন-না এখানে—ওই ওপরের টঙের ঘরটা পছন্দ হলে সেখানেই থাকুন। কিন্তু একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করছি, টাইকুন ট্যানার আপনাকে বন্দুকের পাকা মিস্ত্রি বলে তার সফরিতে নিয়েছে আবার শিকারি কেনেথকে আপনি যেভাবে জার-বোয়া ছাপের তাবিজ-পরা আফ্রিকার গুপ্ত বিপ্লবীদলের খবর দিয়ে ভরসা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ওই জার-বোয়া ছাপের গুপ্ত দলের সঙ্গেও আপনার ভালরকম যোগাযোগ ছিল। এখন আবার আপনাকে দেখছি এই আমাদের কলকাতা শহরে। আসল পরিচয়টা তাহলে আপনার কী?"

"হ্যাঁ, কেনেথও ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে চামড়ার জার-বোয়া ছাপ নিয়ে তাঁবু থেকে জঙ্গলের পথে চলে যাবার সময়। তাকে যা বলেছিলাম, তাই আপনাদের বলি—'নিজের পরিচয় কি কেউ আমরা জানি! সেই পরিচয়ই তো সবাই খুঁজছি সারা জীবন।' "

আমাদের হতভম্ব করে ওইটুকু বলেই টেবিল থেকে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা নিয়ে তিনি তেতলার ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে চলে গিয়েছিলেন।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা না থাক, ভদ্রলোক এখনও আমাদের টঙের ঘরেই আছেন। না থেকে উপায় কী? লন্ডন টাইমসের জার-বোয়া ছাপ-মারা বিজ্ঞাপন-দাতার উদ্দেশে লেখা তাঁর চিঠির জবাব যে এখনও আসেনি।

হ্যালি-র বেচাল

দেখা গেছে?

হ্যাঁ, দেখা গেছে! উনিশশো পঁচাশি বারোই নভেম্বর তারিখের খবর তাই।

কী দেখা গেছে যা নিয়ে এত উত্তেজনা, তা নিশ্চয় এখন আর বলতে হবে না। কোথা থেকে, কেমন দেখা গেছে সেইটেই আসল খবর।

দেখা গেছে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস থেকে, দূরবিন-টুরবিন নয়, একেবারে খালি চোখেই। এইটিই যা বারোই নভেম্বর তারিখের খবর।

লস অ্যাঞ্জেলস্-এর বাসিন্দাদের ঈর্ষা করবার কোনও কারণ কিন্তু নেই। আমেরিকার চিত্র-তারকাদের নিজস্ব মুলুক বলে ভাগ্য তাদের ওপর বেশি সুপ্রসন্ন এ কথা ভাবাও ভুল। যা দেখতে পাওয়া নিয়ে এত হইচই দুদিন বাদে সারা পৃথিবীর মানুষই প্রাণভরে তা দেখতে পাবে।

কিন্তু এই দেখতে পাওয়াটাই এমন কিছু কি বড় খবর?

যা দেখবার কথা হচ্ছে তা যে হ্যালির ধূমকেতু তা আর নিশ্চয় হাঁকডাক করে জানাতে হবে না। হ্যাঁ, হ্যালির ধূমকেতু আসছে, আসছে যেমন তার নিয়ম, সেই ছিয়াত্তর বছর বাদে। সে আসবে তার লম্বা আগুনের লেজটা পেছনে ছড়িয়ে আমাদের সূর্যকে একটা পাক দিয়ে, আবার ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছিল সেই অজানা সুদূর নিরুদ্দেশে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন কিছু নয়। এক জীবনে কোনও একজন একবারের বেশি দুবার ও-ঘটনা দেখবার সুযোগ পায়নি বললেই হয়। কিন্তু বিশেষ কোনও একজন পেলেও পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এ-ঘটনা যে দেখে লক্ষ করে আসছে, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মহাভারতেও তার প্রমাণ আছে। যেমন তেমন প্রমাণ নয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাই যে এই ধূমকেতুর অশুভ আবির্ভাবের ফল এমন ইঙ্গিত নাকি দেওয়া আছে সেখানে।

তাই স্বীকার করতেই হচ্ছে যে হ্যালির ধূমকেতুর আসা যাওয়া একটা অসাধারণ ঘটনা হলেও একেবারে নতুন অজানা কিছু নয়।

হ্যালির ধূমকেতু আগেও যেমন এসেছে আর কিছুদিনের জন্য রাতের আকাশের পরম বিস্ময় হয়ে থেকে সূর্যদেবকে একবার পাক দিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, এবারও তাই যাবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এবার শুধু তাই কি?

এই ১৯৮৫-র ২রা জুলাই ফরাসি গায়নার কোস্ট থেকে গিয়োত্তো নামে যে রকেট ছোঁড়া হল সেটা কি নিছক বাহাদুরি! কী মতলবে জলের মতো পয়সা খরচ করে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ব্রিটিশ এরোস্পেস-এর সঙ্গে থেকে সত্তর কোটি কিলোমিটার পাড়ি দেবার জন্য এই রকেট ছোঁড়ার ব্যবস্থা করেছে!

হ্যাঁ, লক্ষ্য যে হ্যালির ধূমকেতু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গিয়োত্তোকে ছোঁড়া হয়েছে যেদিক দিয়ে হ্যালি-র ধূমকেতু আসছে তার উলটো দিক থেকে তার সঙ্গে মোলাকাতের জন্য। আর সে মোলাকাত যদি সত্যিই হয় তবে হবে সেই ১৯৮৬-র ১৩ই মার্চ গ্রিনিচ মানা ঘড়ির হিসাবে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট থেকে পরের দিন ১৪ই মার্চ বেলা তিনটে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। সে সাক্ষাৎ যদি হয় তাহলে ৯৬০ কিলোগ্রাম ওজনের তিন মিটার লম্বা গিয়োত্তো তার খবর যা পাঠাবে সে রেডিয়োবার্তা পৃথিবীতে পৌঁছতে অন্তত আট মিনিট লাগবে।

কিন্তু খবর কি সত্যিই পাঠাতে পারবে গিয়োত্তো?

যদি পারেও তাহলে কেমন আর কী হবে সে খবর?

কী বলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধুরন্ধরেরা? কী বলেন আপনাদের টঙের ঘরের তিনি?

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা পড়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে রণং দেহি চ্যালেঞ্জটা সেই মৌ-কা-সা-বি-স-এর।

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব কেমন করে দেওয়া যাবে? টঙের ঘরের তাঁকেও আসরে নামানো যাবে কী করে?

নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে কোনও রাস্তাই যখন ঠিক করতে পারছি না তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া দিয়েই আসরটা জমানো যায় কি না সে চেষ্টার কথা ভাবা হল।

হ্যাঁ, সোজাসুজি ঝগড়া। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে প্রায় হাতাহাতির অবস্থা পাকিয়ে তুলতে হবে।

ছিয়াত্তর বছর অন্তর দেখা দেওয়া ধূমকেতু এবার কী করবেন তাই নিয়ে যার যার নিজের কল্পনার লড়াই।

সুবিধে হয়ে গেল সকালের রেডিয়ো মারফত খবরটা শোনায়। তারিখ ২৭শে নভেম্বর। হ্যালির ধূমকেতু আজই নাকি আমাদের দেশের আকাশে দেখা দিচ্ছেন। তবে খালি চোখে নয়, তাঁকে দেখতে হলে দূরবিন জোগাড় করতে হবে।

খবরটা ২৭শে সকালে পেলেও দূরবিনে দেখার মতো হ্যালির ধূমকেতুর

আবির্ভাব নাকি হয়েছে ২১শে নভেম্বর সূর্যাস্তের পর।

"বিশ্বাস করি না—"

সমস্ত আড্ডাঘর এক মুহূর্তে চমকে একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া এ কার গলা?

আর কারও নয়, আমাদের শিবুরই।

গুরু নানকের জন্মদিন বলে ছুটি থাকায় সকালেই সবাই এসে আড্ডাতে জমায়েত হয়েছি। বনোয়ারি সুরভিত চায়ের ট্রে নিয়ে নীচে থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই টঙের ঘরের তিনিও এসে তাঁর মৌরসি আরামকেদারা দখল করে শিশিরের মুখে সকালের বেতার সংবাদ শুনছেন—এমন সময় শিবুর এই চমকে দেওয়া ঘোষণা।

নিজের ঘোষণাটা আরও জোরালো করবার জন্য শিবু দ্বিতীয়বার সেটা গলা চড়িয়ে শোনাল, "বিশ্বাস করি না আমি।"

"বিশ্বাস করো না? কী বিশ্বাস করো না?" খানিক বিস্ময় বিমূঢ়তার পর আমাদের প্রশ্ন।

"কী বিশ্বাস করি না?" শিবু নিজের বক্তব্যটা জোরালো করবার জন্য প্রশ্নটা নিজেই আবার আউড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, "বিশ্বাস করি না তোমাদের ওই জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের হিসেব নিকেশ।"

"বিশ্বাস করো না!" একেবারে হতভম্ব হয়েই বললাম, "কত যুগ যুগ ধরে যারা হিসেব মিলিয়ে আরও অনেক কিছুর জন্য এই ধূমকেতুর গতিবিধির নির্ভুল গণনা করে এসেছেন তাঁদের বিশ্বাস করো না? এতদিনে তাঁদের হিসেবের ভুল কোথাও ধরা পড়েছে?"

"ধরা পড়েনি বলেই ভুল যে হয়নি তার ঠিক কী?" শিবু হার না মেনে বললে, "আর আগে যদি ভুল না-ও হয়ে থাকে, এবারে হয়েছে বলেই আমার ধারণা।"

"তোমার ধারণা!" তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম, "তোমার ধারণা মতে কী এবার হবে শুনি? হ্যালির ধূমকেতু এবার আসবে না?"

"আসবে না, বলছি না," শিবু জোর দিয়ে বলে চলল, "এসেই যখন পড়েছে তখন আসবে না বলবে কোন আহাম্মুক? কিন্তু যেখান দিয়ে যেমন করে এসে যতদিন থাকবে বলা হচ্ছে সেসব হিসেব মিলবে না।"

"তার মানে," বিদ্রূপের সুরেই বললাম, "তা হলে হ্যালির ধূমকেতু আমাদের এই পৃথিবীর ওপরই আছড়ে পড়তে পারে!"

"তা পারে না এমন নয়," শিবু আমাদের বিদ্রূপটা গ্রাহ্য না করেই যেন ধৈর্য ধরে বোঝালো, "এর পরে কোনওবার হয়তো এসে পড়বে। তবে এবারে অমন একটা দুর্ঘটনা ধরতে না পারার মতো হিসেবের ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে ভুলচুক কিছু যে না হয়ে পারে না সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার মতো ব্যাপারে না হোক, সে ভুল হ্যালির ধূমকেতুর এবারের গতিবিধিতেই ধরা পড়বে।"

"হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আর কেন?" শিশির তর্কটা সিধে রাস্তায় চালাবার চেষ্টায় বললে, "ধূমকেতু তো এসে পড়েছে, তখন তার গতিবিধির বেয়াড়াপনা দেখতে পাব

আর ক-দিনের মধ্যে। কিন্তু জ্যোতির্বিদদের গণনায় ভুলচুক যে হবেই এ ধারণার ভিতটা কী জানতে পারি?"

"নিশ্চয় পারো," শিবু তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝাল, "জ্যোতির্বিদেরা মূর্খ অথবা আনাড়ি গণক অবশ্যই নয়। তবু তাদের ভুল না হয়ে পারে না। আর সে ভুল হবার কারণ, যার কণামাত্র আমরা জেনেছি, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতল রহস্য। জ্যোতির্বিদেরা তাঁদের দূরবিন আর রেডিয়ো-টেলিস্কোপ দিয়ে যেটুকু হদিস পান তা দিয়ে সে অসীম অতল রহস্যের কতটুকু অঙ্কের ছকে ফেলতে পারেন? এ যেন পুকুরের জলের ঢেউ দেখে অপার সমুদ্রের রহস্যের ব্যাখ্যা করা।"

না, শিবু বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

"তার মানে তুমি বলতে চাও"—বলে শিবুর দার্শনিকতা এবার থামাবার চেষ্টা করা হল।

কিন্তু সে থামল না, সমান উৎসাহে বলে চলল, "এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ছায়াপথের মতো সামান্য একটা গ্যালাক্সি অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলের এককোণে ছোট্ট একটা ধূমকেতু মাত্র ছিয়াত্তর বছর অন্তর আমাদের সূর্যের মতো একটা ছোটখাটো তারাকে পাক দিয়ে যায়। সেই পাক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা আর সময়টা অনেককাল একরকম ছিল বলে কি চিরকাল থাকবে—না, থাকতে পারে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে দিলাম, আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-তেই কত কী না হচ্ছে যার ঢেউ এসে লেগে হ্যালির ধূমকেতুর গতিবিধি সব তছনছ করে দিতে পারে।"

"মানলাম যে তা পারে।" বিতণ্ডাটা যেন জমেছে বুঝে একটু উসকানি দিলে গৌর, "কিন্তু মহাশূন্যে অমন ঢেউ তোলার মতো তেমন কিছু ঘটেছে কি?"

"ঘটেছে নিশ্চয়", শিবু জোর দিয়ে বললে, "আর যা ঘটে তার সব কি আমাদের জানা সম্ভব? আমাদের পৃথিবীর সৌরমণ্ডল যে গ্যালাক্সির ছায়াপথে আমরা আছি, আমরা তার কী দীনহীন একটা সদস্য তা জানো? জানো আমাদের এই ছায়াপথের প্রায় কিনারায় কেন্দ্র থেকে কতদূরে আমাদের সৌরমণ্ডল পড়ে আছে—তুমি জানো?"

শিবুকে খোঁচা দেবার ছল করে আড়চোখে যাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম তাঁর কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই নেই! এক পেয়ালা শেষ করে টী-পট থেকে আর-এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে হাতের খবরের কাগজটাতেই যেন তন্ময় হয়ে আছেন। এমনই করে সাজিয়ে তোলা চালগুলো কি তাহলে ভেস্তেই গেল!

ওদিকে শিবু আবার তার নিজের ফাঁদেই না পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ছায়াপথের কোন দূর কিনারায় আমাদের সৌরমণ্ডলের হেলায় ফেলায় পড়ে থাকার কী সব আঁকজোকের কথা বলছিল তা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে?

তা পারল শিবু। বেশ একটু মাতব্বরি চালেই বললে, "আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আমরা যত দূরে আছি তার সেকেন্ডে যে আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেই আলোর সমান বেগে ছুটতে পারলেও আমাদের ত্রিশ হাজার বছর লেগে যাবে। এই দূরত্ব থেকে যে বিশালতার আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে যা

কিছু হচ্ছে তা আমরা জানব কী করে? তোমরা বলবে যে সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি ছিয়াত্তর বছর পরে পরে কতবার হ্যালির ধূমকেতু ঘুরে গেছে। কম-বেশি সেই পাঁচ হাজার বছরে তার গতিবিধির কোনও এদিক ওদিক হয়েছে কি? হ্যাঁ, মানছি যে সামান্য কিছু গতিবিধির অদলবদল যদি হয়েও থাকে তা ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আমাদের কাছে অনেক মনে হলেও যে সময়টার অল্পবিস্তর সঠিক খবর আমরা পাচ্ছি তাই মাত্র পাঁচ হাজার বছর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড কারখানায় পাঁচ হাজার বছর কি একটা হিসেবে ধরবার মতো সময়? আমাদের এই গোটা ছায়াপথ গ্যালাক্সি চরকির মতো অনবরত পাক খাচ্ছে তা জানো বোধ হয়। একটা পাক পুরো করতে তার কত সময় লাগে ভাবতে পারো? লাগে—লাগে—এই আন্দাজ—দশ—দশ—”

শিবুর তোঁতলামির মাঝখানে হঠাৎ আড্ডাঘরটা কাঁপিয়ে বাজখাঁই গলায় ধমক শোনা গেল—“না। কুড়ি কোটি বছর!”

হ্যাঁ, বারুদের পলতেটা ঠিকই ধরেছে শেষ পর্যন্ত। ঘরের ছাদ কাঁপানো গলার ধমকটা আর কারও নয়, মৌরসি কেদারার সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁরই। তিনিই আগের শেষ করা পেয়ালাটা সামনের টী-পট-এ নামিয়ে রেখে বললেন, “হ্যাঁ, আমাদের ছায়াপথের একবার পুরোপুরি পাক খেতে লাগে পাক্কা কুড়ি কোটি বছর। আর আমাদের এই ছায়াপথ গ্যালাক্সি-র বয়স হল বারো শো থেকে দু হাজার কোটি বছর। হ্যালির ধূমকেতুর খবর যখন থেকে অল্পবিস্তর পেতে শুরু করেছি সেই পাঁচ হাজার বছর ওই অশেষ যুগযুগান্তের কাছে তো চোখের একটা পলকের বেশি নয়। সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এ ধূমকেতুর অনেক চাল-বেচাল হয়েছে ভাবলে তাই ভুল কিছু হবে না। তারপর মাত্র পাঁচ হাজার বছর সুশীল সুবোধ থেকে এবারই তার হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে কিছু বেচাল দেখানো তাই মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু বেচালটা তার কী ধরনের হতে পারে, আর কেন, সেইটেই ভাববার!”

ঘনাদা থামলেন। শিশিরও প্রস্তুত। ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই তার নতুন সিগারেটের টিন খোলার মৃদু শিসের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর ঘনাদা তা থেকে সিগারেট তুলে মুখে ঠোঁটের ফাঁকে বসাতে না বসাতেই শিশিরের লাইটার জ্বালার মৃদু শব্দ শোনা যায় কানে।

সিগারেট ধরিয়ে ঘনাদা হালকা থেকে শুরু করে গোটা তিনেক রাম টান দিয়ে এক কুণ্ডলী ধোঁয়া না ছাড়া পর্যন্ত আমরা অধীর আগ্রহে খানিক চুপ করে থেকে ছেড়ে দেওয়া খেইটা একটু ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় দ্বিধাভরে বললাম, “হ্যালির ধূমকেতুর বেচাল তাহলে এবার সত্যি হতে পারে? তা বেচালটা কীরকম?

কথা শেষ হতে না হতেই ঘনাদার ধমক—“কীরকম হতে পারে আর কেন তা নিজেরাই একটু ভেবে বলো না।”

নিজেরাই ভেবে দেখব? চালের ভুলে শেষ কিস্তিটাই কাঁচিয়ে দিলাম নাকি? ঘনাদা কি চটেছেন নাকি?

না, গলাটা কড়া হলেও ঘনাদা বেশ তৃপ্তিভরেই সিগারেটে সুখটান দিলেন।

দরকার এখন তাঁকে একটু তোয়াজ করা। তাই করলাম।

বোকা সেজে বললাম, "বেচাল কী আর কেন হতে পারে, বলব? বেচাল হবে আমাদের গ্যালাক্সির ওই যে বলেছেন ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের কেন্দ্র সেখানে কোথাও কোনও সুপার-নোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণের দরুন আর তার ধাক্কায় হ্যালির ধূমকেতু এবার সূর্যকে পাক দেওয়ার বদলে হয় তার ভেতর মরণ ঝাঁপ দেবে কিংবা কোনওরকমে মান বাঁচিয়ে খসে যাওয়া লেজটা শুধু রেখে পালাবে।"

"লেজটা তোমার জন্যেই রেখে যাবে," আমার বাড়িয়ে দেওয়া চালটা শিশির উচিত মতোই চড়াতে ভুল না করে বললে, " সুপার-নোভা অমন অনেকে ফেটেছে আমাদের গ্যালাক্সিতে গত হাজার বছরে, তার জন্য অবশ্য হ্যালির ধূমকেতুর কোনও বেচাল আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে জানি না। না, ঘনাদা আপনি বলুন, কী বেচাল দেখব এবার হ্যালির ধূমকেতুর—"

"কী বেচাল দেখব তা কেউই ঠিক করে বলতে পারে না, তবে—" ঘনাদা যেন সুদূর মহাশূন্যেই নিজেকে চালান করে দিয়ে বললেন, "তবে হয়তো-হতে-পারে এমন সব কিছু ব্যাপার অনুমান করতে পারি। তার যা এবার হতে পারে বা হতে যাচ্ছে আমাদের নিজেদেরই কর্মফল। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ গায়নার কোস্ট থেকে ছোঁড়া গিয়োত্তো হয়তো তাকে যা হুকুম তার চেয়ে আলাদা বেশি কিছু করবে। হয়তো তার গণকযন্ত্র ভুল করে বসবে, আর সেই ভুলের দরুন হ্যালির ধূমকেতু থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে ঢুঁ মেরে বসবে, আর তাতে যা হবে সেইটেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গিয়োত্তোর গুঁতোয় ধূমকেতুর মাথা কিংবা লেজ থেকে যা বেরিয়ে আসবে সেইটেই সাত রাজার ধন মানিকের চেয়ে অবাক করা এক বস্তু। পৃথিবী থেকে লক্ষ রাখা দূরবিনে সে বস্তুর দেখা পাওয়া মাত্র পৃথিবীর দুই মহাশক্তির কেউ হয় ফেরি-রকেট চ্যালেঞ্জারে, নয় অন্য কোনও মহাকাশযানে তাকে উদ্ধার করে আনবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্ধার করার পর সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না—জিনিসটা কী তা বুঝতে পারার পর। জিনিসটা একটা অসাধারণ টি ভি ক্যামেরা যা হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গাঁথা হয়ে থেকে আগাগোড়া তার ছিয়াত্তর বছরের মহাকাশ পরিক্রমার সব বিবরণ ধরে রেখেছে। পৃথিবীর মানুষেরা এরকম একটা যন্ত্র হ্যালির ধূমকেতুর ভেতরে গেঁথে তার ছিয়াত্তর বছরের পাড়ির সব বৃত্তান্ত ধরে রেখে সংগ্রহ করার কথা ভাবছিল। সে চেষ্টা তাদের আর করতে হল না।

এটা যে কল্পনাতীত আশাতীত সৌভাগ্য সে কথা আর বলবার নয়, কিন্তু কথা যা হবে তা এই যে এমন আশ্চর্য যন্ত্র কারা তৈরি করে হ্যালির ধূমকেতুর মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। ছিয়াত্তর বছর আগে দূরদর্শন-ক্যামেরা কি রকেট-বিজ্ঞান ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষেরও হাতেখড়ি মাত্র হয়েছে বলা যায়। এমন আশ্চর্য কীর্তি তাহলে কার?

সৌরমণ্ডলের কোনও গ্রহে উন্নত সভ্যতা দূরে থাক বুদ্ধিমান কোনও প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে তার ছিয়াত্তর বছরের পরিক্রমায় হ্যালির ধূমকেতু আরও অনেকদূর পর্যন্ত টহল দিয়ে আসে বটে, কিন্তু তা-ও চার

দশমিক তিন আলোকবর্ষ দূরের আমাদের সবচেয়ে কাছের তারকা প্রক্সিমা সেনটোরির চেয়ে দূরে নয়। এরকম একটা যন্ত্র বানিয়ে তা হ্যালির ধূমকেতুতে গেঁথে দেওয়ার ক্ষমতা যাদের হয়েছে এমন উন্নত সভ্যতায় পৌঁছনো প্রাণী তাহলে আছে কোথায়? আমাদের কোনও দূরবিনে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি কেন এতদিন, এইটেই হবে আমাদের ভাবনা। তবে এ প্রশ্নের উত্তরও আছে।

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারা পর্যন্ত ফাঁকা মহাশূন্যে খানিকটা কালো নীহারিকার এলাকা যে আছে তা-ও আমরা দেখেছি। মহাকাশের মুলুকে অন্ধকার কত কী যে লুকিয়ে রাখে কে জানে, মানুষেরও আগে দূরদর্শন বা রকেট-যন্ত্র আবিষ্কারের মতো উন্নত সভ্য প্রাণীর হয়তো সেখানে কোথাও বাস। তাদের দূরদর্শন যন্ত্র থেকেও তাদের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করতে পারি। এখন শুধু তারই অপেক্ষায় থাকা।” শিশিরের সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে পকেটে নিয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন, “১৯৮৬-র ১৩ই মার্চ তো আর খুব বেশি দূরে নয়।”

জয়দ্রথ বধে ঘনাদা

(১)

“মহাভারতে নেই।”

“না, আছে।”

“কোথাও নেই।”

“আলবত আছে। ওই মহাভারতেই।”

“বাজে কথা। পড়েছ মহাভারত?”

“পড়েছি বলেই বলছি। ওই মহাভারতেই আছে, ভালো করে পড়ে দেখো।”

ওপরের কোটেশন চিহ্ন দেওয়া বাক্যালাপগুলো পড়েই ওগুলোর অকুস্থল বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন নামে কোনও গলির একটি না-নতুন না-পুরাতন মুক্তছাদের একটি মাত্র ত্রিতল নাতি-প্রশস্ত গৃহযুক্ত অট্টালিকা বলে যাঁরা ধরে নিয়েছেন, তাঁরা ভুল কিছু করেন নি।

কথাগুলি ওই বাহাত্তর নম্বরের দোতলার বৈঠকি ঘরেই শোনা গেছে। এবং সেগুলি তেতলার টঙের ঘরের সেই 'তিনি'-কে শোনাবার জন্যই উচ্চারিত।

কিন্তু এ মেসবাড়ির সে মামুলি দস্তুরের সঙ্গে মিল ওইটুকুই—ওই ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে টঙের ঘরের তাঁর চটির শব্দ পাওয়া থেকে সে শব্দ বারান্দায় এসে পৌঁছনো পর্যন্ত গলা ছেড়ে তাঁকে শোনাবার মতো আওয়াজে ওইসব আলাপ উত্তেজিত হয়ে চালিয়ে যাওয়া।

মিলটা তারপর ওইখানেই শেষ। তাঁর চটির আওয়াজ বারান্দা থেকে আমাদের বৈঠকি ঘরের দিকে এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চাল একেবারে আলাদা। অনেকদিন অনেক গোপন পরামর্শসভার তর্কাতর্কির পর ঘনাদার ওপর এই চাল চালাই সাব্যস্ত হয়েছে।

এ চালের স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো ওকালতি করেছে গৌর। বলেছে, "ঘড়ি কি টিকটিক বন্ধ করে টিকতে পারে? জিন্দা আর জাগা থাকলে গোলা পায়রা কি বকবক্‌ম থামাতে পারে? নিলেমের হাটের ফড়ের সবচেয়ে বড় সাজা কী? কথার তুবড়ি ছোটাতে না পারুক, দু-চারটে জুতসই ফোড়ন কাটতে না পারা। ঘনাদাকে সেই সাজাই আমরা দেব।"

"তারপর দেখব", গৌরকে মদত দিয়েছে শিশির, "এ সাজায় চিড়বিড়িয়ে মৃগীর রুগি না হয়ে উঠে উনি ক-দিন চাঙ্গা থাকতে পারেন?"

ঘনাদাকে এই মোক্ষম সাজা দিতেই আমরা ক-দিন এই নতুন চাল চালছি!

চাল খুব ঘোরালো প্যাঁচালো কিছু নয়। শুধু ঘনাদার মুখে এক রকম কুলুপ দেওয়ার ব্যবস্থা।

চালটা সোজাসুজি তাই এই। সকাল বিকেল তেতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে নামবার সিঁড়িতে ঘনাদার চটি ফটফটানি শুনলেই আমরা তাঁকে শোনাবার মতো ছাড়া গলায় ওই মহাভারত বা আর কিছু নিয়ে জোর তর্ক শুরু করব। কিন্তু তিনি বারান্দায় নেমে বৈঠকি ঘরে এসে ঢোকার আগেই সব একেবারে চুপ।

তিনি প্রথমবারে ওই অবস্থায় ঘরে এসে মুখে কিছু বলেননি, শুধু একটু সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা সবাই তখন একেবারে ধোওয়া তুলসি পাতা। খল প্যাঁচ কিছু আমাদের মুখে ফুটবে কোথা থেকে?

দ্বিতীয়বার ঘনাদা আর মুখ না খুলে পারেননি।

সেদিন আমরা একটু অপ্রস্তুতই ছিলাম। ঘনাদা তাঁর বাঁধাধরা সময়ের একটু আগে নেমে আসায় ভেবেচিন্তে তৈরি করে রাখা কিছু তর্ক তুলে তাঁকে ছটফটানি ধরাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি। তার জায়গায় হঠাৎ ন্যাড়া সিঁড়িতে তাঁর চটির আওয়াজ পেয়ে যা তৎক্ষণাৎ মাথায় এসেছে তাই শুনিয়েছি গলা চড়িয়ে।

"না, কালবোশেখি আর হবে না।" শিশিরই প্রথম যা হোক করে একটা প্রসঙ্গ তুলেছে।

"হবে না মানে?" শিবু যেন মানহানির মামলা রুজু করেছে। "কালবোশেখি বন্ধ

হলে—"

"এ দেশ রাজস্থান হবে।" শিবুর খুঁজে না পাওয়া জবাবটা পূরণ করে দিয়েছিল গৌর।

"হবে কেন? রাজস্থানই তো হচ্ছে।" শিশির জোর গলায় ওই শেষ কথাটি বলেই চুপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ বারান্দার দরজা দিয়ে ঘনাদা তখন আড্ডাঘরে পা দিয়েছেন।

আমাদের সকলের মুখ হঠাৎ কুলুপ-আঁটা হয়ে গেলেও ঘনাদা কিন্তু আগের দিনের মতো নিজেও চুপ হয়ে থাকতে পারেননি। দরজা থেকে এসে তাঁর মৌরসি আরামকেদারাটি দখল করতে করতেই নিজের আগ্রহটা লুকোতে একটু হালকা সুর লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—"কী তর্ক হচ্ছিল হে?"

আমরা সবাই তখন বোবা। প্রশ্নটা যেন বুঝতেই পারিনি, এমনভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি।

ঘনাদা অধৈর্যটা পুরোপুরি আর চাপতে না পেরে একটু ঝাঁঝালো গলাতেই বলেছেন—"কী নিয়ে অত চেঁচামেচি করছিলে, বলেই ফেলো না।"

এতক্ষণে যেন অতি অনিচ্ছায় মুখ খুলে গৌর বলেছে, "আজ্ঞে, ও কিছু না!"

"কিছু না!" ঘনাদা বেশ কষ্ট করেই গলাটা যথাসাধ্য ঠাণ্ডা রেখে বলেছেন, "কিন্তু রাজস্থান নিয়ে কী যেন চেঁচাচ্ছিলে মনে হল?"

"রাজস্থান!" প্রথমে বেশ একটু অবাক হবার ভান করে, তার পর উদাসীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ, কিছু বলছিলাম বোধহয়, ঠিক মনে পড়ছে না।"

"মনে পড়ছে না।" ঘনাদার গলার আওয়াজেই এবার আর সন্দেহ করবার কিছু থাকে না যে সলতের আগুন খোলের ভেতরের মশলায় গিয়ে লেগেছে।

তা লাগুক! তবু এখনও নয়। ও সোঁ-সোঁ আওয়াজ পেয়েই এখুনি ছাড়লে কাজের কাজ কিছু হবে না। আঙুলের টিপুনিতে শুধু একটু ঘুরপাক খেয়েই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে ফেঁসে যাবে।

তাই ভেতর থেকে একেবারে ঠিকরে বার হবার মতো প্রচণ্ড সেই ঠেলাটা আসার জন্য আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

একবার সে ছুটি-কি-ফাটি বেগ এসে গেলে আর ভাবনা নেই। দু-আঙুলে টিপে একটু পাক দিয়ে ছেড়ে দিলেই উড়ন তুবড়ি ক-পাক ঘুরে মাটি ছুঁতে গিয়েই আবার যেন ছোঁ মারা হয়ে তেশূন্যে উঠে যাবে।

যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেই প্রচণ্ড বেগের ঠেলাই এরপর একদিন টের পেলাম।

শুধু সোঁ-সোঁ ডাক নয়, যে হাতের যে যে আঙুলে ধরে রাখা, সব একেবারে যেন ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে যাবার ছটফটানি।

মওকা বুঝে আমরাও ঠিকমতো পাক লাগালাম এবার।

মওকাটা এল মহাভারতের কথা নিয়েই।

আমাদের অবশ্য সেদিন আগে থাকতে রিহার্সেল দিয়ে তৈরি থাকার সুবিধে ছিল।

ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির মাথায় ঘনাদার চটি ফটফটিয়ে উঠতেই উদারামুদারা বাদ দিয়ে একেবারে তারায় তান ছেড়েছিলাম সবাই মিলে।

"সব বাজে কথা!"—প্রথম গলাবাজিটা গৌরের—"মহাভারতে ও-সব কিচ্ছু নেই।"

"আলবত আছে!" শিবুর গর্জন, "পড়েছিস মহাভারত?"

"হ্যাঁ, পড়েছি।"—গৌরের আস্ফালন—"সব পড়েছি—ব্যাসদেব থেকে কাশীরাম দাস, স-ব।"

"শুধু যেমন-তেমন করে পড়লেই হয় না।"—আমার শিবুকে সমর্থন—"পড়তে জানা চাই। তাহলে দেখবি মহাভারতে যা চাস সব আছে!"

"যা চাইব সব আছে?" গৌরের ভেংচি কেটে টিটকিরি।

"হ্যাঁ, মহাভারতে আছে।" ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘনাদার আজ আর প্রশ্ন-ট্রশ্ন কিছু নয়—একেবারে সরাসরি বাড়ি-কাঁপানো-গলায় ঘোষণা।

ভেতরে চলে এসে মৌরসি আরামকেদারায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘোষণায় আর একটু সংযোজন—"পড়তে জানলেই পাওয়া যায়।"

"পড়তে জানলেই পাওয়া যায়?" হ্যাঁ, আজ আর মুখে আমাদের কুলুপ-টুলুপ নয়। একেবারে প্রথম থেকেই যুদ্ধং-দেহি-তাল-ঠোকা শিশিরের গলা দিয়ে—"মহাভারতে একটা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব কোথায় পাব বলতে পারেন?"

"প্রশ্নটা কী?" ঘনাদা শিশিরের আও-লড়েঙ্গে গোছের তাল ঠোকার সঙ্গে তার বাড়িয়ে ধরা সিগারেটের টিনটার ভেতরও আঙুল চালিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

"প্রশ্নটা হল"—শিশির যেন ভেবে নিতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে হঠাৎ দুম করে বলেছে, "এই—এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটার কথাই ধরুন না। ওটা কবে হয়েছে কিছু বলতে পারেন? আছে সেকথা মহাভারতে কোথাও? কই, বলুন-না?"

কিন্তু বলবেন কী করে? ঘনাদা তখন শিশিরের টিন থেকে হাতানো সিগারেটগুলোর একটা ধরাতেই ব্যস্ত।

ঘনাদা কি সত্যি ফাঁপরে পড়েছে নাকি? অতক্ষণ ধরে সিগারেট ধরানো নিজের সেই বেসামাল অবস্থা ঢাকবার একটা ফিকির। কিন্তু এ ফিকির আর কতক্ষণ চালাবেন?

চালাতে পারলেনও না। সিগারেট ধরানো শেষ করে শিশিরের নতুন লাইটারটা নিজের মুঠোতেই রেখে দিয়ে ঘনাদা প্রশ্নটা যেন ঠিক শোনেননি এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ, কী যেন জানতে চাইছিলে?"

ঘনাদাকে বেকায়দায় পেয়ে আমরা সবাই যেন ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে তৈরি। শিশিরের বদলে শিবুই সবিস্তারে আমাদের প্রশ্নটা ঘনাদাকে শোনালে। তার সঙ্গে আমিই এবার শেষ তালটা ঠুকে দিয়ে বললাম, "যা শুনলেন তার জবাবটা কোথাও আছে মহাভারতে?"

"আছে!" ঘনাদার বেশ জলদগম্ভীর স্বর।

এটা ফাঁকা আওয়াজ না, সত্যিকার একটা পাকা চালের পাঁয়তারা পরখ করবার

জন্য যা বলব ভাবছিলাম তা আর বলবার দরকার হল না।

ঘনাদা নিজে থেকেই বললেন, "অভিমন্যু বধটা পড়েছ? ভাল করে পড়ে দেখো।"

"অভিমন্যু বধ পড়ব? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ জানতে?"

আমাদের সকলের সব ক-টা চোখই তখন বুঝি কপালে। কিন্তু ধাঁধাটা যাঁর সরল করবার দায়, তিনি তো হঠাৎ আরামকেদারা ছেড়ে উঠে এ ঘর ছেড়েই চলে যাচ্ছেন। শিশিরের লাইটারটা অবশ্য ফেরাতে ভুলে গিয়ে।

যেতে যেতে একটু দয়া তিনি শুধু করলেন। বারান্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে ক-টা কথা আমাদের দিকে যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন।

কথাগুলো হল—"ভালো করে পড়ো। তা পড়লে যা কিছু আসল খেই সব ওখানেই পাবে।"

(২)

আমরা ঘনাদাকে বেকায়দায় ফেলে জব্দ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনিই আমাদের থ বানিয়ে গেলেন।

তিনি ঘর থেকে হাওয়া—কিন্তু আমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধিও সেই সঙ্গে যেন জট পাকানো।

'অভিমন্যু বধ পালা পড়ো, খেই পাবে'—তিনি বলে দিয়ে গেলেন। এটা কি ভাঁওতা? কিন্তু রাম-ভাঁওতা হলেও আমাদের তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না। ভাঁওতাটা ধরিয়ে দেবার জন্যই অভিমন্যু বধের পর্বটা কাশীরাম দাসে অন্তত পড়তে হবে।

অন্য উপায় যখন নেই তখন আনাও কাশীরাম দাস। পড়ো অভিমন্যু বধের গোটা পালাটা।

চারজনে পালা করে তাই পড়লাম। সেই—

যুদ্ধিষ্ঠির বলে বাপু শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ ॥
অভিমন্যু বলে তবে শুন নরমণি।
প্রবেশ জানি যে আমি নির্গম না জানি ॥

থেকে দ্রোণের সেই অতি দুঃখের স্বীকারোক্তি—

ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে ॥
কৃষ্ণের সে ভাগিনেয়, অর্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত ॥
তাহারে নারিব ন্যায়যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন ॥

তারপর দুর্যোধনের কথায় সেই সপ্তরথীর একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ—

বেড়িল বালকে গিয়ে সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মারামারি যুদ্ধ চলে অতি ॥

আর এসব বিবরণের শেষে সেই—

সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
গমন করিল চন্দ্রলোকে সেইক্ষণ ॥

শেষ পর্যন্ত কিছুই পড়তে বাদ রাখলাম না। কিন্তু আমরা যা চেয়েছি কোথায় সেই জবাব?

সেদিন বিকেলেই তাঁর বিকেলের সরোবর-সভায় যাবার মুখে ন্যাড়া সিঁড়ির নীচেই তাঁকে ধরলাম।

"কই? শুধু অভিমন্যু বধের বৃত্তান্ত নয়, গোটা দ্রোণপর্বই তো পড়ে ফেললাম। কোথাও কিছু পেলাম না।"

ঘনাদা কি আমাদের এমন দল বেঁধে চড়াও হওয়াতে ভড়কালেন? বিন্দুমাত্র না।

বরং আমাদের আনাড়িপনায় যেন হতাশ হয়ে করুণা করে বললেন, "তার মানে সব পড়েও আসল খেইটা ধরতে পারোনি।"

"আসল খেইটা কোথায়?" আমাদের গলায় অবিশ্বাসের সুরটা বেশ স্পষ্ট।

"কোথায়?" ঘনাদা যেন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে বললেন, "জয়দ্রথ কে, তা জানো?"

"জানব না কেন! খুব জানি।"—আমাদের আস্ফালন।

"তাহলে ওই জয়দ্রথের ব্যাপারটাই ভাল করে আর একবার পড়ো," বলে ঘনাদা হনহন্ করে আমাদের ছেড়ে বারান্দা হয়ে নীচে নেমে গেলেন।

আমরা রাগব, না হাসব বুঝতে না পেরে তখন সবাই হতভম্ব।

জয়দ্রথের ব্যাপারটা ভাল করে জানলেই আমাদের প্রশ্নের জবাব পাব? কী পেয়েছেন আমাদের ঘনাদা? আর কত এমন গুল ঝাড়বেন? নিজের গুল নিজেই শেষে সামলাবেন কী করে?

তবু জয়দ্রথের ব্যাপারটা পুরোপুরি আর একবার না পড়ে আমাদের উপায় নেই। তাই পড়লাম। অভিমন্যু বধে যুধিষ্ঠিরের সেই বিলাপ থেকে—

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি তবে কহি সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র লাগিল কহিতে।
নির্গম না জানি ব্যূহে, জানি প্রবেশিতে ॥
তথাপিহ পাঠাইনু না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার ॥
তার পিছু যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥

জয়দ্রথে জিনিবারে নারে কোন জন।
সে কারণে মরিলেক অর্জুন নন্দন ॥

থেকে—

জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥

এসব কিছু নিয়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের মায়া কৌশলে জয়দ্রথ বধ পর্যন্ত আগাগোড়া সবই পড়লাম। কিন্তু তার মধ্যে আমরা যা চাই সে জবাব কোথায়?

সেই কথাই বলতে পরের দিন সকাল হতেই সবাই মিলে টঙের ঘরে গিয়ে হাজির। অবশ্য উপযুক্ত ভেট না নিয়ে নয়।

ঘনাদা তখন সযত্নে তাঁর গড়গড়ার কলকেতে টিকে সাজাচ্ছিলেন। বনোয়ারির বয়ে-আনা ট্রে-র দুটি বড় বড় প্লেটে হিঙের কচুরি আর অমৃতিগুলির সুগন্ধ আর চেহারা তো বটেই—বায়না দেওয়া ডবল সাইজগুলো দেখেও খুশিটা একেবারে গোপন করতে পারলেন না। টিকে সাজানো কলকেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে তামাকটা ধরতে দিয়ে বেদিগোছের তাঁর লম্বা চওড়া নিচু চারপায়াটির যথাস্থানে এসে বসে বললেন, "এত সকালে এই হাতিমার্কা মাল কোথায় পেলে হে?"

তাঁর এই খুশির ওপরই বড় ঘা দেবার জন্য তৈরি থেকে বললাম, "আজ্ঞে, ওগুলো আমাদের গলির মোড়ের রাদুর দোকানেরই, তবে কাল প্রায় মাঝরাতে বায়না দেওয়া।"

ঘনাদা তখন কচুরির প্লেট কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার সদ্ব্যবহার শুরু করেছেন। সেই অবস্থাতেই যতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করা সম্ভব তাই করে বললেন, "তা মাঝরাতে কেন?"

"আজ্ঞে, তখনই আমাদের পড়াটা শেষ হল কিনা"—বড় গোলাটা ছাড়বার আগে আমরা একটু ছররা ছিটোলাম।

"পড়া শেষ হল? কী পড়া?" ঘনাদাকে সত্যিই দু-চোয়ালের বাঁধানো দাঁতের কাজ একটু থামাতে হল। তারপর পূর্ব কথাটা স্মরণ করে কতকটা অবহেলা ভরে বললেন, "ও, তোমাদের যা পড়তে বলেছিলাম, সেই জয়দ্রথের কথা সব পড়লে?"

"হ্যাঁ"—আমরা কামানটা দাগলাম—"পড়ে দেখে বুঝলাম আপনি নিজে জয়দ্রথের বৃত্তান্ত কিছুই পড়েননি, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হয়েছিল তার কোনও হদিসই সেখানে নেই।"

ঘনাদা তাঁর চোয়াল নাড়া থামিয়ে হঠাৎ কি একটু টান হয়ে বসলেন! বসা আশ্চর্য

কিছু নয়, কারণ এরকম সোজাসুজি ঘা তাঁর ওপর আমরা কখনও দিইনি।

এরকম ঘা খেয়ে ঘনাদা যদি একটু চমক খেয়ে থাকেন, তা মাত্র দু-সেকেন্ডের জন্য। সে মুহূর্তটুকু পার হতেই আবার যথাপূর্ব চোয়াল নাড়তে নাড়তে চোখে একটু উপহাসের ঝিলিক ফুটিয়ে বললেন, "নেই নাকি? আচ্ছা নীচে গিয়ে বোস। আমি সেখানেই গিয়ে সব শুনছি।"

প্রতিবাদ না করে নীচেই নেমে গেলাম বটে, কিন্তু মেজাজ তখন সকলেরই আমাদের খোশ। ঘনাদা এই সময় নেওয়া মানে যে তাঁর এখন সসেমিরে অবস্থা তাতে আর সন্দেহ নেই। তা সময় তিনি যত পারেন, নিন। শেষ মাত-এর চাল এখন আমাদেরই মুঠোয়। হাবুডুবু খেতে খেতে তিনি ধরবার মতো কুটোটিও পাবেন কিনা সন্দেহ।

শেষ পর্যন্ত ঘনাদা এলেন, বাইরে বেরুবার মতো সাজপোশাকে একেবারে তৈরি হয়ে। শেষে মৌরসি, কেদারাটি দখল করে যথারীতি শিশিরের বাড়িয়ে ধরা টিনটি থেকে সিগারেট নিতে গিয়ে টিনটি হাতে রাখতেও ভুললেন না। তারপর সিগারেট ধরিয়ে যেন ধীরে সুস্থে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা কী পড়েছ শুনি একটু!"

"সবই পড়েছি।" আমরাও ভারিক্কি চালে বললাম, "জয়দ্রথের সেই আদি বৃত্তান্ত, পাণ্ডবদের বনবাসের সময়ে তাদের আস্তানা লুট করতে গিয়ে পাণ্ডবদের হাতে মার খাওয়া, বিশেষ ভীমের থাপ্পড়ে পুরো দু-পাটি দাঁত উপড়ে যাবার পর তার সেই বারো বছরের দারুণ তপস্যা আর শেষে বাধ্য হয়ে শিবঠাকুরের সেই বর দিতে চাওয়া—

শিব বলে বর চাহ সিন্ধুর তনয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হরে প্রণময় ॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভু মম নিবেদন ॥
এই বর দেহ শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি ॥

তাতে শিব যা বললেন, সেই—

শুন তবে সত্য কথা সিন্ধুর তনয়।
জিনিবে পাণ্ডবগণে বিনা ধনঞ্জয় ॥

এইসব শেষ করে অভিমন্যু বধ আর তারপর জয়দ্রথই অভিমন্যুর সহায়হীন ভাবে যুদ্ধে হত হওয়ার প্রধান কারণ জেনে—

জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥

আর তারপরে অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা—

মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥

তারপর—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও!" ঘনাদাই হঠাৎ গম্ভীর গলায় বাধা দিয়ে আমাদের থামালেন—"এর পর আসল বিবরণটা ওখানে নেই।"

"ওখানে নেই মানে!" আমরা তাজ্জব—"কোথায় আছে তাহলে? ব্যাসের মূল মহাভারতে?"

"না," ঘনাদা যেন দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সেখানেও ব্যাসদেব অর্জুনের খাতিরে একটু অদল-বদল করে বলেছেন।"

"অদল-বদল!" আমরা একটু সন্দিগ্ধভাবে বললাম, "কী রকম অদল-বদল?"

"না, সেরকম কিছু নয়।" ঘনাদা আশ্বস্ত করলেন, "এই একটু বাড়িয়ে কমিয়ে উলটো-পালটা বসানো।"

আমরা এ নিয়ে কিছু তর্ক তোলবার আগে ঘনাদা নিজে থেকেই আবার বললেন, "এই যেমন অর্জুন জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করে—'এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর' বলার পর যা যা থাকবার কথা তা নেই। অর্জুনের মুখে তারপর যা বসানো হয়েছে, সে-সবও তার কথা নয়।"

"তার মানে?" এবার আমরা সত্যিই হতভম্ব।

"মানে, ওখানে যা থাকবার কথা তা হল," বলে ঘনাদা প্রায় সুর করেই আমাদের শোনালেন,

"এত তীব্র পুত্রশোকে মূর্ছাহত প্রায়।
অর্জুনের মুখে না আর বাক্য বাহিরায় ॥
তখন চিৎকারী উঠি দেবকীনন্দন।
বলেন শুনহ সবে প্রতিজ্ঞা বচন ॥
কালি যদি জয়দ্রথ বিনাশ না হয়।
সূর্যাস্তেই প্রাণ পার্থ ত্যজিবে নিশ্চয় ॥
দিনান্তেও জয়দ্রথ না মরিলে কালই।
আত্মঘাতী হবে পার্থ নিজ চিতা জ্বালি।"

"অর্জুনের হয়ে শ্রীকৃষ্ণই এসব কথা বলেছিলেন?" ঘনাদা তাঁর শোলোক পড়া থামাবার পর আমরা বেশ সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "মানে, এগুলো অর্জুনের তো মনের কথা না-ও হতে পারে? আর তা যদি না হয় তাহলে অর্জুনও একথা শুনে একটু চমকাবেন না কি?"

"অর্জুন হয়তো বেশ একটু চমকেও গিয়েছিলেন," ঘনাদা তাঁর অনুমানটা বিস্তারিত করলেন, "কিন্তু পুত্রশোকে তিনি তখন অধীর। শ্রীকৃষ্ণের কথা যত ভুলই হোক, তার প্রতিবাদের কোনও দরকারই আর তাঁর নেই।"

"সবই বুঝলাম," শিশির যেন পুলিশি জেরার ধরনে জানতে চাইলে, "কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ কাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত জয়দ্রথ বধের সময় বেঁধে দিয়ে অর্জুনকে অমন রীতিমত বেকায়দায় ফেলতে গেলেন কেন?"

"কেন তা তিনিই জানেন।"—ঘনাদা ভক্তি গদগদ হলেন—"তবে বিশ্বসংসার

যিনি চালাচ্ছেন, চতুর চূড়ামণি সেই কৃষ্ণ বাসুদেবের নেহাত বাজে খামখেয়াল ওটা নিশ্চয় নয়। একটা কিছু মতলব তাঁর নিশ্চয় ছিল। দেখা যাক সে মতলব শেষ পর্যন্ত জানা যায় কি না।"

ভক্তি গদগদ হয়ে আগের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেও ঘনাদাকে পুরোপুরি হড়কে পালাতে দিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলো মহাভারতে অর্জুনের জবানিতে চালান হল কী করে?"

"সেটা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়," ঘনাদা মহাভারতের বর্ণন-প্রমাদের রহস্য ভেদ করে বললেন, "নিজের মহিমা তাঁর আর বাড়াবার দরকার নেই। তাই কীর্তির গৌরবটা অর্জুনকেই দিতে চাইলেন। মহামতি ব্যাসদেবও মানসবার্তায় তা টের পেয়ে সেই ইচ্ছাপূরণে ত্রুটি করেননি।"

"আচ্ছা, অনেক কথাই জানালাম!"—গৌর হঠাৎ ঘনাদাকে বেকায়দায় ফেলতে মূল মামলায় ফিরে গেল—"কিন্তু এসব কথার মধ্যে আসল প্রশ্নের জবাব আছে কি? সে জবাব কোথায়?"

ঘনাদা কি বেসামাল? হঠাৎ কোনও ছুতোয় তিনি কি ঘর ছেড়ে যাবার তাল করবেন এবার?

না। ভাঙলেও যিনি মচকান না, অমন সেই ঘনাদা অত সহজে দান ছাড়বার মানুষ নন।

বেশ ধীরে-সুস্থে হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তিনি বললেন, "আছে! আছে! জবাব ঠিক যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। এরপর আর কী পড়লে শুনি না।"

"এরপর?" শিবু মুখে যেন সত্যিকার অরুচি ফুটিয়ে বললে, "এরপর তো সেই মামুলি থোড়-বড়ি-খাড়া আর শ্রীকৃষ্ণের সেই সস্তা-সস্তা ম্যাজিক দেখাবার ভড়কি!"

"ভড়কিটা কী রকম একটু শুনতে পাই না?" ঘনাদার মুখে একটু বাঁকা-হাসি লাগানো বলে সন্দেহ হল।

"বেশ, শুনুন তাহলে," শিবু তাল ঠোকার মতো করে ওখানেই আনিয়ে রাখা ঢাউস কাশীরাম দাস-খানি কাছে টেনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, "পরের দিন অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রথে জয়দ্রথকে খুঁজে কী রকম হয়রান—দ্রোণাচার্যের ব্যূহ-রচনার কায়দায় জয়দ্রথই বা কেমন নিশ্চিহ্নভাবে লুকোল—সে সব বিবরণ পড়বার নিশ্চয় দরকার নেই, আমি শুধু ভড়কির বর্ণনাটুকুই পড়ছি।"

শিবু সেই বিরাট কাশীরাম দাস খুলে এবার পড়তে শুরু করল—

"জয়দ্রথে কোনো মতে পাওয়া নাহি যায়,
হতাশ হইয়া পার্থ সখাপানে চায়।
বলে, আর বৃথা কেন করি অন্বেষণ,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালো দিব প্রাণবিসর্জন।
পার্থের হতাশা দেখি দেব নারায়ণ,
সখারে সাহস দিয়া কহেন তখন।

কি ভয় আছে রে ইথে উপায় সৃজিব,
জয়দ্রথে আজিকেই নিধন করিব।
এত বলি সুউপায় চিন্তি নারায়ণ,
সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন।
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী,
কুরুসেনা মধ্যে হল জয় জয় ধ্বনি।"

"ব্যাস? আর কী চাই?"

শিবু তার কাশীরাম পড়া থামাতেই ওপরের মন্তব্যটি শুনে আমরা চমকে বক্তার দিকে চাইলাম।

না, আমাদের শুনতে কোনও ভুল হয়নি। বক্তা স্বয়ং ঘনাদা ছাড়া আর কেউ নন।

কিন্তু তিনি কী বললেন? কী? হঠাৎ বাতুল প্রলাপ বকতে শুরু করলেন নাকি? প্রলাপ না হলে কথা ক-টার মানে কী? ঘনাদাকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

"মানে!" ঘনাদা করুণার হাসি হেসে বললেন, "মানে, যা চাও সবই তো পেলে!"

"সবই পেলাম!" আমরা হাসব, না রাগে চেঁচাব বুঝতে পারছি না, তখন সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, "সব পেয়ে গেছি মানে আমাদের প্রশ্নের জবাবও পেয়ে গেছি বলতে চান? কোথায়?"

"কোথায় আবার?"—ঘনাদা আমাদের মূঢ়তায় যেন বিস্মিত—"এইমাত্র যা পড়লে ওই শোলোকগুলিতেই। তবে অবশ্য ঠিক মতো পড়তে জানা চাই।"

"ঠিক মতো আপনার পড়াটা কী শুনি?"—এবার আমাদের আর গরম হবার ভান করতে হল না—"ওই 'সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন' পড়ে কী গভীর রহস্যের আপনি সন্ধান পেলেন বুঝতে চাই।"

"আরে!" ঘনাদা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "রহস্য গভীর হবে কেন? একেবারে ওপরেই ভেসে রয়েছে। 'সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন' মানে কি সত্যি সত্যি সুদর্শন চক্রে সূর্য ঢেকে দেওয়া? ওর আসল মানে, সে দিন ওই কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ইঙ্গিত দেওয়া। শ্রীকৃষ্ণ আর যেমন-তেমন কেউ নন, আর সব কিছুর সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রটাও তাঁর পুরোপুরি জানা। তিনি আগেই কষে জানতে পেরেছিলেন, কোনদিন ওখানে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। দিনটা ঠিক অর্জুনের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞার পরের দিন হওয়ায় তিনি অমন করে অর্জুনের হয়ে কথা বলার ছলে অমন অসম্ভব প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়েছিলেন সবাইকে। যতদূর বোঝা যায়, সেদিন বেশ মেঘলা ছিল, সেই মেঘের আড়ালে বেশ খানিকটা বেলা থাকতেই হঠাৎ গ্রহণ শুরু হয়ে একেবারে পূর্ণগ্রাসে পৌঁছয়। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে ভেবে জয়দ্রথকে নিয়ে কুরুযোদ্ধারা অর্জুনের অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ-বিসর্জন মজা করে দেখতে আসে। আর তখনই পূর্ণগ্রাসের পর সূর্যের রাহুমুক্তি আবার শুরু হয়, আর দিনের আলো থাকতেই জয়দ্রথকে সামনে পেয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পালনের কোনও অসুবিধা আর থাকে না।"

এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষ করে ঘনাদা শিশিরের পুরো সিগারেটের টিনটি হাতিয়ে আরামকেদারা ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করতে আমরা তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে রেখে দাবি করেছি—"কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব মহাভারতে কই?"

"এখনও সে কথা জিজ্ঞাসা করছ?" আমাদের সম্বন্ধে তাঁর হতাশাটা ভাল করেই গলার স্বরে বুঝতে দিয়ে বললেন, "আরে, সূর্যগ্রহণ কারওর খামখেয়ালে হয় না। তা হয় একেবারে নির্ভুল অঙ্কের হিসেবে। এই ক-দিন আগে আমাদের এখানে সূর্যের পূর্ণগ্রাস হয়ে গেছে। সত্যিকার জ্যোতির্বিদ কাউকে ধরে, এই গ্রহণ থেকে পিছনে হিসাব চালিয়ে সেই গ্রহণের তারিখ, জয়দ্রথ-বধ মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পল-বিপল পর্যন্ত নির্ভুল বলে দেবে।"

আমাদের চোখগুলো কপালে উঠিয়ে রেখেই ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার আর তাঁকে বাধা দিতে পারলাম না।

উপন্যাস

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

॥ এক ॥

বাহাত্তর নম্বরের একেবারে চক্ষুস্থির।

হ্যাঁ, চক্ষুস্থির ছাড়া আর কী বলে অবস্থাটা বোঝাব?

বাহাত্তর নম্বর মানে তো তিনি, ওই নম্বরের বনমালি নস্কর লেনের একটি বেশ বয়স্ক বাড়ির তেতলার টঙের ঘরে যিনি বেশ কিছুকাল বিরাজ করছেন।

আসল তিনি, আর ফাউ হিসেবে আমরা ক-জন।

তা সেই তেতলার টঙের ঘরে তিনি, মানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদার সঙ্গে আমাদের, মানে শিবু শিশির গৌর ও আমার চক্ষুস্থির তো তখন বটেই।

চক্ষুস্থির না বলে চক্ষুচড়কগাছও বলা যায় অবশ্য, আর আমাদের তালিকাটা একটু সংশোধন করে শিশিরকে বাদ রাখা যায়। শিশির তখন সত্যি অনুপস্থিত।

শিশির থাকুক বা না থাকুক আমাদের চোখের অবস্থায় তাতে হেরফের কিছু অবশ্য হবার নয়। দুদিন ধরে রীতিমত রিহার্সালে নিজেদের পাকিয়ে, জোড়া জোড়া চোখ একেবারে ছানাবড়া করে আমরা তখন যে যার পার্ট সিনেরিও মাফিক করে যাচ্ছি।

সত্যি কথা বলতে গেলে পার্ট যা করতে হচ্ছে তা এমন কিছু শক্ত নয়। ব্যাপার যা তখন ঘটেছে, তার হাড়-হদ্দ জানা থাকলেও চোখগুলো বুঝি আপনা থেকেই কপালে উঠে যায়।

চিত্রনাট্যটা গোড়া থেকে শোনালেই ব্যাপারটা বোঝার অসুবিধা থাকবে না।

প্রথম লং-শট। বাহাত্তর নম্বরের বনমালি নস্কর লেনের তেতলার টঙের ঘরে যাবার ন্যাড়া সিঁড়ি।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে শিবু সেখান দিয়ে ওপরে উঠেছে। শিবু তেতলার ছাদ পর্যন্ত ওঠার পরই কাট। তারপর ছাদ থেকে ক্যামেরা শিবুকেই ধরে প্যান করে টঙের ঘরের ভেতর। সেখানে পাতা তক্তপোশের ওপর গৌর ও আমি বসে অবাক হয়ে শিবুর দিকে তাকাচ্ছি আর ঘনাদা ওই তক্তপোশেরই অন্য প্রান্তে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটি ছোট আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করছেন।

পরের শট-এ অ্যাকশন, মানে যাকে বলে খেল শুরু।

"ব্যাপার কী!" শিবুর বিমূঢ় জিজ্ঞাসা, "বাহাত্তর নম্বরটা হাসপাতাল হয়ে উঠল নাকি?"

"হাসপাতাল? সে আবার কী?" গৌর ও আমি উঠে কি দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন!

"হাসপাতাল না হলে এত ডাক্তার-বদ্যি, যন্তরপাতির আমদানি কেন?'

আড়চোখে ঘনাদার দিকে তখন একবার তাকিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে।

না, শিবুর ভগ্নদূতের পার্টটা একেবারে বিফলে যায়নি, ঘনাদার নিজের মুখ নিরীক্ষণ করায় একটু ছেদ পড়েছে। মুখটা না হলেও কানটা এদিকে ফেরানো।

তারস্বরে এবার তাই বিমূঢ় বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়েছে। "ডাক্তার-বদ্যি, যন্ত্রপাতি আসছে বাহাত্তর নম্বরে? কী বলছিস, কী! মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর!"

"মাথা খারাপ হওয়ার অপরাধ কী?" শিবুর ক্ষুব্ধ স্বর—"চেয়েই দেখো-না একবার।"

সেই চেয়ে দেখার পর চক্ষুস্থির না হয়ে পারে? সিঁড়ি দিয়ে যেন মিছিল করে যাঁরা উঠে আসছেন তাঁদের পরিচয় সাজ-সরঞ্জামেই অনেকখানি মালুম।

"এটা কি মি. দাসের ঘর?" প্রথম জনের জিজ্ঞাসা, তাঁর হাতের ব্যাগটার মর্ম যদি প্রথমে না-ও বোঝা যায়, গলায় ঝোলানো স্টেথিস্কোপটা ভুল করবার নয়।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বলে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাই নিজেদের বিস্মিত কৌতূহলটা প্রকাশ করেছি, "কিন্তু আপনি?"

"আমি ডাক্তার সোম।" গম্ভীরভাবে যেন আমাদের বকুনি দিয়ে বলছেন ভদ্রলোক, "মি. দাসের প্রেশার নিতে এসেছি।"

"কী নিতে এসেছেন?" প্রশ্নটা সবিস্ময়ে করে ফেলার পর আমাদের হাঁ-করা মুখগুলো যেন আর বোজাবার অবসর মেলেনি।

প্রেশার যিনি নিতে এসেছেন তাঁর পেছনে ব্যাগ হাতে আর-এক মূর্তি আর এ দুজনের পেছনে বাহকের মাথায় ছোটখাটো একটা যন্ত্রাগারের নমুনা চাপিয়ে অন্য একজন।

আমাদের অনুচ্চারিত প্রশ্নগুলো যেন অনুমান করে নিজেরাই তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেশার নেবার জন্য যিনি আগে ঢুকেছেন তাঁর পরের জন আমাদের যেন আশ্বস্ত করবার সুরে বলেছেন, "ভাবনার কিছু নেই। আমি শুধু একটু রক্ত নেব।"

"অ্যাঁ! রক্ত নেবেন? ঘনাদার?"

আমাদের সম্মিলিত আর্তনাদের ওপরই তৃতীয় জন যেন বরাভয় দেবার মতো করে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন, "আমার কার্ডিয়োগ্রাম।"

ভ্যাবাচাকা ও ভয়ে-কোঁকড়ানো চেহারা নিয়ে ওরই মধ্যে ঘনাদার দিকে একবার চেয়ে দেখে নিয়েছি।

হ্যাঁ, ওষুধ ধরেছে বলেই মনে হচ্ছে। ঘনাদা অন্তত আর্শিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ঘরের দেওয়ালের কেরোসিন কাঠের শেলফে সেটা রেখে যেভাবে কী খোঁজাখুঁজি করবার ভান করছেন সেটা দিশাহারা অবস্থাটা ঢাকবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বোধহয় নয়।

চিকিৎসা-জগতের তিন প্রতিনিধির তখন ঘরের ভেতরে ঢুকে কোনও অস্বস্তি কি আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই, যেন নিত্যই এখানে আসেন-যান এমনই স্বচ্ছন্দে নিজেদের মধ্যে তাঁরা একটা আপস করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই।

“আপনি রক্তটা আগে নিন ড. গুপ্ত!” প্রেশার মাপার সোম সৌজন্য দেখিয়েছেন রক্ত নেবার গুপ্তকে।

“না, না, তা কি হয়!” গুপ্ত পাল্টা বিনয় দেখিয়েছেন, “আপনার প্রেশার আগে।”

‘আপ উঠিয়ে’ ভদ্রতা মিনিট দশেক ধরে চলেছে তারপর।

বিনয়ের পাল্লা দুজনের কেউ হারতে না চেয়ে প্রেশারের সোম আর রক্তের গুপ্ত শেষ পর্যন্ত হৃদয়কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

“আপনিই কার্ডিয়োগ্রামটা আগে করে ফেলুন ড. সান্যাল।” সমস্বরে অনুরোধ জানিয়েছেন সোম আর গুপ্ত।

“বেশ তাই।” এ সম্মানে যেন বেশ বিব্রত হয়ে ড. সান্যাল তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে তাঁর যন্ত্রপাতি খাটাবার তোড়জোড় শুরু করেছেন।

এ নাটক যখন চলছে তখন আমরা তো ভোম মেরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন সেই ঘনাদা করছেন কী এতক্ষণ ধরে!

ওযুধের কাজও এতক্ষণে শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। তার লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঘনাদা তখনও শেলফটার এ-তাক ও-তাক ঘাঁটাঘাঁটিতেই যেন তন্ময়। তাঁর ঘরে এত বড় একটা উপদ্রব যে চলেছে সে বিষয়ে যেন হুঁশই নেই।

আচ্ছা, হুঁশ হয় কি না দেখা যাক।

এখনও পর্যন্ত বড়ে-ঘোড়া-গজের চালই চলেছে। নৌকো, আর তারপর দাবার চালটা এবার পড়ুক।

নৌকার চালটা কার্ডিয়োগ্রামের সান্যালই দিলেন। মধুর কণ্ঠে জানালেন, “আপনাকে এবার একটু শুয়ে পড়তে হবে, মি. দাস!”

আমরা একদৃষ্টিতে তখন ঘনাদার দিকে তাকিয়ে। বুকের ধুকধুকুনিটা বেড়ে গেছে।

কী করবেন এবার ঘনাদা? এইবার কি ফাটবেন?

না, সলতে ঠিক যেন ধরল না। চালটা বুঝি ভেস্তেই গেল। বিস্ফোরণের বদলে ঘনাদা এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে প্রথম যেন তাঁর ঘরের অনধিকার প্রবেশের ভিড়টা লক্ষ করলেন। তারপর অতি সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, “শুয়ে পড়তে হবে?”

এ সরল জিজ্ঞাসার মানে, নৌকোর চালটা ফসকেছে। তা ফসকাক, এরপর মোক্ষম দাবার চাল যা আছে, ববি ফিসার হয়েও তা সামলাতে পারবেন না।

সেই দাবার চালই এবার পড়ল। একেবারে যেন সেকেন্ডের কাঁটা মিলিয়ে শিবুর চেয়েও অস্থিরভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে শিশিরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ।

কার্ডিয়োগ্রামের সান্যাল ঘনাদার সরল জিজ্ঞাসার জবাবে যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না।

“সে কী! আপনারা করছেন কী?” শিশির এসেই একেবারে সকলের ওপর খাপ্পা। “এখনও শুধু গজল্লা করছেন?”

“আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছ কী?” শিশির আমাদেরও রেহাই দিলে না, “হাঁ করে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ?”

“আমরা, মানে” আমরা যেন লজ্জিত হয়ে নিজেদের অসহায় অবস্থাটা বোঝাবার

চেষ্টা করলাম, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এই এত ডাক্তার-বদ্যি যন্ত্রপাতি কেন?"

"কেন?" শিশির আমাদের বুদ্ধির জড়তা আর স্মৃতিশক্তির অসাড়তায় যেন স্তম্ভিত—"এ ঘরে কেন এত ডাক্তার-বদ্যি জিজ্ঞেস করছ তোমরা? কিছুই তোমরা জানো না? গোনা-গুনতি এই তিন জন ডাক্তারকে দেখেই বিরক্ত হচ্ছ? এখনও তো আর সবাই এসেই পৌঁছননি?"

"আরও কেউ কেউ আসবেন নাকি?" শিবুর শঙ্কিত বেফাঁস প্রশ্ন।

"বাঃ, আসবেন না?" শিশির আমাদের অজ্ঞতাকে যেন তিরস্কার করলে, "ই-এন-টি মানে ইয়ার-নোজ-থ্রোট, আই স্পেশ্যালিস্ট, ডার্মাটোলজিস্ট, কিরোপডিস্ট, এক্স-রে ফটোগ্রাফার, মায় সাইকোঅ্যানালিস্ট পর্যন্ত আসছেন। এঁরা কেন আসছেন এখনও জিজ্ঞাসা করতে চাও? বলতে চাও যে অতবড় গুরুতর ব্যাপারটা ভুলেই গেছ? কী হয়েছিল মনেই পড়ছে না?"

"না, না, পড়ছে পড়ছে।" আমরা যেন হঠাৎ স্মরণশক্তি ফিরে পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম, "আমাদের খুব দেরি হয়ে গেছে কিন্তু। সেই আগের হপ্তা থেকে ঘনাদার শরীর খারাপ, আর আমরা চুপ করে বসে আছি।"

"চুপ করে বসে আছি!" শিশির এবার আমাদের ওপর চটল। "চুপ করে থাকলে এঁরা সব এলেন কোথা থেকে! সেই শনিবার থেকেই এই ধান্ধায় লেগে আছি। ঘনাদার একেবারে থরো চেকিং না করিয়ে ছাড়ব না।"

যাঁর উদ্দেশে এত বড় নাটক তিনি এই মোক্ষম চালে কুপোকাত না হয়ে যাবেন কোথায়?

তাঁর দিকে ফিরে অত্যন্ত যেন কুণ্ঠিত হয়ে শিশির এবার মিনতি জানাল, "আপনার ওপর একটু অত্যাচার করব, ঘনাদা।"

"বেশি কষ্ট অবশ্য দেব না।" আশ্বাসও দিলে তারপর, "এই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এঁদের যা করবার এঁরা সেরে ফেলবেন।"

"বেশি কিছু তো নয়।" শিশির ভরসা দেবার কারণগুলো ব্যক্ত করলে, "আপনার প্রেশার উঠছে না নামছে হাত বেঁধে একটু দেখা, হৃৎপিণ্ডটায় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কি না ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রামে তার একটা ছাপ নেওয়া, শরীরের ভেতরের কলকবজা হাড়গোড়ের গলদ ধরবার জন্যে এক্স-রে ফটো তোলা, আর চিনি কোলেস্টেরল ইউরিয়া ঠিক মাপ মতো আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য শিরা থেকে একটু রক্ত টেনে নেওয়া। তা-ও বড়জোর পো খানেক।"

"পো খানেক!" আমরা রিহার্সেল মাফিক যথারীতি শিউরে উঠলাম—"পো খানেক রক্ত নেবে?"

"হ্যাঁ, নেবে তো হয়েছে কী?" শিশির আমাদের ধমকালে, "ঘনাদা কি দুধের বাচ্চা যে পো খানেক রক্ত দিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে যাবেন? এই রক্তটুকু থেকে কাজ কী হবে ভাবো দেখি? সব কিছু পুরো পরীক্ষার পর ডাক্তারদের আর আন্দাজে ঢিল ছুড়তে হবে না। রোগের জড়টি নির্ভুলভাবে ধরে উপড়ে ফেলে দেবেন।"

"এঁরা তা হলে কাজ শুরু করুন, কী বলেন?" শেষ অনুমতি-ভিক্ষাটা ঘনাদার কাছে।

আমরাও তখন উৎসুকভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে। মেগাটন গোছের কিছু একটা ফাটবে আমাদের আশা।

ঘনাদা তখনও অবশ্য শেলফের কাছেই দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট একটা কাগজের পুরিয়া বলেই মনে হল। এত শেলফ ঘাঁটাঘাঁটি করে এইটিই বার করেছেন নাকি!

তা যাই করুন, ওই কাগজের পুরিয়া এ সংকট থেকে তো তরাবে না! যে বেড়াজালে ঘেরা হয়েছে, তা কেটে বেরুতে, হয় হার মেনে নাকে খত দিতে হয়, না হয় বোমার মতো ফাটতেই হবে।

আর তা হলেই যে জ্বালায় এই ক-দিন উনি আমাদের জ্বালাচ্ছেন সব তার শোধবোধ।

কিন্তু কই? নরম গরম কোনও লক্ষণই যে দেখা যাচ্ছে না।

সেই যে বলে অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর—তাই হয়ে গেলেন নাকি! আমাদের আর ডাক্তারদের নিয়ে সপ্তরথীর বেষ্টনে একেবারে ভ্যাবাচাকা ভোম!

একটু উসকে দিতে হল তাই।

"আর দেরি করবেন না, ঘনাদা! ডাক্তারবাবুরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। রোগটা যখন আপনার অমন বেয়াড়া, তখন হদিস পেতে এসব পরীক্ষা তো না করালে নয়।"

"পরীক্ষা করাতেই তোমরা বলছ?" ঘনাদা যেন নেহাত সরলভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর দেব কী, বুকের ধুকপুকুনি তখন বেড়ে গিয়ে আমরা চোখে প্রায় অন্ধকার দেখছি। এত মাথা খাটিয়ে সাজানো এত কষ্টের আয়োজন এমনই করে পণ্ড হবে নাকি? ঘনাদা অকুতোভয়ে সব পরীক্ষায় রাজি হয়ে আমাদের উলটো ফ্যাসাদে ফেলবেন?

"করো কার্ডিয়োগ্রাম, নাও রক্ত" বলে ঘনাদা যদি এখন এক কথায় তাঁর তক্তপোশে গিয়ে শুয়ে পড়েন তা হলে কেলেঙ্কারির যে কিছু আর বাকি থাকবে না। ডাক্তার সাজিয়ে যাদের আনা হয়েছে তারা যে সব জাল। হাতের শিরা থেকে রক্ত নিতে গেলে নিজেরাই ভির্মি যাবে। রক্ত নেওয়া তো দূরের কথা, প্রেশার মাপবার যন্ত্রের টিউবটাও যে তারা বাঁধতে জানে না।

আগের শনিবার থেকে অসুখের ছুতো করে এ ক-দিন ঘনাদা যা জ্বালাচ্ছেন তারই শোধ হিসেবে ঘনাদাকে একটু শিক্ষা দিতে সবাই মিলে এই ফন্দিটি এঁটেছিলাম।

যেমন অসুখ বলে ঘনাদা আমাদের সব উৎসাহে এ ক-দিন জল ঢেলেছেন, তেমনই তাঁর চূড়ান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাই করেছি। নিজেদের নয়, বেপাড়ার থিয়েটার ক্লাব থেকে ডাক্তার সাজবার লোক এনেছি ভাড়া করে, তাদের দু-চারটে বোল-চালই শেখানো হয়েছে,ঘনাদাকে ভড়কে দেবার জন্য।

কিন্তু এখন সব কিছুই যে যায় ভণ্ডুল হয়ে। শুধু ভণ্ডুল নয়, আমাদের অস্ত্রই বুমেরাং হয়ে আমাদের ওপর চড়াও হবার উপক্রম! তা হলে উপায়?

উপায় নেই। তবু উলটো গাওয়া শুরু করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

"পরীক্ষার ঝামেলা অবশ্য বড় কম নয়।" আমি যেন খুঁত না ধরে পারি না। "ডাক্তারদের তো মায়া-দয়া নেই—পরীক্ষার নামে কাটা-ছেঁড়া বাঁধা-ছাঁদা ফুটো করে একেবারে জান কয়লা করে দেবে।"

"ঠিক বলেছ।" শিবুর পোঁ ধরতে দেরি হল না—"রোগের চেয়ে চিকিচ্ছের জ্বালা বেশি।"

"আমি হলে তো এখুনি বিদেয় করে দিতাম।" গৌর শিশিরের ওপরই যেন গরম হল—"শিশিরের যেমন বুদ্ধি!"

"না, না, শিশিরের দোষ কী?" আমাদের সকলকে থ করে শিশিরের ওকালতি করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং ঘনাদা।

বুমেরাং-এর মার এড়াবার আশা তখন ছেড়েই দিয়েছি। বিশেষ করে ঘনাদা শিশিরের সপক্ষে যা যুক্তি দিলেন তাতে। "ও তো অন্যায় করেনি", ঘনাদা শিশিরকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন, "রোগটা যেখানে বাঁকা আর বেয়াড়া সেখানে তার হদিস পেতে পুরো পরীক্ষাই তো করা দরকার।"

এরপর আর কী আমাদের করবার থাকতে পারে!

হাল ছেড়ে দিয়ে শেষে বেইজ্জতির জন্য যখন তৈরি হচ্ছি, তখন ঘাটের কাছে এসে ডুবতে ডুবতে নৌকো আবার ভাসল।

ভাসালেন ঘনাদা নিজেই। শিশিরকে আপাতত ঠেকো দিয়ে বাঁচিয়ে তিনি যা বললেন তাতে অকূলে কূল পেয়ে আমাদের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

ধড়ে প্রাণটা ফিরলেও মাথায় কিন্তু তখন চরকি পাক লেগেছে। লেগেছে ঘনাদার কথাতেই।

"পরীক্ষার জন্য এঁদের সব ডাকিয়ে ভালই করেছে শিশির।" ডাক্তার সাজা তিন মূর্তির দিকে যেন অভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঘনাদা, "কিন্তু এই পুরিয়াটা পেয়ে গেলাম কিনা!"

পুরিয়া? তার মানে? ও পুরিয়াটা আবার কীসের? তা পেয়ে হলটা কী?

গলার আওয়াজে নয়, আমাদের, মায় সাজা-ডাক্তারদের হতভম্ব মুখের দৃষ্টিতেই কাতর প্রশ্নগুলো ফুটে উঠল।

সে দৃষ্টি দেখেই বুঝি সদয় হলেন ঘনাদা। একটু বিশদ হয়ে জানালেন, "পুরিয়াটা যখন পেয়ে গেছি তখন পরীক্ষা-টরিক্ষার আর দরকার নেই।"

"ওই পুরিয়া পাওয়ার জন্যই আর দরকার নেই?" বিমূঢ় বিস্ময়টা নবাগতদের মধ্যে ব্লাডপ্রেশারের গলাতেই সরবে প্রকাশ পেল।

"ওই পুরিয়াই তা হলে মুশকিল আসান?" কার্ডিয়োগ্রামের বিস্ময়ে যেন একটু সন্দেহ মেশানো।

"পুরিয়াটা কীসের?" রক্ত-পরীক্ষকের প্রশ্নে স্পষ্ট যেন অবিশ্বাসের সুর। আমরা তখন

আবার প্রমাদ গনতে শুরু করেছি। ভাগ্যের জোরে অনুকূল হাওয়া সবে যখন বইতে আরম্ভ করেছে, তখন এই ডেকে-আনা আহম্মকগুলো দেয় বুঝি সব বানচাল করে।

শিশির তাড়াতাড়ি তাল সামলাতে তাই বলেছে, "পুরিয়ায় নিশ্চয়ই আছে আসল মৃগনাভি। একেবারে তিব্বত থেকে আনা।"

"না, না, মৃগনাভি কেন হবে!" শিবু শিশিরের ওপর টেক্কা দিয়েছে, "পুরিয়ায় আছে সূচিকাভরণ, আসল শঙ্খচূড়ের বিষ ছেঁকে তৈরি। ছুঁচের ডগায় ঠেকালেই মরা-মানুষ চাঙ্গা—"

"উঁহুঁ। সূচিকাভরণ নয়।" আমি গুরুগম্ভীর গলায় বলেছি, "পুরিয়ায় আছে জিন-সেঙ। নেপালের নিরেস রিন-সেন নয়, সাইবেরিয়ার টাইগা থেকে তোলা আসল মাল। একরত্তি পেটে গেলে কাটা মুণ্ডু জোড়া লাগে! তাই না, ঘনাদা!"

নাগাড়ে মাঠ-ফাটানো খরার পর আকাশে কোদালে-কুড়ুলে মেঘের দিকে চাষি যেমন করে চায় তেমনই করে ঘনাদার দিকে চেয়েছি এবার।

বিফলও হয়নি সে চাওয়া।

"না।" ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনই অনুকম্পাভরে আমাদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলেছেন ঘনাদা, "মৃগনাভি, সূচিকাভরণ, জিন-সেঙ, কিছুই নয়।"

"তবে?" আমরা যেন বিমূঢ় বিহ্বল।

"পুরিয়াতে আছে," ঘনাদা একেবারে মাপা এক সেকেন্ডের নাটকীয় ছেদ দিয়ে বলেছেন, "শুধু একটু ছাই!"

॥ দুই ॥

"ছাই!"

"ওই এক পুরিয়া ছাই দিয়ে সব অসুখ সারাবেন!"

"যে বেয়াড়া রোগের জড় খুঁজতে গোটা একটা হাসপাতালের পরীক্ষা লাগে, ওই ছাই-ই তার দাওয়াই?"

"আপনার হাতে ওই ছাইটুকু দেখে সে রোগবালাই হাওয়া!"

"ধুলোপড়া তো জানি, এ আবার ছাইপড়া নাকি?"

"ছাইটা কীসের? সোনাভস্ম? মুক্তোভস্ম?"

ঘনাদার মুখে ছাই কথাটা শোনবার পর মিনিট দুয়েক কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা অবশ্য সরেনি। ওপরের বিস্ময় উচ্ছ্বাস বিদ্রূপ সব তার পর থেকে শুরু। তার আগে হাঁ-করা মুখগুলো বোজানোই শক্ত হয়েছে।

বিস্মিত জিজ্ঞাসায় শুরু হয়ে মন্তব্যগুলো যখন বাঁকা টিপ্পনির দিকে যাবার উপক্রম করছে, ঘনাদা তখনই মুখ খুললেন।

বললেন, "না, সোনাভস্ম নয়, নেহাত সাদাসিধে কাঠপোড়া ছাই।"

"ওই কাঠপোড়া ছাই আপনি পুরিয়া করে ঘরে রাখেন? আর তার জোরে বলছেন ডাক্তার-বদ্যি সব বিদেয় করে দিতে?"

"মন্ত্রপড়া ছাই তা হলে বলুন?"

"না, মন্ত্রপড়া নয়।" ঘনাদা নির্বোধের বেয়াদপি ক্ষমা করে জানালেন, "তবে কাজ করে মন্ত্রের মতোই। তা না হলে বুকের যা রোগ হয়েছিল তাতে সেই লাল বালির রাজ্য থেকে কি আর ফিরতে পারতাম! সেখানেই কবর নিতে হত।"

"অমন বুকের রোগ নিয়ে বেঁচে ফিরলেন শুধু ওই কাঠছাইয়ের দৌলতে? অসুখটা কী, ঘনাদা?" আমরা অত্যন্ত উৎসুক।

"ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি নষ্ট হয়ে কার্ডিয়াক রিদ্‌ম্ কেটে যাওয়া। অর্থাৎ হৃদয়ের বৈদ্যুতিক বাহিকা শক্তি দুর্বল হওয়ার দরুন হৃদয়স্পন্দনের ছন্দপতন ঘটা—"

"বুঝেছি! বুঝেছি!" মূলের চেয়ে গোলমেলে টীকা থামাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলতে হল, "কিন্তু রোগটা হয়েছিল কোথায়? রাঙা বালির রাজ্য বলছেন, জায়গাটা রাজস্থান নাকি?"

"না, না, আর একটু দূর!" ঘনাদা আমাদের একটু বুঝি হদিস দিতে চাইলেন।

"তা হলে টাকলামাকান?" শিবু তার অনুমানটা জানালে।

"উঁহু," গৌরই সংশোধন করলে শিবুকে, "আর একটু দূর যখন বলেছেন তখন নিশ্চয় সাহারা। তাই না, ঘনাদা?"

"না, সাহারা নয়।" ঘনাদাকে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় গৌরকে হতাশ করতে হল, "জায়গাটার আবার ঠিক নামও নেই। 'নোডস গরডি আই' বলে কেউ কেউ—তার বদলে আমিই একটা নাম দিয়েছিলাম—ধাঁধিকা।"

"আপনি নাম দিয়েছিলেন ধাঁধিকা!" আমরা তাজ্জব—"এ আবার কী নাম?"

"আচ্ছা নাম যা-ই দিন, জায়গাটা কোথায়? কত দূর?"

"দূর?" ঘনাদা যেন মনে মনে হিসেব করবার জন্য একটু সময় নিলেন, "হ্যাঁ, খুব কম করে ধরলে, মোটামুটি কিলোমিটারের হিসেবে হবে—"

ঘনাদাকে কথাটা আর শেষ করতে হল না।

এমন একটা মৌকা পেলে ছাড়া যায়!

নিলেম ডাকের মতো আমরা তখন ডাকের পাল্লা শুরু করে দিয়েছি।

"মোটামুটি কিলোমিটারের হিসেবে" বলে ঘনাদা থেমেছিলেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কথার শেষ ফাঁকটুকু ভরাট করতে গৌর হাঁকল, "দশ হাজার।"

"ত্রিশ", শিবু একলাফে এগিয়ে চলল।

"চল্লিশ হাজার," হাঁক দিলাম আমি। আমিই বা পিছিয়ে থাকব কেন?

কিন্তু আমার অমন এগিয়ে যাওয়া কি ওদের সয়! হিংসের জ্বালায় শিবু একটু মুখ বেঁকিয়ে বললে, "কত? চল্লিশ হাজার?"

"হ্যাঁ! চল্লিশ হাজার," আমি চেপে ধরে রইলাম গোঁ, "তোমরা ইচ্ছে করলে বাড়তে পারো!"

"বাড়বে কোথায়," শিবুর হাসিটা বড় বেশি বাঁকা। "গোটা পৃথিবীর পরিধি কত জানিস? জানিস তার ব্যাস কত?"

এটা কি ঠিক ধর্মযুদ্ধ হল? এমন অন্যায় ল্যাং মারা কি এ খেলা-সই? হাতাহাতি লড়াইয়ে কচুকাটা হয়ে আকাশ থেকে বোমা মেরে বাঁধ ভাঙা! এমন অধর্মের খোঁচার যা অব্যর্থ পালটা মার তা-ই দিলাম। সবজান্তার ভঙ্গি করে মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই জানিস? না জানিস তো ভূগোলটা আর একবার দেখে আয়।"

এই এক জবাবেই যার কাবু হবার কথা সেই শিবুর হঠাৎ হল কী? মুখে আমার চেয়েও দু ডিগ্রি চড়া বিদ্রূপের হাসি মাখিয়ে সে বললে, "ভূগোল দেখতে যেতে হবে না। আমার মুখেই শুনে নে। পৃথিবীর কোন দিকের ব্যাস চাস?"

কোন দিকের? প্রশ্নটা মনে মনে তখন নিজেকেই করেছি। ব্যাসই জানি না, তার কোন দিকের আবার কী?

কিন্তু ভাঙতে হয় ভাঙব, মচকালে চলবে না।

একেবারে যেন মনুমেন্টের ওপর থেকে তাকে কৃপাভরে নিরীক্ষণ করে বললাম, "যে দিক জানিস সেই দিকটাই বল-না।"

ব্লাডপ্রেশার সোম আর কার্ডিয়োগ্রাম সান্যালদের তখন কিন্তু আর ধৈর্য ধরছে না!

"কী বাজে তর্ক লাগিয়েছেন!" রক্ত পরীক্ষার গুপ্ত একটু ঝাঁঝিয়েই বললেন, "পৃথিবীর ব্যাস আর পরিধি শুনতে এসেছি নাকি? মি. দাস কোথাকার কোন মরুভূমির কথা বলছিলেন, আর তার মধ্যে—"

"ঠিক আছে!" ঘনাদাই বাধা দিয়ে যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন আমাদের কথা শুনে, "হ্যাঁ, পৃথিবীর ব্যাসের কথা কী যেন বলছিলেন?"

"বলছিলাম পৃথিবীর দুদিকের দুরকম ব্যাসের কথা! দুই মেরুর দিক থেকে পৃথিবীর ব্যাস যা বিষুবরেখার দিক দিয়ে তো তা নয়। বিষুবরেখার দিক দিয়ে ব্যাস হল বারো হাজার ছ-শো একাশি দশমিক ছয় কিলোমিটার।"

শিবুর হঠাৎ হল কী! তার জিভে স্বয়ং সরস্বতী হঠাৎ ভর করেছেন মনে হচ্ছে। ঘনাদারও চক্ষুস্থির করে ছাড়ল বোধহয়।

অবস্থা আমার তখন বেশ কাহিল। তবু রোখ ছাড়লাম না! ঘনাদার নকল করা একটু হাসি হেসে বললাম, "তা খুব তো মুখস্থ করেছিস বুঝতে পারছি। কিন্তু তাতে হলটা কী?"

"হল এই যে, তোমার মাথাটি একেবারে নিরেট বলে প্রমাণ হয়ে গেল!"

গায়ে যেন বিচুটি লাগানো এ-মন্তব্যটি শিবুর নয়, শিশিরের। শেষকালে শিশিরও শিবুর দলে গেল!

বিচুটির জ্বালাতেই যেন চিড়বিড়িয়ে উঠলাম তাই। "সরেস মাথাওয়ালাদের ব্যাখ্যাটা তা হলে একটু শুনি না। কোথায় আমি হড়কেছি একটু দেখি।"

"তা দেখতে গেলে একটু ধারাপাত জানা যে দরকার।"—শিবুর এখনও সেই খোঁচানো গলা—"পৃথিবীর ব্যাস যা বললাম তাতে তার বিষুবরেখার বেড় হয় কত? তিনগুণ করলে দাঁড়ায় আটত্রিশ হাজার চুয়াল্লিশ দশমিক আট কিলোমিটার। যে-কোনও বৃত্তের বেড় তার ব্যাসের মোটামুটি তিন গুণ তা আশা করি জানিস?"

"হ্যাঁ, মোটামুটি তিন।"

অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম মন্তব্যটা স্বয়ং ঘনাদার।

লজ্জায় যখন সত্যিই অধোবদন হবার অবস্থা তখন বিপদ-তারণ শ্রীমধুসূদনের মতোই তাঁর এক-একটি টিপ্পনিতে তখনকার মতো হাওয়াটা অন্তত ঘুরল।

কিন্তু শিবু কি সহজে ছাড়ে? এমন একটা বারফট্টাই-এর মৌকা তো রোজ আসে না। ঘনাদার সঙ্গেই তাল দিয়ে ভারিক্কি চালে বললে, "হ্যাঁ, মোটামুটি তিন মানে, তিনের পর এক, চার, এক নিয়ে ক-টা দশমিক আছে?"

"ক-টা নয়, অগুনতি!"

জয় দর্পহারী মধুসূদন! ঘনাদার গলা দিয়েই তিনি ফোড়নটি কেটেছেন।

শিবু কি একটু ভড়কাল? বাইরে অন্তত নয়। ঘনাদাকেই যেন শিখিয়ে দেবার জন্য বললে, "হ্যাঁ, দশমিক এক, চার, এক-এর পর পাঁচ, আট, দুই নিয়ে আরও অনেক সব সংখ্যা আছে।"

"দশমিক এক, চার, এক-এর পর পাঁচ, আট, দুই, নয়," ঘনাদা শুধু শিবুকেই যেন লক্ষ্য করে গড় গড় করে বলে গেলেন, "পাঁচ, নয়, দুই নিয়ে অঙ্কের মিছিল আছে বলা যায়। পাঁচ, নয়, দুই-এর পর ছয়, পাঁচ, তিন—"

ঘনাদা একটু থেমে আমাদের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, "আরও শুনবে? ছয়, পাঁচ, তিন-এর পর পাঁচ, আট, নয়—তারপর সাত, নয়, তিন, তারপর দুই, তিন, আট, চার, ছয়—"

আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি," শিবুই তার মধ্যে প্রথম অস্থির হয়ে উঠে ঘনাদাকে থামালে, "কিন্তু দশমিকের লেজুড় যত লম্বাই হোক, তা দিয়ে পৃথিবীর ব্যাসকে গুণ করলে বড়জোর আটত্রিশ হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশি হলেও চল্লিশ হাজারে তো পৌঁছয় না। চল্লিশ হাজার কিলোমিটার শুনে তাই হাসছিলাম! সোজা অতদূর যেতে হলে তো এ পৃথিবীতে কুলাবে না।"

"তা কুলাবে না বটে!" ঘনাদা এবার শিবুর কথায় যেন বাধ্য হয়ে সায় দিয়ে বললেন, "আরও বেশি দূর হলে তো নয়ই। আমার সে ধাঁধিকা আবার কমপক্ষে আট কোটি কিলোমিটার।"

"কত!" ভুল শুনেছি কি না জানবার জন্যই বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করতে হল। আমাদের গলাগুলো সব তখন প্রায় ধরে এসেছে।

না, ভুল শুনিনি।

ঘনাদা স্পষ্ট স্বরেই সংখ্যাটা আবার জানালেন, "আট কোটি কিলোমিটার।"

॥ তিন ॥

দুবার ঘনাদার মুখে আট কোটি কিলোমিটার শোনবার পর আর কিছু বলতে হয়! তক্তপোশের এধার-ওধারে যে যেখানে পারি তখন চেপে বসে গেছি! ব্লাডপ্রেশার

সোম, কার্ডিয়োগ্রাম সান্যাল আর ব্লাডটেস্ট গুপ্তও বাদ যায়নি।

আমাদের সকলেরই একরকম জায়গা হয়েছে, কিন্তু ঘনাদা? ঘনাদা বসবেন কোথায়? তাঁর কথা কি কেউ ভাবেনি?

যে ভাবার সে ঠিকই ভেবেছে।

আট কোটি কিলোমিটার শোনবার পরই গৌরকে আর যে দেখতে পাওয়া যায়নি সে খেয়াল আমাদের বিশেষ ছিল না।

এইবার সগর্বে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখা গেছে। সঙ্গে তার বনোয়ারি, আর দুজনের সযত্নে ধরে বয়ে আনা দোতলার আড্ডাঘরের সেই মার্কামারা আরাম-কেদারা, ঘনাদার যা মৌরসি।

"এটা আবার বয়ে আনতে গেলে কেন?" কেদারাটা গৌর বেশ জুত করে পাতবার সময় ঘনাদা মৃদু একটু আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু বসতে ক্রুটি করেননি।

শিশির অবশ্য তার আগে থাকতেই এক পায়ে খাড়া। ঘনাদা আরাম-কেদারায় কাত হতে-না-হতে হাতের টিনটা বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দিকে আর সিগারেটটা তিনি মুখে তোলার আগেই লাইটার জ্বেলে ধরতে এক সেকেন্ড দেরি করেনি।

পুজোর ব্যবস্থাটা যোড়শোপচারেই তৈরি। দোতলা থেকে শুধু আরাম-কেদারাই আসেনি, নীচে রামভুজের কাছে হুকুম চলে গেছে। বনোয়ারি ওপর থেকে চেয়ার রেখে নামবা মাত্রই যেন ফুটন্ত কড়ায় মাংসের শিঙাড়া ছাড়তে শুরু করে। ভাজা শিঙাড়ায় যতক্ষণ প্লেট বোঝাই হবে ততক্ষণে বনোয়ারি দুপুর থেকে এনে রাখা তোতাপুলিগুলো ছোট ডিশে সাজিয়ে ফেলবে।

ওসব নৈবিদ্যি বাদে ধুপধুনো হিসেবে শিশিরের সিগারেট জ্বালানো তো আগে থেকেই শুরু হয়েছে।

এখন দেবতা শুধু প্রসন্ন হলেই হয়।

লক্ষণগুলো এখন শুভই মনে হচ্ছে।

ঘনাদা সিগারেটে খুদে খুদে টান থেকে একেবারে রামটানে পৌঁছে প্রায় মানোয়ারি জাহাজের মতো ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমরা কিন্তু তখন নিশ্বাসটা ছাড়তেও একটু দ্বিধা করছি, ঘনাদার আট কোটি কিলোমিটারের পাড়িটা পাছে ভেস্তে না যায়।

আট কোটি কিলোমিটারের আশা দিয়ে ঘনাদা আজকের সন্ধ্যাটাও কি আমাদের পার করে দেবেন না?

এখন দরকার শুধু একটু লাগসই উসকানির।

কেমন করে সেটা দেওয়া যাবে?

আমরা যখন ভেবে সারা তখন ঘনাদাই তার মৌকা করে দেন।

প্রেশার কার্ডিয়োগ্রাম আর ব্লাডটেস্টের সম্বন্ধে হঠাৎ যেন ভাবিত হয়ে উঠে বলেন, "এঁদের সব ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিলে। ডাকবার আগে একবার যদি আমায় জানাতে।"

এমনই একটা সুযোগের জন্যই ওত পেতে ছিলাম। পাওয়া মাত্র একেবারে

ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে বলি, "আজ্ঞে আপনাকে জানাব কী! আমাদের কি তখন মাথার ঠিক আছে! এক হপ্তা আপনি দোতলায় নামেননি!"

"তারপর রামভুজের মুখে শুনলাম, বুকের কী হয়েছে বলে এক বেলা মুরগির আর একবেলা নালির সুরুয়া খাচ্ছেন আর সব কিছুর সঙ্গে।"

"তাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যেখানে যাকে পেয়েছি সবরকম পরীক্ষার জন্য ডাকিয়ে এনেছি। তখন কি জানি যে আপনার নিজের কাছেই কাঠপোড়া ছাইয়ের ধন্বন্তরী আছে অমন!"

"আচ্ছা, ওই কাঠপোড়া ছাই", রিলে রেসের মতো আমি, শিবু ও শিশির পর পর কথার খেই টেনে নিয়ে যাবার পর গৌর শেষ চালটা দেয়, "ওটা আপনার সেই আট কোটি কিলোমিটারেই কাজে লেগেছিল বুঝি?"

তাইতেই বাজিমাত। আর *ঠেলাঠেলির* দরকার হয় না। চাকা আপনা থেকেই গড়িয়ে চলে।

"না।" ঘনাদাকে যেন একটু ভেবে নিয়ে বলতে হয়, "তখনও পুরো আট কোটি হয়নি। হঠাৎ 'পাথর! পাথর! একটা পাহাড়ের চাঁই।' বলে চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম! সেই সঙ্গে টের পেলাম বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করছে।

উত্তেজনা হওয়া তো আশ্চর্য কিছু নয়।

আটলান্টিকের মাত্র ছ-হাজার কিলোমিটারের অজানায় পাড়ি দেবার পর সান সালভাডোর-এর প্রথম ডাঙা দেখে কলম্বাস আর তাঁর নাবিকেরা যদি ধেই ধেই নৃত্য করে থাকেন, তা হলে আট কোটি কিলোমিটার মহাশূন্যে ছুটে এসে প্রথম ধরা-ছোঁয়ার মতো কঠিন কিছু একটার খবর শুনে উত্তেজনা কি তার চেয়ে কম হবে?

কিন্তু বুকের কষ্টটা যে শুধু উত্তেজনায় নয় তা বুঝতে দেরি হল না।

কোনও রকমে টলতে টলতে জানলাটায় গিয়ে তখন দাঁড়িয়েছি।

সুরঞ্জন তখনও পাগলের মতো হাত নেড়ে চিৎকার করছে, 'দেখেছেন? ওই দেখুন কী প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাংড়া! পেয়েছেন দেখতে?'

দেখতে খুবই পেয়েছি।

হ্যাঁ, পাথরের চাংড়া হিসেবে প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু তো নয়। মাপ যা মনে হল তাতে লম্বায় চওড়ায় বড় জোর পঁচিশ আর কুড়ি কিলোমিটার।

আমাদের যা বিপদ আর সমস্যা তা তো ওতে মিটবে না।

এইটুকুমাত্র আশা করা যায় যে অকূল সমুদ্রের জলে ফল-ভরা একটা গাছের ডাল ভাসতে দেখে কলম্বাস যেমন কাছাকাছি ডাঙার আশ্বাস পেয়েছিলেন, এই পাথরের চাংড়ায় তেমনই শূন্যমার্গের কোনও আশ্রয়ের ইঙ্গিত থাকতে পারে।

কিন্তু কোথায় সে আশ্রয়?

মহাশূন্যে প্রায় আট কোটি কিলোমিটার পার হয়ে কোথায় যে এসেছি কিছুই জানি না।

যার জানবার কথা সে[illegible]ন্মাদ লুটভিক-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তো তাকে

বাইরে রেখে এ কামরার দরজা এঁটে নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দি হতে হয়েছে। সঙ্গীর মধ্যে আছে ওই সুরঞ্জন আর নেহাত গোবেচারি বটুকেশ্বর।

মহাশূন্যের এই অজানা বিস্তারে আশ্রয় নেবার মতো জায়গা কি সত্যিই মেলা সম্ভব? আর মিললেও তাতে যে নামতে পারব, তার আশা কোথায়?

মোটা সাতপুরু কাচের জানলা দিয়ে পাথরের চাংড়াটা দেখতে দেখতে এসব ভাবনা ছাপিয়ে বুকের কষ্টটা ক্রমশ তখনও বাড়ছে।

একটু জল আনবার জন্য সুরঞ্জনকে বলতে গিয়ে দেখি বুকের ওপর হাত চেপে সে মেঝের ওপর বসে পড়েছে। 'কী হল কী?' বলে কোনওরকমে হাঁক দিলাম, 'বটুক! বটুক!'

কিন্তু সাড়া পেলাম না কারও।

নিজেরই তখন মেঝেতে একটু নেমে বসলে আরাম হবে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তার আগেই জ্ঞানটা লোপ পাবে নাকি! সেইরকম যেন লক্ষণ।

চমৎকার একটা সমাপ্তি! বসতে গিয়ে তখন ভাবছি, মহাশূন্যে পৃথিবী থেকে আট কোটি মাইল দূরে চারটি মানুষ। এমন করে বেঘোরে নিয়তি যাদের হিসেব চুকিয়ে দিতে যাচ্ছে, একজন তার মধ্যে লুটভিক-এর মতো উন্মাদ বৈজ্ঞানিক, একজন সুরঞ্জনের মতো গানের জগতের ভাবী দিকপাল, বটুকেশ্বরের মতো একজন মুখ্যুসুখ্যু গোবেচারা অনুচর, আর আমার মতো একজন অকর্মণ্য অপদার্থ সর্বঘটের কাঁঠালিকলা।"

ঘনাদার মুখে এমন আত্মনিন্দা!

সকলে মিলে সরবে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার তখন সময় নেই।

প্রতিবাদ তাঁর কানেও যেত কি না সন্দেহ।

তিনি তখন চোখ-কান সব সামনের ছাদের সিঁড়ির দিকে খাড়া করে বসে আছেন।

সেখানে হাতে প্রকাণ্ড ট্রে সমেত বনোয়ারিকে দেখা গেছে। তার পেছনে আর-একটা ছোট ট্রে নিয়ে রামভুজ।

ঘরে এসে নামাবার পর জোড়া ট্রের রহস্য বোঝা গেল । একটিতে মাংসের শিঙাড়া, অন্যটিতে তোতাপুলি।

"এসব আবার কেন হে?" ঘনাদা একটু যেন বৈরাগ্যের ভাব দেখালেন।

এমন একটা সুযোগ দিলে আর ছাড়া যায়।

"আমি তাই বারণ করেছিলাম ওদের!" শিশির যেন আমাদের সকলের ওপর খাপ্পা হয়ে শোনাল, "বলেছিলাম ঘনাদার হার্টের অসুখ। ওপর থেকে নীচে নামেন না, দুবেলা তাঁকে চাঙ্গা হতে সুরুয়া খেতে হচ্ছে, আর তাঁর জন্য এইসব বিষের ব্যবস্থা করছিস! তাঁকে কি ওই মাংসের শিঙাড়া আর তোতাপুলি দিয়ে লোভ দেখাতে চাস? তিনি কি টলবার মানুষ?"

"যা, নিয়ে যা সব ছাই পাঁশ!" শেষ হুকুমটা বনোয়ারিকে, "আমাদের গুলো রেখে ওঁর জন্য শুধু দুটো চিঁড়ে ভিজিয়ে নিয়ে আয়, আর তার যদি জোগাড় না থাকে তো দুটি থিন অ্যারারুট বিস্কুট।"

ঘনাদার মুখের দিকে চাইতেও তখন আর ভরসা হচ্ছে না।

তাঁর নিজের ফাঁদেই তাঁকে ফেলা হয়েছে, শুধু খেয়াল রাখতে হবে মাত্রাটা যেন না ছাড়ায়।

তাই ছাড়াবার উপক্রমই হল আমাদের ভাড়াটে সাজা-ডাক্তারদের আহম্মুকিতে।

কার্ডিয়োগ্রাম সান্যাল দুচোখ একেবারে কপালে তুললেন মায়ের চেয়ে মাসির দরদ দেখিয়ে।

"বলিহারি আপনাদের আক্কেল! হার্টের রুগি, আর তার সামনে ওই বিষগুলি শিঙাড়ার নাম করে ধরে দিয়েছেন?"

"সরিয়ে নিয়ে যান ওসব ওঁর সামনে থেকে! ওই অন্যায় লোভ আর দেখাবেন না ওঁকে।" প্রেশার সোম হুকুম করলেন সরোষে।

ঘনাদার হাতটা তখন প্লেটের কাছে নামতে গিয়ে থমকে আছে।

চোখে যেন দুর্যোগের লক্ষণ।

মাত্রা কি ছাড়িয়েই গেল নাকি?

তা যাক না। আমাদের মতো কৌঁসুলি তা হলে আছে কী করতে! ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, আবার টেনে তুলে, আবার ছাড়িয়ে আনাই তো আমাদের বাহাদুরি।

সেই বাহাদুরিই দেখাল শিবু।

"হাত গুটিয়ে আছেন কেন, ঘনাদা? খান আপনি।" শিবুর উদার উসকানি।

ঘনাদাকে আর দুবার বলতে হয়! প্লেট থেকে একটা গোটা শিঙাড়া এর মধ্যেই তিনি যথাস্থানে প্রেরণ করেছেন। সত্যি বলতে গেলে স্টপওয়াচ না থাকলে শিবুর মুখ থেকে প্ররোচনা খসা আর তাঁর নিজের মুখে শিঙাড়া প্রেরণ—কোনটা আগে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমাদের স্থূল চাক্ষুষ বিচারে প্ররোচনাটা প্রেরণের কাছে এক চুলের জন্য মার খেয়েছে বলেই যেন লাগল।

ওদিকে সাজা-ডাক্তাররা তখন একেবারে খাপ্পা।

"আপনারা জেনে শুনে মানুষকে খুন করছেন!"

"আপনাদের ক্রিমিন্যালি প্রসিকিউট করা উচিত।"

"ওঁকে ওই শিঙাড়া খাওয়ানোর মানে কী তা জানেন?"

"জানি।" গুরুগম্ভীর জবাবটা এবার শিবুর।

"জানেন!" ব্লাডটেস্ট গুপ্তর তিক্ত বিদ্রূপ, "কী জানেন?"

"জানি যে খাওয়া মানে হজম!" শিবু যেন গুরুমশাই।

"হজম তো পেটে!" কার্ডিয়োগ্রাম সান্যাল যুক্তির সাঁড়াশি চালালেন, "কিন্তু বুকে, মানে ওঁর হার্টে কী হতে পারে তা ভেবেছেন?"

"ভেবেছি।" শিবুর মুরুব্বি চালে মোক্ষম জবাব—"হার্টের কিচ্ছু হবে না। ওই কাঠপোড়া ছাই আছে কী করতে! ইচ্ছে করলে উনি একটা কেন, পাঁচটা প্লেট সাবাড় করতে পারেন।"

ঘনাদা শিবুর পরামর্শ আর কী করে ঠেলেন?

যথার্থই গুণে গুণে পাঁচটি প্লেট সাবাড় করবার পর যেন কর্তব্যবোধে তোতাপুলির

দিকে হাত বাড়ালেন।

তাঁর চোখে তখন যে ভাব দেখলাম তা কৃতজ্ঞতা যদি না হয় তা হলে তারই মাসতুতো-পিসতুতো কিছু। আমাদের আসর যে এর পর মালাই কুলপির মতো জমবে এ বিষয়ে অন্তত আর কোনও সন্দেহ রইল না।

॥ চার ॥

আমাদের অনুমান ভুল হয়নি। মাংসের শিঙাড়া-তোতাপুলিতে টঙের ঘরের আবহাওয়াই বদলে দিয়ে গেল।

কাঠপোড়া ছাইয়ের ভরসাতেই নিশ্চয়, অকুতোভয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত বোঝাই করে ঘনাদা নীচে থেকে বয়ে আনা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু তা শুধু দু-মিনিটের জন্য শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে ক-টি সুখটান দিয়ে যেন ভেতরের স্টিম তোলবার জন্য।

সুখটান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে ধোঁয়ার কুণ্ডলিতেই যেন পাকিয়ে ঘনাদা, আট কোটি কিলোমিটার থেকে উপাখ্যানের রকেট একেবারে উপক্রমণিকায় টেনে এনে যেখানে নামালেন সেটা রাজস্থানের মরু বলেই মনে হল।

"হ্যাঁ," ঘনাদা স্মরণশক্তিটা যেন ঠিক মতো ফোকাস করে বললেন, "দিল্লি থেকে আমেদাবাদ যাচ্ছিলাম। আচমকা ওই অমন একটা বেয়াড়া জায়গায় বাধ্য হয়ে প্লেনটা নামাতে না হলে সুরঞ্জন আর বটুককে তাদের দলের কাছে ভালয় ভালয় আমেদাবাদে পৌঁছে দিয়ে আমি একটা বাংলার নাটুকে দলের মান বাঁচাই। আমার জানা টহলদার এক নাটুকেদল দিল্লি-আগ্রা হয়ে আমেদাবাদে গিয়েছিল নাটক দেখাবার বায়না নিয়ে। নাটক আবার কবিগুরুর 'রক্তকরবী' আর 'চিরকুমার সভা'। 'রক্তকরবী'র রঞ্জন যে করবে সে নাকি পা ভেঙে হাসপাতালে। আর অক্ষয়ের পার্ট যার করবার কথা সে রিহার্সেলেই বেসুরো গেয়ে নিজে থেকেই হাওয়া। দিল্লিতে আমার কাছে তাই টেলিগ্রাম—যেমন করে হোক রঞ্জন আর অক্ষয়ের পার্ট নেবার মতো হিরো পাঠান। নইলে বাংলার মান যায়।

বিপদ বুঝলাম। কিন্তু কাকে পাঠাব? দেবব্রত, দ্বিজেন মুখুজ্যে, না সবিতাব্রত? উত্তমকুমার, না সৌমিত্র? বড় গাইয়ে বা হিরো কি মুড়ি-মুড়কির মতো সস্তা! বড় তো দূরের কথা, ছোটখাটোদেরও এখন পায়া কি কম ভারী! দেশ ছেড়ে আমেদাবাদে কারও প্রক্সি দিতে যেতে তারা রাজি হবে কেন?

এমন সময় সুরঞ্জনের কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, সুরঞ্জন রাজি হলে একাধারে সব সমস্যা মিটে যায়। পেশাদার নয়, শৌখিন। সে একাই 'রক্তকরবী'র রঞ্জন আর 'চিরকুমারসভা'র অক্ষয় দুই-ই অনায়াসে চুটিয়ে চালিয়ে দিতে পারবে। যেমন চেহারা, তেমনই অভিনয়, তেমনই গানের গলা।

সুরঞ্জন—সুরঞ্জন সরকারের নাম কেউ নিশ্চয় এ কালে শোনেনি। শুনবে কোথা থেকে? এ দেশ তার প্রতিভার পরিচয় পাবার সুযোগই পেল কতটুকু? সে এ দেশে

থাকলে এত দিনে নাটক সিনেমা সাহিত্য সব কিছুর সাপ্তাহিক-মাসিক-বার্ষিকগুলোর মলাট তারই একরকম একচেটে হয়ে থাকত।

সুরঞ্জনের কথা মনে হতেই তার হোটেলে ফোন করলাম। সুরঞ্জন ভাগ্যক্রমে তখন দিল্লিতে একটা ছোটখাটো জলসায় গাইতে এসেছে! আমার প্রস্তাব শুনে একটু দোনামোনা করে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। তাকে অবশ্য অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল। তাতেও কিছু হয়তো হত না। পয়সাওয়ালা বড় ঘরের ছেলে। গান বাজনা অভিনয় তার শখ। তাই বলে কোনও টহলদার নাটুকে দলের হয়ে গাইতে বা অভিনেতার প্রক্সি দেবার তার কী দায় পড়েছে!

শেষ পর্যন্ত এক যুক্তিতেই তাকে কাবু করতে পারলাম। বাংলা দেশ নয়, আলাদা প্রদেশ গুজরাট। সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাটক গুবলেট হয়ে তাঁর নামের অমর্যাদা হওয়াটা কি ভাল হবে? তাঁর আর বঙ্গভূমির খাতিরেই যেমন করে হোক আমাদের এ দায় উদ্ধার করে দেবার চেষ্টা করতেই হবে। শুধু তাকেই তা নয়, আমাকেও কী বলে এককথায় দিল্লি ছেড়ে যেতে হচ্ছে তো!"

"আপনি তখন বুঝি দিল্লিতে থাকতেন?" শিবু প্রশ্নটুকু বুঝি আর না করে পারলে না।

শিবুর ওপর ঘনাদা আজ একটু খুশি, নইলে বেফাঁস বাগড়া দেবার বেয়াদবির ফল কী হত কে জানে!

ঘনাদা এককথায় মুখে হয়তো কুলুপই এঁটে দিতেন।

আজ কিন্তু তিনি ঈষৎ একটু হেসে শুধু বললেন, "হ্যাঁ, তখন মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে হত।"

ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে তটস্থ হয়ে ছিলাম এতক্ষণ! তাঁর এ কথায় হাঁফ ছেড়ে শিবুকে ধমক দেওয়ার ছলে তাঁকে আমড়াগাছির আর কি কিছু বাকি রাখি!

গৌর শিবুকেই যেন একহাত নিলে, "ঘনাদা দিল্লিতে থাকবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!"

"ক্যাবিনেট ক্রাইসিস-এর জন্যই থাকতে হত নিশ্চয়।"

আমি আর শিশির যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নিলাম।

"শুধু ক্যাবিনেট ক্রাইসিস কেন?" গৌর আমাদের সংশোধন করলে, "ডিফেন্সের কোনও প্রবলেম হলে—ওঁকে ছাড়া ডাকবে কাকে?"

"ওসব কথা থাক না"—ঘনাদার যেন নিজের গৌরবের কথা বিনয়ে বাধল। তাই চাপা দিয়ে বললেন, "সুরঞ্জন ওই যুক্তিতেই কাত হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হল যেতে। কিন্তু একটি শর্ত। বটুক মানে বটুকেশ্বরকে সঙ্গে নিতে হবে। বটুকেশ্বর হল সুরঞ্জনের খাস বাটলার বলতে যা বোঝায় তাই। সুরঞ্জনের খাওয়াদাওয়া পোশাকআশাক থেকে সবকিছু দেখাশোনার ভার বটুকের ওপর। শুধু তাই নয়, বটুক সুরঞ্জনের গানের তবলচি, অভিনয়ের মেকআপম্যান। বটুক বাদে সুরঞ্জনের সবকিছু অচল।

এ হেন বটুককে সঙ্গে নেব সে আর বেশি কথা কী! তখন যা গরজ, সুরঞ্জন আবদার ধরলে অমন দশটা বটুককে নিতেও আপত্তি করতাম না।

দিল্লি থেকে আমেদাবাদে যাবার তখনও রেগুলার প্লেন-সার্ভিস হয়নি।

ভাড়াই করলাম তাই একটা ছোট প্লেন দিল্লি ফ্লাইং ক্লাব থেকে।

দেরি করবার সময় নেই। পাইলটের খুতখুঁতনি সত্ত্বেও সাত-তাড়াতাড়ি সেইদিন দুপুরেই রওনা হলাম। কতক্ষণের বা মামলা। সোজা গেলে বড়জোর শ-বারো কিলোমিটার। খুব বেশি লাগে তো ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

পাইলট খুঁতখুঁত করেছিল ঝড়ের ভয়ে। বছরের ওই সময়টায় বিকেলের দিকে প্রায়ই নাকি ও অঞ্চলে বেশ দুরন্ত ঝড় ওঠে। আবহাওয়া অফিস থেকে সেদিন নাকি ওই রকম ঝড়ের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

ওই পূর্বাভাস শুনেই যেটুকু দ্বিধা ছিল সব কেটে গেল।

'হাওয়া অফিস বলেছে ঝড় হতে পারে!' পাইলটকে হেসে বললাম, 'তা হলে তো আর ভাবনাই নেই!' বেপরোয়া হয়ে প্লেন ছাড়তে পারো ঝড় সম্বন্ধে আজকের দিন অন্তত নিশ্চিন্ত।'

হাওয়া অফিসের কথা সেইদিনই বেদবাক্য হয়ে উঠবে তা কি ভাবতে পেরেছি!

জয়পুর ছাড়াবার পরই সত্যি সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখলাম। মরুভূমির ঝড়! আকাশ বাতাস মাটি সব একাকার করে শুধু বালির ঝাপটা।

সে তো আর যন্ত্রে চালাবার অটোমেটিক কন্ট্রোলের হাল-আমলের প্লেন নয়। সেকালের পাখা ঘোরানো হালকা প্লেন। চোখে দেখে চালাতে হয়।

প্রচণ্ড বালির ঝড়ে কানা করে কোথায় যে আমাদের নিয়ে চলল তা বোঝাই গেল না।

ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে করতে পাইলটের শুধু তখন চেষ্টা প্লেনটা নীচে আছড়ে না পড়ে।

সে চেষ্টা সফল হল। কিন্তু কোথায় যে প্লেনটা নামল তার হদিসই পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি, না ঝড়ের দাপটে পশ্চিম পাকিস্তানেই গিয়ে পড়েছি, তা-ও জানবার উপায় নেই।

এমন কিছু দূর নয়। একটু দিক ভুল হয়ে থাকলে সে মুলুকে গিয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা।

প্লেন কোনওরকমে নামাতে পারলেও ঝড়ের হাত থেকে তখনও রেহাই নেই। প্লেনসুদ্ধ আমাদের হাওয়ার বেগেই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

॥ পাঁচ ॥

"আমরা তিনজন কোনওরকমে নামবার পর প্লেনটার সেই অবস্থাই হল। ঝড় তো দারুণ বেগে বইছে-ই, তার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঝাপটা এসে পাইলট সমেত প্লেনটাকে যেন কাগজকুচির মতো ঝেঁটিয়ে চোখের আড়াল করে দিলে।

নিজেরা তখন চোখমুখ চাদরে বেশ করে বেঁধে বালির ওপরই শুয়ে পড়েছি। ঝড়ে যাতে উড়িয়ে নিয়ে না যায় তাই পরস্পরের হাতও ধরে আছি প্রাণপণে।

আশা এমনিতেই কিছু নেই। তবু তিনজনে একসঙ্গে থাকলে একটু যুঝতে অন্তত পারব। ভরসাও কিছু পাব পরস্পরের কাছে থাকার দরুন।

কিন্তু সে ভরসা পেয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু লাভ হবে কি!

পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে থাকি বা না থাকি, থর মরুভূমির মধ্যে যে আমাদের প্লেন নেমেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন নেই। আয়তনে না হোক ভীষণতায় এ মরুভূমিটি সাহারার চেয়ে কম যান না। তিনটে অসহায় নিঃসম্বল আর এ জগতের পক্ষে একান্ত আনাড়ি মানুষ শুধু হাত-ধরাধরি করেই এ মরুভূমি থেকে কি উদ্ধার পেতে পারে? আমাদের প্লেনটার তো কোনও পাত্তা নেই। চেষ্টা করলেও আমাদের মতো তিনটে প্রাণীকে এই ধূ ধূ শূন্যতায় খুঁজে বার করা পাইলটের পক্ষে অসম্ভব! সুতরাং যা কিছু নিজেদের চেষ্টাতেই করতে হবে। কিন্তু, উদ্ধার পেতে কোথায় কোন দিক যাব!

ঝড়ের দাপট ক্রমশ কমে এল। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মরুভূমির শান্ত পরিষ্কার আবহাওয়ার রাত নয় যে, আর কিছু না হোক, আকাশের ঝকঝকে তারা দেখেই কিছুটা দিক-নির্ণয় করা যাবে।

চারিদিকে মরুঝড়ের রেশ রেখে-যাওয়া ঘোলাটে একটা বিশ্রী অন্ধকার। বালির ওপর থেকে উঠে বসে নিজেদেরই ভাল করে তখন দেখতে পাচ্ছি না।

তিনজনের মনেই তখন এক প্রশ্ন।

কিন্তু মুখ ফুটে কেউ আর কিছু বলছে না। বলে লাভও কিছু নেই। মনে মনে সবাই তখন জানি যে নেহাত অঘটন কিছু না ঘটলে আমাদের উদ্ধার পাবার কোনও আশাই নেই। প্লেন থেকে কোনওরকমে নামবার সময় নিজেদের জামা-কাপড়-জুতো আর বালির ঝাপটা সামলাবার জন্য দুটো চাদর ছাড়া আর কিছু নিয়ে নামিনি। অন্য কিছু দূরে থাক, সকাল পর্যন্ত তেষ্টা মেটাব এমন একটা ফোঁটা জলও নেই।

সব কিন্তু এক হিসেবে আমারই দোষ। আমি শুধু এই আমেদাবাদ নিয়ে যাওয়ারই চক্রী নই, পাইলটের বারণ সত্ত্বেও ঝড়ের ভয় হেসে উড়িয়ে আজকের দিনে প্লেন ছাড়বার দুর্বুদ্ধিও আমার।

এইসব কিছুর জন্যে আমাকেই দায়ি করে সুরঞ্জন যদি আশ মিটিয়ে আমায় একহাত নিত, তা হলে সত্যিই আমার কিছু বলবার থাকত না।

কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও মুগ্ধ হলাম সুরঞ্জন চরিত্রের মহত্ত্ব দেখে। আমার বিরুদ্ধে তো নয়ই, ভাগ্যের নাম করেও সুরঞ্জনকে একবার একটুও হা-হুতাশ করতে শুনলাম না।

আর বটুকেশ্বর! বটুকেশ্বর যে কী জাতের মানুষ তা বোঝবার অবসর তখনও মেলেনি। সে রাত্রে তার অসীম স্থৈর্য ধৈর্য দেখেই আমি অবাক। সুরঞ্জনের পাশে আছে এই যেন তার যথেষ্ট। মরুভূমি না জলাবাদা, তাতে যেন তার কিছু আসে-যায় না।

মনের মধ্যে তখন একমাত্র আশা প্লেনটাকে জড়িয়ে।

পাইলটের পক্ষে প্লেন নিয়ে আমাদের খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব হলেও

কাছাকাছি কোথাও এলে প্লেনটা আমাদের চোখে তো পড়তে পারে।

অনেকগুলো 'যদি' অবশ্য তার মধ্যে আছে।

প্লেনটা যদি চলবার মতো অবস্থায় থাকে, আমাদের কাছাকাছি যদি তা কোথাও থাকে, আর পাইলট নিজে যদি জখম না হয়ে থাকে।

এতগুলো 'যদি' একসঙ্গে মিলে যাওয়া অলৌকিক অঘটন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

অলৌকিক অঘটনই শেষ পর্যন্ত একটা ঘটল। কিন্তু ঘটল যেভাবে তা কিন্তু আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

মরুভূমির যা দস্তুর, দিনের ফোসকা-পড়া গরমের পর রাতের সেই কনকনে ঠাণ্ডা তখন পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে বালির ঝড়টার পর ঠাণ্ডাটা নামছে আর একটু তাড়াতাড়ি।

ঠাণ্ডায় তিনজনেই যখন ভেতরে ভেতরে একটু কাঁপতে শুরু করেছি, এমন সময় বটুকের গলা শুনে রীতিমত চমকে উঠলাম।

বটুকের গলার আওয়াজে চমকাবার মতো কিছু অবশ্য নেই।

ঠাণ্ডায় কাঁপুনি তার মধ্যে একটু আছে, কিন্তু বলার ধরনটা একেবারে যেন, 'চা হয়ে গেছে' কি 'অমুকবাবু এসেছেন' খবর দেওয়ার মতো। তার মধ্যে আবেগ উত্তেজনার বাষ্পও এক ছিটেফোঁটা নেই।

চমকে উঠতে হল তার খবরটায়। নেহাত ঠাণ্ডা গলায় সে যা বলেছে তার তাৎপর্য যে দারুণ! কথাটা হল, 'একটা আলো দেখা যাচ্ছে।'

'আলো! আলো দেখা যাচ্ছে? কোথায় আলো!'

উত্তেজনায় এক মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালাম। সুরঞ্জনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ধীরে সুস্থে বটুকই উঠল সবশেষে।

ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তখন তাকাচ্ছি।

কিন্তু কোথায় আলো?

বটুকেশ্বরের পুরোপুরি পরিচয় তো তখনও পাইনি। বিপদে পড়ে মাথায় গোলমাল হয়ে চোখে ধাঁধা দেখছে বলে সন্দেহ হল। ধমক দিলামও সেইজন্য, 'কী আলো-আলো বলছ! স্বপ্ন দেখছ নাকি!'

'না, না', সুরঞ্জনই প্রতিবাদ জানাল, 'বটুক যদি দেখে থাকে তা হলে ভুল দেখেনি। ওর একেবারে ঈগলপাখির চোখ। কই, কোথায় আলো বটুক?'

'ওই যে দেখা যাচ্ছে।'

বটুক হাত বাড়িয়ে যে দিকটায় আঙুল দেখালে সেখানে আবছা ঘোলাটে অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখতে পেলাম না।

সুরঞ্জনের অবস্থাও বুঝলাম তাই। চোখের ওপর হাত রেখে যথাসাধ্য ঠাহর করবার বৃথা চেষ্টা করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আলোটা এখনও জ্বলছে, না নিভে গেছে?'

'না, নিভে তো যায়নি।' বটুকের সেই উচ্ছ্বাসহীন নিরুত্তাপ গলা—'একটা টিবি

মতনের ভেতর থেকে জ্বলছে!'

একে অদৃশ্য আলো, তার ওপর আবার ঢিবি! প্লেনটা হলেও তবু কথা ছিল। ঢিবি এখানে কোথা থেকে আসবে!

আজগুবি খবরের জন্য এবার বেশ রেগেই তাই ধমকে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দেখি সুরঞ্জন বটুককে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এদের দুজনের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি একসঙ্গে? বটুক অন্ধকারে খোয়াব দেখে বলেছে ঢিবির আলো, আর সুরঞ্জন তার কথাতেই অন্ধের মতো ছুটছে!

আবার ডেকে তাদের থামাবার চেষ্টা করলাম। সে ডাক তাদের কানেই গেল না বোধ হয়।

বাধ্য হয়ে তাই তাদের পেছনেই যেতে হল। এই অজানা ধু-ধু মরুতে রাতের অন্ধকারে ছাড়াছাড়ি হতে তো কিছুতেই দেওয়া যায় না। খেপেই যাক আর যাই হোক, তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।

সঙ্গে থাকলেও অবস্থা শেষ পর্যন্ত যা হবে তা তখন বুঝতে আর বাকি নেই। ওই মরুর মধ্যেই ক-জনের হাড়গুলো যে বছরের পর বছর শুকোবে, কল্পনায় তা তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ওই ধু-ধু অজানা বালির মরুতে সুরঞ্জন আর বটুকের মতো দুজনকে আমার সঙ্গে একত্র করার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়তিরই যে অমন একটা অভিপ্রায় আছে তা কি তখন ভাবতে পেরেছি।

মরুভূমির মধ্যে আমাদের হারিয়ে যাওয়া যে ভবিষ্যতের একটা আভাস, তাই বা তখন কেমন করে বুঝব!

কত বড় অঘটন যে ঘটতে যাচ্ছে আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কল্পনা করতে পারিনি।

বটুক আর সুরঞ্জনের পেছনে কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়ার পর সত্যি সত্যিই এবার ফাঁক থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখে তখন শুধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

ওই ঢিবির কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে অঘটন যা ঘটবার তা অবশ্য ঘটে গেছে।

আমরাই শুধু বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারিনি যে আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বাদে এমন এক অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে যাচ্ছি, পৃথিবীর মানুষের যা কল্পনার বাইরে।"

॥ ছয় ॥

"দূরের ঢিবির আলোর রেখাটার দিকে চেয়ে তিনজনে তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

পাকিস্তান বা ভারত যার সীমানার মধ্যেই পড়ুক, থর-এর মরুভূমির মাঝে মাথায় আলো জ্বলবার মতো ওরকম একটা ঢিবি কেমন করে থাকতে পারে!

আলোটা আবার সাধারণ টিম-টিম কেরাসিন কি তেলের আলো তো নয়। বালিঝড়ের ঘোলাটে অন্ধকারে একটু অস্পষ্ট দেখালেও আলোটা যে বিদ্যুৎ বাতির

চেয়ে জোরালো কিছুর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

টিবি আর আলোর রহস্য যাই হোক, আমাদের তখন আর অপেক্ষা করবার উপায় নেই!

মরুর ঝড়টা এতক্ষণ একটু থেমে ছিল, তা আবার তখন বাড়তে শুরু করেছে।

বালিগুলো ছুঁচের মতো গায়ে তো ফুটছেই, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীর।

ও টিবিটা যাই হোক, ওরকম জোরালো আলো মানেই সভ্যতা। ওখানে এখনকার মতো আশ্রয় তো পাওয়া যাবে।

সেই দিকেই তাই যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেলাম। কিন্তু টিবিটার তলায় গিয়ে পৌঁছে যেমন হতভম্ব তেমনই হতাশ হতে হল।

টিবিটা খুব ছোটখাটো নয়। নেহাত বালির না হলে মনে করা যেত যে লম্বা খাড়া একটা পাহাড়ের টুকরোই যেন সেখানে বসানো আছে। ওরকম জায়গায় একেবারে অসম্ভব, নইলে বালির টিবির মধ্যে লুকানো একটা কুতুবমিনার গোছের কিছুও ভাবা যেত।

কিন্তু এরকম একটা পাহাড়ের টুকরো কি বালিতে পোঁতা পুরনো মিনারের ধ্বংসাবশেষ হলে তার মাথায় অমন জোরালো আলো কোথা থেকে জ্বলতে পারে!

আর জোরালো আলো যার মাথায় জ্বলছে সে টিবির ভেতর ঢোকবার কোনও রাস্তা নেই কেন? চারদিকেই তো শুধু নিরেট বালির গা!

ব্যাপারটা কি ভুতুড়ে কিছু?

নাঃ, সারাদিনের ধকলে আর পিপাসায় আমাদের আর মাথার ঠিক নেই!

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি? কিন্তু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখলে সবাই মিলে কি একই স্বপ্ন দেখে?

তা ছাড়া বালির ঝড় আবার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটায় বালিগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে যে রকম ঠাণ্ডা ছুঁচের মতো গায়ের মধ্যে ফুটছে, যে-কোনও বেঘোর অবস্থা কাটিয়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

না, স্বপ্ন নয়, ভুতুড়ে কোনও ব্যাপার নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। শুধু তার মানেটা একেবারে বোঝা যাচ্ছে না।

বালির ঝড় থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য টিবিটাকেই আড়াল করে তার যে দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সে দিকে থাকাও হঠাৎ বিপজ্জনক বলে মনে হল।

ঝড়ে নাড়া খেয়েই তার ওপর থেকে আগে থেকেই ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ছিল। সেটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি।

তারপর হঠাৎ বেশ বড় একটা চাংড়া ওপর থেকে খসে গড়িয়ে পড়ায় সভয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে যেতে হল।

বালির চাংড়াটা আর একটু হলে মাথার ওপরই পড়েছিল।

কিন্তু তারপর এটা কী আশ্চর্য ব্যাপার!

টিবিটার ভেতর থেকে যেন ক্ষীণ একটু আলো দেখা যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে সে আলো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টিবির বালি এক জায়গায় খসে

গিয়ে একটা যেন ছোট ফোকর দেখা যাচ্ছে। আলোটা আসছে সেই ফোকর থেকেই।

ফোকরের আলোটার দিকে চেয়ে আমরা যখন প্রায় সম্মোহিত হয়ে গিয়েছি তখন ঢিবিটার ওপর থেকে আরও কয়েকটা চাংড়া আর বেশ কিছু বালি খসে পড়ল! অবশ্য তখন নিজেরাই দূরে সরে আছি।

তারপরই অবাক হয়ে দেখলাম ছোট ফোকরটা বড় হতে হতে ক্রমশ যেন একটা বড় গহ্বর হয়ে উঠছে।

ফোকরের আলোটা আর কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আলোটা না থাকার দরুন গহ্বরটা কেমন একটা অন্ধকার জন্তুর মুখের হাঁ-র মতো দেখাচ্ছে।

ব্যাপারটা তখন বোঝবার চেষ্টা করছি।

বালির ঢিবির এটা কি একটা স্বাভাবিক গহ্বর? ঝড়ের ঘায়ে ওপরের বালির চাংড়া খসে পড়ায় আপনা থেকে কি এটার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে?

আলোটা যা দেখেছি সেটা তা হলে কী? ঢিবির মাথায় যে অদ্ভুত আলো দেখে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছি, ফোকরের আলোটার তা-ই যদি উৎস হয়, তা হলে ঢিবিটা আগাগোড়া সেই মাথা পর্যন্ত ফাঁপা।

এরকম কোনও বালির ঢিবি মরুভূমির মধ্যে থাকা কি সম্ভব?

সম্ভব অসম্ভব যাই হোক, তখন আর তা নিয়ে বেশি কিছু ভাববার সময় নয়।

বালির ঝড়টা আমাদের সামান্য একটু আড়ালের সুযোগ পেতে দেখে যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠল। যেমন তার প্রচণ্ড বেগ, তেমনই তার হাড়-কাঁপানো শীত।

সাত-পাঁচ ভেবে সামনের ওই গহ্বরের আশ্রয়টুকু আর উপেক্ষা করা গেল না।

তিনজনে পর পর সেই গহ্বরের ভেতরে ঢুকলাম।

ভয়ে ভয়েই ঢুকেছিলাম, কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই ভয় ছাপিয়ে একটা সন্দিগ্ধ কৌতূহলই বড় হয়ে উঠল।

এ কী রকম গহ্বর?

বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছিল ভেতরের জায়গাটা তার চেয়ে অনেক বড় মনে হল। একেবারে গাঢ় অন্ধকার হওয়ার দরুন মাথার ওপরটা কত উঁচু আর চারপাশে কতখানি ছড়ানো তা ঠিক বুঝতে না পারলেও একটা ছোটখাটো থিয়েটার হল্-এর মতো জায়গায় যে ঢুকেছি সে বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নেই।

অন্য কিছুর বদলে থিয়েটার হল্-এর সঙ্গে মিলের কথাটা কেন যে মনে হয়েছিল কে জানে! নিজের অজান্তে মন কি ভবিষ্যতের কিছু আভাসই তখন পেয়েছিল?

কারণ এর পর থেকে যা শুরু হল, চমকদার যে কোনও আজগুবি নাটককে তা ছাপিয়ে যায়।

প্রথমেই নাটক করলে বটুক।

হঠাৎ মেঝেতে একটু পা ঘষে তার মার্কা-মারা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললে, 'খাঁচাটা কাঁপছে।'

'কী কাঁপছে?' সুরঞ্জন যেমন উদ্বিগ্ন তেমনই একটু বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

'খাঁচা আবার কোথা থেকে এল?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'আমরা তো খাঁচার মধ্যেই আছি।' বটুক যেন বিছানায় শুয়ে থাকার খবরের মতো জানিয়ে বললে, 'ঝাঁপটা তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে!' আমিই এবার সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'ঝাঁপ মানে যেখান দিয়ে এ গহ্বরে ঢুকেছি সেখানকার কোনও দরজার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, তবে দরজা নয়, ঝাঁপ!' বটুক নিজের কথাটাই ধরে রইল, 'আমরা ঢোকবার পরই ওপর থেকে নেমে বন্ধ হয়ে গেছে, আর সমস্ত খাঁচাটা এখন কাঁপছে।'

কম্পনটা তখন আমরাও টের পেয়েছি। কিন্তু বটুকের খাঁচা কথাটা ব্যবহারের কোনও মানে পাইনি। এ-কাঁপা তুফানের দাপটের কি ভূমিকম্পের হতে পারে কি না বিচার করতে গিয়ে দ্বিতীয় নাটকীয় বিস্ময়।

হঠাৎ গহ্বরটা আলোয় আলো হয়ে গিয়েছে। আর তারই মধ্যে ওপর থেকে নেমে আসা একটা লোহার হেলানো সিঁড়িতে একটু অদ্ভুত মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

মূর্তিটি যদি অদ্ভুত হয় তার প্রথম সম্ভাষণটা তার চেয়েও বেশি।

শীর্ণ হাড়-বেরুনো মুখে একটা শয়তানি হাসি নিয়ে সে বলছে, 'তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

বলে কি মানুষটা! আমরা তো সবাই তাজ্জব!

সব কিছুই যে আজগুবি সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে একেশ্বর এক বিরাট বালির ঢিবি।

সে বালির ঢিবির মাথায় এমন আলো যে মরুর ঝড়ের ভেতরও দূরদূরান্ত থেকে দেখা যায়।

বালির ঢিবি আবার ফোঁপরা। তার ভেতর ঢোকবার পর তা যেন বিরাট অন্ধকার এক খাঁচা হয়ে ওঠে। যেখান দিয়ে তাতে ঢুকেছি সেখানে একটা ঝাঁপ পড়েই যেন বন্ধ হয়ে যায়, আর খাঁচার মতো গহ্বরটা হঠাৎ কাঁপতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলো হয়ে কোথা থেকে এক অদ্ভুত মূর্তি এসে দেখা দিয়ে বলে কিনা—'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি!'

মানুষটা কি পাগল নাকি?

তা না হলে কী মানে ওই অদ্ভুত কথার?

যে বলেছে সে লোকটাই বা কে? আমাদের জন্যই বা অপেক্ষা করছে কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিলেছে, কিন্তু যখন তা পেলাম তখন এমন এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের নিরুপায় ভাগীদার হয়েছি যে নিয়তি বলে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর করবার কিছু নেই।"

॥ সাত ॥

"কী বা করবার থাকতে পারে চিরকালের চেনা-জানা দুনিয়ার সঙ্গে একেবারে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দু-চার হাজার নয়, অমন দু-চার কোটি কিলোমিটার ভেসে ভেসেই

ছাড়িয়ে যেতে যেতে!

হ্যাঁ, ক-দিন বাদে তা-ই তখন আমাদের অবস্থা।

অনেক কিছুই তার মধ্যেই জানতে পেরেছি।

জেনেছি যে ফোঁপরা ঢিবির খাঁচায় বন্দী হবার পর অদ্ভুত যে মানুষটার প্রথম দেখা পেয়েছিলাম, মিথ্যা সে কিছু বলেনি।

সত্যিই আমাদের অপেক্ষাতেই সে ছিল! আমাদের মানে, একেবারে নাম ধরে সুরঞ্জন, ঘনশ্যাম, বটুকেশ্বরের নয়, মানুষ হিসেবে যে-কেউ আসে।

কিন্তু কেন? কী তার মতলব? কে সে?

তাও জেনেছি। সে নিজেই বড়াই করে সব শুনিয়েছে, কিন্তু আমাদের জানপ্রাণের চাবিকাঠি যে তার হাতে সে কথাটা ভাল করে বোঝবার আগে নয়।

ঢিবির ফোঁপরা গহ্বরটা তখন বেশ বিশ্রীভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম সেখানকার ফাঁকটা ঝাঁপের মতো একটা কিছু পড়ে তখন বন্ধ।

এ সব থেকে তখন বুঝতে পারছিলাম যে বাইরে যেটার বালির ঢিবির মতো চেহারা, আসলে সেটা কোনওরকম একটা ধাতুর তৈরি বিরাট আশ্রয় গোছের।

মরুভূমির মাঝখানে এরকম একটা আস্তানা বানাবার কী উদ্দেশ্য তা অবশ্য তখন ধরতে পারিনি। মরু সম্পর্কে কোনওরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণাই উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছে।

খাঁচার মতো আস্তানাটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে সেটা অমন বিশ্রীভাবে কাঁপতে শুরু করায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ হয়েছে।

আমার চেয়ে সুরঞ্জনেরই বেশি। লোহার সিঁড়িতে দাঁড়ানো অদ্ভুত মূর্তিটাকে তাই সে প্রথমেই প্রশ্ন করেছে, 'আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কেন? কে আপনি?'

'আমি', শুঁটকো লোকটা অদ্ভুত ভাবে হেসে বলেছে, 'আমাকে সারেং বলতে পারো, আর তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি সওয়ারি দরকার বলে।'

সারেং, সওয়ারি—লোকটা এসব বলছে কী? লোকটার চেহারায় চোখের দৃষ্টিতে একটা পাগলাটে ছাপ কিন্তু আছে।

একটু কড়া গলাতেই তাই জিজ্ঞাসা করেছি, 'কীসের সারেং তুমি? আমাদের সওয়ারি বলছ কেন?'

'কেন বলছি, দেখবে?'

এবার সত্যিই পাগলের হাসি হেসে উঠেছে লোকটা। তারপর লোহার সিঁড়িটা দিয়ে একটু ওপরে উঠে—কোথায় একটা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে দেখেছি আমাদের খাঁচার মতো আশ্রয়টার একটা দিকের গোল দেওয়াল আপনা থেকেই সরে গিয়ে বিরাট একটা জানলা গোছের বেরিয়ে পড়ছে।

কিন্তু জানলার বাইরে ও কী দেখা যাচ্ছে?

আকাশ তো পরিষ্কার। ঝলমল করছে তার মধ্যে তারাগুলো! বালির ঝড় তা হলে থেমে গেছে? ঝড়ে আকাশটার এক রকম ঝাড়পোঁছ হয়ে গেছে বলেই বোধহয় তারাগুলো অত বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

কিন্তু তারাগুলো মিটমিট করছে না কেন?

ব্যাপারটা চোখে পড়লেও তার সঠিক তাৎপর্যটা তখনও বুঝিনি।

বুঝতে অবশ্য দেরি হল না। যার মধ্যে আছি সেই রহস্যময় আশ্রয়টার অদ্ভুত কাঁপুনি তখন আশ্চর্যভাবে থেমে গেছে। কিন্তু সব কিছু ব্যাপার মিলে আমাদের অস্বস্তি আর উদ্বেগ দিয়েছে বাড়িয়ে।

সুরঞ্জন তাই তার মনের কথাটা জোর গলাতেই জানিয়ে দিলে। বললে, 'সওয়ারি-টওয়ারি আমরা হতে চাই না। আকাশ দেখে তো বুঝছি বাইরের ঝড় থেমে গেছে। দরজা খুলিয়ে দিন, আমরা বেরিয়ে যাব।'

'বেরিয়ে যাবে?' লোকটার আবার সেই শয়তানি হাসি, 'বেশ, যাও। তবে একটু লাফ দিতে হবে। পারবে?'

লাফ দিতে হবে! এবার আমিই সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

'তা না হলে নামবে কী করে?' বাচ্চাদের সঙ্গে যেন তামাশা করার ধরনে লোকটা বললে, 'বেশি কিছু নয়! এখন হাজার বিশ কিলোমিটার লাফ দিলেই চলবে।'

'বিশ হাজার কিলোমিটার!'

শুধু সন্দিগ্ধ আর নয়। রীতিমত ভীত হয়েই জানলাটার দিকে ছুটে গেলাম।

খোলা বলে যা মনে হচ্ছিল সে জানলা দেখলাম বন্ধ, তবে কাচের চেয়ে স্বচ্ছ এমন কিছু জিনিস, যা হাতে না ছুঁলে কাছে থেকেও বোঝা যায় না।

তারাগুলোকে ঝিকমিক করতে না দেখে ক্ষীণ যে সন্দেহটুকু মনে জেগেছিল আর নেহাত আজগুবি ভেবে যে ধারণাকে আমল দিইনি, স্তম্ভিত হয়ে বুঝলাম তা-ই সম্পূর্ণ সত্য।

জানলার কাছে ছুটে আসার সময়ই অবশ্য ব্যাপারটার আভাস পাওয়া উচিত ছিল।

ছুটতে গিয়ে আধা-ভাসমান অবস্থাতেই সবেগে জানলাটার কাছে পৌঁছেছি। দুহাত বাড়িয়ে দেয়ালে না ভর দিলে মাথাটাই ঠুকে যেত!

উত্তেজনা ও উদ্বেগে ব্যাপারটা তখন তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি।

এখন জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যের সঙ্গে অন্য সব কিছু মিলিয়ে হতাশ হয়ে বুঝলাম, যেখানে ছিলাম থরের সেই মরুতে তো নয়ই, পৃথিবীরই কোথাও নামবার আর উপায় নেই।

পৃথিবীকে বহুদূরে পেছনে ফেলে আমরা মহাশূন্যে ভেসে চলেছি।

ওই উন্মাদ লোকটা যা বলেছে—পৃথিবী ক্রমশ প্রতি মুহূর্তে সেই বিশ হাজার কিলোমিটারের থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে।

বিস্ময়ে যেমন হতভম্ব, নিজেদের নিরুপায় অবস্থায় তেমনই হতাশ হয়ে উন্মাদ চেহারার লোকটার দিকে এবার ফিরেছি।

লোকটা তখন আমাদের অবস্থা দেখে মিট মিট করে হাসছে।

চেহারা যার উন্মাদের মতো, লোকটা সত্যি কি তাই?

উন্মাদ হলে এমনই অবিশ্বাস্য আশ্চর্য একটা ব্যাপার সে কি সম্ভব করে তুলতে পারে?

পরে বুঝেছি যে উন্মাদ বলেই সে তা পেরেছে।

নাম অ্যালজার লুটভিক। পৃথিবীর কোনও দেশের বৈজ্ঞানিকদের তালিকায় তার নাম পাবে না।

তবে কোথা থেকে তার উদয় হল? লুটভিক কি ভুঁইফোঁড়?

না, নানা দেশে নানা নামে বহুকাল ধরে সে তার গবেষণা চালিয়ে এসেছে। তার আসল কাজ আর উদ্দেশ্য কাউকে বুঝতে না দেবার জন্যই এই চালাকি।

সব গবেষণা শেষ করার পর তার অবিশ্বাস্য পরীক্ষা চালাবার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে থরের এই মরুভূমি।

মরুভূমিই তার দরকার ছিল। কারণ পৃথিবীর সব জায়গায় বিঘ্ন হবার ভয় অনেক বেশি। সাহারায় তখনও ফরাসিদের দাপট। তারা নিজেরাই সেখানে পারমাণবিক পরীক্ষা-টরিক্ষা চালাচ্ছে। সুতরাং সেখানে নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে না।

টাকলা মাকানেও তাই। সেখানে চিনের নজর এড়িয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছে থরের মরুর এই অঞ্চলটা। একদিকে ভারত, একদিকে পাকিস্তান। মাঝখানে খানিকটা প্রায় বেওয়ারিশ নো-ম্যানস-ল্যান্ড। একেবারে নিষ্ফলা ধু-ধু মরু বলে কারওর জায়গা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

লুটভিক তাই নির্ঝঞ্ঝাটে এখানে তার আস্তানা গেড়েছে। সরকারের তরফ থেকে সামান্য খোঁজখবর যা হয়েছে তার মুখ চাপা দিয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দির বসাবার জায়গা খোঁজার অজুহাত দিয়ে। অবিশ্বাসের কিছু নেই। মহাশূন্যের দুরবিন বসাবার মানমন্দিরের জন্য নির্মেঘ শুকনো এমনই মরু-অঞ্চলই সত্যি লাগে।

লুটভিক বড়াই করে নিজেই নিজের এসব কীর্তি শুনিয়েছে।

এ বিবরণে তার ধূর্ত বুদ্ধির পরিচয় থাকলেও সে যে অমানুষিক অপ্রকৃতিস্থ কিছু, এমন কোনও আভাস পাওয়া যায়নি।

সুরঞ্জনের পরের প্রশ্নের জবাবেই লুটভিক-এর সেই ভয়ংকর রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লুটভিক-এর বাহাদুরির ইতিহাস শুনতে শুনতে সুরঞ্জন স্বাভাবিক কৌতূহলেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'বুঝলাম, আপনি মস্ত একজন বৈজ্ঞানিক, যা এখানে গড়ে তুলেছেন তা আশ্চর্য এক মহাকাশযান। কিন্তু এতে আমাদের সওয়ারি নেবার আপনার কী দরকার ছিল?'

'কী দরকার ছিল?' লুটভিক-এর সেই শয়তানি হাসি আবার তখন শুরু হয়েছে—'ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ কি সাদা ইঁদুরের কী দরকার থাকে? ইচ্ছে করলে জন্তু-জানোয়ারও নিতে পারতাম, কিন্তু তার চেয়ে মানুষই ভাল মনে হল।'

'আমাদের আপনি আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় গিনিপিগের মতো ব্যবহার করবার জন্য সঙ্গে নিয়েছেন?' আমাদের সকলের স্তম্ভিত প্রশ্নটাই সুরঞ্জনের মুখ দিয়ে বার হল। 'কী করবেন আমাদের দিয়ে?'

'যা-ই করি না,' লুটভিক আমাদের যেন লোভ দেখিয়ে আশ্বাস দিলে, 'খাওয়া-দাওয়া থেকে আরামে থাকার ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি হবে না। উপরি হিসেবে

এই আশ্চর্য শূন্য-প্রয়াণ তো আছেই। মিছে বাজে ভাবনা ভেবে তো লাভ নেই। বিজ্ঞানের জন্যই নিজেদের উৎসর্গ করছ জেনে এখন খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম করো। এখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছে করলে ওই জানলা দিয়ে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের শোভাও দেখতে পারো।'

শেষ একটা নিষ্ঠুর শয়তানি হাসি হেসে লুটভিক আমাদের কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যখন চলে গেল তখন আমরা সবাই বোবা হয়ে গেছি। ভয়ে ভাবনায় হতবুদ্ধি হয়ে আমাদের জিভগুলোও তখন আড়ষ্ট।

॥ আট ॥

লুটভিক যা বলে গেছে তা মিথ্যে নয়। শূন্যযানের যে অংশটায় ছোটখাটো একটা হল্-এর মতো কামরায় আমরা আছি, খাবার-দাবার থেকে সাধারণ দরকারি কোনও জিনিসের সেখানে অভাব নেই। নীচে প্রথম ঢোকার সেই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার পর লুটভিক নিজে আমাদের এ কামরায় নিয়ে এসেছে। উঠে এসে কামরায় জায়গা পাবার পর লুটভিক-এর শূন্যযানটা যে নেহাত ছোটখাটো নয় তা বুঝতে পেরেছি।

এত বিরাট একটা শূন্যযান কীসের শক্তিতে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে তা অবশ্য বুঝতে পারিনি। সামান্য একটা রকেটকে পৃথিবী ছাড়িয়ে পাঠাবার আর ফেরত আনবারই কত ঝামেলা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে আসাযাওয়া করতেই তো তার শুধু হাওয়ার ঘর্ষণেই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার বিপদ। কত কাণ্ড করে সে বিপদ সামলাতে হয়!

আর এ শূন্যযান পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যে চলে এল, মাধ্যাকর্ষণের অভাবে ক্রমশ পালকের মতো হালকা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও অসুবিধাই তো টের পেলাম না!

এ রহস্য নিয়ে এত সব ভাবনা তখন কিন্তু ভাববার সময় হয়নি।

আমরা যে তার পরীক্ষার গিনিপিগমাত্র তা জানিয়ে লুটভিক চলে যাবার পর এই উন্মাদের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাওয়া যায় সেইটেই তখন একমাত্র ভাবনা হয়ে উঠেছে।

যেটুকু পরিচয় এই কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়েছি, তাতে এই উন্মাদ পিশাচকে কোনও বিশ্বাস নেই। বিজ্ঞানের নামে সে আমাদের নিয়ে অকাতরে এমন কিছু করতে পারে যার পরিণাম হয়তো মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর।

তাকে যেমন করে হোক তাই না ঠেকালে নয়।

কিন্তু উপায়টা কী!

'শুধু টুঁটিটা টিপে ধরলেই হয়।' বটুকেশ্বর তার যেন মুখস্থ-পড়া-বলার গলায় বললে, 'ও শুঁটকো মুরগির জান আর কতটুকু।'

'না', আপত্তি করলে সুরঞ্জন, 'এ শূন্যযান কী বস্তু, আমরা কিছুই জানি না। এটা চালাবার জন্যই ওর টিকে থাকা দরকার। নইলে এই শূন্যে আমরা করব কী? ওকে

ওর কন্ট্রোল রুমে বন্দি রাখাই ভাল।'

'উঁহু', আমি মাথা নাড়ালাম, 'শুধু কন্ট্রোল রুমে বন্দি করে রাখলে সমস্যা মিটবে না। এ শূন্যযান চালাবার জন্য কোথাও কিছু দরকারি কলকবজা থাকতেও পারে। কন্ট্রোল রুমে বন্দি থাকলে লুটভিক সে সবের নাগাল পাবে না। ওকে তাই ছেড়ে রাখতেই হবে।'

'তাহলে ওর হাত থেকে বাঁচবার উপায়?'

'উপায় আমাদের নিজেদের বন্দি করা!'

'নিজেদের বন্দি করা?' অবাক হয়ে বললে সুরঞ্জন, 'সে আবার কী রকম?'

'সেটাই হল সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা', ওদের বুঝিয়ে দিলাম, 'এই কামরাটার সাজ-সরঞ্জাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা আমাদের ওর শয়তানি পরীক্ষার গিনিপিগ রাখবার মতো করেই তৈরি। তাই আর যেখানে থাক, এ কামরায় শূন্যযানের কোনও দরকারি কলকবজা ও রাখেনি বলেই আমার বিশ্বাস। আমরা নিজেরা এ কামরা ভেতর থেকে বন্ধ করে নিজেদের বন্দি করে রাখলে ওর শূন্যযান চালাবার কোনও অসুবিধা হবে না, অথচ আমরাও ওর নাগালের বাইরে থাকব। অবশ্য দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এ কামরায় ঢোকার কোনও গোপন উপায় যদি থাকে তাহলে আমরা নাচার।'

হতাশার আশা হিসেবে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রাখবার ব্যবস্থাই তারপর করা হল।

ব্যবস্থা আর কী? কামরার ভেতরকার চেয়ার টেবিল গোছের কিছু আসবাবপত্র এনে দরজায় ঠেকা দেওয়া। আমাদের ভাগ্যে লুটভিক মানুষটা নেহাত শুঁটকো দুবলা-পাতলা হাড্ডিসার। শূন্যযানে ভার বলে কিছু না থাকলেও তার মতো তালপাতার সেপাইয়ের পক্ষে দরজার ওসব ঠেকো ঠেলার জোরে ভেঙে ঢোকা সম্ভব নয়।

দরজাটা বন্ধ করবার সময়ও শূন্যযানের ভেতরকার মামুলি ব্যবস্থায় বেশ অবাক হতে হয়েছে। এমন আশ্চর্য একটা যন্ত্রযান এমন সব সাধারণ আসবাবপত্র নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে কী করে?

উত্তরটা তখনও পাইনি, তবে নিজেদের বন্দি করার বুদ্ধিটা সফলই হয়েছে।

দরজার বাইরে লুটভিক-এর আস্ফালন থেকে বোঝা গেছে যে ভেতরে ঢোকবার অন্য কোনও গোপন উপায় নেই।

লুটভিক অবশ্য আমাদের ভয় দেখাতে কিছু বাকি রাখেনি। নিজে থেকে দরজা না খুললে আমাদের হাওয়া বন্ধ করে দেবে বলেও শাসিয়েছে। তাতে ভয় কিন্তু পাইনি।

এ কামরায় ওঠবার পথে হাওয়ার কলটা লুটভিকই দেখিয়ে এনেছে। যতদূর বুঝেছি ভাগ ভাগ করে কামরা হিসেবে হাওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা তাতে নেই। হাওয়া বন্ধ করলে লুটভিককেও আমাদের মতোই জব্দ হতে হবে।

যতই ভয় দেখাক, হাওয়া বন্ধ হয়নি। লুটভিকও আমাদের কামরায় ঢুকতে পারেনি। তার শয়তানি পরীক্ষার গিনিপিগ হবার বিভীষিকা এ পর্যন্ত অন্তত ঠেকিয়ে

রাখা গিয়েছে।

এমনই করে পৃথিবীর হিসেবে ক-দিন যে কেটেছে তা ঠিক জানি না। ঘড়ি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা করে ভাগ করে একটা হিসেব রাখা যেত। কিন্তু আমাদের দলে সুরঞ্জনের হাতে একটি মাত্র যে ঘড়ি ছিল, বালির ঝড়ের সঙ্গে যোঝার সময় কখন তা একেবারে বিকল হয়ে গেছে!

নেহাত খিদে পাওয়া ঘুম পাওয়া ধরেই সময়ের যা কিছু আন্দাজ তাই মনের মধ্যে আছে।

সেই আন্দাজ অনুযায়ী অন্তত মাসখানেক ইতিমধ্যে কেটে গেছে। একটা কামরার মধ্যে বন্দি থাকা ছাড়া আর বিশেষ অসুবিধে তাতে হয়নি। খাবার-দাবারের অভাব নেই। গিনিপিগের মতো আমাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে সুস্থ রাখবার জন্য লুটভিক বেশ দীর্ঘকালের মতো রসদ এ কামরায় মজুদ রেখেছে।

খাওয়া-দাওয়া আর নিজেদের মধ্যে ভবিষ্যতের হতাশ আলোচনা ছাড়া আমাদের একমাত্র আনন্দ হল জানলা দিয়ে আকাশ দেখা।

তাই দেখতে গিয়েই আজ এক অভাবিত বিস্ময়ের চমক।

কিন্তু সে চমকের মানে বোঝবার আগেই পরমায়ু যে শেষ হয়ে যাবার উপক্রম!

আমার সঙ্গে সুরঞ্জনও বুকে হাত দিয়ে হাঁফাচ্ছে।

বটুক আমাদের খাবার নিয়ে আসতে গেছে। তার অবস্থাও সেখানে নিশ্চয় আমাদের মতো।

আর লুটভিক!

তার কথাটা মনে হওয়াতেই চোখে যেন আরও অন্ধকার দেখলাম।

লুটভিক-এর কিছু হলে তো এই শূন্যযানই অচল। এত বড় বিপদের মধ্যেও এইটুকু বিশ্বাস মনে ছিল যে, যতই উন্মাদ হোক, লুটভিক এ শূন্যযান সাধ করে ধ্বংস করবে না। আবার পৃথিবীতে একদিন ফিরবেই। তখন কোনও একটা উপায়ে তাকে এড়িয়ে এ বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হবে না, এই ছিল আশা।

কিন্তু এখন যা দেখছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিষ্প্রাণ দেহগুলো নিয়ে এ-শূন্যযান মহাকাশের একটা নিরুদ্দেশে ভাসা উল্কাপিণ্ড হয়েই থাকবে।

কিন্তু এই বুকের কষ্টটাই বা কীসের?

একসঙ্গে সকলেরই বা এমন করে হবার কারণ কী?

এটা কি সংক্রামক কোনও রোগ? তা তো মনে হয় না।

তাহলে যা খেয়েছি সেই খাবারের ভেতরকার বিষ-টিষ কিছু?

কিন্তু বিষ যদি হয় তাহলে সাতদিন কোনও কিছু হয়নি কেন? আর লুটভিক অন্য যা-ই করুক, তার পরীক্ষার জন্যে পুষে রাখা গিনিপিগদের বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু বুকের যে কষ্টটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের খাদ্যের কিছু একটু সম্পর্ক কি নেই? তা না হলে একসঙ্গে আমাদের সকলেরই এক অবস্থা হবার আর কোনও কারণ তো ভেবে পাচ্ছি না।

ওই পর্যন্ত ভাবতেই কারণটা হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুচ্চমকে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কারণটা, ওই আমাদের খাবারের মধ্যেই তো রয়েছে, তবে বিষের মতো কোনও মেশানো জিনিসে নয়, শরীরে বিশেষ করে আমাদের হার্ট-এর অত্যন্ত দরকারি উপাদানের ঘাটতিতে।

কোথায় পাই সে উপাদান!

ওই কষ্টের ভেতরই জোর করে উঠে দাঁড়ালাম।

সুরঞ্জনও একটা ধাক্কা সামলে তখন কাত হয়ে উঠে বসেছে। হঠাৎ ওই অবস্থাতেই সে হাঁ হাঁ করে উঠল।

'ওকী! করছেন কী আপনি? অগ্নিকাণ্ড করবেন নাকি একটা!'

আমি তখন সত্যিই একটা টেবিলের পায়া দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে চেঁছে সেই ছাঁটগুলোয় দেশলাই দিয়ে আগুন ধরাচ্ছি।

কী ভাগ্যি শূন্যযানের কামরার আসবাবপত্রগুলো মামুলি ও সাধারণ।

টেবিলটা কাঠের না হয়ে প্লাস্টিক কি স্টিলের হলে এ কাহিনী আর তোমাদের শোনার ভাগ্য হত না!"

ঘনাদা থামলেন।

আমাদের চারজনের কাউকে আর কিছু বল্‌তে হল না। আমাদের ভাড়াটে ডাক্তারদের তখন ঘোর লেগে গেছে।

"তাহলে, অমনই করে কাঠের ছাই জোগাড় করলেন?" মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠল কার্ডিওগ্রাম সান্যালের মুখে।

"আর ওই কাঠের ছাইয়ের জোরেই সবাই সেরে উঠলেন?" প্রেশার সোম ভক্তিতে গদগদ।

"শুধু সেরেই উঠলাম না", ঘনাদা ঈষৎ হেসে বললেন, "আমাদের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা তা-ও মিটিয়ে ফেললাম।"

॥ নয় ॥

কাঠের ছাই একটু করে মুখে নিয়ে নিজেরা চাঙ্গা হবার পর ব্যস্ত হয়ে উঠলাম লুটভিক-এর জন্য।

ওই তো হাড্ডিসার চেহারা। এতক্ষণে টেঁসে গেছে কি না কে জানে।

মাসখানেক যে দরজা বন্ধ ছিল, চেয়ার-টেবিল ঠেকো সরিয়ে তা খুলে ছুটলাম কন্ট্রোল রুমের দিকে।

ভয় ছিল, ভেতর থেকে দরজা না বন্ধ করে দিয়ে থাকে। তাহলে ভেঙে খোলা ছাড়া উপায় নেই। অত সবুর কি তখন সইবে?

না, বন্ধ নয়, দরজা খোলাই। আর লুটভিক ওই রোগা হাড়েই তখনও টিকে আছে।

তবে অবস্থা কাহিল। কী সব অদ্ভুত ঘড়ি-টড়ি আর নানা রঙয়ের বোতাম বসানো কন্ট্রোল বোর্ডের টেবিলটা ধরে কোনওমতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

আমরা ঘরে ঢোকার পর চমকে মুখ তুলেও ঘাড়টা সোজা রাখতে পারল না। কিন্তু মাথাটা আবার বুকের ওপর ঝুলে পড়ার আগে চোখে যে দৃষ্টিটা হানল তাতে যেন সাতটা কেউটের বিষের জ্বালা।

আমাদের যত বড় দুশমনই হোক, তাকে এমন করে মরতে দিতে তো পারি না। তাই তাড়াতাড়ি কাঠের ছাইটা তার মুখে দিতে গিয়েও কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম।

ঠিক তো! আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান তো এখন আমারই হাতের মুঠোয়। কাঠ-পোড়া ছাই যার দাওয়াই সেই অসুখই তো আমাদের শাপে বর হয়ে গেছে।

'শিগগির একটা দড়ি আনো।' তাড়া দিলাম বটুককে। অন্য কেউ হলে কী দড়ি, কেন দড়ি জানতে চেয়ে কিছুটা সময় নষ্ট করত। বটুকেশ্বরের ওসব দোষ নেই। হুকুম শোনা মানে সাধ্য থাকলে তামিল করা।

চোখের নিমেষে দড়ি হাতে নিয়ে সে হাজির। এবার সুরঞ্জনকেই বললাম, 'বাঁধো ওকে।'

'বাঁধব?'

সুরঞ্জন দড়ি হাতে নিয়ে হতভম্ব।

'হ্যাঁ, বাঁধবে।'

ধমকে বোঝালাম এবার, 'এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এই কাবু অবস্থায় একে বাঁধতে পারলে শেষ পর্যন্ত আমাদের রক্ষা পাওয়ার কিছু আশা থাকবে।'

এর পর আর দুবার বলতে হল না।

সুরঞ্জন যখন উৎসাহভরে হাতে পায়ে দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, লুটভিক-এর মুখে তখন একটু ছাই ভরে দিলাম।

চাঙ্গা হয়ে উঠতে তার দেরি হল না। কী তখন তার মুখের তোড়! ফরাসি জার্মান ইংরেজি রুশ এমন কী এদেশে থাকার দরুন দেহাতি রাজস্থানি ভাষাতেও কোন গালাগাল দিতে সে বাকি রাখলে না।

বটুকেশ্বর নির্বিকার—

সুরঞ্জন রেগে তখন ফুলতে শুরু করেছে। বললে, 'দেব মুখটায় একটা কিছু গুঁজে?'

কন্ট্রোল বোর্ডটা তখন ভাল করে লক্ষ করছি! এটা দেখতে দেখতেই বললাম, 'না, ওকে কথা বলাবার দরকার হবে। মুখ বন্ধ করলে তাই চলবে না।'

গালাগাল ছেড়ে কথা কি সহজে বলে! ভালভাবে অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়ে শেষে চালাকি করে বলাতে হল।

যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা চাবি ঘুরিয়ে দিতে গেলাম।

নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে লুটভিক আমায় লক্ষ করছে তা জানি! আমার কাণ্ড দেখে একেবারে রেগে আগুন হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ! ওটা ছুঁসনি আহাম্মক

জানোয়ার কোথাকার! এখুনি উলটো বেগের যন্ত্র চালু হয়ে যাবে।'

'তাহলে এই বোতামটা টিপে দেখি,' বলে আরেকটা খুদে বালবের মতো উজ্জ্বল বোতাম টিপতে গেলাম।

'না, না, না!'—এবার লুটভিকের প্রায় আর্তনাদ—'ও বোতাম টিপলে আর রক্ষা নেই। দশগুণ বেগ বেড়ে শূন্যযান ওই ফোবস কি ডিমস-এর ওপরেই আছড়ে পড়বে।' "

"ফোবস? ডিমস?"

বিস্মিত প্রশ্নটা লুটভিক-এর কাছে ঘনাদার নয়, ঘনাদারই কাছে আমাদের। এতক্ষণ বাদে ধরা-ছোঁয়ার মতো দুটো নাম শুনে আর চুপ করে থাকতে পারা যায়!

"ফোবস ডিমস মানে তো সেই দুটো চাঁদ?" শিবু ঘনাদার সমর্থন চাইলে।

"ও চাঁদ দুটো তো মঙ্গলগ্রহের!" আমি জোরের সঙ্গেই জানালাম।

"তার মানে আপনারা তখন মঙ্গলগ্রহের কাছে পৌঁছে গেছেন?" শিশির সবিস্ময়ে জানতে চাইলে।

"হ্যাঁ," ঘনাদা শিশিরের টিন থেকে নতুন সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে তিনটে সুখটান না শেষ করা পর্যন্ত আমাদের মহাশূন্যেই একরকম ঝুলিয়ে রেখে দিলেন।

কিন্তু শেষ টানের পর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নিজেই যেন তার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী যেন বলছিলাম?"

কী বলছিলেন ধরিয়ে দেবার জন্য সব ক-টা গলা মুখর হয়ে উঠল।

"বলছিলেন ফোবস আর ডিমস-এর কথা।"

"লুটভিক বলে সেই পাজি পাগলটাকে তখন বেঁধে ফেলেছেন।"

"নিজেরা চাঙ্গা হয়েছেন কাঠের ছাই খেয়ে।"

"যন্তর-টন্তর আনাড়ি হাতে নাড়তে গিয়ে প্রায় আছড়ে ভেঙে ফেলেছেন উড়োজাহাজটা।"

"উড়োজাহাজ নয়, আহাম্মক কোথাকার! মহাশূন্যে কি হাওয়া আছে যে উড়োজাহাজ চলবে। জেট প্লেনও সেখানে পাত্তা পায় না।"

"শুনলি না ঘনাদার সে এক আজব পুষ্পক রথ! পৃথিবী থেকে যেতে-আসতে হাওয়ার ঘর্ষণে পোড়ে না, আর আমাদের ঘরবাড়ির মতোই তার আসবাবপত্র।"

"আরে, উনি কি সত্যিই যন্তর-টন্তরে আনাড়ি হাত লাগাচ্ছিলেন নাকি। ওই ভান করে ওই পাগলা বদমাশটার পেটের কথা সব বার করে নিলেন, বুঝলে না?"

আমাদের তিন ভাড়াটে সহায় এমন জ্বালা হয়ে উঠবে আগে কি জানতাম! কোনওরকমে তাদের কোরাস গলার ফাঁকে নিজেদের কথাটা গলিয়ে দিয়ে বললাম, "লুটভিক-এর কথায় কোথায় পৌঁছেছেন তার যেন একটু আভাস পেয়েছেন।"

"ঠিক!" ঘনাদা যেন লাইন ধরতে পেরে খুশি হলেন, "ফোবস ডিমস-এর নাম শুনেই বুঝলাম নির্ঘাত মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আনাড়ি আহাম্মক সেজে প্যাঁচ করে লুটভিক-এর কাছে যন্ত্র চালাবার মোটামুটি কায়দাও তখন জানা হয়ে গেছে।

এবার জরুরি একটা পরামর্শের বৈঠক বসাতেই হয়।

লুটভিককে বাঁধা অবস্থায় তার চেয়ারেই বসিয়ে রেখে নিজেদের কামরায় ফিরে এলাম।

সুরঞ্জন দারুণ উত্তেজিত—ছোকরা শুধু গানই গায় না, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনাও যে আছে তা প্রথম কথাতেই টের পেলাম। প্রশ্ন যা করলে তা কিন্তু একটু ভড়কে দেবার মতো!

জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি লুটভিক-এর কথা বিশ্বাস করেন?'

'তার মানে? বিশ্বাস না করবার কী আছে?' অবাক হয়ে বললাম, 'ও মিথ্যে বলবে কেন? বিশেষ ওই রকম আঁতকে-ওঠা অবস্থায়?'

'ওর মতো শয়তান সব পারে!' সুরঞ্জন গম্ভীরভাবে জানালে, 'আমাদের গুলিয়ে দেবার জন্যই যে ডিমস ফোবস-এর নাম করেনি তার ঠিক কী!'

বেশ একটু ভাবনায় পড়েই বললাম, 'কিন্তু একটা চাঁদ আমরা তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মাপে-টাপে ফোবস-এর সঙ্গেই মিলছে!'

'ঠিক মিলছে কী?' সুরঞ্জন সন্দেহ প্রকাশ করলে, 'চাঁদ বলতে যত ছোটই হোক বলের মতো গোল একটা কিছু তো হবে। যা দেখছি তা তো একটা পাহাড়ের ভাঙা টুকরো বলা যায়। তা ছাড়া আমার তো মনে হয় মঙ্গলগ্রহের সত্যিকারের চাঁদ বলে কিছু নেই। যা আছে তা কৃত্রিম উপগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছলে আমরা সেই স্যাটেলাইট দুটোই দেখতে পেতাম।'

এবার একটু হাসলাম। বললাম, 'বুঝেছি, কোথা থেকে তোমার এ ধারণা হয়েছে। তুমি স্ক্লোভস্কি পড়েছ?'

'হ্যাঁ, পড়েছিই তো!' সুরঞ্জন উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'তিনি স্পষ্ট হিসেব করে দেখিয়ে গেছেন যে, ষোলো আর নয় কিলোমিটার ব্যাসের ওই উপগ্রহ দুটো স্বাভাবিক চাঁদ হতে পারে না। আমাদের চেয়ে কোনও সভ্য বৈজ্ঞানিক জাত কোনও কালে ওই দুটো স্যাটেলাইট তৈরি করে আকাশে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। সে জাত এখন না থাকতে পারে, কিন্তু তাদের উপগ্রহ এখনও চাঁদের মতো মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' হেসে বললাম, 'বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক স্ক্লোভস্কি ওই রকমই লিখে গিয়েছিলেন বটে। তাঁর কথায় তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, যেমন পড়েছিল ১৮৭৭-এ, গত শতাব্দীতে, ইটালির জ্যোতির্বিদ জোভান্নি স্কিয়াপারেললি-র মঙ্গলগ্রহের বুকে কাটা খালের রেখা আবিষ্কারের ঘোষণার পর।'

'স্কিয়াপারেললি-র কাটা খালের রেখা দেখা, আর স্ক্লোভস্কির কথার তফাত আছে। কাটা খালের রেখা তো পরে ভাল উন্নত দূরবিনের দেখায় ভুল বলে জানা গেছে', সুরঞ্জন আমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটার প্রতিবাদ জানালে, 'কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চাঁদ যে কৃত্রিম তার অন্য প্রমাণও আছে। প্রথম হল ফোবস যার নাম সে চাঁদের গতি। সে উপগ্রহটা মঙ্গলের দিন-রাত্রির অর্ধেক সময়ের মধ্যে মঙ্গলকে এক চক্কর দিয়ে আসে।

মঙ্গলের দিন আমাদের পৃথিবীর দিন-রাত্তিরের চব্বিশ ঘণ্টার সামান্য কয়েক মিনিট বেশি। ফোবস-এর মঙ্গল ঘুরে আসতে লাগে মাত্র এগারো ঘণ্টা। ডিমস-এর ব্যাপার আবার একেবারে উলটো। সমস্ত সৌরমণ্ডলে সব গ্রহের মোট বত্রিশটি চাঁদ আছে। ফোবস-এর মতো এত বেগে কোনও চাঁদ ঘোরে না। ডিমস আবার একেবারে সৃষ্টিছাড়া। তার গতি, আর সব চাঁদ যে দিকে ঘোরে, তার উলটো মুখে।'

'না,' এবার সুরঞ্জনকে থামাতে হল। 'তুমি এত কিছু জেনেও একেবারে হালের খবর জানো না। ফোবস যে মঙ্গলগ্রহকে এত তাড়াতাড়ি কেন চক্কর দেয় তার হদিস না পেলেও জ্যোতির্বিদরা এখন জানেন যে ফোবস-এর আকার এমন গোল নয় যে তার ব্যাস সঠিক হিসেব করা যায়। সূক্ষ্ম আধুনিক পর্যবেক্ষণ জানা গেছে যে ফোবস লম্বায় ২৪.৮ কিলোমিটার আর চওড়ায় ২০.৮ একটা পাথরের চাংড়া। সুতরাং আমরা যা দেখেছি সেটা ফোবস বলেই মনে হয়। ডিমস যে উলটোদিকে ঘোরে এ ধারণাও ভুল। ফোবস যেমন অত্যন্ত চটপটে, ডিমস তেমনই একেবারে গদাইলস্করি চালে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। এ প্রদক্ষিণে তার চব্বিশের চেয়ে আরও ঘণ্টা তিনেক বেশি লাগে বলে মনে হয় সে যেন উলটোদিকে যাচ্ছে। মঙ্গলগ্রহের ওপর থেকে দেখলে তো তাকে শামুকের গতিতে আড়াই দিনে উলটো দিকে অস্ত যেতে দেখা যাবে। ডিমস সম্বন্ধে ভুল ধারণাটা এই থেকেই গড়ে উঠেছে।'

'ওখানে তো ঝড় হচ্ছে!'

চমকে উঠলাম। যার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম নিজেদের তর্কে মশগুল হয়ে সেই বটুকেশ্বরের গলা। কিন্তু সে বলছে কী?

'ঝড়! ঝড় আবার কোথায়?'

'ওই তো ওখানে!'

বটুককে আর আঙুল দেখাতে হল না। তার ঘাড় ঘোরানো দেখেই জানলার দিকে আমরা দুজনেই তখন ছুটে গেছি। নিজেদের অত্যন্ত আহাম্মক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না! হাতে পাঁজি থাকতে মঙ্গলবার নিয়ে তর্ক নইলে করে!

ওই তো সামনে মঙ্গলগ্রহ! অন্তত তাই বলেই আমার ধারণা। কিন্তু বটুক যা বলেছে তাও তো মিথ্যে নয়! সত্যিই ওখানে ঝড় উঠেছে। এমন প্রচণ্ড ঝড় যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রচণ্ড সাইক্লোনও যার কাছে ছেলেখেলা।

ভাল করে কিছু দেখবারই তো উপায় নেই। ধুলোয় সমস্ত গ্রহ আচ্ছন্ন।

'এত ঝড় যেখানে ওঠে সেখানে হাওয়া আছে নিশ্চয়!' সুরঞ্জন নিজেকেই বোঝাবার জন্য যেন বলেছে, 'আর হাওয়া মানে কী?'

'হাওয়া মানেই প্রাণ নাও হতে পারে!' সত্যের খাতিরে সুরঞ্জনকে বলতে বাধ্য হয়েছি, 'মঙ্গলগ্রহের হাওয়া যা আছে তা অত্যন্ত পাতলা। তাতে প্রাণধারণের উপযুক্ত অক্সিজেন আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। একমাত্র যা বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ বাড়িয়েছে তা হল মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বেশ যথেষ্ট জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব। জল থাকার লক্ষণ মঙ্গলগ্রহের অন্য জায়গাতেও নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকরা ওই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন আশান্বিত নন। ওই

একান্ত প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রাণ যদি বা থাকে, তা ভাইরাস কি লিচেন-এর চেয়ে উঁচু পর্যায়ের হতে পারে না বলে তাঁদের ধারণা। কেউ কেউ তো সে সম্ভাবনাও স্বীকার করেন না। সৌরমণ্ডলে তো নয়ই, সমস্ত নীহারিকামণ্ডলীতেও কোথাও পৃথিবীর মতো প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তন হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না।'

'আপনার বিশ্বাসও যেন তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু—' সুরঞ্জন বেশ ক্ষুণ্ণ স্বরেই আরও কিছু বুঝি বলতে যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ,' তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'একটা কিন্তু-র ওপরই আমারও ভরসা।'"

"কিন্তু-র ওপর ভরসা!"

সুরঞ্জনের নয়, আমাদেরই বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

"কিন্তু হল একটা উল্কা। মর্চিসন মিটিওরাইট নামে যা বিখ্যাত হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ার এক চাষির খামারে সেটা পড়েছিল।" ঘনাদার কাছে এ-ই হয়তো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

"উল্কা পড়েছিল তাতে হয়েছে কী?" জিজ্ঞাসা করতে হল—"কত উল্কাই তো পৃথিবীতে পড়ছে। আমাদের কলকাতার মিউজিয়মে গেলেই অমন কত উল্কা দেখা যাবে।"

"এ উল্কা সে সব থেকে আলাদা!" ঘনাদা বিশদ হলেন, "এ উল্কার ভেতর এমন জিনিস পাওয়া গেছে যার দ্বারা প্রাণের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। জিনিসটা হল প্রাণের প্রধান উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড। উল্কা আসে পৃথিবীর বাইরের কোনও মহাশূন্য থেকে। কোনও উল্কায় অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন পেলে পৃথিবীর বাইরেও কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলেই তাই মনে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য যেমন খুঁতখুঁতে, তেমনই সন্দিগ্ধ। অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন পেয়েও তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা খটকা লাগাতে চেয়েছেন এই বলে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন মানেই অপার্থিব অন্য কোনও গ্রহের প্রাণের প্রমাণ মনে করব কেন? উল্কা পৃথিবীতে এসে পড়বার পর তাতে এখানকার প্রাণেরই কেমন করে একটু ছোঁয়া যে লাগেনি তার ঠিক কী? এ সন্দেহের জবাব একমাত্র ওই মর্চিসন মিটিওরাইট-এই আছে।"

"উল্কার মধ্যে সে আবার কী জবাব?"

"জবাব এই যে ওই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে তা ডান-হাতি।"

"ডান হাতি!"

ঘনাদা কি আমাদের আবোল-তাবোল পড়াচ্ছেন?

না, আবোল-তাবোল নয়। ঘনাদা করুণা করে আমাদের তারপর বুঝিয়ে দিলেন, "পৃথিবীর প্রাণবস্তুর যে অ্যামিনো অ্যাসিড, তার অণুর গঠন বাঁ-হাতি, অর্থাৎ অণুগুলো বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সাজানো। আর মর্চিসন উল্কায় তা ডান-হাতি। এইখানেই আমার 'কিন্তু' আর এই 'কিন্তু'র ওপরই ভরসা। এ প্রমাণও সন্দেহে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কেউ কেউ বলছেন, ও ডান-হাতি অণু দিয়েও কিছু প্রমাণ হয় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকবার পর প্রচণ্ড উত্তাপে বাঁ-হাতি গড়ন

ডান-হাতি হয়ে গেছে। অবিশ্বাসীরা যে যাই বলুক, এই মর্চিসন মিটিওরাইট-এর 'কিন্তু'র ভরসা আমি ছাড়িনি।"

॥ দশ ॥

"মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নামবার পর সে 'কিন্তু'র ওপর ভরসা কিন্তু আর রাখা গেল না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত অনেক প্যাঁচ কষে মঙ্গলগ্রহে গিয়েই নামলাম। প্যাঁচের মধ্যে আসল হল লুটভিককেই কখনও রাগিয়ে কখনও ভয় দেখিয়ে শূন্যযানের কলা-কৌশল একটু বুঝে নেওয়া।

ভাগ্যি ভাল যে তখনও শূন্যযানের আসল রহস্য কিছু জানতে পারিনি। শুধু চালাবার কৌশলটাই শিখে নিয়েছি। চালাবার কায়দা-কানুন তার অতি সোজা। বোতাম টেপো, হাতল টানো, চাকতি ঘোরাও ডাইনে বাঁয়ে, আর নজর রাখো ক-টা আলোর ওপর। আমাদের ট্রাফিক সিগন্যালের উলটো নিশান সেখানে। যতক্ষণ লাল ততক্ষণ কামাল। হলদে কি নীল হলেই হুঁশিয়ার হয়ে এদিকে বোতাম টেপো কি ওদিকের হাতল টানো।

সৃষ্টিছাড়া কী সর্বনাশা জিনিস নিয়ে যে কারবার করছি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি বলে অকুতোভয়ে কলকবজা নেড়ে-চেড়ে শূন্যযান মঙ্গলের পিঠে গিয়ে নামিয়েছি।

ধুলোর ঝড় তখন থিতিয়ে এসেছে! তবু চারিদিকে বেশ কিছুটা ঝাপসা।

শূন্যযান থেকে বার হতে তখনও সাহস করিনি। বাইরে আমাদের নিশ্বাস নেবার জন্য হাওয়া তো থাকবারই কথা। যদি বা থাকে তা পৃথিবীর প্রাণীর পক্ষে বিষও তো হতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে এসে পৌঁছেছি তাই যথেষ্ট। সেখানে নেমে কোনও লাভ হবে কিনা তাই তখন ভাবছি।

জানলা দিয়ে গ্রহের যা চেহারা চোখে পড়ছে তা নামবার উৎসাহ বাড়াবার মতো নয়। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকেরা যা অনুমান করেছেন—সেই ধু ধু মরু।

যন্ত্রঘরে টাঙানো মানচিত্র দেখে বুঝলাম, মঙ্গলগ্রহের ইলেকট্রিস যার নাম দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটাতেই নেমেছি।

হাওয়ার অস্তিত্ব মাপার যন্ত্রটা বিকল, কিন্তু জলীয় বাষ্প মাপবার যন্ত্রটায় দেখলাম পৃথিবীর থেকে যা ধারণা হয় মঙ্গলগ্রহ তার চেয়েও অসম্ভব রকম শুকনো। পৃথিবীর মরুপ্রদেশের হাওয়াতে যা জলীয় বাষ্প আছে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় বাষ্পের পরিমাণ তার প্রায় দু-হাজার ভাগের মতো।

হাওয়ার ব্যাপারটা না-ই জানা যাক, এত শুকনো আবহাওয়ায় কোনও প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবই ধরে নিতে হয়।

মিছিমিছি এ শ্মশান-প্রান্তরে নেমে তাহলে লাভ কী। মঙ্গলগ্রহে নামতে পেরেছি সেই গর্বটুকু নিয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করাই তো ভাল।

অক্সিজেন মুখোশ নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নেমে একটু ঘুরে আসা অবশ্য যায়। কিন্তু

তাতেও অজানা ভয়ংকর কোনও বিপদ যে নেই তা-ই বা কে বলতে পারে!

অন্য কিছু না হোক, এখানকার নামমাত্র হাওয়ার ছাঁকনিতে অবারিত আলট্রাভায়োলেট আর কসমিক রে অর্থাৎ মহাজাগতিক রশ্মির বৃষ্টিই মানুষের পক্ষে মারাত্মক হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জানলায় দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ বটুকের কথায় চমকে গেলাম।

বটুক অবশ্য উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে কিছু বলেনি। তার সেই নিজস্ব মার্কামারা মুখস্থ-পড়া-বলার ধরনের কথা।

কিন্তু কথা যা বলেছে তা সত্যিই চঞ্চল করে তোলবার মতো। আর কেউ হলে যে কথাটা বলতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একাকার করত বটুকেশ্বর তা-ই বলেছে নেহাত যেন কলকাতার বাড়িতে বসে 'বাজারে যাচ্ছি' বলার মতো। কথাটা কিন্তু হল—'বেরিয়েই লুকোল।'

'বেরিয়েই লুকোল! সে কী! কী লুকোল? কোথা থেকে বেরিয়ে? কোথায় লুকোল?'

আমি আর সুরঞ্জন দুজনেই তার দিকে ফিরে ব্যাকুল উত্তেজিত অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

'ওই একটা জাঁতার কাছে।' বটুকেশ্বরের ভাবান্তর নেই।

'জাঁতার কাছে! জাঁতা!' আমরা আরও হতভম্ব।

তার পরই অবশ্য খেয়াল হয়েছে যে বটুকেশ্বর তার নিজের বুদ্ধিতে একরকম বুঝিয়ে যা বলতে চেয়েছে তা খুব ভুল নয়। এই মরুভূমির ভেতর বেশ দূরে দু-তিনটে যে পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে দেখতে খানিকটা যেন দৈত্যদানোর বিরাট জাঁতার মতো চ্যাপ্টা গোল গোছের।

'কিন্তু সেই জাঁতার কাছে বেরিয়েই লুকোলটা কী?'

এ প্রশ্নের উত্তরে বটুক সামান্য একটু যেন অবাক হয়েছে আমাদের দৃষ্টিশক্তির অভাবে।

'আপনারা দেখতে পাননি? ওই যে ছোটবড় মাথায় মাথায় বসানো ক-টা জালা!'

ক-টা জালা—তাও আবার বেরিয়েই লুকিয়ে গেল! বলছে কী বটুকেশ্বর!

জাঁতার উপমাটা ঠিকই একরকম দিয়েছিল, কিন্তু এই জালার ওপর জালা দেখা তো নির্ঘাত মাথা খারাপের লক্ষণ।

শেষে বটুকেশ্বরেরও মাথা খারাপ হল দেখে তখন সত্যি দুঃখ হচ্ছে। যে-কোনও অবস্থায় একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা বটুকেরই যখন মাথা খারাপ হল তখন আমাদের আর হতে কতক্ষণ বাকি!

মাথা খারাপ হওয়ার অবশ্য অপরাধ বা কী? থর-এর মরুর ঝড়ে প্লেন থেকে নামার পর থেকে যা আমাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে তাতে মাথা যে এতক্ষণ ঠিক ছিল সেইটেই ভাগ্য।

কারওর মাথায় গোলমাল শুরু হলে তখন তাকে ঘাঁটিয়ে অসুখ বাড়াবার সুযোগ

দিতে নেই।

বটুকের কথাটাই তাই যেন মেনে নিয়ে তাকে একটু খুশি করবার জন্য বললাম, 'জালাগুলো কারও মাথায় ছিল বুঝি?'

'না,' বটুক মাথা নেড়ে জানাল, 'পর পর ক-টা যেন জালা, ওপরেরটা ছোট, মাঝেরটা বড়, আর তার নীচের দুটো কলসি। সেগুলো নিজে থেকেই বেরিয়ে আবার জাঁতার আড়ালে চলে গেল।'

'তা যদি গিয়ে থাকে তাহলে আবার দেখা যাবে নিশ্চয়।' বটুককে উৎসাহ দিলাম, 'চোখের দোষ তোমার নেই যে বলব ভুল দেখছ।'

বটুক জবাব দিলে না। কিন্তু মনে মনে আমি তখন ওই সম্ভাবনাটাই সঠিক বলে ধরে নিয়েছি। বটুকের চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর, কিন্তু মাথা খারাপ যদি না-ও হয়ে থাকে, দেখতে এবার তার ভুল যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুরঞ্জনও ব্যাপারটা বুঝেছে নিশ্চয়। তবু চোখের ইশারায় তাকে বটুককে একটু সামলে রাখতে বলার জন্য তার দিকে চাইতে গিয়ে একটু অবাক হলাম।

সুরঞ্জন যেভাবে চোখ দুটো জানলায় প্রায় সেঁটে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে তাতে বটুকের কথায় তার খুব অবিশ্বাসের লক্ষণ তো নেই।

তার সম্বন্ধে একটু ভাবিত হয়ে আধা-ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমিও জালা-টালা দেখতে পাচ্ছ নাকি?'

'এখনও পাইনি।' আমার দিকে মুখ ফিরিয়েই সুরঞ্জন উত্তর দিলে, 'কিন্তু বটুক যখন দেখেছে তখন তা একেবারে ভুল হতে পারে না।'

এবারে হেসে ফেলে বললাম, 'বটুকের দেখা ঠিক হলে তো পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা সব বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবেন। হাওয়া নেই, জল নেই এমন যমের অরুচি মরুভূমির দেশ, অতি বড় আশাবাদী বৈজ্ঞানিকও যেখানে ভাইরাস কি লিচেন-এর চেয়ে উঁচু ধাপের প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে মনে করেন না, সেখানে একেবারে জালা-প্রমাণ জানোয়ার! তা-ও আবার পর পর সাজানো জালা।'

একটু থেমে আবার বলেছি, 'দেখো, জালা-জন্তুর অস্তিত্ব যদি প্রমাণ করতে পারো তো পৃথিবীতে ফিরে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলতে পারবে। তা পৃথিবীতে ফেরার ব্যবস্থা করার জন্যই লুটভিক-এর একবার খবর নিয়ে আসা দরকার।'

তখনই যদি লুটভিক-এর খোঁজে যাবার জন্য অত ব্যস্ত না হই তাহলে জর্জ বিশ্বাস আর পঙ্কজ মল্লিক, মান্না দে আর তালাত মামুদের সঙ্গে আরেকটা ভারত-জোড়া নাম আজ গানের জগতের গর্ব হয়ে থাকে। সুরঞ্জন সরকার নামটা আজ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু তা হবার নয়। ও নামটা পৃথিবীর গানের জগতে আর লেখাই হল না।"

ঘনাদা একটু ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামলেন।

"তার মানে—হল কী সুরঞ্জন সরকারের?" উতলা হয়ে উঠলেন কার্ডিওগ্রাম সান্যাল।

"মারা গেলেন নাকি?" ব্লাডপ্রেশার সোম দারুণ উদ্বিগ্ন।

"ওই কাঠপোড়া ছাইতেও কাজ হল না?" ব্লাডটেস্ট গুপ্তের বেয়াদবি আশঙ্কা।

"কাঠপোড়া ছাইয়ে কাজ হবে না কেন? তারই জোরে সব তো তখন চাঙ্গা।" আহম্মকদের বেওকুফি বেচাল বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি শুধরে দিতে হল আমাদের— "সুরঞ্জন সরকার বোধ হয় হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল, না ঘনাদা?"

কাঠপোড়া ছাইয়ের অপমানে বিপজ্জনক ভাবে কোঁচকানো ভুরুটা কিছুটা সরল হতে দেখে সাহস করে আবার একটু ন্যাকা সাজলাম—"মঙ্গলগ্রহের ওই ইলেকট্রিসিটিতে শেষ পর্যন্ত নামতে হল বুঝি?"

"ইলেকট্রিসিটি নয়, ইলেকট্রিস," ঘনাদা সানন্দে সংশোধন করে আবার শুরু করলেন, "ইলেকট্রিস হল মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের একটা জায়গা। সেখানে নামবার সত্যিই বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। নামতে যদি হয় মঙ্গলের উত্তর মেরুর কাছাকাছি নামলেই লাভ কিছু হতে পারে। সেখানকার মেরুর আইসক্যাপ অর্থাৎ হিমমুকুট জল নয়, জমানো কার্বন ডায়ক্সাইড দিয়ে তৈরি বলে অনেক জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিকের ধারণা, কিন্তু সে ধারণা বাতিল করবার মতো প্রমাণও আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। পৃথিবীর মেরু প্রদেশের মতো মঙ্গলেরও গ্লেসিয়ার অর্থাৎ হিমবাহ আছে বলে জানা গেছে। কার্বন ডায়ক্সাইডের শুকনো তুষার থেকে কিন্তু হিমবাহ সৃষ্টি হয় না। হিমবাহের অস্তিত্ব থেকেই সেখানে জল আছে বলে সুতরাং ধরে নেওয়া যায়। আর জল থাকলে সেখানেই অন্তত প্রাণের চিহ্ন পাবার আশা কিছুটা করা যেতে পারে।

ইলেকট্রিস থেকে শূন্যযান উড়িয়ে আবার উত্তর মেরু অঞ্চলে নামতে হলে অবশ্য আরও অনেক হাঙ্গামা করতে হত। সে হাঙ্গামা পোহাবার উৎসাহ শেষ পর্যন্ত হত কিনা জানি না—কিন্তু তার অবসরই আর হল না।

কন্ট্রোল রুমে লুটভিককে দেখে আসতে গিয়ে তার একটা গালাগাল শুনে এসে আমাদের কামরায় ঢুকে একটু অবাক হলাম।

সুরঞ্জন আর বটুক গেল কোথায়?

এতদিন বাদে নিজেদের বানানো কয়েদ-ঘর খুলে বার হবার সুবিধে পেয়ে শূন্যযানটা ভাল করে ঘুরে দেখতে গেছে নাকি! তাই যাওয়াই সম্ভব।

বটুক যে জালা-জন্তুর আভাস দেখেছিল, তা আর দেখতে পায়নি নিশ্চয়। তা পেলে এ জানলা থেকে সুরঞ্জনকে কি নড়ানো যেত?

বটুকের চোখের জোর সত্যিই যে অসাধারণ তার প্রমাণ আগেও পেয়েছি, কিন্তু এবারে তার অমন দৃষ্টিবিভ্রম কী থেকে হল তা জানলায় একবার দেখতে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

এ আমি কী দেখছি!

শেষকালে আমারও চোখে ধাঁধা লাগল নাকি!

সত্যিই বড় বড় পাথর ছড়ানো রাঙা বালির প্রান্তর দিয়ে ও কী রকম দুটো কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি চলে যাচ্ছে।

কিন্তু বটুক যা বলেছিল সে রকম কিছু তো এ মূর্তিগুলো নয়। বটুক জালার ওপর জালা বসানো এক রকম অদ্ভুত চেহারা চকিতে দেখবার কথা বলেছিল।

আমি যা দেখছি তার সঙ্গে জালা কি কলসির কোনও মিল কিন্তু নেই।

এগুলো যেন—

ওই পর্যন্ত ভাবতে গিয়ে যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে চমকে আমাদের কামরার বাইরের একটা ছোট কুঠুরিতে ছুটে গেলাম।

দরজা খুলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পরই চক্ষুস্থির।

ঠিক যা ভয় পেয়েছিলাম তা-ই।

এ কুঠুরিটা শূন্যযানের কিছু খুঁটিনাটি দরকারি জিনিসের সঙ্গে অক্সিজেন মুখোশ, স্পেস-স্যুট ইত্যাদি রাখবার জায়গা।

লুটভিক সেই প্রথম দিন এ কুঠুরি আর তার সাজ-সরঞ্জাম আমাদের দেখিয়ে আনতে ভোলেনি।

অন্য জিনিসপত্রের মধ্যে সেদিন এক সারিতে দাঁড় করানো গোটা পাঁচেক একটু অদ্ভুত ধরনের স্পেস-স্যুট দেখার কথা স্পষ্টই মনে আছে।

সেই স্পেস-স্যুটের সারির দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

দুটো পোশাক সেখানে নেই। কেন যে নেই তা আর বুঝতে দেরি হল না।

ছুটে গিয়ে আবার জানলার কাছে দাঁড়ালাম।

স্পেস-স্যুট পরা চেহারা দুটো তখন অনেক দূরে চলে গেলেও একেবারে অদৃশ্য হয়নি। বটুক যেগুলোকে জাঁতা বলে বোঝাতে চেয়েছিল দূরের সেই রকম একটা চ্যাপটা পাথরের চাঁইয়ের দিকেই সে দুটো যাচ্ছে।

মূর্তি দুটো যে স্পেস-স্যুট পরা সুরঞ্জন আর বটুকেশ্বরের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন অবশ্য মনে নেই।

কিন্তু ওদের দুজনের হঠাৎ এ সর্বনাশা খেয়াল হল কেন? বটুক যা বলেছিল তারপর সুরঞ্জন জানলা থেকে সে রকম কোনও জালা-মূর্তি কি দেখতে পেয়েছে?

তা পেয়ে থাকলে আমাকে তা জানাবার ফুরসুতটুকুও তাদের হয় না কেন?

আমি তাদের এ সংকল্পে বাধা দেব এই ভয়ে?

কিন্তু বটুক যা দেখেছে সুরঞ্জনও সে রকম কিছু দেখে থাকলে আমি বাধা দিতে যাব কেন? ভেবে দেখতে গেলে মনে হয়, তাদের এমনভাবে বেরিয়ে পড়াটা নিছক খেয়াল বলেই আমায় কিছু জানাতে তারা চায়নি।

বটুক যা দেখেছে বলেছে, তা-ই বিশ্বাস করার দরুন একবার বেরিয়ে খোঁজ করবার লোভ সুরঞ্জন সামলাতে পারেনি।

কাজটা ওদের খুবই অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন কী করব?

আরেকটা স্পেস-স্যুট পরে তাদের পেছনে বেরিয়ে পড়ব?

কিন্তু তখন তাহলে শূন্যযানটায় একা লুটভিককে রেখে তো চলে যেতে হয়।

লুটভিক অবশ্য বাঁধা আছে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস কিছু তো নেই। চোখে চোখে না রাখলে কী যে সে করবে কে বলতে পারে। একবার কোনও উপায়ে বাঁধনগুলো

খুলতে পারলে তো আমাদের সর্বনাশ। পৃথিবীতে ফেরার আশা তাহলে তো নেইই, এখানে, এই মঙ্গলগ্রহেই কী পৈশাচিক প্রতিশোধ সে নেবার চেষ্টা করবে কে জানে।

তাকে একলা ছেড়ে যেতে তাই রীতিমত দ্বিধা হয়।

সে দ্বিধাও অবশ্য শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারলে না।

জানলা দিয়ে সারাক্ষণই বাইরে নজর রেখেছিলাম। সুরঞ্জন ও বটুকের মূর্তি দুটো ক্রমশ ছোট ও অস্পষ্ট হয়ে এলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তারপর একটা জাঁতা-পাথরের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অস্থির হয়ে উঠলাম।

জাঁতা-পাথরের আড়ালে মূর্তি দুটো একেবারে মিলিয়ে গেল নাকি?

তা না গেলে, যত ছোটই হোক, মূর্তিগুলোকে জাঁতা-পাথরের পেছন থেকে বার হবার পর দেখতে পাওয়ার কথা।

ওরা দুজনে ওখানেই থেমে গেছে তাহলে। থেমে যাওয়ার কারণটা কী?

জালা গোছের চেহারা তো বটুকের কথা মতো ওই রকম একটা জাঁতা-পাথরের ধার থেকেই বেরিয়ে আবার লুকিয়ে পড়েছিল।

এখন ওখানে গিয়ে সে জালা-জন্তুর নতুন কোনও চিহ্ন ওরা কি তাহলে পেয়েছে?

ধৈর্য ধরে আর থাকা গেল না। কন্ট্রোল রুমে গিয়ে লুটভিককে আর একবার দেখে এসেই স্পেস-স্যুট পরে শূন্যযানের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শূন্যযানের এয়ার-লকটা বন্ধ করে বাইরে লালচে বালির ওপরে এসে দাঁড়াবার পর বুকটা একবার যে ছাঁৎ করে উঠল সে কথা অস্বীকার করতে পারব না। মনে হল শূন্যযান ছেড়ে এসে নিজেদের নিয়তি কি নিজেরাই শিলমোহর করে এলাম।

ও শূন্যযানে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার ভাগ্য কি আর হবে?

সে বিষয়ে আশঙ্কা উদ্বেগ যতই থাক, সুরঞ্জন আর বটুকের খোঁজ আগে না করলে নয়।

যে জাঁতা-পাথরের কাছে তাদের শেষ দেখেছিলাম দেরি না করে সেদিকেই পা বাড়ালাম তাই।

মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর তুলনায় ছোট। চাঁদের মতো অত অল্প না হলেও তার মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। অত ভারী স্পেস-স্যুট পরেও হাত-পা চালাতে তাই কোনও কষ্টই হল না। পৃথিবীতে যা কমপক্ষে পনেরো মিনিটের পথ, মিনিট দশেকের আগেই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

শূন্যযান থেকে যা মনে হয়েছিল, কাছে যাবার পর দেখা গেল জাঁতা-পাথরের ঢিবিটা তার চেয়ে অনেক বড়।

পাথরের চাংড়ার আড়ালে সুরঞ্জনকেও দেখতে পেলাম। ঠিক দেখতে পেলাম বলা অবশ্য ভুল। লম্বা-চওড়া আকারটা দেখে বুঝলাম স্পেস-স্যুটটার ভেতর বটুক নয়, সুরঞ্জনই আছে।

কিন্তু সে একা কেন? বটুক কোথায় গেল?

স্পেস-স্যুটের স্পিকিং টিউব দিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম সুরঞ্জনকে।

'তুমি এখানে বসে বসে করছ কী? বটুক তো তোমার সঙ্গেই এসেছিল। সে গেল

কোথায়?'

উত্তরে কোনও কথা না বলে সুরঞ্জন শুধু সামনের জাঁতার মতো পাথুরে ঢিবিটা হাত বাড়িয়ে দেখালে।

পাথুরে ঢিবিটা কী দেখাচ্ছে সুরঞ্জন? স্পেস-স্যুটের মুখোশে ঢাকা না থাকলে তার মুখটা দেখবার চেষ্টা করতাম।

অবাক হয়ে ঢিবিটা একবার দেখে আবার সুরঞ্জনের দিকে ফিরলাম—'কী হল কী তোমার? ও ঢিবি কী দেখাচ্ছ? বটুক কোথায় গেল তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।'

এবার সুরঞ্জনের গলাই শোনা গেল, 'বটুক ওখানেই গেছে।'

ওখানেই গেছে মানে কী? বটুক ওই পাথুরে ঢিবির মধ্যে গেছে? এ কি ভোজবাজি নাকি! না, মঙ্গলগ্রহের মাটিতে মাথা খারাপ করবার কোনও কিছু আছে?

সুরঞ্জনকে রহস্যটা একটু বুঝিয়ে দেবার কথা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় চোখটা দূরে একটা জায়গায় আটকে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানকার মতোই আরেকটা চ্যাপ্টা গোল ধরনের পাথুরে ঢিবির কাছে কী ওগুলো?

বটুক যা বলেছিল হুবহু তো তাই।

গোল গোল পর পর সাজানো ক-টা যেন কলসি আর জালা।

সেগুলো তো ওই ঢিবির ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে ও আসছে।

প্রথমে দুটো, তারপর একটা একটা করে আরও তিনটে।

এ কী ধরনের জানোয়ার?

সত্যিই জানোয়ার, না ভৌতিক কিছু?

ভৌতিক না হলে ওই পাথরের ঢিবির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কী করে?

শুধু যে বেরিয়ে আসে তা নয়, সুরঞ্জনের কথা বিশ্বাস করতে হলে তো জলজ্যান্ত অন্য কাউকে ওই পাথরের মধ্যে মিশিয়ে দিতেও পারে বলে মানতে হয়!

সুরঞ্জনও তখন জালা-মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

স্পেস-স্যুটের ভেতর দিয়েই চাপা উত্তেজিত গলায় বললে, 'দেখতে পেয়েছেন? বিশ্বাস হয়েছে এবার বটুকের কথা?'

বিশ্বাস তো হয়েছে, কিন্তু এখন কী করা উচিত তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই অদ্ভুত মূর্তিগুলোর ভাল করে একটু পরিচয় নেবার চেষ্টা করব? বটুক কি সেই রকম কিছু করতে গিয়েই পাথরের ঢিবির মধ্যে মিশিয়ে গেছে?

মুর্তিগুলো কী ধরনের জীব তাও তো জানা নেই! নিরীহ, নির্দোষ, না হিংস্র নিষ্ঠুর?

মঙ্গলগ্রহে এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বও তো কেউ কখনও কল্পনা করেনি।

কোনও আজগুবি বৈজ্ঞানিক গল্পেও এরকম প্রাণীর কল্পনা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

এদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাই বা কীভাবে করা যায়?

মূর্তিগুলো দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের যে লক্ষ করছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু দাঁড়ানোটা তাদের ধীর স্থির নয়, পাঁচটা মূর্তি অনবরতই নড়ছে চড়ছে।

ওটা কি উত্তেজনার লক্ষণ?

উত্তেজিত হওয়া আশ্চর্য তো কিছু নয়। আমরা তাদের দেখে যদি তাজ্জব হয়ে থাকি তো তাদেরও তো আমাদের দেখে তাই হওয়ার কথা।

প্রথমত, তাদের এই মঙ্গলগ্রহে এ রকম অচেনা অদ্ভুত এক রকম প্রাণীর আবির্ভাবই তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, স্পেস-স্যুটে আমাদের যা চেহারা হয়েছে কিছু না জেনে তা প্রথম দেখলে পৃথিবীর কোনও সরল পাহাড়-জঙ্গলের মানুষও ভয়েই ভিরমি যেত নাকি?

আমরা যেমন তাদের সম্বন্ধে কী করা উচিত ঠিক করতে পারছি না, তাদেরও অবস্থা নিশ্চয় তথৈবচ।

অবশ্য যাদের দেখছি, তারা মানুষের মতো বুদ্ধিমান মঙ্গলগ্রহের কোনও জীব যদি না হয় তাহলে এসব কথাই ওঠে না।

বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলে ধরে নিয়ে প্রথমে কীভাবে তাদের বোঝানো যায় যে আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ভাব করতেই চাই?

গলার স্বর তো এখানে কোনও কাজে লাগবে না। বেঢপ স্পেস-স্যুটের ভেতর থেকে কোনও ইঙ্গিত করাও শক্ত। হাত-পাগুলো একটু নেড়েচেড়ে ভাব করবার কোনও ভঙ্গি দেখানো যায় কিনা তাই ভাবতে হয়।

ভাববার কিন্তু আর দরকার হল না।

জালা-মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলাম সেই পাথরের ঢিবির দিকেই নড়তে শুরু করেছে।

'শিগগির আসুন', বলে সেই মুহূর্তেই সুরঞ্জন তার বেঢপ স্পেস-স্যুট নিয়েই মূর্তিগুলোর দিকে ছুট লাগাল।

'ও কী করছ কী?' বলেও তাকে তখন অনুসরণ না করে পারলাম না।

জালা-মূর্তিগুলো আমাদের ছুটতে দেখে চঞ্চল যে হয়ে উঠেছে তা চোখেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ওই বিদঘুটে ঢাউস শরীর নিয়েই তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চ্যাপটা ঢিবিটার আড়ালে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু সেখানে যাচ্ছে কোথায়?

আর সুরঞ্জনই বা সেদিকে অমন পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে কেন?

মূর্তিগুলো এখন যেন পালাতেই ব্যস্ত মনে হলেও বেকায়দায় পড়ে ফিরে দাঁড়াতেও তো পারে!

তারা তখন কীরকম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক কী? তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ক্ষমতার কথা কিছুই না জেনে এমন বেপরোয়া হয়ে তাদের ওপর চড়াও হওয়া কি উচিত?

কিন্তু সে কথা কাকে বলব!

স্পেস-স্যুটের স্পিকিং টিউবে বৃথাই দুবার সুরঞ্জনকে সাবধান করবার চেষ্টা করলাম। সে তখন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে।

পাঁচটা জালা-মূর্তির চারটেই ইতিমধ্যে জাঁতা-পাথরের আড়ালে অদৃশ্য।

শেষেরটাও সেখানে গা-ঢাকা দেবার আগেই সুরঞ্জন সেখানে গিয়ে পৌঁছল!

কিন্তু পৌঁছেও লাভ কিছু হল না। ওই ঢাউস জালা-মূর্তির একটাকে খালি হাতে ধরতে গেলেও হাতের বেড় কুলোত না। স্পেস-স্যুটের গাবদা ফোলা হাতে তাও অসম্ভব।

সুরঞ্জনকে অবশ্য সে চেষ্টা করতেও দেখলাম না! শেষ জালা-মূর্তিকে ধরবার চেষ্টা না করে তার পেছন নেওয়া জন্যই সে যেন ব্যস্ত।

উদ্দেশ্য তার সফলই হল। জালা-মূর্তিটার পিছু পিছু তাকেও চ্যাপ্টা পাথুরে জাঁতা-ঢিবিটার পেছনে অদৃশ্য হতে দেখলাম।

কিন্তু সে গেল কোথায়?

কয়েক সেকেন্ড বাদেই সে জায়গায় পৌঁছে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেলাম।

এমন দারুণ একটা ভৌতিক ব্যাপার আমার চোখের ওপরই সত্যি ঘটে গেল নাকি!

জালা-মূর্তিগুলোর সঙ্গে সুরঞ্জনও তার স্পেস-স্যুট নিয়ে মিলিয়ে গেল ওই জাঁতা-ঢিবির গায়ে?

'শিগগির! শিগগির নেমে আসুন!'

সুরঞ্জনের গলা শুনে চমকে না উঠলে ওইখানেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম কে জানে!

তারপর হতাশ হয়ে শূন্যযানেই ফিরতে হত।

কিন্তু স্পিকিং টিউবে সুরঞ্জনের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা আপনা থেকেই পাথুরে ঢিবিটায় গিয়ে পড়ল। জালা-মূর্তি আর সুরঞ্জনের অন্তর্ধানের রহস্য সেইখানেই উদ্‌ঘাটিত।

একমুহূর্ত দেরি করবার কিন্তু তখন আর সময় নেই।

সুরঞ্জনের গলাটা যেন কোন ভাঙা লাউড স্পিকারের ভেতর দিয়ে বিশ্রী বিকৃত গোঙানো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'দেরি করবেন না! দেরি—'

বাকিটা আর শোনা গেল না। শোনার অপেক্ষা আমি অবশ্য করিনি।

তার আগেই ওই স্পেস-স্যুট নিয়েই প্রায় লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি জাঁতা-ঢিবিটার ধারে।

॥ এগারো ॥

হ্যাঁ, জাঁতা-ঢিবিটার ওপর নয়, গায়েই বিরাট একটা ফোকর। আর সেই ফোকরের নীচে বিরাট ইঁদারার মতো এক গভীর গর্ত। ফোকরের ধার দিয়ে একটা গড়ানে ঢালও বাচ্চাদের স্লিপ খাবার কাঠামের মতো নীচে নেমে গেছে।

ফোকর দিয়ে সেই ঢালটার ওপর দিয়েই আগের সবাই গড়িয়ে গেছে।

আমার পক্ষে সেটা কিন্তু সহজ হল না।

ফোকরটা তখনই ধীরে ধীরে বুজে আসতে শুরু করেছে। যতটুকু বুজে এসেছে, ওপর থেকে দেখলে পাথুরে-ঢিবিটা থেকে তা আলাদা করে চেনা অসম্ভব। বাকিটুকু বন্ধ হয়ে গেলে আগের দেখা জাঁতা-ঢিবির মতো ওপর থেকে কিছু ধরাই যেত না।

আধখানা বুজে আসা ফোকরের ভেতর দিয়ে কোনওরকমে গলে গেলাম বটে কিন্তু স্পেস-স্যুটের একটা হাতা শেষ পর্যন্ত বুজে যাওয়া ফোকরের ফাঁকে এমন আটকে গেল যে টেনে সেটা ছাড়াতে গিয়ে একটু ছিঁড়েই গেল।

গড়ানে ঢাল দিয়ে নীচে নেমে যেতে যেতে বুকটা তখন আতঙ্কে একেবারে হিম।

স্পেস-স্যুট ছিঁড়ে যাওয়া মানে তো সর্বনাশ। পৃথিবীতে যে-হাওয়ার চাপে আমরা অভ্যস্ত, শুধু তাই কমে গিয়ে শরীরের রক্ত চলাচল থেকে সব কিছু বেসামাল শুধু হবে না, নিশ্বাসের হাওয়াই তো আর পাব না!

ওপরে কোথাও থাকলে, স্পেস-স্যুট একেবারে বিকল হওয়ার আগে কোনওরকমে শূন্যযানে পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারতাম, কিন্তু এ তো পাতাল-গহ্বরে কোথায় যে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছি তাই জানি না!

মাথা খুঁড়লেও এখন তো ওপরে ওঠবার আর আশা নেই।

যে-ঢালটা দিয়ে নামছি সেটা আরও গড়ানে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামবার বেগ যেমন কমতে লাগল, সুড়ঙ্গ-কূপটার গাঢ় অন্ধকারও তেমনই ফিকে হয়ে এল।

আমার বেশ কিছুটা নীচে স্লিপ খাওয়ার মতো করে নামায় সুরঞ্জনের স্পেস-স্যুটটা তখন অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সেই সঙ্গে আরও ক-টা জিনিস যা টের পাচ্ছি সেইটেই মারাত্মক।

নিশ্বাসের কষ্টে বুকটা ক্রমশ যেন জাঁতা-কলে চেপে ধরছে।

প্রাণপণে হাঁপরের মতো নিশ্বাস টেনে আর ফেলেও হাওয়ার অভাব যেন মিটছে না।

মাথাটা তখনও একেবারে ঘোলাটে হয়ে যায়নি বলে ব্যাপারটা কী হচ্ছে তা একটু বুঝতে পারছি।

স্পেস-স্যুট ছিঁড়ে ফুটো হয়ে যাওয়ার দরুন ভেতরকার হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে শরীরের ওপরকার স্বাভাবিক চাপ রাখার ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস জোগাবার মুখোশটাও কাজ করছে না।

বাতাসহীন এই গ্রহে যার দৌলতে এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে চলাফেরা করেছি সেই মুখোশ মুখে এঁটেই এবার দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

গড়ানে ঢালটা আরও কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে জানি না কিন্তু সজ্ঞানে সেখানে পৌঁছনো আমার কপালে নেই।

বাতাসের অভাবের অসহ্য কষ্টটাও ক্রমশ তখন মাথাটা অসাড় হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

গড়িয়ে নামা শেষ হবার আগেই একটা নিবিড় অন্ধকারের মাঝে যেন ডুবে গেলাম।

ব্যাপার যা হয়েছিল তাতে জ্ঞান আর না হবারই কথা।

কিন্তু জ্ঞান তবু ফিরল। ফিরল আমার অজ্ঞান অবস্থাতেই একটা অচেতন যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায়।

প্রথম একটু হুঁশ হবার পর টের পেলাম একটা বেশ প্রশস্ত গোলাকার জায়গায় আমি পড়ে আছি আর প্রাণপণে সুরঞ্জনকে বাধা দিচ্ছি যাতে আমার মাথা থেকে খুলে ফেলা মুখোশটা সে না চাপাতে পারে।

মুখোশটা নিশ্বাসের কষ্টের পর অজ্ঞান অবস্থাতেই আমি খুলে ফেলেছি নিশ্চয়। সুরঞ্জনের সেটা আবার মাথায় পরিয়ে দেবার চেষ্টাতেও বাধা দিচ্ছি সেই অবস্থায়।

সুরঞ্জনের অবশ্য দোষ নেই। নিশ্বাসের মুখোশ খুলে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই সে সেটা চাপিয়ে দেবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছে। মুখোশটা আগেই বিকল হয়েছে সে আর কী করে জানবে।

মুখোশটা বিকল।

হঠাৎ মাথার ভেতর বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে কথাটা।

মুখোশটা বিকল হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। নিশ্বাস নিতে না পারার যন্ত্রণায় আপনা থেকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই আমি সেটা যে খুলে ফেলেছি তাও ঠিক। কিন্তু খুলে ফেলার পরও বেঁচে আছি কী করে!

শুধু বেঁচে নেই, অজ্ঞান অবস্থা থেকে আবার জ্ঞানও ফিরে পেয়েছি।

কেমন করে তা সম্ভব?

তাহলে কি—?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে স্পেস-স্যুট পরা সুরঞ্জনকে একটু ঠেলে দিলাম।

তার মুখ দেখবার উপায় নেই, কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বুঝলাম ব্যাপারটা যে কতখানি অদ্ভুত ও আশ্চর্য এতক্ষণে তার মাথাতেও ঢুকেছে।

বিনা মুখোশে আমার বেঁচে থাকা আর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার তো একটা মাত্রই মানে হয়।

মঙ্গলের ওপরের হাওয়া যেমনই হোক, এই সুড়ঙ্গ-কূপের ভেতর আমাদের নিশ্বাস নেবার মতো হাওয়াই রয়েছে।

মুখোশ খুলে ফেলার পর স্পিকিং টিউবে কথা বলার উপায় নেই, সুরঞ্জনকে তাই ইঙ্গিতেই মুখোশটা খুলে ফেলতে বললাম।

বার দুই ইশারার পর নির্দেশটা বুঝলেও প্রথমটা সে একটু ভয়ই পাচ্ছিল! আমার ভরসা পেয়ে খুলে ফেলার পর তার উৎসাহ দেখে কে!

'দেখেছেন!' সুরঞ্জন উত্তেজিত ভাবে বললে, 'একেবারে আমাদের পৃথিবীর মতো হাওয়া, বরং আরও নির্মল পরিষ্কার, ঠিক আমাদের সমুদ্রের ধারের হাওয়ার মতো। অথচ ওপরে মঙ্গলগ্রহে তো বাতাস নেই বললেই হয়। যা আছে তা পৃথিবীর হাওয়ার শতকরা এক ভাগ মাত্র ঘন। তারও বেশির ভাগ কার্বন ডায়ক্সাইড, তাতে অক্সিজেন আর জলীয় বাষ্প যা আছে তাও ছিটেফোঁটার বেশি নয়।'

'সব তো বুঝলাম', সুরঞ্জনের উত্তেজিত বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই সুড়ঙ্গ-কূপে এমন হাওয়া এল কোথা থেকে? জায়গাটাও বা কী?'

জায়গাটা একটু অবাক করবার মতোই। যেখানটায় গড়িয়ে নেমেছি, সেটা খুব বড় সার্কাসের তাঁবুতে ঘেরা খেলার অ্যারিনার মতো গোল একটা জায়গা। তার একদিকে যেখান দিয়ে আমরা নেমে এসেছি সেই ঢালু সুড়ঙ্গটা ওপরে উঠে গেছে, আর একদিকে পাথরের দেয়াল ভেদ করে ওপরে উঠবার একটা চওড়া গোল সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। জায়গাটার চারিধারের মসৃণ পাথুরে দেয়ালে আর-কোনও আসা-যাওয়ার ফাঁক কি দরজা কিছু নেই। মাথার ওপরেও নিরেট একটানা পাথুরে ছাদ একেবারে নিশ্ছিদ্র।

এরকম জায়গার আসল তাৎপর্যটা কী? শুধু একদিক দিয়ে গড়িয়ে নেমে আর একদিক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার জন্যই জায়গাটা রাখা আছে বলে তো বিশ্বাস হয় না।

তা ছাড়া যাদের অনুসরণ করে এ গুপ্ত সুড়ঙ্গের হদিশ পাওয়া গেছে সেই জালা-মূর্তিরাই বা গেল কোথায়? তাদের মতো আমাদের বটুকেশ্বরেরও তো কোনও পাত্তা নেই।

সকলের আগে বটুক কীভাবে এই পাতাল-সুড়ঙ্গে ঢুকল সে কথা সুরঞ্জনকে এবার জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমি লুটভিককে কন্ট্রোল রুমে দেখতে যাবার পর জানলা থেকে তারা আর একবার এই জালা-মূর্তিদের দেখতে পায়। আমাকে জানিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করলে পাছে সে মূর্তিগুলির রহস্য জানার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে স্পেস-স্যুট পরে তারা তৎক্ষণাৎ শূন্যযান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

অত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া সত্ত্বেও কোনও লাভ কিন্তু হয় না।

তাদের বেরুতে দেখেই মূর্তিগুলো ওই সব জাঁতা-ঢিবির আড়ালে যায় অদৃশ্য হয়ে।

হতাশ হয়ে একটা ওই রকম ঢিবি যখন তারা পরীক্ষা করে দেখছে তখনই আশ্চর্য অভাবিত একটা ব্যাপার ঘটে।

দানবদের জাঁতার মতো সেই বিরাট পাথুরে ঢিবির গা-টা যেন কোন মন্ত্রে ফাঁক হচ্ছে মনে হয়। সেখান থেকে গুটি তিনেক জালা-মূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা একেবারে মড়ার মতো নিশ্চল হয়েই ছিল, কিন্তু কেমন করে যেন টের পেয়ে মূর্তিগুলো নিমেষের মধ্যে আবার ঢিবির ফাঁক-হওয়া-গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে ফোকরটাও তখন আবার বুজে আসতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ফাঁক বুজে গিয়ে ঢিবির গায়ে তার আর চিহ্নই থাকে না।

বটুকের পক্ষে সেই কয়েক সেকেন্ডই কিন্তু যথেষ্ট।

এমনিতে একটু যেন জড়ভরত। কিন্তু আসল দরকারের সময় ও একেবারে চিতাবাঘের চেয়েও চটপটে আর বেপরোয়া।

ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, পাথুরে চিচিংফাঁক বন্ধ হবার আগেই, এক লাফে সে জালা-মূর্তিদের পেছনে ওই ফোকরে ঢুকে পড়ে।

সুরঞ্জন তার পরেই যখন ঢুকতে যায় তখন পাথুরে ঢিবি আবার মন্ত্রবলে যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কী করবে বুঝতে না পেরে ঢিবির ফোকর আবার খোলবার আশায় সে ওখানে বসে ছিল।

অন্য একটা ঢিবি থেকে আর-একদল জালা-মূর্তি বার হবার পর তাদের ফিরে যাওয়ার লক্ষণ দেখে আমাকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে অমন তাড়া করে ছুটে গিয়েছিল ওই ফাঁকটা খোলা থাকতে থাকতে ভেতরে ঢুকতে পাবার আশায়।

সে আশা সফল হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে লাভ কিছু হয়নি।

বটুকেশ্বরের কোনও পাত্তাই নেই, আর জালা-মূর্তিদের রহস্য যেমন ছিল তেমনই অভেদ্যই হয়ে আছে।

'এখন তাহলে আমাদের কী করা উচিত?' সুরঞ্জনকেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'এখানে দশ বছর বসে থাকলেও আমাদের সমস্যার কিনারা হবে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ ছেঁড়া স্পেস-স্যুট নিয়ে আমার শূন্যযানে ফেরারও উপায় নেই। তার চেয়ে তুমিই ফিরে যাও, সুরঞ্জন, বটুকেশ্বরের জন্য আমিই এখানে অপেক্ষা করি যতদিন পারি।'

'না।' জোর দিয়ে বলেছে সুরঞ্জন।

মাথায় মুখোশ দেওয়া শিরস্ত্রাণটা সে আগেই খুলে ফেলেছিল।

এবার স্পেস-স্যুটটাও গা থেকে খুলে ফেলতে ফেলতে বলেছে, 'দুজনের যখন যাবার উপায় নেই, এখানে তখন আমিই থাকব। আপনি আমার স্পেস-স্যুটটাই পরে শূন্যযানে ফিরে যান। আপনার জায়গায় আমি গেলে কোনও লাভ হবে না। আপনি তবু লুটভিক-এর কাছে কায়দা করে শূন্যযান চালাবার কলাকৌশলগুলো শিখে নিয়েছেন। দরকার হলে তার কাছ থেকে আরও কিছু জেনে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন। আমি গেলে সে-রকম ফিরে যাবার কোনও আশাই নেই। সুতরাং পোশাকটা পরে নিয়ে আপনি ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যান। সিঁড়িটা ওই জন্যই আছে বলে মনে হয়—'

ধৈর্য ধরে সুরঞ্জনের সব কথা শোনবার পর একটু হেসে বললাম, 'হৃদয়টা তোমার সত্যিই বড়, সুরঞ্জন। তোমার নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করি। কিন্তু বটুকেশ্বরের খোঁজ না পেয়ে এখান থেকে আমিও যেতে পারব না। তাতে যদি সারাজীবন এখানেই কাটাতে হয় সেও ভাল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।'

যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম দুজনে।

এ কী শুনছি?

পরিষ্কার বাংলা কথা! তাও বটুকের গলায় হলেও বুঝতাম।

তার গলা তো নয়ই, কোনও পুরুষের গলাই নয়।"

॥ বারো ॥

ঘনাদা থেমে নতুন সিগারেট ধরালেন।

ব্লাডটেস্ট গুপ্ত, প্রেশার সোম আর কার্ডিওগ্রাম সান্যালের তখন আর ধৈর্য ধরবার ক্ষমতা নেই।

"পুরুষ না হলে তো মেয়ের গলা!" ব্লাডটেস্ট গুপ্তের দুচোখ কপালে।

"তার ওপর বাংলা!" প্রেশার সোমের হাঁ-মুখ আর বোজে না!

"মঙ্গলগ্রহে বাঙালি মেয়ে!" কার্ডিওগ্রাম সান্যালের গলাই যেন শুকনো!

"না, মঙ্গলগ্রহে বাঙালি মেয়ে কেউ ছিল না," ঘনাদা সিগারেটে দুটি রামটান মেরে বনোয়ারির নিয়ে আসা দ্বিতীয় দফার চায়ের ট্রে থেকে একটি কাপ তুলে নিয়ে সশব্দে চুমুক দিয়ে বললেন, "তবে বাঙালি ছেলেকে সেখানেই রেখে আসতে হল।"

"কাকে রেখে আসতে হল?" এবার আমাদের জিজ্ঞাসার পালা—"ওই সুরঞ্জনকে?"

"হ্যাঁ, সুরঞ্জনকে আর নিয়ে আসা গেল না।" ঘনাদা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—"আর সুরঞ্জনকে রেখে এলে তার ছায়া বটুকেশ্বরকে কি আর আনা সম্ভব? তাই ভাবি, বটুকের অমন চিলের চোখ যদি না হত।"

ঘনাদার আবার দীর্ঘশ্বাস।

দু-দুবার দীর্ঘশ্বাস আমাদের খুব ভাল ঠেকল না। ঘনাদার এটা ঝিমিয়ে পড়ার লক্ষণ। তাড়াতাড়ি তাই একটু তাতাবার আঁচ দিতে হল সবাই মিলে।

"ও জালা-জন্তুগুলোই সব গণ্ডগোলের মূল, না ঘনাদা?"

"বটুকের অমন চোখের জোর না হলে ওগুলো কি আর দেখা যেত? আর দেখা না গেলে সুরঞ্জনেরও নেমে দেখবার অমন ঝোঁক হয় না, তাকে অমন রেখেও আসতে হয় না, সেই আট কোটি কিলোমিটার দূরের নির্বাসনে।"

"সুরঞ্জন সেই জালা-জন্তু ধরবার লোভেই নেমেছিল নিশ্চয়! ইস, একটা যদি ধরে আনতে পারত! আপনিও পারলেন না একটা আনতে?"

অনুযোগ মেশানো শেষ জিজ্ঞাসাটা ঘনাদার মুখের দিকে বড় আশায় ছাই-পড়া-চেহারা নিয়ে চেয়ে।

প্রক্রিয়াটা বিফল হল না!

"একটা ধরে আনবার কথা বলছ?" ঘনাদা যথোচিত সাড়া-ই দিলেন, "তা আর পারলাম কই? তার বদলে তারাই যখন সুরঞ্জনকে ধরে রাখলে তখন ছাড়িয়ে আনতে পারলাম না। ইতিহাসের খাতিরে ছেড়ে আসতে হল।"

"ইতিহাসের খাতিরে?" এবার আমাদের বিস্ময়টা একেবারে নির্ভেজাল।

"হ্যাঁ, গ্রহটার ভাবী ইতিহাসের একটা দাবি তো আছে।" ঘনাদা বিশ্বত্রাতার করুণাঘন হাসি হাসলেন, "সে দাবি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।"

মঙ্গলের ভাবী ইতিহাসের দাবি শুনে চোখে তখন অন্ধকার দেখছি। তবু কথাটা চালু রাখবার জন্য বিজ্ঞতার নামে বুদ্ধু সেজে বলতে হল, "ঠিক, ঠিক! ইতিহাসের

দাবি না মানলে চলে? নইলে সেখানেই হয়তো নিশান নিয়ে আমাদের-দাবি-মানতে-হবে বলে ঘেরাও করত ইতিহাসের দল।”

“না, এ সেরকম দাবি নয়।” ঘনাদা অনুকম্পাভরে সংশোধন করতে পেরে খুশি হয়ে বললেন, “দাবি হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসের ধারার। সে ধারা তো শুকিয়ে গিয়ে তখন শেষ হতেই বসেছে, মঙ্গলগ্রহের ওপরটা অনেকদিন আগে থেকেই, আমাদের বিজ্ঞান যা জেনেছে, সেই শ্মশান। সেখানে প্রাণের চিহ্ন না পাবারই কথা, কিন্তু তা না পেয়ে, ও গ্রহে প্রাণই নেই ভাবা একেবারে ভুল শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অভাব তাতে প্রমাণ হয়। গ্রহের ওপরে প্রাণ না থাকলেও কি তলাতে থাকতে পারে না? মঙ্গলগ্রহে ঘটেছিল ঠিক তাই। সেখানে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন আমাদের পৃথিবীর অনেক আগেই হয়, তারপর আমাদেরই মতো পারমাণবিক যুগে পৌঁছে নিজেদের হিংসা-প্রতিহিংসার যুদ্ধে আর স্বাভাবিক কারণে গ্রহের ওপরটা প্রাণীদের বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। মঙ্গলের যারা সেরা প্রাণী সেই মাঙ্গলিকেরা এ-সম্ভাবনার কথা ভেবে অনেক আগে থেকেই মাটির ওপরের স্তরের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে সব পাতাল শহর বসাবার কাজ শুরু করে রেখেছিল। হাওয়া ফুরিয়ে জল উবে গিয়ে সূর্যের মারাত্মক আলট্রা-ভায়োলেট আর মহাকাশের কস্‌মিক রশ্মির বর্ষণে ওপরে টিকে থাকা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন মাঙ্গলিকদের যারা তখনও বেঁচে ছিল সবাই ওই পাতাল রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সেখানেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায় না। ওপর ছেড়ে পাতালে নামবার সময় যে মাঙ্গলিকেরা কমতে কমতেও সংখ্যায় অন্তত লাখ দুয়েক ছিল, আমাদের ও গ্রহে নামবার সময় তারা শেষ পর্যন্ত মাত্র গুটি দশেকে এসে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, তাদের আবার—”

“ওই জালা-মূর্তির মতো চেহারা?” প্রেশার সোম নিজেকে সামলাতে পারেন না। প্রমাদ গনতে শুরু করে আমরা তখন ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

এমন করে বেমক্কা কথার সুতো ছেঁড়ার জন্য আসরই বুঝি যায় ভেস্তে।

কিন্তু ভাগ্য ভাল। মাংসের শিঙাড়া তোতাপুলির সঙ্গে শিশিরের সিগারেটগুলোই ধাক্কা সামলালে। ঘনাদার মুখে-চোখে একটু ঘনঘটা হওয়ার সূত্রপাত হয়েই কেটে গেল।

“মাঙ্গলিকদের জালা-মূর্তির মতো চেহারা?” ঘনাদা প্রেশার সোমকে যেন বহুকষ্টে নিরীক্ষণ করতে পেরে বললেন, “না।”

গলাটা রীতিমত গম্ভীর।

তা হোক, কারেন্ট এখনও আছে। আমরা ডবল ফিউজ তার লাগালাম।

“সেই বাংলা শোনার পর একেবারে হকচকিয়ে গেছলেন, না ঘনাদা?”

“মঙ্গলগ্রহে বাংলা! তাও আবার মেয়ের গলায়!”

“আজগুবি ব্যাপার!”

“যত আজগুবিই হোক, মানেটা কি আর ঘনাদা পাননি?”

“হ্যাঁ, পেলাম”, ঘনাদা প্রসন্ন হয়ে জানালেন, “পেলাম নাটকের ভেতর দিয়ে বলা যায়। বাংলায় ওই নেপথ্যবাণীর পরই সে নাটক যেন আপনা থেকে শুরু হল।

যেখানে তখন পৌঁছেছি, আগেই বলেছি যে সে জায়গাটা সার্কাসের অ্যারিনার মতো গোল। একদিকে একটা গড়ানে সুড়ঙ্গ ঢাল, আর একদিকে ঘোরানো সিঁড়ি বাদে চারিধারে, ওপরের নিরেট ছাদ পর্যন্ত, শুধু খাড়া দেওয়াল।

সে খাড়া দেওয়ালগুলো হঠাৎ চতুর্দিকেই ফাঁক হয়ে গিয়ে সেখান থেকে এক এক করে গুটি দশেক জালামূর্তিই বেরিয়ে এল।

সে জালা-মূর্তিগুলোর পেছনে আর কেউ নয়, স্পেস-স্যুট ছেড়ে তার ঘরোয়া পোশাকে আমাদের বটুকেশ্বর।

'একী কাণ্ড, বটুক!' আমার আগে সুরঞ্জনই চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি এদের সঙ্গে করছ কী! এরা কারা?'

'এরা বাংলা জানল কী করে? তুমি শিখিয়েছ?'

এতগুলো প্রশ্নের বাণেও অবিচলিত বটুক তার সেই মুখস্থ-পড়ার শুধু শেষ জিজ্ঞাসাটারই জবাব দিলে, 'শেখাতে এদের হয় না।'

পর মুহূর্তেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সে বিরাট পাতাল-মঞ্চ ঝন ঝন করে উঠল।

দশ-দশটা মেয়ের গলায় একসঙ্গে শোনা গেল—'শেখাতে এদের হয় না।'

'বুঝলেন এবার!' বটুক তার সেই এক পর্দার গলায় জানালে, 'এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তাই নকল করতে পারে।'

আবার সেই জালা-মূর্তির ভেতর থেকে দশ-দশটা মিহি হলায় শুনলাম—'বুঝলেন এবার! এরা সব হরবোলা। যা শুনবে তাই নকল করতে পারে।'

হ্যাঁ, হরবোলা যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কথাগুলো বটুক যা বলেছে তাই, কিন্তু পর্দাগুলো এক নয়। ওই একই কথা মিহিগলায় নানা পর্দায় যেন জলতরঙ্গ বাজিয়ে দিলে।

কিন্তু ওই জালা বসানো চেহারার ভেতর থেকে এমন মেয়ের গলা বার হয় কী করে?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম বটুককে।

একরকম ভেংচানো ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও অবশ্য চলল সঙ্গে সঙ্গে। বটুক যা জবাব দিলে তারাও তাই।

'দেখবেন তাহলে?' বলে বটুক অমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করে বসবে তখন কি জানি? 'মাপ করবেন তাহলে একটু'—বলে বটুক আচমকা তার গায়ের জামাটাই ফেললে খুলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দশ মুখে তার প্রতিধ্বনির সঙ্গে যা হল তা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত।

দশ দিকে দশটা জালা-মূর্তি ঝপ ঝপ করে তাদের মাথার আর গায়ের জালা-পোশাকগুলো নামিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমাদের স্পেস-স্যুটের মতো জালা-পোশাকগুলো তাদের মঙ্গলের ওপরে যাবার বেশ।

সেই পোশাক খোলার পর তাদের আসল চেহারা দেখলাম। সেই সঙ্গে খিল খিল করে হাসিটা ফাউ।

কিন্তু এ কী দেখছি!

দশ-দশটা মেয়ের কাকে ছেড়ে কাকে দেখব! সব যেন তিলোত্তমার ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালা।"

"কিন্তু দশটাই মেয়ে?" প্রশ্নটা কার্ডিওগ্রাম সান্যালের, "ছেলে নেই?"

"না", ঘনাদা একটু যেন দুঃখের হাসি হাসলেন, "সেই কথাই তখন বলতে যাচ্ছিলাম। মাঙ্গলিকরা কমতে কমতে শুধু মাত্র দশটাতেই পৌঁছয়নি, তাদের সবাই আবার মেয়ে। তারা একবার ছেলে হাতে পেলে কি ছাড়ে! বটুককে আগেই ধরেছিল, সুরঞ্জনকেও ছাড়ল না। মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসটা যাতে অচল না হয়ে যায় তাই জোর করে ফিরিয়ে আনতেও মন উঠল না।"

"আর আপনি?" হাসিটাকে ঠোঁট টিপে চেপে জিজ্ঞাসা করলে শিবু, "আপনাকে যে ছেড়ে দিলে?"

"আমাকে!" ঘনাদা যেন ক্ষণিকের জন্য উদাস হয়ে গেলেন—"আমাকে কি আর ছাড়তে চায়! পৃথিবী থেকে আরও ছেলে আনবার ভরসা দিয়ে অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়ে এসেছি।"

"সে কথা আর রাখতে পারেননি তো?" গৌরের গভীর আফশোস।

"কী করে আর রাখব!" ঘনাদার হতাশ স্বীকৃতি—"প্রথমত পাতালপুরীর যে নামটা দিয়েছিলাম সেই ধাঁধিকা থেকে সুরঞ্জনেরই স্পেস-স্যুট পরে বেরিয়ে আসবার মুখেই আবার সেই বুকের কষ্ট। কী ভাগ্যি, কাঠ-পোড়া ছাই একটু সঙ্গে রেখেছিলাম। তাই মুখে দিয়ে তখনকার মতো ধাক্কাটা সামলালাম।"

ঘনাদা থামলেন। তারপর আমাদের মুখগুলোর দিকে চেয়ে একটু বুঝি করুণা হওয়াতেই সদয় হয়ে ব্যাখ্যাটা আর চেপে রাখলেন না।

"ভাবছ, ছাই দিয়ে হার্টের অসুখ সারে কী করে? সব হার্টের অসুখ তো নয়, মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার ফল হিসেবে অ্যাস্ট্রোনট বা মহাকাশযাত্রীদের যে হার্টের গোল দেখা যায়, সেই অসুখ শুধু ওই ছাইয়ে সারে। আকাশপথে অনেককাল ভারশূন্য থাকবার ফলে সকলেরই শরীর থেকে পটাসিয়াম স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বেরিয়ে যায়। কারও আরও বেশি। পটাসিয়াম কম থাকলে হার্টের বৈদ্যুতিক প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয়ে হৃদযন্ত্রের ছন্দ কেটে যায়। মহাকাশযাত্রীদের খাবারে তাই একটু বেশি পটাসিয়াম থাকা দরকার। পটাসিয়াম বড় মজার এলিমেন্ট। দুনিয়ায় তিনি একা থাকেন না। সায়ানাইডের সঙ্গে মিশে যা বিষ সেই পটাসিয়াম আবার অন্য সংসর্গে অমৃতের শামিল। লুটভিক-এর শূন্যযানে হার্টের গোল যখন প্রথম শুরু হল তখন পটাসিয়াম আর কোথায় পাব। টেবিলের কাঠের পায়া পুড়িয়ে তাই তা জোগাড় করতে হল। এককালে কাঠের ছাই থেকেই পটাসিয়াম কার্বনেট সংগ্রহ করা হত।

কাঠের ছাই খেয়ে সুস্থ হয়ে শূন্যযানে যখন ফিরে এলাম তখন সত্যিই মনে মনে আবার মঙ্গলে একদল আইবুড়ো নিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। আমার জন্য অপেক্ষা করে করে এতদিনে সেখানে আমাদের কুলীন বামুন কি আমেরিকার মর্মনদের মতো বহুবিবাহ যদি ওরা চালু করে দিয়ে থাকে তাহলে দোষ

দেবার কিছু নেই।”

“কিন্তু সত্যিই আর সেখানে ফিরলেন না কেন?” প্রেশার সোমের আকুল জিজ্ঞাসা, “শূন্যযানটা নিয়ে পৃথিবীতে যে ফিরেছিলেন তাতে তো আর সন্দেহ নেই।”

“না, তোমাদের সামনে সশরীরে যখন উপস্থিত”, ঘনাদার মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি, “তখন ফেরার কথা অস্বীকার করি কী করে! কিন্তু ফেরার পর ওই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক-ই যে শয়তানি করল! আমার ওপর তার দারুণ আক্রোশ। তবু ফিরে আসবার সময় তার আশ্চর্য যন্ত্রের সৃষ্টিছাড়া রহস্য সে আমাকে যেন ঘৃণাভরেই বুঝিয়েছে। রকেট-টকেট নয়, এ আশ্চর্য শূন্যযান চলে অ্যান্টি-ম্যাটারের জোরে। অ্যান্টি-ম্যাটার মানে হল আমাদের দুনিয়ার মূল উপাদানের যেন আয়নায় দেখা উলটো নকল। সে অ্যান্টি-ম্যাটারের হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটা প্রোটনের চারিধারে একটা ইলেকট্রন ঘোরে না। নেগেটিভ অ্যান্টিপ্রোটনের চারিধারেই ঘোরে পজিটিভ পজিট্রন। অন্য সব উপাদানও তাই। এই অ্যান্টি-ম্যাটারের আঁচ পেলেও কেউ তা এখনও সৃষ্টি করতে পারেনি। করেছে শুধু এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিক। অ্যান্টি-ম্যাটারের সঙ্গে ম্যাটারের সম্পর্ক অহিনকুলের শত্রুতার চেয়েও বেশি, অ্যান্টি-ম্যাটারে ম্যাটারে দেখা হলে দুজনেই একেবারে বিদ্যুদ্বেগে যায় দুজনের কাছ থেকে ছিটকে। সে দুই বস্তুর ওই ধর্ম কাজে লাগিয়ে লুটভিক থরের মরুভূমির মাঝে তার আশ্চর্য যন্ত্রযান বানিয়েছিল। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে সে শূন্যযানের রকেটের মতো অসম্ভব বেগ লাগে না। যেমন খুশি বেগে বেলুনের মতো ভাসতে ভাসতেও তারা পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারে। হাওয়ার ঘর্ষণে পুড়ে যাবার ভয় তাই আমাদের শূন্যযানের ছিল না। সাধারণ আসবাবপত্রও সেখানে বাতিল করতে হয়নি। একেবারে শামুকের গতি থেকে অ্যান্টি-ম্যাটারে ধীরে ধীরে প্রায় আলোর গতিতে তোলা যায় বলে মহাশূন্যে বেগ বাড়াবার সময় ভারশূন্যতা ছাড়া অন্য কোনও অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয়নি। মঙ্গলগ্রহে নামতেও পেরেছি নিরাপদে!

তেমনই নিরাপদেই আবার থরের সেই মরুপ্রান্তরেই এসে নেমেছিলাম। নামার পর লুটভিককে আর বেঁধে রাখতে নিজের বিবেকেই বেধেছে। তাকে অনেক বুঝিয়ে তাই বাঁধন খুলে দিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাইরে বেরিয়ে এসেছি।

বেশি দূর তারপর যেতে হয়নি। কিছুদূর যেতে না যেতেই একটা যেন উলটো বজ্রপাত হয়েছে। মরুর বালি থেকেই একটা বিদ্যুৎশিখা যেন নিমেষে আকাশে উঠে বিরাট একটা আগুনের হলকা হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সেই উলটো বজ্রপাতের ধাক্কাতেই বালির ওপর তখন মুখ থুবড়ে পড়েছি। কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসে মুখ ঘুরিয়ে শূন্যযানটাকে আর দেখতে পাইনি। লুটভিক তার সঙ্গেই নিজেকে শেষ করেছে, না অন্য কোনও দিকে আগেই পালিয়েছে, তা জানি না এখনও।”

“আচ্ছা!” ঘনাদা থামতে কার্ডিওগ্রাম সান্যাল শেষ সংশয়টা আর প্রকাশ না করে পারলেন না, “মাঙ্গলিকদের অমন মানুষের চেহারা হল কী করে? তারা তো মানুষ নয়!”

"না, তারা মানুষ নয়, কিন্তু আমরাই তো আসলে মাঙ্গলিক হতে পারি!" ঘনাদা শেষ ধাঁধাটি ছাড়লেন, "লক্ষ লক্ষ বছর আগে মাঙ্গলিকরাই এসে পৃথিবীতে মানুষ জাতের গোড়াপত্তন যে করেনি তা কে বলতে পারে! মিসিং লিংক এখনও তো ঠিক পাওয়া যায়নি।"

এর পর আমাদের চোখগুলো যদি চড়কগাছ হয় তাহলে সে কি চোখের দোষ?

তেল দেবেন ঘনাদা

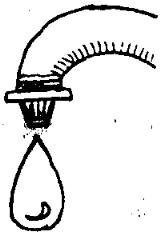

১

"জানেন আর মাত্র উনিশ বছর বাদে কী হবে?"

"সারা দুনিয়ার তেল নিয়ে নবাবি আর উনিশ বছর বাদেই শেষ, তারপর খনির গ্যাস পাবেন মেরে কেটে আর একটা বছর মাত্র!"

"জানেন, আমাদের যা শেষ ভরসা, সেই কয়লার একটা গুঁড়োও একশো দশ বছর বাদে কোথাও খুঁজে পাবেন না?"

কথাগুলোর নমুনা দেখেই কোথায় কাকে উদ্দেশ করে সেগুলো বলা, তা অনুমান করতে কারওর ভুল হয়নি বলেই বুঝতে পারছি।

হ্যাঁ, কথাগুলো বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের টঙের ঘরের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদাকে উদ্দেশ করেই বলা।

অনুমান ওইটুকু পর্যন্ত ঠিক হলেও তারপরই একেবারে ভুল।

না, এ সব কথা তাঁর টঙের ঘরে নিজের তক্তপোশে আসীন ঘনাদাকে তাতিয়ে একটা গল্পের ফুলকি বার করবার জন্য ভান করা মেজাজ দেখিয়ে খোঁচানো নয়।

রাগটা আমাদের যথার্থ, আর সত্যিই ঘনাদার ওপর একেবারে খাপ্পা হয়ে সবাই মিলে তাঁকে আমরা টঙের ঘরে পৌঁছবার আগেই সেই ন্যাড়া সিঁড়ির ওপর থেকে আক্রমণ শুরু করেছি।

স্বীকার করছি যে রাগটা আমাদের মাত্রা ছাড়া, আর ঘনাদার ওপর ওরকম সত্যিকার তর্জন-গর্জনও প্রায় কল্পনাতীত।

কিন্তু এমন একটা অভাবিত ব্যাপারের মূল কারণটা শোনালে আমাদের এই অবিশ্বাস্য বেয়াদবির জন্য অনেকের কাছে হয়তো ক্ষমার সঙ্গে কিঞ্চিত সহানুভূতিও পেতে পারি, এই আশাতেই সমস্ত ঘটানাটা গোড়া থেকে জানাচ্ছি।

ব্যাপারটা সেই সকালবেলাতেই শুরু। ছুটির দিন। আমরা সবাই একটু দেরি করেই আড্ডাঘরে এসে একে একে জমায়েত হতে শুরু করেছি। টঙের ঘর থেকে ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে ঘনাদার ধীরে সুস্থে নেমে আসার শব্দও সবে পাওয়া যাচ্ছে, এমন সময় নীচে থেকে অচেনা গলার হাঁক, "শিবু, শিবু আছ তো?"

গলাটা খুব বাজখাঁই নয়, কিন্তু ডাকটায় বেশ একটু মাতব্বরি সুর আছে।

এই সক্কালবেলা এই গলায় শিবুকে ডাকতে এল কে এবং কেন?

শিবুও প্রথমটায় বুঝি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর তার মুখখানার লোডশেডিং যেন কেটে গেল।

"আরে, এ তো পল্টু! সত্যি এসেছে তা হলে! গাড়িও এনেছে নিশ্চয়। চলো, চলো।"

নিজের উৎসাহে আমাদের সকলকে ঢালাও নিমন্ত্রণ জানিয়ে শিবু যে-রকম

হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে গেল তাতে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। তবু যথাসাধ্য সে চেষ্টা করতে করতে নিজেদের কৌতূহলগুলো যথাসাধ্য মেটাবার চেষ্টা করলাম, "কে পল্টু? কোথা থেকে কেন এসেছে? গাড়ি আবার এনেছে কী?"

প্রথম দুটো প্রশ্নের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যে জবাব পেলাম তাতে জানা গেল, পল্টু শিবুর একরকম মামাতো ভাই। তাকে কথা দিয়েছিল বলে এমন সাতসকালে দেখা করতে এসেছে।

আর গাড়ি যা এনেছে, তা নিজের চোখেই দেখলাম বাহাত্তর নম্বরের বাইরের গলিতে।

না, রদ্দি ঝরঝরে মল্লিক বাজারের জোড়াতালি-দেওয়া মাল নয়, সত্যি সত্যি নতুন মডেলের নামকরা কোম্পানির গাড়ি। ঝকঝক চকচক করছে এমন, যেন সবে মোড়ক খুলে বার করা হয়েছে।

শিবুর মামাতো পিসতুতো মাসতুতো ভাইয়েদের লিস্ট বেশ লম্বা। বাহাত্তর নম্বরে কিছুদিন থাকলে তাদের সকলের সঙ্গে এক-আধবার পরিচয় না হয়ে পারে না।

পল্টুবাবু তাদের মধ্যে নতুন। প্রথমে শুধু গলাটা শুনে আওয়াজটা একটু ভারী আর সুরটা বেশ মাতব্বরি ধরনের লাগলেও মানুষটা দেখলাম, আমাদেরই বয়সি, ছোটখাটো নরম নরম চেহারার।

আমাদের সকলকে একসঙ্গে দেখে একটু যেন লাজুক লাজুক ভাবেই শিবুকে বললেন, "কেমন, নিয়ে এলাম কিনা? এখন কোথায় যেতে চাও বলো!"

এরপর শিবুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা শুনতে আমাদের দেরি হল না। ব্যাপারটা হল এই যে, শিবুর কী রকম মামাতো ভাই পল্টুবাবু কিছুদিন হল এক বড় কোম্পানির মোটর-বিক্রির দালালির কাজ পেয়েছেন। শিবুর সঙ্গে এর মধ্যে কবে দেখা হতে পল্টুবাবু তাকে নতুন মোটর চড়াবেন কথা দিয়েছিলেন। সেটা যে মিথ্যে চালবাজি নয়, তাই প্রমাণ করতেই পল্টুবাবু আজ সকালে সত্যি সত্যি গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন বাহাত্তর নম্বরে।

"একটা কথা বলতে পারি?"

সবাই যে চমকে উঠে আমাদের পেছনে ঘনাদাকে লক্ষ করে এবার রীতিমত লজ্জিত হয়েছি, তা বলাই বাহুল্য। শিবু-পল্টু-সংবাদ শুনতে শুনতে আর ছুটির দিনের সকালের এই সুবর্ণ সুযোগের সার্থক সদ্ব্যবহারটা কীভাবে হতে পারে ভাবতে ভাবতে ঘনাদার কথাটা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম।

নিজেদের ত্রুটিটা শোধরাবার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম তাই। প্রায় সমস্বরে সবাই বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না, বলুন না।"

ঘনাদা বললেন। বিশেষ কিছু নয়, জানালেন যৎসামান্য একটা অনুরোধ। আমরা যতক্ষণ গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব ঠিক করছি, তার মধ্যে তাঁকে যদি এ গাড়ি নিয়ে দু-পা একটু পৌঁছে দেওয়া হয়।

বলেন কী ঘনাদা! এমন একটা গাড়ির সুবিধের দিনে আমাদের ফেলে একলাই আগে কোথায় যেতে চান! কিন্তু হাঁ হাঁ করে উঠে বাধা দেওয়া আর হল না।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যান না," আমাদের সকলের আগে পল্টুবাবুই ব্যস্ত হয়ে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, "ড্রাইভারজি, লে যাইয়ে সাবকো যাঁহা যানে চাহতে হেঁ।"

ড্রাইভারজি মোটরের দরজা খুলে দিলেন। ঘনাদা গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারজি তাঁর আসনে বসে দুবার হর্ন বাজিয়ে আমাদের বনমালি নস্কর লেন থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

২

সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের চোখের ওপর যখন ঘটল, তখন প্রায় কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটা।

গাড়ি চলে যাবার পর পল্টুবাবুকে নিয়ে আমাদের একটু ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করবার আছে।

ঘনাদা বলেছেন, তাঁকে দু-পা মাত্র পৌঁছে দিতে হবে। তা দু-পা মাত্র যেতে আসতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু সাতটা বেজে সাড়ে সাতটা হল। সাড়ে সাতটা থেকে ঘড়ির কাঁটা পৌঁছল আটটায়। আটটার পর ন-টা বাজল। বাজল দশটা।

তবু ঘনাদাকে যথাস্থানে রেখে পল্টুবাবুর গাড়ি ফেরত এল কই?

ততক্ষণে তিন-তিনবার চায়ের পালা আমাদের শেষ হয়ে গেছে। প্রথমে শুধু পাঁপর ভাজাই ছিল টাকনা, তারপর সেটা পাড়ার দোকানের হিঙের কচুরি থেকে শেষে তেলেভাজা-বেগুনিতে গিয়ে উঠল, তবু গাড়ির দেখা নেই।

বেগুনি-ফুলুরি তখন আর মুখে রোচে! শিবুর মামাতো ভাই পল্টুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অন্তত নয়। কোনও লাভ নেই জেনেও ওপর থেকে নীচে আর বাহাত্তর নম্বর থেকে বেরিয়ে বনমালি নস্কর লেন ছাড়িয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এমন বার দুই যাওয়া-আসা করলাম। পল্টুবাবুর গাড়ি তখনও নিপাত্তা।

দশটা ক্রমে ক্রমে এগারোটা হল। তারপর বারোটা! আরও বার দশেক ওপর-নীচ আর ঘর-বার করে, গাড়িটার কোথাও কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলেই ধরে নিয়ে আমরা পাড়ার থানায় খোঁজ করতে যাব বলে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বনোয়ারি নীচে থেকে খবর দিলে, "গাড়ি আওত বানি!" অর্থাৎ গাড়ি আসছে।

সবাই মিলে এর পরে হুড়মুড় করে নীচে নেমে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বনোয়ারির খবর ভুল নয়। গাড়ি মানে পল্টুবাবুর গাড়িই আসছে বটে, তবে সেটাকে ঠেলে নিয়ে আসছে রাস্তার ক-জন মজুর।

কী হয়েছে তা হলে? দারুণ কোনও দুর্ঘটনা? না। গাড়ি সম্পূর্ণ অক্ষত। তা থেকে প্রথমে যিনি নামলেন, সেই ঘনাদাও সম্পূর্ণ তা-ই।

নেমে এসে বাহাত্তর নম্বরের দেউড়িতে ঢোকবার আগে আমাদের দিকে চেয়ে ঈষৎ যেন দুঃখের সঙ্গে বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল, না?"

একটু দেরি হয়ে গেল! সাতটায় দু-পা পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে

বেলা বারোটার পরে ফিরে ঘনাদা বলছেন কিনা, একটু দেরি হয়ে গেল!

বিহ্বল, হতভম্ব তো হয়েই ছিলাম, তার ওপর ঘনাদার এই আত্মধিক্কারের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে সবাই যেন বোবা হয়ে গেলাম।

কথা ঘনাদাই আবার বললেন। যেন হঠাৎ তুচ্ছ একটা কথা মনে পড়ায় আমাদের জানিয়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই গাড়ি যারা ঠেলে এনেছে, তাদের মজুরির সঙ্গে কিছু কিছু বকশিশও দিয়ে দিয়ো। কমখানি তো নয়, প্রায় মাইল দুয়েক ঠেলে আনছে।"

প্রায় মাইল দুয়েক ঠেলে আনছে! এবার একসঙ্গে হঠাৎ সলতে-ধরে-ওঠা বোমার মতো আমরা ফেটে পড়লাম।

"ঠেলে আনছে কেন?" জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"গাড়ির কি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কিছু?" জানতে চাইলাম আমি।

"ইঞ্জিন কি কলকবজা কিছু বিগড়েছে?" কড়া গলায় জেরা করল গৌর।

"না, না, কলকবজা বেগড়াবে কী!" ঘনাদা যেন পল্টুবাবুর গাড়ির অপমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "দস্তুরমতো ভাল নিখুঁত নতুন গাড়ি।"

"তবে?" শিশিরের মাত্র একটি শব্দের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

"তবে আর কী!" ঘনাদা আমাদের বুদ্ধির স্থূলতাতেই যেন হতাশ হয়ে বললেন, "গাড়িতে তেল ছিল না, তাই।"

"তেল ছিল না!"

আর্তনাদটা এবার আমাদের নয়, পল্টুবাবুর গলা দিয়ে বার হল, "আমি যে এখানে আসবার আগে নিজে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল এনেছি। ট্যাঙ্কে কোথাও কোনও ফুটো—"

পল্টুবাবুকে কথার মাঝখানেই থামিয়ে ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ট্যাঙ্ক ফুটো-টুটো কেন হবে! পুরো ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেলই ছিল। সবটা অমন ফেরবার আগেই ফুরিয়ে যাবে সেইটে ঠিক বুঝতে পারিনি।"

নীচের সিঁড়ি দিয়ে তখন আমরা দোতলার বারান্দায় এসে পৌঁছেছি। ঘনাদার সরল বিনীত স্বীকারোক্তিটুকুর পর কয়েক সেকেন্ড রীতিমত হতবাক হয়ে থাকবার পর নিজেদের আর সামলানো সম্ভব হল না।

"তার মানে," শিশির প্রায় চিড়বিড়িয়ে উঠে বলে, "ওই ট্যাঙ্ক-ভর্তি তেল সব আপনি খরচ করে এসেছেন?"

"এই আজকের দিনে তেলের জন্য যখন সারা দুনিয়ায় হাহাকার পড়ে গেছে!"

"এক ফোঁটা তেলের জন্য যখন দেশে দেশে গলাগলির বন্ধুত্ব গলাটেপাটেপিতে পৌঁছে যাচ্ছে।"

"আপনি কি জানেন না যে, তেলের দাম দিন দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় নয়, মিনিটে মিনিটে কীভাবে বাড়ছে! আর আজকের পৃথিবীতে তেলের বাদশা আরবেরা হঠাৎ তেলের বাজারের চাবিকাঠিটি নিজেদের হাতে নেবার পর সারা দুনিয়ার কীভাবে টনক নড়েছে!"

"হিসেব করতে বসে কেন সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে জানেন? জানেন যে, আরবরা হাতের মুঠো খুলুক বা না খুলুক, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আসতে আর দেরি নেই!"

এই পর্যন্ত বলতে বলতেই টঙের ঘরের ন্যাড়া সিঁড়ির তলা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের জবরদস্ত ঘেরাওয়ের ধরনে সিঁড়ির দিকটা আটকানো বলে ঘনাদাকে এবার আড্ডাঘরেই ঢুকতে হয়েছে।

সেখানে ঢুকেও অবশ্য নিস্তার পাননি। এ-বিবরণ যা দিয়ে শুরু করেছি সেই সব বাক্যবাণ তাঁর ওপর তখন নির্মমভাবে ছোড়া হয়েছে। একজন থামতে-না-থামতে আর-একজন শুরু করে। এক মুহূর্তের সামলাবার ফাঁক তাঁকে দেওয়া হয়নি।

শিশির কয়লার আসন্ন চরম দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার কথাটা শুনিয়ে দেবার পরেই গৌর একেবারে সর্বনাশা ছবিটা অঙ্কের হিসেবে এঁকে দিয়েছে। এ সব হিসেবে সে এমনিতেই একটু পাকা। তার ওপর ঘনাদার জন্য সারা সকাল অপেক্ষা করায় অধৈর্য আর যন্ত্রণার মধ্যে নানা কাগজপত্র এই জন্যই সে হাঁটকাচ্ছিল নিশ্চয়।

"আপনি যা করেছেন," গলা থেকে যেন আগুনের হলকা বার করে গৌর বলেছে, "তা আজকের দিনে রীতিমত একটা সামাজিক অপরাধ, তা জানেন! মরুভূমির যাত্রী হয়ে খুশির খেয়ালে তেষ্টার জল নষ্ট করা যা, এও তা-ই।"

গৌরের আক্রমণের তোড়ের সামনে দাঁড়াতে না-পেরে ঘনাদা তাঁর অত সম্মানের আর শখের কেদারায় এবার যেন অসহায়ভাবে বসে পড়েছেন।

গৌর তাতে থামেনি। নির্মমভাবে বলে গিয়েছে, "দুনিয়ার সত্যিকার অবস্থাটা কী, তা আপনার জানা আছে? তেল আর মাত্র পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল, আর মাত্র ছশো বিলিয়ন টন কয়লা পৃথিবীর এখন সম্বল!"

"হ্যাঁ," বেশ একটু অপরাধীর মতো স্বীকার করেছেন ঘনাদা, "তেল তো আছে মাত্র তিন হাজার সাতশো চল্লিশ বি-টি-ইউ! এম-বি-ডি-ও-ই যা বাড়ছে, বছর দশেকের মধ্যেই তা দুশো ছাড়িয়ে যাবে!"

বি-টি-ইউ! এম-বি-ডি-ও-ই! এ সব কী বলছেন ঘনাদা! অন্য সময় হলে এরকম দুটো বুকনিতেই বেশ কাত হয়ে পড়তাম সবাই। কিন্তু আজ মেজাজ যে পর্দায় বাঁধা, তাতে এ সব ভড়কিতে আর আমরা ভোলবার পাত্র নই।

তাই, গলাটা আরও কড়া করে, প্রায় ধমক দিয়েই উঠলাম, "রাখুন আপনার ওসব গুল-টুল!"

তারপর পল্টুবাবুকে দেখিয়ে বললাম, "দুনিয়ার হিসেব ছেড়ে দিয়ে এই ভদ্রলোকের কথা একটু ভেবে দেখেছেন? ভদ্রলোক নিজে থেকে খাতির করে আপনাকে তাঁর গাড়িটা চড়তে দিলেন। ভদ্রলোকের নিজের গাড়ি নয়, তাঁর কোম্পানির খরিদ্দারদের দেখাবার জন্য তিনি সেটা এখানে-সেখানে নিয়ে যান! সেই গাড়ি তাঁর পিসতুতো ভাই শিবুকে আর সেই সঙ্গে আমাদের একটু দেখাবার আর চড়াবার জন্য তিনি তেলের এই আকালের দিনে ট্যাঙ্ক-ভর্তি করে এনেছিলেন। আপনার অনুরোধে দু-পা যাবার জন্য আপনাকে সে-গাড়ি উনি একটু চড়তে

দিয়েছিলেন মাত্র। আপনি—আপনি সেই গাড়ি নিজের খুশি মতো পুরো পাঁচ ঘণ্টা কোথায় না কোথায় চালিয়ে সমস্ত তেল খরচ করে শেষে রাস্তার লোক দিয়ে ঠেলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন! ভদ্রলোকের ওপর কী অন্যায় যে করছেন, সে-কথা একবার মনে হল না!"

প্রসিকিউশনটা ভালই করেছি নিশ্চয়। অন্যেরা একটু উসখুস করলেও ঘনাদা সারাক্ষণ একেবারে চুপ। আমরা কথা শেষ হবার পর বেশ একটু যেন শুকনো গলাতেই বললেন, "না, পল্টুবাবুর ওপর খুবই অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, ট্যাঙ্কে গ্যালন কুড়ি তেল ছিল নিশ্চয়!"

"না, না, কুড়ি নয়," পল্টুবাবু বিনীতভাবে জানালেন, "আট-ন গ্যালনের বেশি নয়।"

"ও একই কথা!" ঘনাদা নিজের অপরাধের গ্লানিতেই বোধহয় উদার না হয়ে পারলেন না, "আট-ন গ্যালন তো আর কম তেল নয়, বিশেষ আজকের বাজারে। এ-লোকসান আপনার হবে কেন? দাঁড়ান, দাঁড়ান।"

আমরা এবার বেশ একটু হতভম্ব।

ঘনাদা বলছেন কী? আর জামার এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে খুঁজছেনই বা কী? ভাবখানা তো পকেট থেকে বার করে তখুনি যেন নগদানগদি পল্টুবাবুর তেলের দামটা দিয়ে ফেলে সব ঝামেলা চুকিয়ে দেবার মতো। কিন্তু পকেটে ওঁর বকেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছু কখনও থাকে না। আজ তা হলে এত খোঁজাখুঁজি কীসের?

খোঁজাখুঁজিতে কিছু অবশ্য পাওয়া গেল না। ঘনাদা কিন্তু তাতে যেন বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "না, কোথায় যে ফেললাম! তেল ফুরিয়ে যাবার ওই ঝামেলার মধ্যেই কোথায় পড়ে গেছে বোধহয়! এখন একটা সাদা কাগজ দিতে পারো?"

হাসব, না জ্বলে উঠব, তখন আমরা বুঝতে পারছি না। কাগজ খুঁজে নিয়ে ঘনাদার হাতে দেবার মতো অবস্থা সুতরাং আমাদের তখন নয়। তবে আমাদের আগেই পল্টুবাবু তাঁর পকেট থেকে নোটবই বার করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে ঘনাদাকে এগিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফুটল, "কী খুঁজছিলেন আপনি, ঘনাদা? কী হারিয়েছে? টাকা?"

"না, না, টাকা নয়!" ঘনাদা যেন টাকার কথায় অপমান বোধ করে বললেন, "হারিয়েছে দু'ব্যারির সই-করা ছাপা কাগজের ছোট একটা খাতা। যাক, এতেই হবে।"

ঘনাদা কলমটাও পল্টুবাবুর কাছে ধার নিয়ে খসখস করে কী লিখে কাগজটা আর কলমটা পল্টুবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে একটু স্নেহের হাসি টেনে বললেন, "যত্ন করে রেখে দেবেন!"

যত্ন করে রেখে দেওয়ার মতো কাগজের চিরকুটটা এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে পল্টুবাবুর হাত থেকে টেনে নিয়ে দেখতেই হল।

দেখে সত্যিই মাথায় চরকিপাক!

কাগজটার ওপরের ক-টা অক্ষরের নীচে ঘনাদার একটা সই। ঘনাদার সইটাকে বোঝা মহেঞ্জোদরোলিপির পাঠোদ্ধারের চেয়ে শক্ত হতে পারে, কিন্তু তার ওপর তাঁর অদ্বিতীয় হস্তাক্ষরে এসব তিনি কী লিখেছেন? লেখাগুলোর ছিরি যাই হোক সেগুলো পড়া যায়।

ঘনাদা ওপরে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে "ই-ইউ-ডব্লিউ-সি" লিখে তার নীচে লিখেছেন "পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই এক বছর"।

"এম-বি-ডি-ও-ই" শব্দটা তাঁর মুখে খানিক আগেই শুনেছি, "ই-ইউ-ডব্লিউ-সি"-টা নতুন। কিন্তু কী মানে এই হিং-টিং-ছটের?

ঘনাদা কি ভেবেছেন, এই বুজরুকি দিয়েই আজ আমাদের কাত করে দিয়ে যাবেন? আজ আর সেটি হচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিয়ে অবরোধটা একটু নরম করেই শুরু করলাম।

বললাম, "এই চিরকুটটা পল্টুবাবুকে রেখে দিতে বলছেন যত্ন করে? এতে তাঁর আট-ন গ্যালনের শোক তিনি ভুলতে পারবেন? তাঁর সব লোকসান পুষিয়ে যাবে?"

"তা যাবে বইকী!" ঘনাদা যেন আমাদের সরল বিশ্বাসের অভাবে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "অনেক অনেক গুণ যাতে পুষিয়ে যায়, সেইমতই লিখে দিয়েছি।"

"আপনার অশেষ দয়া!" আমাদের গলায় এবার স্টেনলেস স্টিল ব্লেডের ধার, "তা পল্টুবাবুর সব লোকসান ওই চিরকুটেই পুষিয়ে যাবে কেমন করে, তা একটু জানতে পারি? হিজিবিজি কী সাপের মন্তর লিখেছেন ওই চিরকুটে?"

"সাপের মন্তরও নয়, হিজিবিজিও না!" ঘনাদা যেন ধৈর্যের অবতার হয়ে উঠেছেন হঠাৎ, "লেখাগুলো পড়তে পারোনি বুঝি?"

"না, পেরেছি!" অসাধ্যসাধনের গর্ব নিয়েই বললাম, "অক্ষরগুলো ইংরেজিতেই লিখতে চেয়েছিলেন মনে হচ্ছে! কিন্তু মানে কী ওই ই-ইউ-ডব্লিউ-সি আর এম-বি-ডি-ও-ই-র? ও কোথাকার হিং-টিং-ছট?"

"হিং-টিং-ছট নয়, শুধু ক-টা আদ্যক্ষর," গভীর সহানুভূতি দেখালেন ঘনাদা, "তবে তোমাদের কাছে অক্ষরগুলো ধাঁধার মতোই লাগবার কথা। ওই ই-ইউ-ডব্লিউ-সি-র মানে এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্লড কার্টেল। অর্থাৎ অফুরন্ত শক্তির বিশ্বসঙ্ঘ। এ নামটা নতুন সাজানো। তবে এম-বি-ডি-ও-ই শক্তি বিজ্ঞানীদের মহলে পুরনো আধুলির মতো সর্বত্র চালু। অক্ষরগুলোর জট ছাড়ালে কথাটা দাঁড়ায়, মিলিয়ন ব্যারেলস ডেইলি অফ অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট। মানে, প্রতিদিন দশ লক্ষ পিপে তেল বা তারই সমান কাজ দেবার মতো যে-কোনও বদলি বস্তুর জোগান!"

"কী বললেন?" আমাদের গলাগুলো একটু ধরা-ধরা। "প্রতিদিন দশ লক্ষ পিপে তেল বা তার বদলি কিছু জোগান দেওয়া! এই এত জোগান দিচ্ছে কে?"

"দিচ্ছি আমরাই," ঘনাদা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, "উনিশশো তিয়াত্তরে আরবরা তেলের দাম আকাশে তুলে দিয়েছে। হাহাকার পড়ে গেছে চারদিকে, তা সত্ত্বেও রুশ দেশ ছাড়াই বাকি দুনিয়া দিনে একাশিরও বেশি এম-বি-ডি-ও-ই খরচ করছে। ওদের পণ্ডিতরা বলছে, বছর কুড়ি বাদে ওই একাশি দুশোয় পৌঁছবে।"

"কাজটা ওদের খুব অন্যায় তো তা হলে?" আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"তেলের দিক দিয়ে ওদের যা ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা, তাতে অন্যায় বইকী।" বলে সায় দিলেন ঘনাদা।

আর সেই মওকাতেই তাঁকে চেপে ধরলাম। তাঁরই চিরকুটটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "কিন্তু এটা আপনি কী লিখে দিয়েছেন পল্টুবাবুকে? এটা তো তেলের হ্যান্ডনোট বলেই মনে হচ্ছে। পল্টুবাবুকে এক বছর প্রতিদিন পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই দেওয়া হবে, সেইরকমই কি এতে লেখা না? না আমাদের ভুলই হয়েছে পড়তে?"

এবার ঘনাদাকে যে মোক্ষম প্যাঁচে ফেলেছি তাতে নির্ঘাত কুপোকাত! তাঁর নিজের হাতে সদ্য লিখে দেওয়া চিরকুট! এ ফাঁদ থেকে বার হবেন কী করে? নিজের হাতের লেখা আর মুখের ব্যাখ্যা হটজলদি বদলে দেবার চেষ্টা করবেন? তা হলে ফাঁস টানব আরও জম্পেশ করে? অবস্থাটা কত বেগতিক, তা বুঝেই বোধহয় ঘনাদা সেদিক দিয়েই গেলেন না। চিরকুটের লেখাটার মানে বদলে দেবার চেষ্টা না করে একেবারে উলটো সুর ধরলেন।

আমাদের সন্দেহেই যেন অবাক হয়ে বললেন, "পড়তে ভুল হবে কেন? ঠিকই পড়েছ। আর তেলের হ্যান্ডনোট ধরে নিয়ে ও চিরকুটের কড়ারের বহর দেখে যদি অবাক হয়ে থাকো, তা হলে জেনে রাখো যে, ও হ্যান্ডনোট জেনেশুনে বুঝেসুঝেই লিখেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে পল্টুবাবুর ঋণ ওতেও পুরো শোধ হবে না।"

"তাই নাকি!" আমরা গলার সুরটা যথাসম্ভব সরল রেখেই বললাম, "ওই আট-ন গ্যালনের ঋণ?"

"হ্যাঁ, ওই আট-ন গ্যালন!" ঘনাদা একেবারে গদগদ হলেন, "ওই আট-ন গ্যালন আর পল্টুবাবুর গাড়িটা না থাকলে ই-ইউ-ডব্লিউ-সি নামটাই হয়তো পৃথিবীতে অজানা থেকে যেত। তার জায়গায় এস-এস-পি-এস-এর মালিকদেরই আমরা গোলামি করতাম সারা দুনিয়ায়। এত বড় উপকারের জন্যে দিনে পাঁচ এম-বি-ডি-ও-ই লিখে দেওয়া কি বেশি কিছু হয়েছে?"

এস-এস-পি-এস, এম-বি-ডি-ও-ই, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি। তার মানে বেড়াজাল কেটে বেরোবার রাস্তা না পেয়ে ঘনাদা ওই সব আবোলতাবোল প্রলাপ বকে আমাদের মাথায় ঘোর লাগাবার চেষ্টা করছেন। উঁহু, সেটি আর হচ্ছে না।

বললাম, "বেশ কাজের মতো কাজই করেছেন! কিন্তু এত যে সব ভেল্কিবাজি হয়ে গেল, সবই তো সাতসকালে পল্টুবাবুর আট-ন গ্যালন তেল ভরে আনা গাড়িটির জন্যে। সেটি আজ আপনার হাতে না পড়লে দুনিয়ার মস্ত লোকসান হয়ে যেত তা হলে?"

"হ্যাঁ, হত।" ঘনাদা এতক্ষণের মধুর ভাব ছেড়ে হঠাৎ যেন গর্জন করে উঠলেন, "ও গাড়িতে চড়ে না বেরুলে গড়িয়াহাটের মোড়ের ওই বিশ্রী ট্রাফিক জ্যামে পড়তাম না। সেই ট্রাফিক জ্যামে না পড়লে পাশের জানলা-তোলা একটা বিদেশি সেডান-এর ভেতর থেকে ক-টা কথা কানে গিয়ে চমকে উঠতাম না। তারপর সেই গাড়ির পেছনে ধাওয়া করে অর্ধেক কলকাতা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্ট হোটেলে গিয়ে আসল

পালের গোদার দেখা পেতাম না। আর তার দেখা তখন না পেলে এতক্ষণে ব্যাংককের পথে মালয়ের ওপর একটা অপ্রত্যাশিত বিমান দুর্ঘটনার খবর নিশ্চয়ই বেতারে ছড়িয়ে পড়ত। যাক, এর বেশি আর কিছু বলার নেই এখন। বারোটাও বেজে গেছে। এখন ওঠাই ভাল।"

৩

ঘনাদা কেদারা ছেড়ে ওঠার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই বাইরের দরজা আগলে আমরা জবরদস্ত ভাবে খাড়া।

আমাদের ভঙ্গিগুলো মিলিটারি হলেও আওয়াজ তখনও খুব নরম। বললাম, "এখন উঠছেন কী? ছুটির দিনে বারোটা আবার বেলা! রামভুজ এখনও চিতল মাছের ধোঁকা চড়ায়ওনি বোধহয়। বলুন, বলুন। পল্টুবাবুর গাড়িতে না-চড়লে যে ট্রাফিক জ্যামে পড়তেন না, সেই ট্রাফিক জ্যামে পাশের বন্ধ মোটর থেকে চমকে দেওয়ার মতো কী শুনলেন সেইটা বলুন।"

"সেইটে শুনতে চাও?" ঘনাদা একটু অনুকম্পার হাসি হেসেই বললেন, "কিন্তু তা শুনলে তো বুঝতে পারবে না!"

"বুঝতে পারব না!" আমরা একটু অপমানিত—। "কেন? কোন দেশের ভাষা?"

"ভাষা ইউরোপেরই!" ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন, "তবে ইউরোপেরও খুব কম লোকই এ-ভাষায় কথা কয় বা জানে। ভাষাটা হল বাস্‌ক্। স্পেনের উত্তর পশ্চিমের একটা ছোট অঞ্চলের এ ভাষা—"

"থাক্ থাক, ওতেই হবে," ঘনাদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ভাষাটা আপনার তো জানা। আপনি কী শুনে কী বুঝলেন তা-ই বলুন।"

"আমি যা শুনলাম, আর যা বুঝলাম, তাও তো তোমাদের কাছে ধাঁধা।" ঘনাদা তাঁর কথায় বাধা দেবার শোধ তুলে বললেন, "কথা যা শুনলাম তা এনজেল নিয়ে। এনজেল মানে বোঝো কি?"

"বুঝব না কেন?" আমরা তাচ্ছিল্যভরে বললাম, "এনজেল মানে দেবদূত, তা কে না জানে!"

"না, এ সে-এনজেল নয়।" ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন, "এ হল আকাশে প্লেন কি রকেটের ওড়ার উচ্চতার মাপ। এক এনজেল প্রায় তিনশো পাঁচ মিটার। তবে শুধু এনজেল কি বাস্‌ক্ ভাষা শুনেই আমি চমকে উঠিনি। আমি রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেছি গলার স্বরটায়। বাস্‌ক্ ভাষার সঙ্গে এ গলা তো দুনিয়ার একটি মাত্র লোককেই নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। ট্রাফিক জ্যাম কেটে গিয়ে আবার গাড়িগুলো সচল হবার মধ্যে আরও ক-টা কথা শুনে আমি তখন নিশ্চিতভাবে বুঝেছি আমার পাশের জানলা-বন্ধ দামি বিদেশি সেডান গাড়িটার ভেতরে বোরোত্রা ছাড়া আর কেউ নেই। বোরোত্রা অবশ্য তার আসল নাম নয়। তারই দেশের অনেক আগেকার এক মস্ত টেনিস খেলোয়াড়ের ওই নামটা সে ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করে।

কিন্তু বোরোত্রা হঠাৎ দুনিয়ার সব জায়গা ছেড়ে কলকাতা হেন শহরের রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মতো রাস্তায় কেন? বোরোত্রা মানেই তো চরম শয়তানি, সর্বনাশা কিছু! এখানে সেরকম কী মতলবে সে এসেছে!

ট্রাফিক জ্যামটা কাটবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা উচ্চারণে ভয়ংকর রহস্যটার আসল খেই পেয়ে গেলাম। বন্ধ গাড়িটার ভেতর থেকে একটা নামই শুধু চকিতে কানে এল। দু'ব্যারি! তারপরই গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল সামনে।

বিদেশি দামি গাড়ির যেমন পিক আপ তেমনই বেগ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছনে লেগে থাকা কি সোজা কথা! তবু বোরোত্রাকে চোখের আড়াল হতে দিলে আমার চলবে না। যেমন করে হোক তার পেছনে আঠার মতো লোগে থাকতে হবেই।

কলকাতার ঘিঞ্জি সব রাস্তার ভিড় আর যানবাহনের অব্যবস্থা আমার সহায় না হলে বোরোত্রার পেছনে লেগে থাকা আমার সম্ভব হত না। তার পেছনে কেউ লেগে আছে তা আন্দাজ করে অথবা নিজের স্বাভাবিক সাবধানতায় বোরোত্রা তার গাড়িটাকে কলকাতার ভেতরে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিকে তখন যেন চরকি পাক খাওয়াচ্ছে। ড্রাইভারকে যেমন করে হোক তাকে চোখের আড়াল না-হতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি তখন কৌতূহল ভাবনা উদ্বেগে অস্থির হয়ে বসে আছি।

বোরোত্রার সঙ্গে প্রথম দেখার কথাটা তো ভোলবার নয়। বোরোত্রার সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণটা হয়েছে অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য একজন।

মাত্র বছরখানেক আগে হঠাৎ নিজেদের তেলের খনিগুলোর মধ্যে সারা দুনিয়াকে খুশিমত ওঠবোস করাবার কী ক্ষমতা যে আছে, তা বুঝে আরব দেশগুলো পেট্রলের দাম একেবারে আকাশ-ছোঁয়া করে দিয়েছে। পৃথিবীর আমির-ওমরাহ দেশগুলোই তাতে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পথে বসে পড়েছে। দিনকাল বদলেছে। নইলে আরব দেশগুলোর মতো সামান্য ক্ষমতার কোনও রাজ্য আগেকার দিনে বেয়াদবি করলে গ্রেট ব্রিটেন দেখতে-না-দেখতে তিনটে ম্যান অফ ওয়ার পারস্য উপসাগরে পাঠিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিত। এখনও বড় বড় শক্তিগুলোর একটা ছুতো করে পায়ে-পা-লাগিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দুটো এয়্যারক্র্যাফট কেরিয়ার অকুস্থলে রওনা করিয়ে দিয়ে, গোটা পাঁচেক বড় বম্বার সেখানকার আকাশে ক-বার একটু ঘুরিয়ে বেয়াড়াদের সিধে করে দিতে কি ইচ্ছে করে না? কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, সেদিন আর নেই। এক দলের এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার সেখানে দেখা দিতে-না-দিতেই আর-এক নিশান-ওড়ানো কেরিয়ারকে কাছাকাছি টহল দিতে দেখা যাবে নিশ্চয়। একজনের বোমারু বিমান কিছু বাড়াবাড়ি করলে আর-একজনের অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট কামান এখান-সেখান থেকে হঠাৎ হয়তো উঁকি দিতে শুরু করবে।

ও সব পুরনো চাল ছেড়ে মার-খাওয়া পালের গোদাগুলো তাই তখন মুশকিল আসানের ভিন্ন উপায় খুঁজছে।

সব বড় বড় দেশগুলোয় তখন অমন গণ্ডা গণ্ডা লুকোনো আর দেখানো সংকট-মোচনের রাস্তা বার করবার ঘাঁটি।

ন্যু-ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, বন, মাদ্রিদ, অসলো, স্টকহোলম তো বটেই, লিমা, ব্রাসিলিয়া, বুয়েনস এয়ারসে পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা অকাতরে খরচ করে দুনিয়ার সব বাঘা বাঘা ওই লাইনের বৈজ্ঞানিকদের জড়ো করা হয়েছে তেলের বদলি এনার্জি জোগাবার নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য।

নদীর স্রোতের তোড়, হাওয়ার বেগ, সমুদ্রের ঢেউয়ের নিত্য ঝাঁপিয়ে আসা আর ফিরে যাওয়া থেকে সূর্যের তাপ আর পরমাণু বিস্ফোরণ পর্যন্ত অনেক কিছুর ভেতরেই অফুরন্ত শক্তির উৎস সন্ধানের চেষ্টা হচ্ছে।

নানা দেশের রাজশক্তির সরকারি সাহায্য আর উৎসাহ এ-সব চেষ্টার পেছনে অল্পবিস্তর থাকলেও দুনিয়ার কুবেরমার্কা কারবারিরাই নিজেদের স্বার্থে জোট বেঁধে এ-কাজ হাসিলের জন্য মুক্তহস্ত হয়েছে।

তেলের বদলি একটা কিছু সব-দিক-সামলানো সত্যিকার শক্তির উৎস বার করতে খরচায় টান যাতে কোনওমতেই না পড়ে, সেইজন্যই ইউরোপ-আমেরিকার কুবের-কারবারিদের এমন করে জোট বাঁধা। সবচেয়ে বড় এ-জোটের নাম এস-এস-পি-এস।

এক দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বাঘা কারবারি-জোট হলেও এই এস-এস-পি-এস-এর কথা খুব কম লোকেই জানে।

মন্ত্রগুপ্তির ব্যবস্থা তাদের এত পাকা যে, তারা যে দুনিয়ায় নতুন জমানা আমদানি করার ব্যাপারে প্রায় বাজিমাত করতে চলেছে, এ-খবরটা ঘুণাক্ষরেও বড় বড় দেশের গোয়েন্দা দপ্তরেও পৌঁছয়নি।

মঁসিয়ে লেভির মুখে এ-নামটা শুনে তাই সেদিন সত্যি চমকে উঠেছিলাম।

প্যারিসের বেশ একটা গরিব পাড়ার নেহাত সস্তা একটা হোটেলের একেবারে টঙের একটা অখদ্যে ঘর নিয়ে তখন থাকি। হোটেলটার এমন অবস্থা যে, নীচের লবির কাউন্টার থেকে বোর্ডারদের কামরায় ফোনের ব্যবস্থাও নেই। বোর্ডারদের কাউকে কোনও খবর দেবার দরকার হলে নীচের জ্যানিটরকেই সেটা দিতে আসতে হয়।

আমার কামরা চারতলার টঙে। সবচেয়ে সস্তা বলে এই গ্যারেট-ঘরটাই নিয়েছি। চার-চারটে তলার সিঁড়ি ভেঙে এসে হোটেলের বুড়ো জ্যানিটর হাঁফাতে হাঁফাতে যে-খবরটা আমায় দিলে, তাতে আমি প্রথমটা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করলাম।

জ্যানিটর খবর এনেছে যে, কে একজন হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে এ-হোটেলে! মনে মনেই কথাটা আউড়ে আমি বেশ ভাবনায় পড়লাম।

আমার সঙ্গে এ হোটেলে কারওর দেখা করতে আসা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। নিজেকে একটু গোপনে রাখব বলেই খুঁজে পেতে প্যারিসের সেইন নদীর বাঁ পাড়ের এমন একটা অখদ্যে হোটেলে আমি উঠেছি। নিজের সঠিক নামটাও এখানকার রেজিস্ট্রি খাতায় লিখিনি। পাছে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই রাত্রের

অন্ধকারে ছাড়া হোটেল থেকে আমি কখনও বার হই না। তা সত্ত্বেও এখানে আমার খোঁজ করে দেখা করতে যদি কেউ আসে, তা হলে সেটা তো বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার।

মনের তোলাপাড়াগুলো অবশ্য বাইরে বুঝতে না-দিয়ে একটু বিরক্তির সুরেই বলেছি, 'কে আবার এল দেখা করতে। যে এসেছে তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি কেন?'

'পাঠাব কী করে?' জ্যানিটর বুড়ো আমার চেয়েও তিরিক্ষি মেজাজে বলেছে, তার কী এতখানি সিঁড়ি ভাঙবার ক্ষমতা আছে! নীচে এসে যেরকম ধুঁকছে, তাতে আমাদের হোটেল থেকেই না অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়।'

একটু থেমে নীচে যাবার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বুড়ো জ্যানিটর তারপর যেতে যেতে বলেছে, 'আমার খবর দেবার দিলাম। তোমার যা করবার করো।'

মনে মনে তখন বুঝেছি, নীচে যে-ই এসে থাক, তার সঙ্গে দেখা করতে না-গিয়ে আমার উপায় নেই। জ্যানিটর বুড়ো চলে যাবার পর প্রায় তার পিছু-পিছুই তাই সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি নীচের লবিতে। যেমন হোটেল তেমনই তার লবি। বসবার চেয়ার সোফাটোফাগুলি ভাঙাচোরা, ছেঁড়া-খোঁড়া, কাউন্টারের কাঠের তক্তার পালিশ-টালিশ কবে উঠে গিয়ে একটা উইয়ে-খাওয়া চেহারা। সমস্ত হোটেলটাই যেন কোনও পুরনো রদ্দি মালের নিলেমের হাট থেকে কিনে এনে বসানো হয়েছে।

হোটেল যেমনই হোক, তার কাউন্টারের ক্লার্ক কিন্তু চটপটে, মোটামুটি ফিটফাট এক ফাজিল ছোকরা। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে লবিতে কাউকে দেখতে না-পেয়ে কাউন্টারের দিকে খোঁজ করতে যেতেই ঠাট্টা করে বললে, 'আপনার সঙ্গে স্বয়ং মিথুজেলা দেখা করতে এসেছেন।'

রসিকতাটা গ্রাহ্য না করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় তিনি!'

ফাজিল ছোকরা রসিকতার সুরেই বললে, 'খোদ মিথুজেলা তো! সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাবার ক্ষমতা নেই, আবার লবিতেও সকলের সামনে বসে থাকতে চান না। একটু নিরিবিলিতে অপেক্ষা করতে চাইলেন বলে সিঁড়ির নীচের কোণে জ্যানিটরের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি। যা অবস্থা! দেখুন এতক্ষণ টিঁকে আছেন কিনা।'

ছোকরার শেষ রসিকতাটা মুখ থেকে বার হবার আগেই সিঁড়ির পেছনের কোণে জ্যানিটরের বসবার জায়গায় একটু ব্যস্ত হয়েই ছুটে যাবার ইচ্ছে হলেও সে-ইচ্ছেটা চেপে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, 'মিথুজেলাই হোক আর যেই হোক, আমার খোঁজে এসেছে বলছ কী করে? নাম বলেছে আমার?'

এবার ক্লার্ক ছোকরা একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর একটু সামলে কৈফিয়তস্বরূপ জানালে, 'না, নাম আপনার বলেননি। তবে কাউন্টারে এসে আপনার চেহারা পোশাকের বর্ণনা দিয়ে খোঁজ করাতে আমি ভাবলাম—'

'তোমার শুধু চুল ছাঁটাবার মাথা। ভাববার জন্য নয়,' বলে ফাজিল ছোকরাকে বেশ একটু হতভম্ব করে সিঁড়ির পেছনের কোণে গিয়ে কিন্তু সত্যি অবাক আর স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সেখানে জ্যানিটরের চেয়ারটায় প্রায় যেন ভেঙে-পড়া অবস্থায় যে মানুষটা বসে আছে তাকে চিনতে পারিনি এমন নয়। একমুখ দাড়ি গোঁফ সমেত চেহারায় অমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সে যে মঁসিয়ে লেভি ছাড়া আর কেউ নয় তা বুঝতে আমার কয়েক সেকেন্ড মাত্র লেগেছে।

কিন্তু মঁসিয়ে লেভি এমন অবস্থায় আমার কাছে কেন? আমার খোঁজই বা সে পেল কী করে! আর আমার এখন তার বিষয়ে কী করা উচিত? এই ক-টা প্রশ্ন মনের ভেতর ওঠবার মধ্যেই লেভি কোনওরকমে ঘাড়টা তুলে আমার দিকে তাকাল। তার সেই ক্লান্ত কোটরে-বসা-চোখের চাউনি যেন মড়ার চোখের দৃষ্টি।

আমার দিকে সেইভাবেই কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে সে বললে, 'দাস, তোমায়—'

আমার এবার কী করা উচিত তা এইটুকুর মধ্যে আমি ঠিক করে নিয়েছি।

লেভিকে তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কড়া গলায় বললাম, 'কাকে কী বলছেন আপনি? দাস বলছেন কাকে? আমি দাস নই! মিছিমিছি কেন আমাকে ডাকিয়ে নামিয়েছেন?'

লেভির মুখচোখের চেহারা দেখে তখন কষ্ট হচ্ছে। কেমন হতাশভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলেছে, 'তুমি—আপনি দাস নন?'

'না, আমি দাস নই। আমার নাম লোপেজ গঞ্জালেস। হোটেলের কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করলেই আমার নাম জানতে পারতেন—'

বেশ গলা চড়িয়ে লেভিকে এসব কথা শোনাবার মধ্যে একটা চোখ কয়েকবার মটকে তাকে ইশারা করবার চেষ্টা করেছি।

লেভির চোখের দৃষ্টিই হয়তো ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে বলে সে সে-ইশারা বুঝেছে বলে মনে হয়নি।

তার ওপর ফরাসিতে চড়া গলায় তম্বি করার মধ্যে তাই এবার একবারের জন্য গলাটা একেবারে নামিয়ে তুর্কি ভাষায় একটা কথা শুধু বলেছি। ফ্রান্সের লোক হলেও লেভি যে বহুকাল তুরস্কেই কাটিয়েছে আর সেখানকার ভাষা যে ওর প্রায় মাতৃভাষার মতো তা জেনে চড়া গলার গালাগালির মধ্যে ছোট্ট করে শুধু তুর্কিতে একবার বলেছি, 'এটা নাটক।'

মুখের তোড়টা অবশ্য আগে পরে সমানে চালিয়ে গেছি। বলে গেছি, 'আসলে কে আপনি, কী মতলবে এখানে এসেছেন ঠিক করে বলুন। আজগুবি একজনের নাম বলে এখানে খুঁজতে আসার ছল করে ঢোকার নিশ্চয়ই একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে।—ভয় নেই! এটা নাটক!—আপনার পাকা চুলদাড়ি দেখে ভুলব ভাববেন না। ও সব চালাকি আমার অনেক জানা আছে।'

চোখের ইশারায় যা হয়নি, আমার তম্বির মধ্যে ওই তুর্কি কথাটুকুতেই তা হাসিল হয়েছে। ক্লান্ত দুর্বল গলাতে হলেও লেভি এবার ব্যাপারটা বুঝে নিজেও যথাসাধ্য অভিনয় করবার চেষ্টা করেছে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলেছে, 'না, না, আমারই ভুল হয়েছে

এখানে আসা। আমায় মাপ করবেন। আমি—আমি চলে যাচ্ছি।'

কিন্তু চলে যাবে কী, উঠতে গিয়েই লেভি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার জোগাড়।

কোনওরকমে তাকে ধরে ফেলে এবার বাধ্য হয়ে সুর পালটাতে হয়েছে।

যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'আরে আপনি হাঁটতে গিয়ে টলে পড়ছেন যে! নেশায় চুর হয়ে এসেছেন বুঝি? অবস্থা যা দেখছি তাতে এই হোটেলের মধ্যেই দাঁত ছিরকুটে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবেন। চলুন, চলুন, আপনাকে বার করে দিয়ে আসি। আরে না, না, ও সামনের দরজা দিয়ে নয়। ওখানে কেউ আপনার এ চেহারা দেখলে এ হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে। এদিকে এই খিড়কি দিয়ে আসুন—'

এই সব বোলচাল দিতে দিতে লেভিকে ধরে হোটেলের পেছনের দিকের একটা খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিরাপদ বলে সেইন নদীর ধারে ওখানকার মাল-টাল বওয়া লঞ্চ, টাগ-বোটের মাঝিমাল্লাদের একটা কফিখানায় গিয়ে উঠেছি।

সেখানে লেভির এমন হাল কী করে হল জানতে চাওয়ায় তার মুখে এস-এস-পি-এস শুনে অবাক হয়েছি।

জিজ্ঞাসা করেছি, 'এস-এস-পি-এস! এ নাম তুমি কোথা থেকে জানলে? কী জানো তুমি এস-এস-পি-এস সম্বন্ধে?'

'যা জানবার সবই জানি', হতাশ ভাবে বলেছে লেভি,' আমার এখন এ হাল হয়েছে ওই এস-এস-পি-এস-এরই জন্য।'

'এস-এস-পি-এস-এর জন্য?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তা হলে ওদের সঙ্গে তুমি জড়িত ছিলে?'

'হ্যাঁ, ছিলাম," ক্লান্তভাবে বলেছে লেভি, 'কিন্তু ওরা কারা, কী ওদের কাজ, তুমি নিজে কিছু জানো?'

'তা একটু জানি বইকী', তিক্ত স্বরেই বলেছি, 'আর কিছু অন্তত না-জানলে আর আরও-কিছু জানতে না চাইলে এমন করে নাম ভাঁড়িয়ে এরকম একটা জায়গায় লুকিয়ে বসে আছি কেন? কিন্তু তুমি এখানে আমায় খুঁজে বার করলে কী করে?'

'নেহাত ভাগ্যের জোরে', বলে লেভি তার নিজের কাহিনীটা আমায় শুনিয়েছে।

লেভি কাজটা এতদিন যা করে এসেছে তা প্রাণ-হাতে-নিয়ে-ফেরার মতো পরম দুঃসাহসের হলেও তার একটা দুর্নাম আছে।

কাজটা গুপ্তচরের। তবে লেভির একটা বিশেষত্ব এই যে, শুধু মোটা ইনামের প্রলোভনে যা সে অন্যায় মনে করে এমন কাজ সে কখনও জেনেশুনে হাতে নেয়নি।

বাইরে ফ্রান্সের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে সেলসম্যানের ভোল নিয়ে সে বহুকাল থেকেই তুরস্কেই তার গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

এস-এস-পি-এস তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তেলের বাদশাদের একচেটিয়া মালিকানার জুলুম ব্যর্থ করে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য এনার্জির অন্য উৎস আবিষ্কারই এদের মহৎ উদ্দেশ্য জেনে লেভি এদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়। তেলের বাদশা-মালিকরাই তাদের আসল শত্রু বলে বুঝিয়ে তাদের গোপন চক্রান্তের অন্ধি-সন্ধি জানবার জন্যই লেভিকে যেন

লাগানো হয়।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লেভি এস-এস-পি-এস-এর আসল স্বরূপ জানতে পারে।

'কী সে স্বরূপ?' এই পর্যন্ত শুনেই লেভিকে প্রশ্ন করেছি।

'তা তুমি এখনও জানো না?' লেভি একটু রুক্ষ স্বরেই আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

একটু হেসে বলেছিলাম, 'জানি যে, তারা সমস্ত পৃথিবীকে নতুন এক মহাজনি সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস করে রাখতে চায়। তুমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানো কি না তাই শুনতে চাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বেশি কিছুই জানি', জ্বলন্ত স্বরে বলেছে লেভি, 'একটা নামই প্রথম বলছি, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি। শুনেছ কখনও এ নাম?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' এবার একটু নরম গলাতেই বলেছি, 'ও নাম হল, এনার্জি আনলিমিটেড ওয়ার্লড কার্টেল। ওই নামটুকুর বেশি আর কিছুই জানি না সে-কথা অবশ্য স্বীকার করছি।'

'বেশ, আমার কাছেই শোনো তা হলে', বলে লেভি এবার এস-এস-পি-এস আর ই-ইউ-ডব্লিউ-সির সমস্ত রহস্য আমায় বুঝিয়েছে। সে-রহস্য নিজে জানবার পর এস-এস-পি-এস-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে রাজি না হওয়ায় কেমনভাবে তাকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে লোপাট করে কাছের এক ছোট দ্বীপে বন্দি করে রাখা হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে খতমই করে দেওয়া হবে জেনে কেমন করে সে ভাগ্যক্রমে সেখান থেকে পালায় আর তারপর এসব গোপন রহস্য জানিয়ে যাবার জন্য নিজে এস-এস-পি-এস-এর ভাড়াটে দুশমনদের হাতে ধরা পড়বার বিপদ সত্ত্বেও কীভাবে তার পুরনো বিশ্বাসী বন্ধুদের খোঁজ করে বেড়ায়, সে-কাহিনী লেভি আমায় শুনিয়েছে।

আমায় খুঁজে পাওয়াটা নেহাত তার ভাগ্য। প্যারিসের নানা রাস্তায় ছন্নছাড়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে একজনের চেহারা দেখে বেশ ফাঁপরে পড়ে। চেহারাটার সঙ্গে তার এককালের বন্ধু আর সঙ্গী দাস-এর খানিকটা মিল থাকলেও, মানুষটার চলাফেরা পোশাক সবই আলাদা।"

৪

"ও! আপনি বুঝি চলাফেরার কায়দাও বদলে দিয়েছিলেন?" ঘনাদার কথার মাঝখানেই মুগ্ধ গদগদ স্বরে বললেন পল্টুবাবু।

"হ্যাঁ, চেনার অসাধ্য করে ভোল পালটাতে হলে শুধু চেহারা পোশাকই নয়, হাঁটা, চলা, কথা বলার ধরনও বদলাতে হয়!" ঘনাদা একটু অনুকম্পার হাসির সঙ্গে জ্ঞানটুকু দিতে পেরে খুশি হয়েই আবার বলতে শুরু করলেন, "কিন্তু লেভিও তো গুপ্তচরগিরির বিদ্যায় বড় কম যায় না। গরমিলগুলো সত্ত্বেও সে দূর থেকে আমার পিছু নেয়, আর তারপর আমার হোটেলটার হদিস পেয়ে দেখা করতে আসে মরিয়া

হয়েই।

তার নিজের যে আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই তা সে ভাল করেই জানে। এস-এস-পি-এস-র কয়েদখানায় তার শরীরের যা হাল হয়েছে তাতে আর ক-দিনই বা সে টিঁকবে! তা ছাড়া বেঁচে থাকলেও যে-দুশমনেরা তার পেছনে লেগে আছে, তারা তাকে ধরে ফেলবেই। আমায় তাই লেভি তার জোগাড়-করা সমস্ত সুলুক-সন্ধান দিয়ে ই-ইউ-ডব্লিউ-সি আর এস-এস-পি-এস সম্বন্ধে যা করবার তাই করতে বলে।

আমার একটা সুবিধের কথাও সে আমায় জানিয়ে দেয়। ই-ইউ-ডব্লিউ-সি তো বটেই, এস-এস-পি-এস-এর চর আর চাঁইদের কাছেও আমি একেবারে অজানা। আমি তাই বেশ চুপিসারে তাদের পেছনে লেগে থেকে নিজের মতলব হাসিল করতে পারব।

সবশেষে লেভি বলেছে, ই-ইউ-ডব্লিউ-সি সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব যে কী তা আমায় যে বলে দিতে হবে না, তা সে জানে।

লেভিকে তারই ভালর জন্য মাঝিমাল্লার ওই কফি-খানাতেই রেখে আমি একলা সেখান থেকে চলে এসেছি। সাবধানের মার নেই বলে হোটেলটা থেকেও পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে সরে পড়েছি সেইদিনই।

তারপর লেভির কাছে পাওয়া সব সুলুক-সন্ধানের খেই ধরে যত জায়গায় ঘুরেছি তা দেখাতে হলে সারা দুনিয়ার ম্যাপটাই খুলে ধরতে হয়। সারা দুনিয়া চষে বেড়াবার পর তখন ক-দিনের জন্য হংকং-এ আছি। কাজ যে কিছু সারতে পারিনি তা নয়, কিন্তু হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা যা হয়ে গেল, তা আমার সম্পূর্ণ আশাতীত।

বিকেলের দিকে সেদিন হংকং-এর সব দ্রষ্টব্যের মধ্যে তুলনাহীন সেই সমুদ্র-পার্কে গিয়েছিলাম। পৃথিবীর কোথাও যা নেই, সামুদ্রিক প্রাণীর সেই বিরাট স্বাভাবিক পরিবেশের সমাবেশে অন্য সবকিছুর মধ্যে বিশেষ করে গ্লোরি আর বার্ট নাম দেওয়া দুই ডলফিনের জল থেকে পুরো এক-মানুষ-প্রমাণ লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে বল হেড করার বাহাদুরি দেখে বেশ একটু আমোদ পেয়ে কেব্‌ল-কারে চড়ে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে উঠে বসতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেছি।

ট্যাক্সির দরজাটা খুলে সবে ভেতরে উঠে বসেছি, এমন সময় অন্যদিক থেকে একটা রোগাটে হাঘরে চেহারা ও পোশাকের মানুষ যেন চোরের মতো ছুটে এসে অন্যদিক দিয়ে আমার ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ে কাতর মিনতি করে বলল, 'দোহাই আপনার, যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানেই চালাতে বলুন।'

মিনতিটা ফরাসিতে করা। ট্যাক্সিতে চিনে ড্রাইভার ফরাসি বুঝুক না-বুঝুক এ উপদ্রবে রেগে উঠে তার নিজের ভাষায় আর পিজিন ইংরেজিতে লোকটাকে নেমে যাবার জন্য ধমক দিলে।

আমার দিকে করুণভাবে চেয়ে লোকটা নেমে যেতেই উঠছিল। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে ড্রাইভারকে আমারে হোটেলের ঠিকানায় চালাতে বললাম।

হোটেল পর্যন্ত পৌঁছবার পর লোকটা নেমে চলে যাবে ভেবেছিলাম। তা গেলে তাকে বাধা দিতেও পারতাম না। কিন্তু তা সে গেল না। আমি লবি থেকে অটোমেটিক লিফটে গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার সেই আধময়লা ছেঁড়া হ্যাভারস্যাক নিয়ে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ে আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

পাঁচতলায় আমার কামরা। সেখানকার ল্যান্ডিংয়ে নামবার পরেও দেখি, সে আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। আমার কামরা সতেরো নম্বর। সে-কামরায় যাবার প্যাসেজে তখন কোনও লোক নেই। আমার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে তার দিকে ফিরে বললাম, 'আমি কিন্তু এবার আমার কামরায় যাচ্ছি।'

'দয়া করে আমাকে তা হলে আজকে রাত্রের মতো এখানে থাকতে দিন।' লোকটা আতঙ্ক-মেশানো চাপা গলায় বললে, 'আমি মেঝের কার্পেটের ওপর শুয়ে থাকব। আপনার এতটুকু অসুবিধে করব না। আর কাল ভোর হবার আগেই এখান থেকে পালিয়ে যাব।'

একটু বাঁকা ঠোঁটে হেসে কামরার দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আগেই সেই আগের মতো সুড়ুত করে যেন চোরের মতো ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দরজাটা বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে এবার একটু কড়া গলাতেই বললাম, 'এ হোটেলটা পশ যাকে বলে সেইরকম খানদানি মোটেই নয়। তবে অনেককালের চেনা, আর এদের আদর-যত্নের ব্যবস্থা খারাপ নয় বলে এখানেই আমি সাধারণত উঠি। এ হোটেলের ওপর আমার যেমন একটু টান আছে, এখানকার মালিক ম্যানেজারও তেমনই আমায় একটু খাতির করে। তাদের কিছু না-জানিয়ে বেআইনিভাবে সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোককে আমার কামরায় থাকতে দেওয়ার মতো বেয়াড়া কাজের কথা যদি তারা জানতে পারে তা হলে আমার অবস্থাটা কী হবে? আমার এ কামরায় হোটেলের বয়-বেয়ারারা নানা ফরমাশ তামিল করতে আসে। হোটেলের ডাইনিং রুমে নয়, আমি এখানেই নিজের কামরায় ডিনার খাই। সে-ডিনার দিতে, প্লেট-টেট নিয়ে যেতে, আর আরও নানা কাজে বয়-বেয়ারারা যখন আসা-যাওয়া করবে, তখন আপনি তাদের চোখে পড়বেন না বলতে চান? কোথায় আপনি তখন লুকোবেন? বাথরুমে?'

'হ্যাঁ,' বলেই থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে লোকটি শুকনো মুখে কয়েক সেকেন্ড পরে বললে, 'তা হলে? তা হলে আমি চলেই যাই।'

সে অসহায়ভাবে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াতে তাকে হাতের ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার বিপদ খুব বেশি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি তা থেকে বাঁচবার জন্য আমার শরণ কেন নিলেন বলুন তো?'

'আমি—আমি—কিছু না ভেবেচিন্তে প্রথম আপনাকে ট্যাক্সি করে যেতে দেখে আপনার গাড়িতে উঠে পড়েছি।'

লোকটি আরও কী বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি যা করেছেন তা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু আপনার কাজটা কী রকম হয়েছে জানেন?'

একটু থেমে কামরার একটা দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'হোটেলটা খুব নতুন নয়, তা আপনাকে আগেই বলেছি। ওই দেখুন, দেয়ালে একটা শিকারি মাকড়শা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ছোট্ট মাকড়শাগুলো জাল পাতে না। একা একা শিকার করে বেড়ায়। পোকা বা মাছি দেখলে ওত পেতে থেকে জো বুঝে ঝাঁপ দিয়ে ধরে।'

লোকটি এবার কেমন একটু সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চাইছে। আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ কি না এই বোধহয় সন্দেহ।

তার সন্দেহটা একটু গভীর হতে দিয়েই বললাম, 'বাগে পেলে এ মাকড়শা মাছি-টাছি শিকার করে, কিন্তু ধরুন, কোনও মাছি যদি নিজে থেকে যেচে এসে ওর খপ্পরে পড়ে, তখন মাকড়শাটার কীরকম ভাব হতে পারে বুঝতে পারেন?'

লোকটা কোনও উত্তর না দিয়ে বেশ হতভম্ব আর একটু ভয়-ভয় মুখ নিয়ে আমার দিকে এবার চেয়ে রইল।

'বুঝতে ঠিক পারছেন না, না?' আমিই আবার একটু হেসে বললাম, 'আচ্ছা অন্য একটা কথা বলি। আমি কে, তা তো আপনি জানেন না। আমি ট্যাক্সি করে চলে যাচ্ছি দেখে পালাবার জন্য কিছু না ভেবেচিন্তে আমার গাড়িতে এসে উঠেছেন। এখন আমার পরিচয় একটু শুনুন। আমি এই হংকং শহরে কেন এসে আজ সাতদিন ধরে সমস্ত শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি? বেড়াচ্ছি শুধু একটি মানুষকে খোঁজবার জন্য। তার নাম দ্যু'ব্যারি। রোগা পাতলা প্রায় হাঘরে চেহারা পোশাকের একটা নেহাত সাধারণ মানুষ। নাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি, কিছুই তার নেই। তবু পৃথিবীর কারও কারও কাছে তার দাম তার ওজনের হিরে-মানিকের চেয়ে বেশি। তেমনই একটি পার্টি দ্যু'ব্যারিকে খুঁজে বার করবার জন্য যা চাই তা-ই খরচা আর ইনাম কবুল করে আমায় লাগিয়েছে। দু'ব্যারিকে আমি এই হংকং শহরে খুঁজেও পেয়েছি। শুধু খুঁজেই পাইনি, সে নিজে থেকে—'

এরপর আর কিছু আমার বলা হল না। দু'ব্যারি নামটা করার পর থেকেই একেবারে ভয়ে সিঁটিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে লোকটা একটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কথার মাঝখানে শুকনো কাঁপা গলায় বললে, 'আপনি—আপনি আমাকে নিয়ে কী করবেন এখন?'

'আপনাকে নিয়ে!' এক মুহূর্তের জন্য একটি মিথ্যে বিস্ময়ের ভান করতে গিয়ে খুব খারাপ লাগল বলে সোজাসুজিই এবার বললাম, 'আপনি তা হলে স্বীকার করছেন যে, দ্যু'বারি আপনার নাম। কিন্তু কারা আপনাকে যেমন করে হোক, যেখানে হোক ধরবার জন্য সমস্ত দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে তা জানেন কি?'

'না।' শুকনো কাতর গলায় দু'ব্যারি বলল, 'সত্যিই ঠিক করে জানি না। তবে তাদের যে অনেক ক্ষমতা, অনেক টাকা, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই যে তাদের লোকজন চর-টর আছে, এটুকু ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।'

হেসে বললাম, 'তা হলে অনেকটাই বুঝেছেন। কিন্তু কেন তারা আপনাকে ধরতে চায় তা কিছু জানেন কি?'

'জানি, একটু ইতস্তত করে বললে দু'ব্যারি, 'তারা—তারা আমার সমস্ত কাজ নষ্ট

করে দিতে চায়, আমায় তারা ব্যর্থ করতে চায়।'

'কিন্তু কেন তা চায়, কী আপনার কাজ, তা বলতে আপনার একটু দ্বিধা হচ্ছে—কেমন?' এবার গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এমনই বেকায়দায় পড়েও আপনার সব রহস্য আমার মতো অচেনা একজনের কাছে ফাঁস করতে চান না। তা হলে কী আপনার কাজের রহস্য, আর কেন কারা আপনাকে নিজেদের খপ্পরে পুরে সে কাজ নষ্ট করে দিতে চায় তা আমিই বলছি, শুনুন।'

দ্যু'ব্যারির করুণ অসহায় চেহারা দেখলে তখন মায়া হয়। দেওয়ালের ধার থেকে তাকে একটা সোফায় বসিয়ে তার পাশের আর-একটা আসনে বসে বলতে শুরু করলাম, 'উনিশশো তিয়াত্তরে আরব দেশগুলো তাদের অঢেল তেলের পুঁজির জোরেই গোদা গোদা সব রাজাগজার দেশের বড়মানুষি গরম ঠাণ্ডা করে দেবার পর পৃথিবীর সব জায়গায় নতুন করে হিসেবনিকেশ শুরু হয়। এ সব বিষয়ে মাথা যাদের পাকা, তারা এইটে তখন বুঝে ফেলেছে যে, আরবরা হঠাৎ আবার দয়া করলে বা নতুন আরও ক-টা আরব দেশের মতো তেলের খনি বেরুলেও পৃথিবীর জ্বালানির সমস্যা চিরকালের মতো তাতে মিটবে না। এখন যত অঢেলই মনে হোক, মানুষের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে পৃথিবীর বুকের এ সব তেলের পুঁজি ক্রমশই একেবারে ফুরিয়ে যাবে। তখন উপায়? উপায় অনেক রকমই আছে মনে হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে শুরু করে সূর্যের তাপ পর্যন্ত অনেক কিছু ভবিষ্যতের ভরসা হতে পারে। কিন্তু তা, অপর্যাপ্ত শুধু নয়, সস্তা আর সহজে পাবার মতো হওয়া চাই। পৃথিবীর পয়লা নম্বর মহাজনি কারবারিরা তার চেয়েও যা বেশি চায়, তা হল যাকে বলে মৌরসি পাট্টা। দুনিয়ার জ্বালানির সমস্যা যা মেটাবে তা যেন গোনাগুনতি ক-জনের মাত্র দখলে থাকে। নগদ লাভ ওরা বোঝে, কিন্তু শুধু সেই দিকে নজর দিয়েই কাজ করে না। ওরা অনেক দূর-ভবিষ্যতের ওপর চোখ রেখে ঘুঁটি সাজাতে জানে। ও সব দেশে তাই এস-এস-পি-এস অর্থাৎ স্যাটেলাইট সোলার পাওয়ার স্টেশন নিয়ে এক বিরাট কারবার ফাঁদা হয়েছে। এ কারবারে জোট বেঁধেছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর ধুরন্ধর টাকার কুমিরেরা।

সূর্যের তাপ পৃথিবীতে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে মহাশূন্যে শুধু অনেক বেশি নয়, সারাক্ষণই পাওয়া যায়। মহাকাশে অসংখ্য সূর্যের তাপ ধরবার যন্ত্র-বসানো স্যাটেলাইট ঘুরিয়ে, তারই উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেতার অণু-তরঙ্গে পৃথিবীর কারবারিদের নিজস্ব সব অণু-তরঙ্গ-ধরা অ্যান্টেনা-গ্রিডের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে, তা থেকেই সর্বত্র নিজেদের লাইনে পাঠাবার মতো হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এই কারবারিরা ভবিষ্যতের দুনিয়াকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখবার জন্য এস-এস-পি-এস নিয়ে এক বিরাট কোম্পানি গড়ে তুলছে। দু-চার বছর নয়, অমন বিশ পঞ্চাশ, এমনকী, একশো বছর এরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। এরা জানে, একদিন এদের কাছে পৃথিবীর সবাইকে হাত পাততে হবে। তাদের শুধু সাবধান থাকতে হবে যাতে তাদের এই ভাবী শক্তি-সাম্রাজ্যের একাধিপত্যে বাদ সাধবার মতো কোথাও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না গোকুলে বাড়তে পারে।'

একটু থেমে তার দিকে নালিশের আঙুল তুলে বললাম, 'আপনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী। কী এক আজগুবি ফন্দি খাটিয়ে আপনি ওদের এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ধসিয়ে দিতে চান—আপনি—'

'না, না,' অস্থিরভাবে আমার কথায় বাধা দিয়ে বললে দ্যু'বারি, 'আমি যা করতে চাইছি, তা সত্যিই আজগুবি কিছু নয়। আমি একা নয়, আমার সঙ্গে আমারই মতো আরও ক-জন এই কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। আমরা সাম্রাজ্য গড়তে চাই না। পৃথিবীর সকলের জন্যে নিতান্ত সস্তায় এমন অঢেল এনার্জির ব্যবস্থা করতে চাই, যা আকাশ-বাতাসকে কোথাও এতটুকু নোংরা করবে না। আমরা একাজে অনেক দূর এগিয়েছি, আর কিছুদিন নির্বিঘ্নে একটু নিরিবিলিতে যদি কাজ করতে পারি, তা হলে আমাদের আবিষ্কারে উদ্ভাবনে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে। আমাদের আসল কাজটা যা নিয়ে তা এখনও কাউকে বলার উপায় নেই, তাই—'

'বলার দরকার নেই,' দ্যু'ব্যারিকে থামিয়ে বললাম, 'কী আপনাদের কাজ, তা আমি জানি।

'জানেন?' অবাক আর সেই সঙ্গে একটু হতভম্ব গলায় বললে দ্যু'ব্যারি, 'কিন্তু আমরা তো—'

'আপনাদের আসল কাজ আর উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ করেননি, এই তো?' দ্যু'ব্যারির কথাটা তার হয়ে শেষ করে দিয়ে বললাম, 'তা না-করলেও আপনারা কোথাও কোনও গোপনে একটা নতুন ধরনের রেডিয়ো-টেলিস্কোপ বসিয়েছেন, এই খবরটুকুই অল্পবিস্তর এখানে ওখানে ছড়িয়েছে। কেউ কেউ তার ওপর শুধু আর-একটু অনুমান করেছে যে অমন গোপনে চুপিচুপি কোথাও নতুন রেডিয়ো-টেলিস্কোপ বসানো নেহাত বাতুল খামখেয়াল নয়। আমি কিন্তু জানি যে, আপনাদের কাজকর্মগুলো খামখেয়াল না হলেও ছোট শিশুর চাঁদ ধরতে চাওয়ার চেয়ে কম আজগুবি বাতুলতা নয়।'

'আজগুবি বাতুলতা বলছেন আপনি?' দ্যু'ব্যারি রীতিমতো ক্ষুণ্ণ।

'তা ছাড়া কী বলব?' একটু হেসে বললাম, 'অবোধ শিশু আকাশের চাঁদ ধরতে চায়, আর আপনারা চাইছেন চাঁদ-সূর্য-তারা-টারা কিছু নয়, মহাশূন্যের একটা ছেঁদা, একটা কালো ফুটো। সেই ফুটো দিয়েই দুনিয়ার সব এনার্জির সমস্যা আপনারা মিটিয়ে দেবেন। কয়লা, পেট্রোল কি পরমাণু-শক্তির আর কোনও দরকারই থাকবে না—এই তো আপনারা বলতে চান?'

খানিক যেন ভোম মেরে চুপ করে থাকবার পর দ্যু'ব্যারি ধীরে ধীরে বললে, 'কী করে আপনি এ সব জেনেছেন জানি না, কিন্তু সত্যিই এই কাজেই আমরা লেগে আছি। আকাশের একটা কালো ফুটো, এর মানে যদি সবাই বুঝত!'

তার মুখ থেকে কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললাম, 'বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই এখনও ভাল করে বোঝে কি? উনিশশো সত্তরে আফ্রিকার কিনিয়া থেকে উহুরু নামে উপগ্রহকে পৃথিবী প্রদক্ষিণে ছাড়ার তিন মাস বাদে, এক্স-রে-র উৎস ধরে সিগনাস তারামণ্ডলে পৃথিবী থেকে প্রায় আট হাজাব আলোকবর্ষ দূরের, আমাদের সূর্যের

বিশগুণ বড়, এক জ্বলন্ত তারার বেতালা অয়নেই তার বিরাট সঙ্গী হিসেবে মহাশূন্যের প্রথম যথার্থ এক কালো ফুটোর হদিস মেলে। মহাশূন্যের সেই কালো ফুটো যে কী তা এখনও প্রায় বেশির ভাগই অঙ্ক দিয়ে হাতড়ানো অনুমান আর কল্পনা। মাধ্যাকর্ষণ এমন এক শক্তি, যা দূরত্বের বর্গ হিসেবে বাড়ে কমে। দূরত্ব দু-গুণ বাড়লে মাধ্যাকর্ষণ চারগুণ কমে যায়, আবার দূরত্ব তিন ভাগ কমলে তা ন-গুণ যায় বেড়ে। বিশ্বের বিরাট বিরাট রাক্ষুসে সব তারার তো বটেই, সব জ্বলন্ত নক্ষত্রই শেষ পর্যন্ত নিজের মাধ্যাকর্ষণের টানে কুঁকড়ে ছোট হতে হতে নিজের মধ্যেই এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে যায় যে, একটা আলোর কিরণেরও ক্ষমতা থাকে না সেই চরম মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে বার হতে। জ্বলন্ত নক্ষত্রের সেই শেষ কবর মহাশূন্যের একটা কালো রাক্ষুসে ফুটো হয়ে থেকে যা নাগালের মধ্যে পায় তা শুধু গিলেই খায়। সে শুধু খায়, ওগরায় না কিছু। তার নাগালের মধ্যে পড়লে কোনও কিছুর নিস্তার নেই। সব কিছু সে টেনে নেবেই ফুটোর মধ্যে।'

'হ্যাঁ, ওই টেনে নেওয়ার ওপরই আমাদের সব ফন্দি খাটানো।' দ্যু'ব্যারি যেন আমার কথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, 'মহাশূন্যের কালো ফুটো সম্পর্কে অন্য-কিছু সঠিক জানা থাক বা না থাক, তা যে নাগালের মধ্যে যা পায়, অবিরাম নিজের গহ্বর-কবরে তা টেনে নেয়, এ-বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তা ছাড়া আর-একটা বিষয়ে বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরই ধারণা যে, সমস্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যেমন অসংখ্য ছায়াপথ নক্ষত্র আছে, তেমনই আছে অগুনতি কালো ফুটো। আমাদের নিজেদের এই ছায়াপথেই এমন অন্তত এক কোটি কালো ফুটো থাকা অসম্ভব নয়। সেসব ফুটো আবার বিরাট না হয়ে নেহাত ছোটও হতে পারে।'

একটু থেমে দম নিয়ে দ্যু'ব্যারি গর্বভরে বললে, 'তেমনই একটি কালো ফুটো আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমার রেডিয়ো-টেলিস্কোপে। সেটা সিগনাস এক্স-ওয়ান-এর মতো দূরও নয়, মাত্র দুই আড়াই আলোকবর্ষ দূরে। আর কিছু দিন নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারলে তার অবস্থানটা আমি একেবারে নির্ভুলভাবে ছকে ফেলতে পারব। তা হলেই কাম ফতে। ওই খুদে কালো ফুটোর চারধারে কুয়ো বাঁধিয়ে দেবার মতো একটা উপগ্রহের কায়েমি চাকতি হিসেব করে মাপাজোখা দূরত্বে লাগিয়ে দিলেই, পাহাড়ি প্রপাতের জল পড়বার বেগ থেকে যেমন, কালো ফুটোর সর্বনাশা টান থেকে তার গলার চাকতিতে বসানো যন্ত্র দিয়ে তেমনই অফুরন্ত অগাধ এনার্জি পৃথিবীতে চিরকাল ধরে জোগান দেওয়া যাবে। আর কিছুদিন মাত্র বিনা উপদ্রবে নিরিবিলিতে কাজ করবার অবসরটুকু আমার দরকার। আমার রেডিয়ো-টেলিস্কোপ যে কোথায় কোন অজানা জায়গায় লুকোনো, তা এরা জানে না। আমায় শুধু মাঝে মাঝে কিছু দরকারি সাজসরঞ্জাম আর রসদের জন্য কোনও-না-কোনও বড় দেশের আধুনিক শহরে আসতে হয় বলে এবারে এদের নজরে আমি পড়ে গেছি। আমার কাজ শেষ করবার জন্য যেমন করে হোক এদের কাছ থেকে লুকিয়ে নিজের ঘাঁটিতে আমায় পালাতে হবে। সেই সুযোগটুকু শুধু আমি চাই।'

দ্যু’ব্যারি আমাকেই যেন দেবতা বানিয়ে তার প্রার্থনা জানালে!

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাই বলতে হল, ‘সে সুযোগ তো আপনি পাবেন না, মঁসিয়ে দ্যু’ব্যারি। যারা আপনার পেছনে লেগে আছে তারা আপনার ওই কালো ফুটো কবজা করবার ফন্দি নেহাত আজগুবি ঘোড়ার ডিম মনে করলেও সাবধানের মার নেই হিসেবে আপনাকে নিজের খুশি মতো পাগলামি করবার জন্যও ছেড়ে দেবে না। তাদের একজন হিসেবে আমি আপনার সামনেই আছি। তা ছাড়া এই হোটেলে আর তার বাইরে ক-জন যে এই শহরে আপনার ওপর নজর রাখবার জন্য আছে, তা আমিও জানি না। এদের হাত ছাড়িয়ে, এখন আর আপনি পালাতে পারবেন না।’

এতক্ষণে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে দ্যু’ব্যারি বললে, ‘তা হলে কী করতে চান এখন আমাকে নিয়ে?’

‘আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব।’ শক্ত হয়েই বললাম, ‘তবে আপনার নিজের সম্মানের খাতিরে আর হোটেলের সুনামের জন্য সামনের কোনও লিফটে হোটেলের লবি দিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই না। হোটেলের পেছনের দিকে দরকার মতো হোটেলের মালমাত্র তোলা আর নামানোর জন্য যে সার্ভিস লিফট আছে, তাই দিয়েই আপনাকে নিয়ে যাব। যাবার আগে শুধু দু-একটা কাজ সারবার আছে।’

সেসব কাজ সেরে যখন দ্যু’ব্যারিকে নিয়ে যাবার জন্য ডাকলাম, তখন সে যেভাবে বিনা প্রতিবাদে সোফা থেকে উঠে এল, তাতে মনে হল, সব আশা-ভরসা হারিয়ে সে একটা নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে গেছে। সোফায় এলিয়ে পড়ে থেকে আমি যে এতক্ষণ কী করেছি, তাও সে লক্ষ করেনি।

দ্যু’ব্যারিকে যা বলেছিলাম, সেইমত পুলিশ-ঘাঁটিতে রেখে আসবার পর সামনের গেট দিয়েই হোটেলে ঢোকবার সময় বোরোত্রাকে প্রথম দেখলাম। তার নিজের চেহারা এমন যে, সামনে কোথাও পড়লে পাঁচশো জনের মধ্যেও লক্ষ না করে উপায় নেই, বিরাট বপু আর তার সেই জালার মতো বিশাল ভুঁড়িটির জন্য মানুষের চেয়ে তাকে হিপোপটেমাসেরই স্বজাতি বলে মনে হয়। এর ওপর আর-একটি কারণে তাকে সব সময়ে আলাদা করে চেনা যাবে। তাকে কোথাও কখনও একলা দেখা যায় না। একটি নিত্যসঙ্গী তার সঙ্গে সব সময় থাকে।

সেদিনও সেই সঙ্গীটিকে কাছে নিয়েই সে বসেছে। জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে দৈত্যের মতো চেহারায় নিজে যে চেয়ারটাতে বসেছে, তার পাশের চেয়ারটিতেই রেখেছে তার পুঁচকে সেই নিত্যসঙ্গীটিকে।

লবি দিয়ে লিফটের দিকে যাবার পথে এরকম মানুষটাকে দেখে দু সেকেন্ডের বেশি মনোযোগ হয়তো দিতাম না। কিন্তু হঠাৎ ক-টা কথা কানে গিয়ে ছুঁচের মতো বেঁধায় লিফটের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ওপরে এখনই যাব কিনা ভাবতে হল।

তখনও অবশ্য লোকটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পুঁচকে সঙ্গীর সঙ্গে তার কথাগুলো যে শুনেছি, তা আমি বুঝতে দিইনি। লিফটটা তখনও ভাগ্যক্রমে নামেনি। সেটার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মধ্যে আরও ক-টা কথা শুনে কান ঝাঁঝাঁ করার বদলে মজাই পেলাম।

জ্বলে ওঠার বদলে মজা পাওয়াটাই অবশ্য গোড়া থেকে উচিত ছিল। তবে তখন আচমকা ওই ধরনের কথাগুলো ওইভাবে আর ওই ভাষায় শুনে মেজাজটা একটু টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল ঠিকই।

লোকটার আর তার সঙ্গীর দিকে একবার নজর দিয়েই লিফটের দিকে যেতে যেতে একটা সরু পিনপিনে গলায় শুনেছিলাম 'এই শুঁটকো চামচিকেটাকেই খুঁজছিলি না?' তার উত্তরে ভারী গলার কথা শোনা গেছল, 'হুঁ।' 'তা হলে চুপ করে বসে আছিস কেন?' আবার সেই পিনপিনে ছুঁচলো গলায় শোনা গেল, 'ডাক না ছুঁচোটাকে! আর না যদি আসে, তবে দে মুরগির গলাটা মুচড়ে ছিঁড়ে।' কথাগুলোর পরেই সেই পিনপিনে ছুঁচলো গলার হিহি করে বিদঘুটে হাসি। আর সেই ভারী গলায় আদরের ধমক, 'আরে চুপ চুপ, লোকে বুঝতে পারবে।'

লবিতে ওদের কাছাকাছি যারা ছিল, তাদের অনেকেই তখন এই বাক্যালাপে হাসছে। তবে তার মানে বুঝে নয়। কারণ সে মানে বোঝা কারওর পক্ষে সম্ভব নয় এই জন্য যে, বাক্যালাপের ভাষাটা হল 'বাস্ক্', পৃথিবীর মধ্যে যা বিরলতম ভাষার একটি। লোকগুলো হাসছিল মিহি আর মোটা গলা দুটোর কথা বলাবলির ধরনে।

লিফটটা এতক্ষণে ওপর থেকে নামতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাকে আর তাতে উঠব কি উঠব না তা ঠিক করবার দ্বিধায় থাকতে হল না। লিফটের কাছে তখন আমিই একা দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে ভারী গলায় ফরাসিতে অত্যন্ত ভদ্র বিনীত অনুরোধ শুনলাম—'ও মশাই, লিফটের কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে বলছি। দয়া করে আমাদের এ টেবিলে একটু এসে আমাদের বাধিত করবেন? আমার শরীরটা বড় বেসামাল, নইলে আমিই এখনই উঠে যেতাম। কিছু মনে করবেন না।'

কথাগুলো যতক্ষণ বলা হচ্ছে, তার মধ্যে লিফটের দরজার কাছ থেকে প্রথম যেন অবাক হয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে কে আমায় ডাকছে দেখে আমি একটু যেন অবাক হয়ে ওই দুই মূর্তির টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

দৈত্যাকার মানুষটা তখন তার সঙ্গীটিকে বাঁ হাতের মুঠোয় তার চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলছে, 'আমায় মাপ করবেন। একটু বিশেষ কারণে আপনাকে এমন করে বিরক্ত করলাম। আমার নাম বোরোত্রা, হ্যাঁ বোরোত্রা, আর এর নাম হল—'

'আমার নাম পিঁপিঁ। পিঁপিঁ।' বোরোত্রার আগেই তার বাঁ হাতের মুঠোর পুঁচকে সঙ্গী যেন ছটফটিয়ে উঠে সরু খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠল, তারপর দাঁতে-দাঁত-চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে সেই বাস্ক্ ভাষাতে বললে, 'ছুঁচোটা যেন আমায় না ছোঁয়।'

যেন কিছুই বুঝতে পারিনি, এমনই মজা-পাওয়া মুখ করে আমি পিঁপিঁর একটা খুদে নরম হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম, সেনর পিঁপিঁ। আমার নাম হল দাস। শুধু দাস।'

পিঁপিঁ তখন কাছাকাছি সকলের হাসির মধ্যেই কঁকিয়ে উঠে চিৎকার করে আমায় গাল পাড়ছে ফরাসি ভাষাতেই। 'ছিঁড়ে গেছে নড়াটা আমার, ছিঁড়ে গেছে একেবারে! ওরে বাবা রে! মরে গেছি রে!'

সেই সঙ্গে বাস্‌ক্ ভাষায় ফোড়নও চালাচ্ছে মাঝে মাঝে। যেমন—'চিমসেটাকে, দে না নিংড়ে শেষ করে,' কিংবা—'ছারপোকাটাকে টিপে মার।'

বাস্‌ক্ তো নয়ই, ফরাসিও কেউ বুঝুক বা না-বুঝুক, কাছাকাছি যারা ছিল, তারা পিঁপির সেই সরু খ্যানখেনে গলার কাতরানি আর সেই সঙ্গে 'চুপ! চুপ' বলে বোরোত্রার ভারী গলার ধমকে দারুণ মজা পেয়ে হাসি আর থামাতে পারেনি।

তাদের হাসির কারণ হল পিঁপি। পিঁপি একটা তুলো-ভরে-সেলাই-করা পুঁচকে পুতুল। ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা মুখ না নেড়ে তাদের ছদ্ম-গলার কথা যেন অন্য জায়গা থেকে বার করবার জন্য এই পুতুল ব্যবহার করে। এ পুতুলকে দিয়ে মজা করে অনেক উলটোপালটা খোঁচানো কথা বলানো যায়।

বোরোত্রা সব সময়ে এই পুতুল তার সঙ্গে রাখে। এ পুতুলকে দিয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে বেয়াড়া কথা বলানো তার শুধু মজার খেলা নয়, এটা তার একটা রোগও। নিজের মনের কথাগুলো এইভাবে সে পেট থেকে বার না-করে দিয়ে পারে না। কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেই জন্যেই সে অবশ্য বাস্‌ক্-এর মতো এমন একটা ভাষা ব্যবহার করে, যা দুনিয়ার কেউ জানে না বললেই হয়।"

ঘনাদা থামলেন। তাঁর একটানা কাহিনী শোনার মধ্যে অবাক হয়ে আর একটা ব্যাপারও আমরা লক্ষ করেছি। এতক্ষণের মধ্যে ঘনাদা একবার একটা সিগারেটও খাননি। শিশির অবশ্য মেজাজ খারাপ থাকার দরুন ইচ্ছে করেই নিজে থেকে তাঁকে সিগারেট এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঘনাদার তো ভালমানুষের মতো তা মেনে নিয়ে চুপ করে থাকার কথা নয়।

এখন এতক্ষণের অন্যায়টা শোধরাবার জন্য শিশির যখন পকেটে হাত দিতে যাচ্ছে, ঘনাদা তখন নিজের পকেট থেকেই সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করে আমাদের চমকে দিলেন।

সে আবার যেমন-তেমন সিগারেট নয়। প্যাকেটের এক কোণ ছিঁড়ে তা থেকে একটা সিগারেট অবহেলাভরে বার করার সময় খানদানি গন্ধটাই শুধু নাকে গেল না, প্যাকেটের ওপর ছাপা ব্র্যান্ডের নামটা পড়েও চোখ কপালে ওঠবার জোগাড়।

বিদেশি একেবারে পয়লা নম্বরের একটা সিগারেট। ঘনাদা এয়ারপোর্ট হোটেলেই কিনেছেন নিশ্চয়।

এখন সেটা ধরাবার জন্য শিশিরের দেশলাইকাঠি জ্বালবারও অপেক্ষা করলেন না। নিজেই আর এক পকেট থেকে এক বিদেশি দেশলাইয়ের খাপ বার করে তার কাঠি খুলে জ্বেলে সিগারেট ধরালেন।

৫

ঘনাদার মৌজ করে সেই সিগারেট খাওয়ার মধ্যেই গৌর তার হাতঘড়িটা আমাদের দেখাতে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। বেলা তো প্রায় দেড়টা হয়ে গেছে। আমাদের তো বটেই, ঘনাদা নিজেরও নাওয়া

খাওয়ার কথা ভুলে গেছেন নাকি? গল্প যা ফেঁদেছেন, তা এত বেশি সবিস্তারে বলার মধ্যে অতিমাত্রায় বেলা বাড়িয়ে দিয়ে আসল কথাটা গোলেমালে হারিয়ে ফেলে দেওয়ার মতলব নেই তো?

সিগারেটে ঘনাদার দু-চারটে রামটানের পর তাই একটু কড়া গলাতেই বলতে হল, "এ সব বৃত্তান্ত তো অনেক শোনালেন! সারাদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে এ বৃত্তান্ত শুনে আমাদের মোক্ষলাভ হবে না, পল্টুবাবুর গাড়ির আট-ন গ্যালন তেল ফুঁকে দিয়ে আসার ঠিক মতো জবাবদিহি পাব?"

"কেন? কেন?" আমাদের সকলের চোখ কপালে তুলিয়ে পল্টুবাবুই ঘনাদার হয়ে জোরালো ওকালতি করলেন, "ওঁকে অমন যা-তা বলছ কেন? উনি যা বলছেন, আমার আট-ন গ্যালন তেলটা তার চেয়ে দামি হল তোমাদের কাছে? না, না, আপনি বলুন, বলে যান। একদিন অমন নাওয়া খাওয়া বন্ধ হলে যার নাড়ি ছেড়ে যায়, সে চলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়াই করুক। বলে যান আপনি।"

হায় কপাল! যার জন্য লড়তে নামি, সে-ই বন্দুকের নল দেয় ঘুরিয়ে!

আমাদের উড়ন্ত নিশান একেবারে ভিজে ন্যাকড়ার মতোই নেতিয়ে পড়ে।

ঘনাদা তার ওপর কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে দিয়ে বললেন, "না, না, খিদেতেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে বইকী! সকলের সহ্যশক্তি তো আর সমান নয়। তা ছাড়া বেলাও বড় কম হয়নি। তবে আমারও বলার খুব বেশি কিছু আর নেই।

বোরোত্রার নিজের সঙ্গে সারাক্ষণ পুতুলের ছল করে কথা বলবার ওই বদভ্যাসটা যে একটা রোগ, সেদিন হংকং-এর চিনা হোটেলের লবিতেই সেরকম সন্দেহ হয়েছিল। আমার সন্দেহটা ঠিক না হলে তার সঙ্গে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা আর অবশ্য হত না। আর তা না হলে ই-ইউ-ডব্লিউ-সি নামটা দুনিয়া থেকে মুছে গিয়ে এস-এস-পি-এস-এর সাম্রাজ্যই নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করে নিত।

সেদিন চিনা হোটেলের লবিতে পরিচয়-টরিচয় করার পর বোরোত্রা যে রকম খাতির করে আমায় তার সামনের চেয়ারে বসিয়েছিল, আর তার সঙ্গী পুচকে পিঁপির বেয়াদবি মাপ করতে বলে যেভাবে একটা দুঃখের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিল, তাতে নেহাত বাস্‌ক্ ভাষাটা জানা না-থাকলে তার সম্বন্ধে একটু দ্বিধায় হয়তো আমি পড়তে পারতাম। পেটের দায়ে এস-এস-পি-এস-এর চর হলেও ভবঘুরে বাজিকর হিসেবে লোকটা খুব খারাপ নয়, এমন ধারণা আমার হতে পারত। আর দ্যু'বারি সম্বন্ধে সে যা আমায় শুনিয়েছিল, তার কতকটা সত্য বলে বিশ্বাসও হয়তো আমার হত।

দ্যু'ব্যারি সম্বন্ধে গল্পটা সে বেশ কায়দা করেই সাজিয়েছিল। নিজেকে ধোয়া তুলসিপাতার মতো সাধু বা দ্যু'ব্যারিকে মিটমিটে বিচ্ছু শয়তানগোছের কিছু হিসেবে সে মোটেই সাজায়নি।

তার বদলে দ্যু'ব্যারি যে তার দেশেরই ছেলে আর ছেলেবেলার বন্ধু এ কথা জানিয়ে, আজ নিয়তির ঘুঁটি নাড়ায় দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত দলে ভিড়লেও কেন সে পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে দ্যু'ব্যারির একটা চরম উপকার করতে চাইছে, সে কথা আমায় বলেছে। যা বলেছে তা খুব অবিশ্বাস্য ব্যাপারও নয়। দ্যু'ব্যারি যখন জীবন

মরণ তুচ্ছ করে কোনও এক অজানা আস্তানায় তার কী আশ্চর্য সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন যে কয়জনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উপর বিশ্বাস রেখে সে তার দল গড়ে তুলেছে, তাদের কেউ কেউ নাকি শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার ফন্দি এঁটেছে। আগেকার দিন আর বন্ধুত্বের খাতিরে সময় থাকতে সাবধান হবার জন্য দ্যু'ব্যারিকে এই খবরটা শুধু বোরোত্রা দিতে চায়। দ্যু'ব্যারির পেছনে তাই সে এমন করে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দ্যু'ব্যারি তাকে এখন এত অবিশ্বাস করে যে তাকে ক-মিনিটের জন্য কাছে আসবার সেই সুযোগটুকুও দিচ্ছে না। এ পর্যন্ত বারবার একেবারে মুখোমুখি হওয়ার অবস্থায় যেমন করে হোক এড়িয়ে পালিয়েছে।

বোরোত্রার এ গল্প বেশ যেন মন দিয়ে শুনেছিলাম। তবে এ গল্প বলার মধ্যে পিঁপি একবারও বাধা দেয়নি, এটাও লক্ষ করেছি। গল্প শেষ হলে একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কিন্তু এসব কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন?'

পিঁপি কী যেন একটা বলতে মিহি সুর তুলতে যাচ্ছিল। ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে বোরোত্রা সবিনয়ে বলেছে, 'মাপ করবেন সেনর দাস। আপনার চেহারাটা যে কোনও জায়গায়, বিশেষ করে এখানকার মানুষজনের মধ্যে, একটু চোখে পড়বার মতো তো। তাই আমাদের জানাশোনাদের কেউ কেউ আপনাকে লক্ষ করার সময়ে দ্যু'ব্যারির মতো কাউকে যেন আপনার ট্যাক্সিতে লুকিয়ে উঠতে দেখেছে। এই খবরটা তাদের কারও কারও কাছে পাবার পরই যাচাই করতে আপনার এখানে এসেছি।'

বেশ একটু কৃতার্থভাবে হেসে এবার বলেছি, 'এবার তা হলে আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।'

'ভাগ্যবান?' বোরোত্রা সত্যি সত্যিই কথাটার মানে বুঝতে না পেরে সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়েছে।

'ভাগ্যবান মানে বুঝতে পারছেন না?' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে লিফটটার দিকে আঙুল দেখিয়েছি। তারপর সেদিকে যেতে যেতে বলেছি, 'আপনার ছেলেবেলার বন্ধু দ্যু'ব্যারির সঙ্গে এতদিন বাদে আজ আপনার দেখা এখুনি হবে বলে আপনাকে ভাগ্যবান বলছি।'

লিফটটা ভাগ্যক্রমে নিজেই তখন খালি অবস্থায় নেমেছে। বোরোত্রা আর তার পুঁচকে সঙ্গীকে নিয়ে সেই লিফটে ওপরে উঠতে উঠতে আরও আশ্বাস দিয়ে বলেছি, 'আপনার বন্ধু দ্যু'ব্যারি সত্যিই আমার ট্যাক্সিতে এখানে এসে কাকুতি মিনতি করে আমার কামরায় আশ্রয় চেয়েছে। আশ্রয় দিলেও তার ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হওয়ায়—এই আসছি—বলে কামরার দরজায় তালা দিয়ে তাকে আটকে রেখে এসেছি।'

আমার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নিজস্ব চাবি লাগিয়ে দরজাটা খোলার সময় বোরোত্রার চেহারাটা ফোটো তুলে রাখবার মতো। উত্তেজনায় সে যেন তখন ফেটে পড়ছে। তার বাঁ বগলে রাখা পিঁপি তো কান-ফুটো-করা হুইসলের স্বরে চেঁচিয়েছে, 'খোল শিগগির, খোল।'

দরজা খুলতে-না-খুলতে হুড়মুড় করে ঢুকেছে বোরোত্রা। পিঁপির জবানিতে আমার এতক্ষণের সব অপমানের শোধও তখন আমি নিতে পেরেছি।

বোরোত্রা সমস্ত কামরাটা তো বটেই, বাথরুম এমনকী ওয়ার্ডরোব পর্যন্ত খুলে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেশ গরম গলায় বলেছে, 'কই, গেল কোথায় দ্য'ব্যারি?'

আমিও একেবারে তাজ্জব বনে যাওয়ার ভান করে বলেছি, 'তাই তো! এই বন্ধ কামরা থেকে সে যাবে কোথায়?'

তারপরই যেন হঠাৎ কী মনে হওয়ায় পেছনের একটা জানলার দিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছি, 'এই তো, এই তো দ্য'ব্যারির পালাবার প্যাঁচ!'

বোরোত্রাও তখন হাঁফাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্যাঁচটা দেখে তার মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠেছে। হবারই কথা। কারণ সেখানে একটা খড়খড়িতে বেঁধে দুটো পাকানো চাদর পরপর গিঁট দিয়ে যেভাবে ঝোলানো, তাতে তা বেয়ে নামবার চেষ্টা করলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। পাঁচতলা থেকে দুটো চাদর চারতলা ছাড়িয়ে সামান্য একটু পৌঁছেছে মাত্র। সেখানে ওদিকের খাড়া দেওয়ালে একটা জানলার কার্নিশও নেই একটু পায়ের ভর দেওয়ার। একমাত্র গতি সুতরাং সেখান থেকে হাত পা ছেড়ে নীচে লাফ। প্রমাণ-প্রায় চারতলা সমান উঁচু থেকে সে লাফ কেউ দিলে তার হাড়গোড়ের টুকরোগুলোও সব খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

জানলার খড়খড়িতে বাঁধা চাদর দুটো যে নেহাত ছেলেভুলানো মিথ্যে চালাকি, তা একবার নজর দিলেই বোঝা যায়।

বোরোত্রার মুখ যত থমথমে হয়ে উঠেছে, পিঁপির গলা তত হয়েছে কান-ফুটো-করা। অসহ্য ছুঁচলো গলায় বাস্ক্-এ সে চেঁচিয়েছে, 'সব মিথ্যে কথা! তোর সঙ্গে মশকরা করছে কালা নেংটিটা। জিভটা ওর টেনে ছিঁড়ে ফেল! না হয় চটকে দলা পাকিয়ে ফেলে দে এই পাঁচতলা থেকে। দে, ফেলে দে! দেখছিস কী?'

বোরোত্রা গম্ভীর মুখে যেন মেঘলা আকাশের গায়ে বাজগড়ানো আওয়াজে বলেছে, 'সবুর, সবুর। দু-দিন ওর দৌড়টা একটু দেখেই টুঁটি চেপে ধরব।'

কিছুই যেন না-বুঝে বোকা-বোকা মুখে আমি বোরোত্রাকে সহানুভূতি জানিয়েছি, 'সত্যি এমন করে জ্বালাবে, ভাবতেও পারিনি।'

পিঁপি চিড়বিড়িয়ে উঠেছে, 'থোঁতা মুখটা ভোঁতা করে দে না।'

বোরোত্রা যেন মেঘ-ডাকা আওয়াজে বলেছে, 'দেব, দেব। দুটো দিন শুধু নজরে রাখি।'

নজরে রাখতে সে পারেনি। তার নিজের আর তার সঙ্গী চর-অনুচরদের চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে আমি হংকং থেকে চিনেদের মাছধরা নৌকোয় সরে পড়েছি, জানতেও পারেনি তারা। জানবেই বা কী করে? তাদের পাহারায় গাফিলি কিছু ছিল না। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার কোনও ট্রলারে মাছের জন্য পাঠানো সব বরফের বাক্সের কোনওটায় যে মানুষ থাকতে পারে, তা তাদের মাথায় আসেনি।

নিজে সরে পড়বার আগে এক বেলার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা সেখানকার

পুলিশ-ফাঁড়িতে-জমা-করে-রাখা দ্যুব্যারিকেও সেখান থেকে ছাড়িয়ে ওই জেলে-নৌকোতেই পালাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে সব বোঝাপড়াও করে নিয়েছি। বোঝাপড়া শুধু এই যে, তখন থেকে আমিও তাদের ই-ইউ-ডব্লিউ-সি-র একজন অংশীদার হয়েছি। দ্যুব্যারি তার রেডিয়ো-টেলিস্কোপের গোপন ঘাঁটিতে নির্বিঘ্নে যাতে তার বাকি কাজটুকু সারতে পারে, বাইরের দুনিয়ায় তারই একজন প্রধান পাহারাদার হওয়া আমার কাজ। দ্যুব্যারিকে হংকং থেকে পাচার করবার সময় আর-একটা পরামর্শও তাকে দিয়েছি। ছোট বড় দরকার-টরকার যা মাঝে মাঝে হয়, তার জন্য লন্ডন নিউইয়র্ক প্যারিস তো নয়ই, হংকং-এর মতো দুনিয়াদারির শহরে সে যেন না আসে। আর কাজ শেষ হবার আগে আমার সঙ্গেও কোনও যোগাযোগের চেষ্টা না করে।

তা সে করেনি। কিন্তু আমার পরামর্শ মতোই নিশ্চয়ই অন্য বড় শহর-টহরের বদলে কলকাতায় সওদা করতে এসেই প্রায় সর্বনাশ বাধাতে বসেছিল।

এস-এস-পি-এস তো কম পাত্তর নয়। তারাও চুপ করে বসে থাকেনি। ওত পেতে থেকে থেকে ওদের ওই বোরোত্রা কেমন করে দ্যুব্যারির কলকাতা আসার খবরটা ঠিক পেয়ে গেছে। দ্যুব্যারির পেছনে ও যে কলকাতাতে এসেছে, তা আমি আর কেমন করে জানব।

কিন্তু বোরোত্রার ওই ভেনট্রিলোকুইজমের কায়দায় নিজের সঙ্গে হরদম কথা বলার রোগই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তার এ রোগ না-থাকলে আর পল্টুবাবুর গাড়িটা ঠিক ওই সময়েই না পেলে পৃথিবীর এনার্জির সমস্যা মিটতে কত যুগ লাগত কে জানে!"

৬

ঘনাদা একটু থামতেই পল্টুবাবু প্রথম গদগদ হলেন। "তা হলে ভাগ্যিস আমি গাড়িটা নিয়ে আজ অমন সময়ে এসে পড়েছিলাম!"

আমাদের ক-জনের গলায় খুকখুকে কাশিটা তখন প্রায় ছোঁয়াচে হয়ে উঠেছে। ঘনাদা সেটা অগ্রাহ্য করেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই। ওই গাড়িটা না থাকলে বোরোত্রার হদিস কখনও পেতাম! রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছি, বোরোত্রা তখন তার বন্ধ গাড়ির ভেতরে মনের সুখে পিঁপির সঙ্গে বাস্ক্-এ আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই আলাপ শোনবার পর আর তার পেছন ছাড়ি! তার দামি বিদেশি গাড়ির সঙ্গে লেগে থাকতে অবশ্য আমাদের জিভ বেরিয়ে গেছে।

তবু শহর ছাড়িয়ে দমদমের রাস্তায় শেষ পর্যন্ত তার গাড়িটাকে এয়ারপোর্ট হোটেলের দিকে যেতে দেখেই তার পিছু ছেড়ে সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে, ইস্টার্ন ফ্লাইটস-এর ওয়েটিং হল্-এ গিয়ে হাজির হয়েছি। অনুমানে আমার ভুল হয়নি, ভাগ্যটাও ভাল, দ্যুব্যারি তার সেই মার্কামারা আখখুটে হাঘরে চেহারা পোশাকে একটু আগে আগেই এসে তার মাল ওজন করাতে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে দেখে সে তো যেমন অবাক তেমনই আহ্লাদে আটখানা। গলগল করে কী যে জিজ্ঞাসা করবে, আর কোন কথা যে আগে বলবে, তাই ঠিক করতে পারছে না।

গম্ভীর মুখে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, 'ওজন করাতে হবে না, মাল নিয়ে শিগগির ওদিকে চলো।'

এ কথায় একেবারে হতভম্ব হলেও দ্যু'ব্যারি প্রতিবাদ কিছু করেনি। তাকে নিয়ে তারপর একদিকের নির্জন একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছি, 'এ ফ্লাইটে যাওয়া তোমার হবে না। তোমায় অন্য প্লেনে কোথাও যেতে হবে।'

'কোথায়?' দ্যু'ব্যারি এই প্রশ্নটুকু শুধু করে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছে।

'কোথায় তা জানি না।' তাকে আরও বিমূঢ় করে বলেছি, 'এখন অন্য যে কোনও ফ্লাইটে একটা-না-একটা সিট খালি পাওয়া যাবে, তাতেই।'

আর-কোনও প্রতিবাদ বা প্রশ্ন না করে দ্যু'ব্যারি এবার বলেছে, 'এখনও সময় আছে, আমার যাওয়াটা তা হলে বাতিল করিয়ে আসি।'

'বাতিল করিয়ে আসবে!' একটু থেমে ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'সঙ্গে তোমার পুঁজির অবস্থা কী রকম? এ টিকিট ক্যানসেল না করলেও প্রথমে কাছাকাছি কোথাও, আর তারপর সেখান থেকে আবার ফিরে তোমার নিজের জায়গায় যাবার নতুন টিকিট করার মতো খরচে কুলোবে?'

একটু ভেবে নিয়ে দ্যু'ব্যারি বলেছে, 'ক-টা জিনিস এখানে কিনতে পারিনি। তাই সঙ্গে যা আছে তাতে একরকম কুলিয়ে যাবে।'

'তা হলে টিকিট ক্যানসেল করতে হবে না।' তাকে বুঝিয়ে বলেছি, 'তুমি যেন এই ফ্লাইটেই যাচ্ছ, এইটেই সবাই জানুক। না-এসে-পৌঁছনো প্যাসেঞ্জার হিসেবে তোমার নাম শেষ পর্যন্ত মাইকে ডেকে যাবে। তাই যাক। শেষ মুহূর্তেও তুমি এসে পড়তে পারো, এইরকম একটা ধারণা ভাঙবার কোনও কারণ যেন না থাকে।'

দ্যু'ব্যারির মালপত্র নিয়ে তাকে ঘরোয়া বিমান-যাত্রীদের ঘাঁটিতে রওনা করিয়ে দেবার সময়ে সে হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বললে, 'তুমি যা করছ তা অনেক ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝেই করছ, এ বিশ্বাস আছে বলে কোনও প্রশ্ন তোমাকে করব না। একটা কথা শুধু তোমায় বলে যাই, দাস। তোমার সঙ্গে দেখা আমার শিগগিরই আবার হবে । আর তা লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, দুনিয়ার সকলকে সগৌরবে জানিয়ে। কারণ আমার সাধনা আমি প্রায় ষোলো আনাই সফল করে এনেছি।'

এরপর পকেট থেকে একটা নোটবইয়ের মতো খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে আবার বললে, 'এই খাতাটা সেইজন্যেই তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। এতে সব পাতায় আমার সই আছে। তা থাক বা না থাক, শুধু তোমার সই থাকলেই এ খাতার পাতা কিংবা যে কোনও সাদা কাগজ এখন থেকে লক্ষ টাকার চেয়েও দামি। কারণ সবচেয়ে যা দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান, সেই এনার্জি তুমি যাকে যত খুশি দেবার হ্যান্ডনোট লিখে দিতে পারো। পৃথিবীর সব এনার্জির চাহিদা চিরকালের মতো মেটাবার মতো মহাশূন্যের কালো ফুটো আমি পেয়েছি।'

কথাগুলো বলে নিজের আবেগেই দ্যু'ব্যারি আর আমার দিকে না-ফিরে হন হন

করে তার মালের ঠেলার সঙ্গে এগিয়ে চলে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে আমি আবার আগের ওয়েটিং হল্‌-এই ফিরে এলাম। আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। বোরোত্রাও এয়ারপোর্ট হোটেলে বেশ ভালরকম সেঁটেই নিশ্চয় সবে তখন তার মালপত্র ওজন করাচ্ছে।

সঙ্গে তার পিপি আছে ঠিকই। ওজন করাতে করাতেও তাদের আলাপের বিরাম নেই।

ভাষাটা তাদের অবোধ্য হলেও কাছাকাছি সবাই পুতুল-পিপি আর বোরোত্রার আলাপের ধরনে হেসে কুটোপাটি হচ্ছে তখন। বিশুদ্ধ বাস্‌ক্‌-এ সেই আলাপের মর্ম বুঝলে তাদের মুখে কী ধরনের হাসি ফুটত তাই ভাবলাম।

ওজন করাতে করাতে বোরোত্রার বাঁ বগলের পিঁপি তখন বলেছে, 'খুব যে খুশি, না? প্লেনে গিয়ে ওঠার আর তর সইছে না!' বোরোত্রা যেন তাকে ধমক দিয়ে বলেছে, 'চুপ কর। তর সইছে না-সইছে, তাতে তোর কী?'

'আমার কী!' খ্যানখেনে হাসির সঙ্গে বলেছে, পিঁপি 'আরে আমারই তো সব। আমি ছাড়া তুই তো ঠুঁটো!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বোরোত্রা যেন পিঁপিঁকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছে, 'সত্যিই তো, সব তো তোরই কেরামতি। আমি তো এর পরের ঘাঁটিতেই নেমে যাব। তারপর তো তোরই খেল।'

'আমায় ফেলে তুই নেমে যাবি!' পিঁপি একটু কাঁদুনে সুর ধরেই আবার তা ভুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কোথায় রেখে যাবি আমায়?'

'সে যেখানেই রেখে যাই না,' বলে একটু গরম হতে গিয়েই বোরোত্রা যেন ভয়ে ভয়ে নরম হয়ে বলেছে, 'রাখব, রাখব, ভাল জায়গাতেই রাখব। তুই তো ওই একরত্তি পুঁচকে একটা পুঁটলি, ওপরের তাকের লাইফবেল্টের ভেতরেই গোঁজা থাকলে কে খেয়াল করবে।'

'কেউ না! কেউ না!' পিঁপি যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে বলেছে, 'ওইখান থেকেই এমন খেল শুরু করব, একেবারে ফটকাবাজি। ফট্‌ ফট্‌—'

'থাম থাম, আহাম্মক কোথাকার।' বোরোত্রা তাকে আবার ধমক দিয়েছে, 'আর ফটকাবাজি দেখাতে হবে না। এদিকে দেরি হয়ে গেছে। পাখি ডালে গিয়ে বসেছে কিনা দেখা হয়নি।'

'বসেছে! বসেছে!' পিঁপি প্রায় যেন নাচতে-নাচতে বলেছে, 'আমরা আসবার আগেই গিয়ে বসেছে নিশ্চয়! চল! চল!'

ওজন-টোজনের ঝামেলা চুকিয়ে এক হাতে ঝোলানো একটা ব্যাগ আর-এক হাতে পিঁপিঁকে নিয়ে কাউন্টারের সকলের হাসির মধ্যে বোরোত্রা এবার তার প্লেনে গিয়ে ওঠবার পথে রওনা হয়েছে। কিন্তু দু-পা গিয়েই তাকে থামতে হয়েছে চমকে হতভম্ব হয়ে।

অন্য সবাই যখন এটাও তার ভেনট্রিলোকুইজমের একটা প্যাঁচ মনে করে হেসে খুন, তখন বোরোত্রা নিজে বেশ দিশাহারা।

'তা দিশাহারা হওয়া আশ্চর্য কী? কাউন্টার ছেড়ে দু-পা না যেতে যেতেই তার পিঁপিঁই যেন ছুঁচলো গলায় তাকে সাবধান করে দিয়ে স্প্যানিশে বলেছে, 'আপনি কী হারাইতেছেন, আপনি জানেন না।'

বলে কী পিঁপি! আর বলছে কেমন করে? বেশ হতভম্ব হয়েও বোরোত্রা আবার তার ব্যাগ তুলে রওনা হওয়া মাত্র আবার পিঁপি যেন ফরাসি ভাষায় সেই একই কথা তাকে শুনিয়েছে।

বোরোত্রার সত্যিই তখন বেসামাল অবস্থা। মাথাটাই তার হঠাৎ বিগড়ে-টিগড়ে গেছে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে।

মাথাতেই কিছু গণ্ডগোল না হলে এমন অদ্ভুত কাণ্ড হয় কী করে। তাও একবার আধবার কী! স্প্যানিশ আর ফরাসির পর জোর করে ব্যাগ তুলে নিয়ে পা বাড়াবামাত্র পিঁপি খাস বাস্ক্-এই সেই একই কথা তাকে শুনিয়েছে, 'আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না।'

বোরোত্রার কাণ্ড দেখে তখন মনে হয়েছে, সে যেন পাগলের অভিনয় করছে। আশপাশের লোকে যত এটা তার মজার খেলা মনে করে হেসেছে, সে তত চিড়বিড়িয়ে উঠে, আর-কিছু না পেরে, এক দফা চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে পিঁপিঁকেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে সেখানকার মেঝের ওপর।

ছুড়ে ফেলে দিয়েই যেন তার হুঁশ হয়েছে। তারপর যে রকম অস্থির হয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে পুতুলটা তুলে নিয়েছে, তা দেখবার মতো। সেইটুকু দেখেই হিসেবের ভুল কিছু যে আমার হয়নি তা বুঝে বোরোত্রার প্লেন ছাড়া পর্যন্ত বেয়াড়া কিছু ঘটে কিনা, তা একটু দেখে যাবার জন্য এয়ারপোর্ট হোটেলেই গিয়ে একটু বসেছি।

এয়ারপোর্ট হোটেলের একটা নিরিবিলি টেবিলে একলাই বসে বসে প্লেনের ভেতর বোরোত্রার অবস্থাটা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি।

কী অস্বস্তি নিয়েই সে যে তার সিটে বসে আছে, তা তার মুখের চেহারাতেও এখন আর লুকোনো নেই নিশ্চয়ই। সিটটা এখন যেন তার কাছে কন্টকাসন।

কোনওরকমে নিজের সিটটায় বসে আছে বটে, কিন্তু নজর তার প্লেনের ভেতরে ঢোকবার দরজাটার দিকে যেন আঠা দিয়ে আটকানো। নীচের ঢাকা-দেওয়া সিঁড়িটা সেইখানেই লাগানো। সেই সিঁড়িই বেয়েই এক-এক করে যাত্রীরা উঠে আসছে ভেতরে।

কিন্তু যাত্রীরাও তো যা আসবার প্রায় সবাই এসে গিয়েছে। এখন যা আসছে তা তো বেশ একটু ফাঁক দিয়ে দিয়ে দু-একজন মাত্র। তার মধ্যে দ্যু'ব্যারি কই? হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে অস্থির হয়ে উঠছে এবার বোরোত্রা, আর সময়ই তো নেই।

মাত্র এক মিনিট, পঞ্চাশ সেকেন্ড, পঁয়তাল্লিশ।

প্লেনের দরজা ওরা বন্ধ করতে যাচ্ছে যে।

নীচে দরজার গায়ে লাগানো সিঁড়িটা সরিয়ে ফেলেছে নাকি।

বোরোত্রার মনের মধ্যে কী হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি তখন।

একটু দেরি হলেও দ্যু'ব্যারি শেষ মুহূর্তে ঠিক এসে পড়বে এই ছিল তার বিশ্বাস।

সত্যি না এসে দ্যু'ব্যারি যাবে কোথায়?

কিন্তু এখন কী করবে বোরোত্রা?

নেমে যাবে প্লেন থেকে?

সিট থেকে উঠে পড়তে গিয়ে তার পিঁপিঁর কাছেই সে পরামর্শ চাইছে নিশ্চয়।

কী পরামর্শ দেয় পিঁপি?'

পিঁপি এখন চিঁচিঁ হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। চিঁচিঁ করেই জানায়, 'কোথায় যাবি? এখন কি আর নামতে দেবে?'

'দেবে দেবে, কেন দেবে না!' ধমক দিয়ে আবার উঠতে চেষ্টা করে বোরোত্রা।

পিঁপিঁর চিঁচিঁ আবার শোনা যায় নিশ্চয়, 'নামতে পারলেও যাবি কোথায়? কোথায় এখন পাবি সে-হতভাগাকে? তার চেয়ে চেপে বসে থেকে এরপর কী করবি ভেবেই নে না।'

বোরোত্রা আবার বসে পড়েছে দোনামোনা মুখে।

পিঁপির সঙ্গে কথাগুলো বাস্‌ক্-এই হয়েছে সন্দেহ নেই।

আশপাশের লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ভেন্ট্রিলোকুইজমের মজা পেয়েই তখন হাসছে।

সে হাসিতে গা জ্বলে গেলেও বোরোত্রাকে বোকা-বোকা ভালমানুষের মুখ করে থাকতে হচ্ছে জাদুকরের ভোল নিয়ে।

মনের ভেতর এখন তার ভাবনার তুফান চলছে।

সে যা ভাবছে আমি সব টের পাচ্ছি।

ভাবছে, দ্যু'বারি তো শেষ মুহূর্তেও প্লেনে এসে উঠতে পারল না। কেন পারল না?

ইচ্ছে করে দ্যু'ব্যারি যে এ প্লেনটায় ওঠেনি, তা অবশ্য বোরোত্রার মাথাতেই আসছে না।

দ্যু'ব্যারি নিশ্চয়ই কোনও কিছুতে আটকে গেছে এই সন্দেহই বোরোত্রার হচ্ছে।

কিন্তু কীসে আটকাতে পারে?

কোনওরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা? হঠাৎ অসুখ-বিসুখ?

তেমন কোনও দারুণ দুর্ঘটনা কি হঠাৎ অসুখে একেবারে টেঁসে গেলে তার কাজ তো হাসিল হয়ে যায়।

কিন্তু অত ভাগ্য কি তার হবে? তা ছাড়া অমন দৈব দুর্ঘটনায় কিছু হলে তার বাহাদুরির দাম সে কি পাবে?

না, ওরকম কিছু হয়ে কাজ নেই। আর যাই হোক, পরের ঘাঁটিতে নেমে তাকে ভাল করে খোঁজ নিতে হবে। দরকার হলে আবার ফিরেও যেতে হবে কলকাতায়।

কিন্তু এদিকে পিঁপির বুকের ভেতর প্রায় নিঃশব্দ ধুকধুকুনি যে সমানে চলেছে।

ওই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে জুড়ে যে শয়তানির প্যাঁচটি আছে, তা নির্ভুল ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ডের হিসেব ধরে ঠিক সময়টিতে প্রলয়কাণ্ড বাধাবে।

সেই ব্যবস্থা করেই পিঁপির ভেতর টাইম-বোমাটি লুকিয়ে দ্যু'ব্যারির প্লেনেই

বোরোত্রা টিকিট কেটে উঠেছে।

সে মাঝপথে নেমে যাবার সময় টাইম-বোমা-লুকোনো পুতুলটা ওপরের তাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাবে। আর সেটা প্লেন আবার ছাড়বার পর সমস্ত প্লেনটাকেই চৌচির করে ফাটাবে। এমন পাকা প্ল্যান যে কোনওভাবে ভেস্তে যেতে পারে, তা সে ভাবতেই পারেনি।

এখন এই পিঁপিঁ পুতুলটার সর্বনাশা শয়তানি প্যাঁচটা কাটিয়ে ভণ্ডুল না করে দিলেই নয়।

বোরোত্রা কেমন করে বিপর্যয় ঘটাবে, তাও আমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।

একটু বাদেই পিঁপিঁকে নিয়ে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে। তারপর সেখানে গিয়ে পিঁপির ছালচামড়া ছাড়িয়ে তার ভেতরের ঘড়িটা দেবে বন্ধ করে।

পিঁপিঁকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে তাকে না-নিয়েই আবার ফিরে এলে তার যে সব সহযাত্রী এতক্ষণ তার ভেনট্রিলোকুইজমে মজা পেয়েছে তারা একটু অবাক হয়ে পিঁপির খোঁজ হয়তো নিতে পারে।

তখন কী জবাব বোরোত্রা দেবে, সেটা তার দায়। আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী!

বোরোত্রার প্লেনটা ছেড়ে যাবার বেশ খানিকটা পরে তাই আমি ফিরে আসবার জন্য উঠেছি।

তা এয়ারপোর্ট হোটেলে তো আর এমনি এমনি বসে থাকা যায় না। তাই একটু খাবার দাবার অর্ডার দিতে হয়েছিল। তা এত দিল যে, ওখানে শেষ করা যাবে না বলে কিছু প্যাক করিয়ে সঙ্গেও আনতে হয়েছে। সে বাক্সটা—"

ঘনাদার মুখের কথা পড়তে-না-পড়তে পল্টুবাবু প্রায় জোড়হস্ত হয়ে বললেন, "সে খাবারের প্যাকেট আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি এই এদের বনোয়ারিকে দিয়ে।"

"ও, দিয়েছ!" ঘনাদা একটু প্রসন্ন হাসি দিয়ে পল্টুবাবুকে ধন্য করে কেদারা থেকে উঠে পড়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা যেন মনে পড়ায় থেমে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আর-একটা মুশকিল হয়েছে। সঙ্গে তেমন কিছু নিয়ে তো বেরোইনি। ওই হোটেলে যাবার সময় ড্রাইভারের কাছে গোটা চল্লিশই যেন ধার করতে হয়েছিল। সেটা—"

"সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।" পল্টুবাবু কৃতার্থ গলায় বললেন, "ও সব কিছুর যা করবার আমি করব। আপনি এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে একটু।"

"হ্যাঁ, তাই করি।" বলে টঙের ঘরে যেতে যেতে ঘনাদা আমাদের জন্য একটু সহানুভূতি খরচ করে গেলেন, "তোমাদের বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ।"

আমাদের মুখগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখলে ঘনাদা আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিমাণটা বুঝতে পারতেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়া পর্যন্ত কেন যে ঘনাদা আজ অমন অকাতরে আমাদের সঙ্গে খিদেতেষ্টা অগ্রাহ্য করেছেন, তা বুঝে আমরা আরও অভিভূত।

ঘনাদাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নতুন ভক্ত পল্টুবাবুর ফিরে আসার পর তাঁকেই একটু নিশানা না বানিয়ে তাই পারলাম না।

বললাম, "বেরাল তো মিলেছে, কিন্তু তার গলায় ঘণ্টাটা বাঁধা হবে কী করে?"

"বেরাল!" পল্টুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ঘনাদা বেরালের কথা তো কিছু বলেননি!"

সোজা করেই তাই বলতে হল, "আকাশের ছেঁদা, ওই সর্বার্থসাধিকা কালো ফুটো, ও তো শুনলাম দেড় দুই আলোকবর্ষ দূরে। তা ফুটোর গলায় উপগ্রহের বিদ্যুৎ-বানানো যন্ত্র বসানো হাঁসুলি পরানো হবে কী করে?"

প্রায় ঘনাদার মতোই নাসিকাধ্বনি করে নিজের পকেটের ঘনাদার-দেওয়া এনার্জির দানপত্র একটু নেড়ে নিয়ে পল্টুবাবু বললেন, "ওসব তোমাদের বোঝবার নয়।"

পল্টুবাবুর অন্ধ ভক্তির ছোঁয়াচ লেগেও আর একটা রহস্য হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঘনাদার অনেক রকম বেয়াড়া আবদার অত্যাচারই আমরা অম্লানবদনে সহ্য করে থাকি। কিন্তু আজকের এই অন্যের আনা গাড়ি নিয়ে এমন বেপরোয়া উধাও হয়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষেও যেন বেশ একটু বাড়াবাড়ি। এটা যেন তাঁর গুল-সম্রাট চরিত্রের সঙ্গেও খাপ খায় না।

হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক চরিত্রস্খলনের কারণ কী!

কারণটা গৌরের মাথাতেই প্রথম ঝিলিক দিল।

"ঘনাদা আজ কীসের শোধ নিলেন বুঝতে পারছিস?"

গৌর বুঝিয়ে বলবার আগেই ব্যাপারটা আমাদের ভাল করেই মনে পড়ল। মাসখানেক আগেই আমাদের একটা ছোটখাটো বেয়াদপি হয়ে গেছে। বিকেলবেলা সেদিন ঘনাদাকে নিয়ে এক নামকরা হোটেলে যাবার কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু খেলার মাঠে সর্ব ভারত-প্রতিযোগিতায় বাংলা-দলের অপ্রত্যাশিত হারে এমন মুষড়ে পড়েছিলাম সবাই যে মেসে ফিরে যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম।

ঘনাদা সেজেগুজে রাত প্রায় ন-টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রামভুজের রান্নাতেই ডিনার সারলেও, পরের দিন এ ব্যাপার যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

মোটেই যে তিনি ভোলেননি, আজকের এই প্রতিশোধই তার প্রমাণ।

এ কাহিনীর একটু অপ্রত্যাশিত উপসংহার আছে।

ঘনাদার সেদিনকার অন্য সব কীর্তির মোটামুটি কিছুটা ব্যাখ্যা পেলেও পল্টুবাবুর মোটরের ট্যাঙ্কের অতখানি তেল মাত্র দমদম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যেতেই কেমন করে তিনি ফুরিয়ে এলেন, সেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে মস্ত একটা ধাঁধা হয়ে ছিল।

আর যাই করুন, ঘনাদা তেলটা কাউকে বিক্রি নিশ্চয়ই করেননি।

তা হলে কি দান-খয়রাত করে এসেছেন?

না, ওরকম উদারতা করে এসে থাকলে সেটার এক কড়া এতক্ষণে পাঁচকাহন হয়ে উঠত নিশ্চয়।

তেল খরচের রহস্যটা অমন আশাতীতভাবে আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

হল অবশ্য ঘনাদারই চরিত্র মহিমায়।

পঞ্চম গেম-এ কার্পভের ভুল চালগুলো কর্চনয়ের বদলে ফিশার বা সে নিজে থাকলে কী করত, তাই আমাদের বোঝাচ্ছে শিবু, আর শিশির তার প্রতিবাদে ফিশার থাকলে কার্পভের কাছে যে তুলোধোনা হয়ে যেত গলার জোরে তা প্রমাণ করে আমাদের আড্ডাঘর সরগরম করে তুলেছে, এমন সময় ভগ্নদূতের মতো দরজায় বনোয়ারির আবির্ভাব।

হাতে কোনও খাবার-দাবারের খালি প্লেট ছাড়া নিরস্ত্র নিরাভরণ বনোয়ারির আবির্ভাব আমাদের এ ঘরে বড় একটা হয় না।

হলে সংবাদটা কিছু গুরুতর বা চমকপ্রদই হয়ে থাকে।

এবারের সংবাদটা গুরুতর, না শুধু চমকপ্রদ, প্রথম শুনে ঠিক বোঝা গেল না।

বনোয়ারির সংবাদ হল, ড্রাইভারজি আসিছে।

ড্রাইভারজি! আমরা তো অবাক। কে এই ড্রাইভারজি?

সন্দেহ ভঞ্জন হতে দেরি হল না। বনোয়ারির ঘোষণার পরেই দরজায় ড্রাইভারজিকে দেখতে পাওয়া গেল।

প্রথমটা সত্যি চিনতে পারিনি। চেনা একটু শক্তও বটে। ড্রাইভারজিকে আর আমরা কতটুকু দেখেছি? আর যাও বা দেখেছি তা অন্য বেশে-পরিবেশে।

ড্রাইভারজির বেশভূষা এখন আলাদা। ড্রাইভার-মার্কা ধরাচূড়ার বদলে গায়ে পাঞ্জাবি ধরনের কোর্তা, পরনে পাজামা, মাথায় মারাঠি টুপি।

ড্রাইভারজি দরজার ভেতর একটু ঢুকে দাঁড়িয়ে আমাদের সেলাম করে একটু কুণ্ঠিতভাবে রাষ্ট্র-প্রাদেশিক মেশানো ভাষায় হেসে জানালে, "বড়া বাবুকে সেলাম দেনে আসছি।"

ব্যাপারটা যখন প্রায় বুঝে ফেলেছি, ড্রাইভারজির পরের কথায় তখন মাথাটা আবার একটু গুলিয়ে গেল।

আমাদের বোঝবার একটু সুবিধে করে দেবার জন্যে ড্রাইভারজি তার উল্লেখটা একটু বিস্তারিত করলে, "যো বড়াবাবুকে ও দিন কোল্যানি লিয়ে গেলাম।"

বড়াবাবু যে স্বয়ং ঘনাদা তা বুঝতে তখন আর বাকি নেই, কিন্তু কল্যাণীতে নিয়ে যাবার কথা কী বলছে ড্রাইভারজি?

সে বিভ্রমের চেয়ে একটা শঙ্কিত সন্দেহই গোড়ায় প্রবল হয়ে উঠল।

ঘনাদা নিজেই কবুল করেছেন যে, ড্রাইভারজির কাছে তিনি কিছু ধার নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পল্টুবাবুও নিজেই সে দেনা সম্বন্ধে তাকে ও আমাদের নিশ্চিন্ত হবার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ঘনাদার সেই ধার শোধের ব্যাপারেই কিছু গলতি হয়ে গেছে নাকি পল্টুবাবুর?

ড্রাইভারজি তারই তাগাদায় এসেছে?

উদ্বিগ্ন হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করতে হল আমাদের, "বড়াবাবুকে যা দিয়েছিলে তোমার সে টাকা কি—"

কথাটা শেষ করা গেল না। ওইটুকু বলা হতেই ড্রাইভারজি লজ্জিতভাবে জিভ কেটে বলল, "রাম! রাম! বড়াবাবু সে রুপয়া তো হমার কোম্পানির বাবুর মারফত ভেজে দিয়েছে ওই দিনেই। আর না দিলে ভি ও রুপয়া মাঙতে আসব হামি বড়াবাবুর কাছে!" একটু থেমে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললে, "কাল রামনবমী, তাই আমি আসিয়েছে।"

রামনবমী! তাই এসেছে ড্রাইভারজি! আমরা হতভম্ভ হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

রামনবমীর নামে আসা মানে বখশিশের আশায় যে আসা নয় তা তো ড্রাইভারজির আগের আলাপেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তা হলে?

ড্রাইভারজির পরের কথায় রহস্যটা একসঙ্গে কিছুটা পরিষ্কার ও রীতিমত ঘনীভূত হয়ে উঠল।

"কালসে তুলসীদাসজির পূজায় অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হোবে কিনা, উস লিয়ে বড়াবাবুকে বোলাতে এসেছি।"

মাথায় এবার চরকিপাক লাগা অন্যায় কিছু নয় নিশ্চয়। রামনবমীতে তুলসীদাসের সম্মানে "অখণ্ড" রামায়ণ পাঠ হবে, তার সঙ্গে ঘনাদার কী সম্বন্ধ?

সম্বন্ধটা ড্রাইভারজির ব্যাখ্যাতেই ভাল করে জানা গেল।

ঘনাদার অনেক আশ্চর্য গুণাগুণ আর ক্ষমতার কথা আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে একজন অসামান্য অপরূপ রামায়ণ গায়ক, সারা তুলসীদাসের সপ্তকাণ্ড রামচরিত-মানসই যে তাঁর প্রায় মুখস্থ, এই অবিশ্বাস্য খবরটা ড্রাইভারজির কাছেই প্রথম পেলাম। তেল ফুরোবার পর দমদম থেকে প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই ভাড়াটে লোক দিয়ে গাড়ি মেস পর্যন্ত ঠেলে আনবার সময় ঘনাদা নাকি তুলসীদাসী রামচরিতমানস-এর শ্লোক গেয়ে শুনিয়েই ড্রাইভারজি আর ঠেলাদারদের পর্যন্ত মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। আসন্ন রামনবমী উৎসবে অখণ্ড রামায়ণ পাঠের ভার নিতেও সেদিন তিনি নাকি রাজি হয়েছিলেন।

ড্রাইভারজি তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

সেদিন দায়ে পড়ে ঘনাদা যা করেছেন ও বলেছেন তা যতই অদ্ভুত ও চমকদার হোক আজ তার জের টানতে তিনি উৎসাহী হবেন বলে তো বিশ্বাস হয় না। কী ভাগ্য তিনি এখন তাঁর সরোবর-সভা সান্ধ্য বৈঠকে গেছেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্য গৌরই বুদ্ধি করে বলল, "সব তো ঠিক ছিল ড্রাইভারজি, কিন্তু বড়ি আফশোস কি বাত যে বিলাইত সে এক সাহাব অচানক আকে উনকো দূর কাঁহা টহলমে লিয়ে গেছে! কব যে লৌটেঙ্গে কুছ ঠিক নহি। তাই তোমাদের অখণ্ড রামায়ণ পাঠ উনি আর এবার

করতে পারলেন না।"

ড্রাইভারজি একটু হতাশ হয়েই তারপর চলে গেল।

ঘনাদার ভাগ্য ভাল যে, তিনি এ সময়ে যথারীতি তাঁর সরোবরসভায় গিয়েছেন।

তাঁর ভাগ্য ভাল বলব, না আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ?

ঘনাদা বাহাত্তর নম্বরে এখন উপস্থিত থাকলে ড্রাইভারজিকে সামলাবার হয়তো আর-একটা কাহিনী শোনার ভাগ্য আমাদের হত!

মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা

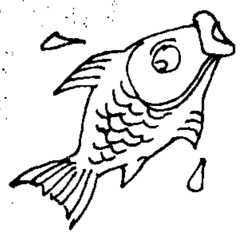

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্...

প্রথম মহাপ্রলয়ের বন্যায় সমস্ত সৃষ্টিকে যিনি চরম বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই মৎস্যাবতারের যথার্থ পরিচয় বিজ্ঞান কি আজও জানে?

সেই মৎস্যাবতার স্বয়ং যদি আদি মনুর রক্ষক হন, তা হলে একমাত্র মান্ধাতার টোপই তাঁকে ধরবার যন্ত্র নয় কি?

কে সেই আদি মৎস্যাবতার? মান্ধাতার টোপের রহস্যই বা কী? এ সব অতল রহস্যের মীমাংসা যথাস্থানে ও যথাসময়ে হবে আশা করে, আর কেউ নয়, স্বয়ং ঘনাদার বিরামহীন আলাপন এবার শোনা যেতে পারে বোধহয়।

হ্যাঁ, আমাদের সকলকে বিস্মিত বিহ্বল করে তিনি সম্প্রতি দাঁড়ি-কমা-ছেদহীন যে ভাষণ দিয়ে চলেছেন, কোনও দিক দিয়ে তার কোনও কূলকিনারা না পেয়ে আমরা সত্যিই দিশেহারা।

বোঝাসোঝার চেষ্টা না করে সেই কলস্বর-প্রবাহে ভেসেই না হয় যাওয়া যাক!

ঘনাদা বলে যাচ্ছেন:

"তা আমার কাছে কেন? শার্লক হোমস না হয় নেই, কিন্তু অ্যারকিউল পোয়ারোর কাছে গেলেই তো পারতেন? আর তা-ও না পেরে উঠলে পেরি ম্যাসনকে ভুলে গেলেন কেন?

বলতে গেলে সারা দুনিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজে ভূমধ্যসাগরের এই নিতান্ত খুদে আর তখনকার প্রায় অজানা নির্জন দ্বীপে ভাড়া-করা জেলে-নৌকোয় কোনওক্রমে যাঁরা আমার সন্ধান করে এসে নেমেছেন, তাঁদের মুখে প্রথমে কোনও কথাই নেই।

আমার গলার স্পষ্ট বিরক্তিতে বেশ একটু বেসামাল হয়ে দুই নতুন আগন্তুকের মধ্যে বয়স যাঁর একটু বেশি, সেই রোগাটে চিমসে চেহারার টাক-মাথা মানুষটি আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে, দেখুন—মানে—'

'আজ্ঞে দেখুন—অর্থাৎ কিনা—মানে—ও সব বুকনি ছেড়ে একটু ঝেড়ে কাশুন দেখি।' একটু ধমকে দিয়েই এবার বললাম, 'ব্যাপার যা বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে হঠাৎ গা-ঢাকা-দেওয়া দুনিয়ার এক সেরা ধাপ্পাবাজকে হন্যে হয়ে আপনারা খুঁজছেন। কিন্তু তাকে খুঁজতে দুনিয়ার সব বাঘা-বাঘা ফাটকা বাজার ছেড়ে আমার কাছে কেন?

'তোর কাছে কেন? শোন তবে উচ্চিংড়ে!' দুই আগন্তুকের মধ্যে বয়সে যে ছোট, কিংকং-এর ছোট ভাইয়ের মতো চেহারা, সেই দৈত্যটি আমার একটা হাত মুচড়ে ধরে এবার বললে, 'শোন তবে তেলাপোকাটা, দুনিয়ার টিকটিকি-মহলে মস্ত এক

ঝানু ঘুঘু বলে তোর নাকি দারুণ সুনাম! তাই তোকে আমাদের মক্কেলকে এক মাসের মধ্যে খুঁজে বার করবার হুকুম দিতে এসেছি। পারিস যদি তা হলে একটা মেডেলই হয়তো পেয়ে যাবি, আর না পারলে গর্দানটাই দেব মটকে। বুঝলি?'

বাঃ, বাঃ। মনে-মনে তখন আমি যে দারুণ খুশি হয়েছি, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। মৎস্যাবতারের আশায় ক-বছরের আজব এক তল্লাশির টহলদারিতে কখনও জেলেদের, কখনও সাধারণ ব্যবসায়ীদের ডিঙিতে আর সুলুপে ঘুরতে-ঘুরতে নেহাত নরম-নরম মানুষজনের সঙ্গে দিন কাটিয়ে হাত-পাগুলোয় যখন বাত ধরে গেছে, তখন একটু হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারলে যেন বাঁচি।

কিংকং-এর ছোট ভাই তখন দাঁতে-দাঁত-চাপা গলায় বলে যাচ্ছেন, 'তা আমাদের কথায় একটু কান দেবেন, না একটার বদলে দুটো কানই মেরামতের জন্য আমরা ছিঁড়ে নিয়ে যাব?'"

ওপরে যে বাক্যালাপের বিবরণটুকু এ-পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, তা যে আমাদের এই কলকাতা নগরীর বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের ঠিকানায় একটি নাতিজীর্ণ নাতিনবীন আড়াইতলা বাড়ির একটি বিশেষ আড্ডাঘরে ছাড়া আর কোথাও হতে পারে না, এবং সে-বিবরণদাতা যে স্বয়ং তেতলার টঙের ঘরের তিনি, মানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদা ছাড়া আর কারও হওয়া সম্ভব নয়, সে-কথা বিশদ বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নিশ্চয় নেই।

হ্যাঁ, বিবরণ যা শুনছি তা স্বয়ং ঘনাদাই দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, দিচ্ছেন প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বলা যেতে পারে। দিনের পর দিন সাধনা করে বড় রাস্তার মোড়ের হালুইকরের ক্ষীরের পান্তুয়া লেডিকেনি থেকে শুরু করে চৌরঙ্গিপাড়ার সেরা মোগলাই পরোটা আর মুরগমসল্লমের ঘুষ দিয়ে যাঁকে দিয়ে এক-এক সময় একটা অব্যয় শব্দও বলানো যায় না, সেই ঘনাদার এ কী অবিশ্বাস্য রূপান্তর! আজকের বিকেলের আড্ডাঘরে আর কেউ আসবার আগেই ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ি দিয়ে রেডিয়োর সিগন্যাল টিউনের মতো তাঁর বিদ্যাসাগরি চটির স্বাক্ষর চটপটি ধ্বনি তুলে নিজের মৌরসি কেদারাটি দখল করে সবাই এসে হাজির হবার আগেই একনাগাড়ে সেই যে বলে চলেছেন তার আর বিরাম নেই। বলা মানে একেবারে লাগাতার, যেন এক নিশ্বাসে বলা। আর সে-বলায় থামলে যেন কেউ তাঁকে কোতল করবে, এমনই তাঁর অস্থিরতা।

কিন্তু বলছেন তিনি কী? আর কী নিয়ে?

শ্যামবাজারে গল্প শুরু করে হঠাৎ টালা হয়ে একেবারে নিউ আলিপুর গেলেও তবু তার মধ্যে কিছু মানে থাকতে পারে, কিন্তু এ যে জামতাড়া দিয়ে শুরু করে পাজামার কথায় জড়িয়ে পড়ে জামরুল কিনতে ছোটা!

কত কী-ই না তিনি আমাদের এর মধ্যেই শুনিয়েছেন! এক কথায়, কোথায় না নিয়ে গিয়েছেন!

আরম্ভই করেছিলেন, নরেশ্বর নামটা শুনে একেবারে নরওয়ের উত্তরে পোলার

বিয়ার মানে সাদা ভাল্লুকের জন্য চোখের জল ফেলে।

"থাকবে না, থাকবে না!" প্রায় চাপা কান্নার সুরে বলেছিলেন, "নরওয়ের ওই কড়া আইন সত্ত্বেও সাদা ভাল্লুক সেখানে কেন, দুনিয়াতেই আর থাকবে না। এখন অবশ্য সারা বছরে গোনাগুনতি ক-টি মাত্র মারবার অনুমতি দেওয়া হয় শিকারিদের। কিন্তু চোরাশিকারিরা লুকিয়ে লুকিয়ে ছাল পাচারের লোভে আরও কত অমন মেরে শৌখিন মেরু-টহলদারদের খুদে প্লেনে সরিয়ে ফেলছে, কে তার হিসেব রাখে! তাই বলছি, নরওয়ের কথা আমায়, ভাই, বোলো না। বড় আফশোস হয়।"

"না, না। নরওয়ের কথা বলিনি আপনাকে," শিশির সংশোধনের চেষ্টা করে বলেছিল, "বলছিলাম ওঁর নাম হল নরেশ্বর। উনি—"

আর বেশি কিছু বলবার ফুরসত পায়নি শিশির। ঘনাদা তখন নরওয়ের সাদা ভাল্লুক ছেড়ে একেবারে নামাবলির রহস্য নিয়ে মেতে উঠেছেন।

"নাম? নামের মজার কথা যদি বলতে হয়," ঘনাদা নামকীর্তনের মতো গদগদ হয়ে বলতে শুরু করেছেন, "তা হলে দুনিয়ার সেই সবচেয়ে সৃষ্টিছাড়া আজগুবি নামটার কথাই বলতে হয় নিশ্চয়। সেই আজগুবি, কিন্তু মিথ্যে ধাপ্পা-টাপ্পা কিছু নয়, সত্যিকার একটা ছাপার অক্ষরে ছাপা সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বলে করে লেখা নাম। খুব বেশি নয়, মোট আটান্নটি অক্ষর সে নামের। নামটা আর কিছুর নয়, একটা রেল স্টেশনের। জংশন-টংশন গোছের বড় স্টেশন নয়, নেহাত খুদে একটা সামান্য স্টেশন। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন কি রাশিয়ার বিরাট কোনও রেললাইনেরও নয়, জায়গাটা বিলেত হলেও তার মফস্‌সলের মফস্‌সল ওয়েলসের একটা লেভেল ক্রসিং-এর চেয়ে মান্যে বড় কিছু নয়। কিন্তু সেই বিলেতি ধ্যাড়ধাড়া গোবিন্দপুরের নাম কী একখানা! কী, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই নরহরিবাবুর?"

ঘনাদার দৃষ্টিটা এবার সোজাসুজি নরেশ্বর বলে শিবু যাকে পরিচিত করতে চেয়েছিল, সেই বেশ একটু যেন ঘামতে-শুরু-করা, মোটাসোটা নিরীহ চেহারা ভদ্রলোকের দিকে।

ঘনাদার আজকের এতক্ষণের বল্গাছাড়া বাক-বিস্তারের রহস্যের খেই কি এখানে আছে মনে হয়?

তা নিয়ে ভাববার ফুরসত তখন আর মেলেনি। ঘনাদা তাঁর দৃষ্টি আবার আমাদের সকলের উপর বুলিয়ে নিতে-নিতে যেন একটু লজ্জিতভাবে বলেছেন, "আমারই কি আর সব ঠিক মনে পড়বে? এক-আধটা তো নয়, পুরো আটান্ন হরফের নাম। আর সে এমন ভাষায়, যাতে বেশিদিন কথা বললে মাথায়-জিভে জট পাকিয়ে ঘিলুতেই গোলমাল হয়ে যায় মনে হয়। তবু—"

"মানে!" আবার আমাদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা, "সেই আটান্ন হরফের স্টেশনের নামটা আপনার মনে আছে নাকি?"

"থাকা কি আর সম্ভব?" ঘনাদা কেমন একটু তাল ঠোকার ভঙ্গিতে শিবুর আনা অতিথি নরেশ্বরবাবুর দিকে চেয়ে তারপর যেন গলায় কিছুটা বিনয়ের সুর আনবার চেষ্টা করে বললেন, "তবু দেখি একবার চেষ্টা করে। এই যেমন—"

ঘনাদা একটু থামলেন। আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তখন তাকিয়ে।

কী করবেন এবার ঘনাদা?

সত্যি-সত্যি রামধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মগডাল থেকে মুখ থুবড়ে পড়বেন নাকি মাটিতে?

ধাপ্পায় উনি ধুরন্ধর, এ-কথা মেনে নিয়েও বলি, সব গুলবাজিরই যে একটা সীমা আছে, তাও তো ওঁর জানা উচিত!

বিলেতের ওয়েলস অঞ্চলের একটা খুদে রেলস্টেশনের যে শুধু দাঁত-ভাঙা নয়, পুরোটা বলতে দম ফুরিয়ে যাবার মতো একটা নাম আছে, সেই খবরটা কেউ কি আর আমরা শুনিনি? দু-চারটে নয়, পুরো বানান করে বলতে গেলে তাতে সাতান্ন না আটান্নটা অক্ষর লাগে, তাও আমাদের অজানা নয়, কিন্তু তাই বলে সেই আটান্ন অক্ষরের নামটা হরফ ধরে ধরে পুরোটা বলে যাওয়ার স্পর্ধা?

কী ভেবেছেন ঘনাদা? ক-এ আকার কা, আর খ-এ আকার খা যাদের কাছে এক, তেমন গোমুখ্যুদের যা শুনিয়ে দেবেন, তাই তারা না মেনে নিয়ে করবে কী?

কেন, আমাদেরও করবার কিছু নেই নাকি? আর কিছু না জানি, গিনেসের বুক অব রেকর্ডস-এর নামটা তো অজানা নয়। দেখি-না একবার এবার ঘনাদার দৌড়টা। টেবিলের উপর বাজারের হিসেবের খাতাটা পড়ে রয়েছে। সেটাই টেনে নিয়ে ঘনাদাকে একটু উসকানি দিয়ে বললাম, "তা আপনি পারেন নাকি সত্যি ওই আটান্নটা হরফের নামটার কিছুটা অন্তত বলতে? সব না পারেন, আটান্নর মধ্যে তিন-আটে চব্বিশটা পারলেই বাজিমাত।"

"না, না, চব্বিশটা কেন? বলতে গেলে পুরো আটান্নটাই না বললে তো বাহাদুরি না করতে যাওয়াই ভাল।" ঘনাদা আমাদের বেশ একটু অপ্রস্তুত করে এই মজলিশে শিবুর আনা আজকের অতিথির দিকে ফিরে বললেন, "কী বলেন, নরেশ্বরবাবু?"

"আজ্ঞে, আমি, মানে—" শিবুর আনা আজকের অতিথি চারবার ঢোক গিলে কেমন যেন একটু তোতলা হয়ে যা বলবার চেষ্টা করলেন, তা ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারার আগেই ঘনাদা তাঁকে যেন ভুলে গিয়ে নিজের আগের কথাতেই ফিরে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, পারি না-পারি চেষ্টা তো করে দেখতে দোষ নেই। এই যেমন নামটার প্রথম পাঁচটা অক্ষর হল—এল, এল, এ, এন, এফ।"

ঘনাদার কথা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাজারের হিসেবের খাতার একটা সাদা পাতায় অক্ষর ক-টা লিখে নিয়েছি।

এরপর ঘনাদাও যেমন বলে যান, আমিও এক নাগাড়ে সব লিখে নিই আমার খাতায়। ঘনাদা কত বড় স্মৃতিধর-বাহাদুর, তার প্রমাণ এই খাতাই এরপর দেবে। গৌর আছে আমার পাশেই বসে। ঘনাদার উচ্চারণগুলো এক-এক করে খাতায় লেখার সময় তা সাক্ষী হিসেবে তাকে দেখিয়ে তো রাখছি আমি।

প্রথম পাঁচটা অক্ষরের পর ঘনাদা তখন বলছেন, "এ, আই, আর, পি, ডব্লু, এল, এল, জি, ডব্লু, ওয়াই, এন, জি, ওয়াই, এল, এল, জি, ও, জি , ই , আর, ওয়াই, সি,

এইচ, ডব্লু, ওয়াই, আর, এন, ডি, আর, ও, বি, ডব্লু, এল, এল, এল, এল, আই, এ, এন, টি, ওয়াই, এস, আই, এল, আই, ও, জি, ও, জি, ও, জি, ও, সি, এইচ।"

ঘনাদার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখাও শেষ করে সামনের টেবিলের ড্রয়ারে খাতাটা রেখে দিয়ে একটু বোকা সেজেই বললাম, "এতগুলো অক্ষর তো আউড়ে গেলেন, কিন্তু সেগুলো ঠিক না ভুল তার প্রমাণ তো আর আমাদের হাতে নেই। আবোলতাবোল বলে গেলেই বা ধরব কী করে?"

ধরতে পারা যাবে না বলেই ঘনাদার মুখে একটু বাঁকা হাসি। "আপনি কী বলেন, নরোত্তমবাবু?" ঘনাদা আবার সেই শিবুর আনা অতিথির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলেন নরসিংহবাবু, হরফগুলো ঠিক না বেঠিক, তা ধরবার কোনও উপায় নেই?"

শিবুর নিয়ে আসা নতুন অতিথির এবার প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখ। প্রায় মিনতির সুরে তিনি বলবার চেষ্টা করলেন, "দেখুন, আমি মানে, আপনাকে মিনতি করে বলছি—"

"না, না, মিনতি করবেন কেন?" ঘনাদা ভদ্রলোকের মুখের চেহারা আর গলার করুণ সুরে এতক্ষণে বুঝি নিজের ধারণা আর ব্যবহার সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে সুর একটু পালটে তাঁকে যেন সাহস দিয়ে বললেন, "যা বলবেন তা একেবারে তাল ঠুকেই বলবেন। বলার মুরোদ যার আছে, যা বলবার, সে তো তা সাহস করে বলবে। বলুন না আপনি, আটান্নটা হরফ, যা শোনালাম, তা প্রলাপ না সাচ্চা বানান, তার হদিস কোথাও মেলা কি সম্ভব?"

নরেশ্বর বা নরোত্তম, নামটা যাই হোক, শিবুর নিয়ে আসা ভদ্রলোক এবারে মরিয়া হয়েই বুঝি একটু সাহস সংগ্রহ করে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্ভব।"

"সম্ভব?"

আমরা সবাই তো বটেই, স্বয়ং ঘনাদাও এবার বুঝি কেমন একটু চমকিত।

"সম্ভব বলছেন তো আপনি?" জোর দিয়ে বলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘনাদার কেমন একটু দ্বিধান্বিত জিজ্ঞাসা, "ঠিকঠাক, না আবোলতাবোল বানান বলেছি, তা ধরে ফেলার উপায় তা হলে আছে বলছেন আপনি?"

"হাঁ, বলেছি।" শিবুর নিয়ে আসা অতিথি নরহরি বা নরেশ্বরবাবু আরও যেন বেপরোয়া হয়ে বললেন, "আর কোথাও না হোক, আপনাদের এখানে শুধু তা কেন, সাপের পাঁচ পা-ও হওয়া সম্ভব।"

সাপের পাঁচ পা? আমাদের আর বিস্ময়ের ভান করতে হল না এবার।

আমাদের সকলের বক্তব্যই ঘনাদার মুখ দিয়েই বার হল, "সাপের পাঁচ পা? সাপের পাঁচ পা আবার কোথা থেকে এল?"

"কোথা থেকে এল?" নরেশ্বর না নরহরি নামের ভদ্রলোক অনেক সয়ে এবার যেন পুরোপুরি খাপচুরিয়াস—"এল আপনাদের এই গারদ মানে পাগলা-গারদের গুণে। সাপের পাঁচ পা কেন, আপনাদের এই বদ্ধ পাগলের গারদখানায় সবকিছু হওয়া সম্ভব। এখানে যাহা বাহান্ন, তাকে আপনারে তেষট্টি মাত্র নয়, পোস্তার আলুপট্টি করে

দিতে পারেন। তিন-তিরিক্ষে নয়-ও আপনাদের এই মাথার ঘিলু-গলানো আসরে তিরুপল্লির তিন্তিড়ি হয়ে যেতে পারে—”

“শাবাশ, শাবাশ।” শিবুর নিয়ে আসা নরহরি না নরেশ্বরবাবুর তাল-মেলানো গজরানির মাঝে ঘনাদার অমন তারিফ শুনে আমরা অবাক। শাবাশ বলে তারিফ জানিয়েই ঘনাদা থামলেন না, সোৎসাহে শিবুর আনা অতিথি নরহরি না নরেশ্বরবাবুকে নিজের সমর্থন জানিয়ে ঘনাদা বলে চলেছেন, “চালিয়ে যান, চালিয়ে যান।”

কিন্তু নরহরি বা নরেশ্বরবাবুর মেজাজটা তখন ওই দুটো 'শাবাশ' ছিটিয়ে শান্ত করবার নয়। তপ্ত তেলের কড়ায় জল পড়ায় তিনি যেন আরও চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, “চালিয়ে যেতে বলছেন আমাকে? বলতে লজ্জা করছে না? সাতে নেই, পাঁচে নেই, আমি মশাই নেহাত সাদাসিধে কলের জলের কনট্রাকটর। করপোরেশনের কলের জলের পাইপ লাগানো আর মেরামতের মিস্ত্রিও বলতে পারেন। সেই আমাকে আপনাদের কোথায় কলের জলের নতুন পাইপ লাগাতে হবে বলে ডাকিয়ে এ কী জুলুম আর শাস্তি!”

একটু থেমে থেকে শিবুর দিকে আঙুল তুলে করপোরেশনের জলের কলের কনট্রাকটর আবার বলতে শুরু করলেন, “উনি, ওই উনিই তো আমায় ডাকিয়ে এনেছেন। এখানে আসবার আগে অবশ্য আগে থাকতে একটু সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন নিজে থেকে কথা বলে নিজের পরিচয়-টরিচয় না দিই। ওই ওঁর ইশারা না পাওয়া পর্যন্ত চুপ করে সব শুনেই যাই। কিন্তু সেই শুনে যাওয়া মানে কি এই যন্ত্রণা? আমার নামটা নিয়ে পর্যন্ত কী হেলাফেলা! পেঁচিয়ে দুমড়ে থেঁতলে নরহরি না নরেশ্বর বানানো! শুনুন, আমার নাম নরহরি বা নরেশ্বর-টর নয়। সরল সোজা তিন অক্ষরের নবীন। বুঝেছেন?”

নবীনবাবু তাঁর গায়ের জ্বালায় অনেক কথা যখন বলে যাচ্ছেন, ঘনাদার এই ক-দিনের লাগাতার ভাষণের ঝোঁকের রহস্যটা তখন ধরে ফেলেছি। কেরামতিটা অবশ্য শিবুর।

মাঝে-মাঝে যেমন হয়, বাহাত্তর নম্বরে তেমনই কিছুদিন আগে থেকে একটা গুমোটের পালা চলছিল। খুচখাচ তোয়াজ-তারিফ যা কিছু সম্ভব, ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা করেও ঘনাদাকে একটু হ্যাঁ করাতেও যেন পারছিলাম না।

ঘনাদার বেয়াড়াপনা এবার ছিল একটু নতুন ধরনের। না অসহযোগ-টোগ নয়, তার বদলে যেন একেবারে ন্যাকা সেজে যাওয়া। আমাদের কথায় কান দেন না এমন নয়, কিন্তু ফল তার হয় বিপরীত। ধান শুনতে কান তো শোনেন বটেই, সে কানও আবার শব্দ শোনবার সহায়, না জল থেকে নিশ্বাসের হাওয়া সংগ্রহের জন্য মাছেদের কানকোর অক্ষর-সংক্ষেপে কিনা, তাই যেন ঠিক করতে পারেন না।

বেয়াড়াপনাটা আরম্ভ করেছিলেন অবশ্য শিবুরই দোষে। কথায়-কথায় কেমন করে দক্ষিণ আমেরিকায় যার জন্ম, পৃথিবীর সেই সবচেয়ে হালকা বালসা-কাঠের ভেলায় যাঁরা পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে পলিনেশিয়ার এক নগণ্য দ্বীপে

এসেছিলেন, তাঁদের কথা হচ্ছিল। শিবু তার মধ্য দিয়ে নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্য একটু ফোড়ন কেটে বলে ফেলেছিল, "নামগুলো একটু সাবধানে উচ্চারণ করতে হয় কিন্তু, ঘনাদা। এক-আধটা তো নয়, অমন পাঁচ-সাতটা ভাষার খিচুড়ি। বানান ঠিক রাখাই প্রায় অসম্ভব।"

"ও, তাই বুঝি?" ঘনাদা যেভাবে হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হবার ভঙ্গিতে শিবুর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, শিবুর তাতেই হুঁশ হওয়া উচিত ছিল।

তার বদলে আহাম্মকটা আরও মাতব্বরির চালে বলেছিল, "হ্যাঁ, এই দেখুন না, ওই বালসা-কাঠের পালতোলা একটা ভেলা, কোনওরকম লোহা পেতল কি তামার পেরেক ইস্ক্রুপ ছাড়া শুধু বুনো লতার দড়িতে বেঁধে যিনি পেরু থেকে প্রায় গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটাই পার হবার আজগুবি কল্পনায় ক-জন নিজেরই মতো আধপাগলা বন্ধু জোগাড় করে সমুদ্রে ভেসেছিলেন—"

নিজের উৎসাহে নাগাড়ে বকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘনাদার দিকে চোখ পড়ায় শিবু একটু থেমেছিল।

ঘনাদা তখন তার দিকে আদার ব্যাপারির কাছে যেন সওদাগরি জাহাজের খবর বলা হচ্ছে, কিংবা বলা যায় প্রথমভাগের পড়ুয়ার কাছে যেন মুগ্ধবোধের শ্লোক পড়া হচ্ছে, এমনভাবে বোকা সেজে চেয়ে আছেন।

এ চেহারা দেখেও হুঁশ কি হয়েছে শিবুর? মোটেই নয়। নিজের বাহাদুরিতে সে যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ঘনাদাকে জ্ঞান দিয়ে বলেছে, "হ্যাঁ, ওই থর হেয়ারডালের কথাই বলছি। উচ্চারণটা হেয়ারডাল কি না তারই বা ঠিক কী?"

"হ্যাঁ," শিবুর কথার মধ্যেই ঘনাদা হঠাৎ তাঁর আরামকেদারায় সোজা হয়ে বসে তাঁর বিদ্যাসাগরি চটিতে পা গলাতে গলাতে বলেছেন, "ও সব ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।"

তারপর আমরা কেউ কিছু বলবার করবার আগেই ঘনাদাকে বারান্দার দরজা দিয়ে সোজা ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে দেখা গেছে।

"কিন্তু—" আমাদের মতোই হতভম্ব শিবুর মুখ দিয়ে শুধু ওই শব্দটি যখন বেরিয়েছে, ঘনাদার বিদ্যাসাগরি চটি তখন ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির প্রথম ধাপ ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরি চটির তাল দেওয়া চটপটির সঙ্গে ঘনাদার শেষ যা কথা শোনা গেছে, তা হল, "ঠিক! ঠিকই বলেছ। হাতেখড়ি না হতেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নিরেট আহাম্মকেরাই করতে যায়।"

॥ ২ ॥

কী হয়েছে তারপর থেকে?

তাঁর টঙের ঘর থেকে ঘনাদা আর নামাই দিয়েছেন বন্ধ করে। এর আগে যেমন বহুবার হয়েছে, তেমনই বনোয়ারি আর রামভুজের বকলমেই আমাদের সামান্য যা-কিছু বিনিময় চলছে।

প্রতিদিন সকালের খবরের কাগজগুলো আগে থাকতে নিজের ঘরে আনিয়ে ঘনাদা তার বাড়ি-ভাড়ার পাতাগুলোতে বেছে বেছে তাঁর মনের মতো ভাড়াবাড়ির বিজ্ঞাপনে লাল কালিতে দাগ মেরেছেন কোথায় কোথায় তিনি উঠে যেতে পারেন তা আমাদের জানাবার জন্য?

না, না। ও সব কিছু নয়। ওরকম কোনও বদমেজাজ কি বেয়াড়াপনার কোনও লক্ষণই তাঁর মধ্যে এবার নেই। বরং বলা যায়, তিনি যেন আরও মোলায়েম, আরও আরও মাটির মানুষ হয়ে উঠেছেন এই কিছুদিন থেকে।

আড্ডাঘরে এসে জমায়েত হয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর বিদ্যাসাগরি চটির চটপটানির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আর অপেক্ষা করতে হয় না কোনওদিন। আমাদের কেউ সে ঘরে গিয়ে ঢোকবার আগেই দেখা যায় তিনি সেখানে প্রসন্ন মুখে তাঁর মৌরসি কেদারা দখল করে হাজির।

হ্যাঁ, শুধু হাজির নন, একেবারে রীতিমতো হাসিমুখেই তিনি সেখানে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে প্রথম যে গিয়ে উপস্থিত হয়, কুশল প্রশ্নটুকু তাকে করতে তিনি ভোলেন না। যেমন, "আজ একটু দেরি হল যে? শরীর ভাল তো?"

বাহাত্তর নম্বরের ইতিহাসে যা কখনও শোনা যায়নি, আচমকা একেবারে অপ্রত্যাশিত তেমন প্রশ্ন প্রথম শুনে বেশ একটু ভড়কে গিয়ে আমাদের মুখ দিয়ে কিছু অস্পষ্ট "অ্যাঁ—মানে হ্যাঁ" গোছের অব্যয়ধ্বনি যদি বেরিয়ে যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ, ঘনাদা তাঁর আগের প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে বিষয়ান্তরে চলে যান। সেই দ্বিতীয় উক্তিটি শুনতে খারাপ না লাগবার হলেও বেশ চমকপ্রদ।

"বায়না দিয়ে এলাম," ঘনাদা হয়তো বেশ একটু চমকে দিয়ে বলেন, "ওই এক চেঙাড়ি মানে দশ গণ্ডারই বায়না দিয়ে এলাম, বুঝেছ?"

বুঝতে আমাদের একটু দেরি হলে তিনি আরও বিশদ হয়ে বলেন, "হিঙের কচুরির বায়না হে! ওই শিবু হালুইকরের হিঙের কচুরির। সবে দেখলাম কড়া চাপিয়ে লেচি বেলে ভাজা শুরু করেছে। তাই দিয়ে এলাম এক চেঙাড়ি মানে দশ গণ্ডারই বায়না। কী বলো, ঠিক করিনি?"

ঠিক না তো কি বেঠিক কিছু করেছেন? করলেও সে-কথা কে বলবে? তাই সানন্দেই তাঁর কথায় সায় দিই।

কিন্তু তারপর?

সেই তারপর নিয়েই হয়েছে যত গোল।

ঘনাদা রাগ করেন না, মেজাজ দেখান না। আমাদের বর্জন করবার কোনও লক্ষণও তাঁর কোনও কিছুতেই নেই। শুধু তিনি যেন—তিনি যেন—না, সোজাসুজি বলেই ফেলি কথাটা, তিনি যেন সাধ করে আর-এক মানুষ সেজে আমাদের নাক-কানগুলো মলে দিচ্ছেন।

আর-এক মানুষ সাজা কীরকম? কীরকম আর, কতকটা ভ্যাবাগঙ্গারামেরই কুটুম-ভাই বলা যায়।

যেন নেহাত ভালমানুষ। রাগ নেই, বিরক্তি নেই, নেহাত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ।

কিন্তু ক-এর কোন দিকে আঁকড়ি আর র-এর শূন্যটা কোন দিকে পড়ে, তাও যেন জানেন না।

মুখে একবার 'ম' উচ্চারণ করলে যিনি মহাভারত না-আউড়ে থামতে পারেন না, সেই ঘনাদার কানের ফুটো যেন বন্ধ, আর জিভটা যেন অসাড়।

সাত চড়ে কেন, সাত-সাতে উনপঞ্চাশ সিধে আর বাঁকা জেরার খোঁচাতেও তাঁর মুখে রা নেই।

শুধু কি রা নেই! সাড়ই যেন নেই মগজে।

তাঁকে একটু জাগাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কি কিছু করেছি? বলতে গেলে বিশ্বকোষের স্বরে-অ থেকে শুরু করে অনুস্বর বিসর্গ পর্যন্ত হরফের কিছু না কিছু একবার করে নাড়া দিয়ে গেছি, কিন্তু ফল যা হয়েছে, তাতে আমাদের প্রায় দেওয়ালে মাথা খোঁড়া না হোক, দু-হাতে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা!

আড্ডাঘরে মজলিশ শুরু হবার কিছু পরে ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকে গৌর উত্তেজনায় যেন প্রায় তোতলা হয়ে বলেছে, "শুনেছেন ঘনাদা, শুনেছেন, কুমেরু অভিযান থেকে কী খবর পাঠিয়েছে আমাদের এবারের কুমেরু অভিযাত্রী-দল?"

"কী খবর?" আমরা উদ্গ্রীব হয়ে প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছি, "ভাল খবর, না মন্দ?"

"ভাল খবর কী আর হবে!" শিশির যেন এরই মধ্যে হতাশায় কাতর হয়ে বলেছে, "খারাপ খবর নিশ্চয়ই। যেখানে ছ-মাসের শীতের রাতের জন্য ডেরা বাঁধা হয়েছিল, সেই গঙ্গোত্রীই বোধহয় ধসে তলিয়ে গেছে বরফের তলায়।"

"কী যা-তা বলছিস," আমি ওদের ধমক দিয়ে ঘনাদার শরণ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, "সত্যি সেরকম কিছু হতে পারে, ঘনাদা? অতসব ঝানু-ঝানু বৈজ্ঞানিকের দল বেছে বেছে অমন কাঁচা জায়গায় ডেরা পাততে পারে?'

"পারে-না-পারে সে পরের কথা," শিবু আমায় ধমক দিয়ে থামিয়ে বলেছে, "খবরটা কী, তা-ই আগে শোনো না। কী বলেন ঘনাদা, কাকে কান নিয়ে গেছে শুনে কানটা ঠিক আছে কি না, হাত বুলিয়ে না দেখেই কাকের পিছনে দৌড় দেওয়া কেন?"

"ঠিক, ঠিক," বলে শিবুর কথায় সায় দিয়ে এবার গৌরকে চেপে ধরা হয়েছে, খবরটা কী তা জানবার জন্য।

কিন্তু গৌর তা বলতে পারেনি। তার কৈফিয়ত হল এই যে, বাস-এ আসতে আসতে ফুটপাতে বিকেলের বিশেষ খবর বলে এক ফেরিওয়ালাকে সে 'কুমেরুর জবর খবর! এই বেরিয়ে গেল' বলে হাঁকতে শুনে এসেছে।

তা হাঁকতে শুনেও একটা বিশেষ খবরের পাতা কিনে নিয়ে আসেনি কেন?

তা কিনতে নামলে আর সে-বাস কেন, কোনও বাস-এ কি ফিরতে পারত? গৌর চটপট জবাব দিয়ে জানিয়েছে।

"খবরটা কী তাই যদি না জোগাড় করতে পেরে থাকো, তা হলে মিছিমিছি এখানে

এসে আমাদের অমন অস্থির করে তোলবার দরকার কী ছিল!”

আমাদের এ নালিশের উত্তর যেন গৌরের মুখস্থ ছিল। সে চটপট জবাব দিয়ে বলেছে, “বাঃ, কাগজে ছাপা খবরটা না দেখেও ঘনাদা ব্যাপারটা শুনলে সেটা কি অনুমান করতে পারবেন না?” তাই জন্যই তো সেই শুধু জবর খবরটুকু শুনেই ঘনাদাকে সেটা জানাবার জন্যে ছুটে এসেছে।

“শাবাশ! শাবাশ!” গৌরের অকাট্য যুক্তিতে আমাদের বাহবা দিতেই হয়েছে।

কিন্তু লাভ কি কিছু হয়েছে তাতে? দিনকাল যখন আলাদা ছিল, তখন ওই একটা খেই ধরিয়ে দিলেই ঘনাদা তা থেকে কোন না পঞ্চাশটা ফ্যাঁকড়া বার করে আমাদের একেবারে মাথায় চক্কর লাগানো উপাখ্যান বুনে ফেলতেন!

আর কিছু না হোক, কুমেরুর ক-মাইল পুরু জমা বরফের নীচে থেকে ডাইনোসরদের হার-মানানো এক বিদঘুটে আজগুবি জানোয়ারের ফসিল কি আর আচমকা ঠেলে বার করতেন না দারুণ এক ভূমিকম্পে?

কিন্তু সে সব কেরামতি দূরে থাক, ঘনাদার কাছ থেকে একটু নড়েচড়ে ওঠার লক্ষণও দেখতে পাওয়া যায় না।

তার জন্য একটু খোঁচাতেও আমরা বাকি রাখি না।

“জবর খবরটবর সব বাজে কথা, কী বলেন, ঘনাদা?” শিশির ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্য করে ঘনাদাকে প্রতিবাদে উসকে দিতে চায়।

কিন্তু লাভ কিছু হয় কি? একেবারেই না।

এ যে ঠাণ্ডা কড়াইয়ে জলের ছিটে দেওয়া। ছ্যাঁক করে একটা শব্দও শোনা যায় না।

“একটা বিকেলের জরুরি খবর কিনতে পাঠাব নাকি, ঘনাদা?” আমি হাওয়াটা গরম রাখবার চেষ্টায় জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু কাকে কী জিজ্ঞেস করছি? আমরা যাঁকে জাগাতে চাইছি, তিনি এখন কোমাতেই আচ্ছন্ন বললে অবস্থাটা কিছুটা বোঝানো যায়।

নেহাত জবাব না দিলে ছাড় নেই বুঝে যেন ক্লান্ত, নির্বিকারভাবে বললেন, “তা আনাও! তবে—”

সত্যিই আনাতে হলে যে বিপদ হত, ওই ‘তবে’টুকুর জোরে সেটা এড়িয়ে, তাড়াতাড়ি বলতে হল এবার, “হ্যাঁ, আনতে পাঠানোতে লাভ নেই। কী না কী বিশেষ খবর, এতক্ষণ কি আর তা বিক্রি হয়ে যেতে কিছু বাকি আছে? তবে খবরটা ওই দক্ষিণ গঙ্গোত্রীরই নিশ্চয়, কী বলেন আপনি?”

‘গঙ্গোত্রী’ শব্দটাই যেন প্রথম শুনলেন, এমনভাবে নির্বোধের মতো আমাদের দিকে চেয়ে ঘনাদা শুধু শব্দটা আর একবার উচ্চারণ করে বললেন, “গঙ্গোত্রী বলছ? তা সে গঙ্গোত্রী—”

সলতে একটু ধরেছে আশা করে উৎসাহভরে বললাম, “হ্যাঁ, কুমেরুর যে জায়গাটায় আমাদের অভিযাত্রীরা ছ-মাস দিনের পর ছ-মাস রাতও কাটাবে বলে পাকা আস্তানা তৈরি করেছে, সেটারই ওরা গঙ্গোত্রী মানে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী নাম

দিয়েছে না!"

কী বললেন এবার ঘনাদা। নিভু নিভু সলতেটা একটুও এবার ধরল কি?

না, আমাদের সব চকমকি ঠোকা বৃথা। ঘনাদা যা বললেন, তাতে ভিজে সলতে একটু শুকোবার লক্ষণও নেই।

"ও," বললেন ঘনাদা, "ওই নাম দিয়েছে ওরা? দক্ষিণ—কী বলে—দক্ষিণ গঙ্গোত্রী।"

কী ইচ্ছে করে এর পরে? ঘনাদার এই বেয়াড়া রোগের সূত্রপাত যার জন্য হয়েছে তাকেই এই বাহাত্তর নম্বর থেকে নির্বাসন দিতে ইচ্ছে করে নাকি?

কিন্তু তার দরকার হয় না।

রোগ যার বাধে, দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাটাও সেই করে।

দাওয়াইটা বেশ অদ্ভুত। প্রথমে দাওয়াই বলে ধরাই যায়নি।

বাহাত্তর নম্বরের এখনকার নিতান্ত জোলো মজলিশে কদিন আগে হঠাৎ একটা নতুন মুখ দেখা গেছে। কার এ মুখ, কোথা থেকে আমদানি এ সব কিছু জানবার আগে শিবুর কাছে সামান্য দু-একটা ইশারা আমরা অবশ্য পেয়েছি।

"শব্দ-কল্পদ্রুম-এর নাম শুনেছ তো?" শিবু যেন জনান্তিকে জানিয়েছে আমাদের, "এ তা হলে আর-এক নিখিল বিশ্ব শব্দ-কল্পদ্রুম। এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই, যা ওই মানুষটাকে একটু নাড়া দিয়ে বার করতে পারা যায় না। আর একবার মুখ খুললে সে অনর্গল কথার ফোয়ারা বন্ধ করে কে? শুধু একটু বুঝেসুঝে ফোয়ারাটা চালু করতে হয়। মেজাজি মানুষ তো, এমনিতে মুখ যেন খুলতেই চায় না।"

যাঁর সম্বন্ধে কথাগুলো বলা হয়েছে, তাঁকে মাত্র একদিনই বাহাত্তর নম্বরে আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। শিবুর সঙ্গে সন্ধের দিকে এসে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে আড্ডাঘরে খানিক বসে শিবুর সঙ্গে তিনি আবার ঘব ছেড়ে চলে গেছেন।

ওপরে যাঁর কথা লেখা হল, প্রথম দিনের নীরব সাক্ষাতের পর দ্বিতীয় দিনে শিবু যখন প্রথম তাঁর বিশদ পরিচয় দিয়েছে, তিনি নিজে তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। ওপরের টঙের আড্ডাঘরে তাঁকে তখনও দেখা না গেলেও ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর বিদ্যাসাগরি চটির চটপটানি সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পৌঁছবার শব্দ তখন পাওয়া গেছে।

শিবু অবশ্য তার নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস যেরকম তারস্বরে প্রচার করেছে, তাতে সিঁড়িতে পা দেবার আগে নিজের টঙের ঘর থেকেই ঘনাদার তা শুনতে খুব অসুবিধে হত না।

বাইরে বারান্দা থেকে ঘনাদা যখন ঘরে ঢুকেছেন, শিবু তখন তার নতুন আবিষ্কারের নামটা আমাদের জানিয়ে বলেছে, "ওঁর নামটা ভাল করে জানার সুযোগ অবশ্য হয়নি। হবে কোথা থেকে? এমনিতে থাকেন একেবারে স্ফিংসের মতো বোবা হয়ে, আর কথা যখন একবার শুরু করেন তখন তার মধ্যে তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করবার ফুরসত থাকে কখন। তবে নামটা ওই নবীন না নরেশ্বর না নরহরি গোছের কিছু বলে যেন হচ্ছে।"

শিবুর কথা শেষ হবার আগে ঘনাদা ঘরের যথাস্থানে এসে তাঁর মৌরসি কেদারাটি দখল করতে করতে বলেছেন, "ভাল, ভাল, নামটা ঠিক না-ই জানো, আবিষ্কারটা করেছ তো ঠিক। যা-তা নয়, একেবারে নিখিল বিশ্ব শব্দ-কল্পদ্রুম। অর্থাৎ ইউনিভার্সাল এনসাইক্লোপিডিয়া। মানে বিশ্বকোষ। শুকনো পুঁথির কাগজের নয়, জীবন্ত বিশ্বকোষ মানে দ্বিতীয় ব্যাসদেব আরকী!"

ঘনাদা তখন তাঁর যা বলবার বলেই যাচ্ছেন, আর আমরা ঠিক সজ্ঞানে আছি কি না জানবার জন্য নিজেদের চিমটি কাটব কি না ভাবছি।

চিমটি সত্যি অবশ্য কাটিনি। কিন্তু আমাদের মাঝখানের মৌরসি কেদারায় আসীন মানুষটি যে আমাদের এ ক-দিনের ঘনাদা, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

কী তাঁর হয়েছিল, তা একেবারে অজানা না হলেও, হঠাৎ এ-রূপান্তর কী করে যে তাঁর হল, তার রহস্যটা যে ধরতেই পারছি না।

এ কি আমাদের টঙের ঘরের সেই তিনি, এই গত কালই যাঁকে 'রাম' বলাতে হন্যে হয়ে গিয়ে 'মরা' পর্যন্ত বলাতে পারিনি। হঠাৎ তাঁর বোবা গলায় কথার যেন বান ডেকেছে। সে-বান আবার বাঁধভাঙা হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে শিবুর আবিষ্কার বিশ্ব-শব্দকল্পদ্রুম নরহরি না নরেশ্বরবাবুর ঘরে এসে ঢোকায়।

"আসুন, আসুন, নরহরি না নরেশ্বর না দ্বিতীয় ব্যাসদেবঠাকুর, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা। বসুন, বসুন। হ্যাঁ, হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসুন। আপনি নাকি কথা আরম্ভ করলে তার অবিরাম তোড়ে আর কারও কোনও কথা পাত্তা পায় না, তাই আমার কথাটা আগেই বলে রাখছি সেই শব্দ-কল্পদ্রুম নিয়ে। আমাদের এই বাংলা ভাষায় প্রথম শব্দ-কল্পদ্রুম কবে কে প্রকাশ করেছিলেন তা আপনাকে নতুন করে কী শোনাব? স্যার রাধাকান্ত দেববাহাদুরের সেই আশ্চর্য কীর্তিটি তখনকার হিতবাদী মেশিনের যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল বলেও মনে করতে পারছি। শুধু কোন সালে ছাপা হয়েছিল আর মুদ্রাকর কে ছিলেন, তাই নিয়ে মনে যা একটু সংশয় আছে। তা আপনি নিশ্চয় নিরসন করে দেবেন! আপনার অপেক্ষায় সেই আশাতেই আছি—"

ঘনাদা যেন ভক্তিভরে শিবুর আনা নতুন অতিথির দিকে চেয়ে প্রায় হাত জোড় করে মিনতি করবার ভঙ্গি করেছেন এবার।

কিন্তু শিবুর আনা নরহরি বা নরেশ্বরবাবু কেমন অসহায় অস্থিরভাবে, "আজ্ঞে—আমায়—বলছেন, মানে—আমি—" বলতে গিয়ে প্রায় তোতলা হবার উপক্রম হতে, "থাক, থাক, আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত তখন যা জানবার সবই ঠিক সময়ে জানব," বলে তাঁকে তখনকার মতো রেহাই দিয়ে ঘনাদা তাঁর লাগাতার একক ভাষণ কোথায় যে নিয়ে গেছেন তা আগেই জানানো হয়েছে।

এর আগে ক-দিন যাঁর গলা দিয়ে একটা হাঁচিকাশির আওয়াজও আর বার হবে না বলে সন্দেহ হচ্ছিল, সেই ঘনাদা হঠাৎ মুখে কেন যে বুকনির বান ডাকাচ্ছেন তা বুঝতে আমাদের তখন আর বাকি নেই। আহাম্মক শিবুকে একটু ভাল করে শিক্ষা দেবার জন্যই তার আমদানি করা পণ্ডিতকে একেবারে ছাল ছাড়িয়ে নেবার কী

অবস্থায় যে এনে দাঁড় করিয়েছেন তা আমরা দেখেছি।

কিন্তু ফ্যাসাদ বেধেছে নকল বেদব্যাস সাজানো নরহরি কি নরেশ্বরকে নিয়ে নয়, জলের কলের কনট্রাকটর নেহাত সাদাসিধে নবীনবাবুকে নিয়ে।

সম্পূর্ণ বিনা দোষে অকারণে তাঁকে টিটকিরির শিকার করে তোলার অবিচারে নরহরি বা নরেশ্বর নয়, নেহাত সাদাসিধে নবীনবাবু যখন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, তখন ঘনাদা সত্যিই পড়েছেন বিপদে।

"আপনি মানে—," ঘনাদা বিব্রত অপ্রস্তুত হয়ে বলেছেন, "ও সব পণ্ডিতটণ্ডিত, ওই কী বলে, শব্দ-কল্পদ্রুম গোছের কিছু নন তা হলে? মাফ করবেন, নরহরি, না না, নরেশ্বর, থুড়ি নবীনবাবু, আমি আমার ভুলের জন্য বারান্দা থেকে ন্যাড়া ছাদ পর্যন্ত সব ক-টা সিঁড়ি নাকখত দিয়ে উঠতে রাজি আছি। আপনি শুধু আমায় ক্ষমা করবেন।"

ঘনাদার কথাগুলো শুনব কী, তাঁর কাণ্ড দেখে তখন আমাদের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধোবার অবস্থা।

ঘনাদা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। শুধু উঠে দাঁড়াননি, বারান্দার দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলেছেন, "মিছিমিছি ক-টা বাজে বুকনি ছেড়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টায় আপনার সময় নষ্ট করেছি বলে আমি সত্যিই আপনার কাছে মাফ চাইছি। আচ্ছা, নমস্কার!"

"নমস্কার," বলে ঘনাদা সত্যি তখন রওনা দিয়েছেন বারান্দার দরজা দিয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে।

হায়, হায়! একেবারে ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি! শিবুকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ঘনাদা তো হাজার একের ওপর আরও ক-টা আরব্যরজনী নামিয়ে এনেছিলেন।

সে সব তো গেল গাঢ় অমাবস্যায় হারিয়ে।

এখন ঘনাদাকে আর কি ফেরানো সম্ভব? ছিঁড়ে যাওয়া তার আবার জুড়ে আর কি সুরে বাঁধা যায় ভাঙা সারেঙ্গি?

যায়, যায়। ব্যাপারটা একরকম হোমিওপ্যাথিই বলা যায় নিশ্চয়। রোগ যা ধরায়, দাওয়াই জোগায় তা-ই।

ঘনাদার বিদায়-নমস্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধমকই যেন শোনা গেল। শুধু ধমক অবশ্য বলব না, ধমকেরই সুরে যেন একটা নালিশ, "নমস্কারের মানে? নমস্কার মানে চলে যেতে চান আমাদের 'কী জানো, কী হল, কী হবে'র ভয়-ভাবনা-সন্দেহের কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ঝুলিয়ে? না, না, সেটি হবে না। গণপতি না গজেশ্বরবাবু, এলোপাতাড়ি সন্দেহ-সংশয়ের কাঁটা যা-সব ছড়িয়েছেন, তা সাফ না করে আপনার যাওয়া চলবে না।"

"আরে, আরে, করেন কী নরহরি, না, থুড়ি নবীনবাবু?"

নবীনবাবুর এর আগের প্রাণখোলা বক্তৃতায় আর ব্যবহারে যতই খুশি হয়ে থাকি, এবার তাঁকে সামলাবার জন্য এগিয়ে গিয়ে ধরতে হল।

ধরতে হল তখন তিনি ঘনাদাকে প্রায় জাপটে ধরে আবার বসাবার চেষ্টা করছেন

বলে।

"কী, করছেন কী, নবীনবাবু!" সঠিক নামটা ধরেই তাঁকে শাসন করতে হল এবার, "টানাটানি করছেন কেন ওঁর হাত ধরে?"

"বেশ, হাত ছেড়ে দিয়ে পা-ই না-হয় ধরছি," নবীনবাবু তা-ই করতে গিয়ে ঘনাদা সরে যাওয়ার জন্যই বিফল হয়ে বললেন, "আমাদের মনের খোঁচাগুলো উনি শুধু বাড়িয়ে দিয়ে যান। শুধু জিজ্ঞাসাগুলো জানিয়ে উত্তরগুলো চেপে চলে যাওয়াটা কি ওঁর উচিত হচ্ছে?"

"আচ্ছা বলুন, কোন উত্তরটা চান?" ঘনাদাই এবার ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন।

"একটাই তো নয়, অনেক জিজ্ঞাসারই উত্তর চাই," নবীনবাবুই আমাদের সকলের মনের কথাটা জানিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার কী বলে, একটু বসলে ভাল হত না?"

আমাদের সকলকে অবাক করে, লজ্জা দিয়ে নবীনবাবু এবার ঘনাদার মৌরসি কেদারাটাই টেনে তাঁর কাছে এনে পেতে দিলেন।

ঘনাদা কি বিরক্ত? ভেতর থেকে রাগটা কি ফোঁস করে ওঠার উপক্রম করছে?

মুখ দেখে তা অবশ্য বোঝা গেল না। শুধু গলাটা একটু গম্ভীর রেখে ঘনাদা জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, কোন উত্তরটা চান প্রথম?"

"প্রথম?" নবীনবাবু বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন নিজের কর্তব্যটা স্মরণ করে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "বলুন না আপনারাই, প্রথম কোন জবাবটা শুনতে চান?"

"না, না, আপনি বলুন," এ-মজলিশের মেজাজ যিনি শুধরেছেন, তাঁকেই অধিকারটা আমরা সানন্দে দিলাম।

"তা হলে," অনুমতি পেয়ে নবীনবাবু খুশিমুখে বললেন, "ওই যে বিলেতের ওয়েলস-এর কোন খুদে স্টেশনের আটান্ন হরফের এক ঘটোৎকচ-মার্কা নামের বানান শোনালেন, সে-বানান যে ঠিক, তার প্রমাণ কোথায় মিলবে?"

"তার প্রমাণ?" ঘনাদার মুখের ছায়াটা একটু হালকা হচ্ছে কি? "তার প্রমাণ মিলবে বিলেতের স্টাউট নামে পানীয়ের জন্য বিখ্যাত কোম্পানির 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস' নামের বইতে। সেই বই দেখে এক-এক করে আটান্নটা অক্ষর মিলিয়ে দেখতে পারো। আচ্ছা, এ-প্রশ্ন তো হল, তারপর?"

"তারপর? তারপর?" শিশিরই এবার জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, মহিষাসুরের মতো বিরাট আর চামচিকের মতো চিমসে যে দু-জন আপনাকে অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত মধ্যোপসাগরের এক প্রায় অজানা জেলেদের দ্বীপে গিয়ে দেখা পায়, তারা কে, কেনই বা আপনাকেই অত করে খুঁজছিল?"

"কেন খুঁজছিল তা তো আগেই শুনেছ।" ঘনাদার স্বর কি একটু ক্লান্ত?

॥ ৩ ॥

পাছে তিনি ধৈর্য হারান সেই ভয়ে তাঁর মেজাজকে তোয়াজ করার সুরেই বললাম, "আপনি যা বলেছেন তা যে বুঝতে পারিনি, তা ঠিক। জোচ্চোর বাটপাড় ধাপ্পাবাজ হলে তাদের ব্যবস্থা করবার জন্য তো কোর্ট-কাছারি, পুলিশ আর গোয়েন্দাটোয়েন্দা আছে।"

"তা আছে!" ঘনাদা একটু যেন হাসলেন, "কিন্তু পুলিশ-গোয়েন্দারা যখন কূল পায় না, তখনই তো হয় মুশকিল। ওদের হয়েছিল তাই।"

"ব্যাপারটা কী হয়েছিল যদি দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেন," নবীনবাবুর সঙ্গে আমরাও মিনতি জানালাম, "এ তো সাধারণ চুরি-ডাকাতি, তহবিল তছরুপ গোছের কিছু মনে হচ্ছে না, কিন্তু—"

"হ্যাঁ, ওই কিন্তুটাই বড় ভয়ানক," ঘনাদার গলায় একটু উৎসাহের আভাসই পাওয়া গেল এবার, "সাধারণ চুরি-ডাকাতি নয়, কিন্তু আমেরিকা জার্মানি ফ্রান্সের মতো বড়-বড় দেশের শেয়ার মার্কেট মানে ব্যবসার বাজারে যেন ভূমিকম্প লেগেছে। একটা ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ সেখানে শেয়ার বেচাকেনার এমন কারসাজি করেছে যে, তার ফাঁপানো সুদিনের খোয়াব দেখানো ফাঁপানো ফানুস হঠাৎ ফেঁসে গিয়ে একদল লোভী ফাটকাবাজারির একেবারে সর্বনাশ হয়েছে। সেই ফেঁসে-যাওয়া ফাটকাবাজারিরাই এখন দুশমনকে খুঁজছে হন্যে হয়ে। কিন্তু খুঁজলে কী হবে? ক-দিনের জন্য দুনিয়ার বাজারে দেখা দিয়ে প্যাঁচালো বুদ্ধির জোরে ছড়ানো ধাপ্পায় লোভীদেরই বেশি করে ফাঁদে ফেলে যে একেবারে খতম করে দিয়ে গেছে, তার পাত্তা আর কে কোথায় পাচ্ছে?"

"তা হলে?" দ্বিধাভরেই জিজ্ঞেস করলাম আমরা, "সেই ধুরন্ধর ধড়িবাজকে ধরার দায় শেষ পর্যন্ত আর নিলেন না?"

"নেবার ইচ্ছেই তো ছিল না, কিন্তু—" ঘনাদা যেন স্বীকার না করে পারলেন না— "কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরই যে লোভ হল দুনিয়ার ধড়িবাজ চূড়ামণিকে স্বচক্ষে একবার দেখে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। তাই কিংকং-এর ছোট ভাইয়ের হাতের মোচড়ে যেন ককিয়ে উঠেই তার হুকুমটা মেনে নিলাম শুধু একটা শর্তে।

'শর্ত! তোর আবার শর্ত কী রে উচ্চিংড়ে,' দুশমন দানোটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কাজটা হাসিল করলে তোরই পছন্দ মতো হয় ডান নয় বাঁ কানটা ছিঁড়ব। এই একটা শর্ত তুই অবশ্য করতে পারিস বটে!'

'না, অমন অবুঝ হবেন না,' যেন মিনতি করে বলেছিলাম, 'আপনাদের কাজ হাসিল করবার জন্যই এ-শর্তটা আমার রাখা দরকার।'

'বেশি বকবক করিসনি,' ধৈর্য হারিয়ে কিংকং-এর ভাই ছোট কং এবার ধমক দিয়ে বলেছে, 'কী তোর শর্ত বলে ফ্যাল, শুনি।'

'এমন কিছু নয়,' আমি যেন ভয়ে ভয়ে বলেছি, 'শর্ত শুধু এই যে, আমি আপনাদের মক্কেলকে এক বছরের মধ্যে খুঁজে বার করব ঠিক, কিন্তু আমাকে তারপর

আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

'তার মানে?' ছোট কং মানে ঘটোৎকচের দাদা রাগে রক্তচক্ষু হয়ে আমার দিকে চেয়ে এবার গর্জে উঠেছে, 'তুই খুঁজে বার করবি আমাদের ধুরন্ধরকে? আর তার পর তোকে খুঁজতে হবে আমাদের? এ কী উলটো-পালটা রসিকতা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? দেব এবার মুণ্ডুটা সত্যি উলটো দিকে ঘুরিয়ে।'

ছোট কং তখনই আমায় ধরবার জন্য হাত বাড়ায় আরকী!

তার নাগালের বাইরে একটু সরে গিয়ে বললাম, 'মিছিমিছি রাগ করছেন কেন? আপনাদের যা আসল উদ্দেশ্য তার সিদ্ধির জন্যই এ-শর্তটা যে দরকার, তা বুঝতে পারছেন না কেন? আপনাদের মক্কেল তো বলছেন ধড়িবাজ চূড়ামণি। তাকে খুঁজে বার করে সামনাসামনি কোতল করতে গেলে আপনাদের হবে কিছু? যা আপনাদের বিশেষ দরকার, তার সেই গোলমেলে কাজ-কারবার আর লেনদেনের গোপন কাগজপত্র তখন কি আর হাত করতে পারবেন? সে আগেই সব দেবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে। তাই বলছি, আমি এক বছরেরই মধ্যে তাকে খুঁজে বার করবার কড়ার করছি। কিন্তু খুঁজে বার করে আমি শুধু তার ওপর নজর রাখার বেশি আর কিছু করব না। করলে সব কাজ যাবে ভেস্তে! আপনাদেরই তাই তখন আমায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করে আপনাদের সেই ধড়িবাজের সঠিক সন্ধান পেতে হবে।'

ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই বেশ একটু জটিল গোলমেলে করে তাদের কাছে সাজিয়ে ধরেছিলাম। ঠিক মতো কিছু না বুঝলেও নিজেদের গরজে শেষ পর্যন্ত আমার শর্ত মানতে তারা আর আপত্তি করেনি।"

গল্প যেন এখানেই শেষ, ঘনাদা এমনভাবে থেমে যাওয়ায় নবীনবাবুই প্রথম প্রতিবাদ করলেন, "ও কী, থামলেন যে? সেই শুঁটকো চামচিকে আর কিংকং-এর ভাই ছোট কং আপনার শর্ত না হয় মেনে নিল, তাতে হল কী? ধরতে পারলেন সেই ধড়িবাজ চূড়ামণিকে? কোথায় কেমন করে ধরলেন?"

"ধীরে, বন্ধু ধীরে," আমাদেরই এবার নবীনবাবুকে সামলাতে হল, "কোথা দিয়ে কেমন করে কী হল, শুনুনই না একটু ধৈর্য ধরে।"

"ধৈর্য ধরে শুনব?" আমাদের বকুনিতে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে নবীনবাবু বললেন, "কিন্তু শেষ ফলটা না জানলে স্বস্তি পাচ্ছি না যে!"

"ও, আপনি তা হলে তাদেরই একজন, গোয়েন্দা-গল্প পড়তে শুরু করে প্রথমেই শেষ পাতাগুলো উলটে যারা অপরাধীটা কে জেনে নিতে চায়। না মশাই, ওই ধৈর্যটুকু না থাকলে বাহাত্তর নম্বরের মজলিশে বসে আপনি সুখ পাবেন না।"

"কেন?" নবীনবাবু এবার একটু যেন গরম, "এখানে গল্প তৈরি হতে হতে বুঝি বদলেও যায়? আসামি যায় পালটে?'

"না, তা যাবে না!" নবীনবাবুর কথার প্রতিবাদে আমরা কেউ কিছু বলার আগে ঘনাদারই বাজখাঁই গলা শোনা গেল, "বরং শেষ দিক থেকেই শুরু করে উজানে পিছিয়ে যাচ্ছি।"

"উজানে পিছিয়ে যাচ্ছি মানে?" গৌর আমাদের সকলের হয়ে প্রতিবাদ না

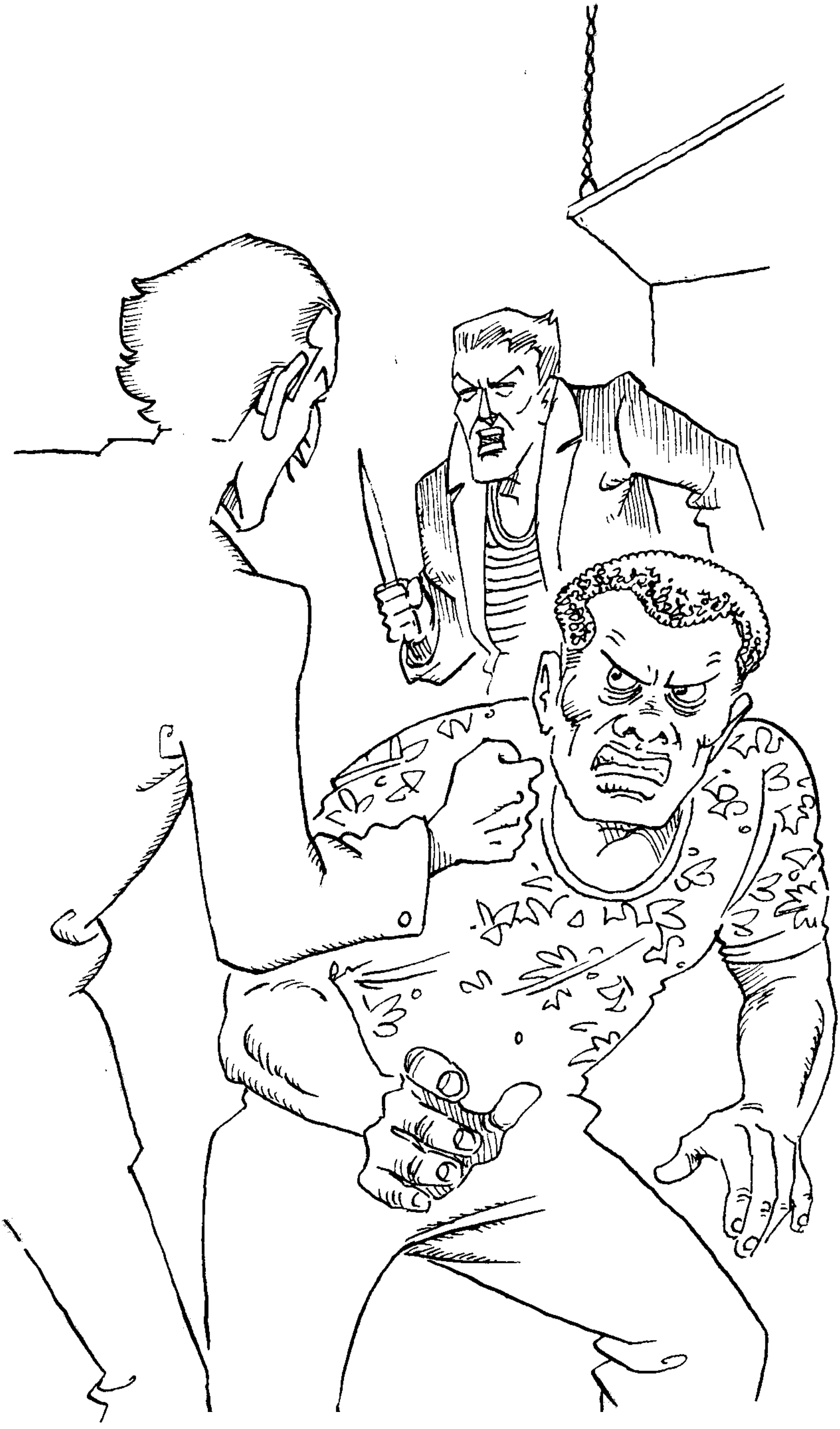

জানিয়ে পারল না, "ঠিক ধারা ধরার বদলে উলটো দিক থেকে শুনে গল্পের সেই আসল মজা আর থাকবে?"

"থাকবে, থাকবে!" আমরা সমস্বরে আশ্বাস দিলাম, "এ একরকম 'বাহবা', বুঝেছ? যেদিক দিয়ে শুরু করো, একই দাঁড়ায়।"

আমাদের যুক্তিটা জোরালো না হলেও সমর্থনটায় ঘনাদা অখুশি হলেন না বলেই মনে হল। প্রসন্ন মুখেই বললেন, "তারপর ঠিক এক বছর কোনও সাড়াশব্দ আর করিনি। ঠিক বার-তারিখ ধরে একটি বছর শেষ হবার পর ছোট কং আর তার চিমসে সঙ্গী একটা চিঠি পেয়েই নিশ্চয়ই একেবারে হতভম্ব। আমাদের মতো আঠারো মাসে বছরের দেশ নয়, খাস মার্কিন মুলুকের রাজধানী ওয়াশিংটন শহরের লাগাও মেরিল্যান্ড-এ একটা পাঁচতারা হোটেল। ডাকে চিঠি দিলে সেখানে মারা যাবার কি বিলি হতে দেরি হবার কোনও ভয় না থাকলেও নিজের হাতে হোটেলের চিঠির বাক্সে আমার দুই মুরুব্বির নামের চিঠিটা ফেলেছি।

ভোরবেলা 'জরুরি' ছাপ দেওয়া চিঠিটা ফেলেছি, সুতরাং ব্রেকফাস্টের সময়েই সে চিঠি তাদের হাতে পৌঁছেছে নিশ্চয়ই। খাম খুলে সে চিঠি পড়তে পড়তে আর সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে দুজনের মুখের অবস্থা কী হয়েছে দেখতে না পেলেও অনুমান বোধহয় ঠিকই করতে পেরেছি।

চিঠিটার ভাষা ছিল:

মনিব বাহাদুর, ছোট কং ও চিমসে চামচিকে মহোদয়,

দেখতে দেখতে এক বছর তো হয়ে গেল। আমার কাজ তো আমি ঠিক মতো শেষ করছি, কিন্তু এখনও আপনাদের দেখা নেই কেন? কথা ছিল আমি এক বছরে আমার কাজ সারব, আর আপনারাও তখন আমায় খুঁজে নেবেন। আপনাদের শ্রীমুখ এখনও পর্যন্ত একবারও না দেখে মনে হচ্ছে, এখনও আমার সঠিক পাত্তা আপনারা পাননি। তা হোক, হতাশ না হয়ে চেষ্টা করে যান। অধ্যবসায়ে সব কিছু সম্ভব।

ইতি বশংবদ ঘনশ্যাম

এ-চিঠির পরে আবার একটু 'পুনঃ' দিয়ে লেখা:

আপনাদের ধুরন্ধর ধড়িবাজ মক্কেলকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করবার একটা হদিস এখানে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, আপনারা যাকে খুঁজছেন, সেই মক্কেল এক পাকা জাত-জুয়াড়ি। মাছের আঁশটে গন্ধ যার ধ্যানজ্ঞান, সেই বেড়ালকে যেমন মাছ কোটার হেঁশেলে, তেমনই রক্তে যার জুয়ার নেশা তেমন পাকা জাত-জুয়াড়িকে কোথায় পাওয়া যায়, একটু ভেবে দেখুন না। হ্যাঁ, স্যার, একটা কথা, আপনাদের ধড়িবাজ চূড়ামণি পাকা জাত-জুয়াড়ি, ইতিমধ্যে এই মেরিল্যান্ড-এর এক হাসপাতালে একরাশ ডলার এই কিছুদিন হল দান করেছে। এ খবরটা যাচাই করে নেবেন। ধড়িবাজ চূড়ামণিকে কিন্তু খুঁজে যান।

তা খুঁজতে তারা কি আর কিছু বাকি রেখেছে?

কিন্তু এরপর তাদের অবস্থা যা হল তা আরও করুণ ছাড়া আর কী বলা যায়!

মেরিল্যান্ড-এর হোটেলে যে চিঠি পেয়েছিল তাতে গায়ের জ্বালায় ছটফট করে তারা অ্যাটলান্টিকের এপার-ওপার হয়ে তখন মন্টিকার্লোয় এসে একটা ভিলা-বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে।

মন্টিকার্লো নামটা উচ্চারণ করবার পর আর বোধহয় কোনও বিবরণ দিতে হয় না। হ্যাঁ, ফ্রান্সের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে দুনিয়ার সেই জুয়াড়িদের অমরাবতী মন্টিকার্লো। ভাগ্যের রুলেট চাকা সেখানে এক-এক চক্করে দু-দশ লাখ নয়, অমন কোটি কোটি টাকার বরাত ঘুরিয়ে আনে কি উড়িয়ে দেয়।

ছোট কং আর তার চিমসে দাদা সেখানে ক-দিন হল এসে সমুদ্রের তীরে রিভিয়েরায় একটা স্বর্গপুরীর মতো ভিলা ভাড়া করে আছে।

আছে মানে ভিলায় নয়, ঠিকানাটা তাই রেখে সারা দিন-রাত তারা সব জুয়ার ঘাঁটি ক্যাসিনো থেকে ক্যাসিনো ঘুরে তাদের মক্কেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর আগে মেরিল্যান্ড-এ পাওয়া চিঠিটায় উচ্চিংড়ে সেই দাসটা লিখেছিল সারা দুনিয়ার ফাটকা বাজারে যে ধড়িবাজ সব বাঘা বাঘা কারবারি আর দালালদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, সে যে আসলে একজন জুয়াড়ি, সে কথা মনে রাখতে। সে কথা মনে রাখলে সেই ধড়িবাজকে দাতব্য লটারির মজলিশে খোঁজার কোনও মানে হয় না নিশ্চয়।

কথাটা মনে ধরেছিল বলেই কং আর তার শুঁটকো সঙ্গী এদিক-ওদিক একটু ঘুরেফিরে এই মন্টিকার্লোয় এসে উঠেছে। জুয়াড়ির এমন স্বর্গ আর কোথায় আছে দুনিয়ায়!

কিন্তু কই! এখানে আসা অবধি সারা দিনরাত সব ক-টা ক্যাসিনোতে পালা করে সারাক্ষণ ধরনা দিয়েও সেই ধড়িবাজের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেল না।

সে ধড়িবাজের দেখা পাওয়ার বদলে পেল সেই গায়ে জ্বালা-ধরানো চিঠিটা।

চিঠিটা সেই শুঁটকো উচ্চিংড়ে দাসটার।

দাস লিখেছে:

আরে ছ্যা ছ্যা। তোমরা যে এমন নিরেট আহাম্মক তা ভাবতেই পারিনি। সমস্ত দুনিয়ার কারবারের চাকা স্রেফ বুদ্ধির প্যাঁচে যে উলটে-পালটে যেমন খুশি ঘুরিয়ে দিয়ে সিসের গাদ থেকে সোনার তাল বানিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে এসেছ জুয়োর চাকতিতে, ভাগ্য ফেরাবার ছেলেখেলা যেখানে হয় সেইসব ক্যাসিনোয় রুলেটের টেবিলে গাওস্কর তার হাতের মার ঠিক রাখতে গেছে ডাংগুলি খেলতে? না হে, উজবুকরা, তা নয়। যাকে তোমরা খুঁজছ রুলেটের জুয়ায় হাত নোংরা করবার মানুষ সে নয়। মন্টিকার্লো কি তোমরা এর আগে যেখানে খোঁজ করে এসেছ, সেই লাসভেগাস-এর দশ-বিশ লাখ ডলার লাভে তার লোভই নেই। সাগর হেন পাঁচ-দশটা দিঘি যে বাগিয়েছে, দুটো পাতকোর জন্য হ্যাংলামি সে করবে কেন? তার

আবার দানের কথা শুনেছি, আর ক-টা নতুন দানের কথা শোনো। ইউরোপে যেমন তেমনই আফ্রিকাতেও দু-দুটো নতুন বিরাট হাসপাতাল বসাবার সমস্ত খরচ সে দেবার ব্যবস্থা করেছে। যা গচ্চা দিয়ে তোমরা হন্যে হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছোটাছুটি করছ, তোমাদের সেই লোকসানের টাকা দিয়েই সে এ সব দানধ্যান যে করছে, তা বুঝতে পেরে তোমরা যে দাঁত-কিড়মিড় করছ, তা টের পাচ্ছি। কিন্তু উপায় তো নেই। তোমাদের নাক-কান যে এমন করে মলে দিয়েছে, তার হদিস পেতে হলে বড়ের চালে যেখানে কিস্তিমাতের খেলার কেরামতি দেখা যায়, সেখানে যেতে হবে। তোমাদের ওই ফাটকাবাজারি বুদ্ধি নিয়ে শুধু নিজেদের চেষ্টায় সেখানে পৌঁছবার আশা অবশ্য কম। তবু চেষ্টা করে যাও, করে যাও চেষ্টা।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে ছোট কং আর তার শুঁটকো সঙ্গীর চেহারা যা হয়েছিল, তা যে এঁকে রাখবার মতো তা নিশ্চয়ই বলতে হবে না। একজন যেন মাটিতে পোঁতা মাইন, আর অন্যজন, যাকে ক্ষেপণাস্ত্র বলে, সেই মিসাইল।

চিঠিটা যখন তারা পেয়েছে তখন নিজেদের শিকার খুঁজতে একটা ক্যাসিনোর মধ্যে বসে নজর রাখছিল বলেই কোনওরকমে নিজেদের সামলে তারা আগুনের হলকার মতো রুলেট-টেবিল ছেড়ে ক্যাসিনোর বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

এইমাত্র চিঠিটা একজন বেয়ারার হাতে তাদের কাছে পৌঁছেছে। বেয়ারাকে খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। কিন্তু খুব ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরা অজানা এক ভদ্রলোক দূর থেকে তাদের দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে জরুরি চিঠিটা তাদের দেবার নির্দেশ দিয়ে চলে গেছে। এর বেশি সে বেয়ারা আর কিছু হদিস দিতে পারেনি।

রীতিমত ফ্যাশনদুরস্ত দামি পোশাকের ভদ্রলোক যে চিঠিটা যথাস্থানে দেবার জন্য মোটা বকশিসও দিয়ে গেছে, বেয়ারা শেষ পর্যন্ত তা স্বীকার না করে পারেনি।

কিন্তু চিঠি দিয়ে লোকটা গেল কোথায়? ক্যাসিনোর মধ্যে সে ঢোকেনি, ক্যাসিনোর বাইরেও তার কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। সেখানকার ক্যাসিনোর বাহারে উর্দিপরা নেহাত শোভা হিসেবে বসিয়ে রাখা এক দ্বারপাল তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে বলা যায়। আর এ সব ক্যাসিনোতে যেমন থাকে, তেমনই দু-একজন হাড়হাভাতে ফতুর-হওয়া জুয়াড়ি, ভাগ্যের কৃপায় মোটা দাঁওটা যারা মেরেছে, এমন কারও কাছে নানা ছুতোয় কিছু ভিক্ষে পাবার আশায় ঘোরাঘুরি করছে।

ছোট কং আর তার সঙ্গী ক্যাসিনোর বাইরে বেরিয়ে আসতেই তেমনই একজনের পাল্লায় পড়ে।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটা চোখ কালো ঠুলিতে ঢাকা, পকেট আর বোতাম-ঘর ছেঁড়া একটা ওভারকোট কাঁধে ঝোলানো লোকটা ছোট কং আর তার সঙ্গীর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল। তারা বাইরে আসতেই তাদের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাকুলভাবে বলে, 'শুধু একটা ফ্রাঁ মঁসিয়ে, শুধু একটা ফ্রাঁ ঢাকা

দিয়ে বরাতের চাকা একেবারে ঘুরিয়ে দেব দেখুন।'

ছোট কং আর তার সঙ্গী রাগে বিরক্তিতে তাকে ঠেলে দিয়ে যত সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করে, সে নাছোড়বান্দা হয়ে ততই তাদের প্রায় জড়িয়ে ধরে থামাবার চেষ্টা করে বলে, 'দোহাই আপনাদের, লাখে একজনের ভাগ্যে একবারই যা কখনও আসে, এমন করে সেই আশীর্বাদ পায়ে ঠেলবেন না। শুনুন, শুনুন, আজ এই বিকেল ঠিক চারটের পর তিনের পড়তার দিন। হ্যাঁ, লাল চৌকো আর তিনের নামতার পড়তা চলবে। সারা রাত জেগে দিনক্ষণের জ্যোতিষী হিসেব কষে আমি দেখেছি। একটা ফ্রাঁ দিয়ে শুরু করতে পারল আমি ক্যাসিনোর গোটা জুয়ার ব্যাঙ্ক ফেল করিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম। শুধু একটা ফ্রাঁ পেলে—যা আমার নেই—'

মন্টিকার্লোর মতো বড় বড় জুয়াড়িদের সাধের শহরে এরকম পাগল নানা আস্তানায় প্রায়ই দেখা যায়। জুয়ার নেশায় সর্বস্ব খুইয়ে তারা আবার জ্যোতিষ গণনায় নির্ভুল লাভের ছক বার করবার স্বপ্ন দ্যাখে। আইনের শাসন আর পুলিশের চোখ এড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় এমনই করে।

ছোট কং আর তার সঙ্গী নাছোড়বান্দা ভিখিরিটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলেই শেষ পর্যন্ত ক্যাসিনোর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, কে তাদের চিঠিটা পাঠিয়েছে তা জানবার আশায়।

কিন্তু শান্ত নির্জন দুনিয়ার কুবের হেন ধনীদের জুয়ার নেশা মেটাবার অমরাবতীর মতো শহরের বাইরে তখন দক্ষিণের উপসাগর থেকে মধুর সমুদ্রের হাওয়া বইছে। দূরে-দূরে ক্যাসিনোগুলোর বাহারি আলোর মালা এক এক করে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

রাগে দাঁত ঘষতে ঘষতে দুই দুশমন আবার ক্যাসিনোর দিকেই ফিরতে গিয়ে দ্যাখে, সেই গাঁয়ে ছেঁড়াখোঁড়া ওভারকোট ঝোলানো নাছোড়বান্দা ভিখিরিটা একটু যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের দিকেই আসছে।

ছোট কং তখন রাগে প্রায় বুঝি ফেটেই পড়ে। 'খবরদার বলছি গিরগিটিটা,' একটু থেমে বুনো বরার মতো ঘোঁতঘোঁতিয়ে সে বললে, 'আর এক পা যদি এদিকে আসিস তা হলে তোর পলকা শিরদাঁড়াটাই মটকে দেব। সত্যি ভেঙে দেব।'

লোকটা ভয় পেয়েই নিশ্চয়ই অতদূর এসেছিল। তারপর আর না এগিয়ে যেন হতাশ হয়ে বললে, 'আমায় একটা ফ্রাঁ দিয়ে বরাত ফেরাবার মওকা তো দিলে না। তা না দাও, তবু তোমাদেরই বরাত ফিরুক। এই কাগজটায় আজকের জ্যোতিষের গণনায় পড়তার নম্বর কী, তা লিখে কষে দেওয়া আছে। তোমরাই একটু গা ঘামিয়ে ভাগ্যের চাকাটা ঘোরাতে পারো কি না দ্যাখো।'

লোকটা দূর থেকে একটা কাগজের পাকানো ডেলা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ছোট কং রাগে সেটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিঁড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সিড়িঙ্গে সঙ্গী তার আগেই কাগজের ডেলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

‘ওটা তুমি কুড়িয়ে নিলে ডুগানচাচা? তোমার ঘেন্না হল না?’ ছোট কং প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বললে।

‘না, ঘেন্না হবে কেন?’ হেসে জবাব দিলে ছোট কং-এর সিড়িঙ্গে সঙ্গী ডুগান, ‘কাগজের ডেলাটা তো আর পকেটে কামড়াচ্ছে না?’”

॥ ৪ ॥

ঘনাদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প:

“পকেটে না কামড়াক, সেই নাছোড়বান্দা ভিখিরির ছুঁড়ে দেওয়া কাগজের ডেলাটা অমন লজ্জা আর অপমানের জলবিছুটির জ্বালা যে সারা শরীরে ধরাবে, তা কি ওরা জানত! আসল নামগুলো যখন জানাই হয়ে গেছে, তখন তা-ই ব্যবহার করে বলি, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা-মার্কা কার্ভালো তা ভাবতেই পারেনি।

ক্যাসিনোর বাইরে থেকে বৃথাই ঘুরে এসে নিজেদের রুলেটের মজলিশে গিয়ে বসবার আগে পকেটে রাখা কাগজটা খুলে বার করে পড়তে গিয়ে দুজনের চোখ প্রায় ছানাবড়া।

এ কার চিঠি! কী নিয়ে চিঠি?

না, এ চিঠি জুয়ায় ফতুর হওয়া কোনও হেরো ভিখিরির নয়, যাকে কুচিকুচি করে কেটে গায়ের জ্বালা যায় না, সেই উচ্চিংড়ে দাসের।

দাস লিখেছে,:

চিনতে পারলে না তো? ওভার কোটটা শুধু উলটে পরে, মাথায় একটা লাল ব্যান্ডেজ বেঁধে, একটা চোখ একটা ঠুলিতে ঢেকেছিলাম। তাতেই অমন বোকা বনার পর দুনিয়ার ফাটকাবাজার ফাটানো সেই ধড়িবাজ চূড়ামণিকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে, এ আশা আর করতে পারি? অন্য সব কথা বলার আগে আমার ওভারকোটটার কথাই বলে দিই। ওটি সরল সোজা ছদ্মবেশ। ওর এক দিকটা ছেঁড়াখোঁড়াময়লা একটা ওভারকোটের যেন শেষ অবস্থা। ওভারকোটটা ওলটালেই অন্য দিক কিন্তু একেবারে হাল ফ্যাশনের ঝকঝকে তকতকে নতুন সাজ। উলটো দিকটা বাইরে রেখে পরে ক্যাসিনোর বেয়ারাকে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিঠিটা দিয়েছিলাম। তারপর বাইরে আসবার আগেই একটা বাথরুমে ঢুকে মাথায় মিথ্যে ব্যান্ডেজ বেঁধে আর চোখে ঠুলি লাগিয়ে ওভারকোটটা উলটে পরে এসেছিলাম। যাই হোক, তোমাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যাকে খুঁজছ, সত্যিই যদি তার হদিস পেতে চাও, কাল দিনের প্রথম ফ্লাইটে এখান থেকে বিলেতের হিথরোতে গিয়ে নামবে। তারপর কী করতে হবে, সেখানকার এয়ারপোর্ট থেকে উড়োজাহাজ কোম্পানির বাস-এ তাদের শহরের আস্তানা মানে সিটি অফিসে গিয়ে পৌঁছবার আগেই তার হদিস পাবে নিশ্চয়।

হদিস তারা যা পেয়েছিল, তাতে তাদের নিরেট মাথা দুটো ঠুকে দেওয়াই উচিত ছিল। তবু তা না করে ধৈর্য ধরে তাদের বলেছিলাম, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা দুনিয়ার এক ধড়িবাজ চূড়ামণিকে ধরার আশা রাখো? হিথরোতে নেমে তোমরা শেষ পর্যন্ত এই ঘোড়দৌড়ের মাঠে এলে তার খোঁজে? আগে দুনিয়ার সেরা সব জুয়ার আড্ডায় তাকে খুঁজেছ, তারপর এই বিলেতে এসে নেমে এলে কিনা ঘোড়দৌড়ের মাঠে!'

'মানে—,' ছোট কং অর্থাৎ আসলে গোরিলা কার্ভালোর শুঁটকো সঙ্গী ডুগান একটু বুঝি লজ্জিত হয়েই বলেছিল, 'আমরা ভাবলাম যে, আজ বিলেতে দুনিয়ার সেরা ঘোড়দৌড় ডার্বির খেলা হচ্ছে, তাই সে ধড়িবাজটা—'

'থামো,' ধমক দিয়েই বলেছিলাম, 'তোমরা যাদের সঙ্গে কারবার করো, এ সেই হেঁজিপেঁজি ধড়িবাজ নয়, এত দিনেও তা বোঝোনি! টাকা রোজগারটা এদের মতো মানুষের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। কারবারে দুনিয়ায় এদিকে ওদিকে ক-টা প্যাঁচ কষে এরা যখন যত খুশি মুনাফা লুটতে পারে বললেই হয়। যাকে তোমরা খুঁজছ, সেই ধুরন্ধরের আবার টাকায় লোভ নেই বললেই হয়। তার আগের দুটো দাতব্যের কথা তোমরা আগেই শুনেছ, এখন জেনে রাখো, মন্টিকার্লো থেকে ছেড়ে আসবার আগে সেখানেই সে একটা বড় ক্যানসার হাসপাতালের জন্য মোটা সাহায্যর টাকা দিয়ে এসেছে। না, টাকার কুমির হওয়া নয়, এ মানুষের নেশা হচ্ছে মানুষের জীবন আর জগতের যে সব ব্যাপার আজও পরম ধাঁধা হয়ে আছে, বুদ্ধি দিয়ে তাদের রহস্য ভেদ করা। মহাভারতের যুগে জন্মালে এ মানুষ অর্জুনের সঙ্গে দ্রুপদরাজের লক্ষ্যভেদের বাহাদুরির খেলায় পাল্লা দিত। গাণ্ডিবীকে লজ্জা-দেওয়া সেই মানুষকে তোমরা খুঁজতে এসেছ এই এপসম ডাউনস-এ?'

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ঘোড়দৌড় ডার্বি খেলার মাঠ এপসম ডাউনস-এর মধ্যে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। হিথরোতে প্লেন থেকে নেমে তারা আর কোথাও নয়, এই বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠেই প্রায় ছুটে আসবে, তা বুঝে এখানে এসেই দুই মূর্তিমানকে ধরেছিলাম। তাদের বুদ্ধির দৌড়ে আর একবার ধিক্কার দিয়ে সেই কথাই আর একবার বললাম, 'মন্টিকার্লো থেকে বিলেতের হিথরোতে এসে নেমে লন্ডন শহর পর্যন্ত আসার পথে এই ডার্বির ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া আর কোনও কিছুর কথা তোমাদের মনে পড়ল না? ওই নিরেট দুটো মাথার ঘিলুতে আর কোনও ভাবনা একটু নাড়া দিল না?'

'না, দিল না!' এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক বাক্য সয়ে ছোট কং, বা তার আসল যা নাম তাই ধরে বলি, গোরিলা কার্ভালো খেপে গেছে বললেই হয়। ডার্বি-দৌড়ের দিন এপসম ডাউনস-এর সেই মাঠ-ভর্তি দিনমজুর থেকে লাট-বেলাট, বড়লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার একটা হাত ধরে মোচড় দিয়ে প্রায় ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করে বললে, 'আমরাই যদি ভাবব, তা হলে তোকে হুকুম দিয়ে কাজে লাগিয়েছি কেন? নে, খুঁজে বার কর তোর সেই মক্কেলকে। নইলে তোর দুটো হাত আর মাথাটা এখানেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাব। কী? বুঝলি, যা বললাম? এক্ষুনি বার কর তোর মক্কেলকে।'

'এক্ষুনি বার করতে হবে?' যেন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, 'কিন্তু তা হলে এ জায়গা ছেড়ে একটু যেতে হবে যে!'

'যেতে হবে?' ছোট্ট কং মানে গোরিলা কার্ভালো আগুনের হলকা বার-করা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায়?'

'বেশি দূরে নয়,' যেন ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'এই ওয়াটার্লু স্টেশনে।'

'ওয়াটার্লু স্টেশনে!' শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো দু-জনেরই গরম গলায় এবার খিঁচুনি শোনা গেল, 'রসিকতা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে?'

তারপর ছোট কংই আলাপের মওড়া নিয়ে বললে, 'জিভটা ছিঁড়ে নেব, এইটা মনে রেখে যা বলবার বলবি। কোথাও এতদিনে যার খোঁজ মেলেনি, ওই ওয়াটার্লু স্টেশনে গেলেই তার দেখা মিলবে? সে আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করে বসে আছে?'

'তা কি আর আছে!' সবিনয়ে স্বীকার করলাম। 'তবে তাকে খুঁজে বার করতে হলে ওই ওয়াটার্লু স্টেশনে যাওয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'তা ছাড়া উপায় দেখছিস না!' ছোট কং মানে গোরিলা কার্ভালো তার মুঠো করা ডান হাতটার রদ্দাটা আমার বাঁ কানের ওপর চালাবে কি না, তক্ষুনি ঠিক করতে না পেরে কী ভেবে নিজেকে তখনকার মতো সামলে বললে, 'বেশ, তোর ওয়াটার্লু স্টেশনেই চল। সেখানে আজ তোর এসপার কি ওসপার, এইটে শুধু মনে রাখিস।'

মনে আর কী রাখব? দুই বুনো মক্কেলকে বেশ একটু ভুলিয়ে ভালিয়েই সেদিন ওয়াটার্লু থেকে উত্তর স্কটল্যান্ডের একটা গাড়িতে তুলতে হল।

এর আগে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে ওয়াটার্লু আসবার পথেই ট্যাক্সিতে দুই মক্কেলকে কিছুটা নরম করতে পেরেছিলাম। নরম আর কিছুতে নয়, স্রেফ মোটা দাঁও-এর লোভ দেখিয়ে। 'তোমরা ফাটকাবাজারের লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্য দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ, আর সে মানুষটা অত লাভের পড়তা হেলায় অগ্রাহ্য করে দানধ্যান করেই সব বিলোতে বিলোতে অন্য কী এক ধান্দায় উধাও হয়ে গেছে! তার মানে কী? সে ধান্দায় এমন দারুণ কিছু লাভ নিশ্চয়ই আছে, যা আমাদের কল্পনাতেই নেই। সুতরাং সে মানুষটাকে খুঁজে বার করে তার এখনকার ধান্দাটা জানাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো মুখ গোমড়া করে রাখলেও আমার কথাগুলো একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দুনিয়ার কারবারি লেনদেনের বাজার নিয়ে যে এমন অনায়াসে ছিনিমিনি খেলে যখন খুশি লাভের পুঁজির পাহাড় জমিয়ে ফেলতে পারে, সে কোন লোভে এ সুখের স্বপ্ন ছেড়ে কোন অজানা ধান্দায় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়?

সে ধান্দাটা কী, তা জানবার আগ্রহটা আমার দুই বুনো মক্কেলের মধ্যে জাগিয়ে তুললেও স্টেশন থেকে তাদের বিলেতের হিসেবে দূরপাল্লার গাড়িটায় তুলতে একটু বেগই পেতে হয়েছে।

এপসম ডাউনস থেকে ওয়াটার্লু স্টেশনের নাম করে বার হলেও রাস্তায় একটু যেন লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করেছিলাম যে, বিলেতের রেল-স্টেশনের খবর আমার

তেমন জানা নেই। তাই ঠিক ওয়াটার্লু স্টেশনে গেলেই কাজ হাসিল হবে কি না বলতে পারছি না। তবে ওয়াটার্লু না হোক, বড় গোছের একটা স্টেশনে গেলে চলবে।

'যে-কোনও বড়গোছের স্টেশন হলেই চলবে?' শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো বেশ একটু সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

'হ্যাঁ, যে-কোনও, মানে—একটু বড়গোছের স্টেশন হলে নিশ্চয়', এমনিভাবে এলোমেলো খানিক বকুনি দিয়ে দুই মক্কেলকে তখনকার মতো ঠাণ্ডা করলেও সত্যিকার কাজটা হাসিল করবার জন্য যে প্যাঁচটা কষলাম, সেটা কাজে না লাগলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেত মাটি হয়ে।

তা যে হয়নি তার কারণ গোরিলা কার্ভালো আর শুঁটকো ডুগানের মতো মক্কেলদের মেজাজ-মরজির মারপ্যাঁচ কষে নিতে আমার ভুল হয়নি।

একটার জায়গায় দুটো বড় স্টেশনে এফোঁড় ওফোঁড় যেন খোঁজাখুঁজি করে আমি তখন আমার দুই মক্কেলকে একেবারে খাপ্পা করে তুলেছি।

'কই, কোথায় তোর শিকার?' স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপরই যেন আমার ধড়মুণ্ডু ছিঁড়ে আলাদা করে দেবে এমনই হিংস্র চাপা গলায় গোরিলা কার্ভালো তার হিংস্র চোখ দুটো দিয়ে আমায় যেন খুবলেছে।

'এই যে! এই যে! এক্ষুনি ধরে দিচ্ছি,' আমি যেন ভয়ে ভয়ে বলেছি, 'একটু শুধু ধৈর্য ধরো।'

আর বেশি ধৈর্য ধরবার অবশ্য দরকার হয়নি। এক থেকে আর-এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব্যস্তভাবে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক যা চাইছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি।

যে প্ল্যাটফর্মে তখন এসে দাঁড়িয়েছি, বরাত-জোরে নিশ্চয় দূরপাল্লার ট্রেনটা তখন সবে তা থেকে ছাড়তে যাচ্ছে। একেবারে খালি একটা ডিল্যুক্স কামরা থেমেছে ঠিক আমাদেরই সামনে।

আমার মাথায় মতলবটা খেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা লম্বা হুইসল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর যা করবার তাতে এতটুকু ভুল আমার হয়নি। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে কামরার ভেতরে উঠে পড়ে আমি দরজা থেকে পাশের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেছি, 'টা-টা বন্ধুরা, টা-টা! আশা করি আবার—'

কথাটা শেষ করতে কিন্তু পারিনি উদ্বেগে উত্তেজনায়। কী করবে এবার দুই মূর্তিমান । রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও উজবুকের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে ছুটন্ত ট্রেনে আমায় সরে পড়তে দেবে?

তা যদি দেয় না, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মতো মূর্তিমানদের মরজি-মেজাজের মারপ্যাঁচ কষতে আমার ভুল হয়নি।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে দরজা থেকে একটা জানলার কাছে এসে আমার মুখ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই রাগে একেবারে আগুন হয়ে পড়ি কি মরি করে দুজনেই ছুটে এসে পর পর দরজার হাতলটা ধরে ফেলে ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল।

দুজনেই এরপর ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে। গোরিলা কার্ভালোর চেয়ে শুঁটকো

ডুগানের রাগটা একটু বেশি। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বার করে সে তার ফলাটা যে রকম উৎসাহের সঙ্গে খুলতে যাচ্ছিল তাতে তার কনুইয়ে সামান্য একটু টোকা দিয়ে হাতটা অবশ করে ছুরিটা মেঝেতে ছিটকে ফেলতে হল। গোরিলা কার্ভালো তখন প্রায় আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটু কাত হয়ে সরে গিয়ে তাকে একধারের আসনের ওপর গড়িয়ে পড়তে দিয়ে মাথার মাঝখানে দু আঙুলের একটা টোকা দিয়ে বললাম, 'একেবারে কংক্রিট মনে হচ্ছে রে!'

গোরিলা কার্ভালো চাঁদির ঠিক মাঝখানে সেই টোকা খেয়ে চোখের তারা উলটে একটা বার্থের ওপর বসে পড়বার পর কামরার মেঝে থেকে ডুগানের ছুরিটা তুলে নিয়ে ফলা মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললাম, 'লড়াইটড়াই যা হবার খুব হয়েছে। এবার যে-জন্য এই প্যাঁচ করে তোমাদের এ গাড়িতে তুলেছি, সেই বৃত্তান্তটা শোনো। যে বাদশাহি আরামের ডিল্যুক্স কামরায় আমরা বসে আছি, এ-কামরা কাল ভোরের আগে আর কেউ খুলবে না। এই কামরাকে যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই ট্রেনটাও তখন এদেশের উত্তরের এক শহরে গিয়ে থামবে। তোমরা যা খুঁজছ, আর আমি যা যতটা উদ্ধার করেছি, সেইসব রহস্যের ইতিহাস-ভূগোল যা জানবার, সেখানেই জানা যাবে। তোমাদের হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে বিমানবন্দর থেকে খাস শহরে আসার পথেই তোমাদের এপসম ডাউনস-এর হাতছানির বদলে আমি এই আসল রহস্যের হদিস পাই। সেই হদিস পেয়ে এই লাইনেরই এইরকম এক ট্রেনে আমি যেখানে গেছি, যা যা দেখেছি, জেনেছি ও শেষ পর্যন্ত যে-রহস্যের সন্ধান পেয়েছি, তা-ই তোমাদের এখন শোনাব। যে ট্রেনে আমরা উঠেছি, একটানা সারারাত গিয়ে কাল ভোরে যেখানে তা থামবে, সেইটিই আমাদের গন্তব্যস্থান। শুধু তোমরা যা খুঁজছ, তার জন্য নয়, আজকের দুনিয়ার এক অতল রহস্যের সন্ধান করতে হলে ওখানেই যেতে হবে। আশ্চর্যের কথা এই যে, বিলেতের হিথরো বিমানবন্দরে নামবার পর শহরে আসতে আসতে এই রহস্যের হাতছানি তোমাদের প্রথম থেকেই অস্থির করে তোলেনি। বিদেশের যে-কোনও জায়গা থেকে বিলেতে প্রথম পা দেবার পর ওই একটি রহস্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে বেসামাল না হয়ে তো উপায় নেই। যেদিকে যাও, যেখানে যাও, ওই এক রহস্য হাজার ছুতোয় তোমাকে হাতছানি দেবেই। এমন হাতছানি, যার টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব বললেই হয়। হ্যাঁ, নেসি-র রহস্যের কথা বলছি। স্কটল্যান্ডের উত্তরে লকনেস নামে সেই আশ্চর্য হ্রদের কথা, যার রহস্যকে কেন্দ্র করে একটা গোটা মহাভারতের মতো নবপুরাণ, আর হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে বই কাগজ খেলনা ছবি খাদ্য-পানীয়ের ফলাও এক রাশ ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে।'

সব রহস্যের যা মূল সেই নেসি এখনও পুরোপুরি একটা অজানা ধাঁধা হয়ে আছে বললেই হয়। কিন্তু বিলেতে উত্তর স্কটল্যান্ডের একটা সাধারণ শহরকে তা বিশ্বের ভূগোলে জায়গা করে দিয়েছে। সেই শহরের নাম ইনভারনেস, আর সেই শহরের কাছে মাইল চল্লিশ লম্বা যে পাহাড়ি হ্রদটির হাজার দশেক বছর আগে প্রথম উদ্ভব হয় বলে ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, সেই পাহাড়ি হ্রদের একটি অতল রহস্য এখনও তার ব্যাখ্যা খুঁজছে।

'এ-ট্রেনের এই শৌখিন কামরায় সারারাত যেতে যেতে উত্তর স্কটল্যান্ডের সেই ইনভারনেস শহর থেকে শুরু করে আমার সমস্ত বিবরণটা আমি দিয়ে যাব।' কার্ভালো আর ডুগানকে বললাম, 'শুনতে শুনতে যদি ঘুম আসে তো ঘুমিয়ে পড়তে পারো। আমার তাতে আপত্তি নেই। শুধু বেয়াড়াপনা করার কিছু চেষ্টা করলে তোমাদের মধ্যে বয়সে বড় বলে শুঁটকো ডুগানকে কনুইয়ের দু-হাড়ে একটু করে টুসকি দিয়ে সারা অঙ্গ অসাড় করা রামঝিঝি ধরিয়ে দেব আর কার্ভালো, আমি তোমার নাম দিয়েছি ছোট কং। তোমার মাথার চাঁদিতে রামগাঁট্টা দিয়ে চোখ দুটো জমিয়ে ছানাবড়া করে রেখে দেব সেই সকাল অবধি। সকালেই আমরা ইনভারনেস গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আশা করি তার আগে আমার গল্প বলার মধ্যে গল্পটা থামাবার মতো বেয়াদবি করার কুবুদ্ধি তোমাদের দুজনের কারও হবে না।

যে শহরে আমরা নামতে যাচ্ছি, সেই ইনভারনেস দিয়েই আমার যা বলবার শুরু করি। মার্কামারা স্কটিশ শহর ইনভারনেস। সেইরকম সওয়ারি ঘোড়া আর ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালাবার সুবিধের জন্য পাথরের নুড়ি বসিয়ে বাঁধানো সামান্য চওড়া সব রাস্তা, আর বেশির ভাগ সেকেলে একতলা দোতলা বাড়ি। পুরনো শহর।

বিলেত বলতে আমরা এখন যা বুঝি, একসঙ্গে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডে, ওয়েলস মেলানো সেই গ্রেটব্রিটেন তো চিরকাল ছিল না। এই সেদিনও তাদের এ রাজ্যে ও রাজ্যে বিশেষ করে ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ডের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি-লড়াইয়ের শেষ ছিল না। সেইরকম লড়াইয়ে বলতে গেলে এই সেদিন, মানে এই ১৭৪৬ সালে এই ইনভারনেস শহরেই স্কটরা ইংরেজদের সবচেয়ে বড় পরাজয়ের লজ্জা দেয়।

ইনভারনেসের নামডাক কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে ছড়ানো শুরু হয়েছে। নামটা ছড়িয়েছে নুড়ি ফেলে বাঁধানো সরু সরু রাস্তা আর ছোট ছোট দোতলা একতলা বাড়ির জন্য নয়। ওই শহরের গা থেকে ছড়ানো প্রায় চৌষট্টি কিলোমিটার লম্বা পাহাড়ি হ্রদটার জন্য।

স্কটল্যান্ড তো পাহাড়ি দেশ। ওরকম হ্রদ সেখানে তো ওই একটা নয়, তবে ওই পাহাড়ি হ্রদটা নিয়ে অত আদিখ্যেতা কেন?

লকনেস নাম দেওয়া ওই হ্রদটা নিয়ে যে অত হইচই, তার কারণ ওই হ্রদটার একটা দারুণ রহস্য। দু-দশ বছরের কথা তো নয়, বহু-বহু কাল আগে থেকে সঠিক তারিখ ধরে বলতে গেলে সেই ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে যাযাবর ধর্মযাজক সেন্ট কলম্বা ওই ইনভারনেসের হ্রদে এক ভয়ংকর জলচর দানবের সম্বন্ধে কথা বলে গেছেন। তিনি যখন এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হ্রদের জলে স্নান করবার সময় ভয়ংকর এক জলদানবের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত একটি লোকের মৃত্যুর কথা শোনেন। সেন্ট কলম্বা নিজে সেই হ্রদে স্নান করতে নামলে সেই ভয়ংকর দানব তাঁকেও আক্রণ করতে আসে। তবে সেন্ট কলম্বা তাঁর ইষ্টদেবতার নাম জপ করে ক-বার "দূর হ, দূর হ" বলাতেই দানবটা দূরের গভীর জলে পালিয়ে যায়।

সেই ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম প্রচারের পর থেকে ইনভারনেসের হ্রদের সেই ভয়ংকর দানব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী ক্রমশই লোকের মুখে মুখে ফিরে একত্র

জমা হয়ে উঠেছে। সে-সব বিবরণ পল্লবিতও হয়েছে নানাভাবে। যেমন, সেই জলচর দানবের মুখ-চোখ দিয়ে নাকি আগুনের হলকা বার হয়। আর সামনে কেউ পড়লে তাকে চোখের সম্মোহনী দৃষ্টিতে সেই দানব নাকি নিঃসাড় নিস্পন্দ করে রাখতে পারে। এইরকম আরও অনেক গুজব।

অবশেষ ১৯৩৪-এ এই জলচর দানবের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল বলে মনে হল। পাওয়া গেল লন্ডন শহরের এক শল্যচিকিৎসকের নেওয়া একটি ফোটোতে। ফোটোটায় পাওয়া গেল, হ্রদের ভেতর থেকে লম্বা গলা বাড়িয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে একটি অদ্ভুত প্রাণীর ছবি।

সে ছবি কেউ বিশ্বাস করল, কেউ-বা করল না। কিন্তু ইনভারনেসের হ্রদের অদ্ভুত প্রাণী সম্বন্ধে কৌতূহলের মাত্রা আর নানা বিবরণের সংখ্যা বাড়তেই লাগল ক্রমশ।

এ পর্যন্ত কমপক্ষে তিন হাজার বার ইনভারনেসের হ্রদ কিংবা সংক্ষেপে লকনেসে ওই প্রাণীটিকে দেখবার দাবি নানা জনে নানা সময়ে পেশ করেছে। তার মধ্যে কোনটা সাচ্চা, কোনটা ঝুটো বিচার করা কি সোজা কথা?

যেমন এই ক-বছর আগে একদিন ভোরবেলায় অবিরাম ফোনের আওয়াজে অস্থির হয়ে জেগে উঠে লন্ডনের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মিউজিয়ামের কিউরেটরমশাই তাঁর পরিচিত মাইকেল ওয়েদারেলের উত্তেজিত কণ্ঠে শুনলেন যে, মাইকেল খানিক আগেই লকনেসের তীরে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ দেখেছেন।

দুর্দান্ত খবর!

দু ঘণ্টার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ হেলিকপ্টারে করে লকনেসের তীরে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে তদন্ত শুরু করে দিলেন।

কিন্তু হায়, সবই ধাপ্পা। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, পায়ের ছাপ অন্য কিছু নয়, সব ক-টিই হিপোপটেমাসের। খানিক বাদে ইনভারনেসের স্থানীয় মিউজিয়াম থেকে চুরি করা হিপোপটেমাসের যে একটি ভুষি-ভরা কাটা পা হ্রদের তীরে ছাপ ফেলবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিকেও পাওয়া গেল।

এরকম ঠাট্টার ব্যাপার দু-একটা মাঝে-মাঝে ঘটলেও লকনেসের জলচর দানব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিন্তু বন্ধ হয়নি। যে যাই বলুক, সমস্ত ব্যাপারটা যে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়, গভীর ভাবে তা বিশ্বাস করে এই অজানা প্রাণীটির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা সমানে করে আসছেন, ব্রিটেন শুধু নয়, অন্য নানা দেশের বৈজ্ঞানিকেরাও।

গত ২০ বছর ধরে রাডার যন্ত্র থেকে শুরু করে প্রতিধ্বনি পরিমাপকের মতো নানা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তাই সন্ধানীর দল অবিরাম লকনেসে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ন-জন জাপানির একটি দল প্রায় দু-মাস অজস্র টাকা খরচ করে ওই হ্রদের নানা জায়গায় তাদের সন্ধান চালিয়ে এইটুকু নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে, লকনেস হ্রদের তলার গভীর নানা জায়গায় কোনও অজানা প্রাণীর চলাফেরার আভাস আছে।

জাপানিরা যে আর বেশি কিছু করতে পারেনি তার কারণ নাকি লকনেসের রহস্য

উদঘাটনে যা সময় ও পরিশ্রম লাগে, তা প্রায় অশেষ। ছোটখাটো পুকুর-দিঘি তো নয়ই, হ্রদ হিসেবেও বড়। যেমন চল্লিশ মাইল লম্বা, সেই অনুপাতেই গভীর।

লকনেস-রহস্যসন্ধানী ব্যুরো নামে একটি প্রতিষ্ঠান বহুদিন এই ব্যাপারে রহস্যভেদীদের অর্থসাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অর্থাভাবে সে প্রতিষ্ঠানকেও এক সময়ে নিজেদের দরজায় তালা দিতে হয়।

এত দিকে এভাবে বাধা পেয়ে লকনেসের রহস্যভেদের চেষ্টা মানুষ ছেড়ে দিয়েছে কি? না, তা দেয়নি। নানা দিকে নানা সন্ধানী গবেষণায় এই পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুমান করবার ভরসা করছেন যে, একটি-দুটি নয়, খুব-সম্ভব অন্তত শ-দেড়েক জলচর দানবাকার প্রাণী লকনেসের গভীরে বর্তমানে বাস করে। বহু প্রাচীন যে-সামুদ্রিক প্রাণীর সঙ্গে তাদের মিল থাকতে পারে সে-প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম হল প্লিসিওসোরাস।

কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে স্কটল্যান্ডের এই পাহাড়ি হ্রদে তারা কেমন করে কোথা থেকে এল? প্লিসিওসোরাস নামের সামুদ্রিক প্রাণীটি তো অন্তত দশ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। আর স্কটল্যান্ডের লকনেসের উদ্ভব হয়েছে দশ হাজারের খুব বেশি বছর আগে নয়।

লকনেসে প্লিসিওসোরাসের মতো কোনও জলচর দানবাকার প্রাণী থাকতে পারে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের ধারণা, কোটি কোটি বছর আগে এই অঞ্চলটায় আদি সমুদ্রের একটা অংশ ছিল, আর সেই সমুদ্রের অংশটুকু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্কটল্যান্ডের এই হ্রদটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। প্রাচীন সমুদ্রের কিছু প্লিসিওসোরাস বংশের প্রাণীও সেই সময়ে আটকা পড়ে যায় এই হ্রদের মধ্যে।

হ্রদের মধ্যে আটকা পড়ে কোটি কোটি বছর ধরে যদি তারা টিকে আছে মনে করা যায়, তা হলে তাদের, জীবন্ত তো নয়ই, কোনও শব কি অস্থিও পাওয়া যায় না কেন? তখন অপরপক্ষ বলেন যে, প্লিসিওসোরাস অত্যন্ত ভীরু গোছের প্রাণী বলে মানুষের সংস্পর্শ তারা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। তা ছাড়া, এ প্রাণীটি হয়তো, তাদের মধ্যে যারা মারা যায়, তাদের খেয়েই ফেলে, আর মৃত্যু আসছে এমন লক্ষণ টের পেলে তারা ভারী ভারী পাথর গিলে খেয়ে নিজেদের দেহ অগাধ জলে একেবারে গলে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যাতে ডুবে থাকে তার ব্যবস্থা করে।

এসবই নেহাত মনগড়া অনুমানের বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু অনুমানের চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ কি একেবারে নেই? হ্যাঁ, তা আছে।

প্রয়োগ-বিজ্ঞানের বোস্টন অ্যাকাডেমি সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য চার বছর ধরে লেগে থেকেছে। তাদের যান্ত্রিক সহায় হল গভীর জলের মধ্যে ছায়াছবি তোলার ক্যামেরা, অত্যন্ত শক্তিমান সার্চলাইট আর ক্ষীণতম শব্দতরঙ্গ ধরার মতো অত্যন্ত আধুনিক মাইক্রোফোন। এসব সার্চলাইট আর মাইক্রোফোন পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি গভীর জলের তলায় নামিয়ে রাখার সঙ্গে এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল যে, বড় গোছের কোনও কিছু কাছাকাছি এলেই সার্চলাইট আর মাইক্রোফোন আপনা থেকেই চালু হয়ে যাবে।

১৯৭৫-এর ১০ ডিসেম্বর এই বোস্টন দলের নেতা তাঁর সন্ধানের ফলাফল, আর কোথাও নয়, একেবারে বিলেতের পার্লামেন্টেই জানাবার ব্যবস্থা করেন। পার্লামেন্টে সেদিন পাহারার দারুণ কড়াকড়ি, জাল প্রবেশপত্র নিয়ে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে। বোস্টন দলের নেতা সেদিন পার্লামেন্টের সদস্য আর নিমন্ত্রিতদের কী দেখিয়েছিলেন? দেখিয়েছিলেন কয়েকটা রঙিন আর সাদা-কালো ফোটোগ্রাফের ছবি, যাতে অস্পষ্ট আকারের কোনও একটা কিছুকে ঝাপসাভাবে দেখা যায়। কল্পনার সাহায্য নিলে ভাবা যায় যে, দলনেতা লম্বা গলা আর লেজসমেত দুটি পাখনাওলা খুদে মাথার বিরাট একটা প্রাণীকে দেখেছেন। বোস্টন দলের ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো কয়েক মিটার দূর থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে বোস্টন-নেতা বলেন যে, দেহটা প্রায় আট থেকে দশ মিটার লম্বা, গলাটা প্রায় তিন থেকে পাঁচ মিটার। সেই প্রাণীটি আদিম প্লিসিওসোরাসেরই বংশধর। হ্রদের মাছ আর জলজ শ্যাওলাই প্রাণীটির খাদ্য। আর লকনেসে মোট একশো পঞ্চাশটি সেরকম প্রাণী এখন আছে বলে তাঁদের ধারণা। বোস্টনের এই প্রথম দলের পর দ্বিতীয় একটি দল এসে আগের দলের মতোই প্লিসিওসোরাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার পর বৈজ্ঞানিক মহলে সত্যিকার একটা সাড়া পড়ে গেল। বোস্টনের দ্বিতীয় সন্ধানী দল নিজেরাই বিজ্ঞানের সততার মর্যাদা রাখতে লকনেসের রহস্যময় জলচর যে প্লিসিওসোরাস হওয়া সম্ভব, সে-বিষয়ে নতুন কিছু প্রমাণ দাখিল করেও, বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সততার মর্যাদা রাখতে, ছোট ডুবোজাহাজ গোছের কিছু দিয়ে আরও কিছু সন্ধানের পরামর্শ দিলেন।

বৈজ্ঞানিক মহল কিন্তু তখন আর ঘুমিয়ে নেই। যেমন-তেমন নয়, লন্ডন সান-এর মতো পত্রিকা একটু বাড়াবাড়ি করেই লিখল যে, বোস্টনের বৈজ্ঞানিক সন্ধানী দল লকনেসের রহস্য-দানবের যে খবর ও ছবিটবি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছে, তা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্র আবিষ্কারের মতোই যুগান্তকারী। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের সন্দেহাতীত সম্পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ কবে পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য যেমন সাধারণ মানুষ, তেমনই বৈজ্ঞানিকেরাও উৎসুক হয়ে আছেন। চেষ্টায় তাঁদের ত্রুটি নেই। কোন দিক দিয়ে এই রহস্যভেদের চেষ্টা কে করছেন তা অবশ্য সম্পূর্ণ গোপনই রাখা হচ্ছে। আসল খবর খুব বেশি না বার হলেও একটা তীব্র উত্তেজনার বিদ্যুৎ-স্পন্দন যেন ছড়াচ্ছে চারদিকে।'

এই পর্যন্ত বলে ছোট কং ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'মধ্যোপসাগরের সেই ছোট্ট দ্বীপে তোমাদের কাছে দুনিয়ার ফাটকাবাজার ওলটপালট করা সেই এক ধুরন্ধর ধড়িবাজ চূড়ামণিকে ধরবার ফরমাশ পেয়ে এদিকে ওদিকে একটু ঘুরে ফিরে বিলেতে হিথরোতে এসে নামবার পরই এয়ারপোর্ট থেকে আমি বুঝতে পারি যে, আমার খোঁজাখুঁজির দায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।' "

॥ ৫ ॥

একটু থেমে থেকে ঘনাদা বললেন, "মানুষকে চিনতে হয় চরিত্র দেখে। চেহারা ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু চরিত্র তো আর ঢাকা যায় না।

শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মতো আরও অনেকে হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছে, সে-মানুষটার চেহারা যতটা তার চেয়ে বেশি আসল চরিত্রটা আমি তখন প্রায় অঙ্ক কষার মতো গণনায় বুঝে ফেলেছি। ফাটকাবাজারে সে রাশি রাশি টাকা উপায় করবার ফন্দি বার করে, কিন্তু সেটা তার আসল নেশা নয়। নানা বড় বড় দেশের শহরের কারবারি জগতের কলকাঠি নেড়ে প্রায় যেমন খুশি পয়সা কামাবার অদ্ভুত ক্ষমতা সত্ত্বেও, একবার কোথাও দাঁও মারবার পর কিছুদিন তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। তখন স্বনামে ছদ্মনামে নানারকম দানধ্যানে টাকা ছড়াতে ছড়াতে সে দুঃসাহসিক দুঃসাধ্য কিছু সাধন করবার জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘোরে।

ডুগান আর কার্ভালোকে বললুম, 'তোমাদের কাছে তার চেহারার যা বর্ণনা পেয়েছিলাম শুধু তাই দিয়ে তাকে চিনে খুঁজে বার করা যে যাবে না, তা আমি জানতাম। তোমরা যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলে তা হল সোনালি চুল, নীল চোখ আর একেবারে ধপধপে ফরসা নর্ডিক অর্থাৎ নরওয়ে-সুইডেনের খাস বাসিন্দাদের। কিন্তু সে চেহারা তো খুশি মতো বদলানো যায়! অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু সোনালি চুলগুলো লালচে, গায়ের রঙ ঠিক মতো আরক লাগিয়ে তামাটে, আর চোখের নীল তারাগুলোও কনট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যে অনায়াসে ব্রাউন, এমনকী কালোও করা যায়। সুতরাং আমি চেহারা দিয়ে নয়, চরিত্র দিয়েই সেই ধুরন্ধরকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছি।'

কিন্তু সেটাও কি সোজা কাজ? লকনেসের জলচর দানবের খবর চালু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশের সন্ধানীরা দলে দলে ছুটে এসেছে এই অঞ্চলে। স্কটল্যান্ডের উত্তরের নির্জন একটা পাহাড়ি শহর আর তার আশপাশের অঞ্চলে গিজগিজ করছে সত্যিকার সন্ধানীদের সঙ্গে হুজুগে মেতে আসা টহলদারের দল।

স্কটল্যান্ডের লোকেদের একটু বেশি হিসেবি আর কৃপণ বলে খ্যাতি আছে। ব্যবসাটা তারা ভালই বোঝে। তাই লকনেসের রহস্য নিয়ে হুজুগটা তারা ভাল করেই কাজে লাগিয়েছে। ছোট শহরের সরু সরু নুড়ি বসানো রাস্তায় সাধারণ দোতলা একতলা সব সেকেলে প্যাটার্নের বাড়ি। যাত্রীদের ভিড়ে সেইসব বাড়ির এক-একটা ঘরের জন্য বড়-বড় শহরের চার-পাঁচতারা হোটেলের কামরার ভাড়া তারা আদায় করছে। হোটেল-রেস্তোরাঁ দু-চারটে নতুন হয়েছে, কিন্তু তাতে সব সময়ে জমজমাট ভিড়, ভিড় রাস্তায় ঘাটে আর দোকানে-দোকানে তো বটেই, লকনেসের লম্বা পাড় ধরে কিছু দূর অন্তর পাতা সব তাঁবুতেও। ইউরোপ আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের তো বটেই, আফ্রিকা-এশিয়ার লোকেরও একেবারে অভাব নেই।

এর মধ্যে আমার সেই লোকটিকে খুঁজে বার করব কোন্ ফুসমন্তরে?

ফুসমন্তরে নয়, একটু সজাগ চোখে আর ভাগ্যের একটু দয়া থাকলে সে

অসাধ্যসাধনও হয়ে যায়। আমার বেলাতেও হল।

ইনভারনেসে পৌঁছে ক-দিন থাকবার জন্যে গলাকাটা ভাড়ার একটি পুরনো সেকেলে বাড়ির দোতলার একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাড়িটি একটি বয়স্কা স্কট মহিলার। বাড়িটি ভাড়া দেওয়া ছাড়া ইনভারনেসে তিনি শৌখিন জিনিসপত্রের একটি জমজমাট মনিহারি দোকানও চালান তাঁর অন্য একটি বাড়িতে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস টড। ইনভারনেসেই তাদের বাড়ি। স্বামীর মৃত্যুর পর বছর পনেরো আগে সেখানকার ঘর-বাড়ি-সম্পত্তির একরকম ব্যবস্থা করে তিনি এডিনবরায় শেষ ক-টা বছর কাটাবার জন্য চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে এই লকনেসের জলচর দানবের রহস্য জমাট বেঁধে উঠতে উঠতে ইনভারনেস শহরের ভাগ্যের চাকাই দিলে ঘুরিয়ে। ঘুঁটেকুড়ুনির হঠাৎ রাজরানি হওয়ার উপমা দিয়েও ভাগ্যের এ পরিবর্তন বুঝি বোঝানো যায় না। লকনেসের অজানা আদিম জলচর দানবের রহস্যভেদের হুজুগে দেশবিদেশের সব ধনকুবেররা খোলামকুচির মতো ডলার, পাউন্ড, মার্ক আর ফ্রাঁ ছড়াতে লাগল ইনভারনেসের রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে। এমনিতে সবকিছু দরকারি জিনিস আসলের চেয়ে পাঁচগুণ দামে বিক্রি তো হয়ই, তার ওপর লকনেসের রহস্য-দানবের সঙ্গে একটু সংস্রব থাকলে তো কথাই নেই। সাচ্চা-ঝুটা আসল-নকল লকনেসের নেসি রহস্যের সঙ্গে জড়ানো কোনও কিছু বাজারে দেখা দিতে না দিতেই লুট হয়ে যায় হুজুগে-মাতা খরিদ্দারদের হাতে। কোনও কারণ না থাকলেও ব্যবসাদারেরা সবকিছুতে নেসির একটু ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েই বাজিমাত করে। ইনভারনেসের ট্রেনে আসতে আসতেই চায়ের ট্রে, টি-পট, কাপ-ডিশ, কেক-বিস্কুট-টোস্ট, সবকিছুতেই নেসি নামে চালু অজানা প্লিসিওসোরাসের একটু ছাপ রাখবার চেষ্টা দেখা যায়। ইনভারনেসের দোকানে দোকানে নেসির ছাপমারা জিনিসপত্র তো বিক্রি হয়ই, সেইসঙ্গে নেসির বিষয়ে আসল-নকল ছবি, সত্য-মিথ্যা কাল্পনিক বিবরণের বই, নেসিকে শিকারের সরঞ্জাম ও উপায় ইত্যাদি নিয়ে বই রাশি-রাশি বিক্রি হয়।

মিসেস টড এই নতুন হুজুগের ঠিক জোয়ারের মুখে ইনভারনেসে ফিরে এসে নিজের সেকেলে বাড়ির ঘরটর একেলে বড় হোটেলের ভাড়ায় বিলি তো করেই দেন, সেই সঙ্গে তাঁর একটি বাড়ির নীচের তলার হল্‌ঘরে নেসি মিউজিয়াম নাম দিয়ে একটি দোকানও খুলেছেন এই অজানা জলার দানব সম্বন্ধে যা-কিছু বেচাকেনার জন্য। হ্যাঁ, প্রত্যক্ষদর্শীর নেসি সম্বন্ধে বিবরণ, তাদের ফ্ল্যাশ-ক্যামেরায় তোলা নির্ভেজাল বলে দাবি করা নেসির 'যথার্থ ছবি'র প্যাকেট তো বটেই, নেসি সম্বন্ধে আরও যা-কিছু সম্ভব সবকিছু সেখানে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই বিক্রিও করা যায় মিসেস টডের কাছে।

মিসেস টডের স্বামী এককালে ভারতবর্ষে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। মিসেস টডও তখন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। ভারতবর্ষে যে ক-বছর ছিলেন, তাতে মিসেস টডের মনে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসী, জ্যোতিষীদের মতো মানুষদের সম্বন্ধে একটা গভীর কৌতূহল আর সম্ভ্রমের ভাব গড়ে উঠেছিল। দেশে ফিরে আসবার পরেও সে ভাবটা

তাঁর মন থেকে দূর হয়ে যায়নি। আমি তাঁর বাড়ির একটা কামরা ভাড়া নেওয়ার সময় ভারতীয় বলে জেনে আমায় ক-টি বিশেষ সুযোগসুবিধে তো দিয়েছিলেনই, ভারতীয় যোগবিদ্যা আর জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আর অনুরাগের কথাও প্রকাশ না করে পারেননি। মিসেস টডের মনের ভাবটা জানা ছিল বলে দিন দুই ইনভারনেসে থাকার পরেই আমি তাঁর কাছে আমার প্রস্তাবটা জানাই। আর কিছু নয়, প্রস্তাবটা শুধু এই যে, তাঁর দোকানে অন্য অনেক কিছু যেমন বিক্রির জন্য রাখা আছে, তেমনই নেসি সম্বন্ধে আমার বিশেষ রহস্য-সংকেতও আমি রাখতে চাই। আমার সে জিনিসটি রাখবার জন্য আমি অবশ্য তিনি যত চান সেই দৈনিক ভাড়াই দেব। কিনতে চাওয়া খরিদ্দারদের জন্য আমার দেওয়া রহস্য-সংকেতের একটা দাম ঠিক করা থাকবে। কোনও খরিদ্দার সেই দাম দিয়ে সংকেতটি কিনলে মিসেস টড তাঁর প্রাপ্য দোকানভাড়া তা থেকে কেটে নিয়ে বাকিটা আমায় দেবেন, এই হল আমাদের মধ্যে চুক্তি। আমার রহস্য-সংকেত বিক্রি না-ও হতে পারে বলে আমি হপ্তাখানেক তা দোকানে রাখবার ভাড়া মিসেস টডকে অগ্রিম দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা নেননি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আমার রাখা তিন-তিনটি রহস্য-সংকেত দোকানে রাখবার পর দু-দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। যে তিনজন আমার দিয়ে-রাখা-সংকেত প্রায় আকাশছোঁয়া চড়া দামে কিনে নিয়ে যায়, তাদের তিনজনকেই আমি মিসেস টডের অনুগ্রহে দোকানের মধ্যে অন্য জায়গা থেকে লক্ষ করবার সুযোগ পাই, এবং আমার ধারণা, অত্যন্ত নিপুণভাবে ছদ্ম চেহারায় সেজে এলেও তাদের মধ্যে আসল ধুরন্ধরকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

আমার রহস্য-সংকেত যারা কিনেছে, আর একদিন বাদে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাদের এক-একজনের আমার সঙ্গে একটি বিশেষ ঠিকানায় দেখা করবার কথা। ওই বিশেষ দেখা করবার ঠিকানাটা মিসেস টডের অনুগ্রহে পাওয়া গেছে। রহস্য-সংকেত আর যা ছিল, তা শুধু একটি সংস্কৃত শ্লোকের অংশ। আর তার চারপাশে জ্যোতিষের কয়েকটা চিহ্নের সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা। যেমন,

নেসির রহস্যভেদ করতে শুনুন:
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্...

গীতগোবিন্দ-র সংস্কৃত শ্লোকটার কিছুটা আবৃত্তি করবার পর শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোকে বললাম, 'তোমাদের হয়ে যাকে খুঁজছিলাম, সেই ধুরন্ধরকে আমার এই নতুন প্যাঁচে ছাড়া ন-মাসে ছ-মাসেও খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার এই ফন্দিতে আমার বদলে সে-ই যাতে আমায় খোঁজে তার ব্যবস্থা করে কাজটা অনেক সহজ করে ফেলেছি। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ইনভারনেসে পৌঁছতে আমাদের ঘণ্টা-দেড়েকের বেশি দেরি নেই। সেখানে পৌঁছে আমার বাসাতেই তোমাদের নিয়ে যাব, তারপর তৈরি হয়ে এক এক করে আমাদের তিন মক্কেলের সঙ্গে—'

ব্যস, ওই পর্যন্ত বলার পর একেবারে বেহুঁশ হয়ে ট্রেনের কামরার সিটের ওপরেই লুটিয়ে পড়লাম।

শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো এরপর যা করল এবার তা-ই বলি।

আমি কামরায় আসনের ওপর হাত-পা এলিয়ে পড়ে যাবার পরেই ডুগান আর কার্ভালো দুজনে চটপট উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আমার দিকে চেয়ে কার্ভালো তার মুঠো করে ঘুসিটা আমার মাথার কাছে একটু নেড়ে বললে, 'দেব আর একটা ঘা?'

'না, তার দরকার হবে না মনে হচ্ছে,' বলল শুঁটকো ডুগান, 'একটা মোক্ষম ঘায়েই যা ঘায়েল হয়েছে, দুটোয় একেবারে কাবার না হয়ে যায়! এমনিতেই কাজ হাসিল হলে সে-সব হাঙ্গামায় যাওয়ার দরকার কী? এখন চটপট হাত-পাগুলো বেঁধে মুখে রুমাল গুঁজে দাও দিকি। পকেটগুলো হাতড়ে যা পাও তা আগে বার করে নিতে অবশ্য ভুলো না।'

ডুগানের নির্দেশমতো কার্ভালোর কাজ সারবার মধ্যে ট্রেনটা একটা স্টেশনে একটু থামে।

তখন প্রায় শেষ রাত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা আলোয় ঝলমল করলেও একেবারে নির্জন।

স্টেশনে থামবার আগে গাড়িটার গতিবেগ একটু কমতে দেখেই বুদ্ধিটা শুঁটকো ডুগানের মাথায় আসে নিশ্চয়। তাদের গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের দরজাটা খুলে ফেলে সে বলে, 'শিগগির ওর হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল-গোঁজা পোঁটলাটা দাও এই প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে।'

গোরিলা কার্ভালো তাই যখন করতে যাচ্ছে, তখন শুঁটকো ডুগানের মাথায় আরও ভাল একটা বুদ্ধি আসে। আলোয় ঝলমল অথচ একেবারে নির্জন প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এ-প্ল্যাটফর্মের দিকে আসার পথেই ওদিকের মালগাড়ির ইঞ্জিনটা দেখা গেল বলেই, সেটা যে উলটো মুখে যাচ্ছে তা বোঝা গেছল নিশ্চয়। ডুগান তাই আবার মতটা পালটে ব্যস্ত হয়ে হুকুম দিলে, 'না, প্ল্যাটফর্মে নয়। ওধারের মালগাড়িটার প্রায় সব কোচগুলোই খালি মনে হচ্ছে। ওর একটায় ওটাকে ফেলে এসো।'

কার্ভালোর এই হুকুম তামিল করতে দেরি হল না। প্ল্যাটফর্মের ওদিক থেকে কাজ সেরে আসতে আসতেই তাদের গাড়িটা ছেড়ে দিলেও, ছুটে এসে নিজেদের কামরায় উঠতে তার অসুবিধে হল না। 'শাবাশ!' বলে তাকে তারিফ জানিয়ে ডুগান বললে, 'যাক, এখন হপ্তাখানেকের জন্য অন্তত নিশ্চিন্ত থাকব বলতে পারি। দু-চার ঘণ্টা বাদে জ্ঞান যদি হয়ও, কোথায় গিয়ে যে হতভাগা জাগবে তার কোনও ঠিক নেই।' "

॥ ৬ ॥

চা এসে গিয়েছিল। ধীরেসুস্থে চা শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে, ঘনাদা ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প: "ভোর হবার পর ইনভারনেস স্টেশনে গিয়ে নামবার আগে ট্রেনের

কামরায় আমার জামা আর প্যান্টের পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্র ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে নিয়ে তারা অন্য দু-চারটে দামি খবরাখবরের সঙ্গে মিসেস টডের দোকানের হদিস আর তাঁর কাছে আমার ভাড়া-নেওয়া কামরাটার ঠিকানা আর ল্যাচ-কি হাত করতে পেরেছে।

তারা তখনই মিসেস টডের দোকানে কি আমার ভাড়া-নেওয়া তাঁর বাড়ির কামরায় যায়নি। স্টেশনের একটি ওয়েটিংরুমেই সারারাত্রির ট্রেনযাত্রার পর একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে, শহরটায় একটু ঘুরে দরকারি ঠিকানাগুলো জেনে নিতে বেরিয়েছে।

আমার জামা ও প্যান্টের পকেট থেকে যেসব কাগজপত্র তারা বার করে নিয়েছিল, তার মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপার না থাকলে তারা হয়তো তখনকার মতো লন্ডনে ফিরে গিয়ে এখানকার বোঝাপড়ার জন্য একটু তৈরি হয়ে আসবারই চেষ্টা করত। কিন্তু সে সময় তখন তাদের নেই।

তাদের কাছে অমন বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপারটা যে কী, তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। হ্যাঁ, ভারতীয় জ্যোতিষী হিসেবে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে শুরু করা মিসেস টডের দোকানে রাখা আমার সেই রহস্য-সংকেতগুলি কিনে যারা পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করবার দিনক্ষণ লিখিয়ে নিয়েছিল, সেই তিনজন অজানা রহস্য-সন্ধানীর সাক্ষাতের আশাটাই ছিল ডুগান ও কার্ভালোর কাছে দুর্নিবার আকর্ষণ। ব্যাপারটা নেহাত হুজুগের প্রলোভনের চেয়ে বেশি কিছু যাতে হয়, তারই জন্য সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া রহস্য-সংকেত আর তার দরুন সুবিধের জন্য দামটা ধরা ছিল প্রায় গলা-কাটা। সংস্কৃত শ্লোক লেখা ভারতীয় জ্যোতিষের চিহ্ন আঁকা এক-একটা রহস্য-সংকেতলিপির দামই ধরা ছিল পাঁচ পাউন্ড করে। সেই রহস্য-সংকেত কেনবার পর তারই জোরে মূল যোগী-জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আর তার নির্দিষ্ট সময় স্থির করে জেনে নেবার জন্য আরও দশ পাউন্ড খরচ।

শতকরা নিরানব্বুইজন যে ব্যাপারটা বুজরুকি আর ধাপ্পা বলে ধরে নিয়ে কাছে ঘেঁষবে না, তারই জন্য যে তিনজন নিজে থেকে অমনভাবে এগিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যেই ধড়িবাজ চূড়ামণি, দুনিয়ার ফাটকাবাজারের বাজিকর ভোজরাজকে পাওয়া যাবে, আমার দেওয়া এই ইঙ্গিত শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মনে বিশেষ করে ধরেছিল।

তাই লন্ডনে ফিরে না গিয়ে একটু বেলা হবার পর তারা প্রথমে মিসেস টডের দোকানটা সাধারণ খরিদ্দার হিসেবে একটু দেখে নিয়ে সেখান থেকে আমার ভাড়া-করা বাসাটা খুঁজে বার করে আমার পকেট ঘেঁটে পাওয়া ল্যাচ-কি দিয়ে আমার কামরাটা খুলেছিল।

ছোট একটা বাসা। কিন্তু ব্যবস্থাটা তাদের পছন্দ হয়েছিল। ভারতীয় যোগী-জ্যোতিষীদের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধের জন্য যে তিনজন অত চড়া দামের টিকিট কিনেছে, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পর পর তাদের আধ ঘণ্টা করে দেখা দেওয়া তো যাবেই, তারপর অবস্থাটা যেমন দাঁড়ায় সেই মতো এই কামরাটাই

সেদিনকার রাতের মতো নিজেদের কাজে তারা ব্যবহার করবে।

কিন্তু মুশকিল হল একটা সমস্যা নিয়ে। গোরিলা কার্ভালো সেটা তুলে ভাবনায় ফেললে। কী এক বিদঘুটে হরফের ভারতীয় ভাষায় রহস্য-সংকেতের কাগজগুলোয় যা লেখা আছে তা-ই জানতে যারা আসছে তাদের কাছে তার কী ব্যাখ্যা তারা করবে? রহস্য-সংকেতের টিকিট নিয়ে যারা আসছে, তাদের মধ্যে নিজেদের শিকারকে খুঁজে বার করা তাদের আসল কাজ। কিন্তু সে-কাজ সারবার জন্যই পর পর এক-একজনকে ডেকে পাঠাতে হবে। উত্তরও দিতে হবে তাদের জিজ্ঞাসার। সে-জিজ্ঞাসা কী বিষয়ে হবে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু উত্তরটা কি তারা দিতে পারবে?

ঠিক আছে। শুঁটকো ডুগানই বুদ্ধিটা বাতলালে। আসছে তো পরপর তিনজন। তাদের মধ্যে নিজেদের শিকারকে খুঁজে নেওয়াই হল ডুগান আর কার্ভালোর উদ্দেশ্য। যাকে তারা খুঁজছে, সেই ধুরন্ধর যদি প্রথমেই আসে তা হলে তো সব সমস্যা ওখানেই মিটে যাবে। আসল মানুষটিকে কব্জা করে বাকি দুজনকে তারা বিদায়ই করে দেবে সরাসরি। কিন্তু অত সুবিধে যদি না-ই হয়, তাতেই বা কী? টিকিট নিয়ে যারা আসছে, তাদেরও, আসল শিকার না হলে, দেখা করতে আসার আর-একটা দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেই চলবে। বললেই হবে যে, ভারতীয় জ্যোতিষের গণনা বড় কঠিন। আরও কিছু সময় লাগবে তা শেষ করতে। সেই জন্য আর-একটা তারিখ মায় সময় ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক করে নিয়ে দুজনে এর পর দুপুরের লাঞ্চ সেরে আসবার জন্য কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের একটি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল।

ফিরে এসে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা দেখে তারা অবাক। দরজা খোলা হলেও ভেজানো ছিল ভেতর থেকে। সে দরজায় ঠেলা দিয়ে খুলে তারা একেবারে তাজ্জব।

তা তাজ্জব হবারই কথা। সেখানে আর কাউকে নয়, আমাকেই বসে থাকতে দেখার কথা তারা কল্পনাও করেনি।

'তুমি—তুমি—' কার্ভালো প্রায় তোতলা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

'হ্যাঁ, আমি,' আমি একটু হেসে বলেছিলাম, 'অশরীরী ছায়াটায়া নয়, একেবারে সশরীর হাজির। আর তাও বেশ অনেকক্ষণ থেকে আছি। আর তাই আছি বলেই তোমাদের পরামর্শটা জেনে গোলমেলে প্রশ্ন এড়াবার বুদ্ধিটার তারিফ করছি।'

'তারিফ করছ আমাদের বুদ্ধির?' গোরিলা কার্ভালোর মাথায় কথাটা যেন ঠিক ঢুকছে না।

'কী জন্য তারিফ করছ?' শুঁটকো ডুগানের এবার কড়া গলায় সোজাসুজি প্রশ্ন, 'কী জানো আমাদের পরামর্শের?'

'তোমরা যা বলেছ, তার বেশি আর কী করে জানব?' যে সোফাটায় বসে ছিলাম, তার একটা পায়ার পেছন থেকে কিছু একটা প্যাঁচ দিয়ে খুলতে খুলতে আমি বললাম, 'মক্কেলদের বেয়াড়া প্রশ্ন এড়াবার জন্য ভারতীয় জ্যোতিষ-গণনা কঠিন বলে যে দোহাই পাড়ার কথা তোমরা বলাবলি করেছিলে, সেইটে শুনেই তোমাদের বুদ্ধির

প্রশংসার কথা মনে হয়েছিল। আর—'

আমার কথার মধ্যেই থামিয়ে দিয়ে যেমন উত্তেজিত, তেমনই কেমন-একটু হতভম্বভাবে কার্ভালো বললে, 'কিন্তু আমাদের কথা তুমি শুনলে কী করে? তখন এখানে আমরা দু-জন ছাড়া আর কেউ তো ছিল না!'

'তা ছিল না বটে,' আমি যেন বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম।

'তবে?' প্রায় গর্জন করে উঠল কার্ভালো, 'আমাদের পরামর্শের কথা তুই—'

আপনি তো নয়ই, সম্বোধন তুমি থেকে তুই-এ নামাতে কার্ভালোর গায়ের জ্বালা কত সেলসিয়াসে পৌঁছেছে তা বোঝা গেল। তার কথার মাঝখানে তাই বাধা দিয়ে বললাম, 'সাবধান! সাবধান! হঠাৎ অত গরম হয়ে উঠলে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। তোমাদের কাছে যা ধাঁধা, তার উত্তরটা তাই শুনিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজে সশরীর এখানে উপস্থিত না থাকলেও—না, আমার আত্মাটাত্মা নয়, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই যন্ত্রটা এখানেই সোফার পায়ার পেছনে লুকিয়ে লাগানো ছিল। দেখতে খুদে হলে কী হয়, এই রেকর্ডার যন্ত্রটা দারুণ কাজের। তোমাদের সব কথা তাই স্পষ্ট করে ধরে রেখেছে।'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে!' কার্ভালো আবার লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করতেই তাকে একটু ঠেলা দিয়ে তার আসনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'এ যন্ত্র এখানে কেমন করে এল, এই তো জানতে চাও? বলছি, শোনো। না, কোনও ভোজবাজিতে এটা এখানে আসেনি। আমিই ওটা এখানে লাগিয়ে রেখেছিলাম। কখন লাগিয়ে রেখেছিলাম? তোমরা এখানে এসে এ বাসার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে সব দেখেশুনে নিয়ে একবার কিছুক্ষণের জন্য দরজার ল্যাচ-কি লাগিয়ে বাইরে গেছলে। আমি সেই সুযোগেই এসে এটা লাগিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ঠিক সেই সময়ে এখানে এলাম কী করে, এই ধাঁধাটার উত্তর পাচ্ছ না, কেমন? উত্তর শুনতে হলে একটু ধৈর্য ধরে খানিকক্ষণ শুনতে হবে। হ্যাঁ, ট্রেনের কামরায় আমার গর্দানে গোরিলা কার্ভালো যখন একটা রামরদ্দা চালায়, সেই তখন থেকে যা হয়েছে সব।

মোক্ষম রদ্দাই চালিয়েছিলে বটে তুমি, মানে গোরিলা কার্ভালো। ও রদ্দা খেয়ে আমার সত্যিই বেহুঁশ হবার কথা। কিন্তু তা যে আমি হইনি, তার কারণ তোমাদের মতো পেঁচি বদমাশদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তাই তোমাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে-চালাতে চোরা নজরটা আমি ঠিকই রেখেছিলাম তোমাদের ওপর। মাথায় রামটুসকির ধাক্কা সামলে উঠে আর-একটা রামরদ্দা পাড়বার জন্য মুঠো পাকানো থেকে হাত চালানো পর্যন্ত সবই আমি সজ্ঞানে ঘটতে দিয়েছি। রদ্দাটাকে এমন তাল মিলিয়ে ঘাড়ের ওপর নিয়েছি যে, মনে হয়েছে, তাইতেই আমি কাত আর বেহুঁশ হয়ে গেলাম। গোরিলা কার্ভালোর অবশ্য আর-একটা রদ্দা দিয়ে জখমটা পাকা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কার্ভালো তা করতে গেলে ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে আমার খেলাটা অন্যভাবে সাজাতে হত। তোমার, মানে শুঁটকো ডুগানের সুপরামর্শে তার অবশ্য দরকার হয়নি।

আমার পকেট-টকেট থেকে যা হাতড়াবার হাতড়ে আমায় বাঁধাছাঁদা করে, মুখে রুমাল গুঁজে বোবা করবার ব্যবস্থার মধ্যে ট্রেনটা মিনিট খানেকের জন্য একটা স্টেশনে থেমেছিল। এইটাই একটা পরম সুযোগ মনে করে প্রথমে আমায় নির্জন প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার মতলব করে পরে আবার তা পালটে প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকের থেমে থাকা একটা উলটোমুখো মালগাড়ির একটা ফাঁকা কোচে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলে। কিন্তু ধর্মের কল সত্যিই কখনও বাতাসে নড়ে। তোমাদের দেখা উলটোমুখো মালগাড়ি আমার খাতিরে সোজামুখো হয়ে গিয়েছিল খানিকবাদে। ইঞ্জিনটা মালগাড়ির মাথার থেকে সেটাকে সামনে টেনে নিয়ে যাওয়ার বদলে সেটা পিছন দিক থেকে গাড়িটাকে ঠেলে ইনভারনেস স্টেশনের মাল খালাসের রেলইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়েছে।

পৌঁছে দিয়েছে রেল কোম্পানিরই নিজেদের দরকারে নিশ্চয়, পৌঁছেছে তোমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের অনেক পরে। কিন্তু তাতে আমার লাভই হয়েছে। যে খোলা-দরজার মালগাড়িটায় আমায় পুঁটলির মতো বেঁধে ফেলে আসার বন্দোবস্ত করেছিলে, তাতে তোমাদের গাড়ি ছাড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমি আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে বসেছিলাম। ইচ্ছে করলে মালগাড়িটা থেকে নেমে একটা ছুট দিয়ে তোমাদের গাড়িটার পেছনের কোনও কামরায় উঠতেও হয়তো পারতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিনি।

তার বদলে বেশ একটু দেরিতে স্টেশনের যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে নয়, মাল খালাসের গুডস ইয়ার্ডের এক জায়গায় ধীরেসুস্থে নেমে সেখান থেকে শহরে বেরিয়ে এসে তোমাদের খোঁজ করাটা সহজই হয়েছে।

এদিক ওদিক ঘুরে তোমরা তখন মিসেস টডের দোকানটা খুঁজে বার করে সেখানে ঢুকেছ। সেখান থেকে বেরিয়ে তোমরা আমার ভাড়া-নেওয়া এই বাসাটা খুঁজে বের করে এখানে আসার সময় আমি যে আগাগোড়া তোমাদের পেছনে ছিলাম তা তোমরা টের পাওনি। পাও না পাও, লোকসান তাতে তোমাদের এমন কিছু হয়নি। এখন তোমাদের আসল কাজ যদি উদ্ধার হয়, তা হলে আর আফশোসের কিছু নেই।

ঘড়িতে দেখছি তোমাদের মক্কেলদের আসবার সময় হয়ে গেছে। আমি তা হলে এখনকার মতো বাইরে যাচ্ছি—'

'না', গর্জন করে উঠল কার্ভালো।

যাবার জন্য উঠে পড়েও আমি আবার সোফার ওপর বসে পড়লাম। তবে সেটা গোরিলা কার্ভালোর গর্জনের জন্য নয়, এমনকী কোমরের বেল্ট থেকে যে পিস্তলটা টেনে বার করে সে তখন আমার দিকে তুলে ধরেছে, তার জন্যও নয়। তবে পিস্তল উঁচিয়ে ধরবার মতো স্পর্ধা যার হয়েছে, তার দৌড় কতটা তা আমি তখন দেখতে চাই।

বেশ একটু ভয়ের ভান করে তাই আমি চটপট আবার বসে পড়ে কাঁপা কাঁপা গলায় যেন নালিশ জানালাম, 'পিস্তল-টিস্তল দেখানো, এ আবার কী! সোজাসুজি

আমায় এখান থেকে যেতে বারণ করলেই তো হয়। তাছাড়া আমায় এখানে ধরে রেখে তোমাদের লাভটা কী? তোমরা কাকে খুঁজছ না খুঁজছ তা কি আমি জানি?'

ভয় পাওয়ার অভিনয়টা আমার ভালই হয়েছিল বোধহয়। কারণ, এর আগে বারকয়েক নাকাল হবার পর নিজের জবরদস্ত শাসানির ফল এবারে যেন হাতে হাতে পেয়ে কার্ভালো তখন মুখে যেন বাঁকা হাসি মাখিয়ে পিস্তলটা ডান হাতে একটু ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'না, তুই কিছুই জানিস না। তবু তোকে কেন ধরে রাখছি, তা বুঝতে পারছিস না? তোকে ধরে রাখছি, যাতে এখন বাইরে গিয়ে তুই আমাদের মক্কেলদের কোনওরকম ভাঙচি না দিতে পারিস।'

'ভাঙচি দেব আমি?' সত্যিই একেবারে আকাশ থেকে পড়ে আমি বললাম, 'কী ভাঙচি আমি দিতে পারি? আর দিয়ে আমার লাভটা কী, তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'অত কথা জানি না।' কার্ভালোর আগে শুঁটকো ডুগানই এবার খিঁচিয়ে উঠল, 'তোমায় এখানে থাকতে বলা হয়েছে। তা-ই তুমি থাকবে। এ নিয়ে তর্ক করবার আর আমাদের সময় নেই।'

'বেশ, তোমাদের হুকুমই মানছি!' অসহায় ভাবে ওদের কথা যেন মানতে বাধ্য হয়ে বললাম, 'কিন্তু থাকব কোথায়? এই এখানে, তোমাদের সঙ্গে? সে কি ঠিক হবে?'

'না, তা হবে না,' কার্ভালো গর্জন করে উঠল, 'আমাদের মধ্যে নয়, তুই থাকবি ওই—ওই—'

এদিক-ওদিক চেয়ে ঘরের ওয়ার্ডরোবটার দিকে চোখ পড়ায় সে খুশি হয়ে বললে, 'তুই থাকবি ওই ওয়ার্ডরোবের ভেতরে।'

থাকবার জায়গার নির্দেশ দিয়ে গোরিলা কার্ভালো সাবধানও করে দিলে সেই সঙ্গে, 'ওখানে থাকবি, কিন্তু একেবারে সাড়াশব্দ না দিয়ে। ওখান থেকে কোনওরকমে বেয়াড়াপড়ার চেষ্টা করলে লুকিয়ে চোর ঢুকেছে মনে করার ছুতোয় পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেব, মনে থাকে যেন।'

ওয়ার্ডরোবের ভিতর বা যেখানেই হোক, ওই কামরার মধ্যে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পাওয়াটাই তখন আমার কাছে মস্ত লাভ।

সময় তখন হয়ে গেছে। কার্ভালোর সঙ্গে কোনও রকম তর্ক আর না করে সুবোধ ছেলের মতো ওয়ার্ডরোবের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। ছোটখাটো নয়, আমার মতো মানুষের বেশ স্বচ্ছন্দে থাকবার মতো প্রশস্ত জায়গা। আমাদের এখানে হলে ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পাবার ভয় হয়তো ছিল। কিন্তু উত্তর স্কটল্যান্ডের তখনকার শীতে কোনওরকম কষ্টই হয়নি।

কিন্তু যার জন্য এতসব আয়োজন, সেই আসল কাজটাই যে গেল পুরোপুরি ভেস্তে। যাদের আসবার কথা তারা পর পর সময়মত তিনজন ঠিকই এসেছে। কিন্তু এই নিষ্ফল আসার হয়রানির জন্য গালমন্দ দিয়ে ঝগড়া যে কেউ তারা করেনি, সে নেহাত ওদেশের সহবত শিক্ষার গুণেই বলে মনে হয়।

যে তিনজন এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা, একজন প্রৌঢ়

ভদ্রলোক, আর তৃতীয়জন কিছুটা কম বয়সের, অবসর-নেওয়া মিলিটারি অফিসার বলেই মনে হয়।

ওয়ার্ডরোবের দরজার চাবির ফুটোটা আমি আমার চাবির রিং-এ পরানো খুদে ছুরির ফলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে একটু বড় করে নিয়েছিলাম। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চেহারাগুলো দেখতে আর কথাগুলো শুনতে বিশেষ কিছু অসুবিধে তাই হয়নি।

চেহারাগুলোর তফাত থাকলেও কথা তিনজনে যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ একই বলতে হয়।

তাদের প্রথম জিজ্ঞাসা হল, তাদের কাছে বিক্রি করা রহস্য-সংকেতের কাগজে ভারতীয় ভাষায় যা লেখা আছে তার অর্থটা কী? আর সেটা যদি জ্যোতিষ গণনার মন্ত্র হয়, তা হলে তার সাহায্যে কী হদিস পাওয়া গেছে লকনেসের জল-দানবের রহস্যের?

দুই মূর্তিমান, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো যে কোনও জবাবই এই দুটি প্রশ্নের দিতে পারেনি, তা বোধহয় বলতে হবে না। সময় লাগার অজুহাত যে তারা দেখিয়েছে, তা মানতে কেউ রাজি হয়নি। রহস্য-সংকেত জানবার জন্য প্রার্থীদের দেওয়া মোটা দর্শনী তাই ফেরত দিতে হয়েছে ডুগান আর কার্ভালোকে!

তাতে তারা খুব দুঃখ পেয়েছে কি?

না, তা পাবার তো কথা নয়। কারণ, আসল যা কাজ তা তাদের হাসিল হয়ে গেছে। সংকেতলিপির রহস্য জানতে যারা আসবে, কাছ থেকে তাদের খুঁটিয়ে দেখাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। সে-দেখার সুযোগও তাদের হয়েছে।

তবু তারা খুশি নয় কেন? তারা যাকে খুঁজছে সংকেতলিপির মানে বুঝতে চাওয়া তিন উমেদারদের মধ্যে সে কি ছিল না? ছদ্মবেশেও কি নয়? কথাটা জিজ্ঞেস করেছি আমি বেশ একটু হতাশ গলাতেই।

'না, না, নেই!' এবার ডুগানই খিঁচিয়ে উঠে বলেছে, 'তোমার জন্যই বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করে আমাদের এই নাকাল হওয়া। কিন্তু আমার ডালকুত্তার নাক। একটু গন্ধ যখন পেয়েছি তখন যেমন করে হোক আজ না হয় কাল খুঁজে বার করবই।'

'খুঁজে বার করবেই?' যেন সত্যি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তা হলে আসল বাসাটা বার করতে না পারলেও কোন মুলুকে সে চরে, সেটার হদিস দেবার বাহবাটা আমায় দাও।'

'হ্যাঁ, দেব, দেব। তার জন্য তোর গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দেব।'

'মেডেলের আগে বকশিশ পেলে কিন্তু সুবিধে হত আমার।' আমি একটু যেন মিনতির সুরে বলেছি।

'বকশিশ! তুই বকশিশ চাইছিস?' একেবারে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কার্ভালো। তারপর আমার ওয়ার্ডরোবে গিয়ে ঢোকার পর কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা পিস্তলটা আবার টেনে বার করে আমার দিকে উঁচিয়ে ধরে বলেছে, 'তোর

খুলিতে একটা কি দুটো হাওয়া খেলবার ফুটো করে দেওয়াই এখন তোর উপযুক্ত বকশিশ, তা জানিস কি?'

'না, না, ওসব কী অন্যায় কথা! আমি—আমি—' প্রায় করুণ স্বরে বলেছি, 'তোমাদের আসল কাজ এমন করে হাসিল করে দেবার পর মাথার খুলি ফুটো করতে চাওয়াটা—'

'থাম, থাম।' অধৈর্যের উত্তেজনায় আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গোরিলা কার্ভালো গর্জে উঠেছে, 'আমাদের সঙ্গে ঠক্‌বাজি করিস, এত বড় তোর সাহস! এই অখদ্যে শহরে আনা ছাড়া কী কাজ তুই আমাদের করেছিস? বড়াই করছিস কী আসল কাজের?'

'কী আসল কাজ তা এখনও বুঝতে পারোনি?' আমি রীতিমত হতাশার সুরে বলেছি এবার। 'তা যদি না বুঝে থাকো, তা হলে আর বুঝে দরকার নেই। তোমাদের মতো মগজ যাদের নিরেট, তাদের কাজের ভার নেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। যাক, তোমাদের বকশিশ দেবার দরকার নেই। আমারও কাজ নেই এখানে আর সময় নষ্ট করবার।'

'খবরদার,' আমি উঠে পড়বার ভঙ্গি করার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে কার্ভালো বজ্রস্বরে ধমকে দিয়েছে, 'আর একটু বেয়াড়াপনা করলে মাথার খুলি ফুটো করার আগে পাঁজরা দুটোই ঝাঁঝরা করে দেব!' আর কিছু বলার সুযোগ কার্ভালো পায়নি। তার ডান হাতের কনুইয়ের নীচে বিদ্যুতের বেগে আমার বাঁ পায়ের হাঁটুর একটা মোক্ষম ঠোক্কর লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা অবশ হয়ে পিস্তলটা মেঝেতে ছিটকে পড়েছে।

তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিয়ে ডান হাতে একটু লোফালুফি করতে করতে বলেছি, 'এসব বেয়াড়া জিনিস বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপের সময় কাছে না থাকাই ভাল। আলাপটা আমাদের দু-পক্ষের মধ্যে কাজের ফরমাশ আর তার জন্যে বকশিশের দরাদরি নিয়ে, কেমন? আসল কাজ কিছু করিনি বলে তোমরা আমার বকশিশের দাবিটা মানতেও চাও না। এমনকী, আসল কাজ যে কী আমি করেছি, তা তোমরাও জানো না বলছ! তা জানতে যখন পারোনি, তখন তোমাদের যেমন আছ তেমনই অন্ধকারে রেখে আমি এখন চলে যেতে পারি তোমাদের কিছু না বোঝার ছটফটানির মধ্যে রেখে। কিন্তু তা আমি করব না। তোমাদের অন্য এক জাতের ছটফটানির মধ্যে রেখে এইটুকু শুধু বলে যাব যে, যাকে তোমরা খুঁজছ সে আজ এখানে তোমাদের সামনে এসে দেখা দিয়ে কথাও বলে গেছে। তার ছদ্মবেশ আর চেহারা শুধু তোমরা চিনতে পারোনি। এখন যে তিনজন আজ এসেছিল, তাদের মধ্যে কোনটি তোমাদের আসল শিকার তা ভেবে বার করতে মাথার চুল ছেঁড়ো। আমি চললাম।'

আমি ঘরের বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে প্রায় আকুল আর্তনাদের মতোই দুই মূর্তিমানের মিনতি শুনলাম, 'এই যে, এই শোনো, শোনো—' এরপর আর-একটু খাতির মাখানো গলায়, 'শুনুন, শুনুন মি. দাস!' মিনতির উত্তরে গুলি বার করে নেওয়া পিস্তলটা শুধু বাইরের দরজার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আমি একটা গলি-পথে বাঁক নিয়ে চলে এলাম।"

॥ ৭ ॥

ঘনাদা বললেন, "রহস্য-সংকেতের কাগজ নিয়ে তার অর্থ বোঝার জন্য যে তিনজন খানিক আগে আমার ডেরায় এসেছিল, তাদের মধ্যে আসল ধুরন্ধরকে আমি চিনতে পেরেছি মনে হল। এখন প্রথম কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা।

কিন্তু ডুগান আর কার্ভালোর আগে তা কি আমি পারব?

ছদ্মবেশ চেহারায় আসা আসল আসামিকে তারা ঠিক মতো চিনতে না পেরে থাকলেও সে যে তিনজনের একজন, এ বিষয়ে তো তাদের কোনও সন্দেহ নেই। আমি যখন বিশেষ একজনকে খুঁজব, তাদের তখন পরপর তিনজনের পেছনে লেগে থেকে আসল ধুরন্ধরকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু তিনজনের বেশি চারজন তো নয়। ভাগ্য একটু সদয় হলে আমার আগেই তারা আসল লোককে পাকড়াও করতে পারবে নাই বা কেন?

যাকে আসল আসামি বলে চিনে ফেলেছি বলে আমার ধারণা, তাকে খুঁজে বার করাও আমার পক্ষে মোটেই সোজা নয়। তার ছদ্মচেহারাটাই আমি দেখেছি। সেই ছদ্মচেহারা যদি সে এখন চটপট পালটে না-ও ফেলে থাকে, তা হলেও তার আস্তানা খুঁজে বার করে তার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগের ব্যবস্থা করার কী উপায় আছে?

ভাগ্য একটু সহায় বলে সেই উপায়ই হল। কার্ভালো আর ডুগান হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছে, খুব বেশিদিন সে বিলেতে এসে নামেনি। হিথরোতে নেমেই সম্ভবত লকনেসের রহস্যের টানে ইনভারনেসে রওনা হলেও সেটা মাস-খানেকের চেয়ে বেশি আগের ব্যাপার হতে পারে না। কার্ভালোদের শিকারের খোঁজ করতে হলে ইনভারনেসের গোনাগুনতি ছোটবড় হোটেলের রেজিস্টারে মাস-দেড়েকের মধ্যে আসা-যাওয়া বোর্ডারদের পরিচয়গুলো সংগ্রহ করতে হয়। আসল আসামির সে পরিচয় মিথ্যে হলেও তার হোটেলের বোর্ডার হওয়ার তারিখটা থেকে যা জানবার তা আঁচ করা যেতে পারে।

হোটেলের বদলে আমার মতো বাসা-ভাড়া-করা মক্কেলের খবর এভাবে পাওয়া যাবে না জেনেই প্রথম দুটো বড় হোটেলে গিয়ে খোঁজ করতেই ভাগ্যের জোরে আসল মক্কেলেরই খোঁজ পেলাম বলে মনে হয়।

এ-হোটেলে ঠিক মাস-দেড়েক আগেই এই মক্কেলটি এসে বোর্ডার হয়েছে। আরও অনেকের মতো লকনেসের রহস্যভেদই আসল নেশা হলেও মানুষটার চালচলন একটু অদ্ভুত।

এই মানুষটার সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনেই হোটেলের রিসেপশনিস্ট সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে, সেটা কোনওমতেই সম্ভব নয়। কারণ এই অদ্ভুত মানুষটি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, যে-কোনও দর্শনপ্রার্থীকে সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবার নির্দেশ তিনি হোটেলের ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে রেখেছেন।

যাকে খুঁজছি, এমন আশাতীত ভাবে তার সন্ধান পাওয়ার পর এরকম নিষেধের বেড়ায় বাধা পেয়ে কী করব তাই ভাবছি, এমন সময়ে আমার মক্কেলই স্বয়ং হোটেলের লবিতে ঢুকে কাউন্টার থেকে তাঁর স্যুইট-এর চাবিটা চেয়ে নিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক হোটেলের কাউন্টারে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে হোটেল-ক্লার্কের কাছ থেকে তাঁর চাবিটা নিয়ে গেলেও সে সময়টায় তাঁর সঙ্গে কোনওরকম আলাপের চেষ্টা করিনি। তিনি লবি থেকে হোটেলের লিফটে তাঁর ওপরতলার স্যুইটে উঠে যাবার পর হোটেলেরই নিজস্ব ছাপ-মারা একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে তাতে যা লেখবার তা লিখে হোটেল-ক্লার্ককে সেটা ওপরে ওই ভদ্রলোকের কাছেই পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও হোটেল-ক্লার্ক একজন জ্যানিটরকে দিয়ে কাগজটা পাঠিয়ে যে রকম মুখভঙ্গি করেছে, তাতে বোঝা গেছে, এ চিঠির জবাবে আমার ওপরে যাবার ডাক আসবার কোনও আশাই নেই।

কিন্তু ডাক সত্যিই এসেছে হোটেলের সকলকে অন্তত অবাক করে।

আমি অবশ্য জানতাম যে ডাক আসবেই। কারণ চিঠিতে আমি শুধু মৎস্যাবতারের শ্লোকের প্রথম লাইনটুকু সংস্কৃতে লিখে তার নীচে ইংরেজিতে লিখেছিলাম, 'সামনে দারুণ বিপদ। তবু হারের খেলায় জেতার মন্ত্র শোনাতে এসেছি।'

এ চিঠি পাঠাবার খানিক বাদেই চিঠি যাঁকে লিখেছি তাঁর হুকুম পেয়ে জ্যানিটর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমায় সঙ্গে করে ওপরের তলার স্যুইটে পৌঁছে দিয়েছে।

স্যুইটটা সত্যিই শৌখিন। আমির-ওমরাহের থাকার মতো। সাজসরঞ্জাম আর মালপত্র দেখে বর্তমান দখলকারী বোর্ডারের চালচলন, অবস্থা আর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু হয়তো জানা যায়, কিন্তু সেসব দিকে নজর না দিয়ে আমি সোজাসুজি প্রথম থেকেই আমার আক্রমণ শুরু করেছি।

'দেখা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, পাব্‌লো জুহো—না, মাফ করবেন, নামটা যা নিয়েছেন তা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। নামটার মান রাখতে চেহারাটা যা পালটাবার চেষ্টা করেছেন তাতেও বড় গলদ থেকে গেছে। পাবলো জুহো বলে নামটা তো নিয়েছেন ফিনিশ মানে ফিনল্যান্ডের লোকের। কিন্তু তার জন্যে ছদ্ম চেহারা যা নিজেকে দিতে চেয়েছেন তা তো একেবারে নামের সঙ্গে মিলছে না।

নামটা যাদের নিয়েছেন, সেই ফিনদের মাথার চুল প্রায়ই লালচে আর চোখের তারা কিছুটা বাদামি সাধারণত হয় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ব্লঁদ যাকে বলে, সেই ঈষৎ লালচে ধপধপে ফরসা তারা কখনও হয় না। তা ছাড়া, ফিনরা বেশির ভাগই সুইডিশ বা নরওয়ের লোকের তুলনায় একটু বেঁটেখাটো হয়ে থাকে। চোখের তারা তাদের একেবারে নীলও কখনও হয় না।

আপনি চোখের তারার রং লুকোতে বাদামি রঙের কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে খানিকটা ধোঁকা দিতে পেরেছেন সত্যি, মাথার সোনালি চুলেও বেশ একটু লালচে

ছোপ ধরাতে পেরেছেন, কিন্তু লম্বা-পাতলা দেহটাকে বেঁটেখাটো করা তো ভোজবাজিতে ছাড়া সম্ভব হয় না। তার ওপর মুখ আর হাত-পা-র খোলা জায়গায় বেশ কয়েক পোঁচ পালিশ দিলেও ভেতরের পাকা ব্লঁদ মানে দুধে-আলতা আভাকে একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি।

শুনুন, পাব্‌লো জুহো, আসল নাম আপনার যা-ই হোক, আপাতত পাব্‌লো জুহো নামেই আপনাকে ডেকে বলছি, এই নাম বদলে ছদ্ম-চেহারা নিয়ে আপনার লাভ কী হচ্ছে? সাধারণ গোলা লোককে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন, তাদের আপনার আসল নাম আর পরিচয় নিয়ে মাথাব্যথা থাকবারও কথা নয়। কিন্তু সত্যিকার কাজের কাজ তাতে আপনার কিছু হচ্ছে কি?'

বেশ ধৈর্য ধরেই ঘরের একটা সোফায় বসে আমার কথা শুনতে শুনতে মানুষটা হঠাৎ যেন খেপে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কুকুর-তাড়ানোর মতো আমাকে তাড়া দিয়ে বললে, 'যান, যান, বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে। কে আপনি যে, আমায় আমার ঘরে ঢুকে যত বাজে কথা শোনাতে এসেছেন! আমি যদি নাম ভাঁড়িয়ে থাকি, তা হলে সে আমার খুশি। আর কারও তাতে কী আসে যায়?'

'আর কারও নয়।' আমি গলাটা আগের চেয়ে নামিয়ে শান্ত স্বরে বলেছি, 'আসে যায় আপনারই। এবং কেন যায় তা আপনি ভাল করেই এখন জানেন। যাদের জন্য নাম ভাঁড়িয়ে এমন করে লুকিয়ে বেড়িয়েছেন, তারা যে আপনার পেছনে এখনও কীভাবে লেগে আছে, আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনি পেয়েছেন। তারা অতরকম খুঁত থাকলেও ছদ্ম-চেহারায় আপনাকে চিনতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু আজ না পারলেও কিছুদিন বাদেই তাদের চোখে ধুলো দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ আর কিছু না বুঝে থাক, যে তিনজন আজ তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছল, তাদের আসল শিকার যে সেই তিনজনেরই একজন, এটুকু তারা ঠিকই এখন বুঝে ফেলেছে। সুতরাং এক-এক করে তিনজনকেই খুঁজে বার করবার জন্য তারা যা কিছু করা সম্ভব তা করতে বাকি রাখবে না। ইনভারনেস লন্ডন কি প্যারিসের মতো এত বড় শহর নয় যে বাড়িঘর আর মানুষের ভিড়ের জঙ্গলে সেখানে চিরকাল না-ও যদি হয়, বেশ কিছুদিন অন্তত লুকিয়ে থাকা যায়। তা ছাড়া আপনাকে যারা খুঁজছে তারা কী ধরনের মানুষ তা জানতে নিশ্চয় আপনার বাকি নেই। চটপট আপনাকে খুঁজে বার না করতে পারলেও তারা খোঁজায় ক্লান্ত হবে না। সহজে খোঁজ না পেলে তারা হন্যে হয়ে আপনার সন্ধানে যা কিছু সম্ভব তার কোনও ফন্দি খাটাতে বাদ রাখবে না। কিছুতে না পারলে তারা আপনার আসল পাসপোর্ট যে নামে আছে, সেই নামের যে-মানুষ হঠাৎই এই ইনভারনেস শহরে আসার পর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাকে খোঁজার জন্য পুলিশের সাহায্য চাইবে।

বিলেতের পুলিশ কী বস্তু, তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। কোনও কিছু নিয়ে হেলাফেলা করা তাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। সুতরাং মেকিয়াভেলির বুদ্ধি নিয়ে যত ফন্দিফিকিরের ওস্তাদই আপনি হন না কেন, এখানে থাকলে ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। আপনার একমাত্র বাঁচবার উপায় এখন এ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া।'

'না, না।' মঁসিয়ে জুহো প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ-শহর ছেড়ে এখন আমি যেতে পারব না। এখান থেকে এখন চলে যাওয়া মানে বেঁচে থাকার আর কোনও মানেই না থাকা।'

'কিন্তু এখানে কতদিন থাকতে পারবেন আপনাদের দুশমনদের দৃষ্টি এড়িয়ে? বেশিদিন যে পারবেন না, আর ওদের কাছে ধরা পড়লে কী দশা যে আপনার হবে, তা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'জানি, জানি।' মঁসিয়ে জুহো আমার দিকেই বিষদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সেই নরক-যন্ত্রণার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যই পরিচয় আর চেহারা সবকিছু বদলাবার চেষ্টা করে এদেশে ওদেশে গা-ঢাকা দিয়ে ফিরতে ফিরতে শেষে এইখানে এসে এমন একটা কিছু করবার পেয়েছি, যাতে রহস্যভেদ করতে পারলে একটা আশ্চর্য কীর্তির সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে রেখে যেতে পারব।'

'আমি যদি বলি এখান থেকে আপনি আর-এক বিশেষ জায়গায় চলে গেলেই সে আশ্চর্য কীর্তি আপনার নামের সঙ্গে জড়িত হতে বাধ্য?'

'তা হলে বলব', মঁসিয়ে জুহো বেশ একটু তেতো গলায় বললেন, 'আমায় ছেলে-ভোলানো ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছেন। শুনুন, আশ্চর্য কীর্তি বলতে কীসের কথা বলছি তা আপনি নিশ্চয় কিছুটা বুঝেছেন, তবু আমি কতদূর যে এগিয়েছি তা আপনি কেন, এ-কাজে যারা মেতে আছে তারা কেউ বোধহয় কল্পনাই করতে পারবে না।'

এগিয়ে যাওয়াটা কতদুর আর কোথায়, তা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না। মঁসিয়ে জুহো নিজের উৎসাহের আবেগেই বলে চললেন, 'আমি যদি বলি, এতকাল ধরে এতবার লকনেসের মধ্যে জলচর দানবের মতো কিছু থাকার বহু প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কেন কেউ তার জীবন্ত একটা ছবি বা তার দেহের কিছু হাড়গোড়ও সংগ্রহ করতে পারেনি? কেন এতদিনে বংশবৃদ্ধির দরুন অন্তত শ-দেড়েক ওই প্রাণী লকনেসে নিশ্চিত আছে বলে বিশ্বাস হলেও তাদের একটিকেও ঠিক মতো ধরাছোঁয়া যাচ্ছে না? তারা যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও তারা কোন্ ভোজবাজিতে লকনেসের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে? ধরাছোঁয়ার চেষ্টা হলেও এ সমস্ত রহস্যের সঠিক উত্তর কী হতে পারে, তা কেউ এখনও কল্পনাও করতে পেরেছে কি?'

'তা বোধহয় পেরেছে!'

আমার কথায় চমকে উঠে মঁসিয়ে জুহো বেশ একটু অবিশ্বাসের সুরে কড়া গলায় জানতে চেয়েছেন, 'কে পেরেছে? কে?'

যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'যদি বলি, আমি?'

'আপনি?' মঁসিয়ে জুহোর গলায় অবজ্ঞার সঙ্গে একটু বিস্ময়ও মেশানো, 'কী, কী বুঝছেন আপনি? কী উত্তর পেয়েছেন ওই ধাঁধার?'

'আপনি যা পেয়েছেন, তা ছাড়া আর কিছু নয় বোধহয়।' ইচ্ছে করেই মঁসিয়ে জুহোকে একটু জ্বালিয়ে বলেছি, 'ওই একটি ছাড়া রহস্যের সহজ ব্যাখ্যা আর কিছু আছে বলেই মনে হয় না।'

'কিন্তু ব্যাখ্যাটা কী?' জুহো জ্বলে উঠেছেন, 'কী আপনি বুঝেছেন, সেইটে স্পষ্ট করে বলুন না!'

'স্পষ্ট করে বলতে হলে,' যেন অত্যন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে হচ্ছে এমনভাবে বলেছি, 'আর কিছু নয়, উত্তরটা শুধু এই যে, লকনেস নামে হ্রদটার বাইরের মাপ লম্বায় চল্লিশ মাইল হলেও আসল মাপ খুব সম্ভবত আরও অনেক বেশি। বাইরে যা দেখা যায়, তা বাদে এই হ্রদ পাতালসাগর হয়ে এই ইনভারনেস অঞ্চলের পাহাড়ি উপত্যকার নীচে বহুদূর পর্যন্ত গভীরভাবে ছড়িয়ে আছে। ওপরে যে হ্রদ আমরা দেখতে পাই, তার সঙ্গে সেই পাতালহ্রদের যোগাযোগ আছে ঠিকই, কিন্তু তা খুঁজে বার করতে হলে সমস্ত হ্রদটাই তন্নতন্ন করে জরিপ করতে হয় বলে তা আপনার আমার তো নয়ই, মার্কিন ধনকুবেরদেরও সাধ্য যদি বা হয়, শখ করে মেতে ওঠবার মতো কাজ হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আদ্যিকালের এক আজগুবি জানোয়ার সত্যি এখনও আছে কি নেই, তার প্রমাণ পাবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তার দেশের পাহাড়-জঙ্গল অমন খোঁড়াখুঁড়ি করে তছনছ করার অনুমতি দেবে বলেও মনে হয় না।'

মঁসিয়ে জুহোর মুখটা বেশ একটু করুণ হয়ে এসেছে, তা লক্ষ করে এবার বললাম, 'না, মঁসিয়ে জুহো, আপনার বৈজ্ঞানিক অনুমানটা যত সঠিকই হোক, নেহাত অচল টাকায় কেনা লটারির টিকিটে ডার্বি সুইপ পাওয়ার মতো ভাগ্যের অবিশ্বাস্য কৃপা না হলে বাকি জীবনভর আগাগোড়া লকনেসের বুকে ডুবুরি হয়ে খুঁজলেও পাতালসাগরের সঙ্গে কোথায় তার যোগাযোগ হয়েছে তা খুঁজে পাবেন না। আর খুঁজে পেলেও বা লাভ কী হবে? পাতালসাগরের খোঁজ পেলেই সেখান থেকে জ্যান্ত কি মরা, বাচ্চা কি বুড়ো লকনেসের জলচর দানব ধরে আনতে পারবেন কি? না, তা পারবার একমাত্র উপায় আমি যা পরামর্শ দিচ্ছি তা অগ্রাহ্য না করা। শুনুন মঁসিয়ে জুহো, লকনেসের রহস্য চিরকালের মতো যথার্থই ভেদ করবার গৌরব যদি না-ও চান, নিজেকে বাঁচাবার জন্য ইনভারনেস থেকে সম্ভব হলে এই মুহূর্তে আপনার চলে যাওয়া একান্ত দরকার। যাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে এমনভাবে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, তাদের আসল পরিচয় আপনি আমার চেয়ে ভাল করেই জানেন। ভারতবর্ষের জঙ্গলে কেঁদো বাঘেরা পর্যন্ত যাদের অন্তত ক্রোশখানেকের ফাঁক রেখে এড়িয়ে চলে, সেই জংলি কুকুরের পালের চেয়ে এরা বুঝি ভয়ানক। একবার নিজেদের দাঁতের কামড় যার ওপর এরা বসিয়েছে তার আর রক্ষে নেই। এরা তাকে—'

'জানি, জানি।' আমার কথার মাঝে যেমন অধৈর্যের সঙ্গে তেমনই ভীত গলায় মঁসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব আমি জানি। তবু বলছি, আপনি দয়া করে থামুন। আমার এখানে থাকা মানে যদি ওই শয়তানদের হাতে আবার পড়া হয়, তা হলে আমার এখন এখান থেকে পালানো মানেও এমন এক হার মানা, যার পর বাঁচবার কোনও মানেই আর থাকে না। না, না। কোথাও আমি এখন আর কিছুতেই যাব না। ওরা জংলি কুকুরের পালের মতো আমায় খুঁজছে এটা ঠিকই, কিন্তু তবু আমায়

এখনও তো ধরতে পারেনি। আজ বলতে গেলে ওদের নিজেদের বাসা থেকেই নিরাপদে আমি ঘুরে এসেছি। আপনি আমার ছদ্মবেশের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা ওদের হয়নি। এমনই করে আর ক-টা দিন যদি আমি ওদের হাত এড়িয়ে থাকতে পারি, তা হলে লকনেসের রহস্য হয়তো সত্যিই আর অজানা থাকবে না। আর তা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তা হলে জংলি কুকুর কি বাঘ-সিংহের বদলে ওরা আমার কাছে নেংটি ইঁদুর হয়ে যাবে, তা কি বুঝতে পারছেন না?'

'তা পারছি।' হতাশভাবে মঁসিয়ে জুহোকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু পুরোপুরি লকনেসের রহস্য-ভেদের উপায় সত্যিই যদি আপনি পেয়ে যান, তার সময় যে কিছুতেই আপনি আর পাবেন না। ওরা আজ আপনাকে সামনে পেয়েও চিনতে পারেনি তা ঠিক, কিন্তু ওরা তো তাতেই হার মেনে এখান থেকে চলে যাবে না। ওরা এইটুকু নিশ্চিত জানে যে, আজ যে তিনজন ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেছল তাদের একজনই ওদের আসল শিকার। সেই একজনকে প্রথমে নিজেদের চেষ্টায় খুঁজে বার করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত ওরা এখানকার ব্রিটিশ পুলিশের সাহায্য যে নিতে যাবে তাতে কোনও ভুল নেই।'

'পুলিশের সাহায্য?' একসঙ্গে আতঙ্ক আর সন্দেহ-মেশানো গলায় মঁসিয়ে জুহো বললেন, 'পুলিশের সাহায্য ওরা কী করে নেবে? এদেশের পুলিশের নজর দেবার মতো কোন অপরাধ আমি করেছি?'

'না, তা করেননি,' দুঃখের সঙ্গেই জানালাম, 'তাই ওরা আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের সাহায্য তো চাইবে না।'

'তা হলে?' রীতিমত অবাক আর সেইসঙ্গে আমার মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে স্পষ্ট সন্দেহের সুর নিয়েই মঁসিয়ে জুহো জানতে চাইলেন, 'কী বলে ওরা এখানকার পুলিশের সাহায্য চাইবে?'

'চাইবে,' যতদূর সম্ভব সোজা করে কথাটা মঁসিয়ে জুহোকে বোঝাবার চেষ্টায় বললাম, 'ওদের তো বেশি কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না। ওরা শুধু যে নামে বাইরের দুনিয়ায় এতকাল আপনি পরিচিত ছিলেন, সেইটি জানিয়ে আর আপনার আসল চেহারার একটা ফোটো দিয়ে পুলিশের কাছে জানাবে যে, তাদের সঙ্গী হিসেবে এই ইনভারনেসে আসার পথে আপনি হঠাৎ রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাই তারা—'

'না, না, না, না।' আমার কথার মাঝেই অস্থির উত্তেজনায় বাধা দিয়ে মঁসিয়ে জুহো বললেন, 'আমার আসল নাম, আসল চেহারা—এসব কী বলছেন আপনি? পু-পুলিশ ওদের কথায় আমার খোঁজ করবে কেন?'

"একটু শান্ত হয়ে আমার কথাগুলো শুনুন মঁসিয়ে জুহো,' বেশ শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম এবার, 'পুলিশ কোনওরকমের অপরাধী বলে আপনার খোঁজ করবে না। আপনার দুশমনদের চাল সেদিক দিয়ে খুব পাকাই হবে। কিন্তু অপরাধী না হলেও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া মানুষকে খুঁজে বার করা তো পুলিশের একটা দায়। ওরা সেই দিক দিয়েই আপনার যথাসাধ্য খোঁজ করবে। তখন কেঁচো খুঁড়তে কী যে

বার হতে পারে, তা আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।'

'না, না, না।' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে একটু খাপছাড়া ভাবেই বলে উঠলেন জুহো, 'আমার আসল নাম কিছু নেই। আর এখানকার পুলিশ তা বার করতেই বা পারবে কী করে? আর যদি বারই বা করে, তার ভয়টা কী আমার? পুলিশ গ্রেফতার করে চালান দিতে পারে এমন কোনও কিছুর সঙ্গে সে নাম কি জড়ানো?'

'না, তা নয়।' একটু দুঃখের হাসি হেসে বললাম, 'তবু ওই নামটা পচা খোলসের মতো খুলে ফেলে তার সঙ্গে যা কিছুর সংস্রব সব ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা সুস্থ জীবন পাবার জন্য আপনি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এই লকনেসের রহস্যের দেশে এসে হাজির হয়েছেন। আর এর মধ্যে নানা জায়গায়, কে জানে কোন ফাঁকির কারসাজিতে গাদা-করা রাশি রাশি টাকা নানা সৎ কাজে দান করে নিজের মনের গ্লানি খানিকটা ধুয়ে ফেলতে চেয়েছেন।'

'হ্যাঁ,' জুহো এবার স্বীকার করেন, 'দুঃখী মানুষের উপকারের কাজে অনেক টাকা আমি নানা জায়গায় নিজের নামটুকু পর্যন্ত না জানিয়ে দান করেছি। তবে বিশ্বাস করুন, নানা জায়গায় দান যা করেছি তা কোনওরকম সাধারণ চুরি-ডাকাতি-জালিয়াতির টাকা নয়। সাধারণ বলছি এই জন্য যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চোরাই মালের আসামি হবার মতো অপরাধ না হলেও তা এখনকার যুগের কোটিপতি শেঠেদের একরকম দুর্দান্ত জালিয়াতি। এ জালিয়াতি কোনও আইনের শাসনে পড়ে না, কিন্তু টাকার জোরের সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের ধারালো বুদ্ধি থাকলে দুনিয়ার পয়সাকড়ির বাজার নির্ভয়ে নিজের খুশি মতো লুঠ করা যায়। বুদ্ধির সেরকম প্যাঁচালো ধার থাকলে টাকার জোরেরও দরকার হয় না। যেমন হয়নি আমার। ফাটকাবাজার যাকে বলে, দুনিয়ার সেই ব্যবসাদারির জুয়ার জগতের হাড়হদ্দ অতি সহজে বুঝে নিয়েই আমি সামান্য দু-চারটে নাড়াচাড়ার চালে যখন যেমন খুশি মুনাফা লুটতে পেরেছি। এ কাজে প্রথমে নামবার সময় আমার দুশমন বলে যাদের আপনি জেনেছেন, সেই দু-জনের সঙ্গে আমায় নিয়ম রাখতেই জোট বাঁধতে হয়েছিল। আমার বুদ্ধিতে এর পর অঢেল টাকা যখন উপায় হতে থাকে, তখন এই জোটের বন্ধন আমার গলায় ফাঁসি হয়ে ওঠে। আমার বুদ্ধিতে যত তাদের লাভের টাকা জমতে থাকে তাদের লোভও বাড়তে থাকে তত। আমার তখন সমস্ত ব্যাপারটায় ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও তাদের ধুলো-মুঠোকে সোনা-মুঠো করবার পরশপাথর হিসেবে আমায় তারা কিছুতেই মুক্তি দেবে না। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত নাম ভাঁড়িয়ে চেহারা লুকিয়ে এমন করে আমি পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এই অবস্থায় লকনেসের রহস্যভেদের মতো অসামান্য কিছু করলে আমি আমার সব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করে আবার সজ্জন মানুষের সমাজে মুখ দেখাতে পারব। আমি—'

'শুনুন, মি. গুস্তাভ নুটসন—' বলে বাধা দিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বলা আর হল না।

'কী? কী বললেন? কী নাম? গুস্তাভ নুটসন?' এতক্ষণ মঁসিয়ে জুহো বলে যাঁকে

ডাকছিলাম, তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'এ নাম আপনি কোথায় পেলেন? এ কার নাম?'

'নাম আপনারই,' শান্তভাবেই জবাব দিলাম, 'আর এই-ই যে আপনার আসল নাম তা আপনি ভাল করেই জানেন। আপনার দুশমনদের এড়িয়ে পালিয়ে থাকবার জন্য আপনি নাম আর চেহারা দুইই বদলেছেন, তবে নামটা বদলাবার একটা অন্য বড় কারণও আছে।'

'কারণ! অন্য কারণ—' বলে দু-বার ঢোঁক গিলে আমার প্রতিপক্ষ থেমে যাবার পর বেশ সহানুভূতির স্বরেই এবার বললাম, 'হ্যাঁ, মি. নুটসন, আপনার দুশমনদেরই ফরমাশে আপনাকে খুঁজে বার করতে গিয়ে আপনার সবকিছুই আমি জানতে পেরেছি। আপনি যা এইমাত্র আমায় শুনিয়েছেন তার কিছুই মিথ্যে নয়। আপনি সত্যিই যে আপনার বিশেষ বুদ্ধির জোরে দেশ-বিদেশের কারবারি জগৎ তোলপাড় করে তুলে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা উপায়ের ব্যবস্থা করে দেন, আর শেষে এ কাজে অরুচি শুধু নয়, সত্যিকার ঘেন্না ধরায় এ জগৎ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন, সে সব কথাই সত্যি। কিন্তু যে-কথাটা আপনি এখনও বলেননি, তা হল এই যে, অনেক অনুরোধ উপরোধ আর তারপর ভয়টয় দেখিয়েও আপনাকে নিজেদের কথায় রাজি করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওরা একটা মিথ্যে জুয়াচুরির সাজানো মামলায় আপনাকে জড়িয়ে দেয়। সেই সাজানো মামলা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্য লড়বার ধৈর্যটুকুও না থাকায় আপনি তার দায় এড়াতে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' দুঃখে রাগে তিক্ত স্বরে বললেন গুস্তাভ নুটসন, 'সেই জন্যই দেশে-দেশান্তরে এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আর সেই জন্যই লকনেসের রহস্যভেদের মতো এমন একটা কিছু করতে চাইছি যার জোরে সত্যিকার সজ্জন সভ্যসমাজে আমার কথা বুঝিয়ে বলতে পারার অধিকার পাব।'

'পাবেন, পাবেন,' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু তার জন্যই আপনাকে এখান ছেড়ে আমি যেখানে বলছি সেখানে চলে যেতে হবে—'

'থামুন, থামুন।' নুটসন আবার যেন খেপে উঠলেন। 'বারবার শুধু আমায় এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা! এখান থেকে চলে যেতে হবে বললেই চলে যেতে হবে! কোথায় যেতে হবে? কোথায়? আমায় এখান থেকে তাড়াবার পিছনে আপনার আসল মতলবটা কী, বলুন তো? কী ধান্দায় আপনি আমার পেছনে ঘুরছেন?'

'বলছি শুনুন।'"

॥ ৮ ॥

একটু থেমে ঘনাদা বললেন, "কিন্তু বলা আর হল না। ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। রিসিভার তুলে দু-বার শুধু 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়ে নুটসন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর আমার বাঁচার উপায় নেই।'

'উপায় নেই?' নুটসনের কথায় সত্যিই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে,

কী?'

হঠাৎ ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মতো একেবারে ভেঙে পড়ে ফ্যাকাশে মুখে নুটসন বললেন, 'ওরা এসে গেছে। নীচে হোটেলের কাউন্টারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আমার অনুমতির অপেক্ষায় বসে আছে।'

'আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে?' আমি যেমন অবাক তেমনই নুটসনের ওপর কিছুটা রেগেই বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ওরা চাইবে কী বলে? আপনার আসল-নকল কোনও নামই কি ওরা জানে? ওদের সঙ্গে আপনি যখন রহস্য-সংকেতের কাগজ নিয়ে দেখা করতে যান তখন তো তাতে নামটাম নয়, শুধু আপনার দেখা করবার পাস-এর একটা নম্বর দেওয়া ছিল।'

'হ্যাঁ, নামটাম নয়, শুধু তাই ছিল,' হতাশভাবে বললেন নুটসন, 'তাই ওরা এখানে এসে দারুণ চালাকি করেছে। নামটাম বলেনি। শুধু আমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছে যে, এই চেহারার একজন ভদ্রলোক খুব সম্ভব এই হোটেল থেকেই আজ সকালে তাদের সঙ্গে একটা বিশেষ কারণে দেখা করতে যান। তিনি যদি এই হোটেলেরই বোর্ডার হন তা হলে তাঁর নিজেরই বিশেষ দরকারে এখনই তাঁর দেখা পাওয়া অত্যন্ত দরকার।'

যেভাবে কথাগুলো বলা হয়েছে তাতে সন্দেহ করবার এমন কিছু নেই। হোটেলের কর্তারা তাই সরল বিশ্বাসে চেহারার বর্ণনা থেকে তাঁর নামটা বুঝে নিয়ে এইমাত্র ফোনে তাঁর কাছে দু-জন দর্শনপ্রার্থীকে পাঠাবার অনুমতি চেয়েছে।

'বুঝলাম।' গম্ভীর হয়েই আবার বলেছি, 'আপনি কী বলেছেন তাতে?'

'আমি—আমি—' হতাশ গলায় নুটসন বলেছেন, 'কী আর বলতে পারি আমি? ওদের লবিতে অপেক্ষা করতে বলে এখনই যাচ্ছি বলে জানিয়েছি।'

একটু থেমে নিজের রঙ-করা লালচে চুলগুলো মুঠো করে যেন ছেঁড়ার চেষ্টা করে নুটসন পাগলের মতো বললেন, 'এখন—এখন আমার এই হোটেলের জানলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে মরা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।'

'থামুন', রীতিমত কড়া গলায় ধমক দিয়ে এবার বললাম, 'আপনার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি। কারবারি দুনিয়াকে শুধু বুদ্ধির প্যাঁচে যে নাকানিচোবানি খাওয়ায়, আপনি যে সেই হিসেবের ভোজবাজির জাদুকর, একথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। শুনুন, হাত-পা ছেড়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতো কিছু হয়নি। যা বলছি শুধু তাই করুন এখন। আপনি নিজে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না। তার বদলে ওদেরই এখানে পাঠিয়ে দিতে বলুন আপনার হোটেলের কর্তাদের। আর—'

'ওদের এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?' আঁতকে উঠলেন নুটসন। 'তারপর—তারপর—বাঁচবার কোনও উপায় যে আর—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবে।' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনার কোনও ভাবনা নেই। যা-যা বলছি, শুধু তা-ই করুন। ওরা দু-জনে এখানে পৌঁছবার পর যেন অত্যন্ত খুশি হয়ে ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবেন, ভাল, ভাল। ভারতীয় জ্যোতিষের গণনা তা হলে শেষ হয়েছে। ওরা কিছু বলবার আগেই অধীর আগ্রহে আবার বলবেন,

বলুন, বলুন, গণনায় শেষ পর্যন্ত কী জানা গিয়েছে? আমি এখনই আমার কর্তাদের জানিয়ে দেব।

নিজেরা জ্যোতিষ গণনার বিষয়ে কিছু বলতে না পেরে আপনার কর্তারা আবার কারা তা ওরা জানতে চাইবে না নিশ্চয়। আপাতত আপনার নাম-ঠিকানাটা জানতে পারাই যথেষ্ট লাভ মনে করে আবোলতাবোল কিছু বলে ওরা বিদায় নেবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু তারপর?' নুটসন হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর ওরা কি লকনেসের জলে হাত-পা ধুয়ে ব্যাপারটায় দাঁড়ি টেনে চলে যাবে নিজেদের ধান্দায়?'

'না, তা যাবে না।' গম্ভীরভাবেই বললাম, 'তারপরেই বড় খেলা আরম্ভ বলতে পারেন। কিন্তু আপাতত এই প্রথম ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠুন তো! নিন, ফোন করুন নীচের লবিতে। আমি ততক্ষণ এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখি। কামরার ওধারে ওই বিরাট ওয়ার্ডরোবের ভেতরেই গিয়ে লুকোচ্ছি।'

'ওয়ার্ডরোবের ভেতরে!' নুটসন বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু ওখানে যদি—'

'না,' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে একটু হেসে বললাম, 'ওখানে ওরা খোঁজাখুঁজি করবে না। আর তা ছাড়া, ওয়ার্ডরোবের ভেতরে থাকা আমার একরকম অভ্যাসই হয়ে যাচ্ছে।'

নুটসনের স্যুইটের এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে যা দেখবার দেখে নিয়ে বিরাট ওয়ার্ডরোবটায় গিয়ে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার কিছু পরেই নুটসনের দুই দর্শনপ্রার্থীকে জ্যানিটর এই স্যুইটে পৌঁছে দিল।

প্রথম দিকে যেমনভাবে বলে দিয়েছিলাম সেই মতোই আলাপ করে নুটসন তার দুই দুশমনকে বেশ একটু বেকায়দাতেই ফেলেছিল, কিন্তু তারপরই প্রসঙ্গটা বদলে তারা যে বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল, অপ্রস্তুত নুটসনের তাতে নিশ্চয় হাত-পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম হলেও আমি সেইরকম কিছুর জন্য তৈরি হয়েই ছিলাম।

নুটসনের মুখে আমার শেখানো প্রশ্ন ক-টার জবাব দিতে বেশ খানিক বিব্রত হয়ে হঠাৎ তারা ফাঁদের আসল ফাঁসটাই টেনে বসল।

'কিছু যদি মনে না করেন,' শুঁটকো ডুগান তার প্যাঁচালো বুদ্ধিতে কথাগুলো শানিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার পাসপোর্টটা যদি একবার একটু দেখান!'

'পাসপোর্ট?' নুটসনের হতভম্ব গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে আতঙ্কটাও আর গোপন রইল না। 'পাসপোর্ট কেন?'

'না, অন্য কিছু নয়,' শুঁটকো ডুগান আশ্বাস দিয়ে বললে, 'ওই জ্যোতিষের গণনার জন্যে আপনার পাসপোর্টের ক-টা নম্বর নাকি দরকার। তা পাসপোর্টটা দেখাতে আপনার আপত্তি কিছু—'

ডুগানের কথা আর শেষ হল না। নুটসনের মুখে যে আতঙ্ক খানিক আগে থেকে ফুটে উঠেছে, সেই আতঙ্কেরই গাঢ় ছায়া তখন তার আর কার্ভালোরও মুখের ওপর।

দু-তিন সেকেন্ড কান খাড়া করে স্থির হয়ে বসে তারা লাফ দিয়ে উঠে স্যুইটের বাইরে এক জানলার ধার থেকে নীচে নেমে যাওয়া ফায়ার এস্‌কেপের দিকে ছুটে গেল।

হ্যাঁ, সমস্ত হোটেলে তখন প্রচণ্ড শব্দে ফায়ার এলার্ম মানে আগুন লাগলে তা থেকে পালাবার জন্য হুঁশিয়ারির সাইরেন বাজছে।

গোলমেলে কিছু অবস্থা দেখা দিলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার এই ফন্দি এঁটে আমি আগেই বৈদ্যুতিক তার-টার নেড়েচেড়ে তবেই ওয়ার্ডরোবে ঢুকেছিলাম।

ফায়ার অ্যালার্ম বাজবার পর সমস্ত হোটেলে রীতিমত হুলুস্থুলু যে পড়ে গেছল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথম হইচই থামবার পর খোঁজাখুঁজি করে অবশ্য এরকম সাইরেন বাজবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ত্রুটিতে এরকম ভুল হুঁশিয়ারি কখনও কখনও হয় বলেই এটাকে সন্দেহজনক কিছু বলে কেউ মনে করেনি।

হোটেলের অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে নীচের ফাঁকা জায়গায় নেমে তাদের ভিড়ের ভেতর থেকে লুকিয়ে নুটসন, ডুগান আর কার্ভালোর ওপর আমি নজর রাখতে যতটা সম্ভব কাছাকাছিই ছিলাম।

সেদিনকার মতো নুটসনের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় শেষ কথা তারা যা বলে গেল, সেইটি শোনার অপেক্ষাতেই অবশ্য আমি ছিলাম।

হোটেলের এই গোলমালে সেদিনকার মতো চলে যাওয়া উচিত মনে করলেও তার পরের দিনই নুটসনের পাসপোর্টটা দেখতে আসবে বলে জানিয়ে গেল।

আগুন লাগার মিথ্যে হুঁশিয়ারি সাইরেন নিয়ে হোটেলের শোরগোল ক্রমশ থেমে যাবার পর নুটসন তার স্যুইটে ফিরে গেলে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলাম।

তার অবস্থা তখন প্রায় আধা-পাগলের মতো। একটা মাঝারি সাইজের স্যুটকেসে নেহাত দরকারি কিছু জিনিস খুঁজেপেতে নেবার জন্য সমস্ত কামরায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে আমায় দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'কী হল, দেখলেন তো? এখন এক্ষুনি এখান থেকে না পালালে নয়।'

তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তা তো নয়ই। আর এইটেই তো চেয়েছিলাম।'

চমকে আমার দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের সুরে নুটসন বললেন, 'চেয়েছিলেন মানে? আজ রাত্রে এই অবস্থায় তাড়া-খাওয়া চোরের মতো আমি যাতে পালাই, তাই আপনি চেয়েছিলেন? ওই ভুল সাইরেন বাজায় তা হলে আপনি খুশি?'

'নিজেই যার ব্যবস্থা করেছি', সরল ভাবেই বললাম, 'তাতে খুশি হব না?'

'তার মানে?' নিজের কান দুটোকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন বিমূঢ় গলায় নুটসন বললেন, 'ওই মিথ্যে সাইরেন বাজানোটা আপনারই কারসাজি?'

'হ্যাঁ,' বাহাদুরিটা সানন্দে স্বীকার করে বললাম, 'ওটা আমার এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল বলতে পারেন। ঠিক সময়মত ওটা বাজিয়ে একদিকে আপনার পাসপোর্ট দেখানোটা তখনকার মতো যেমন থামিয়ে রেখেছি তেমনই আজ রাত্রেই যাতে ইনভারনেস ছেড়ে পালাতে হয় সেব্যবস্থাও করেছি ওই এক চালে।'

'আপনি—আপনি—' নুটসন রাগে প্রায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে সেটা যতক্ষণে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন, সেই অবসরে নিজের কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, 'একবার

পাসপোর্ট দেখবার বুদ্ধি যখন ওদের মাথায় এসেছে তখন আজ না দেখবার সুযোগ পেলেও এই খোঁজে ওরা লেগে থাকবেই। নিজেরা না পারলে শেষ পর্যন্ত এখানকার পুলিসের কাছেই ওরা একটা হারানো পাসপোর্ট খোঁজার জন্য সাহায্য চাইবে, আর সে পাসপোর্ট অন্য কারও নয়, আপনার আসল যা নাম সেই গুস্তাভ নুটসন নামে—সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আর আমার মতে—এক্ষুনি, আপনার না পালালে নয়। শুধু তাই নয়, পালিয়ে যেমন দুশমনদের হাত থেকে ছাড়া পাবেন, তেমনই যে জন্য জীবনপাত করছেন, লকনেসের সেই রহস্যও ভেদ করতে পারবেন।'

'সেই রহস্য ভেদ করতে পারব এখান থেকে পালিয়ে?' এতক্ষণে বাকশক্তি ফিরে পেয়ে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে নুটসন বললেন, 'আপনি কি নিজে উন্মাদ, না আমার সঙ্গে জড়ভরতের বুদ্ধি নিয়ে রসিকতা করছেন? লকনেসের অজানা জলচর দানবের রহস্য এখানে এই ইনভারনেসে, আর আপনি বলছেন আমি তা ভেদ করার উত্তর পাব এখান থেকে পালিয়ে? পালিয়ে যাব কোথায়? শুধু পালালেই কার্যসিদ্ধি হবে?'

'না,' জোর দিয়ে বললাম, 'যেখানে হোক নয়, পালাতে হবে বিশেষ একটি জায়গায়।'

'সেটা কোথায়?' কোনওরকমে এক উন্মাদের সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য না হারিয়ে জিজ্ঞেস করলেন নুটসন।

'সেটা ধরুন মাদাগাস্কারে।'

আমার কথায় এবার হোহো করে হেসে উঠে নুটসন বললেন, 'ঠিক, ঠিক! ঠিক নিশানাই দিয়েছেন এবার। অবশ্য এর বদলে কামস্কাটকা কি গুয়াতেমালাও বলতে পারতেন?'

'না,' গম্ভীর হয়েই এবার বললাম, 'গুয়াতেমালা কি কামস্কাটকা নয়, যেতে হবে ওই মাদাগাস্কার ছাড়া আর কোথাও নয়।'

'বটে!' ঠিক উন্মাদকে প্রশ্রয় দেবার মতো গলায় নুটসন বললেন, 'তা শুধু ওখানেই কেন?'

'শুধু ওখানেই এই জন্যে যে,' আমি শান্ত গলায় ধীরে-ধীরে বললাম, 'যাকে নিয়ে লকনেসের রহস্য, সেই জলচর দানবটি পৃথিবীর আদ্যিকালের প্লিসিওসোরাসের বংশধর বলে বহু বৈজ্ঞানিক মনে করছেন। ফসিল মানে জীবাশ্মের প্রমাণে প্লিসিওসোরাসের বংশ যদিও বহু কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবু পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ জীবগোষ্ঠীর ধারার মধ্যে এরকম এক-আধটা ধারা প্রায় অমর হওয়ার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। লকনেসের বেলায় তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করবার উপায় ওই মাদাগাস্কারেই পাওয়া যেতে পারে। কেন, কেমন করে তা পাওয়া সম্ভব, তা বোঝাবার জন্য আমার সংকেত-লিপির সংস্কৃত শ্লোকটি আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—শ্লোকটির আরম্ভেই পাচ্ছি:

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রখেদম্‌...
কেশব ধৃতমীনশরীর। জয় জগদীশ হরে।

একটা আশ্চর্য কথা একটু মন দিয়ে এবার শুনুন, নুটসন। পৃথিবীর কোনও দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে পুরাণে যা নেই, আমাদের এই ভারতবর্ষের যোগী-ঋষি-সাধকেরা সভ্যতার উন্মেষের আগে কোন দিব্যদৃষ্টির শক্তিতেই অবতার রূপে কল্পনা করে পর পর যে-সব জীবগোষ্ঠীর উদ্ভব ও প্রাধান্যের কথা তাঁরা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানে সেইসব অনুমানই সঠিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে প্রথম অবতার বলে যে জীবগোষ্ঠীর নাম করা হয়েছিল তা হল মৎস্য। মৎস্যের পর এসেছে কূর্মের নাম, তারপর অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে বরাহের। বরাহের পর নৃসিংহ ও বামনরূপী অবতারকে যেভাবে কল্পনা করা হয়েছে তাতেই আধুনিক বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ সন্ধানী আবিষ্কারে তাঁরা কেমন করে পৌঁছেছিলেন, ভেবে অবাক হতে হয়।

অন্য সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রথম মৎস্যাবতারের কথাই ধরলে কোটি-কোটি বছর আগেকার প্লিসিওসোরাসই তার আদিরূপ ভাবলে বোধহয় খুব ভুল হয় না।

কালে-কালে নিজের সঙ্গী-সাথী আর ধারা একে একে নির্বংশ হয়ে গেলেও লকনেসের বুকে একটি শাখা যদি কোনওরকমে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে, তা হলে কোনও গুপ্ত খাত দিয়ে ইনভারনেসের পাহাড়তলির তলায় কোনও বিরাট পাতালসাগরে পালিয়ে থাকবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের একটি-দুটিকে অন্তত নির্ভুল চার আর টোপের প্রলোভনে বার করে এনে ধরা যেতে পারে। সে নির্ভুল চার আর টোপ বলতে কী বুঝব? লকনেসের রহস্যময় জলদানবদের বহু কোটি বছর আগে বিলুপ্ত বলে ধরে নেওয়া যে জীবগোষ্ঠীর একটি অতি ক্ষীণ, আশ্চর্যভাবে টিকে থাকা প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, সেই প্লিসিওসোরাসের আহার ও বিচরণক্ষেত্র বলতে যা বোঝায় তাই বুঝব নিশ্চয়ই।

বহু কোটি বছর আগে যার মূলধারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সে প্রাণীর মনের মতো চেনা খাবার আর পরিবেশ কি এখন আর পাওয়া সম্ভব? পরিবেশ না হোক, আহারটা পাওয়া সত্যিই যে অসম্ভব নয়, এইটিই এ যুগের পরমাশ্চর্য এক আবিষ্কার।

ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝিয়ে দিতে হলে বলতে হয়, প্লিসিওসোরাস আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণের আদি মৎস্যাবতার। অর্থাৎ সৃষ্টিতে জীব বিবর্তনের ইতিহাসে এই মৎস্যাবতারই আদি মনুর রক্ষক আর বাহন।

আদি মনুর বাহন বা রক্ষক সেই মৎস্যাবতারকে প্রলুব্ধ করে ধরবার জন্য একমাত্র মান্ধাতার টোপই তা হলে প্রয়োজন।

কোথায় মিলবে সে মান্ধাতার টোপ? তা পাওয়া কি সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। বহু কোটি বছর আগে বিলুপ্ত-প্রায় প্লিসিওসোরাসের একটি সমবয়সী জীবগোষ্ঠীর ধারা এখনও ক্ষীণভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

চলেছে আর কোথাও নয়, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের মাদাগাস্কার দ্বীপের

সমুদ্রে। কোটি কোটি বছর ধরে একই চেহারা-চরিত্র আর দেহ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা যে টিঁকে আছে মাদাগাস্কারের সমুদ্র উপকূলে গত দুই-তিন দশকে মৎস্য-শিকারিদের ছিপে আর জালে ধরা পড়া নিদর্শনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।

শুনুন, মি. নুটসন, এখন আর কোথাও নয়, এখান থেকে পালিয়ে সেই মাদাগাস্কারে গিয়েই একটি অন্তত জীবন্ত মান্ধাতার টোপ আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। আদি মনুর বাহন ও রক্ষক প্রথম মৎস্যাবতারের নাম যেমন প্লিসিওসোরাস, তাকে প্রলুব্ধ করে ধরবার এই মান্ধাতার টোপেরও বৈজ্ঞানিক নাম তেমনি হল সিলাকান্থ।

এই সিলাকান্থ-এর একটা-দুটো ছানাপোনা যদি কোনও রকমে সংগ্রহ করে এনে এই লকনেসের জলে ছাড়তে পারেন তা হলে কী ভোজবাজি হয়ে যাবে তা বুঝতে পারছেন কি?

লকনেসের গহনে গভীরে আদি প্লিসিওসোরাস গোষ্ঠীর যে ক-টা বংশধর যেখানেই এখনও টিকে থাকুক, দু-দশ হাজার নয়, এমন দশ-বিশ কোটি বছরের সঙ্গী থাকার স্মৃতির টানে, আর কোনও কিছু নয়, শুধু একটু গা-ঘষাঘষির লোভেই তারা পিলপিল করে ছুটে আসবে। তখন একটু বুদ্ধি করে জাল ফেলার ব্যবস্থা করে তাদের একটা-আধটাকে ধরা তো কোনও সমস্যাই নয়।

শুনুন, কথায়-কথায় অনেক রাত হয়েছে, তবু আপনার বিশ্রামের অবসর আর নেই। হোটেল থেকে লুকিয়ে বার হয়ে আপনি সোজা গলিঘুঁজির পথে ইনভারনেস স্টেশন ইয়ার্ডে চলে যান। কোনও যাত্রী-ট্রেন সেখান থেকে এখন আর পাবেন না। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছি যে, একটি খালি মালগাড়ি সেখান থেকে মাঝ-রাত্রে ছেড়ে এডিনবরা পর্যন্ত যাবে। সেই মালগাড়ির একটা খালি ভ্যানে উঠে লুকিয়ে এডিনবরা পর্যন্ত চলে যান, তারপর সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে প্লেনে সোজা মাদাগাস্কার। ইচ্ছে মতো খরচ করবার যথেষ্ট টাকা জোগাড়ের ক্ষমতা আর উপায় যে আপনার আছে তা আমি ভাল করেই জানি। সুতরাং মাদাগাস্কারে গিয়ে জীবন্ত সিলাকান্থ ধরে আনতে যে আপনি পারবেন, সে-বিশ্বাস আমার আছে। আপনার দুশমনেরা যাতে শেষ মুহূর্তে কোনও শয়তানি না করতে পারে, সেই পাহারায় আমি এখানে রইলাম। আপনি এক্ষুনি রওনা হয়ে যান।' "

ঘনাদা একটু থেমে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে প্রসন্ন মুখেই বললেন, "ইনভারনেস থেকে নুটসনের বাজিমাতের টেলিগ্রামের জন্যই অপেক্ষা করে আছি। খুব বেশি দেরি বোধহয় আর হবে না।"

অগ্রন্থিত

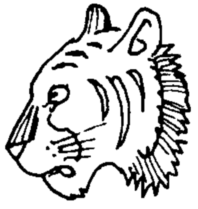

ঘনাদার বাঘ

শিবু প্যাঁচটা ভাল কষেছে।

ক-দিন ধরে হাওয়াটা বেয়াড়া বইছিল।

বাহাত্তর নম্বরের সময়টা এরকম মাঝেমধ্যে একটু আধটু যায় না এমন নয়। যা কিছু করি, গুমোট যেন আর কাটতে চায় না। টঙের ঘরে তাঁকে তখন কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। কখনও তিনি কোনও কিছু ঘোষণা ছাড়াই পূর্ণ অসহযোগ চালিয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর বিদ্যাসাগরি চটি ছোঁয়ানই না। আবার কখনও সকাল বিকেল দুবেলা আমাদের সঙ্গে ওঠবোস করেও মুখে যেন কুলুপ দিয়ে রাখেন। কুলুপ খোলাতে মোগলাই চাইনিজ ফরাসি কতরকম রসুইয়ের কেরামতি যে লাগে তার হিসেব দেওয়া শক্ত।

কিন্তু এবার অবস্থাটা একেবারে আলাদা। আমাদের সেই টঙের ঘরের তিনি নন, তাঁরই চেহারা জাল করে আর যেন কে আমাদের বাহাত্তর নম্বরের উপর ভর করেছেন। চেহারা এক, কিন্তু ভাবগতিক ধরনধারণ সব যেন আলাদা। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তো সে মানুষের পছন্দ অপছন্দের কোনও হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।

"যা রাবড়ি পাকিয়েছে দেখে এলাম মোড়ের মিঠাইওয়ালা"—আমি হয়তো ক-দিন ধরে চপ কাটলেট কাবাব চিনা-চপসুয়ে ইত্যাদি হার মানবার পর বাইরে থেকে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ফলাও করে বর্ণনা করেছি। আমার রসালো বর্ণনা আরও মারাত্মক করে তোলবার জন্য গৌর যেন আমার ওপর খাপ্পা হয়ে ভেংচি কেটে বলেছে, "রাবড়ি পাকিয়েছে মিঠাইওয়ালা, তুমি দেখে এলে! তাতেই আমরা কৃতার্থ হয়ে গেলাম, কেমন!"

"কেন? কেন?" আমি যেন বোকা সেজে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছি, "গণেশ হালুইকরের সদ্য উনুন থেকে নামানো রাবড়ির কড়াইয়ের ভুরভুরে গন্ধে সারা মিঠাইপাড়া মাত হয়ে গেছে। তাই দেখে এসে আমার বলাটা কী অন্যায় হয়েছে, শুনি?"

"দোষের এই হয়েছে যে," শিশির গৌরের হয়ে কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়ে বলেছে, "তোমার বর্ণনা শুনে আমাদের এখন বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। গণেশ হালুইকরের রাবড়ির কড়াইয়ের বর্ণনা দিতে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসার বদলে দু-কিলো কিনে আনতে পারলে না। গণেশ হালুইকরের রাবড়ির কড়াই একবার ভিয়েন থেকে নামবার পর কতক্ষণ দোকানে পড়ে থাকে! এতক্ষণে কড়াই চাঁছাপোছা হয়ে সব বিক্রি হয়ে গেছে দেখো গিয়ে! তবু পাঠিয়ে দেখি একবার

বনোয়ারিকে, কী বলেন ঘনাদা?”

শেষ কথাগুলো ঘনাদার দিকে চেয়ে যেন তাঁর অনুমতি নেওয়া।

কী বলেছেন তাতে ঘনাদা? অনুমতি দিয়েছেন, না জানিয়েছেন আপত্তি?

কী যে করেছেন সেইটে বোঝাই শক্ত।

আপত্তি ঠিক করেছেন তা বলা যায় না, কিন্তু যা বলেছেন, সেটাকে সানন্দ না হোক, কোনওরকম অনুমতিই বলা চলে কি?

নিজের মৌরসি আরাম-কেদারায় বসে হাতের কাগজটা থেকে মুখ না তুলেই নির্লিপ্ত গলায় তিনি বলেছেন, “রাবড়ি আনাবে? তা ইচ্ছে হয়, আনাও। আর কিছু না হোক গায়ে চর্বি জমবে, ভুঁড়ি বাড়বে। মানে—”

ঘনাদাকে আর কিছু বলতে হয়নি। তিনি পরের কথাটা আরম্ভ না করতেই মেজাজটা বুঝে নিয়ে শিবু চাল বদলে ফেলেছে।

“রাবড়ি খাবে, রাবড়ি?” সে আমাদের ভেংচিয়ে বলেছে, “রাবড়ি খায় কারা? যত নিষ্কর্মা পেটুক। রাবড়ি খায় আর কুমড়োপটাশ হয়ে একদিন ফুটিফাটা হয়ে মারা যায়। না, না, ওসব রাবড়ি-টাবড়ি বাহাত্তর নম্বরে আর চলবে না।”

ওদিকে কোপ্তা কাবাব মোগলাই পরোটাও নয়, আবার তার বদলে রাবড়িও না। তাহলে চলবেটা কী? সে জিজ্ঞাসাটা জিভের ডগায় এলেও কেউ আর আমরা করিনি। যাঁর জন্য এত পাঁয়তারা সেই তিনিই হঠাৎ কী যেন একটা অত্যন্ত দরকারি কথা মনে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন।

“ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়, ঘনাদা?” আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন যেন ভাল করে শুনতেই না পেয়ে কী একটা অস্পষ্ট জবাব দিয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর টঙের ঘরে চলে গেছেন।

তা চলুন। মুশকিল আসানের চাবিকাঠি আমরা বোধহয় পেয়ে গেছি। অন্তত শিবুর তা-ই ধারণা। টঙের ঘরে উধাও হবার পর সেদিনই আড্ডাঘর থেকে তার নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় হলেও কেল্লাফতের মতো উত্তেজনা নিয়ে বলেছে, “আর বোধহয় ভাবনা নেই। এবারকার ফুসমন্তর মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি।”

“এবারকার ফুসমন্তর?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। “সে আবার কী?”

“সে আবার কী বুঝিয়ে বলতে হবে?” শিবু আমার বুদ্ধির স্থূলতায় হতাশ হয়ে বলেছে, “ওঁর মেজাজ তাতিয়ে সুরে বেঁধে টঙ্কার ছাড়াতে কখন কী মোচড় লাগে তার ঠিক আছে? ওই মোচড়কেই বলছি ফুসমন্তর। কখনও তা কুলপির বদলে গরম কফি, আবার কখনও রাবড়ির বদলে মাথা না ঘামানো কিছু—মানে অ্যাকশন। হ্যাঁ, এবারের ফুসমন্তর হল তাই।”

তা সেই ফুসমন্তরই শিবু প্রয়োগ করল পরের দিন সকালে। দিনটা ছিল রবিবার। তাই সকাল থেকেই আমরা যথাস্থানে জমায়েত হয়েছি। টঙের তিনি আসতে একটু দেরি করে আমাদের উদ্বেগ বাড়ালেও শেষ পর্যন্ত উদাস উদাস কেমন একটু

অন্যমনস্কভাবে নিজের মৌরসি চেয়ারটি দখল করেছেন। আসরটায় নেহাত ছাতা না ধরে যায় সেইজন্য আমরা ফুটবল নিয়ে হাওয়া গরম রাখবার চেষ্টা করতে করতে শিবুর নাটকীয় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছি।

কিন্তু কোথায় শিবু? ফুটবল আর স্টেডিয়াম নিয়ে ঝগড়ার সব পুরনো খোঁচাখুঁচিগুলো যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন শিবু এসে ঘরে ঢুকেছে সত্যিই নাটকীয় ভাবে।

তবে তার প্রবেশের চিত্রনাট্যটা একটু আলাদা বলে প্রথমে একটু ভড়কেই যে গেছলাম তা অস্বীকার করব না।

ঠিক ছিল যে ফুটবল নিয়ে আমাদের নকল ঝগড়ার মাঝে শিবু একেবারে ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকে একপাক নেচে নিয়েই—তারপর ঘোষণা করবে—'মার দিয়া! মার দিয়া কেল্লা।'

'কী মার দিয়া? কোন কেল্লা আবার মেরে এলে?' আমাদের গলায় উঠবে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। 'আবার তোমার সেই বাহাত্তর নম্বরের বদলে নতুন কোনও বাসা-টাসার খোঁজ নয় তো?'

'না, না'—শিবু আমাদের আশ্বস্ত করে জানাবে—'নতুন বাসা-টাসা নয়, বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে খাস অমরাবতীর জোড়া ফ্ল্যাট পেলেও যে কেউ তোমরা নড়বে না তা জানি। ওসব কিছুর বদলে কোন কেল্লা ফতে করেছি একটু আন্দাজ করো তো দেখি!'

এরপর প্যারিসের ভারত মেলায় যাবার ফ্রি টিকিট থেকে স্বয়ং পেলেকে একদিন বাহাত্তর নম্বরে এনে খানাপিনা করানো পর্যন্ত আন্দাজ করে হার মানবার পর শিবু তার 'কেল্লা ফতে'টা ব্যাখ্যা করে আমাদের অবাক করে দেবে এই ছিল কথা।

তার জায়গায় শিবুর একী নাটকীয় প্রবেশ! সে যেন পালছেঁড়া হালভাঙা নৌকোর মতো কোনওরকমে বন্দরে এসে ভিড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে হতাশ গলায় বলেছে, "না, আর হল না।"

সিনারিও বদলেছে। কিন্তু পরের সংলাপটা আপনা থেকেই মুখে এসে গেল। সত্যি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী, হল না-টা কী?"

"সে আর বলে কী হবে?" শিবু একটু বেশি পাঁয়তারা কষে বললে, " যা সুবিধেটা হয়েছিল!"

"কী সুবিধেটা হয়েছিল, কী?" ভান না করে বিরক্তি নিয়েই এবার বললাম, "অত ধোঁয়া-টোঁয়া না ছেড়ে সাফ কথাটা বল দেখি।"

"সাফ কথা বলব?" শিবুর যেন বলতে গিয়ে গলা ধরে এল দুঃখে। "সাফ কথাটা হল, সুন্দরবন।"

সুন্দরবন! আমরা সত্যিই হতভম্ব। সুন্দরবনে আবার কী?

"সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম শুনেছ!" শিবু যেন আমাদের ওপরেই গরম হয়ে বলেছে, "লাট-বেলাট হলেও সেখানে যাবার হুকুম মেলে না। এক কাঠুরে কি মধু-জোগাড়ে সেখানে যেতে পারে প্রাণ হাতে নিয়ে, গেলে অবশ্য প্রাণটি তার হাতেও বেশিক্ষণ থাকবে না। কাঠ কাটতে কি মধু জোগাড় করতে যারা যায় তারা

যাবার আগে নিজেদের শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ সেরেই যায় বলে শুনেছি। সরকারি বনবিভাগের তাই সেখানে কড়া পাহারা। অনুমতি না নিয়ে কেউ যেন সেখানে না যায়, আর অনুমতি কেউ যেন না পায় সেদিকেও কড়া নজর।"

শিবুর নতুন চালটা এতক্ষণে কিছুটা বুঝে ফেলেছি। তাই সবজান্তার চালে বললাম, "তা কড়া নজর তো হবেই। দুনিয়া থেকে বাঘ প্রাণীটা যাতে লোপ না পায় তাই জন্যেই এই ব্যবস্থা। বাঘ যেখানে গিজগিজ করত সেই সুন্দরবনে বাঘ মাত্র এখন এই কত—মানে বড় জোর কত হবে—এই ধরো হাজারখানেক।"

এদিক থেকে নাসিকাধ্বনির মতো একটা যেন শব্দ শুনলাম, সেটা ঘনাদারই কি না তা বোঝবার আগেই শিবুর ভেংচিকাটা ঠাট্টা শোনা গেল—"হাজার-দুহাজার! সুন্দরবনে হাজার দু-হাজার বাঘ! প্রমাণ করতে পারলে রয়্যাল জুয়োলজিক্যাল সোসাইটির সভ্যপদ তো বটেই, চাইকী প্রাণীতত্ত্বে নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারিস।"

"মারটা এবার ইংরেজিতে যাকে বলে বিলো দ্য বেল্ট মানে কোমরের নীচে হয়ে যাচ্ছে না?" চটে উঠেই বললাম, "হাজার দু-হাজার না তো কত, তুই জানিস? ঠিক কি কেউ জানে, না জানতে পারে?"

"হ্যাঁ, প্যারে, আর পেরেছে।" শিবু এবার আসর জমিয়ে বললে, "বারো বছর আগে উনিশশো তিয়াত্তরে সুন্দরবনে বাঘ কত ছিল জানো? মাত্র একশো পঁয়ত্রিশ। হ্যাঁ, খুশি মতো অবাধ শিকার করার অত্যাচারে বাঘ তখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে পৃথিবী থেকে। বাঘ তো শুধু এশিয়ারই প্রাণী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেই সাইবেরিয়া থেকে এই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বর্মা মালয় থেকে সুমাত্রা ফিলিপাইন ইত্যাদি দ্বীপে। যা আছে তাও ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে এখানেও, যা তাদের আসল আস্তানা সেই ভারতবর্ষেই।"

শিবুর বক্তৃতার দিকে কানটা রাখলেও আড়চোখের দৃষ্টিটা আছে ঘনাদার দিকে, কখন তিনি শিবুর মাতব্বরির মাপসই জবাবটা দেন।

কিন্তু কই? তিনি তো বেশ নির্বিকারভাবে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন।

শিবুর প্যাঁচটা কি তাহলে ভেস্তে গেল? না, তার পটকার বারুদ ভিজে। ভাল করে ধরতে চাইছে না।

শিবু তখন বলে যাচ্ছে, "হ্যাঁ, এই ভারতবর্ষে বারো বছর আগে মোট মাত্র এক হাজার আটশোটি বাঘ ছিল। তা-ও সেই ১৯৫৫-র গোড়ায়। বন্দুক হাতে পেলেই ট্রিগার টানার আঙুল সুড়সুড় করা এক খ্যাপা শিকারির গুলিতে ত্রিশ-ত্রিশটা তাগড়া বাঘ মারা যাবার পর মধ্যপ্রদেশের অনেকটা জায়গা ন্যাশনাল পার্ক বলে ঘোষিত হবার পরও—"

"তা যা সব হবার তা তো হয়েছে," শিবুকে একটু থামিয়ে হুঁশিয়ার করবার জন্যই এবার বলতে হল, "কিন্তু সুন্দরবনের কথা হঠাৎ এল কেন? আর নাম করতে গলাটা

অমন করুণ হল কীসে?"

"করুণ হল কীসে?" শিবু দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বললে, "হল যে মওকাটা মিলছিল সেট, ফসকে গেল বলে।"

"মওকাটা কী?" এবার শিবুর সঙ্গে সঙ্গত চলল আমাদের—"ওই সুন্দরবনে যাওয়ার? সে তো ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়। শুধু বনবিভাগ দপ্তর থেকে একটা পাশ জোগাড় করলেই হল।"

"হ্যাঁ, তাই হয় বটে?" শিবু ভারিক্কি চালে বলল, "কিন্তু পাশ দেওয়া এখন এক্কেবারে বন্ধ বললেই হয়।"

"কেন, হঠাৎ এত কড়াকড়ি কেন?" আমাদের কৌতূহল।

"কড়াকড়ি শুধু ওই কানকাটার জন্য!" শিবু প্রায় কাঁপা গলায় জানাল।

"কানকাটা? কানকাটা আবার কে?"

"কে বা কী তা ঠিক কেউ কি জানে? কেউ যে তাকে দেখেছে তাও জোর করে বলতে পারে না," শিবু গলাটা কেমন একটু নামিয়ে বললে, "শুধু নানান সব আজগুবি কথা তাকে নিয়ে কানাকানি হয়। সোঁদরবনের জঙ্গলে সে কখন কোথায় হানা দেবে তার কোনও হদিস পাবার উপায় নেই। এই নাকি সেদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে হাঁসখালির চাষিগাঁয়ের মাইল দুয়েক মাত্র দূরে। চার কাঠুরে আর মধু-জোগাড়ে মিলে গাদা-বন্দুক আর কাস্তে-বল্লম নিয়ে অতি হুঁশিয়ার হয়ে ছোট একটা খাল পেরিয়ে ওদিকের লাট অঞ্চলে যাচ্ছিল। খালটা নেহাত ছোট, হাঁটুজলও হবে না। সেইটুকু পার হয়ে ওদিকে শুকনো ডাঙায় উঠে সবাই একেবারে থ। ছিল তারা চারজন। চারজন একসঙ্গে খালে নেমেছিল, তা আর-একজন গেল কোথায়? তা খালে চোরাবালি কি গাড়াগর্ত নেই যে তলিয়ে যাবে। কুমির নেই যে টেনে নিয়ে যাবে। আর তা নিলেও ঝটপটানির আওয়াজ পাওয়া যেত! সাড়া নেই, শব্দ নেই, হঠাৎ একটা মানুষ হাওয়া হয়ে গেল কী করে?

'এ সেই কানকাটা ছাড়া আর কেউ নয়।' মুখ দিয়ে ভয়ে না বার হোক, সকলের মনে সেই এক কথা। কানকাটা মানে সোঁদরবনের সেই দুশমন শয়তান যাকে চোখে কেউ দেখেছে কি না ঠিক নেই। কিন্তু ওই কানকাটা বর্ণনাটাই কেমন করে তার সঙ্গে জুড়ে গেছে। কানকাটা বলতে যে ভয়ংকর এক প্রাণীর মুখের ইঙ্গিত দেওয়া হয় সেটার সঙ্গে নাকি বাঘেরই কিছু মিল আছে। মিল চেহারায় একটু থাকলেও আর-কিছুতে নয়। এ শয়তান দুশমন নাকি যেখানে যখন খুশি দেখা দিতে পারে। জমিতে নাকি তার থাবার দাগ পড়ে না। ছায়াও পড়ে না কোথাও তার শরীরের।

এই কানকাটার যে সব ভয়ংকর ব্যাপারের কথা সুন্দরবনের এক অঞ্চলে মুখে মুখে ফিরছে তা আজগুবি গল্প, না তার মধ্যে কিছু সত্য আছে এখনও স্থির করতে না পারলেও আমাদের বনবিভাগের সাবধানের একটু কড়াকড়ি বাড়াতে হয়েছে, এই হয়েছে মুশকিল।" শিবু শেষ কথাগুলি বলে যেন হতাশ হয়ে থামল। না, আজ শিবুকে সত্যিই বাহাদুরি দিতে হয়। এতক্ষণ ধরে আসর দখল করে রাখলেও সে খেলাটা সাজিয়েছে ভাল। এখন আমরা ঠিক মতো দু-একটা ঘুঁটি নাড়তে পারলেই বাজিমাত হতে পারে।

শিবুর এগিয়ে দেওয়া ঘুঁটিটাই তাই নাড়লাম। বললাম, "কড়াকড়ি বাড়িয়েছে, মুশকিল তো এই? পাশ দেওয়া বন্ধ তো করেনি? তা কড়াকড়িটা কী বাড়িয়েছে? কী তারা চায়, কী?"

"কী চায়?" শিবুর গলায় গভীর হতাশা। "তারা চায় সঙ্গে একজন শিকারি নিতে হবে।"

হাসব না কাঁদব এমন গলায় বললাম, "এই শুনে তুই এমন একটা মওকা নষ্ট করে এলি? একটা শিকারির অভাবে?"

"না হে, না।" শিবু যেন তার সমালোচনায় জ্বলে উঠে বললে, "বন্দুক হাতে পেলেই ঘোড়া টেনে ছুড়তে পারে তেমন শিকারি ভাবছ নাকি! ওরা যা চায় তা অন্য জাতের শিকারি। চোখের দৃষ্টি আর বন্দুকের গুলিতে যার গাঁটছড়া বাঁধা। ডান বাঁ, যে দিকে হোক, যা যখনই দেখে তক্ষুনি তা ফুটো করে দিতে পারে গুলিতে এমন শিকারি ওরা চায়। নইলে ওই কানকাটার তল্লাটে পাঠাবে কোন ভরসায়!"

"এই ব্যাপার!" আমরা এবার অবাক হয়ে শিবুর দিকে তাকালাম—"এমন শিকারি দরকার শুনে তুই পিছিয়ে এলি? এমন কারও কথা তোর মনে পড়ল না যে—"

"অ্যাঃ, ছিঃ ছিঃ"—আমাদের কথা শেষ হবার আগেই শিবু লজ্জায় দুঃখে জিব কেটে নিজের কানদুটো মলতে মলতে বললে, "হ্যাঁ, তোরা আমার কান দুটো মলে দিতে পারিস। আমার কিনা ঘনাদার কথাটাই মনে হয়নি। ছি—ছি—"

"থাম! থাম!" শিবুর আত্মধিক্কারে বাধা দিয়ে বললাম, "তা মওকা তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ঘনাদাও সশরীরে হাজির। ঘনাদাকে নিয়ে গেলেই তো হয়। কী বলেন, ঘনাদা?"

প্রশ্নটা সবাই মিলে যাঁর দিকে ফিরে করলাম তাঁর মুখে তখন কোনও ভাবান্তর নেই। ফুরিয়ে আসা সিগারেটটায় শেষ টানের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সুন্দরবনে যাবার কথা বলছ? হ্যাঁ, শেষ গেছলাম বটে ১৯৭৩-এ। বাঘ তখন সেখানে মাত্র ১৩৫টা। তার পরের বছরই আবার মধ্যপ্রদেশের কানহার ন্যাশনাল পার্কে ভারতের প্রথম ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হওয়ার ব্যাপার দেখতে গিয়ে দেখি, ১৯৫৪-তে যে-প্যাঁচ দিয়ে কানহার ন্যাশনাল পার্কের পত্তন করিয়ে বন্দুক ধরা চিরকালের মতো ছেড়ে দিই—বনবিভাগের হিসেবে সেই সাজানো ভুলটা কুড়ি বছরেও ধরা পড়েনি।"

"দাঁড়ান! দাঁড়ান!" আমরা আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, "যা বললেন সেই প্যাঁচালো জটে বুদ্ধিশুদ্ধি সব জড়িয়ে গেছে। ধরবার মতো কোনও খেইই পাচ্ছি না। ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝতে দিন। এই যেমন প্রথম কথা হল, আপনি বন্দুক ছোঁড়া ছেড়ে দিয়েছেন সেই ১৯৫৪-তে! আর এমন একটা প্যাঁচ কষেছিলেন যার দরুন ন্যাশনাল পার্কের পত্তন হলেও বনবিভাগের হিসেবে একটা ভুল থেকে যায়।"

নির্বোধের প্রতি অনুকম্পাভরে দুবার মাথা নেড়ে ঘনাদা বললেন, "হ্যাঁ, ১৯৫৪-তেই বন্দুক ছোঁড়া চিরকালের মতো ছেড়ে দিই। আর আমার প্যাঁচের দরুন হিসেবের যে ভুলটা সেদিন হয়েছিল বনবিভাগ এখনও তা শোধরাতে পারেনি।"

"বনবিভাগের হিসেবে ভুল!" এবার আমাদের জিজ্ঞাসা—"ভুলটা কী?"

"ভুলটা মোট বাঘের হিসেবের," ঘনাদা জানালেন, "১৯৭২-এ বনবিভাগের মতে কানহাতে বাঘের সংখ্যা হল ১৮০০। ওই অঙ্কটাই ভুল!"

"তার মানে?"—আমাদের সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা—"ওটা যদি ভুল হয় তাহলে ঠিক সংখ্যাটা কত?"

"ঠিক সংখ্যাটি হল ১৮০২"—ঘনাদা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে জানালেন—"এ ভুল সেই ১৯৭২-এরই নয়, ভুলটা চলে আসছে সেই ১৯৫৪ থেকে। যখন সেই এক খুনে সাহেবের হাতে গণ্ডা গণ্ডা বাঘ মারা যাবার পর দেশময় শোরগোল ওঠার পর মধ্যপ্রদেশের ওই অঞ্চলটা কানহা ন্যাশনাল পার্ক বলে সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়। গণ্ডা গণ্ডা বাঘ মারা নিয়ে দেশময় শোরগোল তোলার পেছনে কার কতটুকু হাত ছিল সে আর ক-জন জানে!"

"তার মানে?" আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইলাম, "ওই শোরগোল তোলার মধ্যে আপনিই ছিলেন আর ওই গুনতির ভুলের মধ্যে—"

"ব্যাপারটা হয়েছিল কী?"

"ব্যাপারটা এই যে," ঘনাদা যেন নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে বিস্তারিত করে বললেন, "তখনকার দিনে এক খুনে মেজাজের সাহেব কল-টল নেড়ে একসঙ্গে একবারে ত্রিশটা বাঘ মারবার লাইসেন্স জোগাড় করেছিল। দুনিয়া থেকে তখনই বাঘের বংশ লোপ পাবার অবস্থা হয়েছে। আজ যেখানে ২৬৪, সেই সুন্দরবনেই বাঘ তখন ১৩৫-এরও নীচে নেমে গেছে। আর বনবিভাগের হিসেবেই যেখানে তিন হাজার বাঘ মধ্যপ্রদেশের সেই কানহায় তখন ১৮০০-রও অনেক কম। দুনিয়ার শিকারি মহলে তো বটেই, সব মানুষদের মধ্যেও বাঘের মতো প্রাণীকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণের উপায়ের কথা ভাবা হচ্ছে। সেই সময়ে একটা-দুটো নয় একেবারে ত্রিশ-ত্রিশটা বাঘ খুশি মতো সাবাড়! প্রথমে একটা দুটো থেকে দেখতে দেখতে দেশের সব অঞ্চলের কাগজে এই নিয়ে লেখালেখি শুরু হল। দেশ তখন স্বাধীন। সরকারি মহলে, বিধানসভায়, লোকসভায় প্রশ্ন উঠল এই নিয়ে।

তারপর ক্রমেই ব্যাঘ্র-প্রকল্প শুরু না হলেও মধ্যপ্রদেশের ওই অঞ্চলটা কানহা ন্যাশনাল পার্ক নামে আলাদা করা হল। খুনে মেজাজের সেই ব্যাঘ্রমেধ বিলাসী সাহেবের পাপে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সুফলই ফলেছিল ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সূত্রপাত হয়ে। মজার কথা এই যে সেই খুনে শিকারি সাহেব কিন্তু তার পুরো লাইসেন্স-এর বরাদ্দমত ত্রিশটা বাঘ মারেনি, মেরেছিল মাত্র আটাশটা।"

"তাহলে? তাহলে?"—আমাদের প্রশ্ন করতেই হল—"সরকারি গুনতিতে সেই আটাশটাই লেখা আছে তো?"

"না।" ঘনাদা একটু হেসে জানলেন, "সরকারি গুনতিতেই পুরোপুরি ত্রিশটা শিকার করা বাঘের কথাই লেখা আছে। আটাশের জায়গায় ত্রিশ ধরার ওই ভুলের জন্যই বনবিভাগের মোট হিসেবে ওই সংখ্যার ভুল থেকে গেছে।"

"কিন্তু গুনতিতে অমন ভুল হবে কেন?" আমরা নাছোড়বান্দা হয়ে জানতে

চাইলাম, "বনবিভাগের লোকেরা তো শিকার করা বাঘ না দেখে আন্দাজে সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়নি।"

"না, তা দেয়নি।" ঘনাদা ধৈর্য ধরে বললেন, "মিথ্যে করেও কিছু লেখেনি। তারা বনের মধ্যে শিকার করা বাঘ স্বচক্ষে দেখে দেখেই হিসেব লিখেছে।"

"তা কী করে হয়?"—আমরা সন্দিগ্ধ—"আটাশের পর আরও দুটো শিকার করা বাঘ এল কোথা থেকে, গেলই বা কোথায়?"

"কোথা থেকে এল আর কোথায় গেল তা জানে শুধু একজনই।"—ঘনাদা হাতের সিগারেটের শেষটুকু ফেলে ওঠবার উপক্রম করলেন।

তাঁকে চেপে ধরে বসিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বসিয়ে বললাম, "সে একজন তো আপনি। বলুন, ওটা কি ম্যাজিক-এর ব্যাপার?"

"না, ম্যাজিক নয়"—ঘনাদা করুণা করে বিশদ হলেন—"আমি তখন বারশিঙ্গা হরিণের খোঁজে ওই কানহার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বারশিঙ্গা হল ডালপালা মেলা শিং-এর এক অপরূপ হরিণ। আজ সরকারি কড়াক্কড়িতে সে হরিণের সংখ্যা চারশো ছাড়াতে চলেছে আর সেই ১৯৫৪-তে সে হরিণ গোটা পঞ্চাশ-ষাটটা ছিল কিনা সন্দেহ! বারশিঙ্গার সন্ধানে ওখানকার জঙ্গলে ঘোরার সময়েই ওই খুনে বাঘ শিকারির কথা কানে আসে। ওই জাতের বেপরোয়া খুনে শিকারিদের অত্যাচারে বাঘ বলে প্রাণীবংশটাই যে লোপ পেতে বসেছে তাই নিয়ে সব দেশের সহৃদয় জ্ঞানীগুণী বৈজ্ঞানিক মহলে জোর আন্দোলন চলছে। অবাধ বাঘ শিকার বন্ধ না করলে ভারতবর্ষে এই প্রাণীটি কিছুদিন বাদে আর দেখা যাবে না তাই জানিয়ে সরকারি ওপর মহলে লেখালেখিও কম হচ্ছে না। তারই ভেতর ত্রিশ-ত্রিশটা বাঘ মারবার লাইসেন্স দেবার মতো এমন অন্যায় কী করে হল তা নিয়ে দিল্লি ছোটাছুটিতে তখন কোনও লাভ নেই, আর তার সময়ও নেই জেনে খোদ খুনে শিকারির সঙ্গেই দেখা করবার চেষ্টা করলাম। দেখা করা শক্তও ছিল না। কারণ ত্রিশটা বাঘ মারার হুকুম যে জোগাড় করেছে সে তো শিকারে নয়, যেন ঘটা করে বিয়ে করতে এসেছে এমনই তার সমারোহ। জঙ্গলের মধ্যে চাকর-বাকর-বাবুর্চি-খানসামা নিয়ে তাঁবুই পড়েছে তিনটে। তার মধ্যে বড় তাঁবুটা যেন রাজদরবার।

অন্য দুই তাঁবুর খবরদারির পর সেখানে যাবার তখন অনুমতি পেলাম যেন ভিখিরির মতো। ভেতরে যখন ঢুকলাম তখন শিকারি সাহেব বিকেলের নাস্তা করছেন। সামনের টেবিলে পাখ-পাখালি আর খরগোশ হরিণের মতো হরেক রকম জংলি শিকারের মাংসের সব প্লেট সাজানো। শিকারির হাতে কিন্তু তরল বস্তুর গেলাসই ধরা।

যা শিকার করতে এসেছেন সেই বাঘের মতোই চেহারা। সেই রকমই গলায় আমায় বললে, 'কী? কী চাস তুই? এই জঙ্গলেও তোদের হাত থেকে রেহাই নেই? এখানেও এসেছিস ভিক্ষে করতে?'

'হ্যাঁ, ভিক্ষে করতেই এসেছি,' সবিনয়ে বললাম, 'দয়া করে যদি সে ভিক্ষা দেন।'

'কী? কী ভিক্ষা চাস এই জঙ্গলে?' শিকারি সাহেব গর্জন করে বললে।

'আজ্ঞে', সবিনয়ে বললাম, 'শুধু দশটা বাঘ।'

'দশটা বাঘ!' তার সঙ্গে রসিকতা ভেবে সাহেব রাগে প্রায় ফেটে পড়ে আর কী! 'আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস? আভ্‌ভি নিকালো—'

'দোহাই আপনার!' হাতজোড় করে একবার বললাম, 'আমার কথাটা দয়া করে একটু শুনুন। আপনি এ পর্যন্ত কুড়িটা বাঘ মেরেছেন। আরও দশটা মারবার আপনার হুকুম আছে। আমাদের ভারতবর্ষের খাতিরে, বাঘের বংশের খাতিরে ওই দশটা বাঘ আর মারবেন না। ওগুলো দুনিয়াকে ভিক্ষে দিন।'

কে কার কথা শোনে? 'আভি নিকালো হিঁয়াসে!' বলে সাহেব যেন খ্যাপা গণ্ডারের মতোই আমার দিকে তখন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সেই ঝোঁকেই তাঁবুর মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ার পর টেবিলে খানার প্লেটগুলো তার গায়ের ওপর ছুড়ে দিয়ে তার গেলাসটার তরল বস্তুও তার ওপর ঢেলে দিয়ে চলে এলাম।

সাহেব তখন মেঝে থেকে উঠে রাগে চিৎকার করছে, 'পাকড়ো উসকো, পাকড়ো উ বদমাস কো—'

কিন্তু কে পাকড়াবে! জঙ্গলে মিলিয়ে যাবার আগে সাহেবের লোকজন তাঁবু থেকে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু ওই বার হওয়া পর্যন্তই।

সাহেবকে একটু শিক্ষা দিয়ে আসার পর জঙ্গল যেন আমার কাছে বিষ হয়ে উঠল। একদিন যায়, দুদিন যায়, আর সাহেবের, একটা একটা করে নতুন বাঘ শিকারের খবর পাই। রাগে দুঃখে আমার যেন হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হয়।

এই অবস্থায় বনবিভাগের সদর দপ্তরে গিয়ে দেখা করলাম। তারা যে নিরুপায় তা জেনেও আইন কেউ ভাঙলে তাদের কতদূর এক্তিয়ার তা জেনে নিলাম।

তারপর কিছুদিনের জন্য জঙ্গল ছাড়লাম। ফিরে যখন এলাম তখন সাহেবের সাতাশটা বাঘ মারা হয়ে গেছে। ক-দিন বাদে আটাশটাও পূর্ণ হল। তারপরই বনবিভাগের স্থানীয় কর্তা আর সেপাই সান্ত্রীদের ডেকে শিকার করা বাঘের লাশ দেখালাম।

বনের মধ্যে এক জংলা ঝোপের ধারে শিকার করা বাঘের লাশ পড়ে আছে। খুনে শিকারি সাহেব সেটা তখনও সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় পায়নি। সেটার কথা বনবিভাগের দপ্তরে জানায়ওনি।

প্রমাণের জন্য শিকারির মারা বাঘটার পেটের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তোলালাম। বেপরোয়া খুনে হলেও সাহেব যে অব্যর্থ শিকারি তা তার বাঘটার কানের ভেতর দিয়ে নির্ভুল গুলি চালানোতেই প্রমাণ করে বোঝাতে ফুটো কানের যেটা দিয়ে গুলি যাওয়ার দরুন রক্ত ঝরে পড়েছে সেই কানটা টেনে দেখালাম। বাঘটার বয়স বুঝতে তার মুখটা হাঁ করে দাঁতগুলোর অবস্থাও দেখলাম।

এই বাঘটা খুঁজে পাবার দুদিন বাদেই আবার বনবিভাগের অফিসার আর সেপাইদের ডাকতে হল। আবার একটা বাঘের লাশ পাওয়া গেছে। এবার জঙ্গলের আধা-শুকনো ঝিলের ধারে। বাঘের পেছনের দুটো পা ঝিলের কাদা জলের মধ্যে

আধ-ডোবা হয়ে আছে।

বাঘের লাশটা দেখিয়ে অফিসারকে একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছেন! এ বাঘটা যেন আগের বাঘটার ঠিক যমজ। শুধু হলদে কালো ডোরাগুলো আরও স্পষ্ট আর মাথাটা যেন আরও ছোট। সে অবশ্য মাথায় লোমগুলো এখনও তেমন বাড়েনি বলে। এটার দেখুন কানের ভেতর দিয়ে গুলি গেছে আর—'

এরপর যা বলে গেলাম অফিসারের তাতে তেমন কান আছে বলেই মনে হল না। বাঘ যে শিকার করা হয়েছে লাশ দেখে তার প্রমাণ পেয়েই তিনি ব্যাপারটা যেন চুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচেন।

ব্যাপারটা পুরোপুরি চুকোবার ব্যবস্থা তার পরদিনই হল। বনবিভাগের অফিসার আর রক্ষী সেপাই-টেপাই মিলে সেদিন ভোর হবার পরই খুনে শিকারির তাঁবুতে গিয়ে হাজির।

সাহেব তখন সাজগোজ করে শিকারে বার হবার জন্য তৈরি হয়েছে। বনবিভাগের অফিসার, সেপাই আর সেই সঙ্গে আমায় দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'ব্যাপার কী? এই সকালে আমাকে বিরক্ত করতে আসার মানে?'

'মানে আর কিছু নয়,' অফিসার আমাদের আগেকার বোঝাপড়া মতো ভদ্রভাবেই বললেন, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন তাই জিজ্ঞাসা করা।'

'কোথায় যাচ্ছি তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছ?' সাহেব একেবারে খাপ্পা হয়ে বললে, 'তোমরা কি কানা? দেখতে পাচ্ছ না, শিকারে যাচ্ছি?'

'শিকারে যাচ্ছেন তা দেখতে পাচ্ছি,' অফিসার তখন একটু কড়া গলায় বললেন, 'কিন্তু কী শিকারে সেইটেই জানতে চাই। কারণ আপনার সঙ্গে যে বড় শিকারের ভারী রাইফেল রয়েছে তা নেওয়ার আর কোনও দরকার তো আপনার নেই।'

'দরকার নেই মানে?' সাহেব একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, 'বাঘ শিকার কি আমি এয়ার গান দিয়ে করব নাকি!'

'তা কেন করবেন?'—অফিসার এখনও ধৈর্যের অবতার—'কিন্তু বাঘ শিকারই যে আপনার শেষ হয়ে গেছে!'

'শেষ হয়ে গেছে মানে!' সাহেব পারলে যেন আমাদেরই গুলি করে এমন গলায় বললে, 'আমি আটাশটা বাঘ মেরেছি। এখনও দুটো আমার বাকি।'

'অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলছি,' অফিসার কড়া গলায় বললেন, 'আপনার গণনা আমরা মানতে পারব না। আপনি যে ত্রিশটা বাঘই মেরেছেন তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। সুতরাং দরকার হলে জোর করেই আপনার শিকার আমাদের বন্ধ করতে হবে।'

'শিকার বন্ধ করবে তোমরা!' সাহেব রাগে খেপে গিয়ে হাতের বন্দুকটা সত্যিই আমাদের দিকে তুলেছিল। আমি এক ঝটকায় তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে অফিসার কড়া গলায় বললেন, 'এই বেয়াদবির জন্য আপনাকে এখনই হাতকড়া পরাতে পারি। কিন্তু তা করব না। আপনি ইচ্ছে করলে দিল্লি থেকে নতুন করে হুকুম

আনিয়ে এ জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে পারেন। নইলে এখান থেকে আপনাকে বিদায় নিতে হবে।'

খুনে সাহেব রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সেই বিদায়ই নিয়েছিল। আর তারপর আসেনি।

অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও কানহার জঙ্গল ছেড়ে এর পর বালাঘাটে গিয়ে যার সঙ্গে দেখা করি তার নাম শশী নায়ার। নায়ারকে থোক হাজার টাকা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা নেয়নি।

বলেছিলাম, 'এ তো আপনার পাওনা, তবু নেবেন না কেন? আপনার সাহায্য ছাড়া এ কাজ হাসিল করতে পারতাম কি!'

'কাজ তো শুধু আপনার নয়।' নায়ার আমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলেছিল, 'কাজ সমস্ত দেশের হয়েই করেছি। তার জন্য টাকা নেওয়া আমার পাপ হবে। প্রার্থনা করি আমাদের এই ব্যাপার থেকেই অবাধ বাঘ শিকার বন্ধ হবে।'

নায়ারকে সাদরে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'তোমাকে আর কী ধন্যবাদ দেব, নায়ার! তবে তুমি না সাহায্য করলে ওই খুনে শিকারিকে এমন করে জব্দ করতে পারতাম না। তবে তোমার এই উপকারের কথা মনে করে আমিও একটা প্রতিজ্ঞা আজ করছি নায়ার। একমাত্র মানুষ-খেকো বাঘের বেলায় ছাড়া বাঘ কেন, কোনও শিকার করতেই আর বন্দুক ধরব না।'

দুজনে করমর্দন করে পরস্পরের কাছে বিদায় নিলাম। নায়ার তার সঙ্গে তার পোষা তালিম দেওয়া বাঘটাকে অবশ্য নিয়ে গেল। নায়ার ম্যাঙ্গোলোরের এক মস্ত সার্কাস কোম্পানির বাঘ-সিংহের ট্রেনার। কানহার জঙ্গল থেকে ক-দিনের জন্যে ওর কাছেই গিয়েছিলাম দু-চার দিনের জন্য বাঘটা ধার নিতে। এই বাঘটাই নিখুঁতভাবে শিকার করা মরা বাঘের অভিনয় করে আমাদের কাজ হাসিল করে দিল।

ঘনাদা উঠে যেতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর হল না। বনোয়ারি আর রামভুজ তখন দুটো বড় বড় ট্রেতে যেসব গরম গরম সদ্য ভাজা আহার্যের প্লেট নিয়ে ঢুকছে তার গন্ধে সমস্তটা ঘর তখন আমোদিত।

প্রথমে শামিকাবাবের প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে তার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেবার আগে ঘনাদাকে আর একটা জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হল।

সুন্দরবন থেকে যা শুরু হয়েছিল কানহার জঙ্গলে শিকারের হিসাব রাখতে তার কথাটা যে ভুলেই যাওয়া হয়েছে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু সুন্দরবনের ওই কানকাটা-র রহস্যের কোনও জবাব তো মিলল না। জবাব কিছু নেই বোধহয়—না ঘনাদা?"

"আছে! আছে!" কাঁটায় গাঁথা কাবাবের টুকরো প্লেট থেকে মুখে তোলার আগে, থেমে, ঘনাদা যত সংক্ষেপে হোক সেরে বললেন, "প্রথমত ওই কানকাটা সোঁদরবনের কেঁদো বাঘের কীর্তি ভূতপ্রেত কি বানানো গল্প নয়। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ অমনই আজগুবি ভয়ংকরই হয়। তাদের চলাফেরার কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। অমন চার-পাঁচজনের দল থেকে একজনকে কেমন করে সে তুলে

নিয়ে যায় পাশের সাথীও তার হদিস পায় না। তবে শিকারির গুলিটুলিতে নয়, এ মানুষখেকোদের ঢিট করবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এমন শিক্ষা দেবার প্যাঁচ হয়েছে যে মধু-জোগাড়ে কি কাঠুরে কাউকে কোলের কাছে পেলেও তারা না ছুঁয়ে ছুটে পালাবে। উপায়টা হল সুন্দরবনের নানা জায়গায় লোভনীয় টোপের মতো করে কাঠুরে আর মধু-জোগাড়েদের জ্যান্ত মানুষদের মতো মূর্তি রেখে দেওয়া। মানুষখেকো বাঘ লোভে পড়ে একবার সে রকম কোনও মূর্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ইলেকট্রিক শক খেয়ে আধমরা হয়ে ছিটকে পড়বে। এরপর মানুষের চেহারার কোনও কিছুর ধারেকাছে সে কখনও ঘেঁষবে কি! সুন্দরবনে এরকম মূর্তি এখন সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"কিন্তু সেখানে আবার লোডশেডিং থাকবে না তো?"

কাবাব গাঁথা টুকরো তখন ঘনাদা মুখে তুলেছেন। তাঁর কাছে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

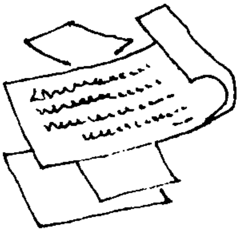

মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা

ছুটির দিন। দুপর বেলা খাওয়াদাওয়া শেষ হতে একটু দেরিই হয়। তবু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে পাট চুকিয়ে ঘনাদা তাঁর খাওয়া সেরে নিজস্ব সেই চিলেছাদের টঙের ঘরে উঠে যাওয়ার পরই সবাই একসঙ্গে দোতলার সিঁড়ির বাঁকে শিশিরের ঘরে গিয়ে জমায়েত হয়েছি।

জমায়েত যে হয়েছি তা ঠিক খোশ-মেজাজ নিয়ে গুলতানি করবার জন্য নয়। তার বদলে রীতিমত একটা লজ্জা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে।

লজ্জা আর অপমানের জ্বালাটা যা নিয়ে তার ব্যাপারেই শিবু তখন নীচের খাবার ঘরে খাওয়া শেষ করার পর আমাদের সঙ্গে ওপরে না এসে বাইরের গেটের পাশের লেটারবক্স হাতড়াতে গেছে আর আমরা শিশিরের ঘরে এসে জড়ো হয়ে অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছি।

অপেক্ষা বেশিক্ষণ করতে হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই শিবু এসে হাজির হল, কিন্তু যে চেহারা নিয়ে সে দেখা দিলে তাতে, ফলাফল সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ না থাকলেও হতাশ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—"কী আজও কিছু

নেই?”

“থাকবে না কেন,” শিবু হতাশ কণ্ঠটা আরও গাঢ় করে জানালে, “যা থাকবার তাই আছে।”

“তার মানে, নেই—টিটকিরির চিরকুট?”

হতাশার সঙ্গে বেশ একটু ক্ষোভের জ্বালা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও শিবুর হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে না পড়ে পারলাম না।

পড়ার অবশ্য নতুন কিছু নেই। বেশ কিছুক্ষণ থেকে সোজাসুজি স্পষ্ট সমস্যার ধাঁধাটাঁধার বদলে যে ধরনের জ্বালা ধরানো টিটকিরির চিমটি আসছে তারই আর একটি নমুনা।

এবারেও সেই পোস্টকার্ডের মাপের একটা ধবধবে সাদা কার্ড। তার সম্বোধন নেই। কোথা থেকে আসছে তার কোনও হদিস নেই। কার্ডের মাঝামাঝি মোটা মোটা অক্ষরে শুধু লেখা—**দুয়ো।**

এ রকম কার্ড এ ক-দিনে আরও কয়েকটা পাওয়া গেছে। এক না হলেও সবগুলিই অপমান ধরা টিটকিরি দিয়ে লেখা।

এই জাতের যে কার্ড পাওয়া গেছে তাতে তার ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষা একটু বিস্তারিত ছিল।

মাপজোকে এক হলেও সে কার্ডে বক্তব্য একেবারে অস্পষ্ট নয়।

লেখার ধরন-ধারণ অবশ্য এক। প্রমাণ আকারের সাদা কার্ডের মাঝখানে পর পর মোটা মোটা অক্ষরে কথাগুলি সাজানো—

কে না কারা? এখনও বুঝলে কিছু, দুয়ো।

এর পরের চিঠিটা আর একটু বড় হলেও মোটেই ধোঁয়াটে নয়। তার একটি খোঁচাই স্পষ্ট করে দেওয়া। পর পর তিন লাইনে সাজিয়ে লেখা—

কোথায় এখন।

টঙের ঘরের তিনি!

ডুব মেরেছেন কোথায়?

নিয়মিতভাবে পর পর এ ধরনের ভেংচিকাটা চিঠি নিয়ে মেজাজগুলো তখন আমাদের কী হয়েছে তা বোধহয় বলে বোঝাবার দরকার নেই।

এ যে মৌ-কা-সা-বি-স-এর কাণ্ড সে বিষয়ে কোনও মতেই আমাদের সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে সে মৌ-কা-সা-বি-স?

কে না কারা?

আমাদের এমন কানমলা দেবার এ গরজই বা তার বা তাদের কেন?

আর আমাদের এই বাহাত্তর নম্বরের বাসার ডাকবাক্সে তারা তাদের চিঠি চালানই বা করছে কখন? কীভাবে?

সারাক্ষণ যতখানি সম্ভব আমরা সজাগ পাহারায় থেকেছি।

সকলে দল বেঁধে না হোক, কেউ না কেউ তো বটেই।

এই এত পাহারার মধ্যে কখন কী ভাবে তারা তাদের এই সব চিঠি চালান করছে আমাদের চিঠির বাক্সে?

দিনের বেলা তো নয়ই, রাত্রেও আমাদের অজান্তে চিঠির বাক্সে কিছু ফেলা অসম্ভব বললেই হয়। কারণ সন্ধ্যা হতে না হতেই আজকাল আমরা বাইরের গেট চাবি দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি।

অন্য কারও তো নয়ই, আমাদের নিজেদেরও কারও বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হলে চাবি দিয়ে গেট না খুলিয়ে আসা যাওয়ার উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় আমাদের অজান্তে আমাদের ডাকবাক্সে চিঠি বা চিরকুট চালান কেমন করে সম্ভব!

ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা পরস্পরের ওপর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি।

আমাদেরই কেউ কি চুপি চুপি এই সব চালাকি করছে। কিন্তু কে সে হতে পারে?

এ রকম মজার বেয়াড়াপনা করে তার লাভই বা কী!

আর তাছাড়া মৌ-কা-সা-বি-স যে সব মাথাগুলোনো ধাঁধার রহস্য আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেছে, একা এমন কিছু করার মতো বুদ্ধিও আমাদের কার আছে?

শিবুর?

না। কোনও একটা মজার ব্যাপার নিয়ে বেশ একটু হইচই বাধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়া আর কোনও এলেম তার থাকার পরিচয় তো এখনও পেয়েছি বলে মনে হয় না।

যদিই বা এরকম ক্ষমতা তার থাকে, আপাতত তা অনুমানের মধ্যে রেখে অন্যদের কথা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমে নিজেকে বিচারের দাঁড়িপাল্লায় তুলে চোখ বুজেই সরাসরি বাদ দিতে পারি।

না, আমি দু চারটে খোঁচা দিয়ে সোজা কথাকে কখনও কখনও প্যাঁচালো করতে পারি, কিন্তু ভেবে চিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা ধাঁধা বানানো—সে আমার কর্ম নয়।

আমার পর বাকি থাকে শুধু গৌর আর শিশির।

তা দু-দুজনের কেউ যে ফেলনা নয় একথা অকপটে স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু বাদ সেধেছে দুজনের নিজস্ব চরিত্রের বিশেষত্ব।

গৌর ইচ্ছে করলে সবই পারে। কিন্তু সকলের সঙ্গে সমান উৎসাহে যে কোনও ধান্দায় মাততে আপত্তি না থাকলেও মৌ-কা-সা-বি-স-এর মতো বাহাদুরির জন্য নিজের গরজে সময় আর বুদ্ধি খরচ সে করবে বলে মনে হয় না।

শিশিরের পক্ষে সে রকম কিছু করা অবশ্য সম্ভব।

কিন্তু ব্যাপারটা আরও তাহলে জমকালো হওয়া দরকার।

জমকালো না হোক, ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে একটা গায়ে জ্বালাধরানো টিটকিরির চাবকানি-র আভাস আছে বলে অবশ্য শিবু, গৌর, শিশির কারওই সামান্য গা-ঝাড়া দিয়ে তাচ্ছিল্য করার ভাবটা আর নেই।

রহস্যটার একটা মীমাংসা তাই না করলেই নয়।

কিন্তু কীভাবে সে ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যায় ঠিক মতো বুঝতে না পেরে আপাতত শিবুর ওপরেই একটু চড়াও হয়ে বললাম, "এতক্ষণ লেটারবক্স হাতড়ে তুই শুধু এই লেখাটুকু পেলি?"

"তার মানে?" হঠাৎ আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে যায়—কেনই বা এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে তা বুঝতে না পেরে শিবু বেশ একটু গরম মেজাজ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী বলতে চাইছিস তোরা।"

"আমরা—আমরা মানে—" বলবার কিছু না পেয়ে আমরা তখন তোতলামিতে পৌঁছে গেছি।

আমাদের হয়ে শিবুই কথাগুলো গরম মেজাজে জানিয়ে দিলে, "তার মানে আমি ওই কাটা কার্ডের টুকরোটা লিখে আনতে দেরি করছিলাম বলতে চাস?"

"না না—" আমরা এবার অপ্রস্তুত হয়ে সরব প্রতিবাদ জানালাম।

"তা—মানে তা কেন বলব—মানে বলছিলাম কী—"

"ও সব বাজে কথা রাখ—" শিবুর চড়া মেজাজ ঠাণ্ডা হল না—"স্পষ্ট আমায় যে সন্দেহ করছিস তা সাহস করে স্বীকার কর না।"

"না, না, মানে—" আমরা অপ্রস্তুত হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম শিবু তাতে বাধা দিয়ে বললে, "শোন, মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই। সত্য কথাটা তাই আমাদের সকলেরই স্বীকার করা ভাল। আসল ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তা এই যে রহস্যটার ঠিক মতো কোনও হদিস না পেয়ে আমরা সকলেই সকলকে মনে মনে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি। আমি নিজে এখন তা অকপটে স্বীকার করছি যে আমি নিজেও তাই করে একদিন হাতেনাতে আসল আসামিকে ধরবার মতলবে ছিলাম। তার জন্যে বেশ একরকম ফাঁদও পেতেছি।"

"সত্যিই তুই আমাদেরই কাউকে সন্দেহ করেছিস?" অবিশ্বাস্য স্বরে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। "আর তাকে ধরবার জন্যে ফাঁদও পেতেছিস?" নিজের কানকেই বিশ্বাস না করতে পেরে একটু রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে?"

"কাকে জানতে চাইছিস?" শিবু বিনা দ্বিধায় জানাল, "কাকে না করেছি সেইটিই বরং জিজ্ঞাসা কর। তবে সে প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারব না।"

"তার মানে?" একটু ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করলাম, "কী আবোল-তাবোল বকছিস।"

"হ্যাঁ, শুনলে আবোল-তাবোলই মনে হয়," শিবু অকপটে স্বীকার করলে, "কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক। সন্দেহ যখন শুরু হয়েছে তখন এক এক করে কেউই বাদ পড়েনি।"

"কেউই বাদ পড়েনি!" নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে না পেরে বললাম, "সন্দেহ করেছিস এক এক করে আমাদেরই সকলকে!"

"হ্যাঁ, তাই করেছি।" শিবু সোজাসুজি জানালে, "আর তার মধ্যে প্রথম কাকে সন্দেহ করেছি শুনবি?"

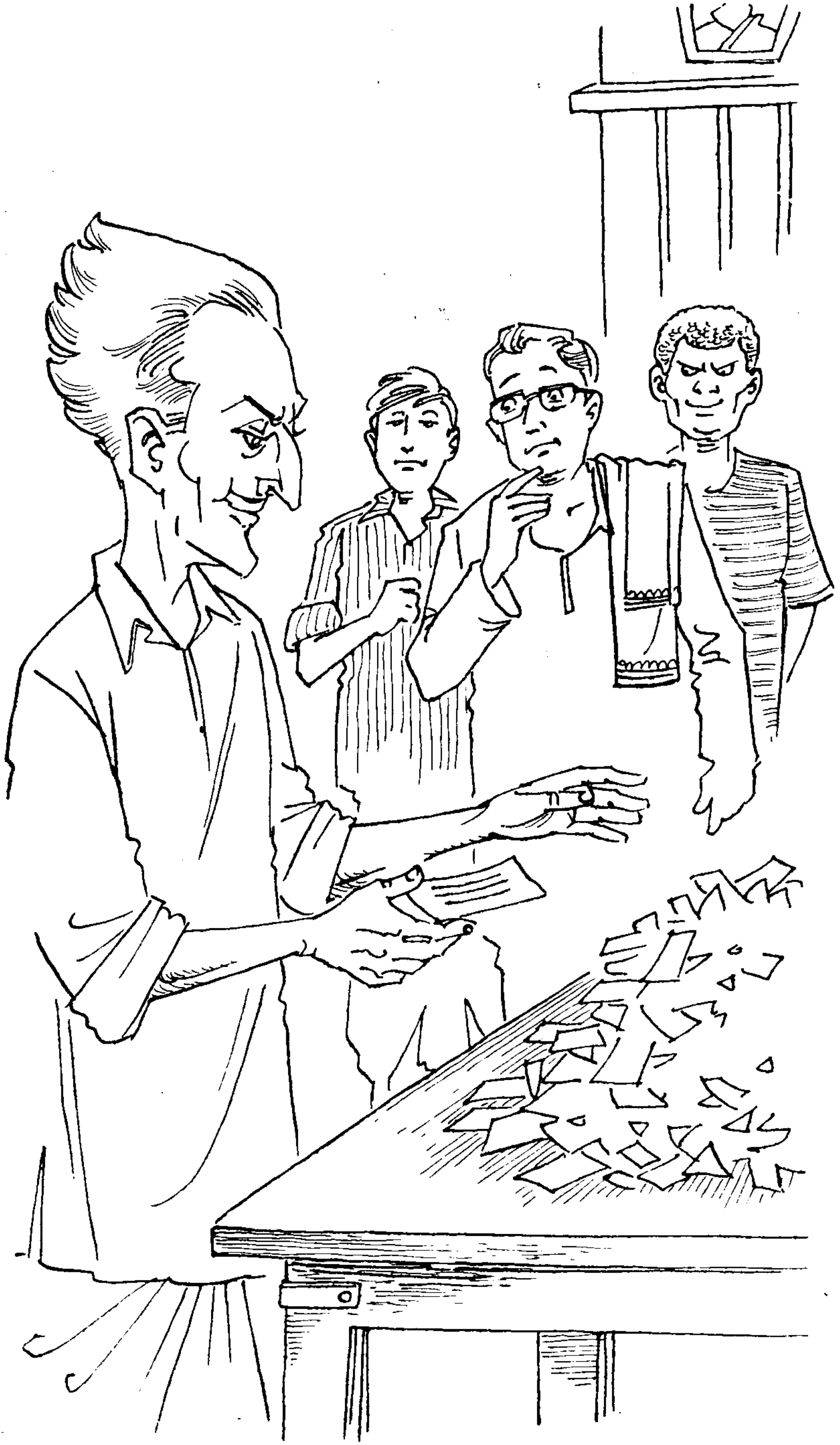

এ ধরনের কথায় মেজাজ ঠিক রাখা যায়? বেশ একটু কড়া গলাতেই বললাম, "সেইটেই তো জানতে চাই।"

"বেশ, শোন তাহলে," শিবু যেন নিজের দায়টা কাটিয়ে নিয়ে বললে, "প্রথম সন্দেহ করেছি আর কাউকে নয়, এই তোমাকেই!"

"আ-আ-আমাকে?" আমি তোতলা হয়ে কথাটা যখন জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, ঘরেও অন্যদিকে তখন চাপা হাসির শব্দটা খুব অস্পষ্ট নয়।

সেটা গ্রাহ্য না করে তোতলামিটা এবার কাটিয়ে উঠে প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রথম সন্দেহ করলি এই আ-মা-কেই? মানে আমি প্রথমে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ওই গোটা দু-তিন চালাকির খেল দেখিয়ে সে সব প্যাঁচের পুঁজি ফুরিয়ে যাবার পর এমনই করে সবাইকে টিটকিরি দিয়ে বাহাদুরি করছি!"

"হ্যাঁ", আমার মেজাজের ঝাঁঝটা গ্রাহ্যই না করে শিবু সোজাসুজি এবার স্বীকার করলে, "হ্যাঁ, প্রথমে তোর ওই বোকা বোকা ভাবগতিকটা হয়তো একরকম সেজে থাকা বলেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর অবশ্য—"

শিবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জ্বলন্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর অবশ্য কী?"

"তারপর", শিবু এবার একটু হেসেই বললে, "বুঝলাম যে তোমায় সন্দেহ করাটা সম্পূর্ণ ভুল। মানে—"

"শেষ পর্যন্ত বুঝলে তাহলে সে কথা?" খুশি হয়ে শিবুকে একটু তারিফ জানাতে যাচ্ছিলাম! কিন্তু তা আর হল না। শিবু তখন তার বক্তব্যটা শেষ করে বলছে, "মানে তখন খেয়াল হয়েছে যে বোকা সাজাটা সহজ হলেও তোমার পক্ষে মৌ-কা-সা-বি-স-এর ওই সব প্যাঁচের এক-একটা গল্প ফাঁদা—তোমার কর্ম নয়। সে বুদ্ধি তোমার নেই।"

এ অপমানের কি জবাব নেই?

থাকলেও তখন তা ভেবে বার করতে না পেরে নীরবে তা হজম করে শিবুর কথাই শুনে যেতে হল।

শিবু তখন বলছে, "তোমাকে বাতিল করে তখন গৌর-শিশিরের কথা ভাবছি। হ্যাঁ, ওদের দুজনের পক্ষেই এরকম একটা বাহাদুরি দেখানো অসম্ভব নয়, আর বিশেষ করে ওদের যা দস্তুর—দুজনে সেইরকম জোট বেঁধে যদি কাজ করে।"

শিবু একটু থেমে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে এবার বললে, "কিন্তু সেইটেই আর সম্ভব নয়।"

"সম্ভব নয়!" আমি গৌর আর শিশিরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন? তা সম্ভব নয় কেন?"

"তাও বুঝিয়ে বলতে হবে?" শিবু আমার মূঢ়তায় তার হতাশাটা গলার স্বরে বুঝিয়ে দিয়েও বললে, "লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ-এর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে না। এখন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান জোট বাঁধবে কী? মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।"

"না, না, তা কেন" গৌর আর শিশির দুজনেই প্রতিবাদ করে জানালে, "ও সব

খেলাধুলোর ঝগড়া আমরা মাঠেই রেখে আসি। ও ঝগড়া বাড়ি বয়ে আনব নাকি?"

"ঠিক, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে।" শিবু নিজের ভুল স্বীকারের সঙ্গে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, "কিন্তু আসামিদের তালিকা থেকে একে একে সবাই বাদ যাবার পর পড়েছি ফাঁপরে। আমাদের চিঠির বাক্সের ও সব নাক-কান মলা চিঠি দিয়ে মজা করছে কে বা কারা?"

"সত্যিই কি ব্যাপারটা তাহলে ভুতুড়ে কিছু?"

"এ ব্যাপারে একমাত্র যিনি সব সন্দেহের বাইরে আছেন এ বিপাকে পড়ে এবার তাঁর শরণ নেবার কথা ভাবতে হচ্ছে! হ্যাঁ, টঙের ঘরের সেই তিনি। মৌ-কা-সা-বি-স-এর এ-রহস্যের কোনও সমাধান যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁর কাছেই তা পাওয়া সম্ভব। তাই তাঁর শরণই এবার নিতে হবে।"

"তা নিতে চাও নাও," একটু সন্দেহ প্রকাশ করেই জানতেই চাইছিলাম, "কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সন্দেহের বাইরে কেন মনে করছ?"

"করছি," শিবু একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিল, "গোড়ায় মৌ-কা-সা-বি-স-এর চিঠিগুলো তাঁর নিজের হাতের লেখার নকল দেখে।"

"তাঁর নিজের হাতের লেখার নকল।" শিশিরই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সে লেখা যে নকল তা বুঝলে কী করে?"

"বুঝলাম তাঁর হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে," শিবু ব্যাখ্যা করে এবার বোঝালে, "ওঁর হাতের লেখা আমাদের কাছে অতি সামান্যই আছে। একবার আমাদের এই বাহাত্তর নম্বর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার হুমকি দিয়ে যখন খবরের কাগজের বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে ভাড়ার আবেদনের চিঠি লিখেছিলেন বনোয়ারিকে দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য, তখন সে সব চিঠি ডাকবাক্সের বদলে আমাদের কাছেই জমা করেছি। সেই চিঠির লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝলাম এ লেখা ঘনাদার। সেই নিজের লেখারই নকল—নকল শুধু আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য? এ ধোঁকা দেবার চালাকি কে বা কারা করছে তা বার করবার জন্য টঙের ঘরের তাঁরই শরণ নিতে হবে।"

"আরে মেঘ না চাইতেই জল!" গৌর টিপ্পুনি কাটলে, "সিঁড়িতে তাঁর চটির আওয়াজ বোধহয় শোনা যাচ্ছে।"

গৌর ভুল বলেনি। মিনিট কয়েক বাদে বিদ্যাসাগরি জোড়া চটির আওয়াজ নীচ থেকে ওপরে উঠে তখনকার আস্তানাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আবার আমাদের দরজায় ফিরেই বোধহয় কড়া ঠেলা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর দরকার হল না।

শিবুই ভেতর থেকে দরজা খুলে ধরে যেন কুর্নিশ করার মতো ভঙ্গিতে বললে, "আসুন না। আপনি বোধহয় অন্তর্যামী। এইমাত্র আপনার কাছে যাবার কথাই ভাবছিলাম। কেমন করে তা বুঝে নিজে থেকেই তার আগে এসে পড়েছেন!"

এ আদিখ্যেতায় ঘনাদা বিশেষ গললেন বলে মনে হল না। কথাগুলো যেন গ্রাহ্যই না করে তিনি ঘরের ভেতর গৌরের ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানো সোফাটায় বসে গম্ভীরভাবে বললেন, "ব্যাপার কী বলো তো, এমন ছুটির দিন বিকেলে তোমরা আড্ডাঘরের বদলে এখানে এসে জমা হয়েছ, আমার কাছেও যাবার কথা ভাবছিলে?

কী হল কী হঠাৎ এমন?"

"হঠাৎ নয়," শিবুই গলাটা ভারি করে জানালে, "ব্যাপারটা হয়েছে অনেকদিন। ছেলেখেলা বলে কিন্তু এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মীমাংসার জন্যে তাই আপনার শরণ নিতে যাচ্ছিলাম।"

"সে কথা তো অনেকবার শুনলাম", ঘনাদা একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কী?"

একটু চুপ করে আমাদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা হঠাৎ যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়ে বললেন, "সেই তোমাদের মৌ-কা-সা-বি-স আবার খোঁচা দিয়েছে? চিঠি দিয়েছে কিছু আবার।"

"চিঠি দিয়েছে, আবার দেয়নি"—

শিবু হেঁয়ালি করে জানাবার চেষ্টা করাতে তার ওপর বিরক্ত হয়ে ঘটনাটা যা দাঁড়িয়েছে, ঘনাদাকে একটু বিস্তারিত করে জানালাম।

সেই সঙ্গে মৌ-কা-সা-বি-স-এর শেষ চিঠিগুলোও দেখাতে ভুললাম না।

ঘনাদা যেরকম গম্ভীর মুখে আমাদের পেশ করা কাগজপত্র প্রথমে দেখছিলেন, শেষের দিকে হঠাৎ তার বদলে তাচ্ছিল্যভরে হেসে ওঠাতে কিন্তু আমাদের অবাক হতে হল।

"এই! এই তোমাদের সমস্যা!" ঘনাদা ওঁর কাছে জড়ো হওয়া কাগজের টুকরোগুলো সামনের টেবিলের ওপর নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "করে দেওয়া এ যদি রহস্য হয়, তাহলে তার সমাধান এইগুলোর মধ্যেই করে দেওয়া আছে। এই কাগজের টুকরোগুলোর মধ্যেই।"

আমরা অবাক হলাম। সেই সঙ্গে ঘনাদা বোধহয় আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন এই সন্দেহ করে একটু চুপ।

ক্ষোভটা গোপন না করে একটু তেতো গলাতেই জানতে চাইলাম, "সমাধানটা আছে বুঝলাম, কিন্তু সেটা কোন ভাষায় তা একটু জানাবেন? ভাষাটা বাংলা না এসপেরান্টো গোছের কিছু?"

"না, না ওসব কেন হবে!" ঘনাদা জড়ো করা কার্ডগুলোর একটা তুলে নিয়ে তার পেছনের সাদা পাতার সামনে যা লেখা আছে সেই কথাগুলোই নিজের পকেট থেকে একটা কলম বার করে লিখতে লিখতে বললেন, "এই কার্ডের এক পিঠের লেখাটাই অন্য পিঠে লিখলাম। একটু মন দিয়ে পড়লে মানেটা বোঝা জলের মতো সহজ হবে বলে মনে করি।"

কথাটা শেষ করে নিজের হাতের দুপিঠে লেখা কার্ডটা অন্য কাগজগুলোর মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে দরজা দিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকেই পা বাড়াতে বাড়াতে যা বললেন তাও একটা ধাঁধা। বলে গেলেন, "এবার লেখাটা পড়তে পারবে আশা করি। লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।"

এ আবার কী আজগুবি কথা?

মনে হল ঘনাদার বিদ্যাসাগরি চটির শব্দ ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার

আগে তাঁকে মানেটা বোঝাবার জন্য ধরে নিয়ে আসি।

কিন্তু সেটা আর পারলাম না। তার বদলে মৌ-কা-সা-বি-স-এর টুকরো কার্ডগুলোর ভেতর থেকে ঘনাদার উলটো পিঠে লেখা কার্ডটা খুঁজে বার করে একটু মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু তাতে লাভ কী হল?

কার্ডটায় এক পিঠে যা লেখা ছিল ঘনাদা অন্য পিঠে ঠিক তাই লিখেছেন।

মূল কার্ডটায় লেখা ছিল একেবারে সংক্ষিপ্ত দুটি মাত্র শব্দ—কার্ডের ঠিক মাঝখানে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—'**কে আমি**।' কার্ডের অন্য পিঠে ঘনাদা আমাদের সামনে সেই কথাই লিখেছেন—

'**কে আমি**!'

তাহলে?

নেহাত সস্তা ধাপ্পা বলে কাগজটা অন্য সবগুলোর সঙ্গে কাগজ ফেলার ঝুড়িতে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ ঘনাদার শেষ কথাই মনে পড়ল।

কী বলে গেছেন ঘনাদা।

বলে গেছেন—"লেখা না পড়তে পারো কলম পড়লেই চলবে।"

ঠিক! ঠিক!

লেখা ক-টার মানে বুঝতে আর দেরি হল না।

এক এক করে অন্য কার্ডগুলোর লেখাগুলোও পড়ে দেখলাম। ঘনাদার কথাই ঠিক। লেখার কলমই লেখককে চিনিয়ে দিয়েছে।

কেমন সে কলম? এমন আজগুবি কিছু নয়। শুধু নিব-এ একটু দোষ আছে। ওপর দিকে কলমের টান দেবার সময় খুব মিহি, প্রায় অদৃশ্য কালির ছিটে কাগজের ওপর ছড়ায়।

এই সূক্ষ্ম ছিটে মৌ-কা-সা-বি-স-এর যত চিঠি আমরা পেয়েছি সবগুলিতেই একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়!

সেই ঘরে—তখনই সেই টঙের ঘরে ছুটলাম?

না, বিকেলের খাবারের ফরমাশগুলো গরম গরম এসে পৌঁছবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষাই করলাম।

খাবার কী এল তার বর্ণনার বোধহয় দরকার নেই। শুধু স্পেশ্যাল আইটেমটার একটা বর্ণনা দিই। সেই এক বারকোশ প্রমাণ পূর্ণচাঁদের মাপের একটি নরম পাকের কাঁচাগোল্লা, সাদা জমির ওপর নীলচে লালচে ক্ষীরের বুটি তোলা অক্ষরে লেখা—"মৌ-কা-সা-বি-স-এর ভাঙা কলম।"

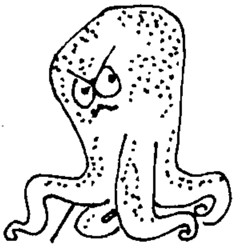

কালো ফুটো সাদা ফুটো

"না, না, মাপ করবেন। দোহাই আপনাদের। আজ আর পেড়াপিড়ি করবেন না। আজ ওঁকে এই নিয়ে বিরক্ত করতে পারব না—"

ছুটির দিন। একটু সকাল থেকেই আড্ডা ঘরে সবাই জমায়েত হয়েছি। টঙের ঘরের তিনিও নেমে এসে তাঁর মৌরসি কেদারাটা দখল করে বসেছেন।

এই সময়ে বারান্দা থেকে নীচের দিকে কাকে না কাদের উদ্দেশ করে গৌরের ওই চেঁচামেচি ভাল লাগে!

চেঁচামেচিটা কেন, কাকে উদ্দেশ করে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না।

ওদিকে মৌরসি কেদারায় তাঁর মেজাজটাই না এই সাত সকালে বিগড়ে যায়।

প্রায় ধমকের সুরে গৌরকে তাই ডাকতে হল, "এই, কী হচ্ছে কী? কার সঙ্গে কী জন্য অমন চেঁচামেচি করছিস?"

"আর কার সঙ্গে?" গৌর বারান্দার রেলিং থেকে আমাদের দিকে ফিরে বিরক্ত গলায় বললে, "সক্কাল বেলাই কী ঝামেলা দেখ দিকি!"

এইটুকু বলেই আবার বারান্দার থেকে নীচের দিকে মুখ নামিয়ে একসঙ্গে বিরক্তি আর কাতরতা মিশিয়ে বললে, "বললাম তো—আজ কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আপনারা বরং আপনাদের নাম ঠিকানা রেখে গিয়ে পরের রবিবারে আসুন—হ্যাঁ, হ্যাঁ পরের—ওঁকে-না আগে থেকে না জানিয়ে—"

ভেতর থেকে আবার আমাদের গলা ছেড়ে গৌরকে ডেকে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করতে হল, "শোন শোন, গৌর, শোন। ব্যাপারটা হয়েছে কী! এই সাত সকালে কার সঙ্গে চেঁচামেচি করছিস! কে ওরা? কী চায়?"

"কে ওরা? কী চায়?" গৌর একেবারে গনগনে মেজাজে বললে, "সব পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি। এসেছেন দূর-দুরান্তর থেকে ঘনাদার ইন্টারভিউ মানে সাক্ষাৎকার নিতে। তাও কি কাছে পিঠের কোথাও থেকে? একজন এসেছে হলদিয়ার কাছের কোন গ্রাম থেকে, আর-একজন দুর্গাপুর থেকে, আর একজনরা বিহারের দানাপুর থেকে।"

"উৎসাহ খুব!" আমাদের স্বীকার করতেই হল—" তা কী নিয়ে ইন্টারভিউ মানে সাক্ষাৎকার তারা চায়?"

"কী নিয়ে আবার!" গৌর আমাদের ওপরেই বিরক্ত হয়ে বললে, "সাক্ষাৎকার কী নিয়ে হয় তা জানো না? এই আপনি কোথায় জন্মেছেন, পড়াশুনা কী করেছেন, আপনার বাড়িঘর কোথায়, কে আছে সেখানে—কী খেতে ভালবাসেন!"

"এইসব নিয়ে বকিয়ে ঘনাদাকে জ্বালাতন করবে?" আমরা ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললাম, "এ সাক্ষাৎকারে ওদের লাভ কী?"

"লাভ—যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল তাঁকে নিয়ে বিনা খরচে অতি সহজে কাগজের খানিকটা পাতা ভরানো।" গৌর তেতো গলায় বোঝালে, "আজকাল এই এক নতুন কায়দা হয়েছে—কাগজের কদর বাড়াবার। যাদের লেখা জোগাড় করা শক্ত তাদের সাক্ষাৎকার নাও। না দিয়ে পার পাওয়া সহজ নয়।"

তা যে নয়, নীচের চেঁচামেচির মাত্রা চড়ে যাওয়া থেকেই তা তখন বোঝা যাচ্ছে। নীচে থেকে নানা পর্দার গলায় ডাক আসছে, "ও মশাই শুনুন না, একবার শুনেই যান না।"

"কী করা যায় বলো তো," গৌর অসহায় ভাবে আমাদের দিকে তাকাল। ঠিক কী করা যায় ভেবে না পেয়ে আমরাও যখন সমান অসহায় তখন সমস্যাটা যাঁকে নিয়ে উপায়টা তিনিই বাতলালেন।

"শোনো হে, শোনো!" বলে ঘনাদা আমাদের জানালেন, "ওই ইন্টারভিউ-এর জন্যে তিন দল এসেছে বলছ? বেশ ভাল কথা। ওই তিন দলকে একটা প্রস্তাব জানিয়ে বলো তা মানলে ওদেরই—ওরা একটা সাক্ষাৎকার পেতে পারে।"

সাক্ষাৎকার পেতে পারে? ঘনাদা নিজেই কথা দিচ্ছেন? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী প্রস্তাব, ঘনাদা?"

"প্রস্তাব এই যে", ঘনাদা ব্যাখ্যা করে শোনালেন, "সাক্ষাৎকার আমি এক দলকেই দেব। আর শুধু একটা মাত্র প্রশ্নের বিষয়ে। এখন ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করুক, কোন দলের কোন প্রশ্ন নিয়ে ওরা সাক্ষাৎকার চায়। ওরা যদি নিজেদের মধ্যে সে বোঝাপড়া না করতে পারে তাহলে সব সাক্ষাৎকার বাতিল।"

ঘনাদার প্রস্তাবটা ভালই ছিল। কিন্তু সেটা যে সত্যি কাজ দেবে তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেই তিন দল তাদের সুযোগটা নষ্ট করে করবে।

কিন্তু তা হল না। সবই হারাবার চেয়ে কিছু পাওয়াই যে ভাল তা বুঝে তিন দল এক হয়ে একটি প্রশ্ন নিয়েই ঘনাদার ইন্টারভিউ নিতে নীচে থেকে আমাদের আড্ডা ঘরে উঠে এল। এদিকে ওদিকে সুবিধা মতো বসে একটু তোতলামি নিয়েই তাদের প্রশ্নটা জানাল।

প্রশ্ন শুনে আমরা খুশিই হলাম বলতে পারি। যা ভয় করেছিলাম সেরকম সৃষ্টি ছাড়া কোনও প্রশ্ন নয়। তার বদলে নিতান্ত সরল সহজ একটা জিজ্ঞাসা। সেটা হল এই যে সারাজীবনে ঘনাদা তো দুনিয়ার অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে তাঁকে কোন জায়গা?

"সব চেয়ে আশ্চর্য করেছে কোন জায়গা?"

ঘনাদা যেভাবে প্রশ্নটা নিজের মুখে আবার উচ্চারণ করে শোনালেন মনে হল উত্তরটা দিতে তাঁকে বেশ ভাবতে হবে।

কিন্তু না। প্রশ্নটা নিজে আউড়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তরটা তিনি শুনিয়ে দিলেন—

"ঘুঘুডাঙা।"

"ঘুঘুডাঙ্গা!"

ইন্টারভিউ নিতে আসা দল চুপ তো বটেই, আমরাও একেবারে হাঁ।

আমাদের অবস্থাটা ঠিক মতো অনুমান করে ঘনাদা এবার ব্যাখ্যা করে বললেন, "শুধু ঘুঘুডাঙা শুনে অবশ্য বুঝতে কিছু পারবে না। জায়গাটা তেমন দূর কোথাও না হলেও নামকরা কোনও জায়গা নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে ঘুঘুডাঙা নামটাই খুব কম লোকের জানা আছে। হাওড়া থেকে লুপ লাইনে যেতে খানা জংশন ছাড়াবার কিছু পর বিরাট একটা ডাঙা পেরিয়ে যেতে হয়। ছোটখাটো ডাঙা তো নয়, মাঝে মাঝে দু-চারটে শাল পিয়ালের পাতলা জঙ্গল নিয়ে ডাঙাটা একনাগাড়ে অমন চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল ছড়ানো। নদী নালা নেই, শুধু এখানে সেখানে লাল কাঁকুরে মাটির ঢিবি নিয়ে জায়গাটার যেন আধা মরুভূমির মতো চেহারা।

এই নেহাত নিষ্ফলা সকল-কাজের-বার ডাঙা জমিটা আমার চেনা এক খেয়ালি ভদ্রলোক একেবারে জলের দরে শ-দেড়েক বিঘে কিনে সেখানে একটা বাংলো গোছের বাড়ি বানিয়ে ছিল। তার আশা ছিল এই নিষ্ফলা আধা-মরু ডাঙার অনেক নীচে কোথাও কোনও পাতাল-ধারার সন্ধান সে পাবে, আর কল্পনা ছিল যে তাই দিয়ে ওখানে এক নন্দনকানন বানিয়ে তুলবে। ডাঙা জমিটা কিনে বাংলো বাড়িটার অর্ধেক তুলতে তুলতেই খেয়ালি মানুষটা মরে যায়! তার যারা ওয়ারিশন তারা এখন ঘনাদার লোককে জলের দরেই ও সম্পত্তি বেচে দিতে রাজি থাকলেও বহুদিন কোনও খরিদ্দার তাদের জোটেনি। সে সময়টা, শুধু নির্জনতার খাতিরে আমি মাঝে মাঝে সেখানকার সেই আধা তৈরি বাংলো বাড়িটা ভাড়া নিয়ে সেখানে গিয়ে কিছু দিনের জন্য থাকতাম। ও ডাঙা জমি যে প্রথম কিনেছিল সেই খেয়ালি মানুষটি জায়গাটার নাম দিয়েছিল নন্দন। আমিই তা বদলে ঘুঘুডাঙা নাম রেখেছিলাম।

সেবার যখন ঘুঘুডাঙার বাংলোয় যাই তখন বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। দেশে সেবার সব জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। শুধু ঘুঘুডাঙা একেবারে খটখটে শুকনো মরুভূমি। আকাশের মেঘগুলো যেন ওই অঞ্চলটা পার হবার সময় জল ঢালতে ভুলে যায়।

তবু শরতের গোড়ায় ওই ধু ধু লাল মাটির ডাঙারও কেমন একটা রূপ যেন খোলে। বিশেষ করে ভোরের আলোয় তার দিগন্ত ছোঁয়া শূন্যতারই একটা আলাদা আকর্ষণ আছে!

অনেক দূরের এক পুরো রেলস্টেশনও নয়, নম্বর দেওয়া হল্ট যাকে বলে, সেইরকম স্টেশনে বিকেলের আগে এক অখদ্যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নেমে জাদুঘরে রাখবার মতো গোরুর গাড়িতে কখনও মেঠো কাঁচা রাস্তা কখনও সটান উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো পাথুরে ডাঙার ওপর দিয়ে প্রায় দু প্রহর গাড়ি চালিয়ে রাত এগারোটা নাগাদ আমার ঘুঘুডাঙার বাংলো বাড়িতে এসে পৌঁছই। বহু দূরের এক গাঁ থেকে এক মুনিস-চাষি চৌকিদার হিসাবে মাঝে মাঝে এসে এ বাংলোটা দেখাশুনো করে যায়। আগে থাকতে চিঠিতে খবর দেওয়ায় সে এসে হয়তো ঘরদোরগুলো একটু সাফসুফ করে খাটিয়াটাটিয়া পেতে শোবার বিছানাটিছানা একটু ঝেড়ে ঝুড়ে

দিয়ে চলে গেছে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে আমার জন্য তার থাকার কথা নেই, সে থাকেওনি। গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানও আমায় পৌঁছে দিয়ে পরের দিন সকালে তার খেপ আছে বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

ওই ধু ধু ঘুঘুডাঙার আধভাঙা বাংলো বাড়িতে আমি একেবারে একা।"

এই পর্যন্ত বলে ঘনাদা থেমে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে আমাদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "কী ভাবছ সবাই? এরপর যা দেখব তা আশ্চর্য এক ভূতের কাণ্ডকারখানা? না। যা দেখেছি তা ভৌতিকের চেয়ে আরও আশ্চর্য ব্যাপার, কল্পনাও তার নাগাল পায় না এমন অবিশ্বাস্য রকম অদ্ভুত কিছু।"

ঘনাদা আবার একটু থামলেন। আমরা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

"সারাদিনের ক্লান্তি।" ঘনাদা বলতে শুরু করলেন, "সঙ্গে আনা খাবারের সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুমটা ভোর হতেই বোধহয় ভাঙল। কিন্তু এ কী রকম ভোর! ভোরের আলো এমন সবুজ হল কী করে। হ্যাঁ, সবুজ। একটু বেশি করে হলদে মেশানো একরকম অদ্ভুত সবুজ! বিছানা ছেড়ে এক লাফে উঠে চারিদিকে চেয়ে একেবারে হতভম্ব। এ কোথায় আমি আছি! এখন কি স্বপ্ন দেখছি তাহলে? না, স্বপ্ন নয়। নিজেকে চিমটি কেটে, নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হেঁচে পরীক্ষা করে বুঝলাম, আমি পুরোপুরি জেগে আছি। কিন্তু কোথায়? আমার চারিধারে ঘরের দেওয়াল কি মাথার ওপর ছাদ নেই! কেমন যেন কাচের মতোই স্বচ্ছ একরকম ঢাকনা। আমি সামনে একটু এগিয়ে যেতেই সে ঢাকনা আপনা থেকেই যেন অদৃশ্য কব্‌জায় উঠে গেল।

কিন্তু তারপর সামনে এ কী দেখলাম? কোথায় সেই ধু ধু করা লাল কাঁকুরে ডাঙা! এ তো যেন বাঁধানো সমুদ্র তীরের খানিকটা। সমুদ্রের রঙ হলুদ মেশানো সবুজ, আর সমুদ্রের ধারে অসংখ্য গুহার মতো ফাঁকওয়ালা বিশাল এক চ্যাপ্টা নিচু দালান যার বিরাট ছাদটা মাপে একটা ছোটখাটো পার্কের মতো। আমাদের পৃথিবীর বড় বড় প্রাসাদের বাইরে কোনও বিশাল ছড়ানো বাগান থাকে—বিশাল ছড়ানো ছাদটা যেন তাই। কিন্তু সে পার্কের মতো ছাদে ওরা কারা? হ্যাঁ, নীচের অগুনতি গুহা-মুখ থেকে উঠেই তো সমুদ্রের জলে সাঁতরে বেরিয়ে আসতে আর সেখান থেকে গুহা-মুখে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে ওদের। কিন্তু ওরা কী রকম প্রাণী? চেহারাটা কতকটা ঘেরাটোপে অক্টোপাসের মতো নয় কি? হ্যাঁ, অক্টোপাসই। তবে ঘেরাটোপের ওপরে চকচকে চোখ বসানো প্রকাণ্ড মাথাটার চারিধারে চারটে বাহু, আর বাকি চারটে খাটো ঘাঘরার মতো ঘেরাটোপের নীচে। সেগুলোয় ভর দিয়ে তাদের চলাফেরাই শুধু অদ্ভুত নয়, অদ্ভুত তাদের আরও অনেক কিছু। প্রথমত তাদের গায়ের রঙ। পার্কের মতো বিরাট চ্যাপ্টা প্রাসাদের ছাদে কিছু একটা জটলার ব্যাপার আছে বলে মনে হয়! অসংখ্য ঘেরাটোপ জড়ানো অক্টোপাস সেখানে জড়ো হয়েছে দেখা যাচ্ছে। নীচের সমুদ্র থেকে গুহা-মুখ দিয়ে দলে দলে যেমন আসছে ওপরের আকাশ থেকেও তেমনই বড় বড় বাদুড়ের মতো প্রাণীর পিঠে সওয়ার হয়ে আসছে আরও অনেকে। শুধু বাদুড়ের পিঠে চড়ে

আসাটাই আশ্চর্য নয়। আশ্চর্য তাদের গায়ের রঙও। নীচের ছাদে যারা জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে চারটে নীল হলদে থাকলেও অধিকাংশই সবুজ রঙ-এর। কিন্তু হাঁসে চড়ে যারা আসছে ওরা সবাই ফিকে লাল। মনে হচ্ছে একটা খুব বড় গোছের সমাবেশ এখানে হচ্ছে। কিন্তু কাদের সমাবেশ? কারা এরা? স্বপ্ন যদি না হয় তাহলে এ কী দেখছি।

হঠাৎ কপালে কী একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় চমকে উঠে দেখলাম ঘেরাটোপ জড়ানো এক অক্টোপাস মূর্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপর থেকে কপালের দুধারের রগে কী একটা এঁটে দিয়েছে।

প্রথমে একটু মাথা ঝিম ঝিম। তারপরই স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'ভয় পেয়ো না—যা তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছি তাতে, তোমার নিজের ভাষা যা-ই হোক, আমাদের সব কথা তুমি নিজের ভাষাতেই স্পষ্ট বুঝতে পারবে। এ কোনও অণুবশ যন্ত্রটন্ত্র নয়। যে যেখানকারই হোক, তোমার মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর মস্তিষ্কের যে-অংশের বিশেষ ক্ষমতায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের কৃত্রিম ভাষা মূল যথার্থ অর্থে অনুবাদ হয়ে যায়, আমাদের দুজনের মস্তিষ্কের সেই অংশই এ-যন্ত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই জুড়ে দেওয়ার দরুন তোমার কথা আমি, আর আমার কথা তুমি ঠিক যেন নিজেদের ভাষায় বলা কথার মতোই বুঝতে পারছ। এখন তোমার মনে যে প্রশ্ন একটা উঠেছে তার উত্তর আগে দিচ্ছি, শোনো। তুমি যা দেখছ তা সত্যই এই জগতের এক মহাসমাজ। এ জগতের সব প্রান্তবাসী আমাদের সব জাতি উপ-জাতির প্রতিনিধি এখানে এ-জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায়। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তোমার মনের অন্য ক-টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে আগে দিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি যা ভেবেছ তাই। তোমাদের জগতের ফাইলাম মোলাস্ক-এর অক্টোপাসের মতো প্রাণীই এখানে সভ্যতার সবচেয়ে উঁচু ধাপে পৌঁছেছে। তোমাদের পৃথিবীতেও এই ফাইলাম মোলাস্ক-এর অক্টোপাস-এর মতো প্রাণীর মধ্যেও অনেক সম্ভাবনা যে আছে তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং প্রকাণ্ড মাথায় বুদ্ধিটুদ্ধির পরিচয় থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সময় নেই তাই সে কথা এখন থাক। আমাদের এই মহাসমাবেশ কী জন্য তাই বলি। তোমাদের দেশের বাদুড়ের মতো প্রাণীর পিঠে চড়ে আমাদের একদল প্রতিনিধিকে আসতে দেখে তুমি অবাক হয়েছ। ভাবছ বাহন হিসেবে বেগবান যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারিনি বলেই আমরা আদিমকালের মতো অন্য প্রাণীই বাহন হিসাবে ব্যবহার করি। না, তা নয়। আমরা যন্ত্রবিদ্যায় প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে, যে বিজ্ঞান পরমাণু-বোমা দিয়ে সৃষ্টি ধ্বংস করতে চায়, তা রোধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আজকের মহাসমাবেশও তাই নিয়ে। সময় নেই, নইলে আমাদের সব জাদুঘরে পারমাণবিক যুগের সমস্ত আশ্চর্য যন্ত্র তোমায় দেখাতাম। সেগুলো বাতিল করে এখন জাদুঘরে রাখা হয়েছে। আমাদের একদল এখন আর-সব যন্ত্র, এমন কী এই আমার ঘেরাটোপের মতো বস্ত্র বোনবার যন্ত্রও, বাতিল করে একেবারে আদিম প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। আর-এক দল

কিন্তু যন্ত্রের ওপর রাশ টেনে প্রকৃতির সঙ্গে সুর মেলানো জীবনের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য করতে চায়। আমরা আরও পিছিয়ে একেবারে সেই আদিম অবস্থায় ফিরে যাব, না যন্ত্রকে সরল স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে বেঁধে আর এক সভ্যতা সৃষ্টি করব এই প্রশ্নের আজ মীমাংসা হবে। এদিকে সময় যে একেবারে ফুরিয়ে এসেছে সে খেয়াল আমার নেই! আমি—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বারবার তুমি সময় নেই সময় নেই বলছ কেন বলো তো! কীসের সময় নেই।'

'সময় নেই আমাদের আলাপের।' মাথার ভেতর শুনলাম, 'যা তুমি দেখছ শুনছ এসব কোথা থেকে কী করে সম্ভব হল তুমি নিশ্চয় ভাবছ। শোনো, তুমি যা দেখছ তা এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কালো ফুটোর জগতের মানুষ তুমি সাদা ফুটোর ভেতর দিয়ে আর-এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার দেখতে পাচ্ছ। কালো ফুটোর কথা তুমি ভাল করে জানো। তোমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাদের মাঝে প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল যে-আলোর গতি সেই আলো লক্ষ কোটি বছরে যা পার হতে পারে না, তোমাদের সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে থাকতে পারে, তোমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কালো ফুটো থেকেই তার কিছু আভাস তোমরা বোধহয় পেয়েছ। কালো ফুটো এমন এক প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের গর্ত যেখানে মাধ্যাকর্ষণের টানে কাছাকাছি গ্রহ তারা সব কিছু এমন তলিয়ে যায় যে সেখান থেকে আলো কি বেতার তরঙ্গও বাইরে আসতে পারে না।

গ্রহ নক্ষত্রের মতো সব কিছু যার মধ্যে তলিয়ে যায় সেই ফুটোর মধ্যেই কি তারা জমা হয়ে থাকে? না আর-এক দিকে আর-এক ফুটো আছে তাদের বার হবার? সেই রকম সাদা ফুটোর কথা যারা অনুমান করেছেন তাঁরা ভুল করেননি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যোগাযোগের এমনই কালো ফুটো আর সাদা ফুটো সত্যি আছে।

বিশ্ব নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই বলি। সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অজানা নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সাদা ফুটো দিয়ে অন্য জগতের কিছুক্ষণের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। তিন ডাইমেনশন বা মাপের জায়গায় চারের কি পঞ্চম ডাইমেনশন-এর কল্যাণে কিছুক্ষণের জন্য এক জায়গায় পরস্পরকে দু জগৎ ছুঁয়েই ফেলেছে। কিন্তু সে শুধু সামান্য একটু সময়ের জন্য। ওই দেখো, এখনই সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। বিদায় ক্ষণিকের বন্ধু, বিদায়।'

মাথার ভেতর শব্দতরঙ্গ যেমন থামল, অদ্ভুত রঙের জগৎও তেমনই কিছুক্ষণের জন্য ঝাপসা হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কই, কোথায় সেই সবুজ আলোর সভা অক্টোপাসের দেশ? এ তো সেই ধু ধু লাল মাটির মরু প্রান্তর।

আর আমি কি বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম? না, তা তো নয়, আমি ভাঙা বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি। যা দেখছি কিছু তাহলে মিথ্যে নয়!"

ঘনাদা চুপ করলেন।

সাক্ষাৎকার নিতে আসা একজন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার দু কপালে আঁটা যন্ত্রটা—সেটা খুলে নিয়ে গেছিল তো?"

কিছু না বলে ঘনাদা শুধু ঠোঁটের ওপর তর্জনীটা চাপা দিলেন।

শিবু ব্যাখ্যা করে বলল, "আপনাদের শুধু একটা প্রশ্ন করারই অনুমতি ছিল সেটা ভুলবেন না।"

অসম্পূর্ণ ঘনাদা

বাহাত্তর নম্বরের তেতালার টঙের ঘর সত্যিই যে তখন খালি করে ঘনাদা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, বুনো বাপি দত্তের হপ্তায় হপ্তায় ডজন ডজন বিগড়ি হাঁস খাইয়ে আমাদের সকলের হাঁস ও সবরকম মাংসেই অরুচি ধরাবার কথা যাঁরা জানেন তাঁদের সকলেরই মনে পড়বে।

ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তা বাহাত্তর নম্বরেরই উপযুক্ত কিছু। দু-কথায় পুরনো স্মৃতিটা একটু ঝালিয়ে নিই। নতুন এক বোর্ডার বুনো বাপি দত্ত ফি শনিবার ছুটির রবিবারটা কাটিয়ে আসার জন্য দেশে যাবার সময় এক জোড়া করে বিগড়ি হাঁস সঙ্গে নিয়ে যেত।

এক শনিবার দেশে যাবার সময় তার কেনা বিগড়ি হাঁসের জোড়া না দেখে সে খাপ্পা। স্বয়ং ঘনাদাই তার সে হাঁস কেটে সেদিন তাদের খাইয়েছেন জেনে সে একেবারে আগুন। সে আগুন জল করে দিতে ঘনাদা যা শোনালেন বাপি দত্ত তাতেই জল হয়ে ঘনাদার প্রতি অতল ভক্তি আর অটল বিশ্বাসে দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা ডজন ডজন বিগড়ি হাঁস কিনে এনে খাইয়ে মেসের সকলের মাংসে অরুচি ধরিয়ে ছাড়লে।

ঘনাদা বাপি দত্তের জোড়া বিগড়ি হাঁস কাটবার কৈফিয়ত হিসেবে শুনিয়েছিলেন যে, তিনি বিগড়ি হাঁস পেলেই কাটেন এক বিশেষ কারণে। সে হাঁসের পেট থেকে তিনি তাঁর একটি নস্যির কৌটো উদ্ধার করতে চান।

কেন? কারণ সেই নস্যির কৌটো দুনিয়ার সবার সেরা হিরে মাণিকের খনির চেয়ে দামি।

কেন?

কারণ তিব্বতের টাকলা মাকানের অসীম তুষার প্রান্তরে তুচ্ছ এমন একটি হ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন যার প্রতি কৌটা জল অমূল্য বললেই হয়। সে জল হচ্ছে—বিজ্ঞানীরা যাকে বলে—ভারী জল। সাধারণ জলে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের পরমাণুর যে অনুপাত থাকে, ভারী জলে তা থেকে একটু আলাদা। সেই তফাৎটুকুর জন্য বর্তমান যুগের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের গবেষণায় বৈজ্ঞানিকেরা সে জল নিয়ে অসাধ্য সাধনের ভোজবাজি দেখাতে পারেন।

এই হ্রদ আবিষ্কার করেও এক দুশমনের হাতে ধরা পড়ে জান-প্রাণ সমেত সবকিছু খোয়াবার উপক্রম হলে ঘনাদা তাঁর আবিষ্কার একেবারে ব্যর্থ না হতে দেবার দুরাশায় তাঁর আবিষ্কৃত হ্রদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান এক টুকরো কাগজে লিখে সেই কাগজ কুচিটা তাঁর নস্যির কৌটোয় ভরে একটি বিগড়ি হাঁসের ঠোঁট ফাঁক করে তার গলার ভিতর ঠেলে দিয়ে তাকে গিলিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিগড়ি হাঁসটা ছিল শিকারিরা যাকে ব্রাহ্মিনি হাঁস বলে সেই জাতের। হিমালয়ের ওপরের তুষার প্রান্তর থেকে দারুণ শীতের সময় ওরা ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের জলায় শীত কাটাতে আসে। অমন ব্রাহ্মিনি হাঁস ঘনাদা পেলেন কোথায়? সেও তাঁর ভাগ্য বলতে হয়। দুশমনের কাছ থেকে পালাবার সময় এক তুষার ঢাকা টিলা পার হবার সময় হাঁসটাকে দেখতে পান। হাঁসটা সুদূর সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় পেরিয়ে ভারতবর্ষ পাড়ি দেবার পথে খানিক বুঝি বিশ্রাম করতে নেমেছিল টিলাটার ওপর। ঘনাদা হাঁসটাকে শুধু দেখেননি। যে—

নাটক

পৃথিবী যদি বাড়ত

[বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের দোতলার আড্ডা ঘর। বেশ বড় ঘর। ডান দিকে পেছনে বাইরের বারান্দায় যাবার বড় দরজা দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় রেলিং ও আরও দূরে ওপরে ছাদে ওঠবার ন্যাড়া সিঁড়িটার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি বজায় রেখে ঘরটি নিজেদের সুবিধা ও পছন্দ মতো যেভাবে হোক সাজানো যাবে। তবে কয়েকটি আসবাবপত্র না থাকলেই নয়। যেমন ঘরের মাঝামাঝি একটু বাঁদিক ঘেঁষে দর্শকদের দিকে মুখ করে পাতা একটি আরাম কেদারা। আর ভাল আয়না গোটা দুই ও বাঁ পাশে গোটা তিন-চার চেয়ার। চেয়ারগুলি এক রকমের হবে না। কোনওটা টিনের, কোনওটা কাঠের। কোনওটার হাতল আছে, কোনওটার নেই। কোনওটা আবার শুধু টুল। দর্শকদের লাইনের চেয়ারগুলির পেছনে একটা ছোট সতরঞ্জি-পাতা তক্তপোশ আর সামনে একটি নিচু চৌকো টেবিল আর গোটা দুই টি-পয় থাকবে। দর্শকদের ডান দিকের পেছনে বারান্দায় যাবার দরজা। বাঁ দিকে একেবারে পেছনের দেয়ালে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত একটি বড় সাদা পর্দা টাঙানো থাকবে। ঘরের সামনের দিকে অভিনয় হবার সময় পর্দাটি আধো-অন্ধকার পেছনের দেওয়াল বলেই মনে হবে। তার ওপর দুটো-একটা কিছুর ছায়াও ফেলে রাখা যেতে পারে। পরে এই পর্দাটি পেছনের উজ্জ্বল আলোয় ছায়ামূর্তি প্রক্ষেপের জন্য ব্যবহার করা হবে।

এ নাটিকার অভিনয়ে এই ক-টি চরিত্র থাকবে। স্বয়ং ঘনাদা, জটাজুট আর একরাশ দাড়িগোঁফে ঢাকা অথচ ঈষৎ গেরুয়া রঙে ছোপানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নকল দুর্বাসা, এ ছাড়া গৌর, শিবু, শিশির ও সুধীর। শেষের চারজন কেউ ধুতি-পাঞ্জাবি কেউ প্যান্ট-শার্ট পরা থাকতে পারে। ঘনাদার ধুতির ওপর হাত গোটানো শার্ট আর সাধারণ কোঁচানো ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি।]

গৌর (ঘর সাজাতে সাজাতে)—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা চিকেন বিরিয়ানি আর দুম্বা খাসির রগন জোস তো হেলায় ফেলায় বানাবার জিনিস নয়। রামভুজের সঙ্গে বনোয়ারির তাই আর অন্য কাজের ফুরসুতও নেই।

ঘনাদা (যেন কিঞ্চিৎ আপত্তির সুরে)—তা, রাত্রে অন্য সব হচ্ছে, তার উপর এখন আবার এসব কেন?

সুধীর (বড় বড় দুটি ফিশ রোলের প্লেট ট্রে-তে নিয়ে গিয়ে ঘনাদার হাতে তুলে দিতে দিতে)—আজ্ঞে, ডি লুক্স কাফের ফিশ রোল। ওদিক দিয়েই আসছিলাম। সবে টাটকা ভাজছে দেখে না নিয়ে এসে পারলাম না।

(শিশির তখন তার সিগারেটের টিন রাখা ট্রেটাও সামনে এনে ধরেছে। ঘনাদা কোনটা আগে নেবেন ঠিক করতে না পেরে বেশ দোনামনা ভাবে দুদিক চাইছেন।)

সুধীর (ফিশ রোলের প্লেটটা ঘনাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে)—নিন, ঠাণ্ডা হতে দেবেন না।

(ঘনাদা প্লেটটা নেবার পর সুধীর, গৌর, শিশির, শিবু এক-একটি আসন নিয়ে বসতে যাচ্ছে আর ঘনাদা বেশ প্রসন্ন হাসি হেসে একটি ফিশ রোল তুলে নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বারান্দার দরজার বাইরে নেপথ্যে গর্জন।)

নেপথ্য থেকে—অয়ম্ অহম্ ভোঃ! তিষ্ঠ—

(হঠাৎ সবাই দরজা থেকে সরে ঘনাদার দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন হতভম্ব। ঘনাদার প্লেটের ফিশরোলটা তাঁর হাত থেকে শূন্যে উঠে ঠিক তাঁর নাকের ওপর ঝুলছে। এই অবস্থায় বারান্দার দরজা দিয়ে মাথায় একরাশ জটা আর মুখে দাড়ির বিরাট জঙ্গল নিয়ে গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবি চাদর গায়ে দেওয়া এক অদ্ভুত মূর্তির আবির্ভাব)

জটাজুটধারী (ঘনাদার দিকে হাত তুলে)—লজ্জা করে না তোমাদের! অতিথি পরিচর্যা ভুলে নিজেদের ভোজন বিলাসে মত্ত। যে লোভে অতিথির অমর্যাদা করেছ সেই লোভের গ্রাসেই তাহলে ছাই পড়ুক।

(ঘনাদার প্লেটের ফিশরোল দুটি অভিশাপের সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যে যেন লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে ছাদে ঠেকে ছত্রাকার।)

শিবু শিশির (সবাই দাঁড়িয়ে উঠে যেন স্তম্ভিত আতঙ্কে)—আরে, আরে, একী কাণ্ড!

ঘনাদা (দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে)—ননুক্রিয়াতামাসন পরিগ্রহঃ। অর্বহিতোঽস্মি!

(ঘনাদা নিজের আরাম কেদারাটাই জটাজুটধারীর দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছিলেন, জটাধারী তার আগেই নিজে থেকে একটা চেয়ার টেনে তাতে বসতে বসতে...)

জটাজুটধারী (চেয়ারটায় বসে)—যাক আমি প্রীত হয়েছি তোমার বিনয়ে আর দেবভাষা প্রয়োগে! আমার ক্রোধ আমি সংবরণ করলাম! (ক্ষমায় উদার ও প্রসন্ন হবার সুরে) হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে ঘনশ্যাম কার নাম বলো তো!

গৌরা (চাপা স্বরে শঙ্কিতভাবে)—এইরে, সব বুঝি দিলে গুবলেট করে!

শিশির (চাপা গলায় আশ্বাস দিয়ে)—না, না, বোধহয় ভয় নেই। ঘনাদার চেহারাটাই দেখ না।

ঘনাদা (বিগলিত বিনয়ে)—আজ্ঞে অধীনের নামই ঘনশ্যাম। আপনার প্রতি অসম্মানের অপরাধে মার্জনা ভিক্ষা করছি। সত্যিই প্রথমে আপনাকে চিনতে না পেরে সেই মালাঞ্জা এমপালে বলে ভুল ভেবেছিলাম।

জটাজুটধারী (বেশ একটু সন্ত্রস্ত অস্বস্তির সঙ্গে)—মালাঞ্জা এম-পালে!

ঘনাদা (যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত স্বরে)—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই যে সাংকুর নদীর ধারে এমবুজি মাঈ থেকে চোরাই হিরে পাচার করার জন্য আমায় ম্যাজিকের ধোঁকা দিয়ে এপুলু-তে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে খবরে ইতুরির গহন বনে পাঠিয়ে জংলিদের ঝোলানো ফাঁদের ফাঁসিতে লটকে মারবার চেষ্টা করেছিল। আর যার মতলব হাসিল হলে

পৃথিবীটা আরও দশ-বিশগুণ বেড়ে গিয়ে আমাদের কী দশা যে হত জানি না, সেই মালাঞ্জা এমপালে ভেবে আপনাকে একটু তাচ্ছিল্য করেছিলাম গোড়ায়, তবে (ঘনাদা যেন একটা বিশ্রি স্মৃতি ঢাকবার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে) থাক সে কথা।

শিবু, শিশির, গৌর, সুধীর (প্রায় এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে)—সে কী! থাক কী বলছেন!

জটজুটধারী (সমান আগ্রহের সঙ্গে)—না, না থাকবে কেন? মনে যখন হয়েছে তখন বলেই ফেলো। বদখদ কিছু হলে সে স্মৃতি পেটে রাখতে নেই। ওই কী বলে—তাতে আবার বদ হজম হয়।

ঘনাদা (হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—না, বদহজম আর কী হবে, পেটে যখন কিছু পড়েনি।

জটাজুটধারী (অপ্রস্তুত ও ব্যতিব্যস্ত)—তাই তো বটে! তাই তো বটে! আমি আবার অভিশাপটা দিয়ে ফেলে খাওয়াটাই নষ্ট করে দিয়েছি। তা তোমরা—

(জুটজুটধারীর কথা শেষ হতে না হতেই বারান্দার দরজায় বনোয়ারির আবির্ভাব।)

বনোয়ারি (দরজা থেকে)—মাফি মাঙছি, হামাকে রামভুজজি ভেজে দিলে। পুছ করতে পাঠালো আর গরমাগরম পিশরুল আসবে কি না।

জটাজুটধারী (সবিস্ময়ে)—গরমাগরম পিশরুল! সে আবার কী?

গৌর, শিশির, সুধীর, শিবু (একসঙ্গে)—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বহুৎ খুব আনবে! গরম গরম ভেজে আনবে। যা যা, জলদি যা। (জটাজুটধারীর দিকে ফিরে) পিশরুল হল ফিশরোলের বনোয়ারি বুলি। (ঘনাদার দিকে ফিরে) ফিশরোলগুলো তো এখুনি আসছে। তার আগে ওই আপনার ইতুরি না ফিতুরির জঙ্গলে ঝোলানো ফাঁস থেকে আপনার ওই বৃত্তান্তটা যদি একটু ধরেন।

[ওপরের কথাগুলো চারজনে যে-যেটা-ইচ্ছে একটা একটা টুকরো পর-পর বলবে]

ঘনাদা (যেন দ্বিধাভরে)—সে বৃত্তান্ত শুরু করতে বলছ? কিন্তু—(জটাজুটধারীর দিকে চেয়ে) কিন্তু এসব কথা ওঁর সামনে বলা ঠিক হবে?

গৌর শিশির ইত্যাদি (সমস্বরে)—খুব হবে, খুব হবে!

জটাজুটধারী—হ্যাঁ, হ্যাঁ শুরু করুন, শুরু করুন।

ঘনাদা (যেন ভরসা পেয়ে)—আসল কথা কী জানো! ওঁকে ম্যালাঞ্জা এমপালে ভাবার জন্য এখন লজ্জা হচ্ছে। কোথায় উনি আর কোথায় সেই শয়তানের শিরোমণি। চেহারায় মিল আছে ঠিক। মালাঞ্জা অবশ্য আরও ফর্সা ছিল। আরও মোটাসোটা জোয়ান চেহারা! তবে এঁকে দেখে ভেবেছিলাম, নিজের শয়তানির সাজাতেই মালাঞ্জা বুঝি অমন শুঁটকো মর্কট-মার্কা হয়ে গেছে।

[জটাজুটধারীর আর শিবু-সুধীর ইত্যাদির বেশ একটু অস্বস্তিকর অবস্থা। গলা খাঁকারি দিয়ে শিবু কিছু যেন বলতে যাবার মুখে ঘনাদা আবার শুরু করবেন—]

ঘনাদা—প্রথমে ম্যাজিক দেখিয়েই মালাঞ্জা আমায় মোহিত করে। একটা মানুষের

খোঁজে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তখন এমবুজি মাঈ শহরে এসেছি। (জটাজুটধারীর দিকে চেয়ে) এমবুজি মাঈ-এর কথা আপনি তো সবই জানেন।

জটাজুটধারী (বিব্রত)—আমি—আমি—আমি—

ঘনাদা (যেন ভক্তিভরে)—আপনার তো সশরীরে যাবার দরকার নেই। যোগবলেই তো সব জানতে পারেন। ও, তার সময় পাননি বুঝি। আচ্ছা, আমিই বলে দিচ্ছি। আগে যার নাম ছিল কঙ্গো আর এখন হয়েছে 'জানতি পারোনা'র জ-য়ের জাইর রাজ্যের একটা শহর এম্বুজি মাঈ, এটা আফ্রিকার পশ্চিম দিকের জাইর রাজ্যের এমন এক শহর যার চারধারের মাটি আঁচড়ালেও হিরে পাওয়া যায়। হিরের খোঁজে নয়, দুনিয়ার এমন একজনের খোঁজে সেখানে এসেছি যার দাম একটা হিরের খনির চেয়ে, আমার কাছে কেন, সমস্ত পৃথিবীর কাছে বেশি। তিনি আর কেউ নন, পৃথিবীর অসামান্য এক জৈব-রসায়নের বিজ্ঞানী। যিনি হঠাৎ তাঁর আইডাহোর ল্যাবরেটরি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন আর দুনিয়ার সব দেশের সেরা সব গোয়েন্দা বিভাগ হন্যে হয়ে খুঁজেও তাঁর কোনও সন্ধান পায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ড. লেভিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন স্বেচ্ছায়। তাঁর ল্যাবরেটরিতে তাঁর নিজের হাতে লেখা আর সই করা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়ে গেছেন যে তিনি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং কেউ যেন তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টা না করে।

কিন্তু ড. লেভিনের মতো বৈজ্ঞানিকের বেলায় দুনিয়ার মানুষ কি ওই চিঠি পড়ে হাত গুটিয়ে থাকতে পারে! ফল কিন্তু কিছু হয়নি। ড. লেভিন সাধনা সফল করতে স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন লিখে গেছেন। কী তাঁর সেই সাধনা অনেক চেষ্টায় সেটা আবিষ্কার করে অবাক হয়েছি। ড. লেভিনের সাধনা আজগুবি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি নাকি পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান করতে পৃথিবীকে আরও বড় করতে চান। পৃথিবী বড় করবেন মানে কী? পৃথিবী কি বেলুন যে ফুঁ দিয়ে হাওয়া পাম্প করে ফাঁপিয়ে তুলবেন! ব্যাপারটা আজগুবি। তবু লেভিন তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার একমাত্র অনুচর হিসেবে যাকে সঙ্গে নিয়েছেন তার নাম থেকেই তাঁকে কোথায় খোঁজা উচিত তার একটু হদিস পেয়েছি। সেই হদিস থেকে সোজা জাইর-এর এমবুজি মাঈতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে সাংকুর নদীর ধারে নির্জন একটা ছোট্ট বাংলো ভাড়া করলাম থাকবার জন্য।

নির্জন বাসায় থাকলেও হিরে কেনার হাঁক-ডাক করে শহরে তখন খুবই শোরগোল তুলেছি ইচ্ছে করে। ফলও ফলল ক-দিনের মধ্যে। ক-দিন বাদেই আমার সঙ্গে যে নিজে থাকতে ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এল সে স্বয়ং মালাজা এমপালে। কিন্তু আইডাহোতে ড. লেভিনের অনুচর হিসেবে তার যা চেহারা ছিল তা থেকে এখানে একটু আলাদা। সেখানকার ফর্সা শ্বেতাঙ্গ চেহারাটা এখানে হয়েছে ঝামা ইটের রঙের মতো।

মালাঞ্জা ঘরে ঢুকে হাতের কড়া ছিঁড়ে দেবার মতো করমর্দন করে বললে, খুব অবাক হয়েছেন, না, মঁসিয়ে দাস!

যেন উত্তর দিতে না পেরে তার দিকে বোকার মতো চেয়ে রইলাম।

[এই কথার ওপরে মঞ্চটা হঠাৎ একটা চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকের পর একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। সেই সঙ্গে বেশ জোরে উপযুক্ত কিছু বাজনাও বাজবে। তারপর সামনের দিকটা অন্ধকার হয়ে পেছনের পর্দাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে দুটি ছায়ামূর্তি দেখা যাবে সিলুটের মতো।

একটি ঘনাদার, আর-একটি তার চেয়ে লম্বায় চওড়ায় প্রকাণ্ড মালাঞ্জা এম্‌পালের। ঘনাদার ইউরোপিয়ান পোশাক আর মালাঞ্জার ঢোলা আলখাল্লা। কোমরে চাদর বাঁধা। মাথায় বাবরি চুলে ফেট্টি বাঁধা।

এ দুটি ছায়ামূর্তি অবশ্য আলাদা দুজন অভিনেতার। এরা মূক অভিনয় করবে। গলা দেবে মঞ্চে দেখা ঘনাদা ও জটাজুটধারী। বিদ্যুৎ চমকের পর মঞ্চ অন্ধকার হবার সময় তারা দুজন উইংস দিয়ে পেছনে চলে গিয়ে দুজনে ঝোলানো পর্দার দুধারে দাঁড়িয়ে গলা দেবে।]

মালাঞ্জা (আবার)—কী মঁসিয়ে দাস, বেশ একটু অবাক হয়েছেন, না!

ঘনাদা (আমতা আমতা করে)—তা মানে—তা একটু হয়েছি।

মালাঞ্জা (ঘনাদার কাছে এসে তার ঘাড়ে একটা হাত রেখে চাপ দিতে দিতে)—কীসে অবাক হয়েছেন? এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়েছি বলে?

ঘনাদা (যেন চেষ্টা করে কাঁধের চাপটা সইতে না পেরে একটু কাতর ভাবে)—না, আপনার চেহারাটা এত পালটেছেন বলে। আইডাহোতে ছিলেন ফর্সা বেলজিয়ান আর এখানে হয়েছেন বান্টু।

মালাঞ্জা (ঘনাদার পিঠে যেন ঠাট্টা করে একটা প্রচণ্ড চাপড় দিয়ে)—আরে এইটেই আমার আসল চেহারা, সেইটে ছিল মেক-আপ করা নকল। কিন্তু আইডাহো থেকে আমার খোঁজে এখানে এলেন কী করে?

ঘনাদা (যেন চাপড় খেয়ে টলে পড়তে পড়তে)—সামান্য একটু বুদ্ধি খাটিয়ে। তাছাড়া আপনি তো হদিসটা রেখেই এসেছিলেন।

মালাঞ্জা (অবাক হয়ে ও রাগী গলায়)—আমি রেখে এসেছিলাম? কী—

ঘনাদা (যেন ভয়ে ভয়ে)—আজ্ঞে, আপনার নামটা। আপনার সে বিদ্যাবুদ্ধি তো নেই। থাকলে জানতেন যে সব দেশের মানুষের নামের কিছু কিছু আলাদা বিশেষত্ব থাকে। যেমন আপনার মালাঞ্জা এমপালে—এ নাম আপনি ট্যানজানিয়া কি সুদানে পাবেন না।

মালাঞ্জা (যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঘনাদার ঘাড় ধরে নেড়ে)—শুধু নাম দেখেই তুই এখানকার হদিস পেয়েছিস?

ঘনাদা (যেন কাতরাতে কাতরাতে)—শুধু আপনার নয়, ড. লেভিনকেও যে ভুজুং দিয়ে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছেন তারও খোঁজ পেয়েছি।

মালাঞ্জা (এবার যেন হতভম্ব)—তারও খোঁজ পেয়েছিস শুধু আমার নাম থেকেই!

ঘনাদা (পেছনের দিকে সরে গিয়ে সবিস্ময়ে)—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে লেভিনের স্বপ্ন আর সাধনা হল পৃথিবীকে বড় করার। তার জন্য এই কঙ্গো বা জাইরে না এসে যাবেন

কোথায়?

মালাঞ্জা (গর্জন করে)—শোন, যেমন করেই হোক, এখানে যে পৌঁছেছিস এই তোর ভাগ্য। এবার ড. লেভিনের খোঁজ ছেড়ে সুবোধ ছেলের মতো তোকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।

ঘনাদা (সবিনয়ে)—কিন্তু আমার ঘর যে বড় দূর। এই গোটা আফ্রিকা আর আরব সাগর পার হবার পরও যেতে হবে ভারতবর্ষের একেবারে পূর্বপ্রান্তে বাঙালিদের দেশে। তার চেয়ে আপনিই ঘরে ফিরে যান—ওই কী বলে—বেলজিয়াম না জার্মানির কোনও লুকনো নাৎসি আস্তানায়। যেখানেই যান ইতুরির জঙ্গলের ধারে কাছে অন্তত থাকবেন না।

মালাঞ্জা (রাগে আগুন হয়ে)—ইতুরি! কী জানিস তুই ইতুরির?

ঘনাদা (একটু যেন বাহাদুরির সঙ্গে)—এইটুকু জানি যে পৃথিবী বড় করার সুবিধে দেখিয়ে সেইখানেই ড. লেভিনকে আপনি লুকিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকেই তাকে এবার উদ্ধার করব।

মালাঞ্জা (একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে)—কী! তুই তাকে উদ্ধার করবি?

মালাঞ্জা গোরিলার মতো ঘনাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘনাদা কিন্তু ঠিক সময় মতো সরে যাওয়ায় মালাঞ্জা সজোরে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে নীচে বসে পড়বে। ঘনাদা তাকে তুলতে গেলে সে আবার হুংকার ছাড়বে। ঘনাদা তাই শুনে অন্যদিকের দেওয়ালের কাছে সরে যাবে। মালাঞ্জা সেদিকেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই ঘনাদা সরে যাওয়ায় মালাঞ্জা আবার দেয়ালে মাথা ঠুকে ধাক্কা খেয়ে নীচে বসে পড়বে।

এই রকম বার তিন-চার দেওয়ালে প্রচণ্ড ঠোকা খেয়ে মালাঞ্জা একেবারে লুটিয়ে পড়বে নীচের মেঝেয়। নীচের মেঝের দিকটা গোড়া থেকেই অন্ধকারে থাকবে। মালাঞ্জাকে তাই ঠিক আর দেখা যাবে না। সে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘনাদা এক হাতে যেন তার বিশাল দেহটা তুলে দু-বার শূন্যে ঘোরাবেন। মালাঞ্জার এ দেহটা আসলে খড়ের। তারপর আবার সে দেহটা মাটিতে আছড়ে আবার আসল মালাঞ্জাকে তুলে একধারে বসাবেন। নীচে মেঝের দিকটা অন্ধকারে রাখার দরুন মালাঞ্জা আর খড়ের ডামি বদলাবদলির সুযোগ হবে। ডামি ঘোরাবার ও আছড়াবার সময় মালাঞ্জার গলায় আর্তনাদ বার করা হবে।]

ঘনাদা (সবিনয়ে)—আমি বড়ই দুঃখিত, হের মালাঞ্জা। এই বাংলো বাড়ির দেওয়ালগুলো গদি আঁটা থাকা উচিত ছিল।

মালাঞ্জা (কাতরাতে কাৎরাতে)—আমি দুঃখিত মি. দাস যে, আপনাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। চলুন এবার ইতুরির জঙ্গলে ড. লেভিনের কাছেই আপনাকে নিয়ে যাবার সম্মানটা আমার হোক।

[আবার সেই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক। তারপর অন্ধকারে যবনিকা নেমে আবার কয়েক সেকেন্ড বাদে উঠে যাবে। খুব জোরালো আবহসঙ্গীত থাকবে।

যবনিকাটা ওঠবার পর আলোকিত মঞ্চে আগের মতো ঘনাদা ইত্যাদি সকলকে

নিজের নিজের জায়গায় বসে থাকতে দেখা যাবে।]

ঘনাদা (জটাধারীর দিকে চেয়ে)—মালাঞ্জা তারপর ইতুরি জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল সত্যিই, তবে ড. লেভিনের কাছে পৌঁছে দেবার ছুতোয় ওখানকার বামনদের মরণ-ফাঁদে ফেলে মারবার ফন্দিই করেছিল ভাল করে। সে ফন্দি ভেস্তে দিয়ে আমি নিজেই ড. লেভিনকে তাঁর গোপন আস্তানায় খুঁজে বার করে তাঁর সর্বনাশা সাধনা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

গৌর (একটা বাঁকাসুরে)—আপনি গিয়ে ডাকলেন আর ড. লেভিন তাঁর গোপন আস্তানা থেকে তাঁর জীবনের পরম সাধনা একডাকে ছেড়ে দিয়ে সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে এলেন?

ঘনাদা (যেন পরম ঔদার্যে সব ধৃষ্টতা ক্ষমা করে)—তাই এলেন! প্রথমে তাঁর স্বপ্ন আর সাধনার কথা জেনেই যে তাঁর গোপন গবেষণার আস্তানার হদিস পেয়েছি তা জানাতে একটু অবাকই হলেন।

শিশির (বাধা দিয়ে)—সত্যি! সে হদিসটা কী করে পেলেন!

শিবু—যোগবলে নিশ্চয়!

ঘনাদা (ক্ষমার অবতার হয়ে)—না, যোগবলে নয়। দুই-এ দুই-এ চারের হিসেবে। সেই কথাটাই ড. লেভিনকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—আপনি পৃথিবী বড় করতে চান। কিন্তু পৃথিবী তো বেলুনের মতো ফুলিয়ে বড় করা যায় না। তখন বুঝলাম যে আপনার পৃথিবী বড় করা মানে মানুষকেই ছোট থেকে আরও ছোট করবার একমাত্র স্বপ্ন। যেখানে বামন মানুষ, বামন ছাগল-মোষ, বামন হাতি পাওয়া যায়, সেইখানেই আকার কমবার রহস্যের হদিস পাবেন ভেবে আপনি ইতুরি এসেছেন। কিন্তু শুনুন ড. লেভিন, আপনার গবেষণা, আপনার স্বপ্ন মানুষের পক্ষে সর্বনাশা। মানুষ ছোট হতে হতে পিঁপড়ের মতো হলে পৃথিবী তার পক্ষে বিরাট হবে সত্যি! মানুষের মনটা কিন্তু আরও বড়, আরও উদার না হলে আপনার সব স্বপ্নসাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

[এরপর ঘনাদা দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই শিবু, শিশির সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠবে।]

শিবু, শিশির ইত্যাদি (সমস্বরে)—আরে, যাচ্ছেন কোথায় ঘনাদা। বনোয়ারি যে ফিশরোল ভাজিয়ে এল বলে।

ঘনাদা (তবু দাঁড়িয়ে উঠে জটাধারীর কাছে যেতে যেতে)—হ্যাঁ, সেই জন্যই রোল আর ফ্রাই-এর উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য যোগীবরের জঙ্গলের বাধাটা একটু সাফ করে দিচ্ছি। (ঘনাদা একটানে জটাধারীর মাথার জটা আর মুখের নকল দাড়ি খুলে ফেলে দিয়ে) অপরাধ নেবেন না, যোগীবর, আপনার জটাজুট আর গোঁফ দাড়ি আমার ফিশরোল সরানো সিলিং থেকে ঝোলানো কলো সুতোয় বেঁধেই পাচার করে দিচ্ছি।

[ঘনাদার কথা শেষ করে যেন এক হাতে টান দেবেন আর জটাজুট আর দাড়ি গোঁফের চুল শূন্যে উঠে ছাদে চলে যাবে। সবাই হাত তালি দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারিকে ট্রে নিয়ে ঢুকতে দেখা যাবে। যবনিকাও আবহসঙ্গীতের সঙ্গে এবার নেমে আসবে।]

ছড়া

ঘনার বচন

১

উলটোহাটা যাবে কি?
সেখানে চাল সাবেকি।
বিকোয় শুধু ঘোড়ার ডিম,
পাঁচ পা সাপের, ব্যাঙের শিং,
ভিজে বেড়াল, শেয়ানা কাক,
নতুন নরুন, দাও যদি নাক,
শিকড় বাকড়, ফুসমন্তর,
ধাঁধা চোলাই বক-যন্তর।
বিকোয় কিছু, বিকোয় মিছু,
লাফ দেয় দর উঁচু-নিচু।

দোকান আছে, সওদা নেই
খরিদ করবে কী?
তিন শূন্যে কে জানে মাল
খাঁটি কি মেকি!

গদিতে গ্যাঁট দোকানদার
দেখা বিন্তি খেলে,
গলায় গামছা দিয়ে বসায়
দাম জানতে গেলে।

শুধোয় আগে ওজন কত,
মাপে বুকের ছাতি
হাঁটিয়ে দেখে চলন কেমন
ডাইনে না বাঁ-হাতি।

হাঁড়ির খবর খুঁটিয়ে জেনে

পাতে শীতল পাটি,
গড়গড়াতে ছিলিম সাজে
টানলে দাঁতকপাটি।

আদবকায়দা নিখুঁত সবই
বেচা-কেনার ঠাট।
ছাড়ান ছিড়েন নেইকো কারও
মাড়ালে চৌকাট।

দামের ওপর দস্তুরি নেয়
বাজিয়ে গুণে টঙ্কা;
তারপরে মাল পাও কি না পাও
কীসের লবডঙ্কা!

উলটোহাটা যায় তবুও
আদিশূরের নাতি
পরনে তার টেনা জোটেনা
পাগ পঞ্চাশ-হাতি!

২

পড়তে গেলে উঠতে হবে
লাফ দিতে পা মুড়তে,
পিছনে ঢিল নিয়েই তবে
সামনে পারো ছুঁড়তে।

দুনিয়াখানাই উলটো!
সোজা কথা শোনাও যদি
বুঝবে সবাই ভুল তো।
বাক্য কিছু হোক না বাঁকা
মনটা থাকুক সিধে।
কযে কথা প্যাঁচাও, শুধু
মর্মে না যায় বিঁধে।

তিলকে যত তাল কর না,
দিনকে করো রাত,

মুখের তোড়ে হয় যদিয়ো
হোক না বাজি মাত,
তালটা শুধু সামলনো চাই
হোয়ো না রাতকানা,
নইলে পড়ে বেঘোরে, শেষ
বুঝবে ঠেলাখানা।
ঘনার বচন শোনো,
সোজা হিসাব ক-জন বোঝে
উলটো করে গোনো।

৩

দুনিয়াটা হত যদি উলটো,
পুবে নয়, পশ্চিমে
পাক খেয়ে পৃথিবী
ঘোরার আইনটাই ভুলত!

হায়! হায়! কী হত যে তা হলে?
ভেবে ভেবে পাকিয়ো না চুল।
যে দিকেই ভোর হোক
সেইটেই পুব দিক
এইটুকু জেনো নির্ভুল!

তাই বলি, পৃথিবীটা
যে দিকেই পাক খাক
নিজের মাথাটা
রাখো ঠাণ্ডা,
পাত্তা না পায় যেন
হাহাকার মন্তর
পড়াবার ঘুঘু
সব পাণ্ডা!

৪

শোনো সবাই, দিচ্ছি বলে,
গুটি কয়েক সত্য।

কোন রোগে কী দাওয়াই দেবে
এবং কী বা পথ্য।

পড়তে বসে উসখুসিয়ে—
ওঠে যদি মনটা,
ডাংগুলি কি ঘুড়ির ধ্যানে
গোনে ছুটির ঘণ্টা।

মরু পাথার পেরিয়ে যাবার
হবে তখন উষ্ট্র—
এই বুদ্ধি দিয়ে গেছেন
জ্ঞানী জরাথুষ্ট্র।
উষ্ট্র কেন? মানে কী?
বুঝলে না তো?
বলে দি।

উষ্ট্র যেমন হপ্তার জল
জমিয়ে রাখে পেটে,
ছুটির খেলা তেমনই ঠেসে
রাখবে মাথায় এঁটে।

চুপিসারে সটকে পড়ার
খোঁজে শুধু মৌকা,
ভরা পালেও চড়ায়-ঠেকা—
হয় যদি এক নৌকা—
পড়ার সঙ্গে একটু করে
খেলা দিলে মাখিয়ে,
ছুটির পড়া, পড়ার ছুটি
দুই উঠবে জাঁকিয়ে।
এমনই আরও অনেক দাওয়াই
দিতে পারি বাতলে,
মেলে যদি মনের মতো
ভুজ্যিটা হাত পাতলে।

পরিশিষ্ট

ঘনাদার গল্প: কালানুক্রমিক পঞ্জি

ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদার প্রথম আবির্ভাব ১৯৪৫ সালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ঘনাদাকে নিয়ে প্রথমে 'মশা' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁকে নিয়ে আর লিখব না। কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে এত চিঠি আসতে লাগল যে, বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির ঘনাদা আর আমি কেউ পালাতে পারলাম না।" বস্তুত ১৯৪৬ সালে প্রেমেন্দ্র ঘনাদাকে নিয়ে কোনও কাহিনী লেখেননি। ঘনাদার পুনরাবির্ভাব ১৯৪৭-এ। ১৯৪৭ থেকেই পর পর, ফি বছর প্রকাশিত হতে থাকে ঘনাদার গল্প। প্রতিটি গল্পের নামই দুই হরফে বাঁধা। পরে অবশ্য নামের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি হয়।

ঘনাদার গল্প, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, মূলত প্রকাশিত হত দেব সাহিত্য কুটির ও শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকীগুলিতে [তালিকায় নামের পাশে যথাক্রমে দেব. ও শরৎ. লেখা থাকবে]। পরের দিকে ১৯৭৩ থেকে আনন্দমেলা ও ১৯৮০ সাল থেকে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এর পাতায় ঘনাদার খোঁজ পাওয়া যাবে।

ঘনাদা সমগ্র-তে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া, ঘনাদার বইয়ের গল্পক্রমই মানা হয়েছে। তবে বইয়ে গল্প সাজাবার সময় সর্বদা স্বয়ং লেখকই, গল্প প্রকাশের কালক্রম মানেননি, কখনও দীর্ঘ ব্যবধানে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে কোনও কোনও গল্প।

মশা। আলপনা (দেব.), ১৯৪৫।
নুড়ি। রাঙারাখী (দেব.), ১৯৪৭।
পোকা। আবাহন (দেব.), ১৯৪৮।
ঘড়ি। ছায়াপথ (শরৎ.), ১৯৪৮।
ছড়ি। নবারুণ (দেব.), ১৯৪৯।
মাছ। মনোরথ (শরৎ.), ১৯৪৯।
টুপি। পরশমণি (দেব.), ১৯৫২।
লাট্টু। তপোবন (শরৎ.), ১৯৫২।
দাদা। বসুধারা (দেব.), ১৯৫৩।
ফুটো। ইন্দ্রধনু (দেব.), ১৯৫৪।
দাঁত। দেবালয় (দেব.), ১৯৫৫।
ঘনার বচন [উলটোহাটা যাবে কি?'] জয়যাত্রা (দেব.), ১৯৫৬।
হাঁস। নবপত্রিকা (দেব.), ১৯৫৭।
সুতো। অপরাজিতা (দেব.), ১৯৫৮।

শিশি। দেব দেউল (দেব.), ১৯৫৯।
ঢিল। অপরূপা (দেব.), ১৯৬০।
কেঁচো। শারদীয়া (দেব.), ১৯৬১।
ছাতা। অলকনন্দা (দেব.), ১৯৬২।
মাছি। শ্যামলী (দেব.), ১৯৬৩।
জল। উত্তরায়ণ (দেব.), ১৯৬৪।
চোখ। নীহারিকা (দেব.), ১৯৬৫।
ভাষা। অরুণাচল (দেব.), ১৯৬৬।
তেল। বেণুবীণা (দেব.), ১৯৬৭।
ধুলো। ইন্দ্রনীল (দেব.), ১৯৬৮।
মাটি। কিশোর ভারতী ১৯৬৮ (?)।
টল। মণিহার (দেব.), ১৯৬৯।
মুলো। কিশোর ভারতী, শারদ সংখ্যা, ১৯৭০।
ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ। বার্ষিক শিশুসাথী, ১৯৭০।
পৃথিবী বাড়ল না কেন? আনন্দমেলা (পুজাবার্ষিকী), ১৯৭৩।
গান। আনন্দমেলা। (পূজাবার্ষিকী), ১৯৭৪।
ভারত যুদ্ধে পিঁপড়ে। আনন্দমেলা (আষাঢ় ১৩৮২), ১৯৭৫।
গুল-ই-ঘনাদা। আনন্দমেলা (পূজাবার্ষিকী), ১৯৭৫।
খাণ্ডবদাহে ঘনাদা। আগমনী (দেব.), ১৯৭৬।
কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা। মন্দিরা (দেব.), ১৯৭৭।
তেল দেবেন ঘনাদা। আনন্দমেলা (পূজাবার্ষিকী), ১৯৭৮।
জয়দ্রথ বধে ঘনাদা। প্রভাতী (দেব.), ১৯৮০।
ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান (পূজাবার্ষিকী), (?)।
মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসমালাই। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৩।
ঘনাদার শল্য সমাচার। বিভাবরী (দেব.), ১৯৮৩।
মৌ-কা-সা-বি-স—একবচন না বহুবচন। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৪।
ঘনাদা ফিরলেন। আরাধনা (দেব.), ১৯৮৪।
ঘনাদার বাঘ। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান। (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৫।
ঘনাদা এলেন। শুকতারা (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৫।
কালো ফুটো সাদা ফুটো। পক্ষিরাজ (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৫।
মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা। আনন্দমেলা (পূজাবার্ষিকী), ১৯৮৬।
ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত। আনন্দমেলা, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬।
মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান (পূজাবার্ষিকী) ১৯৮৭।

(শুভেন্দু দাশমুন্সী লিখিত)

গ্রন্থপরিচিতি

যাঁর নাম ঘনাদা। পৃ. ৭৭ + ৪।
সূচি ॥ ধুলো, মুলো, টল, নাচ, কাদা।

দুনিয়ার ঘনাদা। দে'জ পাবলিশিং।
চতুর্থ সংস্করণ জুন ১৯৮৩।
প্রথম প্রকাশ শুভ নববর্ষ ১৩৮৩, এপ্রিল ১৯৭৬। পৃ. ১০৯। মূল্য আট টাকা।
উৎসর্গ ॥ স্নেহের দীপান্বিতাকে দিলাম—মেসোমশাই।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ গৌতম রায়।
সূচিপত্র ॥ কাঁটা, গান, কীচক বধে ঘনাদা, পৃথিবী বাড়ল না কেন, ঘনাদার ধনুর্ভঙ্গ।

ঘনাদার ফুঁ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
সপ্তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯২। পৃ. ৭৬ + ৮। মূল্য ১৬.০০।
প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৮।
উৎসর্গ ॥ সম্বরণ চট্টোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ ধ্রুব রায়।
সূচিপত্র ॥ ঘনাদার ফুঁ, ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে, বেড়াজালে ঘনাদা, কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা, খাণ্ডবদাহে ঘনাদা।

ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্। পক্ষিরাজ প্রকাশনী।
প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০। পৃ. ৮০। মূল্য ১০.০০।
উৎসর্গ ॥ স্নেহের জয়কে দিলাম। দাদু।
প্রচ্ছদ ॥ ধ্রুব রায়।
সূচি ॥ ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্, গুল-ই ঘনাদা, শান্তিপর্বে ঘনাদা।

ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ।
প্রথম প্রকাশ। জুন ১৯৮৫। পৃ. ১২৪ + ৪। মূল্য ১৫.০০।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। অলয় ঘোষাল।
সূচি ॥ ঘনাদার চিঠিপত্র ও মৌ-কা-সা-বি-স, মৌ-কা-সা-বি-স ও ঘনাদা, মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই, মৌ-কা-সা-বি-স একবচন না বহুবচন, ঘনাদার শল্য সমাচার, ঘনাদা ফিরলেন, আঠারো নয় উনিশ, পরাশরে ঘনাদা।

ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৩। পৃ. ৯৫। মূল্য ৩০.০০।
প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৫।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুব্রত চৌধুরী।
সূচি ॥ ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত, ভেলা, ঘনাদা এলেন!, হ্যালি-র বেচাল, জয়দ্রথ বধে ঘনাদা।

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা। প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩।
উৎসর্গ ॥ শ্রীপরিমল গোস্বামী পরমবন্ধুবরেষু।

তেল দেবেন ঘনাদা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৭। পৃ. ৮০ + ৪। মূল্য ২০.০০।
প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৯।
উৎসর্গ ॥ শ্রীশশধর রাহা ও শ্রীমতী গীতশ্রী রাহাকে
গভীর স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ অহিভূষণ মালিক।

মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৩। পৃ. ৮৮। মূল্য ২০.০০।
প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৪।
উৎসর্গ ॥ পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ দেবাশিস দেব।

ঘনাদার অগ্রন্থিত গল্প।
ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা।
প্রথম প্রকাশ পূজাবার্ষিকী কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান ১৯৮৭।

ঘনাদার বাঘ।
প্রথম প্রকাশ পূজাবার্ষিকী কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, ১৯৮৫।

ঘনার বচন। প্রথম প্রকাশিত জয়যাত্রা, দেব সাহিত্য কুটির ১৩৬৩।